সিরাতুন নবী

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

মাওলানা মুহাম্মদ ইসমাইল রেহান

তারিখে উম্মতে মুসলিমাহর সিরাত অধ্যায়

সিরাতুন নবী

মাওলানা মুহাম্মদ ইসমাইল রেহান

অনুবাদ

নাজিবুল্লাহ সিদ্দীকী

মুহাদ্দিস ও আদিব, জামিয়াতুল মানহাল আল কওমিয়া

উত্তরা, ঢাকা

ইত্তিহাদ

পা ব লি কে শ ন

সিরাতুন নবী
মাওলানা মুহাম্মদ ইসমাইল রেহান
অনুবাদক : নাজিবুল্লাহ সিদ্দীকী
সম্পাদনা : আহসান ইলিয়াস

প্রকাশক : মাওলানা মুহাম্মাদ ইসহাক
প্রকাশকাল : অক্টোবর ২০২২
দ্বিতীয় মুদ্রণ : ডিসেম্বর ২০২৩
স্বত্ব : ইত্তিহাদ পাবলিকেশন
প্রচ্ছদ ও অঙ্গসজ্জা : শামীম আল হুসাইন

মূল্য : ৯৫০ (নয়শত পঞ্চাশ) টাকা মাত্র

বিক্রয়কেন্দ্র :
ইত্তিহাদ পাবলিকেশন
কওমি মার্কেট, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
০১৯৭৯-৭৬৪৯২৬, ০১৮৪৩-৯৮৪৯৮৪
www.ettihadpublication.com

অনলাইন পরিবেশক : রকমারি, ওয়াফিলাইফ, সহিফাহ

https://t.me/islaMic_fdf

লেখকের কথা

নাহ্মাদুহু ওয়া নুসাল্লি আলা রাসুলিহিল কারিম!

আম্মা বা'দ!

আমার জন্য অত্যন্ত আনন্দের সংবাদ যে, অধমের প্রতিটি কাজই প্রিয় বাঙালি পাঠকবর্গ প্রচণ্ড উৎসাহ ও অনিঃশেষ উদ্দীপনার সাথে গ্রহণ করেছেন। মুসলিম উম্মাহর ইতিহাস বাংলাভাষায় প্রকাশের পর যে অপূর্ব উচ্ছ্বাস লক্ষ করেছিলাম, তা আজও আমাকে আন্দোলিত করে। আল্লাহ তায়ালা মুসলিম যুবক ও পাঠকদের এই আবেগ ও অনুভূতি স্থায়ী করুন। আমিন।

সম্প্রতি মাওলানা যুবাঈর সাহেবের মাধ্যমে জানতে পারলাম, তারিখের মধ্যে সংরক্ষিত সিরাতুন নবী অংশটি তারা মাহে মুবারাক, রবিউল আউয়ালের বিশেষ মুহূর্তে একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থাকারে প্রকাশ করতে যাচ্ছেন। এমন উদ্যোগ সত্যিই প্রশংসনীয়। নবীজির (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসা আমাদের সাধ্যের মাঝে থাকা সব ধরনের উপায় ও উপকরণ দিয়ে প্রকাশের চেষ্টা করে যেতে হবে। ইত্তিহাদ পাবলিকেশনের এমন প্রচেষ্টাকে সাধুবাদ জানাই, তাদের কার্যক্রমে অফুরন্ত বরকত কামনা করি। প্রিয় পাঠক ও সুধীবৃন্দ,

আপনারা হয়তো অনেকেই জানেন না, আমি বিগত সময়ে শারীরিকভাবে খুব অসুস্থ ছিলাম। এর মাঝেও আপনাদের ঐতিহাসিক ভূমি সফরের লক্ষ্যে আন্তরিক প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। আমি অধমের সুস্থতা ও আপনাদের সান্নিধ্যে উপস্থিতির সুযোগ যেন অচিরেই ঘটে, এই দোয়া কামনা করে বিদায় নিচ্ছি।

ওয়াস সালাম।

বান্দা ইসমাইল রেহান

হাসান আবদাল, আটক, ইসলামাবাদ

نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم

اما بعد!

میرے لیے یہ بہت خوشی کی بات ہے کہ بندہ ناچیز کے ہر کام کو پیارے بنگالی قارئین نے بڑے جوش اور نہ ختم ہونے والے جذبہ کے ساتھ قبول کیا ہے۔ بنگالی زبان میں تاریخ امت مسلمہ کی اشاعت کے بعد میں نے جس حیرت انگیز جوش و خروش کا مشاہدہ کیا وہ آج بھی مجھے متوجہ کرتا ہے۔ اللہ تعالی مسلم نوجوانوں اور قارئین کے ان جذبات و احساسات کو قائم و دائم رکھے۔ آمین۔

حال ہی میں مجھے مولانا زبیر صاحب کے ذریعے معلوم ہوا کہ وہ تاریخ میں محفوظ سیرت النبی کا حصہ ماہ مبارک ربیع الاول کے خاص موقع پر ایک الگ کتاب میں شائع کرنے والے ہیں۔ ایسا اقدام واقعی قابل تعریف ہے۔ ہمیں ہر ممکن ذرائع اور مواد کے ساتھ نبی اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) سے حقیقی محبت کا اظہار کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ میں اتحاد پبلی کیشنز کی کاوشوں کو سراہتا ہوں اور ان کی کوششوں میں ان کے لیے لامتناہی برکتوں کی خواہش کرتا ہوں۔

پیارے قارئین اور دوستو!

آپ میں سے بہت سے لوگ نہیں جانتے ہوں گے، میں ماضی میں جسمانی طور پر کافی بیمار رہا ہوں۔ اس کے باوجود آپ کی تاریخی سرزمین کی زیارت کی مخلصانہ کوششیں جاری ہیں۔ ناچیز کی صحت اور جلد ہی آپ کی حاضری کے موقع کی دعا کے ساتھ اجازت لے رہا ہوں۔

والسلام

بندہ اسماعیل ریحان

حسن ابدال، اٹک، اسلام آباد

মাওলানা ইসমাইল রেহান : জীবন ও পরিচিতি

সময়ের অন্যতম প্রসিদ্ধ ও বিশ্বস্ত ইতিহাসবিদ, উম্মাহর দরদ-ব্যথা অন্তরে প্রবলভাবে লালনকারী, বিজয়ের শতাব্দীতে উম্মাহর সন্তানদের পুরোনো সেই সোনালি দিনগুলোতে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে যিনি জীবন ওয়াকফ করে দিয়েছেন, নিজের কাজের মূল্যায়নে বাংলাদেশি এক মনীষীর সামান্য ক'লাইনের মন্তব্য পেতে নিজেকে যিনি মুহূর্তেই একজন সাধারণ তালিবে ইলমের পর্যায়ে নিয়ে আসেন, সেই অসম্ভব বিনয়ী মানুষটির জীবন নিয়ে আজ সামান্য ক'টি কথা লিখব।

হাফেজ মাওলানা ইসমাইল জন্মেছেন পাকিস্তানের করাচি শহরে। কিন্তু রক্তের সম্পর্ক তার পশ্চিম পাঞ্জাবে। রাজধানী ইসলামাবাদ থেকে ৪০ কিলোমিটার উত্তর-পশ্চিমে এগিয়ে গেলে আটক জেলা। এই জেলাতে অবস্থিত বিখ্যাত কিছু ঐতিহাসিক স্থান। মোগল দরবারের দুজন বিখ্যাত হেকিম ভাইয়ের মাকবারাও এখানে অবস্থিত। এটি পাকিস্তানের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলীয় এলাকা। এখানেই হাসান আবদাল এলাকায় খালিকদার গ্রামে তাঁর স্থায়ী নিবাস। পূর্বপুরুষরা এখানেই জীবন কাটিয়েছেন। বাবার কর্মস্থলের সুবাদে মাওলানার পরিবার একসময় করাচিতে এসে পড়ে। ফলে তার জন্মস্থান হয়ে পড়ে করাচি। তারিখের হিসেবে পহেলা ফেব্রুয়ারি, ১৯৭১। জনাব আবদুল আজিজ সাহেবের সুপুত্র হিসেবে তার প্রাথমিক নাম রাখা হয় মুহাম্মদ ইসমাইল। লেখালেখির সময় পুরো নাম মুহাম্মদ ইসমাইল রেহান ব্যবহার করেন। করাচির পুরোনো গোলিমার এলাকায় তিনি বাল্য ও কৈশোর অতিবাহিত করেছেন। হিজরতের পর পূর্ব পাঞ্জাব থেকে লাখো মুহাজির এই এলাকায় এসে বসতি গড়েন। তখন প্রাণচাঞ্চল্যে পূর্ণ ছিল এই এলাকাটি। প্রায় সকল এথনিক মাইনরিটি (ছোট বড় গোত্র ও উপজাতি) এই এলাকায় কালিমার পরিচয়ে একত্রিত হয়েছিলেন। বসবাস করতেন পারস্পরিক সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্য নিয়ে।

পারিবারিকভাবে একটি সাধারণ দীনি পরিবেশে তিনি বেড়ে ওঠেন। মায়ের কাছে দীনিয়াত বিষয়ে পড়াশোনার পাশাপাশি স্থানীয় স্কুলে প্রচলিত সাধারণ শিক্ষা গ্রহণ করেন। মেধাবী ছাত্র মুহাম্মদ ইসমাইল বিজ্ঞানবিভাগ থেকে ১৯৮৬ সালে মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এরপর হঠাৎ জীবনে একটি আচমকা মোড় এসে যায়। সাধারণ শিক্ষা থেকে দীনি শিক্ষায় ধাবিত হন। ভর্তি হন দারুল উলুম কোরঙ্গি করাচিতে। শুরু করেন একদম প্রথম থেকে। কালামে পাকের

হিফজ দিয়ে! কৈশোরের শেষপ্রান্তে এসে হিফজের চ্যালেঞ্জ এতটাও সহজ ছিল না। এই নেয়ামত তিনি তিন বছর কঠোর পরিশ্রম করে অর্জন করেন। এই সময়ে নিয়মিত শায়খুল ইসলামের ইসলাহি মজলিসগুলোতে বসতেন। ব্যক্তিগতভাবে সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত তিনি শায়খুল ইসলামের দ্বারাই হয়েছেন। শায়েখের মজলিসে শোনা ইসলামের হারানো ঐতিহ্য ও অতীতের গল্পগুলো তাকে মুগ্ধ করত। স্বপ্ন দেখতেন একদিন বড় হয়ে ইসলামের ইতিহাস নিয়ে শায়খুল ইসলামের মতো গবেষণা করবেন। মুসলিম উম্মাহকে জানাবেন কত সমৃদ্ধ ছিল আমাদের অতীত। আর কত উজ্জ্বল আমাদের ভবিষ্যৎ।

হিফজুল কুরআনের পর বিলম্ব না করে প্রচলিত ধারার স্থানীয় দরসে নিজামিতে ভর্তি হয়ে যান। বাহাদুরাবাদ এলাকায় অবস্থিত জামেয়া মা'হাদুল খলিল আল-ইসলামি থেকে ধারাবাহিক পড়াশোনার মাধ্যমে ১৯৯৫ সালে তাকমিল সমাপন করেন। পরবর্তীতে অবশ্য পুনরায় ২০০১ সালে বেফাকুল মাদারিসে তাকমিল পরীক্ষায় অংশ নেন। অর্থাৎ দু'বার তাকমিল সমাপন করেন তিনি। এর মাঝে সময়ের বিখ্যাত মুহাক্কিক গবেষক আল্লামা আবদুর রশিদ নুমানির শিষ্যত্ব অর্জনেরও সৌভাগ্য হয় তার। গবেষণার নানামুখী শিল্প ও কৌশল তিনি এই সময় রপ্ত করেন। এরই মাঝে সাধারণ শিক্ষা ও এই ক্ষেত্রে কিছু সনদের জন্য নিয়মিত পড়াশোনা চালিয়ে যেতে থাকেন। ২০০৬ সালে করাচি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইসলামের ইতিহাস ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিষয়ে মেজর নিয়ে বি.এ (সমমান) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। একটি প্রাইভেট প্রোগ্রাম ছিল সেটি। এই সময়ে ইসলামের ইতিহাস নিয়ে একটি গবেষণামূলক থিসিস লেখেন তিনি। পড়াশোনার ধারা এরপরেও অব্যাহত থাকে। ২০১০ সালে করাচির উর্দু বিশ্ববিদ্যালয় (FUUAST) থেকে মাস্টার্স ডিগ্রি অর্জন করেন।

বেফাক থেকে তাকমিলের পরপরই কর্মজীবনে পা রাখেন এই তরুণ মাওলানা। দীর্ঘ দুই দশক ধরে নানা বিষয়ে শিক্ষাদান করে আসছেন। আরবি ব্যাকরণের প্রাথমিক স্তরের বিষয় নাহব-সরফ থেকে শুরু করে দাওরায়ে হাদিস বিভাগে মুসলিম শরিফ পর্যন্ত পাঠদান করেছেন। এর মাঝে একাধারে পাঠদান করেছেন ফারসি সাহিত্য, আরবি সাহিত্য, তাফসির, মিশকাত শরিফ, আবু দাউদ, সুনানে নাসায়ি, ইবনে মাজাহ এবং মুসলিম শরিফ। পাশাপাশি ইসলামের ইতিহাস নিয়ে বিশেষ কোর্সও নিয়েছেন দীর্ঘদিন। বুদ্ধিবৃত্তিক ও মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধ নিয়ে কিছুদিন প্রাতিষ্ঠানিক পাঠদান করেছেন। করাচির বিখ্যাত জামিয়াতুর রশিদেও ইতিহাস বিভাগে খণ্ডকালীন অধ্যাপনায় নিয়োজিত আছেন। গবেষণায় ব্যস্ত থাকলেও এখনো পাঠদানের সাথে নিজেকে সম্পৃক্ত রেখেছেন। মাশা আল্লাহ।

লেখালেখিটা বলা যায় তাকমিলের কিছুকাল পূর্ব থেকেই শুরু করেছিলেন। শুরুতে কলাম, প্রবন্ধ ও ইতিহাস নিয়ে ছোটগল্প লিখতেন। এরপর ধীরে ধীরে ইতিহাসের গলিপথে ও ইসলামি ইতিহাসের আলোকোজ্জ্বল মোহনায় শুরু করেন আনুষ্ঠানিক এবং অনুসন্ধানী প্রবেশ। সুদীর্ঘকাল ধরে ইসলামবিদ্বেষী চিন্তাবিদদের ইসলামপ্রশ্নে শত শত বরং হাজার হাজার অপপ্রচারমূলক সুচিন্তিত মিথ্যাচার, প্রচলিত সমাজে লোকমুখে জন্ম নেওয়া অসংখ্য ঐতিহাসিক অসত্য আর অজ্ঞানতাকে আলোয় নিয়ে আসতে দিনরাত আর বছরকে বছর একাকার করে ফেলেন। এক একটি গবেষণায় ব্যয় করেন বছরের পর বছর। শুধু খাওয়ারিজম শাহের ইতিহাস নিয়েই কাজ করেছেন সুদীর্ঘ প্রায় এক যুগ। সুলতান আইয়ুবিকে নিয়েও যেকোনো সময়ের চেয়ে সর্বাধিক পরিমাণ লিখেছেন তিনি। প্রায় হাজার পৃষ্ঠা। এটি যে-কোনো ভাষায় সুলতানকে নিয়ে করা সবচেয়ে বিস্তারিত কাজ। আফগানিস্তানের ইতিহাস নিয়েও লিখেছেন হাজার পৃষ্ঠার বেশি। যে বিষয়ে হাত দিয়েছেন, বিশুদ্ধতা ও ভারসাম্য বজায় রেখে ইতিহাসের সুনিপুণ ছবি এঁকে প্রতিটি পরতের শিক্ষা নিয়ে এসেছেন উম্মাহর সামনে। সমসাময়িক বেশ কিছু ইতিহাসবিদ শিক্ষণীয় আঙ্গিকে ইতিহাস তুলে ধরলেও এই মাওলানার কলব ও কলম দুটোই তার আবেগকে পাঠকের হৃদয় একদম ছুঁয়ে দিয়েছে। বিস্তৃত অধ্যয়নকারী পাঠকমাত্রই বিষয়টি উপলব্ধি করতে পারবেন। বিগত প্রায় এক দশক ধরে তিনি কাজ করে চলেছেন মুসলিম উম্মাহর ইতিহাস নিয়ে। শুরুতে তার পরিকল্পনা ছিল ছয় খণ্ডে সুবিশাল এই কর্মযজ্ঞটি সম্পাদন করবেন। কিন্তু সর্বশেষ অবস্থা কী দাঁড়াবে তা এখনোই নিশ্চিতভাবে বলা যাচ্ছে না। সর্বশেষ ভাবনা অনুযায়ী এই সিরিজটি সাত খণ্ডে-ও পৌঁছতে পারে। এই সিরিজের পরিচয় ও তার বৈশিষ্ট্য ইতোমধ্যে বঙ্গীয় সমাজে আলোচিত হয়েছে। আমি নতুন করে শুধু একটি কথাই বলব, উম্মাহর ইতিহাসকে বিশুদ্ধতা ও ইনসাফের সর্বোচ্চ পর্যায়ে নিয়ে গেছেন এই দেওবন্দি মাওলানা। বারাকাল্লাহু ফীহ!

সাংবাদিকতাতেও তাঁর কমবেশি ঝোঁক ছিল। সেই জায়গা থেকে বেশ কিছু মাসিক ও পাক্ষিকে কাজ করেছেন দীর্ঘদিন। ২০০৬ সাল থেকে ২০০৯ পর্যন্ত মাসিক সুলুক ও ইহসান পত্রিকার নির্বাহী সম্পাদক ছিলেন। শিশুদের জন্য প্রকাশিত সাপ্তহিক 'শিশুদের ইসলাম'-এর সাধারণ সম্পাদক ছিলেন দীর্ঘ আট বছর। নারীবিষয়ক সাপ্তাহিকী 'খাওয়াতুনে ইসলামে'র সম্পাদনা করেছেন তিন বছর। ২০১০ থেকে ২০১৩ পর্যন্ত। বিখ্যাত পত্রিকা দৈনিক 'ইসলাম'-এ ধারাবাহিক কলাম লিখছেন দীর্ঘ দুই দশক। তবে কলাম লিখে সবচেয়ে বেশি বিখ্যাত হয়েছেন 'যরবে মুমিন' পত্রিকায়। প্রায় ২১ বছর ধরে নিয়মিত কলাম

লিখে আসছেন তিনি। বেশকিছু গ্রন্থ এই ধারাবাহিক কলাম থেকেই আলোয় এসেছে। যেমন, তারিখে আফগানিস্তান (এটি খুব শীঘ্রই কালান্তর প্রকাশনী থেকে আসবে), জালালুদ্দীন খাওয়ারিজম শাহ আওর তাতারি ইয়ালগার (সম্প্রতি নাশাত থেকে প্রকাশিত ব্যাপক জনপ্রিয়তা পাওয়া 'খাওয়ারিজম সাম্রাজ্যের ইতিহাস' এই গ্রন্থেরই পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ)।

বর্তমানে কিছু দীর্ঘমেয়াদী প্রকল্পে ব্যস্ত সময় পার করছেন সময়ের অন্যতম প্রসিদ্ধ এই ইতিহাসগবেষক। প্রথমত তারিখের প্রকল্পটি শেষ করার জন্য দিনরাত এক করে কাজ করে যাচ্ছেন। পাশাপাশি নিজ এলাকা হাসান আবদালে উলুমুল কুরআন নামে একটি প্রতিষ্ঠান পরিচালনার গুরুদায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন। মূলত তার কিছু আত্মীয়ের উদ্যোগে দশ বছর পূর্বে এই প্রতিষ্ঠানটির গোড়াপত্তন হয়। সেই সময় মাওলানা করাচিতে তার জীবনের শ্রেষ্ঠ সময় কাটাচ্ছিলেন। কিন্তু সুরা তাওবার ১২২ নং আয়াত তাকে সমুদ্র তীর থেকে নিজ এলাকার উঁচু পাহাড়ি অঞ্চলে নিয়ে আসে। করাচির মতো মেট্রোপলিটন শহর ছেড়ে তিনি কুরআনে কারিমের আওয়াজ নিজ এলাকায় ছড়িয়ে দিতে একদম গাঁও-গ্রামে এসে পড়েন। আটক জেলার একটি বিখ্যাত জায়গা এই তাহসিল হাসান আবদাল। ইসলামপূর্ব ইতিহাস থেকে শুরু করে মোগল আমলের কিছু গুরুত্বপূর্ণ ইতিহাসের সাক্ষী এই অঞ্চল। মাওলানার বর্তমান অবস্থান আপাতত এখানেই। দিনরাত গবেষণায় মগ্ন থেকে কাজ করেন আর প্রাতিষ্ঠানিক বিষয়াদি দেখভাল করেন।

ব্যক্তিগতভাবে তিনি শায়খুল ইসলামের ব্যক্তিত্ব দ্বারা অত্যন্ত প্রভাবিত। এ ছাড়াও সময়ের অন্যান্য আলেমের বিশেষত দেওবন্দিধারার আলেমদের তিনি বিশেষ শ্রদ্ধা করে থাকেন। তার শিক্ষকদের অধিকাংশই দেওবন্দি চেতনার মশালবাহী। আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামায়াতের সকল দলমতকে তিনি সবিশেষ সম্মান করে থাকেন। কোনো রাজনৈতিক দল বা মতের সাথে যুক্ত ছিলেন না কখনো। নিভৃতভাবে কাজ করতেই স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন তিনি। তবে দাওয়াত ও তাবলিগের সাথে বিশেষ সখ্য আছে তার। জীবনের মোড় ঘুরে যাওয়ার পেছনেও এই মেহনতের শুকরিয়া আদায় করেন তিনি। সুযোগ ও অবসর পেলে এখনো দাওয়াত ও তাবলিগের মেহনতে সময় ব্যয় করার চেষ্টা করেন মাওলানা।

মূলত ইতিহাসগবেষণায় প্রসিদ্ধি পেলেও তিনি শিশুদের নিয়েও কিছু কাজ করেছেন। ইসলামি সমাজ বিনির্মাণে শিশুতোষ সাহিত্যের বিকল্প নেই। এই চিরায়ত সত্যটি তিনি কর্মজীবনের শুরুতেই অনুধাবন করেছিলেন। ফলে এখনো শিশুদের পাঠদান করেন। বিশ্বমানের গবেষণার পাশাপাশি শিশুদের নিয়মিত পাঠদান ও তাদের চিরায়ত পরিবর্তনশীল মনস্তত্ত্ব নিয়েও গভীরভাবে

ভাবনাচিন্তা করেন তিনি। শিশুতোষ পত্রিকার সম্পাদনার পাশাপাশি শিশুদের জন্য কয়েকটি গ্রন্থও রচনা করেছেন। এর মাঝে 'আস্তিনের সাঁপ' বেশ সুখপাঠ্য। বর্তমানেও 'এসো বাচ্চারা ইসলামকে জানি' নামে একটি সিরিজ নিয়ে কাজ করছেন। 'এসো বাচ্চারা গল্প শোনো!' নামেও একটি সিরিজ তিনি নির্মাণ করছেন। এ ছাড়াও তার কলামসমগ্র ছেপে এসেছে 'বরাহেরাস্ত' শিরোনামে।

৫০ বছর বয়সি এই মাওলানা নিজেকে উম্মাহর আগামী দিনের পথচলার আয়না তৈরিতে বিলিয়ে দিচ্ছেন। বিশুদ্ধ ইতিহাস ও ইতিহাস থেকে নেওয়া উপযুক্ত শিক্ষাগুলো এমন হৃদয়গ্রাহী মনোভাবে তুলে ধরেন যে, সচেতন ও সামান্য দীনি চেতনাদীপ্ত পাঠকের হৃদয়কেও তা ছুঁয়ে যেতে বাধ্য। তাই তো জনাবের কলাম উম্মাহর সিংহ-শার্দূলরা তাদের মাসিক পত্রিকায় নিয়মিত ছেপে থাকেন। উম্মাহর জন্য তার এই 'মুখলিসানা আন্দাজ' সকলকেই আকৃষ্ট করে। তার রচিত তারিখে উম্মতে মুসলিমাহ প্রকাশিত হবার পর শায়খুল ইসলামের সাথে ফোনালাপেও তাঁর অসাধারণ বিনয় ও অপূর্ব নম্রতা সকলের দৃষ্টি কেড়েছে। মাওলানাসহ যারা নিশিদিন একাকার করে উম্মাহর হারানো গৌরব ও ইতিহাস সময়ের চাহিদানুযায়ী উপস্থাপনের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছেন, সকলের জন্য আন্তরিক দুয়া করতে ভুলবেন না যেন!

ওয়াস সালাম।

যুবাঈর আহমাদ

নিচের লিংকে ক্লিক করে আমাদের টেলিগ্রাম চ্যানেলে যুক্ত হোন

https://t.me/islaMic_fdf

সূচিপত্র

পৃথিবীর সূচনা ২৭
পৃথিবী কখন সৃষ্টি করা হয় ২৮
হজরত আদম আলাইহিস সালাম ২৯
হজরত নুহ আলাইহিস সালাম ৩৪
আদ ও সামুদ ৩৫
হজরত ইবরাহিম আলাইহিস সালামের দাওয়াত ৩৫
জমজম ৪০
ছেলের কুরবানি ৪২
কাবাঘর নির্মাণ ৪২
হজরত ইসহাক ও হজরত ইয়াকুব (আলাইহিমাস সালাম) ৪৪
হজরত লুত আলাইহিস সালাম ৪৫
হজরত আইয়ুব আলাইহিস সালাম ৪৫
হজরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম ৪৬
মিসর এবং মিসরের ফেরাউনরা ৪৭
মিসরের প্রথম খোদা দাবিদার ফেরাউন : ওয়ালিদ বিন মুসআব ৪৮
হজরত মুসা আলাইহিস সালাম ৪৯
বনি ইসরাইলের নবীগণ : কাজি ও রাজাদের যুগ ৫১
অনারব রাজাগণ ৫২
বনি ইসরাইলের পতনযুগ এবং দেশান্তর ৫৩
হজরত ঈসা আলাইহিস সালাম ৫৪
ইয়াসরিবে ইহুদিদের আগমন ৫৫
খ্রিষ্টবাদে ফাটল ৫৫
হজরত ঈসা আ. ও নবীজির মধ্যভাগে আরবের অবস্থা ৫৮
হজরত ইসমাইল আলাইহিস সালামের বংশধর ৫৯
কওমে সাবা, হিময়ারের রাজা এবং তাবাবিয়া ৬০
ইয়েমেনে হাবশিদের কর্তৃত্ব এবং সাইফ বিন যি-ইয়াযানের ৬২
আজাদি আন্দোলন ৬২
জাহিলিযুগে বিভিন্ন আরব রাজত্ব ৬৩
হেরাত রাজ্য ৬৩

মাজদাকিয়াত এবং হেরাত রাজ্য..........৬৪
বনু গাসসান..........৬৫
বহিঃশত্রুর আক্রমণের টার্গেটে আরব..........৬৬
মক্কা উপত্যকা..........৬৭
বনু জুরহুমের দখলমুক্তি এবং বনু খুজাআর কর্তৃত্ব স্থাপন..........৬৮
মূর্তিপূজার সূচনা..........৬৯
কুরাইশের উদ্ভব..........৭০
হাশিম..........৭২
কুরাইশের উত্থান..........৭৩
ইয়াসরিবে ইহুদিদের আগমন..........৭৪
ইয়াসরিবের আউস-খাযরাজ এবং ইহুদিদের বিরোধ..........৭৭
তায়েফ..........৭৮
পৃথিবী ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে..........৭৯
হিন্দুধর্ম..........৭৯
বৌদ্ধধর্ম..........৮০
ইরানের ধর্মীয় অধঃপতন..........৮১
চীনের আকিদা-বিশ্বাসের অবস্থা..........৮৩
ইউরোপের নৈতিক অবক্ষয় এবং আধ্যাত্মিক অধঃপতন..........৮৩
গ্রিকদর্শন..........৮৫
শুধুই শব্দের ফুলঝুড়ি..........৮৬
গোমরাহিতে জর্জরিত ইহুদিজাতি..........৮৭
আরবদের ধর্মীয় অবস্থা..........৮৯
আরবদের নৈতিক অবস্থা..........৯২
আবদুল মুত্তালিব..........৯২
আবদুল্লাহ..........৯৪
জাজিরাতুল আরবের উপর ঐশী-তত্ত্বাবধান কেন? ৯৫
ইতিহাসের শিক্ষা..........৯৮
মানবেতিহাসের সবচেয়ে বড় বিপ্লব..........১০৩
দুরুদ ও সালাম..........১০৪
আসন্ন বসন্তের পূর্বাভাস..........১০৫
হস্তীবাহিনীর ঘটনা : একটি অদৃশ্য ইঙ্গিত..........১০৮
সৃষ্টির উষাকাল..........১১০
পবিত্র শিশু..........১১৫

মায়ের সাথে ইয়াসরিব সফর ১১৬
মা আমিনার অফাত এবং আবদুল মুত্তালিবের তত্ত্বাবধান ১১৬
আবদুল মুত্তালিবের অফাতের পর ১১৭
সুন্দর শৈশব ১১৯
শাম সফর এবং বাহিরা পাদরির সাক্ষ্য ১১৯
হারবুল ফিজারে অংশগ্রহণ ১২১
সাইফ বিন যি-ইয়াযানের অফাত এবং দক্ষিণ আরবের উপর পারস্যের কর্তৃত্ব ১২২
হালাল উপার্জনের জন্য পরিশ্রম ১২৩
হিলফুল ফুযুল ১২৩
ঈর্ষণীয় তারুণ্য, ব্যবসা ও বিয়ে ১২৪
বৈবাহিক জীবন ১২৫
হজরত যায়েদ বিন হারিসার দায়িত্বগ্রহণ ১২৬
নবীজির পারিবারিক জীবন ১২৭
কাবা শরিফ নবনির্মাণ ১২৮
ঘরোয়া দায়িত্ব ১২৯
যায়েদ বিন হারিসার সঙ্গে উম্মে আইমানের বিয়ে ১৩০
সৃষ্টির সেবা : নবীজির অনন্য বৈশিষ্ট্য ১৩০
বনু হাশিমের সূর্য ১৩১
নবুওয়াতের আমানত যখন অর্পিত হলো ১৩৩
জিনদের আসমান-গমন নিয়ন্ত্রণ ১৩৩
প্রথম ওহি ১৩৫
পৃথিবীতে ইলম ও কলমের ধারণা ১৩৭
গুরুদায়িত্ব ১৩৮
ওহি বন্ধ হওয়া এবং নবীজির বেচাইনি ১৩৯
গোপনে দাওয়াত ১৪০
ইসলামি দাওয়াতের ধরন কী ছিল? ১৪০
ইসলামি দাওয়াতে গোপনীয়তা রক্ষা এবং সতর্কতা ১৪২
আবু জর গিফারির ইসলামগ্রহণ ১৪৩
তাওহিদের ঘোষণা এবং মুমিনদের পরীক্ষা ১৪৬
প্রকাশ্য দাওয়াত ১৪৮
আবু লাহাবের ধৃষ্টতার জবাব ও সুরা লাহাব নাজিল ১৪৯
আবু লাহাব ও তার স্ত্রীর উৎপীড়ন ১৪৯

আবু তালেবের উপর কুরাইশের বলপ্রয়োগ : নবীজির জবাব..........১৫০
সাহাবিদের উপর জুলুম-অত্যাচার..........১৫১
আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর উপর অত্যাচার..........১৫২
আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর প্রাণপ্রিয় ব্যক্তিত্ব নবীজি..........১৫২
নবীজিকে অপমান..........১৫৩
আবু জাহলের নোংরামী..........১৫৫
নবুওয়াতের দায়িত্ব এবং পারিবারিক জীবন..........১৫৫
পুত্রসন্তানদের মৃত্যু এবং মুশরিকদের দোষারোপ..........১৫৮
ছেলেদের মৃত্যু ও আল্লাহ তায়ালার হেকমত..........১৫৮
নতুন উম্মতের সৃষ্টি..........১৫৯
দাওয়াতি তৎপরতা..........১৬১
উকাজ বাজারে ইসলামের দাওয়াত (শাওয়াল নবুওয়াত ৪বর্ষ)..........১৬১
জিমাদ আযদির ইসলামগ্রহণ..........১৬৩
কুরআনের প্রভাবের ব্যাপারে মুশরিকদের স্বীকারোক্তি..........১৬৩
উতবা বিন রবিয়ার সঙ্গে কথোপকথন..........১৬৫
তুফাইল বিন আমর দাওসির ইসলামগ্রহণ..........১৬৭
অভয়াশ্রমের খোঁজে : হাবশায় হিজরত..........১৬৮
হাবশায় প্রথম হিজরত..........১৭০
উম্মে আবদুল্লাহ এবং উমর বিন খাত্তাবের কথোপকথন..........১৭১
হাবশায় আশ্রয়..........১৭২
সাহাবায়ে কেরামের ধৈর্য ও অবিচলতার বিধান..........১৭৩
ইসলামের নতুন ত্রাণকর্তা..........১৭৪
হজরত উমরের ইসলাম গ্রহণ..........১৭৫
আশার বাণী..........১৭৫
হজরত উমরের চুপিসারে নবীজির তেলাওয়াত শ্রবণ..........১৭৬
হাবশার মুহাজিরদের প্রত্যাবর্তন..........১৮২
আবারো জুলুমের সম্মুখীন..........১৮৪
দ্বিতীয়বার হাবশা হিজরত..........১৮৫
নাজাশির দরবারে কুরাইশের প্রতিনিধিদল..........১৮৬
নাজাশির সাহায্যের জন্য মুসলমানদের ভাবনা এবং প্রস্তুতি..........১৮৮
হাবশার মুহাজিরদের প্রত্যাবর্তনের সময়কাল..........১৮৮
হাবশায় হিজরতের প্রভাব-প্রতিক্রিয়া..........১৯০
হাবশা হিজরতের শিক্ষা..........১৯১

সামাজিক বয়কট ১৯২
শা'বে আবু তালেবে সীমাহীন কষ্ট-দুর্দশা ১৯২
অভাবের একটি চিত্র ১৯৩
রোম-পারস্যের লড়াই এবং কুরআনের ভবিষ্যদ্বাণী ১৯৪
হাবশার পথে হজরত আবু বকরের রওনা এবং মাঝপথ থেকেই ফেরত আসা ১৯৬
শে'বে আবু তালেবের বয়কট থেকে মুক্তি ১৯৮
হজরত খাদিজার ইনতেকাল ১৯৯
আবু তালেবের অফাত ২০১
হজরত সাওদা ও হজরত আয়েশার সাথে বিবাহ ২০১
চাঁদ বিদীর্ণ হওয়ার অলৌকিক ঘটনা ২০২
তায়েফ সফরের মর্মান্তিক ঘটনা ২০৩
জিনদের ইসলামগ্রহণ ২০৭
দ্বিতীয়বার মক্কায় প্রবেশ ২০৭
হিজরতভূমি ২০৯
ইয়াসরিবের প্রথম মুসলমান ২০৯
বুআস যুদ্ধ এবং তার প্রভাব ২১০
ইয়াসরিবের প্রথম কাফেলার ইসলামগ্রহণ ২১২
প্রথম আকাবার বাইয়াত ২১৪
মেরাজ সফর ২১৬
দ্বিতীয় আকাবার বাইয়াত ২১৯
বাইয়াতে উপস্থিত আরো কিছু প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ২২০
সাহাবিদের হিজরত ২২১
নবীজির হিজরত ২২৩
হত্যার ষড়যন্ত্র ২২৪
হিজরতের নির্দেশ : আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর ঘরে নবীজি ২২৪
হিজরতের সফরের দূরদর্শিতা ২২৭
আমার কওম যদি আমাকে না বের করে দিত! ২২৭
গারে সাওরে আত্মগোপন এবং কুরাইশের টোপ ২২৯
গারে সাওর থেকে হিজরতভূমির উদ্দেশে ২৩০
সুরাকা বিন মালিকের জন্য সুসংবাদ ২৩৩
গারে সাওরের আয়াতের আলোকে হজরত আবু বকরের মর্যাদা ২৩৪
ইমাম রাজি রহ. এর তাত্ত্বিক আলোচনা ২৩৪
প্রথম ইসলামি হুকুমত ২৩৭

কুবায় আগমন.........২৩৭
মসজিদে কুবা নির্মাণ.........২৩৮
মদিনায় আশেকে রাসুলদের এক অবিস্মরণীয় সংবর্ধনা.........২৩৯
বনু নাজ্জারের শিশুদের গান.........২৪০
ইয়াসরিব এখন মদিনাতুন-নবী, নবীজির শহর.........২৪১
মসজিদে নববি : ইসলামের নতুন কেন্দ্র.........২৪১
ইসলামি ভ্রাতৃত্ব বন্ধন.........২৪২
পরিবারকে মক্কা থেকে মদিনায় স্থানান্তর এবং তাদের আবাসনের ব্যবস্থা.........২৪২
আসহাবে সুফফাহ : ইসলামের প্রথম মাদরাসা.........২৪৩
যুহর, আসর ও ইশার চার রাকাত নামাজ ফরজ হওয়া এবং আজানের বিধান অবতীর্ণ.........২৪৩
ইসলামি হুকুমতের সামনে নতুন বিপদ.........২৪৪
আবদুল্লাহ বিন উবাই : মুনাফিকদের সরদার.........২৪৫
ইহুদি.........২৪৭
মদিনার অঙ্গীকার.........২৪৭
কুরাইশ কর্তৃক মুসলমানদের মদিনা থেকে বের করে দেওয়ার অপচেষ্টা.........২৪৯
কুরাইশ কর্তৃক পথ-অবরোধ.........২৪৯
মদিনার উপর কুরাইশের আক্রমণের আশঙ্কা.........২৫০
জিহাদের অনুমতি.........২৫০
মক্কায় কেন জিহাদের অনুমতি দেওয়া হয়নি?.........২৫১
জিহাদের উদ্দেশ্য.........২৫২
অভ্যন্তরীণ ও বহিঃআক্রমণের আশঙ্কা.........২৫৩
প্রাথমিক তৎপরতা.........২৫৪
কুরাইশের দুর্বলতা : অরক্ষিত বাণিজ্যপথ.........২৫৫
গাজওয়া এবং সারিয়া.........২৫৬
সংবাদ সংগ্রহপদ্ধতি.........২৫৮
সারিয়ায়ে আবদুল্লাহ বিন জাহাশ.........২৫৯
কাবাকে কিবলা বানাবার বিধান অবতীর্ণ.........২৬১
আশুরার রোজা.........২৬১
রমজানের রোজা ফরজ হওয়া.........২৬২
গাজওয়ায়ে বদর.........২৬৪
শিশুদের জিহাদি স্পৃহা.........২৬৪
বাণিজ্য-কাফেলার পরিবর্তে মক্কার সশস্ত্র বাহিনীর মুখোমুখি.........২৬৫

যুদ্ধের সূচনা ২৬৮
শাহাদাতের তামান্না ২৭০
আনসারি তরুণদের জিহাদি জযবা ২৭০
মুশরিকদের শোচনীয় পরাজয় ২৭৩
ফেরেশতার মাধ্যমে সাহায্য ২৭৪
উমাইয়া ইবনে খালাফকে হত্য ২৭৬
এই উম্মতের ফেরাউন ২৭৭
বদরযুদ্ধে উভয়পক্ষে হতাহতের সংখ্যা ২৭৮
যুদ্ধবন্দিদের সঙ্গে আচরণ ২৭৮
রাসুলুল্লাহর জামাতার গ্রেফতারি ২৭৯
শরিয়তে সদকাতুল ফিতরের বিধান ২৮০
শরিয়তে ঈদের নামাজের বিধান ২৮০
ঈদের মাঠে রাসুলুল্লাহর নিয়মিত আমল ২৮১
মাতৃজাতির উদ্দেশ্যে বিশেষ নসিহত ২৮১
জাকাতের বিধান ২৮১
বদরযুদ্ধের প্রভাব ২৮২
হাবশা অভিমুখে কুরাইশদের প্রতিনিধিদল ২৮২
হজরত আলির সঙ্গে হজরত ফাতেমার শুভবিবাহ ২৮৩
ইহুদিদের বিরুদ্ধে প্রথম অভিযান গাজওয়ায়ে বনু কাইনুকা ২৮৫
গাজওয়ায়ে সাবিক ২৮৬
কাব বিন আশরাফের গুপ্তহত্যা ২৮৬
হজরত উম্মে কুলসুম রা. এর বিবাহ ২৮৮
সারিয়া যিকারদা ২৮৮
গাজওয়ায়ে উহুদ ২৯০
উহুদ পাহাড়ের দিকে অগ্রসরতা এবং মুনাফিকদের বিরোধিতা ২৯১
প্রতিরক্ষা-কৌশল ২৯২
কুরাইশ বাহিনীর কিছু উল্লেখযোগ ব্যক্তি ২৯৪
মুসলিম-বাহিনীর সৈন্যবিন্যাস ২৯৫
আবু দুজানা রাদিয়াল্লাহু আনহুর বীরত্ব ২৯৭
সামষ্টিক হামলা এবং মুসলমানদের বিজয় ২৯৮
যুদ্ধের পটপরিবর্তন ২৯৮
নবীজির হেফাজতে সাহাবিদের তুলনাহীন জানবাজি ২৯৯
বিক্ষিপ্ত মুসলমানদের হিম্মত এবং জান্নাতের আগ্রহ ৩০১

নবীজির সন্ধানলাভ এবং সাহাবিদের অবর্ণনীয় আনন্দ......৩০২
পর্বত-চূড়ায় আরোহণ ও সাহাবিদের সীমাহীন আত্মত্যাগ......৩০৩
উবাই বিন খালাফের জাহান্নামের টিকিটপ্রাপ্তি......৩০৩
উহুদ পাহাড়ের ঘাঁটিতে......৩০৪
আহতদের শুশ্রূষা, প্রশান্তি অবতরণ......৩০৫
আবু সুফিয়ানের সঙ্গে কথোপকথন......৩০৬
গোয়েন্দাবৃত্তির জন্য হজরত আলির যাত্রা......৩০৭
উহুদের শহিদগণ......৩০৭
আমর বিন জামুহ রাদিয়াল্লাহু আনহু......৩০৮
হানযালা : ফেরেশতারা যার গোসল দিয়েছেন......৩০৮
মুসআব বিন উমাইরের অর্ধেক কাফন......৩০৯
এক শহিদের সর্বশেষ কথা......৩০৯
হামজা রাদিয়াল্লাহু আনহুর লাশ......৩০৯
কে জিতলো আর কে হারলো?......৩১১
গাজওয়ায়ে হামরাউল আসাদ......৩১২
উম্মে উমারার স্পৃহা......৩১২
কয়েকটি গভীর ক্ষত......৩১৪
রাজি ট্রাজেডি......৩১৪
ইসলামের মহোত্তম চরিত্রের একটি উপমা......৩১৬
রাসুলুল্লাহর প্রতি সাহাবিদের মহব্বতের বিস্ময়কর ঘটনা......৩১৭
বি'রে মাউনার মর্মান্তিক ঘটনা......৩১৭
পূর্বাঞ্চলের অভিযান : জিহাদের বিস্তৃত পরিধি......৩২১
গাজওয়ায়ে বনু লাহয়ান......৩২১
হজরত আবু বকরের মক্কার পার্শ্ববর্তী এলাকায় অভিযান পরিচালনা......৩২২
নজদ ও বাতনে উরানায় অতর্কিত আক্রমণ......৩২২
অভিযানগুলোর প্রতিক্রিয়া......৩২২
জিহাদের মাঝেই ইসলামের দাওয়াত......৩২৩
ইহুদিদের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় অভিযান গাজওয়ায়ে বনু নাজির......৩২৪
গাজওয়ায়ে বদরুল মাওইদ (যুলকাদা ৪ হিজরি)......৩২৪
ইহুদি আবু রাফের হত্যা (যিলহজ ৪ হিজরি)......৩২৫
উত্তরাঞ্চলের অভিযান......৩২৬
গাজওয়ায়ে দুমাতুল জানদাল......৩২৬
গাজওয়ায়ে বনু মুসতালিক এবং ইফকের ঘটনা......৩২৮

মুনাফিকদের ভ্রষ্টাচার ৩২৯
ইফকের ঘটনা ৩৩১
গাজওয়ায়ে খন্দক ৩৩৫
পরিখার নকশা এবং খননকার্য ৩৩৬
নৈশ-আক্রমণ প্রতিরোধের ব্যবস্থাপনা ৩৩৯
সাহাবায়ে কেরামের রণোদ্দীপক ও প্রশংসামূলক কবিতা আবৃত্তি ৩৩৯
পূর্ব-প্রাচ্য বিজয়ের ভবিষ্যদ্বাণী ৩৪০
এক সাহাবির ঘরে দাওয়াত ও নবীজির মুজেযা ৩৪১
জোটবাহিনীর আগমন এবং মদিনা অবরোধ ৩৪১
বনু কুরাইজার চক্রান্ত ৩৪২
হজরত সাফিয়া এবং যুবাইর বিন আওয়ামের সাহসিকতা ৩৪৪
নাওফাল বিন আবদুল্লাহর মৃত্যু ৩৪৫
কুরাইশের সামনে অবনত হতে আনসারদের অস্বীকৃতি ৩৪৫
সাদ বিন মুআজের জখম ৩৪৬
আমর বিন আবদে ওয়াদ্দের হত্যা ৩৪৭
জোটে ভাঙ্গন ৩৪৮
ঝড়ের মৌসুম এবং জোটবাহিনীর ব্যর্থ প্রত্যাবর্তন ৩৫১
গাজওয়ায়ে বনু কুরাইজা ৩৫২
খন্দক পরবর্তী কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ৩৫৭
১. নবীজি সা. এর সঙ্গে যায়নাব বিনতে জাহশের বিবাহ ৩৫৭
২. নবীজি সা. এর সঙ্গে উম্মে হাবিবার বিবাহ ৩৫৯
৩. সারিয়া আবু উবাইদা রাদিয়াল্লাহু আনহু (সাইফুল বাহর) ৩৫৯
৪. মক্কার তিনজন নিপীড়িত মুসলমানের মুক্তি ৩৬০
৫. সারিয়া উকাশা বিন মিহসান ও সারিয়া মুহাম্মদ বিন মাসলামা রা. ৩৬২
৬. সারিয়া যায়েদ বিন হারিসা রা. এবং আবুল আস বিন রাবির ইসলাম গ্রহণ ৩৬৩
৭. সারিয়া যায়েদ বিন হারিসা রা. এবং উম্মে কিরফার হত্যা ৩৬৪
৮. মুরতাদদের শাস্তি (৬ষ্ঠ হিজরি) ৩৬৫
হুদাইবিয়াসন্ধি ৩৬৬
কুরাইশের সঙ্গে আলোচনা ৩৬৬
বাইয়াতে রিদওয়ান ৩৬৭
কুরাইশের সন্ধির আকাঙ্ক্ষা ৩৬৯
সন্ধির শর্তাবলি ও তার বিশ্লেষণ ৩৬৯

চুক্তি লিপিবদ্ধ করতে কুরাইশের আপত্তি এবং নবীজির অন্তহীন উদারতা ৩৭২
সহনশীলতা এবং আনুগত্যের কঠিন পরীক্ষা ৩৭৪
আবু বাসিরের কর্মযজ্ঞ ৩৭৫
আবু বাসির-এর কর্মযজ্ঞ প্রসঙ্গে ড. আকরাম যিয়ার পর্যালোচনা ৩৭৬
সন্ধির প্রভাব ৩৭৮
খালিদ বিন ওয়ালিদ ও আমর বিন আস-এর ইসলামগ্রহণ ৩৭৮
অগ্রগামী যুদ্ধের সূচনা ৩৭৯
খাইবার : ইহুদি-ষড়যন্ত্রের আখড়া ৩৭৯
গাজওয়ায়ে খাইবারের পূর্বপ্রস্তুতি : ইয়াসির বিন রিযামের হত্যা ৩৮০
গাজওয়ায়ে যি-কারাদ এবং এক কমবয়সি সাহাবির দুঃসাহসিক ঘটনা ৩৮০
গাজওয়ায়ে খাইবার ৩৮৪
কামুস দুর্গ বিজয় এবং মারহাবের হত্যা ৩৮৫
হজরত আলির হাতে মারহাবের মৃত্যু ৩৮৬
যুবাইর বিন আওয়ামের হাতে ইহুদি ইয়াসিরের হত্যা ৩৮৬
খাইবারের অন্যান্য দুর্গ বিজয় ৩৮৭
সাফিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহার বিয়ে ৩৮৯
ফাদাক এবং ওয়াদিল কুরা বিজয় ৩৮৯
ইহুদিদের আরেকটি ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র ৩৯০
ইহুদিদের সঙ্গে চাষাবাদ-চুক্তি ৩৯১
হাবশার মুহাজিরদের প্রত্যাবর্তন ৩৯১
হজরত আবু হুরাইরার আগমন ৩৯২
হুদাইবিয়ার সন্ধি এবং খাইবারযুদ্ধের পর মদিনার হুকুমতের অবস্থান ৩৯৩
গাজওয়ায়ে যাতুর রিকা ৩৯৪
সালাতুল খাওফ ৩৯৫
আসহামা নাজাশির মৃত্যু ৩৯৫
সুমামার গ্রেফতারি এবং মক্কার খাদ্য রফতানিপথ বয়কট ৩৯৬
শত্রুতা সত্ত্বেও মক্কাবাসীর উপর নবীজির অনুকম্পা ৩৯৮
রাষ্ট্রপ্রধানদের ইসলামের দাওয়াত ৩৯৯
বাদশাহদের নিকট পত্র প্রেরণের তত্ত্ব ৩৯৯
হিরাকলকে ইসলামের দাওয়াত ৪০১
হিরাকল ও আবু সুফিয়ানের কথোপকথন ৪০১
হিরাকলের কাছে নবীজির পত্র এবং তার সম্প্রদায়ের সঙ্গে আলাপ ৪০৫
হিরাকলের জবাবিপত্র এবং উপহারসামগ্রী ৪০৬

রোমানদের কাছে নবীজির পত্র সংরক্ষণ........৪০৭
হারিস বিন আবু শিমরের নিকট নবীজির পত্র........৪০৭
মিশর অধিপতি মুকাওকিসের নামে পত্র........৪০৭
কিসরা পারভেজের নামে পত্র........৪০৯
নাজাশির নামে পত্র........৪১১
আরবের বিভিন্ন শাসকের নামে পত্র........৪১২
উমরাতুল কাযা........৪১৩
মাইমুনা বিনতে হারিস রা. এর সঙ্গে বিবাহ........৪১৫
যায়নাব রা. এর ইনতেকাল........৪১৬
মুতাযুদ্ধ........৪১৭
যাতুস সালাসিল যুদ্ধ........৪২২
কুরাইশের সঙ্গে চুক্তিভঙ্গ হওয়া........৪২৩
মক্কা বিজয়........৪২৫
মক্কায় অতর্কিত আক্রমণ........৪২৬
হজরত আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুর সঙ্গে সাক্ষাৎ........৪২৮
আবু সুফিয়ান বিন হারিসের ইসলামগ্রহণ........৪২৮
আবু সুফিয়ান বিন হারবের ইসলামগ্রহণ........৪২৯
মুসলিম-বাহিনীর দর্শনলাভ........৪৩০
বিজয়ীবেশে মক্কায় প্রবেশ........৪৩১
হত্যা করতে এসে জানবাজে পরিণত........৪৩৩
জীবন-মরণ একসাথেই........৪৩৪
গাজওয়ায়ে হুনাইন........৪৩৬
তায়েফ অবরোধ........৪৩৮
দুধবোন শায়মা রাদিয়াল্লাহু আনহার সঙ্গে সাক্ষাৎ........৪৪০
হালিমা রা. এর সঙ্গে সাক্ষাৎ এবং তার প্রতি সম্মানপ্রদর্শন........৪৪০
বনু হাওয়াজিনের বন্দিদের মুক্তি........৪৪১
গাজওয়ায়ে হুনাইনের গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা........৪৪২
আবু মাহযুরার ইসলামগ্রহণ........৪৪২
মক্কা থেকে মদিনায় প্রত্যাবর্তন........৪৪২
আত্তাব বিন উসাইদের নেতৃত্বে হজ পালন........৪৪৩
গাজওয়ায়ে তাবুক........৪৪৪
মুসলিম-বাহিনীর তাবুকের পথে যাত্রা........৪৪৭
কওমে সামুদের ধ্বংসাবশেষ অতিক্রম করার সময় নবীজির ভয়........৪৪৮

তাবুকে অবস্থান এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চল দখল......৪৪৯
শরিয়ত কর্তৃক জিজিয়ার অনুমোদন......৪৫০
উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর প্রত্যাবর্তনের পরামর্শ......৪৫০
কায়সারের দূতকে ইসলামের দাওয়াত......৪৫১
গাজওয়ায়ে তাবুক থেকে প্রত্যাবর্তন এবং মসজিদে জিরার ধ্বংস করা......৪৫১
মদিনায় আগমন এবং উম্মে কুলসুম রা. এর মৃত্যু......৪৫২
নিষ্ঠাবান তিন সাহাবির পরীক্ষা : হজরত আবু লুবাবার তাওবা......৪৫৩
কাব বিন মালিক এবং তার সঙ্গীদের তাওবা......৪৫৪
বিভিন্ন প্রতিনিধিদলের আগমন......৪৫৭
তায়েফের প্রতিনিধিদল......৪৫৭
বনু তামিম প্রতিনিধিদল......৪৫৮
আদি বিন হাতেম রাদিয়াল্লাহু আনহুর ইসলাম গ্রহণ......৪৫৯
আবদুল্লাহ বিন উবাইয়ের মৃত্যু......৪৬১
ইসলামের দিকে দলে দলে মানুষের আগমন......৪৬২
হজ ফরজ হওয়া এবং সর্বপ্রথম হজ......৪৬৩
নাজরানের পাদরিদের সাথে বিতর্ক......৪৬৮
জাকাত উসুলকারী নিযুক্তীকরণ......৪৬৯
অন্যান্য প্রতিনিধিদলের আগমন......৪৬৯
কতিপয় দুর্ভাগা লোক......৪৬৯
বিদায় হজ......৪৭২
গাদিরে খুম-এর ভাষণ......৪৭৭
আখেরাতের সফর......৪৮০
রোমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধাভিযান ও তার প্রস্তুতি......৪৮১
হজরত উসামা বিন যায়েদ রাদিয়াল্লাহু আনহুর নেতৃত্ব......৪৮২
মরণব্যাধির সূচনা......৪৮৩
উসামা-বাহিনীর যুদ্ধযাত্রা......৪৮৩
হজরত আয়েশার কামরায় আখেরি অবস্থান......৪৮৪
উম্মতের উপর গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব অর্পণ......৪৮৫
সর্বশেষ ইমামতি......৪৮৫
হজরত আবু বকরকে ইমামতির নির্দেশ ও নায়েব বানানোর ইঙ্গিত......৪৮৬
রাসুলুল্লাহ কী অসিয়ত লিখতে চেয়েছিলেন?......৪৮৮
হজরত আলিকে সম্বোধন করে অসিয়ত......৪৯০
মসজিদে নববিতে শেষবারের মতো গমন......৪৯১

উম্মতের প্রতি সর্বশেষ ভাষণ......৪৯২
হজরত আবু বকর সিদ্দিকের অনুগ্রহ......৪৯২
উসামা বিন যায়েদের আমির হওয়াই চূড়ান্ত......৪৯২
কবরকে সেজদাস্থল বানানোর নিষেধাজ্ঞা......৪৯৩
আনসারি সাহাবিদের সাথে উত্তম আচরণ প্রদর্শনের তাগিদ......৪৯৩
হজরত উসামা বিন যায়েদের জন্য নীরব দোয়া......৪৯৪
দুনিয়ার উপকরণ থেকে সম্পর্কহীনতা......৪৯৪
জীবনের শেষদিন- অফাতকাল......৪৯৬
আখেরি অসিয়ত : নামাজের প্রতি গুরুত্বারোপ এবং দুর্বলদের উপর সদয়তা...৪৯৯
রাসুলুল্লাহর বিয়োগব্যথায় সাহাবায়ে কেরামের অস্থিরতা......৫০১
আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর ঐতিহাসিক ভাষণ......৫০২
মুসলিম উম্মাহর নেতৃত্ব দেওয়ার প্রশ্ন......৫০৪
সোমবার বিকেল : সাকিফায়ে বনু সায়িদায় কী হয়েছিল?......৫০৫
আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাতে বাইয়াত সম্পন্ন......৫১১
আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু বাইয়াত নিলেন কেন?......৫১১
নবীজির কাফন-দাফন......৫১২
নায়েবে রাসুলের হাতে দস্তুরমতো বাইয়াত......৫১৩
বাইয়াতের ক্ষেত্রে হজরত আলি ও হজরত যুবাইরের বিলম্ব ও তার কারণ......৫১৪
বাইয়াতের পর আবু বকর রা. এর প্রথম ভাষণ......৫১৯
চিরদিনের জন্য চোখের আড়াল হয়ে গেল রিসালাত-প্রদীপ......৫২১
জানাজা ও দাফন কাজে বিলম্ব কেন?......৫২২
কাফন-দাফনের পূর্বেই খেলাফতের সমস্যা-সমাধান কেন আবশ্যক ছিল?......৫২৩
সাহাবায়ে কেরামের বিরহ-বেদনা......৫২৪
শামায়েলে মুসতফা......৫২৭
নবীজির দৈহিক আকৃতির বিবরণ......৫২৯
নবীজির দৈহিক আকার-আকৃতি......৫২৯
উত্তম চরিত্রের বিবরণ......৫৩১
ব্যবস্থাপনাগত সৌন্দর্য......৫৩৩
তার মজলিসের সৌন্দর্য......৫৩৪
প্রফুল্লতা ও হাসিখুশি স্বভাব......৫৩৫
রুগ্ণ ব্যক্তির সেবা-শুশ্রূষা......৫৩৬
জিকির ও ইবাদত......৫৩৬

আল্লাহর জিকির ও খোদাভীতি..........৫৩৬
নবীজির ঘরোয়া জীবন..........৫৩৭
নবীজির কথাবার্তা..........৫৪০
শিশুদের প্রতি ভালোবাসা..........৫৪০
নবীজির চিত্তাকর্ষক হাস্যরস..........৫৪২
শ্রদ্ধানিবেদন... নবীজির তরে..........৫৪৬
সৃষ্টির শ্রেষ্ঠজনকে সালাম..........৫৪৭
নবী-জীবনের সালভিত্তিক নকশা..........৫৪৯
মক্কিযুগ (নবুওয়াতের পূর্বপর্যন্ত)..........৫৫০
মক্কি-যুগের পর নবুওয়াতপ্রাপ্তি..........৫৫৩
মাদানি-যুগ..........৫৫৯
হিজরি সালভিত্তিক কিছু গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা..........৫৭৬
হিজরি-১ (৬২২-৬২৩ খ্রিষ্টাব্দ)..........৫৭৬
হিজরি- ২ (৬২৩-৬২৪ খ্রিষ্টাব্দ)..........৫৭৬
হিজরি-৩ (৬২৪-৬২৫ খ্রিষ্টাব্দ)..........৫৭৭
হিজরি-৪ (৬২৫-৬২৬ খ্রিষ্টাব্দ)..........৫৭৭
হিজরি-৫ (৬২৬-৬২৭ খ্রিষ্টাব্দ)..........৫৭৭
হিজরি-৬ (৬২৭-৬২৮ খ্রিষ্টাব্দ)..........৫৭৮
হিজরি-৭ (৬২৮-৬২৯ খ্রিষ্টাব্দ)..........৫৭৮
হিজরি-৮ (৬২৯-৬৩০ খ্রিষ্টাব্দ)..........৫৭৯
হিজরি-৯ (৬৩০-৬৩১ খ্রিষ্টাব্দ)..........৫৭৯
হিজরি-১০ (৬৩১-৬৩২ খ্রিষ্টাব্দ)..........৫৮০
হিজরি-১১ (৬৩২-৬৩৩ খ্রিষ্টাব্দ)..........৫৮০
জ্ঞাতব্য..........৫৮১
সিরাতে মুসতফার পয়গাম..........৫৮২
ইসলাম কি বলপ্রয়োগের মাধ্যমে প্রসার লাভ করেছে?..........৫৮৫
প্রাণের ক্ষয়ক্ষতি কম; কিন্তু উপকারিতা অনেক..........৫৮৮
ইতিহাসের শিক্ষা..........৫৯০

পৃথিবীর সূচনা

দুনিয়া বড়ই বিস্ময়কর! বিস্ময়কর আমাদের জীবন, আমাদের রুহ-আত্মা, গোশত-চামড়ায় সুগঠিত আমাদের এই দেহ, যাতে অনুভব-অনুভূতি, কথা বলা ও নড়াচড়ার শক্তি আছে। আমরা প্রত্যেকেই নিজেদের দেহের অভ্যন্তরে জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত একটি হৃৎপিণ্ড বয়ে বেড়াই, যা সারাক্ষণ অবিরাম স্পন্দিত হয়। মানবদেহে হাজার মাইল দীর্ঘ পশমের মতো একটি সূক্ষ্ম শিরা রয়েছে, যা প্রতিটি কোষে নির্বিঘ্নে রক্ত সঞ্চালনে সহায়তা করে থাকে। আমরা আজ থেকে শতাব্দীকাল পূর্বে ছিলাম না এবং পরেও থাকব না। আমরা যেমন নশ্বর, তেমনি এই দুনিয়াও ক্ষণস্থায়ী। এমন ক্ষণস্থায়ী হওয়ার পরেও পৃথিবীকে কত নৈপুণ্য, পবিত্রতা ও শৃঙ্খলা দিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে! যতই অনুসন্ধান ও গবেষণা করা হয়, আকল-বুদ্ধি লোপ পেয়ে একপর্যায়ে আমাদের ভাবনার সীমানা গণ্ডিবদ্ধ হয়ে পড়ে। তবে শুরু থেকেই খুব জোর দিয়ে এই প্রশ্নের অবতারণা করা হচ্ছে যে, এই পৃথিবী কে সৃষ্টি করেছেন, তার উদ্দেশ্যই-বা কী? যারা এসব প্রশ্নের উত্তরে কুরআন-সুন্নাহর নির্দেশনার প্রয়োজন অনুভব করে না এবং অদৃশ্যের প্রতি ঈমান রাখে না, তারা সর্বদা দ্বিধা-সংশয়ে জর্জরিত থাকবে। কোনো রিসার্চ ও গবেষণাই তাদেরকে এই অন্ধত্ব থেকে মুক্তি দিতে পারবে না।

হ্যাঁ, যে ব্যক্তি স্রষ্টার অস্তিত্বে বিশ্বাস রাখে, রাসুলদের মর্যাদার প্রতি ঈমান রাখে এবং আসমানি শিক্ষার প্রয়োজন স্বীকার করে, তার কাছে এই প্রশ্নগুলো কখনো ধোঁয়াশাপূর্ণ হয়ে থাকবে না; দিবালোকের ন্যায় ভাস্বর হয়ে উঠবে। কারণ, প্রত্যেক নবী তার দাওয়াত শুরু করেন এসব প্রশ্নের উত্তর দিয়েই– এই দুনিয়া আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন, সমগ্র বিশ্বজাহান তারই সৃষ্টি, তিনি সর্বদা ছিলেন, সর্বদা থাকবেন, তাকে কেউ সৃষ্টি করেনি, তার কোনো সন্তান নেই, তিনি সবকিছু সম্পর্কে অবগত, সব জিনিস তার নিয়ন্ত্রণে, তিনি মানুষকে তার ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছেন, দুনিয়াকে তিনি পরীক্ষার স্থান বানিয়েছেন, দুনিয়ার পরীক্ষায় কৃতকার্য ব্যক্তিদের পুরস্কার হিসাবে তিনি জান্নাত তৈরি করেছেন আর অকৃতকার্যদের শাস্তি দেওয়ার জন্য জাহান্নাম সৃষ্টি করেছেন।

মূলত এটিই জীবন-মৃত্যুর নিগূঢ় তত্ত্ব, পূর্ববর্তী আসমানি কিতাবসমূহে তার বর্ণনা রয়েছে, সর্বশেষ আসমানি গ্রন্থ কুরআনুল কারিমেও আল্লাহ তায়ালা আরো স্পষ্টরূপে তা বর্ণনা করেছেন। যেহেতু ঐ বিষয়গুলো আকিদা-বিশ্বাসসংশ্লিষ্ট,

আর তা পূর্ণরূপে অবগত হওয়া ছাড়া দিশেহারা অন্তর প্রশান্তি লাভ করতে পারে না, তাই তিনি তার ঐশীবাণীতে এইসব বিষয়ে বিস্তারিত বলেছেন।

কিছু কিছু প্রশ্ন তৈরি হয় মানুষের জানার কৌতূহল এবং সচেতনতার কারণে। স্বাভাবিকভাবেই মানুষ তার অনুসন্ধানী রুচি ও আগ্রহের কারণে জানতে চায় যে, তার পূর্বপুরুষ কারা ছিলেন, কেমন ছিলেন? তাদের আগে কারা ছিলেন? পৃথিবী সূচনা কবে থেকে? কোন কোন গোত্রের আগমন ঘটেছিল? তাদের সভ্যতা-সংস্কৃতি কীরূপ ছিল? কেমন ছিল তাদের জীবনযাপন পদ্ধতি?

এগুলো ইতিহাসবিষয়ক প্রশ্ন। কিছু প্রশ্নের উত্তর আল্লাহর প্রেরিত গ্রন্থাবলি এবং তার রাসুলগণের বক্তব্যে সংক্ষিপ্তভাবে পাওয়া যায়। অতীত নিয়ে চিন্তাভাবনা করা মানুষের জ্ঞান, দর্শন ও আমলের দীক্ষা ও প্রশিক্ষণের জন্য অত্যন্ত উপকারী। এজন্য ওহি এবং নবী-রাসুলদের বাণীতে অতীত সংশ্লিষ্ট বহু নিগূঢ় তত্ত্ব ও তথ্য পাওয়া যায়। তবে ওহি ও রিসালাতের উদ্দেশ্য পূর্ববর্তী লোকদের অবস্থা বর্ণনা করা নয়; বরং মানুষকে পথ দেখানো। তাই অতীত সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য এমন শাস্ত্রের শরণাপন্ন হওয়া আবশ্যক, যেখানে অতীতের প্রতিটি যুগের গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়গুলো সম্পর্কে বিস্তারিত অবহিত হতে পারি। একেই বলে ইতিহাসশাস্ত্র।

ইতিহাসবিদদের মতে- 'ইতিহাস এমন শাস্ত্র, যাতে পূর্ববর্তী গোত্র, রাষ্ট্র, রাজা-বাদশাহ ও বড় বড় ব্যক্তিত্বের অবস্থা সময়ের ক্রমধারা অনুযায়ী সুবিন্যস্তভাবে সংকলন করা হয়।'

পৃথিবী কখন সৃষ্টি করা হয়

পৃথিবী কখন সৃষ্টি করা হয় এবং মানবজাতির ক্রমবিকাশ কবে থেকে শুরু হয়জ্জশুরু থেকেই এই নিয়ে মতানৈক্য চলে আসছে। বর্তমান ভূ-বিজ্ঞানীরা বলেন, ভূমির বয়স কোটি বছর এবং মানবজাতি লক্ষ বছর ধরে পৃথিবীতে বসবাস করছে। তবে তাদের এই মত যুক্তিনির্ভর; তার কোনো ঐতিহাসিক ভিত্তি নেই। ভারত উপমহাদেশের খ্যাতিমান ঐতিহাসিক মাওলানা হিফজুর রহমান সিওহারবি রহ. পৃথিবীর সূচনালগ্ন নিয়ে বিজ্ঞানীদের মতানৈক্য উল্লেখ করার পর এই মতটি তিনি প্রাধান্য দেন যে, পৃথিবীতে সৃষ্টির সূচনা হয় ছ' হাজার বছর পূর্বে। পাশাপাশি তিনি লেখেন যে, তবে এ বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তমূলক কিছু বলা মুশকিল। কারণ আমাদের ইলমের উপকরণ খুবই স্বল্প এবং এমন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সর্বশেষ সিদ্ধান্ত ব্যক্ত করার ক্ষেত্রেও অপ্রতুল। তা ছাড়া প্রাচীন নিদর্শনাবলির সাহায্যেও নিশ্চিতভাবে কোনো ফয়সালা দেওয়া সম্ভব নয়। সর্বোপরি এ ব্যাপারে সবাই একমত যে, পৃথিবীর জনগোষ্ঠীর মাঝে

চীনা, ভারতীয় এবং মিসরীয়রা সবচেয়ে প্রাচীন জাতি। পশ্চিমা ঐতিহাসিকদের দাবি হলো, ভূ-পৃষ্ঠে এইসব গোত্রের বসবাস ৬ হাজার থেকে দশ হাজার বছরের মধ্যবর্তী সময়কাল হবে। আর এটা সর্বজনস্বীকৃত যে, পৃথিবীর কোনো জনগোষ্ঠীর কোনোরূপ অস্তিত্ব দশ হাজার বছরেরও আগে পাওয়া যায় না।[১]

হাফেজ ইবনে আসাকির রহ. এ প্রসঙ্গে বিভিন্ন বক্তব্য উল্লেখ করেছেন। তিনি মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক-এর বরাতে উল্লেখ করেন যে, হজরত আদম আলাইহিস সালাম থেকে হজরত নুহ আলাইহিস সালাম পর্যন্ত ১২০০ বছর, হজরত নুহ আলাইহিস সালাম থেকে হজরত ইবরাহিম আলাইহিস সালাম পর্যন্ত ১০৪২ বছর, হজরত ইবরাহিম আলাইহিস সালাম থেকে হজরত মুসা আলাইহিস সালাম পর্যন্ত ৫৬৫ বছর, হজরত মুসা আলাইহিস সালাম থেকে হজরত দাউদ আলাইহিস সালাম পর্যন্ত ৫৭২ বছর, হজরত দাউদ আলাইহিস সালাম থেকে হজরত ঈসা আলাইহিস সালাম পর্যন্ত ১৩৫৬ বছর, হজরত ঈসা আলাইহিস সালাম থেকে হজরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত ৬০০ বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। সে হিসেবে হজরত আদম আলাইহিস সালামের ইনতেকালের পর থেকে হজরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত ৫০২০ বছর হয়। আর দুনিয়াতে হজরত আদম আলাইহিস সালামের জীবনকাল ৯৬০ বছরও যদি হিসেব করা হয়, তা হলে দুনিয়ার বয়সকাল আদম আলাইহিস সালামের আগমনকাল থেকে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্মগ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত ৬২৯৫ বছর।[২]

হজরত আদম আলাইহিস সালাম

হজরত আদম আলাইহিস সালামকে আল্লাহ তায়ালা মাটি দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। এটিই প্রথম মানব সৃষ্টি। তার সৃষ্টিতে মহান স্রষ্টা এমন অভিনব শৈল্পিক নৈপুণ্য প্রদর্শন করেছেন, যা অন্যকোনো সৃষ্টির ক্ষেত্রে করেননি। মানব সৃষ্টির সূচনালগ্ন থেকেই তার মধ্যে অনুভব-অনুভূতি, বোধশক্তি, আবেগের বহিঃপ্রকাশ, সমস্যার উপলব্ধি এবং উপকরণের সঠিক ব্যবহারের যোগ্যতা সকল সৃষ্টি থেকে অধিক পরিমাণে বিদ্যমান।

পৃথিবীর ভাঙা-গড়ার ক্ষেত্রে উপর্যুক্ত বৈশিষ্ট্যগুলো কীরূপ প্রভাব রেখেছে, তা তো দৃশ্যমান। আল্লাহ তায়ালা মানুষকে ফেরেশতাদের মতো তার ইবাদত করতে বাধ্য করেননি। জিনদের মতো মন্দের প্রতি একেবারে ধাবিতও করেননি। বরং ভালো-মন্দ উভয় কাজের শক্তিই তাকে দিয়েছেন।

---

১. নুরুল বাশার ফি সিরাতি খাইরিল বাশার গ্রন্থের ভূমিকা, পৃষ্ঠা ১৮

২. তারিখে দিমাশক, ইবনে আসাকির, ১/৩১ (দারুল ফিকর, বৈরুত সংস্করণ)

ফেরেশতারা মানুষের ভবিষ্যৎ কর্মকাণ্ডেরও পর্যালোচনা করে ফেলে। কারণ ইতিপূর্বে জিনজাতি জমিনে কী ধরনের অনর্থ ও ফ্যাসাদ সৃষ্টি করেছিল, তা ফেরেশতাদের স্মরণে ছিল। ফলে তারা আল্লাহ তায়ালার নিকট বিনীত আবেদন করে যে, হে আল্লাহ, আপনার গুণকীর্তন করার জন্য তো আমরা সদা তৎপর আছি। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন,

إِنِّيْ أَعْلَمُ مَالاَ تَعْلَمُوْنَ

আমি যা জানি তোমরা তা জানো না।[৩]

মানুষকে ভালো-মন্দ উভয় কর্মের সামর্থ্য দেওয়া হয়েছে। কারণ আল্লাহ তায়ালা দুনিয়াকে পরীক্ষার ক্ষেত্র রূপে প্রস্তুত করেছেন। আল্লাহ তায়ালা বান্দাকে পরীক্ষা করতে চান। তার মধ্যে ভালো-মন্দ উভয় কর্মের শক্তি থাকা সত্ত্বেও যদি সে প্রভুর ভয়ে মন্দ থেকে বিরত থাকে এবং নেক আমল করে, তা হলে সে সফল। অপরদিকে সে যদি আল্লাহকে ভুলে গিয়ে মন্দের ক্ষমতা অধিক পরিমাণে কাজে লাগায়, নেক আমলের সামর্থ্য থেকে বিমুখ হয়ে যায়, তা হলে সে দুর্ভাগা, কপাল পোড়া; এই নিগূঢ় রহস্য ফেরেশতারা ধরতে পারেননি।

হজরত আদম আলাইহিস সালামকে সৃষ্টি করার পর আল্লাহ তায়ালা তাকে সম্মাননা-সেজদা করার জন্য ফেরেশতাদের নির্দেশ দেন, যেন সমগ্র জগতের উপর মানবজাতির শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয়। আদম আলাইহিস সালামের সঙ্গদানের জন্য মানবজাতির কোমলশ্রেণি নারীজাতি সৃষ্টির সূচনা হয় হজরত হাওয়া আলাইহাস সালামের সৃষ্টির মাধ্যমে। উভয়কে মেহমানদারির জন্য জান্নাতে পাঠানো হয়। দুনিয়ার প্রথম নারী-পুরুষ খুব স্বল্প সময়ই জান্নাতে অবস্থান করেছেন।

কিন্তু তারা ঐ সংক্ষিপ্ত জীবনে এমন আরাম-আয়েশ, সুকুন ও প্রশান্তি লাভ করে যে, পরবর্তী প্রতিটি মানুষ নিজের ভেতরে জান্নাতের সেই আয়েশ-আকাঙ্ক্ষা লালন করতে থাকে। জান্নাতে খুশি আর খুশি। সেখানে নেই কোনো দুঃখ-দুর্দশা, নেই কষ্ট-ক্লেশের নামনিশানা। সেখানে সকল চাহিদা পূরণ হবে, সকল নেয়ামত সহজলভ্য হবে।

ঈমানদাররা রাসুলগণের মাধ্যমে অবগত হয়েছেন যে, তাদের আসল বাড়ি জান্নাত। সেজন্য অধিক পরিমাণে নেক আমল করতে হবে, যেন নিজ বাড়িতে পৌঁছতে পারে। যারা আল্লাহ ও তার রাসুলের উপর ঈমান আনেনি, তারা যদিও জান্নাতকে কাল্পনিক বলে তার অস্তিত্ব অস্বীকার করে; কিন্তু তাদের মধ্যে সেই জান্নাতি ফিতরাত ও স্বভাবের কারণে ঠিকই স্বাধীন জীবনযাপন করে থাকে।

---

৩. সুরা বাকারা, আয়াত ৩০

দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী উপকরণ নিয়ে দৌড়ঝাঁপে তারা মশগুল। তারা জান্নাতি স্বাদ দুনিয়াতেই নিয়ে নেয়। ভোগ-বিলাসের প্রতি এমন আকর্ষণের কারণেই পৃথিবী ফেতনা-ফ্যাসাদের কেন্দ্রস্থলে পরিণত হয়েছে।

আদম আলাইহিস সালামের সৃষ্টি থেকে আজ পর্যন্ত মানুষের গোমরাহি ও ভ্রষ্টতার ক্ষেত্রে শয়তানের বড় ভূমিকা রয়েছে। শয়তানদের সরদার ইবলিস হলো জিনের বংশধর। ইবলিস হজরত আদম আলাইহিস সালামের সৃষ্টির বহু আগে ফেরেশতাদের সহচর এবং আল্লাহ তায়ালার নৈকট্যশীল বান্দা ছিল। কিন্তু হজরত আদম আলাইহিস সালামের মর্যাদা তার থেকে অধিক হতে দেখে সে হিংসার আগুনে জ্বলতে থাকে। নিজেকে সে আদম আলাইহিস সালাম থেকে উত্তম মনে করে। কারণ সে আগুনের তৈরি আর আদম আলাইহিস সালাম মাটির। তাই সে হজরত আদম আলাইহিস সালামকে সেজদা করতে অস্বীকার করে। এই অপরাধে ইবলিসকে আল্লাহ তায়ালা তার দরবার থেকে তাড়িয়ে দেন।

শয়তান অবাধ্য ও জেদি হওয়ার দরুন আল্লাহর কাছে ক্ষমা না চেয়ে কেয়ামত পর্যন্ত সুযোগ চায় হজরত আদম ও তার বংশধরকে পথভ্রষ্ট করতে পারার। আল্লাহ তায়ালা তাকে অনুমতি দেন এবং সবধরনের সামর্থ্য তাকে প্রদান করেন। আদম আলাইহিস সালাম ও তার বংশধর ভয়াবহ পরীক্ষার সম্মুখীন। শয়তানের ছল-চাতুরী থেকে বাঁচতে পারলে এবং মহান স্রষ্টা ও মালিকের শরণাপন্ন হতে পারলে, তখনই সে হবে প্রকৃত সফল ও কৃতকার্য।

হজরত আদম আলাইহিস সালামের প্রতি শয়তানের শত্রুতা ও দুশমনি ষোলোকলায় পূর্ণ হয়। এবার সে স্বয়ং হজরত আদমকেও আল্লাহর কাছে অপরাধী বানাবার চেষ্টা করতে থাকে।

আল্লাহ তায়ালা শয়তানকে এমন যোগ্যতা প্রদান করেন যে, সে অপরের কল্পনা ও মস্তিষ্কের ভেতরে ঢুকে তার সবকিছু অবগত হতে পারে। সে তার এই যোগ্যতা ব্যবহার করে হজরত হাওয়া আলাইহাস সালাম এবং আদম আলাইহিস সালামকে এমন একটি গাছের ফল খাওয়ার জন্য ফুসলাতে থাকে, যার ফল খাওয়া হজরত আদমের জন্য নিষিদ্ধ ছিল।

যখনই হজরত আদম ও হাওয়া আলাইহিমাস সালাম ফল খেলেন, সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে জান্নাত থেকে বের হয়ে যাওয়ার নির্দেশ আসে। তাদের জান্নাতি পোশাক খুলে নেওয়া হয়। ফলে তারা জান্নাতি গাছের পাতা দিয়ে নিজেদের লজ্জাস্থান আবৃত করতে থাকেন। খুব দ্রুত তাদেরকে পৃথিবীতে অবতরণ করানো হয়। এখানেই মানুষ ও শয়তানের মাঝে পার্থক্য সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে।

হজরত আদম ও হাওয়া আলাইহিমাস সালাম নিজেদের অপরাধের জন্য আল্লাহর কাছে রোনাজারি করতে থাকেন; অথচ শয়তান তার অবাধ্যতা ও হঠকারিতায় অবিচল ছিল।

আল্লাহ তায়ালা হজরত আদম ও হাওয়া আলাইহিমাস সালামের তাওবা কবুল করেন এবং সতর্ক করেন যে, শয়তান তোমাদের বংশধরদের প্রকাশ্য শত্রু। অতএব, তার ব্যাপারে সাবধান থাকবে। তিনি এ-ও বলে দেন যে, মানবজাতির হেদায়েত এবং শয়তানের গোমরাহি থেকে বাঁচার জন্য আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে পথনির্দেশের ধারা জারি থাকবে। যে ব্যক্তি ঐ নির্দেশনা অনুসরণ করবে, সে আখেরাতে শান্তিতে নিঃশঙ্ক থাকবে। আর যে তা এড়িয়ে যাবে, সে কঠিন শাস্তির উপযুক্ত হবে। যেহেতু হজরত আদম আলাইহিস সালামের সৃষ্টি এবং দুনিয়াতে তার আগমনের ঘটনায় মানুষের প্রকৃত ঠিকানা এবং লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের বিষয় নিহিত রয়েছে, তাই কুরআন-হাদিসে এই ঘটনাগুলো সুস্পষ্টরূপে বর্ণনা করা হয়েছে।[৪]

বুঝা গেল দুনিয়াতে মানুষকে আল্লাহ তায়ালার পাঠানোর পেছনে কারণ হলো, মানুষ তার পরিচয় লাভ করবে, আল্লাহ তায়ালাকে এক মানবে, তার দুয়ারে মাথানত করবে, শরিয়তের বিধান পালন করবে, শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে বেঁচে থাকবে ইত্যাদি। এসবই ছিল হজরত আদম আলাইহিস সালামকে সৃষ্টি, তাকে দুনিয়াতে প্রেরণ এবং তার বংশ-বিস্তারের প্রধান রহস্য।

হজরত আদম আলাইহিস সালামের ইনতেকালের পূর্বে তার সন্তানসন্ততির সংখ্যা ৪০ হাজারে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল।[৫]

এখানে আমাদের ভালো করে বুঝে নেওয়া জরুরি যে, আদম আলাইহিস সালামের সৃষ্টির ঘটনা কুরআন মাজিদ ও হাদিস শরিফে বর্ণিত (তাওরাত ও ইনজিলের বর্তমান বিকৃত অবস্থাতেও যার সমর্থন পাওয়া যায়) হয়েছে এই বাস্তবতা তুলে ধরার জন্য যে, সমগ্র মানবজাতি আদম আলাইহিস সালামের বংশধর। সবার পিতা একজন। মানুষ হিসেবে সকলেই ভাই ভাই।

এ থেকে আরেকটি বিষয় উঠে আসে যে, ডারউইনের বিবর্তনবাদ এবং বানর থেকে মানবজাতির সৃষ্টির দাবি আসমানি কিতাব ও ইতিহাসের সাথে সাংঘর্ষিক এবং একদম যুক্তিপরিপন্থি। বিবর্তনবাদের দর্শন অনুযায়ী যদি আদি যুগ থেকে আসতে আসতে এক সময় বানর মানুষে পরিণত হয়ে গিয়ে থাকে, তা হলে বর্তমান বানরগুলো কেন বানরই রয়ে গেল? এখন পর্যন্ত কেন মানুষে

---

৪. দেখুন সুরা বাকারা, আয়াত ৩০-৩৯; সুরা আরাফ, আয়াত ১১-২৫; সুরা হিজর, আয়াত ২৬-৪২

৫. আলমুখতাসার ফি আখবারিল বাশার, আবুল ফিদা, ১-৯ (হুসাইনিয়্যাহ মিসরিয়্যাহ সংস্করণ)

রূপান্তরিত হল না? বিড়াল কেন সিংহে পরিণত হল না? গাধা কেন আজও ঘোড়ায় পরিণত হলো না?

হজরত আদম আলাইহিস সালাম দুনিয়ায় অবতরণ করলেন। এখানে জান্নাতের মতো নেয়ামত ও সুখ-শান্তি ছিল না। তারপরও মানুষের প্রয়োজন পূরণ করার মতো উপকরণ যথেষ্ট পরিমাণ ছিল। খাওয়াদাওয়া, সতর ঢাকা, বাসস্থানের ব্যবস্থা সহজলভ্য ছিল। মহান স্রষ্টা মানুষকে এসব উপকরণের ব্যবহারবিধি আগেই শিখিয়ে দিয়েছিলেন। হজরত জিবরাইল আলাইহিস সালাম গমের দানা নিয়ে আসেন। আদম আলাইহিস সালাম তা জমিনে চাষ করে ফসল উৎপন্ন করেন। আর সেই গম পিষে আটা বানিয়ে রুটি তৈরি করেন।[৬]

জান্নাত থেকে বের হওয়ার সময় হজরত আদম ও হাওয়া আলাইহিমাস সালাম গাছের পাতা দিয়ে নিজেদের লজ্জাস্থান ঢেকেছিলেন। দুনিয়াতেও তা ভিন্ন একটি ব্যবস্থার রূপ নিয়েছে, তা হলো দুম্বার পশম দিয়ে কাপড় তৈরি করা। দুম্বার পশম দিয়ে হজরত আদম আলাইহিস সালামের জুব্বা এবং হাওয়া আলাইহাস সালামের কামিজ ও ওড়না বানানো হয়।[৭]

হজরত আদম ও হাওয়ার সন্তান জন্ম নিলো। তাদের মাঝে বিয়ের রীতি চালু হলো। আর এভাবেই আদম আলাইহিস সালামের সন্তানদের বংশ-বিস্তার হতে থাকল।[৮]

বর্তমান বিশ্বের পশ্চিমা গবেষকরা, যারা মানুষের সভ্যতা-সংস্কৃতির বয়সকাল লাখো বছর বলে থাকে এবং দাবি করে যে, পৃথিবীর শুরুতে মানুষ বিবস্ত্র ছিল, কাঁচা গোশত চিবাত, বিবাহের কোনো ধারণাই ছিল না তাদের, পুরুষরা কোনো নিয়ম-নীতির তোয়াক্কা না করেই নিজেদের যৌনচাহিদা মেটাত, মানুষ হাজার বছর পর রান্নাবান্না, কাপড় পরার পদ্ধতি আয়ত্ত করতে পেরেছে এবং বিয়েশাদিতে অভ্যস্ত হয়েছে; এইসব দাবি সম্পূর্ণ অনুমাননির্ভর; ইতিহাস যাকে প্রত্যাখ্যান করে।

দুনিয়াতে আসার কয়েকশ বছর পর আদম আলাইহিস সালামের সন্তানেরা স্রষ্টার মৌলিক সবক ও শিক্ষা ভুলে যায়, ভ্রান্ত বিশ্বাসের অনুগামী হতে থাকে। তখন আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে সঠিক পথে ফিরিয়ে আনার জন্য নবী-রাসুল পাঠানোর ধারা জারি করেন।

---

৬. তারিখুত তাবারি- ১/৯০; হজরত ইবনে আব্বাসের সূত্রে); আলমুনতাযাম- ১/২১১, ২১২

৭. আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া- ১/১০৩

৮. আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া- ১/১০৪

হজরত নুহ আলাইহিস সালাম

আল্লাহবিমুখ মানুষদের তাওহিদের দাওয়াত দেওয়ার জন্য প্রথম নবী হিসেবে প্রেরিত হয়েছিলেন হজরত নুহ আলাইহিস সালাম। তিনি আদম আলাইহিস সালামের ইনতেকালের এক হাজার বছর পর প্রেরিত হন।[৯] এক হাজার বছর পর্যন্ত মানুষ তাদের পিতা হজরত আদম আলাইহিস সালামের দীন ও শরিয়তের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। কিন্তু শয়তানের প্ররোচনায় তাদের কিছু মৃত বুজুর্গের প্রতিকৃতি বানিয়ে ভক্তি দেখানো শুরু করে।

এমন কয়েকজন বুজুর্গের নাম হলো ওয়াদ্দ, সুয়া, ইয়াগুস, ইয়াউক এবং নাসর। লোকেরা অন্ধভক্তি ও বিশ্বাসের দরুন এই বুজুর্গদের কাছে প্রয়োজন পূরণ করে দেওয়ার এবং সমস্যা সমাধান করার যোগ্য মনে করতে থাকে। তাদের প্রতিকৃতির উপাসনা করতে থাকে। এখান থেকেই বান্দা ও তার রবের সাথে সম্পর্ক ছিন্নতার সূচনা। হজরত নুহ আলাইহিস সালাম বান্দা ও রবের মাঝে সেই সম্পর্ক জুড়ে দেওয়ার জন্য আসেন। আর এই উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে তিনি শত যাতনা সহ্য করেছেন। সাড়ে নয়শত বছর অনবরত দীনের দাওয়াত দেওয়ার পরেও যখন তার কওম গোমরাহি, অবাধ্যতা, হঠকারিতায় সীমা ছাড়িয়ে যায়, তখন আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে এমন মহাপ্লাবন আসে, যা সবকিছু ভাসিয়ে নিয়ে যায়। কেবল হজরত নুহ আলাইহিস সালাম এবং তার প্রতি ঈমান গ্রহণকারী মুসলমানদের আল্লাহ তায়ালা নৌকাতে চড়িয়ে রক্ষা করেন।[১০]

প্লাবন থেকে বেঁচে-যাওয়া মুমিন নারী-পুরুষ মিলিয়ে কেবল ৪০ জন ছিলেন। এদের মাধ্যমেই পুনরায় দুনিয়া আবাদ হয়। তাদের সন্তান সাম, হাম, ইয়াফেসের বংশধরেরাই পৃথিবীময় ছড়িয়ে পড়ে। সামের সন্তানাদি থেকে আরব, পারস্য, রোম (ইউরোপ) আবাদ হয়। ইয়াফেসের সন্তানদের থেকে তুর্কি (চীনা), ইয়াজুজ-মাজুজ জন্ম নেয়। ইয়াফেসের সন্তানদের থেকে জন্ম নেয় আফ্রিকান, হাবশি, সুদানি, কিবতি এবং বারবার জাতি।[১১]

হজরত নুহ আলাইহিস সালাম তার সন্তানদেরও হজরত আদম আলাইহিস সালাম থেকে প্রাপ্ত আকিদার উপরই রেখে যান। মানুষ তার আত্মার গভীর থেকে উৎসারিত প্রশ্নমালার উত্তরও সেই আকিদায় পেয়ে যেত। সৃষ্টিকুলের মধ্যে মানুষ তার অবস্থান খুঁজে পেত। মহাবিশ্ব কীভাবে সৃষ্টি হলো? কে সৃষ্টি করলেন? আমি কীভাবে সৃষ্টি হলাম এবং কেন সৃষ্টি হলাম? আমাকে কে সৃষ্টি করেছেন? এত বিশাল বিশ্বব্যবস্থা তৈরির পেছনে কী উদ্দেশ্য? মৃত্যুর পর কী

৯. আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া- ১/১১৩
১০. আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া- ১/১১৮, ১২৫
১১. আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া- ১/১২৯

হবে? ভালো-মন্দের প্রতিদান পাওয়া যাবে কি না? যদি প্রতিদান পাওয়া যায়, তা হলে কোথায় এবং কীভাবে? বিশুদ্ধ আকিদা জানার মাধ্যমে উপর্যুক্ত সব প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যেত। আর বিশুদ্ধ আকিদা-বিশ্বাস অন্তরে বদ্ধমূল করে মানবজাতি যখন এক আত্মায় পরিণত হয় তখন ভাষা, দেশ এবং অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ভিন্নতা পরস্পরের মধ্যে বিভেদের দেয়াল দাঁড় করাতে পারে না।

আদ ও সামুদ

কিন্তু হজরত নুহ আলাইহিস সালামের কয়েকশ বছর পর আবার মানুষ বিপথে চলতে থাকে। যেহেতু নবী প্রেরণের ধারা চালু হয়েছে, তাই একের পর এক নবী-রাসুল প্রেরিত হতে লাগলেন। জাজিরাতুল আরবের উপত্যকাজুড়ে বসবাসরত মূর্তিপূজারি আদজাতির কাছে হজরত হুদ আলাইহিস সালামকে প্রেরণ করা হয়। আদজাতি ছিল দৈহিক ও আর্থিক শক্তি-সামর্থ্যে এবং যুদ্ধ-বিগ্রহে উপমাহীন। নিজেদের এই দাপট-শক্তিমত্তার কারণে তারা ছিল চরম দাম্ভিক। ফলে হজরত নুহ আলাইহিস সালামকে মিথ্যাপ্রতিপন্ন করে। আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে তীব্র ঝড়োহাওয়া এসে তাদেরকে সমূলে উপড়ে ফেলে।

হিজাজ থেকে শামে যাওয়ার পথে ওয়াদি হিজর শহরে ছিল সামুদ জাতির বসবাস। নির্মাণশিল্পে তাদের যোগ্যতা ও নৈপুণ্য ছিল তুলনাহীন। পাহাড় কেটে মজবুত বাড়ি নির্মাণ করার কাজে তারা ছিল সিদ্ধহস্ত। তাদের হেদায়েত ও সংশোধনের জন্য হজরত সালেহ আলাইহিস সালামকে পাঠানো হয়। তারা তাকে মিথ্যা আখ্যায়িত করে। ফলে তাদেরকে বজ্রধ্বনি ও ভূ-কম্পের মাধ্যমে ধ্বংস করে দেওয়া হয়।[১২]

আদ, সামুদ-সহ কিছু আরবজাতির নামনিশানা নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়; এদেরকে আরবে বায়েদা বলা হয়। তাদের আলোচনা আসমানি কিতাব, লোকমুখে প্রচলিত কিসসা-কাহিনি এবং প্রাচীন কবিদের কাব্যে পাওয়া যায়।

হজরত ইবরাহিম আলাইহিস সালামের দাওয়াত

বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর মাঝে নবী-রাসুলের আগমন ঘটতে থাকে। হজরত ইবরাহিম আলাইহিস সালামের আসার পূর্বেই পৃথিবীতে বহু জাতি-গোষ্ঠী আবাদ হয়ে যায়। পূর্ব-পশ্চিমে বহু সাম্রাজ্য এবং অনেক শহর-নগর অস্তিত্ব লাভ করে। তাই নবীগণের আগমনও অনেক বৃদ্ধি পায়। একই সময়ে বিভিন্ন এলাকা, গোত্র এবং রাজ্যে অনেক নবী প্রেরিত হতে থাকেন। প্রত্যেকেই বড় বড় পরীক্ষার সম্মুখীন হন। কিন্তু হজরত ইবরাহিম আলাইহিস সালামের

---

১২. সুরা হুদ, আয়াত ২৫-৬৮; সুরা সাফফাত, আয়াত ৭৫-৭৮; আলমুখতাসার ফি আখবারিল বাশার- ১/১০-১৩; আলকামিল ফিত তারিখ- ১/৮২-৮৫

কুরবানি, আত্মত্যাগ, আল্লাহপ্রেম এবং আত্মোৎসর্গ ছিল অনুপম।

হজরত ইবরাহিম আলাইহিস সালাম ইরাকের ব্যবিলন শহরের উপকণ্ঠে 'কুসা' এলাকায় জন্মগ্রহণ করেন। নুহ আলাইহিস সালামের প্লাবনের পর ইতোমধ্যে ১০৮১ বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। সেই সময়ে ইরাক ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকাগুলোতে নমরুদ নামক এক জালেম ও প্রতাপশালী বাদশাহর শাসন চলতো। সে খোদা দাবি করেছিল। ব্যবিলনও তার নিয়ন্ত্রণে ছিল। ইরাকবাসী একদিকে তাকে খোদা মানত, অন্যদিকে চাঁদ-সূর্য, নক্ষত্র এবং নানাবিধ প্রাকৃতিক কুদরতকেও তারা খোদা ভাবত। পাশাপাশি তারা মূর্তিপূজা করত। স্বয়ং হজরত ইবরাহিম আলাইহিস সালামের পিতা আজরও মূর্তিপূজক ছিল। শিরক ও ভ্রান্ত আকিদা গোত্রের সব লোকের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে।[১৩]

হজরত ইবরাহিম আলাইহিস সালামকে আল্লাহ তায়ালা সত্যসন্ধানী করে নবুওয়াত প্রদান করেন এবং নিজ কওমের লোকেদের ইসলাহ করার নির্দেশ দেন। তিনি লোকজনের সামনে চাঁদ-সূর্যের অস্থায়িত্বের বিষয়টি তুলে ধরেন। তাদেরকে বুঝান যে, এগুলো নিজ ইচ্ছায় উদয়-অস্ত যেতে পারে না। তা হলে এগুলো কীভাবে রব হবে? লোকজন যখন তার কথা শুনল না, তখন একদিন তিনি তাদের মন্দিরে গিয়ে সব মূর্তি ভেঙে ফেলেন এবং তাদেরকে একেবারে নিরুত্তর করে দেওয়ার জন্য জিজ্ঞাসা করেন, 'ওরা যদি কথা বলতে পারে, তা হলে তাদের থেকেই জেনে নাও'। কওম নির্বাক হয়ে যায়, লজ্জিত এবং পেরেশান হয়ে তারা বলে, 'ইবরাহিম, তুমি তো জানো এরা কথা বলতে পারে না!'

ইবরাহিম আলাইহিস সালাম বললেন, তা হলে তোমরা আল্লাহকে ছেড়ে এমন জিনিসের ইবাদত কেন করো, যেগুলো তোমাদের কোনো উপকার-ক্ষতি, কিছুই করতে পারে না? তোমাদের এবং তোমাদের উপাস্যদের জন্য বড়ই আফসোস!'

কওমের লোকেরা তার যুক্তির কোনো উত্তর দিতে না পেরে হাঙ্গামা শুরু করে দেয়। তারা তাদের উপাস্যদের সম্মান বাঁচানোর জন্য দাবি তুলল যে, এই লোকটাকে গ্রেফতার করে পুড়িয়ে ফেলা হোক।'[১৪]

হজরত ইবরাহিম আলাইহিস সালামকে নমরুদের কাছে নিয়ে যাওয়া হলো। নমরুদ তাকে সন্ত্রস্ত করার জন্য বিভিন্ন প্রশ্ন করে। হজরত ইবরাহিম আলাইহিস সালাম নির্বিঘ্নে আল্লাহ তায়ালার একত্বের বর্ণনা দেন। তিনি বলেন, আমার রব ঐ সত্তা, যিনি জীবিত করেন এবং মৃত্যু দেন।'

নমরুদ বলে, 'আমিও তো জীবন দিতে পারি, মারতে পারি'। এই বলে সে

---

১৩. আলমুখতাসার ফি আখবারিল বাশার- ১/১৪-১৫; আলকামিল ফিত তারিখ- ১/৮৬
১৪. সুরা আমবিয়া, আয়াত ৫১-৬৮

একজন মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামিকে ডেকে এনে তাকে মুক্ত করে দেয়, আরেকজন নিরপরাধ ব্যক্তিকে ধরে এনে হত্যা করে। অথচ কাউকে ক্ষমা করে দেওয়ার দ্বারা তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে বলে গণ্য করা হয় না। তদ্রূপ কাউকে হত্যা করার মাধ্যমে কেউ বান্দার জীবন-মৃত্যুর মালিক হয়ে যায় না। কারণ এমন হলে তো যেকোনো হত্যাকারী জীবন-মৃত্যুর মালিক হয়ে নিজের কখনো মৃত্যুবরণ না করার কথা। কিন্তু কখনোই এমন হয় না। নমরুদের যে আকল-বুদ্ধি ছিল, তা এসব সূক্ষ্ম যুক্তি বোঝার মতো উপযুক্ত ছিল না। তাই হজরত ইবরাহিম আলাইহিস সালাম কোনো নিগূঢ় তত্ত্বকথার দিকে না গিয়ে একটি সুস্পষ্ট বিষয় উত্থাপন করেন। বলেন, আচ্ছা, আমার প্রভু পূর্বদিক থেকে সূর্য উদিত করেন। তুমি যদি রব হয়ে থাকো, তা হলে পশ্চিম দিক থেকে সূর্য উদিত করে দেখাও। নমরুদ এবার কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ে। লা-জবাব হয়ে যায়।'[১৫]

পরিশেষে সেও অন্যান্য লোকের মতো হজরত ইবরাহিম আলাইহিস সালামকে আগুনে পুড়িয়ে মারার সিদ্ধান্ত নেয়, যেন অন্যদের জন্য শিক্ষা হয়ে থাকে। তারা হজরত ইবরাহিম আলাইহিস সালামকে জ্বালিয়ে দেওয়ার জন্য গভীর গর্ত খুঁড়ে মিনজানিক দিয়ে তাকে তাতে নিক্ষেপ করে। এমন কঠিন মুহূর্তেও তার জবানে উচ্চারিত ছিল-

> اللهم أنت الواحد في السماء، وأنت الواحد في الأرض، حسبي الله ونعم الوكيل
>
> হে আল্লাহ, আসমানে আপনিই একক সত্তা, জমিনেও আপনি একক সত্তা। আমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট এবং তিনি উত্তম কার্যনির্বাহী।

এই সময় জিবরাইল আলাইহিস সালাম তার প্রতি দয়াপরবশ হয়ে বললেন, 'আপনার কোনো প্রয়োজন থাকলে, হুকুম করতে পারেন।'

জবাবে ইবরাহিম আলাইহিস সালাম বললেন, তোমাদের সামনে আমার প্রয়োজন পেশ করা ঠিক হবে না।'

সেই অগ্নিকুণ্ডের উত্তাপ এত প্রচণ্ড ছিল যে, আগুনের উপর দিয়ে উড়তে থাকা পাখিও কাবাব হয়ে নিচে পড়ে যেত; কিন্তু যখন হজরত ইবরাহিম আলাইহিস সালামকে আগুনে নিক্ষেপ করা হলো, আল্লাহ তায়ালা নির্দেশ দেন-

> يَا نَارُ كُوْنِيْ بَرْدًا وسَلَامًا على إِبْرَاهِيم
>
> হে আগুন, তুমি ইবরাহিমের জন্য আরামদায়ক ও শীতল হয়ে যাও।[১৬]

সঙ্গে সঙ্গে আগুন হজরত ইবরাহিম আলাইহিস সালামের জন্য জান্নাতে পরিণত

---

১৫. তাফসিরে ইবনে কাসির; সুরা বাকারা, আয়াত ২৫৮

১৬. সুরা আমবিয়া, আয়াত ৬৯

হলো। ৪০ দিন তিনি এখানে থাকেন। তিনি বলতেন, এই দিনগুলোই আমার জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সবচেয়ে প্রশান্তিদায়ক ছিল।[১৭]

ইবরাহিম আলাইহিস সালাম তার পিতাকেও তাওহিদের দাওয়াত দিতে গিয়ে বলেন, 'আপনি এমন জিনিসের ইবাদত কেন করেন, যেগুলো শুনতে পায় না, দেখতে পারে না, আপনার কোনো উপকারেও আসে না?'

পিতা উত্তর দিয়েছিলেন, 'ইবরাহিম, তুমি কি আমার উপাস্যদের অস্বীকার করছো? তুমি যদি এর থেকে ফিরে না আসো, তা হলে আমি তোমাকে পাথর মেরে হত্যা করে ফেলব।'[১৮]

সবশেষে ইবরাহিম আলাইহিস সালাম যখন তার কওম ও সম্প্রদায়কে ভ্রষ্টতা ও গোমরাহির চরম পর্যায় অতিক্রম করতে দেখেন, তখন তিনি স্বদেশ ত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নেন। ঐ সময়ে তার চাচাতো বোন সারা ঈমান এনেছিলেন। ইবরাহিম আলাইহিস সালাম তাকে বিয়ে করে নেন। তিনি শামের উদ্দেশে রওনা দেন। সঙ্গে সারা এবং ভাতিজা লুতও ছিলেন। লুতও ঈমান এনেছিলেন। পরবর্তীতে আল্লাহ তায়ালা তাকে নবুওয়াতের মর্যাদা প্রদান করেছিলেন।[১৯]

আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছা ছিল পথহারা মানুষ এবং বিক্ষিপ্ত জাতিকে ঐক্যের প্লাটফর্মে সমবেত করা। ইবরাহিম আলাইহিস সালামের তাওহিদ ও একত্বের দাওয়াত এতটাই ইখলাস ও নিষ্ঠাপূর্ণ ছিল যে, আল্লাহর সন্তুষ্টির সাগরে জোয়ার সৃষ্টি হয়। দীনের দাওয়াতের লক্ষ্য বাস্তবায়নে তিনি আপন পিতা, পরিবার-পরিজন এবং দেশ ত্যাগ করে প্রমাণ করেছেন যে, আল্লাহ তায়ালা যে তাকে উম্মতে মুহাম্মদির পিতামহ নির্বাচন করতে চান, তিনি এই সম্মাননা ও ইজ্জতের উপযুক্ত। কিন্তু তখনও প্রেম-ভালোবাসা এবং বিশ্বস্ততার কয়েক ধাপের পরীক্ষা রয়ে গিয়েছিল। আরো কিছু ইতিহাস গড়ার মতো বিষয় অবশিষ্ট ছিল।

হজরত ইবরাহিম আলাইহিস সালাম তাওহিদের দাওয়াতের জন্য উপযুক্ত জমিন খোঁজার উদ্দেশ্যে দেশে দেশে সফর করতে থাকেন। শামে কিছুদিন অবস্থান করার পর স্ত্রী সারাকে নিয়ে মিসর চলে যান। মিসরের তৎকালীন রাজা তুলিস (সিনান বিন ইলওয়ান) তাকে বুজুর্গ হিসেবে তার খেদমতের জন্য আপন কন্যাকে বিয়ে দেন।[২০]

---

১৭. আলকামিল ফিত তারিখ- ১/৮৫-৮৬

১৮. সুরা মারয়াম, আয়াত ৪২-৪৮

১৯. আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া- ১/১৬৮, ১৬৯

২০. সহিহ বুখারি- হাদিস ৩৩৫৮; (কিতাবু আহাদিসিল আমবিয়া); আলমুখতাসার ফি আখবারিল বাশার- ১/১৩; আলকামিল ফিত তারিখ- ১/৮৮

সহিহ বুখারির রেওয়ায়েতে فأخدمها هاجر শব্দের কারণে ইতিহাসবিদগণ তার বাহ্যিক

সিনান বিন ইলওয়ান ছিলেন হাইকোস তথা রাখাল বংশের। এই বংশটি মূলত আরবীয় ছিল। রাজকন্যার সঙ্গে হজরত ইবরাহিম আলাইহিস সালামের বিয়ে হলো। তাকে নিয়ে অন্যত্র যাওয়ার পর তিনি 'হা গার' তথা বিদেশি স্ত্রী বলে পরিচিত হতে লাগলেন। এই 'হা গার'-ই আরবি ভাষায় 'হাজার' হয়েছে।[২১]

হজরত হাজেরার গর্ভে হজরত ইবরাহিম আলাইহিস সালামের পুত্র ইসমাইল আলাইহিস সালামের জন্ম হয়। কিছুদিন পরই আল্লাহ তায়ালা তাকে হুকুম দেন- স্ত্রী হাজেরা আর শিশুসন্তান ইসমাইলকে মক্কার কোনো উপত্যকায় রেখে এসো। এই আদেশ ছিল তার জন্য আরেকটি বড় পরীক্ষা। এটা শুধু হজরত ইবরাহিম আলাইহিস সালামের জন্যই পরীক্ষা ছিল না; বরং তার স্ত্রী হাজেরাকেও পরীক্ষা করছিলেন। কারণ সর্বশেষ উম্মতের মুকুটধারিণী মা হওয়ার জন্য তো শত মুসিবতের মাঝেও অটল-অবিচল থাকা আবশ্যক।

হজরত ইবরাহিম আলাইহিস সালাম দীর্ঘ সফর করে শাম থেকে জাজিরাতুল আরব পৌঁছেন। স্ত্রীকে মক্কার এক বৃক্ষ-তরুলতাহীন উপত্যকায় আল্লাহ তায়ালার হেফাজতে রেখে তিনি ফিরে যাচ্ছিলেন। স্ত্রীর নিকট কেবল একটি পানির মশক, একটি খেজুরের থলে খোরাকি হিসাবে রেখে যান। তখন সীমাহীন পেরেশানি ও অস্থিরতা নিয়ে কাঁপা-কাঁপা স্বরে স্বামীকে জিজ্ঞেস করেন, 'ইবরাহিম, আপনি কোথায় চলে যাচ্ছেন? আপনি আমাদেরকে এমন বৃক্ষ-তরুলতাহীন উপত্যকায় কার হেফাজতে রেখে যাচ্ছেন?'

ইবরাহিম আলাইহিস সালাম জানতেন এই পরীক্ষা শুধু তার জন্যই নয়, তার স্ত্রীর জন্যও। অবশ্য তার নিজ থেকে বুঝা উচিত ছিল যে, আমার স্বামীর স্ত্রী ও শিশুসন্তানকে এমন স্থানে একা রেখে যাওয়ার রহস্য কী! কিন্তু হজরত হাজেরা বার বার একই প্রশ্ন করছিলেন। হজরত ইবরাহিম আলাইহিস সালামও নীরবে পথ চলছিলেন। তখন হাজেরা রাদিয়াল্লাহু আনহা স্বামীর এই নীরবতা নিয়ে কিছুক্ষণ ভেবে জিজ্ঞেস করলেন, আচ্ছা, আপনাকে কি আল্লাহ তায়ালা এই হুকুম দিয়েছেন?' তখন ইবরাহিম আলাইহিস সালাম বললেন, হ্যাঁ, ব্যাপারটা এমনই।

হজরত হাজেরা রাদিয়াল্লাহু আনহার অস্থির মন প্রশান্ত হয়ে যায়। আল্লাহ

অর্থ অনুসারে বলেন, হাজেরা রা. বাঁদি ছিলেন। অপরদিকে কাজি সুলাইমান মানসুরপুরি রহ. বিস্তারিত প্রমাণসহ উল্লেখ করে এটা সাব্যস্ত করেছেন যে, তিনি বাঁদি ছিলেন না; বরং মিসরের রাজকন্যা ছিলেন। [রাহমাতুললিল আলামিন- ২/৩০৯-৩১১; মারকাযুল হারামাইন আলইসলামি সংস্করণ]

২১. তার হিব্রু নাম 'হাগার'। মিসরের ফেরাউন যখন সারা রা. এর কারামত দেখার পর হাজেরাকেও সাথে দিয়ে দেন, তখন তার নাম 'আজেরা' রাখা হয়, যার অর্থ এই কন্যা ঐ মুসিবতের প্রতিদান, যার মাধ্যমে বাদশাহর জুলুম দূর হয়ে যায়। এরপর যখন হিজরত করেন এবং মক্কাতে আবাদ হন, তখন তার নাম হাজেরা হয়ে যায়। [রাহমাতুললিল আলামিন- ২/৩০৮]

তায়ালার পাক্কা মুমিন বান্দি ছিলেন তিনি। প্রশান্তচিত্তে স্বামীকে বললেন, 'আমি তার রেজামন্দির উপর সন্তুষ্ট'- এই বলে তিনি আপন স্থানে ফিরে আসেন।

হজরত ইবরাহিম আলাইহিস সালাম মক্কার সীমানা অতিক্রম করার পর যখন স্ত্রী-সন্তান দৃষ্টির আড়াল হয়ে যায়, তখন তাদের সেই উপত্যকার দিকে মুখ ফিরিয়ে দাঁড়ান।[২২] তিনি তো আল্লাহর নবী ছিলেন। তার জানা ছিল পর্বত-ঘেরা মক্কার এই উপত্যকা সৃষ্টিকুলের এক পবিত্র স্থান। এখানেই আল্লাহ তায়ালার প্রথম ঘরের চিহ্ন আজও বিদ্যমান। শত শত বছর যাবৎ নবী-রাসুলগণ এই ঘরের বরকত হাসিল করার জন্য জিয়ারত করেন। একজন অনুগত বান্দা এবং স্নেহশীল পিতা হিসেবে তিনি আল্লাহর দরবারে দু-হাত তুলে অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী ভাষায় দোয়া করেন,

رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ

হে আমাদের প্রভু, আমি আমার সন্তানদেরকে আপনার সম্মানিত ঘরের কাছে এমন এক ময়দানে রেখে এসেছি, যার ফসল উপযোগী নয়। আপনি তা আবাদ করে দিন। হে আমাদের রব, যেন তারা নামাজ কায়েম করে। অতএব, আপনি কিছু মানুষের অন্তর ওদিকে ঝুঁকিয়ে দিন। আর তাদের খাওয়ার জন্য ফলফলাদি দান করুন, যেন তারা শোকর আদায় করে।[২৩]

হজরত ইবরাহিম আলাইহিস সালাম ও হাজেরা রাদিয়াল্লাহু আনহা উভয়েই আল্লাহ তায়ালার উপর ভরসা রাখা, তার সন্তুষ্টির উপর সন্তুষ্ট থাকা, তার রেজামন্দির কাছে নিজেকে সঁপে দেওয়া এবং তার সন্তুষ্টি অর্জন করার জন্য বড় বড় কুরবানি ও আত্মত্যাগের অপূর্ব ও বেনজির দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। এই একিন ও বিশ্বাসই ছিল মূলত সর্বশেষ উম্মতের অস্তিত্বে আসার প্রস্তুতি। হাজার বছর পূর্ব থেকেই তার গঠনপ্রক্রিয়া অব্যাহত ছিল।

আল্লাহ তায়ালা হজরত হাজেরা ও ইবরাহিম আলাইহিমাস সালামের কুরবানিকে ফলবান করেছেন। হাজেরা যেমন বলেছিলেন 'তা হলে আল্লাহ আমাদের ধ্বংস করবেন না'। সত্যিই আল্লাহ কেয়ামত অবধি তার নাম সংরক্ষণ করেছেন।

জমজম

হজরত ইবরাহিম আলাইহিস সালামের চলে যাওয়ার পর হজরত হাজেরা রাদিয়াল্লাহু আনহা ছেলেকে দুধ পান করাচ্ছিলেন এবং নিজেও মশক থেকে

২২. সহিহ বুখারি- হাদিস ৩৩৬৪; (কিতাবু আহাদিসিল আমবিয়া)
২৩. সুরা ইবরাহিম, আয়াত ৩৭

পানি পান করে দিন কাটাচ্ছিলেন। কিন্তু লতাপাতাহীন মরুভূমিতে কতদিনই-বা ছোট মশকের পানি দিয়ে চলা যায়। খুব দ্রুত পানি ফুরিয়ে যায়। মায়ের দুধ শুকিয়ে যায়। দুধের শিশু ক্ষুধা আর পিপাসায় কাতরাতে থাকে। হজরত হাজেরা রাদিয়াল্লাহু আনহা সন্তানের এই অবস্থা দেখে অস্থির হয়ে পড়েন। কারো সাহায্যের জন্য বার বার উপত্যকার দু'পাশে সাফা-মারওয়া পাহাড়ে উঠে সীমাহীন পেরেশানির সঙ্গে এদিক-ওদিক মানুষের সন্ধান করতে থাকেন। ওদিকে বাচ্চার প্রাণ ওষ্ঠাগতপ্রায়। এমন সময় কারো আগমনধ্বনি শোনা গেল। হজরত হাজেরা আগন্তুককে না দেখেই বলতে লাগলেন, 'তোমার মধ্যে যদি কল্যাণ থেকে থাকে, তা হলে আমাদের সাহায্য করো।'

কিছুক্ষণের মধ্যেই ফেরেশতাদের সরদার হজরত জিবরাইল আলাইহিস সালাম আবির্ভূত হন। তিনি আচমকা উপত্যকার এক কোনায় নিজের ডানা ঝাপটা মারেন এবং মুহূর্তেই ক্ষুধা-পিপাসা মিটে যায়। দুধের শিশু ইসমাইলের জন্য জমজম ঝরনা প্রবাহিত হয়, যার মাধ্যমে তার মিঠা পানি, খাদ্য এবং চিকিৎসার প্রয়োজন পূরণ হয়ে যায়। জমজম আজ অবধি বিশ্ববাসীর নিকট অলৌকিক এবং বিস্ময়কর ঝরনা হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে।[২৪]

ফেরেশতার সেই অলৌকিক কর্ম এবং জমজমের বরকতে মরুভূমির মধ্যেও বসবাসের সুন্দর ব্যবস্থা হয়। ইয়েমেনের এক যাযাবর গোত্রের বনু জুরহুম সেখান দিয়ে অতিক্রম করার সময় পানি ও থাকার জায়গার খোঁজ করছিল। গোত্রের লোকেরা দূর থেকে আকাশে পাখি উড়তে দেখে বুঝতে পেরেছিল আশপাশের কোথাও হয়তো পানি পাওয়া যাবে। তাদের অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা পেরেশান হয়ে বলতে থাকে, 'আমরা তো আগেও এই এলাকা অতিক্রম করেছি, কিন্তু এখানে পানির নামনিশানাও ছিল না।' পানির নিকট পৌঁছলে তারা জমজম এবং তার পাশে হজরত হাজেরা এবং ইসমাইলকে দেখতে পেল। তারা বলে, আমাদেরকে এখানে থাকার অনুমতি দেবেন? হাজেরা রাদিয়াল্লাহু আনহা অনুমতি দেন। এভাবেই বনু জুরহুম এখানে আবাদ হয়। তারা ছিল বনু কাহতানের অন্তর্গত। তাদেরকে আরবে আরিবা বলা হয়। আর বনু কাহতান ছিল মূল আরব। তাদের জন্মভূমি ছিল ইয়েমেন। হজরত ইসমাইল আলাইহিস সালামের ভাষা ছিল সুরিয়ানি। কিন্তু বনু জুরহুম এখানে অবস্থান করার কারণে তারাও আরবিভাষা শিখে ফেলেন। হজরত ইসমাইল থেকে যে বংশধারার সৃষ্টি হয়, তাদেরকে 'আরবে মুসতারিবা' (অন্য বংশের সাথে মিশে যারা আরব) বলা হয়।[২৫]

---

২৪. সহিহুল বুখারি- হাদিস ৩৩৬৪ (কিতাবু আহাদিসিল আমবিয়া);

২৫. আলকামিল ফিত তারিখ- ১/৯০

ছেলের কুরবানি

তখনও হজরত ইবরাহিম আলাইহিস সালামের একটি পরীক্ষা বাকি ছিল। এই পরীক্ষা ছিল পূর্বের দুই পরীক্ষা থেকে বেশি কঠিন। কারণ এখানে ছেলের সম্মতি নেওয়াও জরুরি ছিল। স্বপ্নে আল্লাহ তায়ালা তাকে নির্দেশ দেন যে, 'ইবরাহিম, তুমি তোমার ছেলেকে কুরবানি করো।' এভাবে হজরত ইবরাহিম, হাজেরা এবং কমবয়সি ইসমাইলজ্জতিন জনই পরীক্ষার সম্মুখীন হন। আল্লাহ তায়ালার তাওফিকে তারা সবাই তার নির্দেশের সামনে আত্মসমর্পণ করেন। কিন্তু শয়তান সর্বশক্তি প্রয়োগ করে সৃষ্টিকুলের এমন পবিত্র বান্দাদের সংকল্পে চিঁড় ধরানোর কাজে। তাদেরকে আল্লাহর মহব্বত থেকে সরিয়ে দুনিয়ার দিকে ধাবিত করার চেষ্টায় রত হয়। কিন্তু মা-বাবা, ছেলেজ্জসকলেই নিজ নিজ অবস্থানে অবিচল ছিলেন। শয়তানকে তারা কঙ্কর ছুঁড়ে হটিয়ে দেন। সর্বশেষে হজরত ইবরাহিম আলাইহিস সালাম পুত্র ইসমাইলকে মিনাপ্রান্তরে কুরবানি করার জন্য নিয়ে গিয়ে তার গর্দানে ছুরি চালান। তখন আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে আওয়াজ আসে, 'ইবরাহিম, তুমি তোমার পরীক্ষায় সফল।' তখন হজরত ইবরাহিম আলাইহিস সালাম দেখলেন ইসমাইলের স্থানে একটি দুম্বা জবাই হয়ে আছে।[২৬]

সময়ের গতিবিধি কিছুটা থমকে গিয়েছিল। হজরত ইবরাহিম আলাইহিস সালামের উপর দিয়ে তিন তিনটি বড় পরীক্ষা অতিক্রম করেছে। এখন এত বড় নবীকে পুরস্কার প্রদানের সময় ঘনিয়ে এসেছে।

কাবাঘর নির্মাণ

আল্লাহ তায়ালা হজরত ইবরাহিম আলাইহিস সালামকে ঐ ইজ্জত-সম্মান দেওয়ার জন্য ফয়সালা করে রেখেছিলেন, যার জন্য ইতিহাস অপেক্ষমাণ ছিল। তা হলো দুনিয়াতে আল্লাহ তায়ালার প্রথম ইবাদতখানা নির্মাণ। হজরত আদম আলাইহিস সালামকে যখন তিনি দুনিয়াতে অবতরণ করান, তখনই তাকে এই ঘর নির্মাণ করার হুকুম দেন। হজরত আদম আলাইহিস সালাম ফেরেশতাদের দিকনির্দেশনায় বাইতুল্লাহর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। তারা আল্লাহর নির্দেশিত পন্থায় তাওয়াফ করেন এবং হজের দ্বিতীয় রোকন আরাফার ময়দানে অবস্থান করেন। তারপর থেকে বাইতুল্লাহ একটি নির্ধারিত সময়কাল পর্যন্ত মুমিনদের মাধ্যমে আবাদ ছিল। হজরত নুহ আলাইহিস সালামের প্লাবনের সময় বাইতুল্লাহর ভবনটি ভেঙে যায়, কেবল তার ভিত্তি অবশিষ্ট ছিল।[২৭]

---

২৬. তাফসিরে ইবনে কাসির; সুরা সাফফাত, আয়াত ১০৩-১০৭

২৭. আলকামিল ফিত তারিখ- ১/৫০, ৫১

কালের বিবর্তনে এই ভিত্তিও একসময় ভেঙে পড়ে এবং কাবাঘর সম্পূর্ণ বিলীন হয়ে যায়। আল্লাহ তায়ালা হজরত ইবরাহিম আলাইহিস সালামকে এক বিরল সম্মানে ভূষিত করলেন। তিনি চাইলেন যে, তার এবং তার ছেলের হাতে এমনভাবে বাইতুল্লাহর পুনর্নির্মাণ করাবেন- মানুষের মনে কেয়ামত পর্যন্ত ইবরাহিম আ. এর প্রতি সম্মান ও ভক্তি বাকি থাকে। আল্লাহ তায়ালা হজরত ইবরাহিম আলাইহিস সালামকে বাইতুল্লাহর সীমানা বলে দেন এবং নির্মাণের নকশাও প্রদান করেন। কুরআনে এসেছে:

وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَنْ لَا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ

যখন আমি ইবরাহিমকে বাইতুল্লাহর স্থান ঠিক করে দিয়ে বলেছিলাম যে, আমার সাথে কাউকে শরিক কোরো না এবং আমার গৃহ পবিত্র রাখো তাওয়াফকারীদের জন্য, নামাজে দণ্ডায়মান এবং রুকু-সেজদাকারীদের জন্য।[২৮]

এখন বাইতুল্লাহ দ্বিতীয়বারের মতো তাওহিদের প্রসার এবং আল্লাহর খালেস ইবাদতের প্রাণকেন্দ্রে পরিণত হওয়ার অপেক্ষায় ছিল।

এই মহান লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য হজরত ইবরাহিম আলাইহিস সালাম একবার সুদূর ফিলিস্তিন থেকে মক্কায় উপস্থিত হন। যুবক হজরত ইসমাইল তিরন্দাজিতে দক্ষ ছিলেন। তিনি জমজম কূপের পাশে বসে তির তৈরি করছিলেন। পিতাকে আসতে দেখে তির ফেলে উষ্ণ স্বাগত জানান।

হজরত ইবরাহিম আলাইহিস সালাম তার আসার উদ্দেশ্য ছেলেকে বললেন, 'বৎস, আল্লাহ তায়ালা আমাকে একটি বিশেষ কাজের নির্দেশ দিয়েছেন।'

ইসমাইল আলাইহিস সালাম বললেন, 'আল্লাহ আপনাকে যে নির্দেশ দিয়েছেন, তা আপনি পালন করুন।'

এ কাজে তুমি আমাকে সহযোগিতা করবে?

হ্যাঁ, আমি আপনাকে সহযোগিতা করব।

হজরত ইবরাহিম তখন সামনের এক একটি টিলার দিকে ইশারা করে বলেন, 'আল্লাহর হুকুম হলো তার জন্য একটি ঘর নির্মাণ করা।'

পিতা-পুত্র মিলে আল্লাহর নির্দেশিত ছক ও সীমানায় ভিত্তি নির্মাণ করেন। হজরত ইসমাইল আলাইহিস সালাম পাথর উঠিয়ে দিতেন আর হজরত ইবরাহিম আলাইহিস সালাম পাথর গেঁথে দিতেন। দেওয়াল যখন কিছুটা উঁচু

২৮. সুরা হজ, আয়াত ২৬

হলো, তখন এক কোনায় হাজরে আসওয়াদ স্থাপন করলেন। উভয়ের বিশ্বাস ছিল তারা এমন পবিত্র ঘর ও কেন্দ্র নির্মাণ করছেন, যেখান থেকে লা-শরিক আল্লাহর তাওহিদ ও একত্বের বার্তা পৃথিবীব্যাপী ছড়িয়ে পড়বে, এবং যে ঘর আল্লাহ-ভোলা অন্তর, পরস্পর বিদ্বেষী পরিবার, পথভ্রষ্ট লোকজনসহ পৃথিবীর আনাচে-কানাচে বিক্ষিপ্ত জাতিগোষ্ঠী- সবাইকে তাওহিদের গণ্ডিতে একতাবদ্ধ করার কেন্দ্রস্থল হবে। এখানে জাতি-বর্ণ নির্বিশেষ সকলকে এক উম্মাহর ঝান্ডাতলে সমবেত করবে।

কাবা নির্মাণের এমন মহান উদ্দেশ্য সামনে রেখেই পিতা-পুত্র উভয়ে আল্লাহর দরবারে দোয়া করেন-

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

হে আমাদের রব, আমাদের আমল কবুল করুন। নিশ্চয় আপনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞানী।[২৯]

কাবা শরিফ নির্মাণ যখন পূর্ণ হয়, তখন মানব-ইতিহাসের এই দুই মহান নবী এই দোয়া করেন,

رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

হে আমাদের রব, তাদের মধ্য থেকেই তাদের নিকট একজন নবী প্রেরণ করুন- যিনি তাদের কাছে আপনার আয়াতসমূহ তেলাওয়াত করবেন, তাদেরকে কিতাব ও হেকমত শিক্ষা দেবেন এবং তাদের পবিত্র করবেন। নিশ্চয় আপনিই পরাক্রমশালী হেকমতওয়ালা।[৩০]

তাদের দোয়া কবুল হয়। শেষনবী হজরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হজরত ইসমাইল আলাইহিস সালামের বংশধর হবেন- এই ফয়সালা হয়ে গেল। সেই সাথে এরও ফয়সালা হলো যে, শেষনবী তার বংশধর হওয়ার পাশাপাশি নবীকুল শিরোমণি হবেন, তার হাতেই পৃথিবীর ইতিহাসে বড় বিপ্লব ঘটবে।

হজরত ইসহাক ও হজরত ইয়াকুব (আলাইহিমাস সালাম)

ইবরাহিম আলাইহিস সালাম শামে অবস্থানকালে অপর স্ত্রী সারার গর্ভে ইসহাক আলাইহিস সালাম জন্ম নেন। ইরাক, শাম এবং মিসরের মতো বিশাল সাম্রাজ্যে অবস্থানরত সকল মানুষের ইসলাহ ও সংশোধনের দায়িত্ব তার সন্তানদের উপর

২৯. সুরা বাকারা, আয়াত ১২৭; সহিহুল বুখারি- ৩৩৬৫ (কিতাবু আহাদিসিল আমবিয়া)
৩০. সুরা বাকারা, আয়াত ১২৯

অর্পণ করেন। তাদের মধ্যে বড় বড় রাসুল জন্ম নিয়েছেন; যেমন : হজরত ইয়াকুব, হজরত ইউসুফ, হজরত মুসা, হজরত ইউশা, হজরত দাউদ, হজরত সুলাইমান, হজরত উজাইর, হজরত জাকারিয়া, হজরত ইয়াহইয়া আলাইহিমুস সালাম।

হজরত মুসা এবং তার পরবর্তী সকল নবীকে বনি ইসরাইলের নবী বলা হতো। কারণ তারা হজরত ইয়াকুব আলাইহিস সালামের বারো ছেলের বংশোদ্ভূত ছিলেন। আর ইয়াকুব আলাইহিস সালামের নাম ছিল ইসরাইল (আল্লাহর বান্দা)। তাই তার বংশে জন্ম নেওয়া নবীদের বনি ইসরাইলের নবী বলা হতো।

হজরত লুত আলাইহিস সালাম

হজরত ইবরাহিম আলাইহিস সালামের উপর সর্বপ্রথম যারা ঈমান এনেছিলেন, তাদের মধ্যে তার ভাতিজা লুতও ছিলেন। তিনি ইবরাহিম আলাইহিস সালামের সঙ্গে হিজরত করে জর্ডানের সাদুম গোত্রে বসবাস করতে থাকেন।[৩১]

কওমে সাদুম আল্লাহ তায়ালার নাফরমানিতে লিপ্ত ছিল। অস্বাভাবিক পদ্ধতিতে তারা তাদের যৌনচাহিদা মেটাত। আল্লাহ তায়ালা তাদের হেদায়েত ও সংশোধনের জন্য লুত আলাইহিস সালামকে নবুওয়াত দিয়ে প্রেরণ করেন। একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত তিনি তাদেরকে বুঝাতে থাকেন। কিন্তু এই নির্লজ্জ জাতির মধ্যে কোনোরূপ পরিবর্তন লক্ষ করা যায়নি। তারা তাদের গোমরাহি ও বেহায়াপনায় অবিচল ছিল। পরিশেষে আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে কঠিন শাস্তি দেন। সাদুম গোত্রের বসতি উলটে দেওয়া হলো। আসমান থেকে পাথরের বৃষ্টি বর্ষিত হলো। হজরত লুত আলাইহিস সালাম গুটিকয়েক মুসলমানকে সঙ্গে নিয়ে আজাব নাজিল হওয়ার পূর্বেই আল্লাহর নির্দেশে বসতি থেকে বের হয়ে যান। সেই আজাব থেকে কোনো প্রাণী বাঁচতে পারেনি।[৩২]

কওমে সাদুমের বস্তি এমনভাবে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় যে, আজও বিস্বাদ পানির একটি সমুদ্র ছাড়া তার কোনো কিছুই দেখা যায় না। একে মৃতসাগর বলা হয়। এই সাগরে কোনো প্রাণী জন্মাতে পারে না।

হজরত আইয়ুব আলাইহিস সালাম

হজরত ইবরাহিম আলাইহিস সালামের অপর ছেলে ইসহাক আলাইহিস সালাম শামে পিতার স্থলাভিষিক্ত ছিলেন। হজরত ইসহাক আলাইহিস সালাম নিজের সন্তানদের মিল্লাতে ইবরাহিমে অবিচল রাখার এবং কেয়ামত পর্যন্ত তার ধারা অব্যাহত রাখার প্রতি সচেষ্ট ছিলেন। তার সন্তানদের মধ্যে ইসরাইল এবং ঈস খুব প্রসিদ্ধ ছিলেন। ঈসের বংশধরদের মধ্যেই হজরত আইয়ুব আলাইহিস

৩১. আলকামিল ফিত তারিখ- ১/১০৫, ১০৯
৩২. সুরা হুদ, আয়াত ৭০-৮৩; আলমুখতাসার ফি আখবারিল বাশার- ১/১৫

সালামকে নবুওয়াতের মর্যাদা দান করা হয়। তিনি খুব বিত্তবান ছিলেন। বাগ-বাগিচা, গবাদিপশু, প্রাসাদ সবই তার ছিল।

হজরত আইয়ুব আলাইহিস সালাম অত্যন্ত সুখে-শান্তিতে দিনাতিপাত করছিলেন। এরপর আল্লাহ তায়ালা তাকে ধীরে ধীরে পরীক্ষায় ফেলেন। ভীষণ কষ্টদায়ক ব্যাধিতে তিনি আক্রান্ত হয়ে একেবারে নিঃস্ব হয়ে পড়েন। পরিবার-পরিজনও বিভিন্ন মুসিবতের শিকার হয়। তার দেখভাল করার মতো কেউ ছিল না। কেবল তার স্ত্রী ইখলাস ও নিষ্ঠার সঙ্গে স্বামীর সেবা করেন। আঠারো বছর দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত থাকার পর আল্লাহ তায়ালা তাকে পূর্ণ আরোগ্য দান করেন। তিনি সুখময় জীবনে শোকর এবং মুসিবতের সময় সবরের বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন।[৩৩]

হজরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম

হজরত ইসহাক আলাইহিস সালামের ছেলে ইয়াকুব আলাইহিস সালামকেও আল্লাহ তায়ালা নবুওয়াতের নেয়ামত দান করেছিলেন। হজরত ইয়াকুবের বারোজন ছেলে ছিল। তাদের মধ্যে ইউসুফ ছিলেন সবার ছোট এবং নেককার। আল্লাহ তাকে অপূর্ব সৌন্দর্য দান করেছিলেন। ভাইয়েরা হিংসাবশত তাকে মেরে ফেলার ইচ্ছায় এক নির্জন কূপে নিক্ষেপ করে। আল্লাহ তায়ালা তাকে রক্ষা করেন। কূপের নিকট দিয়ে অতিক্রমকারী একটি কাফেলা তাকে উঠিয়ে নিয়ে মিসরের দাসবাজারে বিক্রি করে দেয়। মিসরের জনৈক মন্ত্রী (তাকে আজিজ বলা হয়) তাকে ক্রয় করে ঘরের চাকর বানিয়ে দেন।

আজিজের স্ত্রী তার প্রতি আসক্ত হয়ে নিজের দিকে আকৃষ্ট করার চেষ্টা করে। কিন্তু হজরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম যখন তার জালে আটকা পড়া থেকে বিরত থাকেন, তখন সেই মহিলা বিফল হয়ে চক্রান্ত করে তাকে কারাবন্দি করে। জেলখানায় তিনি চৌদ্দ বছর কাটান। মিসরের বাদশাহ রাইয়ান বিন ওয়ালিদ আশ্চর্য একটি স্বপ্ন দেখে, যার ব্যাখ্যা দিতে সকলেই ব্যর্থ হয়। হজরত ইউসুফ তার ব্যাখ্যা বলে দিলে বাদশাহ তার প্রতি কেবল মুগ্ধই হননি, বরং তাকে অর্থমন্ত্রী হিসেবে নিয়োগদান করেন। ইউসুফ আলাইহিস সালাম শাসন-ক্ষমতা লাভ করার পর পিতা ও আপন ভাইদের মিসর নিয়ে আসেন।[৩৪]

হজরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম একশ' দশ বছর বয়সে ইনতেকাল করেন। তার চৌষট্টি বছর পর বনি ইসরাইলের সবচেয়ে বড় নবী হজরত মুসা আলাইহিস সালাম জন্মগ্রহণ করেন।[৩৫]

---

৩৩. আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া- ১/২৪৫-২৪৯

৩৪. আলকামিল ফিত তারিখ- ১/১২৩-১৩৭

৩৫. আলমুখতাসার ফি আখবারিল বাশার- ১/১৭, ১৮

মিসর এবং মিসরের ফেরাউনরা

পৃথিবীর সবচেয়ে প্রাচীন সভ্যতা হলো মিসরীয় সভ্যতা। হজরত নুহ আলাইহিস সালামের পৌত্র বিসর বিন হাম প্লাবনের পর নিজ বংশের ত্রিশজন লোক নিয়ে নীলনদের পারে ওঠেন এবং বর্তমান কায়রো থেকে বারো মাইল (উনিশ কিলোমিটার) দূরে 'মান্‌ফে' বসতি স্থাপন করেন। বিসরের ছেলে মিসর দীর্ঘ জীবন লাভ করে এবং গোত্রকে সুবিন্যস্ত করে। তার অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ তারই নামে দেশের নামকরণ করা হয়। মিসরে বসতি স্থাপনকারীরা অধিকাংশই ছিল ভিনদেশি। তাদের মধ্যে কিবতি, আমালিকা, গ্রিসের লোকজন ছিল। তবে কিবতিদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিল।

এই অঞ্চলটি ভিনদেশিদের জন্য নিরাপদ আশ্রয় হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। পূর্ণ নিরাপত্তা এবং নীলনদের পানির মাধ্যমে চাষাবাদ করার মধ্য দিয়ে জনজীবনে সুখ-সমৃদ্ধি ফিরে আসে। মিসরবাসী রসায়নবিদ্যা, নির্মাণশিল্পসহ বিভিন্ন পেশায় দক্ষ হয়ে ওঠে। মতাদর্শের দিক থেকে তারা পথনির্দেশকের শূন্যতায় ভুগছিল। তারা সূর্যের পূজা করত। তাদের মাঝে বিভিন্ন শয়তানিশাস্ত্রের প্রচলন ঘটে। মিসরীয় জাদু-টোনা পৃথিবী বিখ্যাত ছিল।

মিসরের হুকুমত মিসর বিন বিসরের সন্তানদের মাঝেই বদল হচ্ছিল। তাদের মধ্যে একজন ছিল সিনান বিন ইলওয়ান (তুলিস)। হজরত ইবরাহিম আলাইহিস সালাম যখন মিসর আসেন তখন এই তুলিস মসনদে আসীন ছিল এবং তার কন্যা হাগার (হাজার) এর সঙ্গে তার বিবাহ সম্পন্ন হয়।

সিনানের মৃত্যুর পর তার বংশে পতন শুরু হয়। একে একে দুজন নারী মসনদে আসীন হয়। তাদের দুর্বলতার সুযোগে শামের আমালিকা সম্প্রদায় মিসর দখল করে নেয়।

মিসরে আমালিকাদের প্রথম বাদশাহ ছিল ওয়ালিদ বিন দুমাগ। সে গরুর রাখাল ছিল। সে-ই প্রথম ফেরাউন উপাধি ধারণ করে। পরবর্তীতে মিসরের মসনদে আসীন-হওয়া সকল বাদশাহকেই ফেরাউন বলা হতো। কিছু কিছু ঐতিহাসিক তো মিসরের পূর্ববর্তী বাদশাহদেরও ফেরাউন বলে উল্লেখ করে থাকেন; অথচ তারা এই উপাধিধারী ছিলেন না। ওয়ালিদের ছেলে রাইয়ান তার শাসনামলে মিসরে খাদ্যমন্ত্রী হিসাবে ইউসুফ আলাইহিস সালামের মতো ব্যক্তিকে পেয়েছিল।[৩৬]

মিসরের অধিকাংশ ফেরাউন মুসলমান ছিল না ঠিক; কিন্তু তারপরও তাদের কেউই খোদা দাবি করেনি। জনগণের উপর অত্যাচার-নিপীড়ন চালায়নি।

৩৬. আলমুখতাসার ফি আখবারিল বাশার- ১/৫৭, ৫৮, ৯৮

হজরত ইউসুফ আলাইহিস সালামও তাদের অনুসরণ করেননি। রাইয়ানের ছেলে 'দারুম'-এর শাসনামলে তিনি ইনতেকাল করেন। মিসরের লোকেরা তো এই মহান নবীর বদৌলতে আর্থিক দীনতা থেকে মুক্তি পেয়ে সুখী জীবন লাভ করেছে; কিন্তু তার আধ্যাত্মিক শিক্ষার দিকে তারা কেউ মনোযোগ দেয়নি। বরং তার ইনতেকালের পর তারা বুঝে নেয় যে, ঈমানের এই ঝরনাধারা হয়তো বন্ধ হয়ে গেছে। তারা বলতে থাকে, তারপর আল্লাহ তায়ালা আর কোনো রাসুল প্রেরণ করবেন না।'[৩৭] এর পাশাপাশি মিসরবাসী পার্থিব জীবন এবং নির্মাণশিল্পে আত্মনিয়োগ করে এবং আল্লাহর পথ থেকে অনেকদূরে চলে যায়।

মিসরের প্রথম খোদা দাবিদার ফেরাউন : ওয়ালিদ বিন মুসআব

মানুষের আমল ও আকিদা বিনষ্ট হয়ে যাওয়ায় মিসরে রাজনৈতিক অবক্ষয় দেখা দেয়। কিবতি বংশের এক লোক, নাম ওয়ালিদ বিন মুসআব, পুলিশ বিভাগের কর্মকর্তা ছিল। সে-ই আমালিকাদের হুকুমতের অবসান ঘটিয়ে নিজে মসনদে বসে। যেহেতু কিবতিরা সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল, তাই ওয়ালিদের নেতৃত্বে তারা সন্তোষ প্রকাশ করে। তাদের জানা ছিল না যে, একদিন এ-ই চরম অহংকারী ও দাম্ভিকে পরিণত হবে। ক্ষমতা কিবতিদের হাতে হস্তান্তর হওয়ার মাধ্যমে মিসর বাহ্যিকভাবে মজবুত হয়। ওয়ালিদ বিন মুসআব মিসরের সবচেয়ে শক্তিমান ও প্রতাপশালী ফেরাউনে পরিণত হয়। সে অনেক স্থাপনা নির্মাণ করে। সেনাবাহিনীকে অত্যন্ত শক্তিশালী করে গড়ে তোলে। অবশেষে সে তার বাহ্যিক শক্তি-সামর্থ্য এবং জনগণের সমর্থন দেখে খোদা দাবি করে বসে।[৩৮]

এদিকে হজরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের ভাইদের সন্তানেরা বড় হতে হতে ১২টি গোত্রে রূপান্তরিত হয়। তাদেরকেই বনু ইসরাইল বলা হতো। তারা ইয়াকুব আলাইহিস সালামের দীনের উপর অবিচল ছিল এবং মিসরের শিরকি সভ্যতা-সংস্কৃতি থেকে মুক্ত ছিল। তবে পূর্ববর্তী ফেরাউনরা তাদেরকে বিশুদ্ধ আকিদা থেকে সরানোর জন্য মাঝেমধ্যেই তাদের উপর নির্যাতন চালাত। তাদেরকে রাষ্ট্রের দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিক আখ্যা দিয়ে জোরপূর্বক শ্রমিক হিসেবে ব্যবহার করা হতো। কিন্তু যখন ওয়ালিদ বিন মুসআব দম্ভ ও অহংকারে সীমালঙ্ঘন করে খোদা দাবি করে এবং জনগণের উপর প্রভাব বিস্তার করে, তখন বনি ইসরাইল গোলামের মতো বেগার খাটতে থাকে।[৩৯]

---

৩৭. সুরা মুমিন, আয়াত ৩৪

৩৮. আলমুখতাসার ফি আখবারিল বাশার- ১/৫৭

৩৯. প্রাগুক্ত, তাফসিরে ইবনে কাসির; সুরা বাকারা, আয়াত ৪৯

হজরত মুসা আলাইহিস সালাম

এমন পরিস্থিতিতেই আল্লাহ তায়ালা বনি ইসরাইলকে ফেরাউনের অত্যাচার থেকে পরিত্রাণ দেওয়ার জন্য হজরত মুসা আলাইহিস সালামকে প্রেরণ করেন। তিনি বনি ইসরাইলেরই একটি পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তার জন্মের পূর্বে ফেরাউন একটি স্বপ্ন দেখে। জ্যোতিষীরা তার ব্যাখ্যা করে যে, বনি ইসরাইলে এমন সন্তান জন্ম নেবে, যে ফেরাউনের রাজত্ব ধ্বংস করে ফেলবে।

ফেরাউন সেই বাচ্চাটিকে মেরে ফেলার জন্য বহু পদ্ধতি অবলম্বন করে। বনি ইসরাইলের নতুন ভূমিষ্ঠ কোনো শিশুকেই সে জীবিত রাখত না। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা হজরত মুসা আলাইহিস সালামকে বিস্ময়কর উপায়ে হেফাজত করেন। বাচ্চাকে সিন্দুকে ভরে নীলদরিয়ায় ফেলে দেওয়ার কথা মায়ের দিলে আল্লাহ তায়ালা ঢেলে দেন। ঐ সিন্দুক ভাসতে ভাসতে নীলনদের ঐ পাশে চলে যায়, যা ফেরাউনের রাজপ্রাসাদে গিয়ে লেগেছে। ফেরাউনের স্ত্রী আসিয়া সিন্দুক খুলে তাকে পালকপুত্র হিসেবে গ্রহণ করেন। আর এভাবেই ফেরাউনের রাজত্ব ধ্বংসকারী শিশুটি স্বয়ং বাদশাহর ঘরেই প্রতিপালিত হতে থাকে।

যুবাবয়সে একদিন অনিচ্ছায় এক কিবতিকে হত্যা করে ফেলার কারণে তিনি দেশ ছেড়ে মাদায়েন চলে যেতে বাধ্য হন। সেখানে শুয়াইব আলাইহিস সালামের খেদমতে থেকে তার তরবিয়ত গ্রহণ করেন। পরবর্তীতে তার মেয়ের জামাই হন। এরপর তিনি যখন তুর-পর্বতে আল্লাহ তায়ালার সঙ্গে কথা বলার সৌভাগ্য লাভ করেন, তখন নবুওয়াতপ্রাপ্ত হন। এখানেই তাকে ফেরাউনের কাছে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়।

হজরত মুসা আলাইহিস সালাম হুকুম মোতাবেক ফেরাউনের দরবারে গিয়ে তাওহিদের পয়গাম শোনান এবং বনি ইসরাইলকে গোলামি থেকে মুক্তি দেওয়ার দাবি করেন। ফেরাউনকে তিনি সুস্পষ্ট মুজিজাও দেখান। কিন্তু তারপরও সে তার বিরোধিতা এবং হঠকারিতায় অটল থাকে। ফলে আল্লাহর হুকুমে তিনি বনি ইসরাইলকে নিয়ে মিসর থেকে শামের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। মিসর ও সিনাই উপত্যকার মাঝামাঝি অবস্থিত কয়েক মাইলব্যাপী বিস্তৃত লোহিতসাগর। মুসা আলাইহিস সালাম তার কওমকে নিয়ে অলৌকিকভাবে তা গোপনে পাড়ি দেন। ফেরাউন তাদের পিছু ধাওয়া করতে গিয়ে সদলবলে সমুদ্রে ডুবে মরে।

ফেরাউন থেকে মুক্তি পেয়েই বনি ইসরাইল মুসা আলাইহিস সালামের নাফরমানি করতে শুরু করে। কারণ, শত শত বছর ধরে কিবতিদের সংস্পর্শে থেকে বনি ইসরাইলের ভেতরে মূর্তি-ভাস্কর্য নির্মাণের প্রতি আকর্ষণ তৈরি হয়ে গিয়েছিল এবং তাদের আচরণ-উচ্চারণে বাহ্যিক ও জাগতিক বস্তুর প্রতি

এমন অনুরাগ সৃষ্টি হয় যে, তারা বার বার দৃশ্যমান খোদাকে খুঁজতে থাকে।

লোহিতসাগরে ওঠার পর তারা এক কওমকে মূর্তিপূজা করতে দেখে। ফলে সঙ্গে সঙ্গে মুসা আলাইহিস সালামের নিকট আবেদন করে যে, আমাদের জন্য এমন একজন খোদা বানিয়ে দিন, যাকে দেখা যাবে। তার সামনে আমরা মাথানত করব। মুসা আলাইহিস সালাম তখন ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন, 'তোমরা অত্যন্ত মূর্খ'।[৪০]

হজরত মুসা আলাইহিস সালাম যখন তাওরাত আনার জন্য তুর পর্বতে গমন করেন, তখন তার অনুপস্থিতিতে সামেরি নামের এক দুষ্টলোক বনি ইসরাইলকে মাটির বাছুরের পূজার প্রতি আকৃষ্ট করতে থাকে। হাজার হাজার বনি ইসরাইল এই ফেতনার শিকার হয়ে ধর্মান্তরিত হয়ে যায়। পরবর্তীতে এই নাফরমানির কারণে আল্লাহর নির্ধারিত শাস্তিস্বরূপ তারা একে অপরকে হত্যা করে।

মুসা আলাইহিস সালাম যখন তাওরাত নিয়ে আসেন, তখন কওমের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা সন্দেহ পোষণ করে যে, অদেখা খোদার লিখিত বিষয়ের উপর কেন ঈমান আনব? অথচ ইতোপূর্বেও তারা আল্লাহ তায়ালাকে সরাসরি দেখার দাবি জানিয়েছিল, তখন বজ্রপাতে তারা মারা যায়। মুসা আলাইহিস সালামের কাতর দোয়ার বদৌলতে তারা পুনরায় জীবন ফিরে পায়। তারপরও বনি ইসরাইল শোধরায়নি।

হজরত মুসা আলাইহিস সালামের বাকি জীবন বনি ইসরাইলের আদর্শ ও আখলাক বিশুদ্ধ করার মধ্যেই কেটে যায়। তার দাওয়াতি কার্যক্রমে আপন ভাই হারুন আলাইহিস সালামও সহযোগী হিসেবে ছিলেন। উভয়কেই বার বার কওমের অবমূল্যায়ন এবং নির্বুদ্ধিতার শিকার হতে হয়েছে। বনি ইসরাইল তাওরাতের বহু বিধান কঠিন বলে অস্বীকার করে। এসব কারণে তাদেরকে বহুবার আসমানি হুঁশিয়ারির সম্মুখীন হতে হয়।[৪১]

মুসা আলাইহিস সালাম বনি ইসরাইলকে তাদের পিতৃপুরুষের জন্মভূমি ফিলিস্তিনে নিয়ে যেতে চাচ্ছিলেন, কিন্তু সেখানে আমালিকা নামে একটি মুশরিক কওম শাসন করত। আল্লাহ তায়ালা বনি ইসরাইলকে ঐ মুশরিকদের সাথে জিহাদ করার নির্দেশ দেন। মুসা আলাইহিস সালাম তাদেরকে এই হুকুম শোনালে তারা বলে, 'তুমি আর তোমার প্রভু মিলে তাদের সাথে গিয়ে যুদ্ধ করো, আমরা এখানেই বসে থাকবো'।[৪২]

বনি ইসরাইলের এই গোঁড়ামি ও হঠকারিতার দরুন আল্লাহ তায়ালা কিছুদিন

---

৪০. সুরা আ'রাফ, আয়াত ১০৩-১৩৮; তাফসিরে ইবনে কাসির দ্রষ্টব্য

৪১. তাফসিরে ইবনে কাসির; সুরা বাকারা, আয়াত ৪৯-৬০

৪২. সুরা মায়েদা, আয়াত ২৪

তাদেরকে দেশের নেয়ামত থেকে বঞ্চিত রাখেন এবং মিসর ও শামের মাঝে অবস্থিত 'তীহ' প্রান্তরে ঘুরাতে থাকেন। হজরত মুসা আলাইহিস সালাম তাদের সংশোধনের জন্য সর্বদা ব্যস্ত ছিলেন। এই অবস্থাতেই তিনি ইনতেকাল করেন।[৪৩]

বনি ইসরাইলের নবীগণ : কাজি ও রাজাদের যুগ

হজরত মুসা আলাইহিস সালামের অফাতের পর হজরত ইউশা বিন নুন আলাইহিস সালাম নিজ বংশের ইসলাহ ও সংশোধনের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। বনি ইসরাইল অতীতের ত্রুটি সংশোধন করে হজরত ইউশার ঝান্ডাতলে সমবেত হয় এবং কওমে আমালিকার সঙ্গে জিহাদ করে তাদের রাজধানী 'আরিহা' বিজয় করে। আমালিকা পরাজিত হয়ে বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে। তাদের বহুলোক আফ্রিকায় পাড়ি জমায় আর তাদেরকেই বারবার জাতি বলা হয়।[৪৪]

হজরত ইউশা বিন নুন আলাইহিস সালামের ইনতেকালের পর চারশ' বছর পর্যন্ত বনি ইসরাইলের শাসনভার তাদের আলেমদের হাতে ছিল। এই যুগকে 'কাজিদের যুগ' বলা হয়। এরপরের যুগকে 'রাজা-বাদশাহদের যুগ' বলা হয়। এই যুগের মধ্যে ছিলেন হজরত শামউয়িল, হজরত দাউদ, হজরত সুলাইমান আলাইহিমুস সালাম। তারা ছিলেন নবী ও বাদশাহ। তালুতের নেতৃত্বে জালুতের মতো পরাক্রমশালী দুশমনকে পরাস্ত করে বনি ইসরাইল জর্ডান সাগরের উপকূলীয় এলাকা দখল করে নেয়।

হজরত দাউদ ও সুলাইমান আলাইহিমাস সালামের শাসনামল ছিল বনি ইসরাইলের স্বর্ণযুগ। তাদেরকে তৎকালীন সময়ে বিশ্বের একমাত্র পরাশক্তি হিসেবে গণ্য করা হতো। হজরত সুলাইমান আলাইহিস সালামের শাসন জিন, পক্ষী ও বাতাসের উপরও চলতো। সুলাইমান আলাইহিস সালাম যে সিংহাসনে দরবার বসাতেন, তা নিয়েই তিনি হাজার হাজার মাইল চোখের পলকে উড়ে যেতে পারতেন। শেষবয়সে হজরত সুলাইমান আলাইহিস সালাম বাইতুল মাকদাসে একটি ইবাদতখানা নির্মাণ শুরু করেন। জিনরা এ কাজে শ্রমিক হিসেবে কাজ করে। নির্মাণকাজ চলাকালেই সুলাইমান আলাইহিস সালামের ইনতেকাল হয়ে যায়।[৪৫]

সুলাইমান আলাইহিস সালামের মৃত্যুর পর একবার বনি ইসরাইলের মধ্যে আকিদা এবং চারিত্রিক অবক্ষয় দেখা দেয়। তারা জাবুরের বিষয় বিকৃত করে। তাদের মধ্যে চরিত্রহীন লোকেরা শয়তানি শাস্ত্র, জাদুবিদ্যা, জ্যোতিষবিদ্যায় বড়

---

৪৩. সুরা তহা, সুরা কাসাস, সুরা শুআরা, আলকামিল ফিত তারিখ- ১/১৬৯-১৭২

৪৪. আলকামিল ফিত তারিখ- ১/ ১৭৪-১৭৬

৪৫. আলকামিল ফিত তারিখ- ১/ ২০০-২১০

গর্বের সঙ্গে দীক্ষা নিতে থাকে এবং দাবি করে যে, হজরত সুলাইমান আলাইহিস সালামও জাদুর মাধ্যমে জিনদের কাবু করে রেখেছিলেন (নাউজুবিল্লাহ)।[৪৬]

আকিদা ও মতাদর্শের বিভেদ বনি ইসরাইলকে টুকরো টুকরো করে ফেলে, এবং তাদের চিন্তার মধ্যে বৈপরীত্য আসার সাথে সাথে তাদের রাজনৈতিক ঐক্যও বিনষ্ট হয়ে যায়।

অনারব রাজাগণ

সেই সময়ে পৃথিবীর পূর্বপ্রান্তে অনারব রাজা-বাদশাহরা সীমাহীন শান-শওকতের সঙ্গে রাজত্ব করছিল। ইরানি হুকুমতের পরিধি তো দূরদূরান্ত পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিল।

অনারব রাজাদের চার স্তরে বিভক্ত করা যায়। প্রথম স্তরকে ফিশদাযিয়া বলা হয়। এই স্তরের সকল বাদশাহর উপাধি ছিল ফিশদায। তার অর্থ ন্যায়পরায়ণ। তাদের প্রথম বাদশাহ ছিলেন 'উ শুহাঞ্জ'। বাকিদের মধ্যে তাহমুরুস, জামশিদ, বিওয়ারাসিপ (যাহহাক) আফরিদুন, মিনুচেহের এবং আফরাসিয়াব প্রসিদ্ধ ছিলেন। মিনুচেহের হজরত মুসা আলাইহিস সালামের সমসাময়িক ছিলেন।

দ্বিতীয় স্তরকে কায়ানি বলা হয়। এই স্তরের সকল বাদশাহর নামের শুরুতে 'কায়' শব্দটি যুক্ত করা হতো। তার অর্থ পবিত্র। কায়ানি রাজাদের মধ্যে 'কায়কুবায' (কায়কোবাদ), কায়কাউস, কায়খসরু, লাহুরাসেপ ও দারাবাড়ি বিখ্যাত ছিলেন। কায়কোবাদ হজরত ইউশা বিন নুন আলাইহিস সালামের সমসাময়িক ছিলেন। সম্রাট দারা বাদশাহ সিকান্দারের কাছে পরাজিত হয়ে নিহত হন।

তিন স্তরে ছোট ছোট অঞ্চলের রাজাদের (মুলুকুত তাওয়াইফ)। এ স্তরে ডজন ডজন বাদশাহ ছিল। কায়ানি সালতানাত বিলুপ্তির পর গ্রিকদের তত্ত্বাবধানে ঐ রাজারা ছোট ছোট অঞ্চলে শাসন পরিচালনা করতে থাকে। তাদের মধ্যে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ খান্দান ছিল আশগানি। এই বংশের জনক হলো 'আশগা' (আশ্‌ক), বাদশাহ সিকান্দারের ২৪৬ বছর পর সে মসনদে আসীন হয়। দ্বিতীয় আশগানি বাদশাহর নাম ছিল শাপুর। বাদশাহ সিকান্দারের ৩১৬ বছর পর তার ক্ষমতার অবসান। তার কিছুদিন পরই হজরত ঈসা আলাইহিস সালামের জন্ম হয়। আশগানিরা প্রায় ৩০০ বছর শাসন করে। সর্বশেষ সাসানি যুদ্ধবাজ সরদার আর্‌দ শিরিন বাবাক আশগানি হুকুমত ধ্বংস করে ফেলে।

চতুর্থ স্তরকে সাসানি বলা হয়। আশগানিদের পতনের মধ্যদিয়েই সাসানি হুকুমতের যুগ আরম্ভ হয়। এই হুকুমতের প্রত্যেক বাদশাহকে 'খসরু' (কিসরা) বলা হতো। সাসানিদের প্রথম শাসক আয্‌দ শির বিন বাবাক এবং শেষ-শাসক

৪৬. সুরা বাকারা, আয়াত ১০২

ছিল ইয়াযদিগারদ। শেষ-রাজার মুকুট ও সিংহাসন হজরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর খেলাফতকালে মুসলমানদের দখলে আসে।[৪৭]

বনি ইসরাইলের পতনযুগ এবং দেশান্তর

আমরা এখানে বনি ইসরাইলের ঐ সময়ের কথা আলোচনা করব, যখন তাদের আকিদা-বিশ্বাসের ভিন্নতার কারণে শুধু তারা বিভিন্ন দলে-উপদলে বিভক্তই হয়নি, বরং তাদের ক্ষমতার মধ্যেও বিভক্তি চলে আসে। একদল বাইতুল মাকদাসকে কিবলা মানে। তারা ফিলিস্তিনের দক্ষিণে ইহুদা নামে একটি হুকুমত কায়েম করে। আরেকদল 'সা মুররা পর্বত'কে কিবলা মানে। তারা ফিলিস্তিনের উত্তরে 'ইসরাইল' নামে পৃথক হুকুমত কায়েম করে। এই যুগটাকে বলা হয় 'বিভক্তির যুগ'।

বনি ইসরাইলের মধ্যে তখনও অন্যের গোলামি করার রীতি অবশিষ্ট ছিল। এই সময় হজরত ইরমিয়া আলাইহিস সালাম বনি ইসরাইলের সংশোধনে নিয়োজিত ছিলেন। তিনি তাদেরকে আসন্ন বিপদ সম্পর্ক সতর্ক করেছিলেন। কিন্তু এদের মধ্যে তার কথার কোনো প্রতিক্রিয়া দেখা গেল না। পরিশেষে তাদের বিক্ষিপ্ততার কারণে পারস্য সম্রাট 'লাহুরাসেপ'-এর অধীনস্থ ইরাকের শাসক বুখতু নাসার (প্যারিচাদ নেজার) শামের দিকে অগ্রসর হতে থাকে। জাজিরাতুল আরবের সীমানায় প্রবেশ করার পর বুখতু নাসার আরব গোত্রগুলোর সরদারদের থেকে সহায়তা পায়, তাদের মধ্যে কুরাইশের সম্মানিত প্রপিতামহ মাআদ বিন আদনানও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। বুখতু নাসার ফিলিস্তিনে আক্রমণ করে বাইতুল মাকদাস বিরান করে দেয়, তাওরাতের কপি পুড়িয়ে ফেলে, সুলাইমান আলাইহিস সালামের ইবাদতখানা ধ্বংস করে দেয়, হাজার হাজার ইসরাইলিকে হত্যা করে, প্রায় ৭০ হাজার লোককে গ্রেফতার করে ব্যাবিলন নিয়ে যায়। আরব গোত্রগুলোর সহযোগিতার প্রতিদান হিসেবে কিছু গোত্রকে ইরাকের সীমান্তে বসবাসের সুযোগ দেয়। এটি মুসা আলাইহিস সালামের ইনতেকালে ৯৯৯ বছর পরের ঘটনা।[৪৮] এই ঘটনার পাঁচশো পঁচাশি বছর পর হজরত ঈসা আলাইহিস সালাম জন্মগ্রহণ করেন।

সত্তর বছর পর্যন্ত বাইতুল মাকদাস বিরান থাকে। তারপর যখন বাহমান (কুর্শ) পারস্যের সম্রাট হয়, তখন সে নির্বাসিত বনি ইসরাইলকে ফিলিস্তিনে প্রত্যাবর্তনের অনুমতি দেয়। পাশপাশি বাইতুল মাকদাসও পুনর্নির্মাণ করে। ব্যাবিলন থেকে আগত লোকদের মধ্যে হজরত উজাইর আলাইহিস সালামও

---

৪৭. আলমুখতাসার ফি আখবারিল বাশার- ১/৪৭-৫২

৪৮. আলমুখতাসার ফি আখবারিল বাশার- ১/৩১-৩২

ছিলেন। তারা নিজেদের স্মৃতিশক্তির সাহায্য নিয়ে পুনরায় তাওরাত লিপিবদ্ধ করায়। এভাবেই ইহুদিদের শরিয়তের উৎস দ্বিতীয়বার পুনরুদ্ধার হয়।

ইহুদিরা বহুদিন পর্যন্ত পারস্য সাম্রাজ্যের অধীনে থাকে। এমনকি গ্রিক-বিজেতা গ্রেট আলেকজান্ডার এশিয়া-অভিমুখী হয় এবং বুখতু নাসার ফিলিস্তিন আক্রমণের ৪৩৫ বছর পর শাম, ইরাক ও ইরান দখল করে কায়ানি সাম্রাজ্যের পরিসমাপ্তি ঘটান। এভাবে ইহুদিরা গ্রিক বাদশাহদের গোলামে পরিণত হয়, যাদেরকে ফিলিস্তিনে 'হিরুডোস' বলা হয়। এমন লাঞ্ছনা এবং অপমানকর সময়েও বনি ইসরাইলের মধ্যে নবী-আগমনের ধারা অব্যাহত ছিল। কিন্তু তাদের প্রচেষ্টা কোনো ফল বয়ে আনেনি। ইহুদি আলেমরা তাওরাতকে প্রবৃত্তির চাহিদা অনুযায়ী বিকৃতির মাধ্যমে নবীগণের হেদায়েত এবং দাওয়াতি প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে দেওয়ার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছিল। উপরন্তু নবীগণকে ইউরোপের শাসকদের নিষেধাজ্ঞা এবং নির্যাতনের শিকার হতে হচ্ছিল।

হজরত ঈসা আলাইহিস সালামের জন্মের চৌষট্টি বছর পূর্বে রোমান শাসক পাম্পেই গ্রিকদের পরাজিত করে ফিলিস্তিন দখল করে নেয়। তখন ইহুদিরা গ্রিকদের থেকে রোমানদের গোলামিতে চলে আসে। রোমানদের যুগে হজরত জাকারিয়া আলাইহিস সালাম এবং হজরত ইয়াহইয়া আলাইহিস সালাম আগমন করেন। উম্মতের প্রতি অতিশয় দরদি নবীগণ নিজ কওমের হেদায়েত এবং সংশোধনের লক্ষ্যে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা ব্যয় করেন। কিন্তু হজরত জাকারিয়া আলাইহিস সালামের উপর ইহুদিরা অপবাদ আরোপ করে তাকে করাত দিয়ে চিঁড়ে ফেলে। আর হজরত ইয়াহইয়া আলাইহিস সালামকে রোমান শাসক এই অপরাধে শহিদ করে দেয় যে, সে ইয়াহইয়া আলাইহিস সালামের ভাতিজিকে বিয়ে করতে চাচ্ছিল, আর তিনি বাধা দিয়েছিলেন।[৪৯]

হজরত ঈসা আলাইহিস সালাম

হজরত ইয়াহইয়া আলাইহিস সালামের জন্মের ছ'মাস পর হজরত ঈসা আলাইহিস সালাম দুনিয়াতে আগমন করেন। আল্লাহ তায়ালা তাকে তার কুমারী মা হজরত মারিয়াম রাদিয়াল্লাহু আনহার গর্ভ থেকে পিতা ছাড়া সৃষ্টি করেছেন। ত্রিশ বছর বয়সে তিনি নবুওয়াতপ্রাপ্ত হন। তিনি ফিলিস্তিনের বিভিন্ন শহর-নগর ঘুরে বনি ইসরাইলকে দীনের দাওয়াত দিতে থাকেন। আল্লাহ তাকে ইনজিল শরিফ দান করেন। এই আসমানিগ্রন্থ প্রজ্ঞা ও নসিহতে ভরপুর ছিল। কিন্তু অধিকাংশ ইহুদি ইনজিল অস্বীকার করেই ক্ষান্ত হয়নি, বরং হজরত ঈসাকে জাদুকর পর্যন্ত আখ্যা দিয়েছে এবং স্থানীয় রোমান সরকারের সাথে মিলে তাকে

---

৪৯. আলমুখতাসার ফি আখবারিল বাশার- ১/৩৩-৩৪

হত্যা করার ষড়যন্ত্র এঁটেছে। আল্লাহ তায়ালা তৎক্ষণাৎ তাকে তাদের চক্রান্ত থেকে বাঁচিয়ে আসমানে উঠিয়ে নিয়ে যান। ওদিকে হজরত ঈসা আলাইহিস সালামের সন্ধানদাতা 'ইহুদা' আল্লাহর আদেশে অবিকল নবীর চেহারাকৃতি পেয়ে যায়, ফলে ইহুদিরা তাকেই নবী ভেবে গ্রেফতার করে নিয়ে যথারীতি মামলা পরিচালনা করে। তারপর আদালতের ফয়সালা অনুযায়ী শূলে চড়ানো হয়।[৫০]

ইহুদিরা সে সময় থেকেই ভুল ধারণায় আছে যে, তারা হজরত ঈসা আলাইহিস সালামকে হত্যা করেছে; অথচ কুরআন কারিমে সুস্পষ্ট করে বলা হয়েছে, 'তারা ঈসাকে হত্যা করেনি, শূলেও চড়ায়নি।'[৫১]

ইয়াসরিবে ইহুদিদের আগমন

হজরত ঈসা আলাইহিস সালামের পর ইহুদিদের হঠকারিতা এবং অবাধ্যতায় নতুন মাত্রা যোগ হয়। তারা অন্যদের কর্তৃত্ব থেকে বের হয়ে আসার জন্য এবং রোমানদের পরাজিত করার জন্য মাঝেমধ্যেই বিভিন্ন চক্রান্তে লিপ্ত হতো। তাদের কর্মকাণ্ডে অতিষ্ঠ হয়ে ৭০ ঈসাব্দে রোমান শাসক টিটুস ইহুদিদের গণহত্যার নির্দেশ দিয়ে সুলাইমানি ইবাদতখানা ধ্বংস করে দেয়। ৫১৩ ঈসাব্দে আরেক শাসক এডরিয়ান তাদের উপর আরো অধিক আক্রোশ ঝাড়ে এবং বাইতুল মাকদাস থেকে তাদেরকে বের করে দেয়। ইহুদিরা তখন বিক্ষিপ্ত হয়ে বিভিন্ন স্থানে বসতি স্থাপন করে। তন্মধ্যে কিছু লোক জাজিরাতুল আরবে এসে হিজাজের 'ইয়াসরিব' শহরে বসতি স্থাপন করে।

খ্রিষ্টবাদে ফাটল

ঈসা আলাইহিস সালামকে আসমানে উঠিয়ে নেওয়ার পর তার মুষ্টিমেয় অনুসারীর অনেকেই মারা যায়। আর যারাও বেঁচে ছিল, তারা রোমান শাসকদের অত্যাচার ও নজরদারির কারণে খ্রিষ্টবাদের খুব বেশি প্রচার-প্রসার করতে সাহস পায়নি। অনেক অনুসারী তাদের দীন বাঁচিয়ে জঙ্গলে গিয়ে বৈরাগ্যের জীবন বেছে নেয়।

এক ব্যক্তি জোরেশোরে খ্রিষ্টধর্মের প্রচার-প্রসার করে যাচ্ছিল। তার আসল নাম সাউল। কিন্তু সে পল নামে খ্যাতি লাভ করে। সে ছিল কট্টর ইহুদি। হজরত ঈসা আলাইহিস সালামের জীবদ্দশায় তার শক্ত বিরোধিতা করত। কিন্তু হজরত ঈসা আলাইহিস সালামকে উঠিয়ে নেওয়ার কিছুদিন পর থেকেই সে তার উপর ঈমান আনয়নের দাবি করতে থাকে। তারপর সে এমন কিছু নিয়মনীতি প্রণয়ন করে, যা ঈসা আলাইহিস সালামের শিক্ষা ও শরিয়তের

---

৫০. আলকামিল ফিত তারিখ- ১/ ২৭৪-২৮৬

৫১. সুরা মায়েদা, আয়াত ১৫৭

পরিপন্থি। সেই প্রথম হজরত ঈসা, জিবরাইল এবং আল্লাহ মিলে তিন খোদার মতবাদ সৃষ্টি করে। আল্লাহকে পিতা এবং ঈসা আলাইহিস সালামকে তার সন্তান বানায়। ইহুদিদের মতাদর্শ অনুযায়ী সেও হজরত ঈসা আলাইহিস সালামের শূলে চড়ানোর মতবাদ প্রচার করে। হজরত ঈসার প্রকৃত অনুসারীরা তার কথা বিশ্বাস করতেন না। পুলিস এই আকিদা প্রচার করেই ক্ষান্ত হয়নি, বরং সঙ্গে এ কথাও চাওড় করে যে, খোদা তার ছেলেকে শূলে চড়িয়ে তার অনুসারীদের পূর্বের সকল গুনাহের প্রায়শ্চিত্ত করেছেন।

ঈসা আলাইহিস সালামের সত্যিকার হাওয়ারি তথা সাথিরা পুলিসের মতবাদের ঘোর বিরোধিতা করেন। এভাবে খ্রিষ্টধর্ম একাধিক দলে বিভক্ত হয়ে যায়। পুলিসের মতবাদ সবচেয়ে বেশি খ্যাতি লাভ করে। সে নিজেই ইউরোপ গিয়ে তার মতবাদের প্রসার করে। তার মতাদর্শ যেহেতু রোমান ও গ্রিকদের ধারণার কাছাকাছি ছিল, ফলে গোপনে গোপনে মানুষ এই মতাদর্শ গ্রহণ করতে থাকে।

পুলিসের পর তার ভক্তরা প্রচার-প্রসারের কাজ অব্যাহত রাখে। ধীরে ধীরে এই মতবাদই খ্রিষ্টধর্মের স্থান দখল করে। এটিই খ্রিষ্টধর্মের নামে শাম, মিসর, এশিয়া, কনস্টান্টিনোপল এবং রোমে প্রসার লাভ করে।

চতুর্থ খ্রিষ্টাব্দের শুরুতে নতুন সৃষ্ট খ্রিষ্টধর্ম রোমসম্রাট কুস্তানতিন বিন কুসতানস-এর পৃষ্ঠপোষকতা অর্জন করে। এই সম্রাট বৃদ্ধ হয়ে পড়েছিল। সাম্রাজ্যের কর্ণধাররা তার প্রতি ক্ষুব্ধ হয়ে আরেকজন শাসক খুঁজতে থাকে। তখন বাদশাহ কূটনীতির আশ্রয় নিয়ে খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণের ঘোষণা দেন। ফলে গোপনে খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ-করা লাখো মানুষ বৃদ্ধ সম্রাটকে বাঁচাবার জন্য ঢাল হয়ে দাঁড়ায়। তখন তিনি সেসব রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের মোকাবেলা করেন, যারা প্রাচীন গ্রিক কল্পকাহিনিতে বিশ্বাসী ছিল। তাদেরকে পরাজিত করে নতুন ধর্মের পাল্লা ভারি করেন।[৫২]

৩২৫ খ্রিষ্টাব্দে নিকিয়াতে (বর্তমান তুরস্কের একটি নগরী) এই নতুন ধর্মের আলেমদের একটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। এতে ত্রিত্ববাদ, প্রায়শ্চিত্ত এবং খোদা ও ঈসার মাঝে পিতা-পুত্রের সম্পর্ককে খ্রিষ্টধর্মের মৌলিক আকিদা হিসেবে সাব্যস্ত করা হয়। পাশাপাশি ইনজিলের বিকৃত কপিগুলোকেই আসমানি কিতাব হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। অথচ তার মৌলিকত্বের কোনো ভিত্তি নেই।

এভাবেই খ্রিষ্টধর্ম আল্লাহর তাওহিদ ও একত্ববাদ থেকে দূরে সরে শিরকি আকিদার সমষ্টিতে রূপ নেয়। শুধু নাসিরিয়া (ঘধুধৎবহবং) নামক একটি ছোট্ট দল রয়ে যায়, যারা রোম সরকারের জবরদস্তি, পাদরিদের বিভ্রান্তি এবং ইহুদিদের

---

৫২. আলকামিল ফিত তারিখ- ১/ ২৯৮-২৯৯

চালবাজির পরেও নিজেদের মূল আদর্শে অটল থাকে। তা ছাড়াও কিছু খ্রিষ্টান সন্ন্যাসী ও বুজুর্গ ব্যক্তিও বিশুদ্ধ আকিদার অধিকারী ছিলেন। কিন্তু ইহুদিদের ভয়ে তারা নিজেদের চিন্তাধারা গোপন রাখতেন। তাদের মধ্যে একজন ছিলেন নাজরানের জনৈক বুজুর্গ, যিনি আবদুল্লাহ বিন তামির নামক এক যুবকের হেদায়েতের মাধ্যম হন। আর আবদুল্লাহ বিন তামিরের প্রচেষ্টায় গোত্রের সকল লোক মুসলমান হয়ে যায়। কিন্তু স্থানীয় ইহুদি শাসক ইউসুফ যু-নাওয়াস ঐসব নতুন মুসলমানকে আগুনের পরিখায় পুড়িয়ে শহিদ করে দেয়। এই ঘটনা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়াতের সত্তর বছর পূর্বের।[৫৩]

এরপর বিশুদ্ধ খ্রিষ্টধর্ম একেবারেই নিভে যায়। হ্যাঁ, মক্কাতে খ্রিষ্টান আলেম ওরাকা বিন নাওফেলের মতো এক-দুজন খ্রিষ্টান ছিলেন, যারা অন্তরে হেদায়েতের আলোকরশ্মির বদৌলতে একটি আলোকিত ভোরের অপেক্ষায় প্রহর গুনছিলেন।

---

৫৩. তাফসিরে ইবনে কাসির; সুরা বুরুজ

হজরত ঈসা আ. ও নবীজির মধ্যভাগে আরবের অবস্থা

জাজিরাতুল আরব এই পুরো সময়ে পৃথিবীর সকল সভ্যতা থেকে ভিন্ন ছিল। এখানে বিভিন্ন মতাদর্শের দ্বন্দ্ব ছিল না, ছিল না বহিঃশক্তির ঠিকাদারি। আরব মরুভূমিতে বসবাসকারীরা প্রাচীন সভ্যতা-সংস্কৃতি নিয়ে সাদাসিধা জীবনযাপন করত। তারা কোনো বিদেশি শক্তির কর্তৃত্ব পছন্দ করত না। অন্য কারো সভ্যতা ও মতাদর্শ গ্রহণেও তাদের আগ্রহ ছিল না।

জাজিরাতুল আরবের ভৌগোলিক অবস্থানও ছিল এমন যে, বহিঃশক্তির প্রভাব খুব কমই অনুভূত হতো। আরবের পূর্বে পারস্য-উপসাগরীয় তীর, এটিই ইরান থেকে আরবকে আলাদা করে রেখেছে। পশ্চিমে আছে লোহিতসাগর, এটি আফ্রিকাকে পরস্পর থেকে পৃথক করে রেখেছে। দক্ষিণে আছে বিশাল ভারতসাগর, এটি পাড়ি দিয়ে ভারত উপকূলে ভেড়া আত্মঘাতী সিদ্ধান্তই বটে। জাজিরার উত্তর দিকে রয়েছে একটি শুষ্ক ভূমি ও চতুর্দিকে পানি। শাম এবং রোমসাগরের মাঝখানে প্রতিবন্ধক হিসেবে আছে এই শুষ্কভূমি। এর ফলে ইউরোপের কোনো জাহাজ সরাসরি আরব উপকূলে ভিড়তে পারত না।

এই জাজিরাতে হজরত ইসমাইল আলাইহিস সালামের পর মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পূর্বে কোনো নবী প্রেরিত হওয়ার সংবাদ পাওয়া যায় না। হ্যাঁ, তার পার্শ্ববর্তী এলাকাগুলোতে নবী ও রাসুলগণের আগমন অব্যাহত ছিল। এ সময় আরব মরুভূমিতে বসবাসকারীরা (যদিও শিরকি কথাবার্তা ও কল্পকাহিনি তাদের মধ্যে ঢুকে পড়ার কারণে পরিবর্তন হওয়াটা সময়ের ব্যাপার ছিল মাত্র) হজরত ইবরাহিম আলাইহিস সালাম এবং হজরত ইসমাইল আলাইহিস সালামের দীনের কিয়দংশ অন্তর দিয়ে গ্রহণ করে নিয়েছিল। ইয়েমেন ও শামের মাঝামাঝি মরুভূমিতে বিচরণকারীরাও তা প্রত্যক্ষ করত।

আরব সম্প্রদায় হজরত নুহ আলাইহিস সালামের ছেলে সামের বংশধর। এদের সবচেয়ে প্রাচীন সম্প্রদায় হলো 'আরবে বায়িদা', যারা হাজার বছর পূর্বেই বিলীন হয়ে যায়। তাদের বংশধর আদ-সামুদ, তাস্‌ম এবং জাদিসের মতো কয়েকটি সম্প্রদায় ছাড়া ইতিহাসে কারো নাম সংরক্ষিত নেই। আর দ্বিতীয় সম্প্রদায় ছিল 'আরবে আরিবা'। এরা কাহতান বিন আবির-এর বংশধর। বিশুদ্ধ ভাষা, বাগ্মিতা ও অলংকারিত্বের কারণে তাদেরকে 'আরিবা' তথা সুস্পষ্টভাষী হিসেবে অভিহিত করা হতো।

তাদের মূল আবাস ছিল ইয়েমেন ও তার প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলোতে। জাজিরাতুল আরবের প্রকৃত ও প্রাচীন বাসিন্দা মূলত এই লোকগুলোই। আরব হওয়ার কারণে তাদের বংশগুলোই সবচেয়ে সংরক্ষিত ছিল। তারা বড় বড় হুকুমত এবং নগরী আবাদ করেছিল, যেগুলোর আচার-স্বভাবের বর্ণনা প্রাচীন আরব-ইতিহাসে সংরক্ষিত আছে। আরবের তৃতীয় সম্প্রদায় ছিল মুসতা'রিবা (মুতাআররিবা)। এই সম্প্রদায়ের লোকেরা হজরত ইসমাইল আলাইহিস সালামের বংশধর ছিল।[৫৪]

হজরত ইসমাইল আলাইহিস সালামের বংশধর

হজরত ইসমাইল আলাইহিস সালাম কাহতানি গোত্রের বনু জুরহুমের সরদার মুদাদ-এর কন্যাকে বিয়ে করেছিলেন। তার বারজন পুত্রসন্তান জন্ম নেয়। তারমধ্যে নাবিত এবং কাইদার অসাধারণ যোগ্যতাসম্পন্ন ছিল। নাবিত হজরত ইসমাইল আলাইহিস সালামের পরে কাবা শরিফ এবং জমজম ঝরনা দেখাশোনার দায়িত্ব পালন করত। হজরত ইসমাইল আলাইহিস সালামের বংশের মধ্যে আল্লাহ তায়ালা অনেক বরকত দেন। জনসংখ্যা এত দ্রুত বৃদ্ধি পায় যে, মক্কার ভেতরে জায়গা সংকুলান না হওয়ায় তাদের বাইরে এসে বসতি স্থাপন করতে হয়। এই বংশে আদনানের জন্ম হয়। আদনান আরব-ইতিহাসে খ্যাতি ও যোগ্যতার দিক থেকে শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তি ছিলেন। তার বংশধারা সর্বাধিক সংরক্ষিত বলে গণ্য করা হয়। আদনানের পরই আরবের মধ্যে বনু কাহতান এবং বনু আদনান আলাদা আলাদা গোত্রের হিসেবে পরিগণিত হয়। সময়ের আবর্তনের সাথে সাথে তাদের মাঝে বিভাজন মজবুত হতে থাকে। এমনকি পারস্পরিক শত্রুতাও মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। প্রত্যেকের যুদ্ধসাজও ভিন্ন ছিল। কাহতানিরা হলুদ পতাকা এবং হলুদ পাগড়ি ব্যবহার করত আর আদনানিরা লাল পতাকা এবং লাল পাগড়ি পরত।[৫৫]

আদনানের সন্তানদের মধ্যে মাআদ বিন আদনান অনেক সুনাম কুড়িয়েছেন। তার যুগেই শামদেশে বুখতু নাসারের আক্রমণ হয়। এতে আরবরাও অনিচ্ছায় তার সহযোগী হয়। মাআদের ছেলেদের মধ্যে মুযার-এর নাম ইতিহাসের পাতায় উজ্জ্বল হয়ে থাকে। তার বংশে ফিহ্‌র বিন মালিক জন্ম নেয়। তার সন্তানেরাই কুরাইশ নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে।[৫৬]

---

৫৪. নিহায়াতুল আরাব ফি মা'রিফাতি আনসাবিল আরাব- কালকাশানদি- পৃষ্ঠা ১১-১৩ (দারুল কিতাব আললুবনানিয়য়িন' সংস্করণ)

৫৫. ফাজরুল ইসলাম, আহমাদ আমিন- পৃষ্ঠা ৬; (দারুল কিতাবিল আরাবি সংস্করণ)

৫৬. সিরাতে ইবনে হিশাম- ১/৯০-৯৫; (আলবাবি আলহালাবি সংস্করণ), আত-তারিখুল ইসলামি আলআম- আলি ইবরাহিম হাসান- পৃষ্ঠা ২৫ (মাতবাআতুন নাহযাতিল মিসরিয়্যাহ সংস্করণ)

জাজিরাতুল আরবের মধ্যভাগে বসবাসরত আরবদের পরিচালনা-পদ্ধতি সর্বোচ্চ গোত্রপতি কেন্দ্রিক ছিল। কোনো সময় বিশেষ উদ্দেশ্যে একাধিক গোত্র-ও একতাবদ্ধ হয়ে যেত। নিয়মতান্ত্রিক সরকার-ব্যবস্থা জাজিরাতুল আরবের পার্শ্ববর্তী এলাকাগুলোতে প্রচলিত ছিল। দক্ষিণ আরবে ইয়েমেনের হুকুমত, উত্তর-পূর্বে হেরাতের শাসন এবং উত্তর-পশ্চিমে গাসসানের হুকুমত চলত। এই হুকুমতগুলো কিছু বিশেষ গোত্রের অধীনে পরিচালিত হয়ে আসছিল। যেমন : ইয়েমেন কাহতান বংশের সাবাগোষ্ঠীর তত্ত্বাবধানে শাসিত হচ্ছিল। গোত্রগুলো নেতৃত্বের ক্ষেত্রে কিছু প্রসিদ্ধ বংশের অধীনে ছিল। যেমন বনু আদনানের নেতৃত্ব কুরাইশের হাতে ছিল।[৫৭]

কওমে সাবা, হিময়ারের রাজা এবং তাবাবিয়া

জাজিরাতুল আরবের দক্ষিণে সাবাগোষ্ঠীর রাজত্ব আট শতাব্দীকাল (৯৫০-১১৫ খ্রিষ্টপূর্ব) পর্যন্ত বহাল থাকে। এই রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন কাহতান বিন আবির। নুহ আলাইহিস সালামের সন্তানদের মধ্যে তিনিই প্রথম ব্যক্তি, যিনি ইয়েমেন আবাদ করে নিজের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্তীতে তার প্রপৌত্র 'সাবা' এসে ধারাবাহিক বিজয়ের মাধ্যমে বিশাল সাম্রাজ্য গড়ে তোলেন। তিনিই মাআরিবে জীবিকার জন্য এক আশ্চর্য বাঁধ নির্মাণ করেন, যার থেকে সত্তরটি নদী বয়ে যেত। আর এটা খুব সুপ্রশস্ত এবং ফলবান প্রমাণিত হয়। যার ফলে সাবা রাজ্য উন্নতি ও সমৃদ্ধির জোয়ারে ভাসতে থাকে।

সাবার ছেলে হিময়ার ছিল পিতার স্থলাভিষিক্ত। তার ঔরসেই সাবার কয়েকজন প্রসিদ্ধ বাদশাহর জন্ম হয়। সাবার একটি ছোট গোত্রের প্রথম তুব্বা হারেস অনেক খ্যাতি অর্জন করে। তুব্বারই ছেলে সুআব পূর্ব-পশ্চিমের বড় বড় সাম্রাজ্য জয় করে যুলকারনাইন উপাধিতে প্রসিদ্ধি লাভ করে। হজরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুর অভিমত অনুযায়ী তিনিই পবিত্র কুরআনে উল্লিখিত যুলকারনাইন।

ধীরে ধীরে কওমে সাবার রেনেসাঁ ও অগ্রগতি হতে থাকে। চাষাবাদের পাশাপাশি ব্যবসা-বাণিজ্যেও তারা সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। জলে-স্থলে ইয়েমেন থেকে শাম পর্যন্ত তাদের বাণিজ্যকাফেলা দিয়ে ভরে যায়। হিন্দুস্তান এবং পূর্বাঞ্চল থেকে মালপত্র এসে ইয়েমেনের উপকূলে ভিড়ত। সেখান থেকে ইয়েমেনি ব্যবসায়ীরা পণ্য সামগ্রী শামে নিয়ে খুব লাভজনক ব্যবসা করত।[৫৮]

---

৫৭. আলমুখতাসার ফি আখবারিল বাশার- ১/৬৬, ৬৭

৫৮. আলমুখতাসার ফি আখবারিল বাশার- ১/৬৬, ৬৭

সাবার রাজবংশের নবম পুরুষে গিয়ে বিলকিস বিনতে শুরাহবিল সাবা-রাজ্যের ক্ষমতা গ্রহণ করে এবং পূর্ণ বিশ বছর খ্যাতির সঙ্গে রাজত্ব করে। কওমে সাবা সূর্যপূজারি ছিল। কিন্তু বিলকিস হজরত সুলাইমান আলাইহিস সালামের হাতে ইসলাম গ্রহণ করে। পবিত্র কুরআনে তার ঘটনার বর্ণনা রয়েছে।[৫৯]

কওমে সাবা সামগ্রিকভাবে নিজেদের ভ্রান্ত আকিদা-বিশ্বাসে অটল থাকে। সম্পদের প্রাচুর্য ও সুখ-সমৃদ্ধির ফলে তারা গাফলতি ও অকৃতজ্ঞতার ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়। সাবাগোষ্ঠীর প্রবাস-নিবাসে আরাম-আয়েশের উপকরণ এত সহজলভ্য ছিল যে, তারা অকৃতজ্ঞতাবশত আকাঙ্ক্ষা করতে থাকে যে, সকল নেয়ামত তারা কষ্ট ও পরিশ্রম করে অর্জন করবে। পরিশেষে তাদের উপর এই অকৃতজ্ঞতার শাস্তি আপতিত হয়। তাদের বিখ্যাত মাআরিব বাঁধ ভেঙে যায়। সাম্রাজ্যের রাজধানী মাআরিব পানিতে ডুবে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। এই বাঁধভাঙা বন্যা সাবা সাম্রাজ্যের বসতি, ক্ষেত-খামার তছনছ করে ফেলে। ফলে লোকজন দেশ ছাড়তে বাধ্য হয়। এভাবেই সাবা সাম্রাজ্যের পরিসমাপ্তি ঘটে।[৬০]

সাবা সাম্রাজ্য ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পর ইয়েমেনে সাবাগোষ্ঠীর বিভিন্ন সরদার ছোট ছোট দুর্গ এবং বস্তিতে পৃথক পৃথক হুকুমত কায়েম করে। তন্মধ্যে 'তাবাবিয়া সাম্রাজ্য' ধীরে ধীরে শক্তিশালী হয়ে ওঠে। খ্রিষ্টপূর্ব একশ' পনেরো বছর পর্যন্ত এই সাম্রাজ্য অটুট থাকে। এই হুকুমতের বাদশাহদের 'তুব্বা বলা হতো। লোহিতসাগর থেকে হাদরামাউত পর্যন্ত তাদের রাজ্য বিস্তৃত ছিল। পরবর্তীতে তার পরিধি ইয়ামামা, হিজাজ এমনকি ইরান, খোরাসান এবং মধ্য-এশিয়া পর্যন্ত বৃদ্ধি পায়। সাবার রাজাদের বিপরীতে তাবাবিয়া রাজাদের দেশজয় এবং সেনাবাহিনী গড়ে তোলার প্রতি আগ্রহ বেশি ছিল।

তাবাবিআ শাসকদের মধ্যে শিমর, আবু কারিব, তুব্বা (মধ্য তুব্বা), তুব্বা বিন হাসসান (কনিষ্ঠ তুব্বা) এবং হারিস বিন আমর অনেক প্রসিদ্ধ ছিল। হারিস বিন আমর ইহুদিধর্ম গ্রহণ করায় ইয়েমেনের রাষ্ট্রধর্ম ইহুদি করা হয়। আর এজন্যই তার বংশের রাজা ইউসুফ যু-নাওয়াস হজরত ঈসা আলাইহিস সালামের সহিহ আকিদায় বিশ্বাসী নাজরানের হাজার হাজার নগরবাসীকে আগুনের পরিখায় নিক্ষেপ করে জ্বালিয়ে দেয়। এই ভয়ানক নিপীড়নই হিময়ারের রাজত্ব একেবারে নিশ্চিহ্ন করে দেয়। হাবশিদের আক্রমণে রাজা ইউসুফ যু-নাওয়াসের রাজত্ব উলটে যায়। হজরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুর বর্ণনা অনুযায়ী এটি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্মের প্রায় সত্তর বছর পূর্বের ঘটনা।[৬১]

৫৯. তাফসিরে ইবনে কাসির; সুরা নামল, আয়াত ২০-৪৪

৬০. তাফসিরে ইবনে কাসির; সুরা সাবা, আয়াত ১৫-১৯

৬১. আলকামিল ফিত তারিখ- ১/৩৮৮-৩৯২

সে হিসেবে বনু হিময়ারের শাসনকাল খ্রিষ্টপূর্ব ১১৫ সাল থেকে ৫০০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত ছয়শ' পনেরো বছর হয়। এ সময়ে ছাব্বিশ জন বাদশাহ রাজত্ব করে।[৬২]

ইয়েমেনে হাবশিদের কর্তৃত্ব এবং সাইফ বিন যি-ইয়াযানের আজাদি আন্দোলন

বনু হিময়ারের পর ইয়েমেনে ৭২ বছর হাবশিদের হুকুমত চলে। তাদের চার জন রাজা রাজত্ব করেন। প্রথম জন- আরিয়াত, দ্বিতীয়- কাবাশরিফ আক্রমণকারী আবরাহা; এই দু'জনের শাসনকাল অনেক দীর্ঘ হয়। আবরাহার পর তার দুই ছেলে ইয়াকসুম এবং মাসরূক পালাক্রমে শাসক হয়। উভয়ই স্বল্পসময় রাজত্ব করে। স্মর্তব্য, ইয়েমেনের এই হাবশি শাসকদের স্বয়ংসম্পূর্ণভাবে ক্ষমতায় আরোহণের কোনো সুযোগ ছিল না। বরং তারা হাবশার রাজাকর্তৃক নিয়োজিত ইয়েমেনের গভর্নর ছিল। হাবশার বাদশাহ খ্রিষ্টান হওয়ায় তাকে কায়সারের অধীনস্থ অঙ্গরাজ্য বলা হতো।

অবশেষে ইয়েমেনের এক গোত্রপতি সাইফ বিন যি-ইয়াযান হাবশিদের বিরুদ্ধে আজাদি আন্দোলন গড়ে তোলে। আরবরা তাকে সমর্থন জানায়। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্মের দু'বছর পর সাইফ বিন যি-ইয়াযানের হাতে হাবশি-শাসনের সমাপ্তি ঘটে।[৬৩]

---

৬২. আলমুখতাসার ফি আখবারিল বাশার- ১/৬৮

৬৩. আলকামিল ফিত তারিখ- ১/৩৯৪; তারিখে ইবনে খালদুন- ২৭৩

জাহিলিযুগে বিভিন্ন আরব রাজত্ব

হেরাত রাজ্য

প্রাচীন কুফার দক্ষিণে তিন মাইল (পৌনে পাঁচ কিলোমিটার) দূরে অবস্থিত বর্তমান নাজাফ-ই 'হেরাত' নামে প্রসিদ্ধ ছিল। গ্রেট সিকান্দারের আক্রমণের পর 'তানুখি' আরবরা নিজেদের হুকুমত কায়েম করে নিতে সক্ষম হয়। তানুখি আরব হলো ইয়েমেন থেকে হিজরতকারী বাহরাইন শরণার্থী। সেখানে তারা তানুখি নামে পৃথক পৃথক গোত্র গড়ে তুলে খ্যাতি লাভ করে।

গ্রেট সিকান্দারের আক্রমণের পর যখন ইরাক ও পারস্যে তাওয়ায়িফুল মুলুকির রাজত্ব শুরু হয়, তখন এই আরবরা সুযোগ পেয়ে জাজিরাতুল আরবের সীমান্তে অবস্থিত ইরাকের নগরীগুলো কব্জা করার চেষ্টা চালায়। এভাবে শুধু হেরাত নয়, আনবার থেকে নিয়ে ফুরাত নদী পর্যন্ত তারা দখল করে নেয়। আরব হেরাত যেহেতু পারস্য ও রোমান সাম্রাজ্যের সীমান্ত-ঘেঁষা ছিল, তাই এই দুই পরাশক্তির সভ্যতা-সংস্কৃতির প্রভাব তাদের উপর থাকে। ফলে কিছু তানুখি আরব খ্রিষ্টান হয়ে যায়। তাদের বৈশিষ্ট্য ছিল তারা নামের সাথে আবদ যুক্ত করত। যেমন : আবদুল মাসিহ, আবদু ইয়ালিল, আবদুল্লাহ ইত্যাদি। এজন্য তাদেরকে 'উব্বাদ'ও বলা হতো।[৬৪]

ঐ হুকুমতের প্রতিষ্ঠাতা দাওস গোত্রের একজন উঁচু হিম্মতওয়ালা ব্যক্তিত্ব ছিল মালিক বিন ফাহম। সে নিজের বাসভবন এবং বাগবাগিচা সবই করে হেরাতে; কিন্তু হুকুমতের রাজধানী বানায় আনবারকে।[৬৫]

তারই ছেলে জাজিমা আল-আবরাশ সাহসিকতা, বুদ্ধিমত্তা ও বিচক্ষণতার বদৌলতে আরবদের নিকট প্রবাদপুরুষে পরিণত হয়। সে ষাট বছর হেরাতে রাজত্ব করেন। ঐতিহাসিকদের মতে এই জাজিমা সবচেয়ে বুদ্ধিমান, সমরকুশলী এবং দূরদর্শী আরব বাদশাহ ছিল।[৬৬]

আল-জাজিরায় আরব শাসক আমর বিন যারিবের সঙ্গে জাজিমার যুদ্ধ খুব প্রসিদ্ধি পায়। এ যুদ্ধে আমর নিহত হলে তার কন্যা 'যাব্বা' পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য একটি কৌশল গ্রহণ করে। সে জাজিমার সাথে সন্ধি

---

৬৪. আততারিখুল ইসলামি আলআম- পৃষ্ঠা ৬১

৬৫. মুজামুল বুলদান- ২/৩২৮ (দারুস সাদের, বৈরুত সংস্করণ)

৬৬. তারিখুত তাবারি- ১/৬১৩

স্থাপন এবং তার সঙ্গে বিয়ের প্রস্তাব দিয়ে 'যাব্বা'র কাছে আসার আহ্বান জানায়। জাজিমা সেখানে গেলে তাকে হত্যা করে।[৬৭]

জাজিমার পর তার ভাতিজা আমর বিন আদি ইরাকি আরবদের শাসক হয়। সেই প্রথম হেরাত পদানত করে। আমর জাজিমার বন্ধু কুসাইরকে যাব্বা থেকে প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য প্রেরণ করে। কুসাইর নাক কেটে যাব্বার নিকট উপস্থিত হয়ে তার প্রতি আমর বিন আদির জুলুম-অত্যাচারের কপট গল্প বলে। এভাবে সে মজলুম সেজে যাব্বার আস্থা অর্জন করে। এরপর সে সুযোগবুঝে যাব্বার শহরে নিজের বাহিনী প্রবেশ করায় এবং যাব্বাকে কতল করে শহর গুড়িয়ে দেয়।[৬৮]

আমর বিন আদির পর তার স্থলাভিষিক্ত ইমরাউল কায়েসের শাসনামলে হেরাতের রাজাদের দৃঢ়তা ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পায়। ইমরুউল কায়স সাসানি বাদশাহদের সাথে বন্ধুত্ব করে নিজেকে সুরক্ষিত করে নেয়। এটি চতুর্থ খ্রিষ্টশতাব্দীর গোড়ার কথা। ইমরুউল কায়সের দৌহিত্র প্রথম নুমান হেরাতের রাজাদের সুনাম-সুখ্যাতি বিপুল পরিমাণে উচ্চকিত করে। তার শাসনামলেই আরব-ফরাসি সৈন্যরা সম্পূর্ণ পৃথক পৃথক বাহিনী হিসেবে ছিল। এদের মাধ্যমে বড় বড় আরব গোত্রগুলোকে বশে আনতে সক্ষম হয়।

নুমানের পর তার ছেলে মুনজির বিন নুমান সিংহাসনে বসে। তার উপর পারস্যের বাদশাহর এ পরিমাণ আস্থা ছিল যে, বাদশাহ খসরু ইয়াযদিগারদ আসিম তার ছেলে বাহরাম গোরের দীক্ষার জন্য মুনজিরের নিকট পাঠিয়ে দেয়। পরবর্তীতে মুনজির বাহরামকে পিতার সিংহাসনে বসানোর ক্ষেত্রে প্রধান ভূমিকা পালন করে।[৬৯]

মাজদাকিয়াত এবং হেরাত রাজ্য

পঞ্চম খ্রিষ্টশতাব্দীর শুরুতে ইরানে এক নতুন মতাদর্শের আবির্ভাব হয়। এই মতবাদের প্রতিষ্ঠাতা ছিল মাযদাক। সে নারী, টাকাপয়সা এবং জমিজমা-সবকিছু উজাড় করে লোকদেরকে তার মতবাদের প্রতি আহ্বান করে। প্রবৃত্তিপূজার প্রতি আহ্বানকারী এই নতুন মতাদর্শ ইরানি রাজা কিসরা কুবাযের পছন্দ হলে সে তা গ্রহণ করে এবং একে রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে ঘোষণা করে। এমনকি কেউ যদি তা অমান্য করত, তাকে রাষ্ট্রদ্রোহী হিসেবে সাব্যস্ত করা হতো। এভাবে এই নতুন মতবাদ রাষ্ট্রের পূর্ণ আনুকূল্য ও পৃষ্ঠপোষকতা পায়।

হেরাতের শাসক মুনজির বিন মাউস সামা 'মাযদাকি' মতবাদ গ্রহণে অস্বীকৃ

---

৬৭. আলকামিল ফিত তারিখ- ১/৩১৪-৩১৭

৬৮. প্রাগুক্ত- ১/৩১৮-৩২০

৬৯. প্রাগুক্ত- ১/৩৬৫-৩৭০

তি জানালে কিসরা শক্তিপ্রয়োগ করে তার থেকে মসনদ ছিনিয়ে নিয়ে আরেক আরব শাহজাদা হারিস বিন আমরকে অর্পণ করে। সে মাযদাকি মতবাদ গ্রহণ করে নিয়েছিল। কিসরা কুবায মারা যাওয়ার পর নওশেরওয়াঁ মাযদাকি মতবাদ বিলুপ্ত করে এবং হেরাতের শাসন-ক্ষমতা পুনরায় মুনজির বিন মাউস সামা'র কাছে ফিরিয়ে দেয়।

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্মের সময় হেরাতের শাসক মুনজিরের ছেলে আমর ছিল। রাষ্ট্রপরিচালনায় কঠোর নীতির কারণে তাকে 'কঠিনপ্রকৃতির মানুষ' বলা হতো।[৭০]

বনু গাসসান

হেরাতের রাজারা যেমন আরবের পূর্বসীমান্ত এলাকাগুলো পারস্য সাম্রাজ্যের অধীনে পরিচালনা করত, তেমনি জাজিরাতুল আরবের শাম সীমান্তবর্তী অঞ্চলগুলো বনু গাসসান রোমান সাম্রাজ্যের অধীনে পরিচালনা করত।

বনু গাসসান বনু কাহলানের শাখাগোষ্ঠী আজদের সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিল। তারা মাআরিব বাঁধ-এর সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে ইয়েমেন থেকে শামের সীমান্ত পর্যন্ত প্রলম্বিত গাসসান নামের একটি ঝরনার পাশে আশ্রয় নেয়। এজন্য তাদের নাম বনু গাসসান পড়ে যায়। তাদের প্রথম নেতা ছিল জাফনা বিন আমর। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ৪০০ বছর পূর্বেই গত হয়ে যায় সে। জাফনার বংশধররা দীর্ঘসময় শামের সীমান্তবর্তী এলাকাগুলো শাসন করে। ডজনখানেক শাসক রাজ্য-পরিচালনার দৃশ্যপটে আগমন করে। তন্মধ্যে প্রসিদ্ধ ছিল হারিস বিন জাবালা ইয়াকুবি ফিরাকি। সে ছিল খ্রিষ্টানধর্মের অনুসারী। হজরত ঈসা আলাইহিস সালামকে স্বীকৃতি দেয় আল্লাহ তায়ালার শ্রেষ্ঠ বুজুর্গ ও বড় ব্যক্তিত্ব হিসেবে।

৫২৯ খ্রিষ্টাব্দে হারিস হেরাতের আরব শাসক মুনজির বিন মাউস সামা'র বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য রোমান সরকারের বশ্যতা স্বীকার করে নেয়। তারপর ৫৪১ সালে রোমানদের সহায়তায় দজলা নদী পার হয়ে ইরাকে আক্রমণ করে বিজয় অর্জন করে। এভাবে গাসসান রাজ্যও শক্তিশালী হয়ে ওঠে। রোমানদের অধীনস্থ হওয়ার কারণে গাসসানি আরবরা খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ করে এবং সময়ের ব্যবধানে অধিকাংশ লোকই পাক্কা খ্রিষ্টান হয়ে যায়। গাসসানিদের সর্বশেষ শাসক ছিল জাবালা বিন আয়হাম। হজরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর খেলাফতকালে সে মুসলমান হয়। কিছুদিন পর মুরতাদ হয়ে যায়।[৭১]

---

৭০. আলমুখতাসার ফি আখবারিল বাশার- ১/৭০, ৭১

৭১. আততারিখুল ইসলামি আলআম- পৃষ্ঠা ৮৩-৮৮

বহিঃশত্রুর আক্রমণের টার্গেটে আরব

জাজিরাতুল আরব পারস্য ও লোহিতসাগরের মতো গুরুত্বপূর্ণ নৌপথের সাথে সংযুক্ত থাকায় পৃথিবীর মানচিত্রে অনেক মূল্যবান এলাকা ছিল। প্রতিবেশী দেশগুলো এসব শুষ্ক ও সবুজ-শ্যামল ভূমি দখল করার উপকারিতা ভালো করেই জানত। কিন্তু আরবরা স্বভাবতই ছিল স্বাধীনচেতা। এজন্যই তারা সমসাময়িক বিশ্বপরাশক্তির কাছে কখনো পরাজয় বরণ করেনি। মিসরের ফেরাউন, ইরাক-পারস্যের কিসরাই কেবল আরবভূমি নিজেদের দখলে রাখতে চায়নি; বরং ইউরোপও তাদেরকে নিজেদের মতো করে পরিচালিত করার স্বপ্ন দেখতো। কিন্তু তাদের সেই স্বপ্ন কখনো বাস্তবায়িত হয়নি।

গ্রিকবিজেতা গ্রেট আলেকজান্ডার যখন ইরান, ভারতবর্ষ দখল করে ফেরার পথে জাজিরাতুল আরব জয় করার উদ্দেশ্যে রওনা হয়, তখন তার আকস্মিক মৃত্যু আরবদের এক রক্তক্ষয়ী লড়াই থেকে বাঁচিয়ে দেয়। মৃত্যুর সময় সিকান্দারের বয়স হয়েছিল মাত্র ছত্রিশ বছর। এর মধ্যে তেরো বছর সে দেশ শাসন করে।[৭২]

সিকান্দারের পর গ্রিক হুকুমত দুর্বল হতে থাকে। অপরদিকে ইরানের কায়ানি খান খান্দানের সর্বশেষ সম্রাট দারা নিহত হবার পর (আলেকজান্ডার তাকে হত্যা করেছিল) তার সামাজিক অবকাঠামো একদম ভেঙে পড়ে। অন্যদিকে প্রাচ্যের গির্জাখ্যাত কনস্টান্টিনোপলের রোমান সাম্রাজ্য খুব দ্রুত উদ্ভাসিত হতে থাকে।

খ্রিষ্টপূর্ব চব্বিশ সালে রোমান সম্রাট অগাস্টাস জাজিরাতুল আরব দখল করার জন্য বিশাল এক বাহিনী প্রেরণ করে। কিন্তু মরুভূমির উত্তাপ এবং পানির স্বল্পতার কারণে রোমান বাহিনী পথিমধ্যেই হিম্মত হারিয়ে ফেলে। ফলে তাদের অভিযান ব্যর্থ হয়।

প্রায় তিনশো বছর পর যখন রোমান রাজ্য রাষ্ট্রীয়ভাবে খ্রিষ্টানধর্ম গ্রহণ করে, তখন আরবদেরকে নিজেদের আয়ত্তে নেওয়ার জন্য আরেকবার প্রচেষ্টা চালায়। আর এজন্য ধর্মপ্রচারের একটি পদ্ধতি আবিষ্কার করে। রোমান গির্জার পাদরি এবং সন্ন্যাসীদেরকে আরবের দক্ষিণাঞ্চলে পাঠানো হয়। ইতিপূর্বে লোহিতসাগরের তীরে বসবাসকারী হাবশা রোমানদের দখলে এসে গিয়েছিল এবং সেখানে তারা খুব ঘটা করে খ্রিষ্টানধর্মের প্রচার-প্রসার শুরু করে দেয়।

কিন্তু জাজিরাতুল আরবে রোমানদের প্রচার-প্রসার তেমন সফলতা পায়নি। ইয়েমেনে হিময়ারি রাজারা খ্রিষ্টানধর্মের অন্তরালে রোমানদের অগ্রসরতাকে

---

৭২. আলমুখতাসার ফি আখবারিল বাশার- ১/৪৫, আততারিখুল ইসলামি আলআম- পৃষ্ঠা ৪৪

অত্যন্ত ঘৃণার চোখে দেখত। তাদের রাজনৈতিক বিরোধিতা এবং প্রতিক্রিয়া জানানোর জন্য ইহুদিধর্ম গ্রহণ করে নেয়।

উপরন্তু ইয়েমেনের কিছু লোক খ্রিষ্টধর্ম কবুল করে। নাজরানে একজন বুজুর্গ ছিলেন। তিনি হজরত ঈসা আলাইহিস সালামের তরিকার উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। আবদুল্লাহ বিন তামের নামের এক যুবক তার ভক্ত হয়ে যায়। তার কারামতি দেখে নাজরানের বাসিন্দারা তাওহিদের কালিমা পাঠ করে নেয়। হিময়ারের বাদশাহ ইউসুফ যু-নাওয়াস তার উপর ক্রুদ্ধ হয়ে সমগ্র নাজরানবাসীকে আগুনের পরিখাতে নিক্ষেপ করে।[৭৩] এই ঘটনা কেবল হিময়ারেই নয়, জাজিরাতুল আরবের রাজনৈতিক ঐক্যের জন্য ক্ষতিকর হয়ে দাঁড়ায়।

রোমান রাজা জাস্টিনাস এই মর্মান্তিক সংবাদ পেয়েই হাবশার প্রশাসক নাজাশিকে ইয়েমেনের উপর আক্রমণ করে বনু হিময়ার থেকে নাজরানবাসীর হত্যার প্রতিশোধ নেওয়ার নির্দেশ দেয়। তখন নাজাশি তার সেনাপ্রধান আরিয়াতকে সত্তর হাজার হাবশি সৈন্য দিয়ে ইয়েমেন-অভিমুখে পাঠায়। ফলে ইয়েমেন থেকে হিময়ারি বংশের হুকুমতের ইতি ঘটে এবং রোমান সাম্রাজ্যের অধীনে খ্রিষ্টধর্মের সরকার কায়েম হয়। এই এলাকার ব্যবস্থাপক নির্বাচিত হয় আরিয়াত। উক্ত ঘটনা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্মের সত্তর বছর পূর্বেকার।

আরিয়াত থেকে আরেক হাবশি সরদার আবরাহা আল-আশরাম ইয়েমেনের ক্ষমতা ছিনিয়ে নেয়। আবরাহা ছিল কট্টর খ্রিষ্টান। কাবা শরিফের প্রতি আরবদের সীমাহীন ভক্তি ও মহব্বত সে দু'চোখে সহ্য করতে পারত না। তাই সে ইয়েমেনে একটি জাঁকজমকপূর্ণ গির্জা নির্মাণ করে আরবদের আহ্বান জানায় এই ঘরে হজ করতে আসার জন্য। কিন্তু আরবরা তার আহ্বানে মোটেই পাত্তা দেয়নি। তখন সে কাবা শরিফ ধ্বংসের ঘৃণ্য উদ্দেশ্যে মক্কানগরীতে চড়াও হয়। পরিণতিতে সে আল্লাহ তায়ালার হুকুমে পুরো বাহিনীসহ ধ্বংস হয়ে যায়।[৭৪]

মক্কা উপত্যকা

শাম ও ইয়েমেনের ব্যবসার রাজপথে মক্কা হলো হিজাজের মধ্যস্থলে অবস্থিত পাহাড়-টিলায় ঘেরা একটি নিম্নভূমি। মক্কা উপত্যকার উত্তর-দক্ষিণে প্রায় দুই মাইল (সোয়া তিন কিলোমিটার) দৈর্ঘ্য এবং অর্ধমাইল (৮০০ মিটার) প্রস্থ। নিম্নভূমির হওয়ার কারণে বৃষ্টির পানি টিলা থেকে নেমে সরাসরি উপত্যকা ভাসিয়ে দেয়। এ কারণে শহরবাসীকে বহুবার বন্যার কবলে পড়ে ক্ষতিগ্রস্ত হতে হয়। উষ্ণ আবহাওয়ার এই নগরী হজরত ইবরাহিম আলাইহিস সালাম ও

---

৭৩. তাফসিরে ইবনে কাসির; সুরা বুরুজ

৭৪. আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া- ১/৫৬৪; সিরাতে ইবনে হিশাম- ১/৪১-৪৬

ইসমাইল আলাইহিস সালামের স্মৃতিবিজড়িত হওয়ার কারণে আরবদের নিকট ছিল অনেক মর্যাদাপূর্ণ স্থান। এখানে হজের মৌসুমে আরবের সকল গোত্র একত্রিত হয়ে হজ পালন করত।

মক্কার নেতৃত্ব বনু জুরহুমের হাতে ছিল। কাবা শরিফের চাবি এবং তার বিভিন্ন খেদমতের দায়িত্ব বনু ইসমাইলের উপর ছিল। এই দায়িত্ব হজরত ইসমাইল আলাইহিস সালামের বড় ছেলে নাবিত পালন করত। নাবিতের পর বনু জুরহুমের কিছু লোভী লোক বনু ইসমাইলকে এই দায়িত্ব থেকে বঞ্চিত করে।

দীর্ঘ সময় পর্যন্ত বনু জুরহুম মক্কা এবং কাবার দায়িত্ব পালন করে। কিন্তু তারা কাবার সম্মান ও মর্যাদা রক্ষা করেনি। অনেক পরিমাণে খেয়ানত করে বসে।

ইয়েমেনের মাআরিব বাঁধ যখন ভেঙে বন্যা বয়ে যায় এবং বিভিন্ন কাহতানি গোত্র উত্তরদিকে হিজরত করে, তখন তাদের একটি কাফেলা প্রবীণ সরদার আমর বিন আমিরের নেতৃত্বে মক্কায় আসে। কিন্তু বনু জুরহুম তাদেরকে জায়গা দিতে অস্বীকৃতি জানায়। তারপর আমর বিন আমিরের দুই ছেলে আউস ও খাযরাজ তাদের সন্তানদের নিয়ে ইয়াসরিব (মদিনা) চলে যায়। আমরের তৃতীয় দৌহিত্র রবিয়া বিন আরিসা মক্কাতে নিজের অবস্থান তৈরি করে নিতে সক্ষম হয়। তার সন্তানদেরকেই বনু খুজাআ বলা হয়।[৭৫]

বনু জুরহুমের দখলমুক্তি এবং বনু খুজাআর কর্তৃত্ব স্থাপন

বনু খুজাআর শক্তি দিন দিন বৃদ্ধি পেতে থাকে। তারা বনু জুরহুমকে মক্কা থেকে বের করে দিয়ে মসজিদে হারামের কর্তৃত্ব দখল করে নেয়। বলা হয়ে থাকে এটি ২০৭ খ্রিষ্টাব্দের ঘটনা।[৭৬]

বনু জুরহুম নিজেদের দুর্বলতা সত্ত্বেও কাবা শরিফকে সীমাহীন মহব্বত করত। মক্কা তাদের হাতছাড়া হয়ে যাওয়ার পর আপন পিতৃপুরুষের জন্মভূমি ইয়েমেন চলে যাওয়ার পূর্বে তারা কাবা শরিফের জন্য সঞ্চিত অর্থকড়ি জমজম কূপে নিক্ষেপ করে তা মাটি দিয়ে ভরাট করে দেয়। এই অবস্থায় তাদের কবি আমর বিন হারেস নিম্নোক্ত পঙ্‌ক্তিমালা আবৃত্তি করে:

كأنْ لَمْ يكُن بين الْحَجُون إلى صَفَا * أَنِيسٌ ولم يَسْمُر بمكَّة سامِرُ

بل نحنُ كنا أهلُها فَأَزَالَنا * صُروفُ اللَّيَالي والجُدُود العَوائِرُ

---

৭৫. আখবারু মক্কা ওমা জাআ ফিহা মিনার আছারি, ইবনুল ওয়ালিদ আলআজরাকি- ১/৮০-৯০ (দারুল আন্দালুস সংস্করণ)

৭৬. আত-তারিখুল ইসলামি আলআম- পৃষ্ঠা ৯২; তারিখু মাকাতাল মুশাররাফাহ, ইবনে যিয়া- পৃষ্ঠা ৫৬-৫৭

وَكنَّا وُلَاةُ البيت من بعدِ نَابتٍ * نَطُوفُ فما تَحظى لدينا المَكَاثِرُ

মনে হচ্ছে জায়হুন থেকে সাফা পাহাড় পর্যন্ত কোনো বন্ধু নেই
এবং মক্কাতেও গল্প শোনাবার জন্য কেউ বেঁচে নেই।
আমরাই তো ছিলাম এ নগরীর বাসিন্দা। কিন্তু রাতের দুর্বিপাক
এবং ভাগ্যের লিখন আমাদেরকে ক্ষমতাচ্যুত করেছে।

নাবিত বিন ইসমাইলের পর আমরাই বাইতুল্লাহর দেখভাল করেছি।

আমরা যখন তাওয়াফ করতাম, আমাদের কাছে আমাদের ধনদৌলতের কোনো মূল্য থাকত না।[৭৭]

বনু জুরহুমের ক্ষমতাচ্যুতি এবং বনু খুজাআর দখলের কারণে ক্ষতি সাধিত হয়। কারণ, বনু খুজাআ এই ঘরের দেখাশোনা করার পাশাপাশি শিরকের কেন্দ্রে পরিণত করে। অভিশপ্ত শিরকি কর্মকাণ্ডের সূচনা বনু খুজাআর সরদার আমর বিন লুহাই'য়ের হাতে সম্পন্ন হয়। এই ব্যক্তিকে আরবে উঁচুমাপের নেতা হিসেবে গণ্য করা হতো। তাকে বাদশাহদের মতো সম্মান জানানো হতো। ধনদৌলতে সমসাময়িক সরদারদের অনেক ঊর্ধ্বে ছিল। তার উটের সংখ্যা বিশ হাজার বলা হতো। এই শান-শওকত এবং ভাবগাম্ভীর্যের কারণে তার যেকোনো কথা ও সিদ্ধান্ত চোখ বুজে মেনে নেওয়া হতো।[৭৮]

মূর্তিপূজার সূচনা

আমর বিন লুহাই শাম থেকে ফেরার পথে সেখানকার লোকজনকে মূর্তিপূজা করতে দেখে। মূর্তিপূজকরা বিশ্বাস করত যে, মূর্তি রিজিক দেয়, বৃষ্টি দেয়, এদের কাছে নিজের প্রয়োজন পূরণ করে দেওয়ার আবেদন করা যায়, আর তারা পূর্ণও করে দেয়। শয়তানও তাদের এই শিরকি ধারণার কিছুটা বাস্তব রূপ দেওয়ার চেষ্টা করে। আমর বিন লুহাই 'হুবল' নামক মূর্তিটা সাথে নিয়ে এসে কাবা শরিফের সাথে যুক্ত করে মানুষকে তার ইবাদত করার জন্য আহ্বান করতে থাকে। অধিকাংশ লোকই তার অন্ধ অনুসরণ করে। এরপর খুব দ্রুত কাবা শরিফ মূর্তিতে ভরে যায়। আর আরবরা মূর্তিপূজাতে এত মত্ত হয়ে পড়ে, যে দীনে ইবরাহিম তাদের পূর্বপুরুষদের নিকট প্রাণপ্রিয় ধর্ম ছিল, ধীরে ধীরে তা সম্পূর্ণ বিলীন হয়ে যায়।[৭৯]

হ্যাঁ, কিছু লোক শুরু থেকেই মূর্তিপূজাকে ধ্বংসাত্মক কাজ মনে করত। বনু জুরহুমের এক কবি শুহনাহ বিন খালাফ আমর বিন লুহাই'য়ের এই কর্মকাণ্ডের

---

৭৭. ইবনে খালদুন- ২/৩৯৭ (দারুল ফিকর, সংস্করণ)
৭৮. আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া; ইবনে কাসির- ১/৫৮৪ (দারু হিজর সংস্করণ)
৭৯. আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া; ইবনে কাসির- ১/৫৮৪ (দারু হিজর সংস্করণ)

সমালোচনা করে বলেন-

يا عَمرُو إنك قد أحدثتَ آلِهةً * شتَّى بمكة حولَ البيت أَنصابًا

وكان للبيت ربٌّ واحدٌ أبدًا * فقد جعلتَ له في الناس أَرْبَابًا

لَتَعْرِفَنَّ بِأَنَّ اللهَ في مَهَلٍ * سَيَصْطَفِي دُونكُم للبيت حُجَّابًا

রে আমর, তুই তো বাইতুল্লাহর পার্শ্বে উপাস্য হিসেবে কত মূর্তি স্থাপন করলি!

এই ঘরের রব তো সর্বদা একজনই। কিন্তু তুই লোকদেরকে একাধিক উপাস্যের পরিচয় করালি।

জেনে রাখবি, আল্লাহ তায়ালা তোকে কেবল অবকাশ দিয়ে রেখেছেন। তিনিই তোদের ছাড়া অন্যদেরকে কাবা শরিফের রক্ষক হিসেবে মনোনীত করবেন।[৮০]

কুরাইশের উদ্ভব

বনু খুজাআ প্রায় ৩০০ বছর পর্যন্ত কাবা শরিফ দেখাশোনা করে। এই সময় ইসমাইল বংশের প্রখ্যাত ব্যক্তি আদনানের সন্তানদের মধ্যে রবিয়া এবং মুযার প্রত্যেকেই স্বয়ংসম্পূর্ণ বড় বড় গোত্রে পরিণত হয়েও কিছু কিছু শাখাগোত্রে বসবাস করছিল। মুযারের এক প্রপৌত্র খুযাইমার ছেলে কিনানা খুব খ্যাতি অর্জন করে। কিনানার বংশ তার ছেলে নজর থেকে চলতে থাকে এবং অনেক বড় হয়। কিনানার প্রপৌত্র ফিহর বিন মালিকের জমানায় তারা বনু কিনানা নামে পৃথক গোত্রে পরিণত হয়। কিন্তু বনু কিনানার কয়েক পুরুষ পর্যন্ত কারো এমন সাহস হয়নি যে, বনু খুজাআ থেকে কাবার কর্তৃত্ব পুনরুদ্ধার করবে। অবশেষে ফিহরের অধঃস্তন পঞ্চম পুরুষে এসে বিখ্যাত সরদার কুসাই বিন কিলাবের আবির্ভাব হয়। তিনিই তার সম্মানিত পিতৃপুরুষের উত্তরাধিকার পুনরুদ্ধারের জন্য কোমরবেঁধে লেগে যান।

কুসাইয়ের শৈশবকাল কাটে এতিম অবস্থায়। পিতা মারা যাওয়ার পর তার মা বনু উযরায় দ্বিতীয় বিয়ে করেন। ফলে তার শৈশব বনু উযরায় কাটে। যৌবনে পদার্পণ করার পর নিজের আসল বংশের সম্মান এবং মুরব্বিদের সম্পর্কে জানতে পারে। তখন সে হিজাজ চলে আসে। এখানে এসে দেখতে পায় যে, গোত্রের লোকেরা এখানে বড় বিশৃঙ্খল জীবনযাপন করছে। তাদের জীবনের আলাদা কোনো বৈশিষ্ট্য ছিল না। তারা কেবল নজর বিন কিনানার বংশধর হিসাবে বিক্ষিপ্ত কিছু গোষ্ঠীর মর্যাদা রাখত। কুসাই এদের সবাইকে একীভূত

৮০. আলমুফাসসাল ফি তারিখিল আরাব- ডক্টর জাওয়াদ আলি- ১১/৮০

করে। তার ভাগ্য প্রসন্ন ছিল যে, বনু খুজাআর সরদার তার যোগ্যতা ও দক্ষতা দেখে তার নিকট নিজ কন্যাকে বিয়ে দেয় এবং মৃত্যুর পূর্বে কাবা শরিফের চাবিও তার হাতে সোপর্দ করে যায়। এর ফলে শত শত বছর পর বাইতুল্লাহর তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব বনু ইসমাইলের নিকট ফিরে আসে।[৮১]

কুসাই মক্কার একজন বড় সরদারে পরিণত হন। তিনিই মক্কার শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার পর নিজ গোত্র বনু কিনানাকে সাথে নিয়ে বনু খুজাআ থেকে হারামের সীমানা দখলমুক্ত করেন। তারপর বনু কিনানার লোকদের মক্কা ও হিজাজের বিভিন্ন স্থান থেকে জমা করে মক্কায় স্থায়ী বাসিন্দা বানিয়ে দেন। সবাইকে একত্রিত করার পর একটি সুবিন্যস্ত গোত্রে পরিণত করেন। এই গোত্রের নামই 'কুরাইশ' দেওয়া হয়।

কুরাইশ নামকরণের একাধিক কারণ বর্ণনা করা হয়। কেউ বলে- কুরাইশ শব্দটি 'তাকাররুশ' থেকে নির্গত। তার অর্থ হলো বিক্ষিপ্ততার পর একত্রিত হওয়া। নজর বিন কিনানার বংশধরদের যেহেতু বিভিন্ন জায়গা থেকে একত্রিত করে নতুন সমাজ-ব্যবস্থায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে; তাই এই নতুন একতাবদ্ধতাকে কুরাইশ বলা হয়।

কেউ বলে, নজরই কুরাইশ। তাই তার সন্তানরাও এই নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। কারো মতে ফিহর বিন মালিকের উপাধি 'কুরাইশ' ছিল। মূলত কুরাইশ একটি শক্তিশালী সামুদ্রিক প্রাণীকে বলা হয়। আর এরপরই যেহেতু কিনানার সন্তানদের মধ্যে শক্তি-সামর্থ্য এবং প্রভাব-প্রতিপত্তি এসেছে, সে হিসেবে কুরাইশ বলা হয়ে থাকে।[৮২]

কুসাইয়ের নেতৃত্বে মক্কায় ছোট একটি সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। তার মধ্যে অসাধারণ রাজনৈতিক প্রতিভা ছিল। সে মক্কার ব্যবস্থাপনাগত বিষয়গুলোকে ধর্মীয়, আইন এবং সামরিক বিষয়ে বিভক্ত করে। কাবা শরিফ, মসজিদে হারাম এবং হাজিদের সেবার পাশাপাশি নগরীর সেবা ও শৃঙ্খলামূলক কার্যক্রমকে উন্নত করে। নগরীর সেবাগুলো ছয় ভাগে বিভক্ত ছিল:

১. হিজাবাহ বা সিদানাহ : তথা কাবা শরিফের চাবি সংরক্ষণ করা। এর দায়িত্বের অধিকারীদের কাছে বাইতুল্লাহর চাবি সংরক্ষিত থাকত। তাদের অনুমতি ছাড়া কেউ ভেতরে প্রবেশ করতে পারত না।

২. সিকায়াহ : হজের দিনগুলোতে হাজিদেরকে পানি পান করানো।

৩. রিফাদাহ : হাজিদের আহার করানো।

---

৮১. সিরাতে ইবনে হিশাম- ১/১১৭, ১১৮

৮২. সিরাতে ইবনে হিশাম- ১/১২৪; আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া- ২/২০১

৪. লিওয়া : পতাকা স্থাপন করা, যার তলে সৈন্যরা একতাবদ্ধ হবে।

৫. কিয়াদাহ : রণাঙ্গনে সৈন্যদের নেতৃত্ব দেওয়া।

৬. নাদওয়াহ তথা পরামর্শসভা : মসজিদে হারামসংলগ্ন একটি উন্মুক্ত জায়গায় এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হতো। এই জায়গাটিকে 'দারুন নাদওয়াহ' বলা হতো। কুরাইশি নেতারা এখানে বসেই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করত। সৈন্যদের যুদ্ধের ময়দানে রওনা হওয়া এবং ব্যবসায়ী কাফেলার যাত্রা এখান থেকেই হতো। বিবাহানুষ্ঠানও এখানে হতো। ছেলেমেয়েদের বালেগ হওয়ার সত্যায়নও এখান থেকেই করা হতো, যেন আদমশুমারিতে যুবকদের নাম সংরক্ষণ করা যায়।

কুরাইশ হুকুমতের এই ছয়টি বিভাগ ছিল ছয়টি মন্ত্রণালয়ের পর্যায়ে। এই পদে অধিষ্ঠিত হতে পারা অত্যন্ত সম্মান ও গৌরবের বিষয় মনে করা হতো। কুসাইয়ের জীবদ্দশাতেই তার দুই ছেলে আবদুদ দার এবং আবদু মানাফ উপর্যুক্ত মন্ত্রণালয়ে যুক্ত হয়।

কুসাই হাজিদের পানি পান করানো, আহার করানো, যুদ্ধপরিচালনা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব আবদু মানাফকে দেন। আর বাইতুল্লাহর চাবি সংরক্ষণ, দারুন নাদওয়ার তত্ত্বাবধান এবং পতাকা উত্তোলনের দায়িত্ব আবদুদ দারকে অর্পণ করেন।[৮৩]

বনু আবদুদ দারের অধীনে আজও পর্যন্ত কাবার চাবি সংরক্ষণের দায়িত্ব রয়েছে। মক্কাবিজয়ের সময়ও রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই বংশের সন্তান হজরত উসমান বিন তালহা রাদিয়াল্লাহু আনহুকে চাবি সংরক্ষণের তার পূর্ববৎ দায়িত্বে বহাল রেখেই কেবল ক্ষান্ত হননি; বরং এই সুসংবাদও দেন যে, সর্বদা তার বংশের মধ্যেই এই দায়িত্ব থাকবে। কেউ যদি এই অধিকার ছিনিয়ে নেয়, তা হলে সে জালেম বিবেচিত হবে।[৮৪]

হাশিম

আবদু মানাফের দুই ছেলে তার স্থলাভিষিক্ত হয়: হাশিম এবং আবদু শামস। আবদু শামস যদিও দরিদ্র ছিল, কিন্তু কর্মতৎপর এবং নির্ভীক ছিল। তার সন্তানও কয়েকজন ছিল। তাই সে কুরাইশের যুদ্ধপরিচালনার দায়িত্ব পালন করে। আবদু শামসের পর তার ছেলে উমাইয়া কুরাইশের সেনাপতি হয়। এরপর উমাইয়ার ছেলেদের মাঝেই দীর্ঘসময় পর্যন্ত এই দায়িত্ব ঘুরতে থাকে। আর উমাইয়ার ছেলেরাই বনু উমাইয়া নামে খ্যাতি লাভ করে।

---

৮৩. সিরাতে ইবনে হিশাম- ১/১২৫, ১২৯, ১৩০; আররাওযুল উনুফ- ২/৩৩, ৩৪ (দারু ইহয়ায়িত তুরাসিল আরাবি সংস্করণ)

৮৪. আখবারু মক্কা, ইবনুল ওয়ালিদ আলআজরাকি- ১/২৬৫ (দারুল আন্দালুস সংস্করণ)

আল্লাহ তায়ালা হাশিমকে সম্পদের প্রাচুর্য এবং নিশ্চিন্ততার নেয়ামত দিয়েছিলেন। তারই শোকর আদায়স্বরূপ তিনি নিরলসভাবে হাজিদের পানি পান ও আহার করানোর খেদমত আঞ্জাম দিতেন। তার নাম 'হাশিম' রাখার কারণ ছিল, তিনি রুটি টুকরো টুকরো করে ঝোলের মধ্যে ভিজিয়ে রেখে অভাবীদের খাওয়াতেন।[৮৫]

কুরাইশের পেশা ছিল ব্যবসা-বাণিজ্য। পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন এলাকাতে তারা ব্যবসা পরিচালনা করত। কিন্তু হাশিম তাদের ব্যবসার পরিধি আরো বিস্তৃত করেন। বহিঃদেশেও ব্যবসায়িক কার্যক্রম ছড়ানোর দুঃসাহস দেখান। তিনি নিজে শামের 'কায়সারিয়া' নগরীতে যান। এখানে রোমান কায়সারের অবস্থান ছিল। সেখানে গিয়েও হাশিম দৈনিক একটি বকরি জবাই করে আশপাশের লোকদের মেহমানদারি করতেন। কায়সার তা জানতে পেরে তাকে ডেকে পাঠান। তিনি উপস্থিত হয়ে বলেন-

'মহামান্য বাদশাহ, আমরা আরব। ব্যবসা আমাদের পেশা। আপনার যদি মর্জি হয় তা হলে একটি নিরাপত্তাপত্র লিখে দিন, যেন আমাদের লোকেরা হিজাজের পণ্যসামগ্রী এনে এখানে বিক্রি করতে পারে। এতে করে আপনি এসব পণ্য স্বল্পমূল্যে পেয়ে যাবেন।'

কায়সার তখনই নিরাপত্তাপত্র লিখে দেন। এরপর থেকে কুরাইশ-কাফেলা নির্ভয়ে ও নিরাপদে শাম আসা-যাওয়া করতে থাকে। এভাবে তাদের অবস্থা দিন দিন উন্নতি লাভ করে।[৮৬]

কুরাইশের উত্থান

এটিই ছিল কুরাইশের উত্থানকাল। মক্কা শরিফ শাম ও ইয়েমেনের বাণিজ্যিক পথ হওয়ার কারণে সারা বছর তা জমজমাট ছিল। কুরাইশদের ব্যবসায়ী কাফেলা গ্রীষ্মকালে শাম আর শীতকালে ইয়েমেন সফর করত। কারণ, শীতের মৌসুমে ইয়েমেনের উপকূলবর্তী অঞ্চলগুলো আর গ্রীষ্মকালে শামের পার্বত্য এলাকাগুলো নাতিশীতোষ্ণ ছিল। এভাবে পুরো বছরই তাদের ব্যবসায়ের বাজার সরগরম থাকত।

বাইতুল্লাহর প্রতিবেশী এবং তত্ত্বাবধায়ক হওয়ার কারণে কুরাইশের বাণিজ্যিক কাফেলাগুলোর দিকে কেউ বাঁকাচোখে তাকাত না। তাদের কাফেলার পণ্যসামগ্রী বহন করার জন্য মাঝেমধ্যে আড়াই হাজারেরও অধিক উটের প্রয়োজন হতো। আর তার সাথে শ' দু'শ লোক অবশ্যই থাকত।[৮৭]

---

৮৫. সিরাতে ইবনে হিশাম- ১/১৩৬

৮৬. আলআওয়াইল, আবু হিলাল আসকারি, পৃষ্ঠা ২৬; আততারিখুল ইসলামি আলআম- পৃষ্ঠা ১০১

৮৭. আততারিখুল ইসলামি আলআম- পৃষ্ঠা ১০১

ধর্মীয় কেন্দ্রস্থল হওয়ার কারণে দূরদুরান্ত থেকে মানুষ মক্কায় আসা-যাওয়া করত। বিশেষত হজের মাসগুলোতে হাজিদের ভিড় লেগে থাকত। কুরাইশরা অত্যন্ত নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে হাজিদের সেবা করত। এই সময় ব্যবসায়ে মুনাফাও হতো অনেক। নিজেদের ধর্মীয় নেতৃত্ব, ব্যবসায়ের মুনাফার পাশাপাশি সমর ও কূটনীতির ক্ষেত্রেও তাদের দক্ষতা ছিল।

কুরাইশরা বনু গিফারকে অনেক বিপজ্জনক মনে করত। বনু গিফরের বসবাস ছিল হারামের নিকটবর্তী শাম যাওয়ার পথে। তাদের আকিদা-বিশ্বাসও কিছুটা ভিন্ন ছিল। কুরাইশের মূর্তিপূজা, কাবাঘর এবং হারামের প্রতি তাদের কোনো ভক্তি-শ্রদ্ধা ছিল না। তাই তারা শুধু ব্যবসায়ীই নয়; হাজিদের কাফেলাও লুটপাট করত। এভাবে একসময় তাদের উপর সুররাকুল হাজিজ (তথা হাজিদের চোর) লকব পড়ে যায়।[৮৮]

কুরাইশ তাদের এই ভয়-ভীতি মোকাবেলার জন্য এক দূরদর্শী রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। নিজেদের সংখ্যাস্বল্পতা দূর করার লক্ষ্যে মক্কার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে বসবাসরত বনু কিনানা এবং বনু মুদরিকার সাথে মিত্রতা স্থাপন করতে সক্ষম হয়। আর তাদেরকেই ইতিহাসে 'আহাবিশ' বলা হয়ে থাকে।[৮৯]

তা ছাড়া গোলামদের সমন্বয়ে একটি পৃথক বাহিনী গঠন করা হয়, যাদের নামকরণ করা হয় 'উবদান'।[৯০]

ইয়াসরিবে ইহুদিদের আগমন

মক্কার পর জাজিরাতুল আরবের দ্বিতীয় বড় শহর ছিল ইয়াসরিব। এটি কৃষিপ্রধান অঞ্চল ছিল। এখানে বাগান ও কূপ অধিক পরিমাণে ছিল। খেজুর, আঙুর এখানকার প্রধান উৎপাদিত ফসল। মক্কাতে গরম ও শীত উভয়টাই বেশি, অন্যদিকে ইয়াসরিব আবহাওয়ার দিক থেকে অনেক ভালো এবং স্বাভাবিক। ইয়াসরিবের অধিকাংশ লোকই কৃষিকাজ এবং বাগান পরিচর্যা-পেশায় লিপ্ত ছিল। কিছু লোক ব্যবসাও করত। ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ইহুদিরা ছিল সবচেয়ে অগ্রসর। তারা শিল্প ও বিভিন্ন পেশায় অনেক বিখ্যাত ছিল। অস্ত্র ও গহনা তৈরিতে খুব দক্ষ ছিল। ইহুদিদের এক মহল্লা 'বনু কায়কা' ছিল গহনা তৈরির মূলকেন্দ্র।[৯১] তবে ইহুদিদের মধ্যে খুব কম বংশই ছিল বনু

৮৮. আততারিখুল ইসলামি আলআম- পৃষ্ঠা ১০৬; আসসিরাতুন নববিয়্যাহ, ডক্টর আলি সাল্লাবি- পৃষ্ঠা ১/৫৭১

৮৯. আততারিখুল ইসলামি আলআম- পৃষ্ঠা ১০৮

৯০. সিরাতে ইবনে হিশাম- ২/৬৭ (যিকরু মা'রাকাতি উহুদ)

৯১. আলমুফাসসাল ফি তারিখিল আরাব- ডক্টর জাওয়াদ আলি, ৭/২৬৪

(আরবিতে 'قين' মানে হলো কামার, আর 'قاع' অর্থ স্থান। সে হিসেবে 'قَيْنُقَاع' এর অর্থ হয় 'কামারপল্লী'।)

ইসরাইলি। তাদের অধিকাংশই আরব ছিল। তারা 'জুযাম' গোত্রের সাথে সম্পৃক্ত ছিল। এই জুযাম গোত্রের লোকেরা হজরত মুসা আলাইহিস সালামের প্রতি ঈমান এনেছিল। এরপর তারা কওমে আমালিকার (এরা ছিল ইহুদিদের শত্রু এবং মূর্তিপূজারি জাতি) সংখাধিক্যে আতঙ্কিত হয়ে শামের কল্যাণময় ভূমি ছেড়ে হিজাজে পাড়ি জমায়।[৯২]

বনি ইসরাইলের ইয়াসরিবে আসার পূর্ব থেকেই ইয়াসরিব আবাদ ছিল। তাদের পূর্বে এখানকার স্থানীয় বাসিন্দা ছিল বনু সা'দ, বনু আযরাক এবং বনু মাতরুফ। তারা কওমে আমালিকার সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করত। আমালিকা সে সময় মক্কাসহ হিজাজের বিভিন্ন এলাকাতে বসবাস করত। জুযাম গোত্রের আরব বংশীয় ইহুদিরা যখন ইয়াসরিবে আসে, তখন এখানকার আমালিকাদের দুর্বলতার সুযোগ গ্রহণ করে তাদেরকে শ্রমিক হিসেবে ব্যবহার করত; ইয়াসরিবে আরব ইহুদিদের আগমনের একটি উদ্দেশ্য এটাও ছিল।

ইহুদি আলেমরা তাওরাতে পড়ে যে, শেষনবী হিজরত করে এমন খেজুরময় স্থানে আসবেন, যার দু'পাশে ঝলসে যাওয়া উঁচুভূমি। ইয়াসরিব সেসব নিদর্শনের সাথে পুরোপুরি মিলে যায়। এজন্য বহু ইহুদি এখানে বসতি গাড়ে। আর এটিই ছিল ইয়াসরিবে ইহুদিদের প্রথম পদার্পণ।[৯৩]

একটা সময় পর্যন্ত ইয়াসরিবে ইহুদিদের কর্তৃত্ব টিকে ছিল। কয়েক শতাব্দী পর যখন ইয়েমেনের সুপ্রসিদ্ধ বাঁধ ভেঙে যায় এবং সাবার বিশাল সালতানাত তছনছ হয়ে যায়, তখন সেখানকার কাহতানি আরবদের দুটি গোত্র ইয়াসরিবে স্থানান্তর হয়। এরা ছিল আউস এবং খাযরাজ গোত্র। আওসের লোকেরা কৃষি এলাকায় ইহুদিদের বসতির নিকটে বসবাস শুরু করে। আর খাযরাজ ইয়াসরিবের মধ্যস্থলে বসতি স্থাপন করে। ধীরে ধীরে আউস এবং খাযরাজের অনেক বড় বসতি গড়ে ওঠে এবং ইয়াসরিবের এক বড় শক্তিতে পরিণত হয়। উপরন্তু ইহুদিরা সংখ্যায় কম হওয়া সত্ত্বেও তাদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতা বহাল থাকে। ব্যবসা-বাণিজ্য এবং শিল্প-সাহিত্যে তাদের শ্রেষ্ঠত্ব বজায় থাকে। মিথ্যা, ধোঁকাবাজি, ধূর্তামিতে তারা খুব পারঙ্গম হওয়ায় কখনো আউস

---

৯২. আত-তাম্বীহ ওয়াল ইশরাফ, মাসউদি, পৃষ্ঠা ২১৩, তারিখে ইবনে খালদুন- ২/৩৪৩। [তবে তাদের মধ্যে মূল বনি ইসরাইল বংশেরও লোক ছিল, যেমন- উম্মুল মুমিনিন সাফিয়া রা. এর মা-বাবা বনি ইসরাইল বংশোদ্ভূত ছিলেন। এজন্যই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে উদ্দেশ্য করে বলেন, তুমি নবীর কন্যা, তোমার চাচাও নবী (অর্থাৎ হজরত হারুন ও মুসা আলাইহিমাস সালাম)।' সুনানে তিরমিজি- বাবু ফাজলি আযওয়াজিন নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।]

৯৩. মু'জামুল বুলদান- ৫/৮২ (মাদিনাতু ইয়াসরিব)

এবং খাযরাজকে তাদের উপর বিজয়ী হতে দেয়নি। এই দুই শক্তির মাঝে সর্বদা যুদ্ধ, সন্ধি, আলোচনা এবং রাজনৈতিক দাঙ্গা লেগেই থাকত।

৭০ খ্রিষ্টাব্দে রোমানরা যখন শামের ইহুদিদের উপর অকথ্য নির্যাতন করে দেশত্যাগে বাধ্য করে, তখন ইহুদিদের বহু গোষ্ঠী ইয়াসরিবে এসে বসতি স্থাপন করে। তাদের মধ্যে বনু নাযির এবং বনু কুরাইযার লোক ছিল বেশি। এ দুটি গোষ্ঠী ছিল আরববংশোদ্ভূত ইহুদি ধর্মমতের অনুসারী এবং জুযামের শাখা গোত্রভুক্ত।[৯৪]

এটা মূলত আরবজাতীয়তাবাদেরই প্রভাব ছিল। তারা ইহুদি হওয়ার পরেও ইবরাহিমি রীতি-নীতির প্রতি পূর্ণ শ্রদ্ধাশীল ছিল। মক্কা এবং কাবা শরিফের প্রতি তাদের বিশ্বাস ছিল অগাধ। ইসরাইলি বংশোদ্ভূত হওয়ার দরুন সামগ্রিকভাবেই তাদের মধ্যে ধূর্তামি এবং কাপুরুষতা ছিল। কিন্তু এই আরব ইহুদিরা চতুর হওয়ার পাশাপাশি ছিল যুদ্ধবাজও। তাদের নামও আরবি ছিল। পরবর্তীতে আউস এবং খাযরাজের কিছু লোকও ইহুদি ধর্মমত গ্রহণ করে।[৯৫]

যুদ্ধবাজ এই ইহুদিরা ইয়াসরিবে তাদের বস্তির চারপাশে প্রাচীর এবং দুর্গ তৈরি করে তাদের বসতিকে সামরিকভাবে মজবুত করে নেয়।[৯৬] তারা ইয়াসরিবের উত্তর-দক্ষিণ দিক থেকে আক্রমণের শিকার হয়। ইয়েমেনে যখন তুব্বা বাদশাহদের উত্থান হয়, তখন তাদের সর্বশেষ তুব্বা আসআদ আবু কারিব (তাকে হাসসান তুব্বাও বলা হয়) ইয়াসরিবের উপর চড়াও হয়। ইয়াসরিববাসী জানবাজি রেখে তাদের মুখোমুখি হয়। এই যুদ্ধে খাযরাজের বনু নাজ্জার সর্বাধিক বীরত্বের সাথে তাদের মোকাবেলা করে।

হাসসান তুব্বা ইয়াসরিবকে পূর্ণরূপে ধ্বংস করে দিতে চাচ্ছিল। কিন্তু নগরীর প্রতিরক্ষায় ইহুদি এবং আরব একতাবদ্ধ ছিল। ওদিকে দুই ইহুদি আলেম হাসসানকে সতর্ক করেন যে, 'এমন (ইয়াসরিবকে ধ্বংস) করতে যাবেন না। কারণ, এই নগরী শেষনবীর হিজরতের স্থান হবে।' এ কথা শোনার পর হাসসান নিজের সংকল্প থেকেই কেবল ফিরে আসেনি, বরং নিজ গন্তব্যে ফিরে যাওয়ার পথে মক্কায় অবস্থান করে সেখানকার ইহুদি আলেমদের নির্দেশনা অনুযায়ী কাবা শরিফ তাওয়াফ করে, তাকে নতুন গিলাফ পরিয়ে দেয়।[৯৭]

---

৯৪. তারিখে ইয়াকুবি- পৃষ্ঠা ৭৯, ৮০; বাবু মুলুকিশ শাম- পৃষ্ঠা ১২২, ১২৩; বাবু বনু নাযির, বনু কুরাইযা

৯৫. নবিয়ে রহমত- মাওলানা আবুল হাসান আলি নদবি- পৃষ্ঠা ২৩৩

৯৬. তারিখে ইবনু খালদুন- ২/৬১, ৩৪৩; নবিয়ে রহমত- মাওলানা আবুল হাসান আলি নদবি- পৃষ্ঠা ২২২ (তারিখুল ইয়াহুদ ফি বিলাদিল আরব ওয়া ফিলাস্তিন, পৃষ্ঠা ৯)

৯৭. তারিখে ইবনু খালদুন- ২/৬১

হাসসান তুব্বা কাবা শরিফের তৎকালীন তত্ত্বাবধায়ক বনু জুরহুমকে এ মর্মে সতর্ক করে যায়, তারা যেন বাইতুল্লাহ এবং মসজিদে হারামের প্রতিটি জায়গা নাপাকি-আবর্জনা থেকে পবিত্র রাখার ব্যাপারে যত্নবান হয়।[৯৮]

ইয়াসরিবের আউস-খাযরাজ এবং ইহুদিদের বিরোধ

ইহুদি এবং আরবদের মাঝে গোড়ার দিকে বন্ধুত্ব এবং সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক ছিল; কিন্তু তা এক সময় নষ্ট হয়ে যায়। এর বড় কারণ ছিল আউস-খাযরাজের জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার পর তারা নিজেদেরকে ইয়াসরিবের একমাত্র শক্তিশালী গোত্র হিসেবে বেছে নেয়। ইহুদিরা তাদের বস্তি ও দুর্গে স্বাধীন এবং সুরক্ষিত হওয়ার পরেও আরবদের ব্যাপারে শঙ্কিত থাকত। এতে করে উভয়ের মাঝে শত্রুতা তৈরি হয়। ফলে ইহুদিরা সর্বদা আরবদের মাঝে বিভেদ সৃষ্টি করার জন্য সুযোগের অপেক্ষায় থাকে। এক সময় তারা তা পেয়েও যায়। কারণ, আউস-খাযরাজ প্রত্যেকেই স্বয়ংসম্পূর্ণ ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করতে চাইত। প্রত্যেক আরব গোষ্ঠীই যখন নিজেদের শক্তি-সামর্থ্য বৃদ্ধির জন্য মশগুল হয়ে যায়, তখন তাদের ঐক্যশক্তি ভেঙে পড়ে। সময়ের ব্যবধানে উভয়পক্ষ ছোট ছোট সংঘাতেও লিপ্ত হতে থাকে। অন্য আরব গোত্রগুলোও একজোট হয়ে তাদের এই সংঘাতে ইন্ধন দেয়।

বংশপরম্পরা ধরে তাদের মধ্যে এই যুদ্ধ চলতে থাকে। তাদের প্রথম যুদ্ধ ছিল সাফিনাযুদ্ধ, এরপর হয় ইয়াউমে হাতিব, ইয়াওমুল বাকি, ইয়াওমুদ্দারযুদ্ধ। এসব যুদ্ধের আগুন প্রজ্বলিত করার পেছনে ইহুদিদের কলকাঠি নাড়ার কথা সবারই জানা। তাদের কিছু গোত্র সংঘাতে লিপ্ত উভয় দলের সঙ্গ দিত।

মাওলানা আবুল হাসান আলি নদবি রহ. বলেন, মদিনার বাসিন্দা আউস-খাযরাজ এবং ইহুদিদের মাঝে সম্পর্ক ব্যক্তিস্বার্থ এবং পরস্পর থেকে ফায়দা হাসিলের উদ্দেশ্যে ছিল। ইহুদিরা তাদের স্বার্থ হাসিলের জন্য উভয় গোত্রের লড়াইয়ের মাঝে প্রচুর অর্থ ব্যয় করত। যেমন আউস-খাযরাজের মধ্যকার বিভিন্ন লড়াইয়ে তারা অর্থলগ্নি করেছিল। যার ফলে এই দুটি সম্প্রদায় ক্রমেই ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল। এইসব পারস্পরিক দ্বন্দ্বে ইহুদিদের অর্থলগ্নির উদ্দেশ্য কেবল এটাই ছিল যে, এর মাধ্যমে মদিনায় তারা তাদের অর্থনৈতিক কর্তৃত্ব বজায় রাখতে পারে।[৯৯]

---

৯৮. আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া- ৩/১২৬

৯৯. নবিয়ে রহমত- মাওলানা আবুল হাসান আলি নদবি- পৃষ্ঠা ২৩১

তায়েফ

মক্কা-ইয়াসরিবের পর জাজিরাতুল আরবের তৃতীয় বড় শহর ছিল তায়েফ। মক্কার দক্ষিণে প্রায় ৭৫ মাইল (১২০ কিলোমিটার) দূরে অবস্থিত। এখানে বনু সাকিফ বসবাস করত। সমুদ্র থেকে সাড়ে পাঁচ হাজার ফিট উপরে অবস্থিত নির্মল ও স্বচ্ছ আবহাওয়া, তাজা সব্জি ও ফল-মূলের জন্য বিখ্যাত শহর ছিল তায়েফ। মক্কার বহু সরদার তায়েফে বাগান ক্রয় করে রেখেছিল এবং গ্রীষ্মকাল এখানেই কাটাত। সৌন্দর্য এবং প্রাচুর্যের কারণে এই নগরীকেও মক্কার সমপর্যায়ের গণ্য করা হতো।[১০০]

আরবদের মাঝে শহরে দুর্গ ও প্রাচীর নির্মাণের রেওয়াজ ছিল। মক্কা এবং ইয়াসরিব যদিও নগরপ্রাচীর ও দুর্গমুক্ত ছিল; কিন্তু তায়েফে দুর্গ ও প্রাচীর মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে ছিল।[১০১] অপরদিকে প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থার দিক থেকেও সকল আরব নগরী থেকে অধিক সুরক্ষিত ও শক্তিশালী ছিল।

---

১০০. মুজামুল বুলদান- ৪/৮, ৯, তায়েফ

১০১. আলকামিল ফিত তারিখ- ১/৬০৬

পৃথিবী ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে

খ্রিষ্ট ষষ্ঠশতাব্দীর মাঝামাঝি। আমোদ-প্রমোদ এবং চাকচিক্য থাকা সত্ত্বেও পৃথিবীর মানুষ পথহারা ও হেদায়েতশূন্য ছিল। কোথাও ঐশী-পথনির্দেশের নামনিশানা ছিল না। হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান কিংবা ইহুদিধর্ম- সবই নগণ্য কিছু লোকের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। দীনের বিধান মানার আগ্রহ, খোদাভীতি এবং আখেরাতে জবাবদিহিতার ব্যাপারে তারা বেখবর ছিল। যেসব মতাদর্শ পূর্ববর্তী নবীদের সুন্নাতের প্রতিনিধিত্ব করত, তা আমূল বিকৃত হয়ে পণ্যসামগ্রীতে পরিণত হয়েছিল। নবীদের আনীত আসমানি গ্রন্থ ও সহিফাগুলোর আসল আকৃতি সংরক্ষিত নেই।

হিন্দুধর্ম

তৎকালীন সময়ে প্রচলিত ধর্মমতগুলোর মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীন সম্ভবত হিন্দুধর্ম। প্রাচ্যে সমগ্র দক্ষিণ এশিয়াজুড়ে এই ধর্ম বিস্তৃত ছিল। এটি এমন দুর্বোধ্য ধর্ম, যার মূলতন্ত্র বুঝা এবং বুঝানো দুষ্কর ছিল। হিমালয় থেকে ভারতসাগর উপকূল পর্যন্ত ৩৩ কোটি দেবতার পূজা করা হতো। বানর, সাপ থেকে শুরু ধরে ইঁদুরের পর্যন্ত পূজা করা হতো। প্রতিটি পাড়া-মহল্লা এমনকি প্রতিটি গলিতে পৃথক পৃথক দেবতা ছিল।

এক হিন্দু ঐতিহাসিকের অভিমত হলো, ভারতের ঘরবাড়ি থেকেও প্রতিমার সংখ্যা বেশি হয়ে গিয়েছিল। এক দেবতাপূজারি অন্য দেবতার উপাসনা করাকে লাঞ্ছনাকর মনে করত। প্রকৃতপক্ষে হিন্দুধর্মই পরিষ্কারভাবে বুঝা অসম্ভব হয়ে পড়েছিল। কাউকে যদি প্রশ্ন করা হতো, 'হিন্দু কাকে বলে' তা হলে সে সম্ভবত উত্তর দিত যে, প্রত্যেক মূর্তিপূজকই হিন্দু। অথচ এই উত্তরও অশুদ্ধ মনে হবে, যখন দেখবে হিন্দুপণ্ডিতরা সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব অস্বীকারকারীদেরও 'নাস্তিক' নাম দিয়ে হিন্দুধর্মে অন্তর্ভুক্ত করে নেয়। শূদ্রকেও তারা হিন্দু বলে; অথচ তাদের মন্দিরে আসার অনুমতি ছিল না।

বিশ্বাসের চরম অধঃপতনের পর হিন্দুসমাজে জাতিবর্ণ-বিভেদ তাদের জন্য আরেক মর্মান্তিক ট্রাজেডি ছিল। হিন্দুসমাজে ব্রাহ্মণ হলো খোদার সন্তান, তারা গুনাহ করে না। তারা নিষ্পাপ। সবকিছুই তাদের মালিকানাধীন। কারণ, তারা ধর্মপ্রচারক, পুরোহিতশ্রেণি।

দ্বিতীয় ক্ষত্রিয়, তারা যোদ্ধা ও রাজনীতিক শ্রেণি। তারা ব্রাহ্মণদের জীবিকা অন্বেষণের চিন্তা থেকে মুক্ত করে দিয়েছে। কওমকে জুলুম ও শোষণ করাই তাদের পেশা।

বৈশ্য তাদের তৃতীয় শ্রেণি। এরা কৃষি, বাণিজ্য ও বিভিন্ন পেশাজীবী শ্রেণি। এসব পেশার মাধ্যমে উপর্যুক্ত দুই শ্রেণির জন্য সম্পদ উপার্জন করে তাদের সন্তুষ্ট রাখার দায়িত্ব ছিল এই শ্রেণির লোকেদের উপর।

চতুর্থ শ্রেণি হলো শূদ্র। এরা পশুর চেয়েও অধম ছিল। তারা উঁচু শ্রেণির সাথে বসবে দূরের কথা, তাদের স্পর্শ করতেও পারবে না। তারা জন্মগতভাবেই পাপী, চিরন্তন অপরাধী এবং দেবতার অভিশাপপ্রাপ্ত ছিল। প্রত্যেক শূদ্রকেই জন্ম থেকে উঁচুশ্রেণির লোকেদের সেবক হিসেবে থাকতে হতো। তাদের উপর জুলুম-অত্যাচার সবই হবে; কিন্তু তার বিরুদ্ধে আপত্তি তোলা মারাত্মক অপরাধ ও ধৃষ্টতা।[১০২]

শাহ মুঈনুদ্দীন রহ. লেখেন, 'কোনো অবস্থাতেই ব্রাহ্মণের সাজা হওয়ার বিধান ছিল না। কোনো অচ্ছুত যদি উঁচুশ্রেণির কাউকে স্পর্শ করত, তা হলে তার শাস্তি ছিল মৃত্যুদণ্ড। নিম্নশ্রেণির লোকদের ধর্মীয় শিক্ষা আইনগতভাবেই নিষিদ্ধ ছিল। চারিত্রিক অবস্থা লজ্জাজনক পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিল। একজন নারীকে কয়েকজন পুরুষ বিয়ে করতে পারত। মদপানে আসক্তি বৃদ্ধি পেয়েছিল। মাতাল ব্যক্তির সকল অপরাধ পুণ্য হয়ে যেত...।

মন্দিরের পূজারিরা ছিল লম্পট। কিছু কিছু শ্রেণিতে কন্যাসন্তানকে হত্যা করা হতো। মৃত স্বামীর গৃহে স্ত্রীকে দাসিবৃত্তি করেই জীবনধারণ করতে হতো। এমন জীবনের চেয়ে বিধবা নারী স্বামীর জ্বলন্ত চিতায় আত্মাহুতি দেওয়াকে প্রাধান্য দিত।[১০৩]

বৌদ্ধধর্ম

দক্ষিণ এশিয়ার দ্বিতীয় বৃহত্তম ধর্ম হলো বৌদ্ধ। এর জনক ছিল শাহজাদা সিদ্ধার্থ। তার নামই গৌতম বুদ্ধ বলা হয়। হিন্দুধর্মে শ্রেণিবৈষম্যের যাঁতাকলে পিষ্ট হয়ে নির্জন ধ্যানমগ্নতা ও গবেষণার পর একটি নতুন নৈতিক ব্যবস্থাপনা পেশ করে, যেখানে সকলেই বরাবর ছিল। তার সাথে সাথে হিন্দুধর্মের কার্যকলাপ প্রত্যাখ্যান করার উদ্দেশ্যে সে কোটি কোটি দেব-দেবীকে এমনভাবে অস্বীকার করে যে, এক খোদার অস্তিত্বও অপ্রয়োজনীয় মনে করে।

---

১০২. মাযা খাসিরাল আলাম বিনহিতাতিল মুসলিমিন, আবুল হাসান আলি নদবি- পৃষ্ঠা ৪৮-৫৩
১০৩. তারিখে ইসলাম, শাহ মুঈনুদ্দীন নদবি- ১/২৪ (দারুল ইশাআত সংস্করণ)

বুদ্ধ শ্রেণিবৈষম্যের বেড়ী থেকে মুক্তি দেওয়ার শ্লোগান তুলে কোটি কোটি জনতাকে চমকে দেয়। কিন্তু খোদাকে নিয়ে কল্পনা-ধ্যান করার অংশটি যুক্ত না হওয়ায় একটা সময় পর্যন্ত মানুষকে আকৃষ্ট করতে পারেনি। গৌতম বুদ্ধের পর বৌদ্ধধর্মগুরুরা এ ধর্মের প্রচার-প্রসারে সাধারণ মানুষের চাহিদা একজন মূর্তমান খোদাকে পূজা করার উদ্দেশ্য পূরণ করার লক্ষ্যে গৌতম বুদ্ধকে তারা খোদা হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। নতুন এই মূর্তিপূজার এমনভাবে প্রসার ঘটায় যে, হিন্দুদের মূতিপূজাকেও তা ছাড়িয়ে যায়।

বৌদ্ধমূর্তি মধ্য-এশিয়া থেকে পূর্ব-এশিয়া এবং প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপ পর্যন্ত প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ঐশী-নির্দেশনা থেকে দূরে সরে যাওয়ার কারণে এরকম একটি স্বতন্ত্র সংস্কারমূলক আন্দোলন ভ্রষ্টতার নতুন জালরূপে আবির্ভূত হয়।[১০৪]

ইরানের ধর্মীয় অধঃপতন

প্রাচ্যের সবচেয়ে বড় শক্তি সাসানি সাম্রাজ্য ইরান, খোরাসান এবং মধ্য-এশিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ইরানের বাদশাহরা ছিল অগ্নিপূজারি। শত শত বছর যাবৎ তারা অগ্নিপূজার আগুন সরবরাহ করত। অগ্নিপূজা ধর্মের প্রবর্তক ছিল জরথুস্ট। খ্রিষ্টপূর্ব সপ্তম শতাব্দীতে তার আবির্ভাব। সে-ই আলো-অন্ধকার, ভালো-মন্দ এবং খোদার কল্যাণ-অকল্যাণের মাঝে যুদ্ধের ধারণা পেশ করে মানুষকে অগ্নিপূজক বানায়। অগ্নিপূজারিরা চন্দ্র-সূর্যেরও পূজা করত। ইরানের বাদশাহ মানুষদের থেকে নিজের খোদা হওয়ার স্বীকৃতি নিত। খসরু পারভেজ তার নামের সাথে এই উপাধি ব্যবহার করত যে 'খোদার মধ্যে অবিনশ্বর মানব এবং মানবের মধ্যে অদ্বিতীয় খোদা'।[১০৫]

ঐসব খোদার মধ্যে তারা ভালো ও মন্দের খোদাকে সর্বশ্রেষ্ঠ বলে মনে করত। ভালোবিষয়ক খোদাকে তারা 'ইয়াযদা' এবং মন্দবিষয়ক খোদাকে 'আহরামান' বলত। এটা শয়তানেরই বিকৃত রূপ ছিল। তাদের ধারণামতে অনাদিকাল থেকে 'ইয়াযদা' ও 'আহরামান'-এর মধ্যে সংঘর্ষ চলে আসছে। এ কারণেই জগৎময় ভালো-মন্দ, উত্থান-পতন, জয়-পরাজয়ের বিভিন্ন রূপ সামনে আসছে। এটাই ইরানিদের আকিদার ভিত্তি ছিল। আর এর উপর ভিত্তি করে তৈরি হয়েছিল আজব আজব আকিদা, যেগুলো বিভিন্ন সময় নানা রঙ ধারণ করত।

অগ্নিপূজাধর্ম বিশেষ কিছু ইবাদতসর্বস্ব ছিল। নির্ধারিত সময়ে এগুলো আদায় করতে হতো। অগ্নিমণ্ডপ থেকে বের হলেই তারা ধর্মীয় বিধান এবং চারিত্রিক রীতি-নীতি থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হয়ে যেত। সুদ, ঘুষ এবং জিনার

---

১০৪. মাযা খাসিরাল আলাম বিনহিতাতিল মুসলিমিন, আবুল হাসান আলি নদবি- পৃষ্ঠা ৪৬-৪৮
১০৫. নবিয়ে রহমত- পৃষ্ঠা ৪৭

মতো অপরাধ, যেগুলো অধিকাংশ সমাজেই খারাপ মনে করা হয়, তাদের সমাজে একেবারে বৈধ ছিল। এমনকি নিকটাত্মীয়দের সাথেও যৌনসম্পর্ক গড়ে তোলার সুযোগ ছিল।

এই ধর্ম যেহেতু চারিত্রিক শিক্ষা-দীক্ষাশূন্য ছিল, তাই এক হাজার বছর পর খ্রিষ্ট তৃতীয় শতকে 'মানি' অগ্নিপূজাধর্ম সংস্কারের দায়িত্ব কাঁধে নেন। দুনিয়া থেকে সকল অনিষ্ট ও মন্দাচার দূর করার লক্ষ্যে মানুষের দুনিয়া ত্যাগ করে জঙ্গলে গিয়ে বসবাস করা, বিয়েশাদি এবং সন্তানসন্ততির কোলাহল থেকে মুক্তির জন্য মানুষকে উৎসাহ দিতে থাকেন। মূলত এটা ছিল সম্পূর্ণ মানবস্বভাবের পরিপন্থি।

পঞ্চম শতকে যখন সাসানি বংশের রাজত্বের দ্বিপ্রহর, তখন মাযদাক (জন্ম ৪৮৭ খ্রিষ্টাব্দ) নতুন সংস্কার প্রস্তাব পেশ করেন। মানুষকে তিনি সবরকম বিলাসিতার অনুমতি দেন। শুধু পানাহার আর ধন-সম্পত্তিতেই নয়; বরং নারীদের সাথে যৌনসম্পর্ক বজায় রাখার ক্ষেত্রেও সকল পুরুষের সমঅধিকার ছিল। ফলে সাধারণ মানুষ হয়ে পড়ে তাদের ভোগ-লিপ্সা ও কাম-লালসার অসহায় শিকার। দিনে-দুপুরে ঘরে ঘরে হানা দিয়ে মানুষের 'মান ও সামান' তারা ভোগদখলে নিয়ে নিত। গৃহস্বামীর কিছুই করার থাকত না।

মোটকথা, যেই ইরানি সাম্রাজ্য বেলুচিস্তান থেকে সমরকন্দ-বুখারা এবং খুরাসান থেকে এশিয়া মাইনরের শেষসীমানা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল, তাদের রাষ্ট্র ও সমাজ-ব্যবস্থায় ভারসাম্য ও মধ্যপন্থা কিছুই ছিল না; অথচ এই দুটো যেকোনো সফল ও নিরাপদ সমাজ-ব্যবস্থার জন্য আবশ্যক বিষয়। এর বিপরীতে তাদের সমাজে নিরাপত্তাহীনতা, কঠোরতা, জুলুম-অত্যাচার এবং দখলবাজির রমরমা অবস্থা বিরাজমান ছিল। জনসাধারণ চরম অসচ্ছলতা ও দারিদ্র্যে ভুগছিল; অথচ তৎকালীন শাসকরা বাগ-বাগিচা তৈরিতে ব্যস্ত ছিল।

ইরানি সাম্রাজ্যের অধীন প্রায় দু-ডজন এলাকার আয়ের অধিকাংশ অর্থ ব্যয় হতো রাজা ও রাজন্যবর্গের ভোগবিলাসে। কিসরার শাহি বাবুর্চির সংখ্যা ছিল এক হাজার। নর্তকী, সংগীতশিল্পী, বাদক, চিতা ও শিকারি কুকুর এবং এগুলো রক্ষণাবেক্ষণকারীর সংখ্যা তারচেয়ে অধিক। গ্রীষ্মকে বসন্তে রূপান্তর করার জন্য কিসরা তৎকালীন প্রসিদ্ধ বসন্ত-গালিচা প্রস্তুত করত, যার প্রতি বর্গফুটে খরচ পড়ত কয়েক হাজার আশরাফি।[১০৬]

---

১০৬. আসসিরাতুন নববিয়্যাহ, আবুল হাসান আলি নদবি- পৃষ্ঠা ৩৩-৩৬

চীনের আকিদা-বিশ্বাসের অবস্থা

প্রাচ্যের সর্বশেষ সাম্রাজ্য চীন। চীন তার সুবিশাল রাজ্যসীমা, খনিজ সম্পদের সমৃদ্ধি, অসাধারণ প্রতিভা, পরিচ্ছন্ন সভ্যতা-সংস্কৃতি থাকা সত্ত্বেও কনফুসিয়াসের দর্শন থেকে এগোতে পারেনি। তিনি হজরত ঈসা আলাইহিস সালামের জন্মের ৫৫৫ বছর পূর্বে চীনের 'সাঁতুঙ্গে' জন্মগ্রহণ করেন। দার্শনিক হিসেবে পরিচিতি লাভ করার পর তার ৩ হাজারের অধিক শাগরিদ তৈরি হয়। এই প্রাচ্যদার্শনিক কিছু নৈতিক শিক্ষাকে দর্শনের প্রলেপ দিয়ে মানুষের সামনে পেশ করে তাদের মেধাকে নির্দিষ্ট গণ্ডির ভেতর আবদ্ধ রাখেন। তিনি মানবাত্মা ও মানব-সমাজের সামনে বিশ্বব্যাপী সমস্যা নিরসনে কার্যকর কোনো সমাধান পেশ করতে সম্পূর্ণ অক্ষম ছিলেন। ফলে বিশ্ব সমাজ-ব্যবস্থা আরো বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়।[১০৭]

ইউরোপের নৈতিক অবক্ষয় এবং আধ্যাত্মিক অধঃপতন

প্রাচ্যের সভ্যতা-সংস্কৃতিতে এক অস্থির অবস্থা বিরাজ করছিল। পাশ্চাত্যের অবস্থা ছিল তারচেয়ে বহুগুণ খারাপ। পূর্ব ইউরোপ থেকে মধ্য ও পশ্চিম ইউরোপ পর্যন্ত শুধুই মূর্খতা, দরিদ্রতা, পঙ্কিলতা আর স্থবিরতা ছিল। জ্ঞানবিজ্ঞান এবং শিল্প থেকে সম্পূর্ণ উদাসীন ছিল। বাইরের জগতের সঙ্গে তাদের কোনো সম্পর্ক ছিল না। রাজনীতি, সামাজিকতা, শিক্ষা-দীক্ষা, ব্যবসা-বাণিজ্যসহ প্রতিটি বিষয়ে ভ্রান্তবিশ্বাসী এবং গোঁয়ারপ্রকৃতির পাদরিদের দখলদারত্ব ছিল। এরা একদিকে যেমন জ্ঞানবিজ্ঞানের নতুন নতুন গবেষণা এবং যেকোনো গভীর চিন্তা-ভাবনার ব্যাপারে নিরুৎসাহিত করে মানুষের গবেষণাশক্তি ও যোগ্যতা বিকল করে দিত; অন্যদিকে তারা রোমান সালতানাতকে টুকরো টুকরো করার পাশাপাশি তাদের গির্জাকেও পূর্ব-পশ্চিম দুভাগে বিভক্ত করে ফেলে।

প্রাচ্যের প্রধান গির্জা ছিল কনস্টান্টিনোপল, যাকে অর্থোডক্স চার্চ বলা হতো। তার পুরোহিতদের বলা হতো 'পেট্রিক'। আর পশ্চিমা গির্জাকে বলা হতো ক্যাথলিক চার্চ। তার ধর্মগুরুদের উপাধি ছিল 'পোপ'। কনস্টান্টিনোপল এবং রোমের মধ্যে রাজনৈতিক শত্রুতার সাথে সাথে দুই চার্চের মাঝেও দ্বন্দ্ব বৃদ্ধি পেতে থাকে। প্রত্যেকেই একে অপরের আকিদা-বিশ্বাসে আঘাত করতে থাকে। প্রাচ্যগির্জার বক্তব্য হলো ঈশ্বর যিশুর চেয়ে মর্যাদাবান আর পশ্চিমা গির্জার মত হলো উভয়ই সমান। এমন কয়েকটি বিষয়ে তাদের মধ্যকার মতদ্বন্দ্বের কারণে পরস্পর অভিশাপ ছোঁড়াছুঁড়ি করত এবং অপরপক্ষকে কাফের পর্যন্ত বলত। এই অবস্থার প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে হাজারো মানুষ নিজের দীন ও ঈমান বাঁচানোর তাগিদে বনজঙ্গলে আশ্রয় নেয়। আর এদেরকেই রাহেব

---

১০৭. মাযা খাসিরাল আলাম বিনহিতাতিল মুসলিমিন, আবুল হাসান আলি নদবি- পৃষ্ঠা ৪৬

বা সন্ন্যাসী বলা হয়। কিন্তু লিখিত কোনো দিকনির্দেশনা না থাকায় এ দলটিও গোমরাহির শিকার হয়।[১০৮]

সন্ন্যাসীরা দৈনন্দিন জীবনযাপনে শরিয়তের কোনো বিধান অনুসরণ করত না। এ ব্যাপারে তাদের কোনো গরজও ছিল না। পাদরি ও রাহেবদের একটা বড় অংশ কঠোরতা এবং সমাজ-বিচ্ছিন্নতা পছন্দ করত। কোনো কারণ ছাড়াই নিজেকে কষ্ট দিয়ে আল্লাহ তায়ালার নৈকট্য অর্জন করতে চাইত। তারা একেবারে সমাজ-বিচ্ছিন্ন ছিল। নারীদের কেনাবেচা করা এবং তার মালিক হওয়ার পদ্ধতি নিয়ে তখনও তাদের মাঝে সংশয় ছিল। এবং নারীরাও যে মানুষজ্জতখন পর্যন্ত তাদের সে বিশ্বাস জন্ম নেয়নি। তাদের মধ্যে কিছু লোক নারীদেরকে একটি বিপজ্জনক শ্রেণি মনে করত। বিড়ালপ্রজাতির প্রাণির মতো মনে করত। নারীদের মধ্যে কোনো প্রাণ আছে কি না, এ নিয়েও তাদের সন্দেহ ছিল। কিছু লোক তাদেরকে নির্জীব মেশিন ভাবত।

রবার্ট ব্রিফল্ট লেখেন, 'সে যুগের পাশবিকতা ও বর্বরতা ছিল আদিযুগের চেয়ে ভয়াবহ, যেন পচনধরা সভ্যতার লাশ পচেই চলেছে।'[১০৯]

ইউরোপের এই যুগটা ছিল বিক্ষিপ্ততা ও উচ্ছৃঙ্খলার যুগ। ইটালি, ফ্রান্স থেকে পূর্ব ইউরোপ এবং কনস্টান্টিনোপল পর্যন্ত রাজনৈতিক টানা-হেঁচড়া আর অরাজকতা বৈ কিছুই দেখা যাচ্ছিল না। এমন কোনো মুজাদ্দিদ বা সংস্কারকও ছিলেন না, যিনি তাদেরকে সঠিক পথের দিশা দেবেন। তাদের কারো কাছে ইনজিলের বিশুদ্ধ কোনো কপি ছিল না। বরং তারা দীর্ঘ অনুসন্ধানের পর হাতে হাতে চলে আসা ইনজিলের যেই কপি হাওয়ারিদের স্মৃতিতে ছিল, তা গ্রহণ করে নেয়। তবে এর মধ্যেও বহু বিকৃতি ঢুকে পড়েছিল। ঈসায়ি ধর্মের প্রকৃত দায়ী হজরত ঈসা আলাইহিস সালাম বলে গেছেন,

إن الله ربي وربكم فاعبدوه

> নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা আমার রব এবং তোমাদের রব, অতএব তোমরা তারই ইবাদত কর।[১১০]

কিন্তু খ্রিষ্টান ধর্মগুরুর রূপধারী 'পল' খ্রিষ্টধর্মের তাওহিদকে ত্রিত্ববাদ দ্বারা পরিবর্তন করে ফেলে। হজরত ঈসা আলাইহিস সালামকে পুঁজি করে সে মূলত ক্রুশের দিকে আহ্বান করত। গ্রিক দর্শনশাস্ত্রে গা ভাসিয়ে দিয়ে ইউরোপিয়ান

---

১০৮. তাফসিরে ইবনে কাসির; সুরা হাদিদ, আয়াত ২৭; আততুহফাতুল মাকদাসিয়্যাহ ফি মুখতাসারি তারিখিন নাসরানিয়্যাহ, আসিম মাকদাসি- পৃষ্ঠা ৯৬-১১১

১০৯. আসসিরাতুন নববিয়্যাহ, আবুল হাসান আলি নদবি- পৃষ্ঠা ৪০-৪২

১১০. সুরা আলে ইমরান, আয়াত ৫১

খ্রিষ্টানরা সহজ-সরল তাওহিদের দাওয়াত পরিত্যাগ করে। রোমান মূর্তিপূজারিদের সহজে আকৃষ্ট করার উদ্দেশ্যে পিতা-পুত্র এবং পবিত্রাত্মার আজব দর্শন মেনে নেয়। এরা পুরোদস্তুর ত্রিত্ববাদকে ধারণ করেছিল। হজরত ঈসা আলাইহিস সালামের ব্যাপারে ইহুদিদের বক্তব্য 'আমরাই তাকে হত্যা করেছি' দৃঢ়তার সাথে বিশ্বাস করে নিয়েছিল; অথচ আল্লাহ তায়ালা ঈসা আলাইহিস সালামকে জীবিত আসমানে উঠিয়ে নিয়েছেন।[১১১]

ষষ্ঠ হিজরি শতাব্দীর শেষের দিকে কোথাও কোথাও এমন খ্রিষ্টানও পাওয়া যেত, যারা একত্ববাদে বিশ্বাসী এবং বর্তমান খ্রিষ্টবাদে অসন্তুষ্ট ছিল। তবে তাদের সংখ্যা একেবারেই নগণ্য ছিল। তারা বৈরাগ্যের জীবনযাপন করত।

গ্রিকদর্শন

এ সময় জ্ঞানবিজ্ঞান, সভ্যতা-সংস্কৃতির এক প্রাচীনকেন্দ্র ছিল গ্রিস। খ্রিষ্ট ষষ্ঠশতাব্দীতে দর্শনশাস্ত্রের বাজার সরব ছিল। তাই তো আজ পর্যন্ত গ্রিসকে সক্রেটিস, প্লেটো এবং অ্যারিস্টটলের মতো বিখ্যাত দার্শনিকদের জন্মভূমি বলা হয়। তারা ছিলেন যুগের সেরা দার্শনিক। সক্রেটিস হজরত ঈসা আলাইহিস সালামের জন্মের প্রায় ৪০০ বছর পূর্বে অতিক্রান্ত হয়ে যান। আর তার বিশিষ্ট শাগরিদ প্লেটো ঈসা আলাইহিস সালামের সাড়ে তিনশো' বছর পূর্বে গত হয়েছিলেন। তারপর আসেন অ্যারিস্টটল। তিনি গ্রেট আলেকজান্ডারের শিক্ষক এবং উপদেষ্টা ছিলেন।

গ্রিক রাজবংশের পৃষ্ঠপোষকতায় দার্শনিকদের বাজার খুব সচল হয়। আলেকজান্ডার প্রাচ্যকে দার্শনিক চিন্তাধারার সঙ্গে পরিচিত করে তোলার জন্য মিসরে আলেকজান্দ্রিয়া নামে একটি নগরীর গোড়াপত্তন করেন এবং সেখানে ফিলিস্তিন অধিবাসীদের বসবাসের ব্যবস্থা করে দেন। এভাবেই প্রাচ্যে দর্শনভিত্তিক জ্ঞানবিজ্ঞানের চর্চা শুরু হয়। এই দার্শনিকরা প্রতিটি জিনিসকে যুক্তির পাল্লা দিয়ে মাপতে অভ্যস্ত ছিল। তারা ভুল-শুদ্ধ যেকোনো বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দেওয়ার জন্য মানুষের আকল-বুদ্ধিকেই চূড়ান্ত মনে করত। ঐশীজ্ঞানের কোনো প্রয়োজনই তাদের মধ্যে ছিল না।

এই দার্শনিকরা কেবল চিকিৎসা, জ্যোতির্বিদ্যা, গণিতশাস্ত্র এবং রাজনীতি নিয়েই ব্যস্ত থাকতো না; বরং বিশ্বজগৎ, ভালো-মন্দ এবং সৃষ্টির আদি-অন্ত নিয়েও নিজেদের গবেষণা উপস্থাপন করার চেষ্টা করেছে। এখানেই তারা চরম পদস্খলন ও গোমরাহির শিকার হয়। তারা স্রেফ যুক্তিনির্ভর হওয়ার কারণে

---

১১১. আততুহফাতুল মাকদাসিয়্যাহ ফি মুখতাসারি তারিখিন নাসরানিয়্যাহ, আসিম মাকদাসি- পৃষ্ঠা ৭০-৯৩

সৃষ্টিকর্তার সম্পর্কে একেবারে অজ্ঞতার মধ্যে থাকে। আখেরাত, হাশর, পুনরুত্থান সম্পর্কে তাদের কখনো স্বচ্ছ ধারণা তৈরি হয়নি। নিজেদের জ্ঞানকেই পরিপূর্ণ এবং নিশ্চিত মনে করার দরুন কখনো নবী-রাসুলদের শিক্ষা-উপদেশ নিয়ে চিন্তা-ফিকির করার প্রয়োজন অনুভব করেনি।

এই ধরনের দার্শনিক চিন্তাধারা তার ধারকদেরকে এক সময় আখেরাত এবং আল্লাহ তায়ালার অস্তিত্ব অস্বীকারকারী বানিয়ে দেয়। এমনিভাবে শরিয়ত, অহি, হালাল-হারামের মতো ইসলামি পরিভাষাসমূহও তাদের কাছে অর্থহীন মনে হবে।

গ্রিকদর্শনের দ্বারা প্রভাবিত প্রতিটা এলাকায় যখন স্বাধীন সভ্যতা অস্তিত্ব লাভ করে, সেখানে সন্দেহ-সংশয়ে নিমজ্জিত থাকাকে 'ইলম' বা বিজ্ঞান নামকরণ করা হয়। উলঙ্গপনা আর অশ্লীলতাকে সভ্যতা-সংস্কৃতি হিসেবে আখ্যা দেওয়া হয়। দার্শনিকদের সেই সভ্যতা গ্রিকের এমন অবস্থা করে ছাড়ে যে, হাট-বাজারে বেহায়া-পতিতাদের অপকর্মের আহ্বান করা এবং নাট্যমঞ্চে নারীদের দিয়ে নগ্ননৃত্য করা ছিল সাধারণ ব্যাপার। খেলার মাঠে দর্শকদের বিবস্ত্র খেলাধুলা উপভোগ, ব্যভিচার, নাচ গান এবং বিলাসিতার জীবন সর্বস্তরে ছড়িয়ে পড়েছিল।

আমোদ-প্রমোদের রুচি-প্রকৃতি এত নিচু পর্যন্ত গড়ায় যে, আমির-উমারাগণ ক্ষুধার্ত হিংস্র পশুদের সাথে বন্দিদের লড়াই করার দৃশ্য স্বাচ্ছন্দ্যে উপভোগ করত। যৌনচাহিদা মেটানোর জন্য তারা নিত্যনতুন ও অভিনব পদ্ধতি অন্বেষণ করত। মানুষের স্বভাব-প্রকৃতি এতটাই নিচু হয়ে গেছিল যে, অভিজাত লোকেরা সমকামিতায় লিপ্ত ছিল। সাধারণ চরিত্রহীন লম্পটদের কথা আর কী বলবজ্জতাদেরকে বাজারে নারীদের জুতা চাটতে দেখা যেত।

আমরা যে যুগের কথা আলোচনা করছি, খ্রিষ্টীয় ষষ্ঠ শতকে যে গ্রিককে রোমের তোতা বলা হতো, সেখানে দার্শনিকদের সোনালি দিনের সমাপ্তি ঘটেছিল। তবে রোমান সভ্যতার রন্ধ্রে রন্ধ্রে দার্শনিক চিন্তাধারা ঢুকে পড়েছিল। প্রায় প্রতিটি অপকর্মের বীজ এই দর্শনই বুনেছিল।[১১২]

শুধুই শব্দের ফুলঝুড়ি

সবচেয়ে হতাশাজনক কথা হলো, প্রাচ্য-প্রতীচ্যের এই দর্শন-বিপ্লবের দাবি এবং মানবতার পথপ্রদর্শনের শিক্ষা কেবল বইয়ের পাতায় এবং মতবাদেই সীমাবদ্ধ ছিল, বাস্তব ক্ষেত্রে তার কোনো দৃষ্টান্ত কেউ খুঁজতে গেলে অন্ধকার ছাড়া কিছুই দেখতে পাবে না।

---

১১২. আসসিরাতুন নববিয়্যাহ, আবুল হাসান আলি নদবি- পৃষ্ঠা ৪০-৪২; কাযায়াল মারআ ফিল মুতামারাতিদ দাওলিয়্যাহ; ডক্টর ফুআদ বিন আবদুল কারিম, পৃষ্ঠা ২৪৪

একজন মানুষ কীভাবে আত্মিক ও দৈহিকভাবে পবিত্রতা অর্জন করতে পারে, তার জনসমাগম ও নির্জনবাস, কথাবার্তা এবং কর্মপদ্ধতি, স্রষ্টা এবং সৃষ্টির সঙ্গে সম্পর্ক কেমন হবে- দর্শনশাস্ত্রের মাধ্যমে দার্শনিক কিংবা দাঈ'র বাস্তব জীবনে এ বিষয়ে কোনোরূপ পথনির্দেশ পাবে না। খুশি-আনন্দে কীভাবে আবেগ প্রকাশ করবে, দুঃখ-বেদনায় কী আচরণ করবে, জয়-পরাজয়ে করণীয় কী? বালা-মুসিবতে বিপর্যস্ত হলে কর্তব্য কী? কীভাবে শুবে, কীভাবে জাগবে? বড় এবং মুরুব্বিদের সঙ্গে কেমন আচরণ হবে? ছোটদের সাথে কীভাবে চলবে? পারিবারিক ও সামাজিক জীবন কেমন হবে? এই প্রশ্নগুলোর প্রায়োগিক উত্তর প্রয়োজন ছিল। কিন্তু অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছিল, আমলের মতো এত বড় বড় সব নেয়ামত পূর্ববর্তী নবীগণের অন্তর্ধানের সঙ্গে তাও বিলীন হয়ে গেছে।

গোমরাহিতে জর্জরিত ইহুদিজাতি

ঐ যুগের ইতিহাসে যদি হালকা দৃষ্টিপাতও করা হয়, তা হলে উম্মাহ ও সমাজের গোমরাহির এই নাজুক পরিস্থিতির সংশোধন ও সংস্কারের জন্য একজন মুসলিহ ও মুজাদ্দিদের আবির্ভাব হওয়ার আশা করা যেত অন্যান্য গোত্রের তুলনায় ইহুদিদের থেকে অধিক। কারণ হাজারো বছর যাবৎ বনি ইসরাইলে নবী-আগমনের ধারা অব্যাহত ছিল। উপরন্তু তাদের কাছে ছিল ঐশী-হেদায়েতগ্রন্থ তাওরাত শরিফ। এই গ্রন্থ বিকৃতির পরেও শেষনবীর নিদর্শনাবলি অবশিষ্ট ছিল। ইহুদিদের বিশ্বাস ছিল- তাদের মধ্যে যেহেতু শত শত বছর যাবৎ বড় বড় নবীর আগমন ঘটে এসেছে, তাই শেষনবীও তাদের মধ্য থেকে হবেন। ইহুদিরা স্বাভাবিক জীবনযাপনেও সংযমী ছিল। তাদের পূর্বসূরিদের রীতি-নীতি সংরক্ষণ করত। তাদের জ্ঞান-প্রজ্ঞা ও প্রতিভা দেখেও আশা করা যেত যে, তাদের মধ্য থেকেই কোনো সংস্কারক ও নেতার আবির্ভাব ঘটবে।

উপর্যুক্ত সবই ছিল বাহ্যিক হিসাব-নিকাশ। বাস্তবতা হলো, এই কওম শত শত বছর যাবৎ আল্লাহর অসংখ্য নেয়ামত ভোগ করে, শ্রেষ্ঠত্বের আসনে অধিষ্ঠিত থাকে; কিন্তু অভ্যন্তরীণভাবে তাদের অবস্থা এতটাই শোচনীয় ছিল যে, তাদের থেকে কোনো কল্যাণের আশা করাও ছিল নিরর্থক। ইহুদিদের সকল অনিষ্টের মূল ছিল তাদের আত্মপ্রবঞ্চনা ও অহংকার। বিগত সময়ে তাদের প্রতি আল্লাহ তায়ালার অশেষ রহম ও করমের (দয়া-মায়া, অনুগ্রহ) কারণে তারা ধারণা করত যে তারাই আল্লাহর প্রিয় ও নির্বাচিত বান্দা। এই ধারণাই তাদেরকে একগুঁয়েমি ও স্বেচ্ছাচারিতায় ফেলে দেয়। এই ব্যাধি যখন বৃদ্ধি পেতে থাকে, এক সময় তারা শরিয়তের বিধানও নিজের প্রবৃত্তি অনুযায়ী প্রসার করার চেষ্টা শুরু করে দেয়। তাওরাতে আমূল পরিবর্তন করে ফেলে। তারপরও যেসব

আয়াত বিকৃতি থেকে বাদ পড়ে যায়, সেগুলোর মর্ম ও উদ্দেশ্য এমনভাবে ব্যাখ্যা করে, যেন তাদের প্রবৃত্তির পরিপন্থি না হয়।

ইহুদিদের এই নতুন তাফসির ও ব্যাখ্যা তাদের সেই ধারণারই প্রতিফলন ছিল যে, তারা সৃষ্টির সেরা, বাকি মানুষ তাদের গোলাম। তারা উক্ত মনগড়া তাফসির বংশপরম্পরায় চলে আসা উপদেশ বলে প্রচার করত এবং শত শত বছর যাবৎ সেই অনুযায়ী আমল চলছে বলে প্রসার করত। হজরত ঈসা আলাইহিস সালামের নবুওয়াত অস্বীকার করা এবং তার শরিয়ত না মানার কারণও ছিল ইহুদিদের কথিত বংশপরম্পরায় চলে আসা সেই উপদেশ ও শিক্ষার পরিপন্থি হওয়া; আর ইহুদিরা কোনোক্রমেই তাদের এইসব মনগড়া রেওয়ায়েত ছাড়তে রাজি ছিল না।

হজরত ঈসা আলাইহিস সালামকে আসমানে তুলে নেওয়ার দেড়শ' বছর পর ইহুদি আলেমরা তাওরাতের সেসব মনগড়া গোপন তাফসির প্রথমবারের মতো লিখিতরূপে সামনে আনার প্রয়াস চালায়। তাদের এই নতুন কর্মটির নাম দেয় 'মিশনা'। পাশাপাশি ইহুদি আলেমরা সকলের ঐকমত্যের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেয় যে, তাওরাতের পরিবর্তে এখন থেকে 'মিশনা' অনুযায়ী আমল করা হবে। তাওরাত অনুযায়ী আমলকারীরা খোদার ক্রোধ ও শাস্তির শিকার হবে। (পরবর্তীতে 'মিশনা'র সঙ্গে সংযোজনের পর তার নাম দেওয়া হয় 'তালমুদ'। বর্তমান ইহুদিরা এই গ্রন্থের উপরই আমল করে থাকে।)

প্রবৃত্তির চাহিদা পূরণে শরিয়তে বিকৃতি সাধন এবং এমন নতুন নতুন ব্যাখ্যা করার ফলে ইহুদিরা হকের পথ থেকে এত দূরে চলে যায় যে, তাদের অভ্যন্তরীণ অবস্থা সম্পর্কে অবগত কেউ-ই তাদের থেকে কোনো কল্যাণের আশা করে না। ইহুদি আলেমরা দীন বেচা, অধিকার হরণ করা, পার্থিব জিনিসের প্রতি লিপ্সার ক্ষেত্রে উপমা হয়ে গিয়েছিল। তাদের নেতাগোছের লোকদের মধ্যে লোভ-লালসা, কামনা-বাসনা এবং কার্পণ্য সীমাতিক্রম করেছিল। তাদের মধ্যে এমন দাঈ ও পথপ্রদর্শক ছিল, যারা শয়তানি শক্তিও ব্যবহার করত। জাদুটোনা করত। নিজের শত্রুর বিরুদ্ধে এসব শাস্ত্র ব্যবহার করত। আল্লাহর জিকিরের পরিবর্তে জাদুটোনা, বিভিন্ন শয়তানি কর্মকাণ্ডে তারা লিপ্ত থাকত। এগুলোকেই আত্মপ্রশান্তির মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করত। ইহুদিদের বড় বড় প্রাজ্ঞ ব্যক্তি এবং নেতৃস্থানীয় লোকেরা তাদের সেই হেদায়েত পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে মেনে চলত।

ইহুদিদের এরচেয়েও জঘন্য কাজ ছিল; শত শত বছর ধরে লাঞ্ছনা, বঞ্চনা এবং অনুভূতিহীনতার কারণে তারা পুরো পৃথিবীবাসীর প্রতি বীতশ্রদ্ধ এবং হিংসা ও প্রতিশোধপরায়ণ হয়ে উঠেছিল। তারা সব মানুষকে তাদের গোলামে পরিণত

করতে চেয়েছিল। কিছু কিছু এলাকায় তাদের এই মিশন শুরু করেও দিয়েছিল। তাদের এই প্রচেষ্টা সফল করার লক্ষ্যে চাতুর্য, দাঙ্গা-হাঙ্গামার আশ্রয় নেয়। তারা নিজেদের মধ্যে গুপ্তচর তৈরি করে। চক্রান্ত করে সরকারের গদি উলটে দিতে থাকে। এক সরকারকে অন্য সরকারের বিরুদ্ধে এবং এক কওমকে অন্য কওমের বিরুদ্ধে ব্যবহার করে নিজের স্বার্থসিদ্ধি করার ক্ষেত্রে ইহুদিরা বেশ পারঙ্গমতা অর্জন করে। তাদের এই সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি, প্রবৃত্তিপ্রেমী এবং নির্দয় হওয়ার কারণে পৃথিবীতে তারা কোনো ধরনের ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে সচেষ্ট হবে বলে আশা করা নিরর্থক ছাড়া কিছুই নয়।[১১৩]

আরবদের ধর্মীয় অবস্থা

খ্রিষ্টপূর্ব ছয়শত বছর পর্যন্ত আরবরা মূর্তিপূজার অভিশাপ থেকে মুক্ত ছিল। দীনে ইবরাহিমির উপর তারা অবিচল ছিল। কিন্তু ধীরে ধীরে জাজিরাতুল আরবের সাথে সম্পৃক্ত মূর্তিপূজারি কওমগুলোর প্রভাব তাদের মাঝে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। অহির পথনির্দেশ থেকে বঞ্চনা এবং আমর বিন লুহাইয়ের মতো কুটিল চিন্তার অধিকারী নেতার কারণে কেবল কুরাইশ গোত্রেই নয়, জাজিরাতুল আরবের সকল গোত্র দীনে ইবরাহিমি থেকে দূরে সরে যায়। দেখতে দেখতে সমগ্র আরবে মূর্তিপূজা ছড়িয়ে পড়ে।

পাথরমূর্তির নিকট প্রয়োজন পেশ করা, সমস্যা সমাধানকারী হিসেবে মান্য করা আরম্ভ হয়। মানুষের মধ্যে এই বিশ্বাস তৈরি হয়ে যায় যে, এইসব মূর্তির মধ্যে এমন আত্মা আছে, যা উপকার-অপকার করার ক্ষমতা রাখে এবং সৃষ্টির বিভিন্ন গোষ্ঠীর উপর তাদের ক্ষমতা বিদ্যমান। এভাবেও বলা হতো যে, এই উপাস্যরা আল্লাহ তায়ালার নৈকট্য অর্জনের মাধ্যম। এরা তার দরবারে সুপারিশ করবে। আল্লাহ তাদেরকে দুনিয়ার সকল চাহিদা প্রদান করেছেন।

মুশরিকরা মনে করত বিশ্বস্রষ্টা তো আল্লাহই। কিন্তু তিনি এখন অবসরে আছেন। তারই প্রতিনিধি হিসেবে দুনিয়া পরিচালনা করছে এই উপাস্যরা। যুদ্ধে জয়-পরাজয়, জন্ম-মৃত্যু, জীবিকা উপার্জন, সুস্থতা-অসুস্থতা এবং আরোগ্য লাভ করা এবং দুর্ভিক্ষে পতিত হওয়া- সবই তাদের অধীনে হয়ে থাকে।

হারাম শরিফের বরকতের ব্যাপারেও মাত্রাতিরিক্ত আকিদা রাখাও তাদের বিভ্রান্তির শিকার হওয়ার একটি কারণ। কিছু আরব-গোত্র মক্কা থেকে প্রত্যাবর্তন করার সময় সঙ্গে করে পাথর নিয়ে যেত। এগুলোকে কাবার তাওয়াফ করিয়ে বাড়িতে গিয়ে ঐ পাথরেরই পূজা শুরু করে দিত।[১১৪]

১১৩. আলইয়াহুদ ফিল আলামিল কাদিম, ডক্টর মুস্তফা কামালুদ্দীন আবদুল আলিম- পৃষ্ঠা ১১-২০; মাযা খাসিরাল আলাম বিনহিতাতিল মুসলিমিন, আবুল হাসান আলি নদবি- পৃষ্ঠা ৩৮-৪০

১১৪. সিরাতে ইবনে হিশাম- ১/৭৭

আরবে অনেক রকমের মূর্তি ছিল। কিছু কিছু মূর্তি বড় জৌলুস ও মর্যাদার পাত্র ছিল। মক্কার অধিকাংশ প্রসিদ্ধ মূর্তি এরকমই ছিল। তন্মধ্যে স্থানান্তরযোগ্য হালকা-পাতলা কিছু মূর্তিও ছিল। আরবরা এগুলোকে 'আসনাম' বলতো। এটা 'সানাম' শব্দের বহুবচন। বলা হয়ে থাকে যে, এটা মূলত আরামীয় ভাষার 'সলম' (ঝড়ষস) শব্দ থেকে নির্গত। আরবিভাষায় এসে তা 'সানাম' শব্দে রূপান্তরিত হয়ে যায়।

মূর্তিপূজারিদের গণক বা 'কাহেন' বলা হতো এবং তাদেরকে আল্লাহ তায়ালার নৈকট্য অর্জনের মাধ্যম মনে করা হতো। কুরাইশসহ সকল আরব-গোত্র 'কাহেন' তথা গণকদের অনুসরণ করত। এই মূর্তিপূজারি গণকেরা মন্দিরের খেদমতের বাইরে কখনো রণাঙ্গনে যেত না। এখান থেকেই তারা বাহিনীর জয়-পরাজয়ের ভবিষ্যদ্বাণী করত। অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তাদের কথাই চূড়ান্ত বলে গ্রহণ করা হতো। সেই গণকদের মধ্যে কবিলা কাল্‌বের যুহাইর বিন হুবাব এবং কবিলা বনু আবাসের যুহাইর বিন জাজিমা প্রসিদ্ধ ছিল।[১১৫]

আরবের প্রথম মূর্তি হলো 'মানাত'। এর দ্বারাই তারা পূজা আরম্ভ করে। এই মূর্তিকে তারা ভাগ্যবিধাতা বলে বিশ্বাস করত। এই মূর্তিটাই বনু খুজাআর সরদার আমর বিন লুহাই শাম থেকে নিয়ে এসেছিল। কুরাইশ ছাড়া বনু হুজাইল এবং ইয়াসরিবে বসবাসকারী আউস-খাযরাজও এই মূর্তির বিশেষ পূজারি ছিল।[১১৬]

কুরাইশের সবচেয়ে বড় মূর্তি হুবাল। আমর বিন লুহাই কাবা শরিফে একে স্থাপন করে। এটা লাল আকিক পাথর খোদাই করে মানবাকৃতি দিয়ে তৈরি মূর্তি। একশ' উট তার জন্য বলি দিত। কাবা শরিফ তাওয়াফের পর লোকজন তার কাছে গিয়ে মাথা মুণ্ডন করত। এই মূর্তির জন্য উৎসর্গিত উপহারের পৃথক খাজানা ও দায়িত্বশীল নির্ধারিত ছিল।[১১৭]

আরেকটি প্রসিদ্ধ মূর্তি হলো 'লাত'। এটা ছিল তায়েফের মন্দিরে। সাদা রঙের চৌকোনো মূর্তি ছিল এটা। আরবরা তার নামে কসম করত।[১১৮] তায়েফ ও তার আশপাশে বসবাসকারী বনু সাকিফের একজন দানবীরের নামে এই মূর্তির নামকরণ করা হয়, যিনি ঘি দিয়ে ছাতু ভিজিয়ে হাজিদের মাঝে পরিবেশন করতেন। তার মৃত্যুর পর আমর বিন লুহাইয়ের প্ররোচনায় তায়েফবাসী এই মূর্তি নির্মাণ করে।[১১৯]

---

১১৫. আততারিখুল ইসলামি আলআম- পৃষ্ঠা ১২৮, ১২৯

১১৬. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১৪৩

১১৭. আখবারু মক্কা, আবুল ওয়ালিদ আজরাকি- ১/১১৭- ১১৯ (দারুল আন্দালুস সংস্করণ)

১১৮. আলআসনাম, ইবনে কালবি- পৃষ্ঠা ৫

১১৯. আততারিখুল ইসলামি আলআম- পৃষ্ঠা ১৫৪, ১৫৫

আরবরা বৃক্ষেরও পূজা করত। যেমন : বনু গাতফানের একটি বাবলা গাছের নামে 'উজ্জা' নামক প্রসিদ্ধ নারীমূর্তিটি নির্মাণ করে। এটা ভূত-প্রেতের মর্যাদা রাখত। কুরাইশের লোকেরা 'আবদুল উজ্জা' (তথা উজ্জার গোলাম) নামটি অনেক গর্ব করে রাখত। উজ্জার জন্য পৃথক বলির স্থান ছিল। সেখানে পশু কুরবানি দেওয়া হতো।[১২০] 'যাতু আনওয়াত'ও কুরাইশের একটি প্রসিদ্ধ পবিত্র বৃক্ষ ছিল। তার পূজার জন্য লোকজন সেখানে একদিন অবস্থান করত।[১২১]

যুদ্ধের ময়দানে হুবাল, লাত, উজ্জার নামে স্লোগান দিয়ে যোদ্ধাদের উজ্জীবিত করা হতো। পৃথিবীতে তখন মূর্তিপূজার এত আধিক্য দেখা দিয়েছিল যে, কাবা-চত্বরেই তিনশো' ষাটটি মূর্তি ছিল। তন্মধ্যে ইসাফ ও নায়েলা নামে দুটি বড় ও প্রসিদ্ধ মূর্তিও ছিল। লোকজন ইসাফ থেকে তাওয়াফ শুরু করে নায়েলার কাছে গিয়ে শেষ করত। প্রথম মূর্তিটি ছিল পুরুষ, দ্বিতীয়টা নারী। এ ছাড়া দুমাতুল জানদালে 'ওয়াদ্দ' নামক একটি মূর্তির পূজা হতো। এটার তত্ত্বাবধানও কুরাইশরা করত। 'সুওয়া' বনু হুজাইলের মূর্তির নাম। আহলে জুরাশ 'ইয়াগুস' নামে সিংহ আকৃতির একটা মূর্তির পূজা করত। আহলে খাইওয়ান 'ইয়াউক' নামে এক মূর্তির পূজা করত। এটা ঘোড়া-আকৃতির ছিল। ইয়েমেনের হিময়ার গোত্র 'নাস্‌র' নামের একটি মূর্তির পূজা করত। এটা গাধা-আকৃতির ছিল।

এই পাঁচটি মূর্তি (ওয়াদ্দ, সুওয়া, ইয়াগুস, ইয়াউক, নাস্‌র) মূলত হজরত নুহ আলাইহিস সালামের কওমের মূর্তি ছিল। হাজারো বছর পূর্বে (ইরাকের) ব্যাবিলন শহরে নিমজ্জিত হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু কিছুদিন পরই মূর্তিপূজারিরা হুবহু সেই নামেই নতুন আকৃতিতে মূর্তি নির্মাণ করে নেয়। এ থেকে বুঝা যায়, তৎকালীন আরবরা কিছু প্রাণীকে এত পবিত্র মনে করত যে, তার ভাস্কর্য তৈরি করে পূজা করত।[১২২]

ইতিহাসবিদ ইবনে কালবি বলেন, 'মক্কার প্রতিটি ঘরে মূর্তি ছিল। তারা এর পূজা করত। সফরে যাওয়ার সময় মূর্তির গা ছুঁয়ে বের হতো এবং ফেরার পরেও প্রথমে মূর্তি স্পর্শ করত।[১২৩]

কিছু মানুষ মূর্তিপূজার স্থলে নক্ষত্রকে পবিত্র মনে করত। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বস্তু এবং প্রার্থনা ও চাওয়া-পাওয়ার কেন্দ্রস্থল বলে বিশ্বাস করত। তাদেরকে 'সাইবিন' বলা হতো। আর মক্কাবাসীরা মূর্তিপূজা অস্বীকারকারীদের বলত 'সাবি'।[১২৪]

---

১২০. আখবারু মক্কা, আবুল ওয়ালিদ আজরাকি- ১/১২৬

১২১. প্রাগুক্ত- ১/১২৯, ১৩০

১২২. আততারিখুল ইসলামি আলআম- পৃষ্ঠা ১৪৩, ১৪৪

১২৩. আলআসনাম, ইবনে কালবি- পৃষ্ঠা ৩৩

১২৪. তারিখুল ফিকরিদ দীনি আলজাহিলি, ইবরাহিম আলফাইয়ুমি- পৃষ্ঠা ২৭৯

আরবদের নৈতিক অবস্থা

আরবদের নগণ্য কিছু সৃষ্টিগত স্বভাব ছাড়া সার্বিকভাবেই তাদের নৈতিক অবক্ষয় ঘটেছিল। কথায় কথায় যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া, একে অপরের উপর তরবারি ছুঁড়ে মারা- এসব তাদের অভ্যাসে পরিণত হয়েছিল। ক্ষুদ্র বিষয় নিয়ে মতানৈক্যের জের ধরে তাদের মাঝে যুদ্ধ বেঁধে যেত। তারপর তা বংশপরম্পরায় চলতে থাকত।

মদপান এত ব্যাপক আকার ধারণ করেছিল যে, প্রতিটি ঘরেই নির্দিষ্ট মদ্যশালা থাকত। জুয়া খেলায় তারা এত মত্ত ছিল যে, নিজের সবকিছু উজাড় করে বাজি ধরত। আর এটাকে তারা গর্বের বিষয় মনে করত। চুরি-ডাকাতি খুব বেশি হতো। কিছু কিছু গোত্রের পেশাই ছিল লুটপাট করা।

বেহায়াপনা ও অশ্লীলতা এমন সস্তা হয়ে গিয়েছিল যে, লোকেরা জনসম্মুখে নারীদের দেখে চোখ টিপ দিত। ভরা মজলিসে প্রেমাস্পদের আলোচনা করে কবিতা আবৃত্তি করত। তাদের কাছে বিয়ের গুরুত্ব ছিল; কিন্তু ব্যভিচার কোনো মন্দ বিষয় ছিল না। পেশাদার পতিতারা জনবসতিতে অবস্থান করত। তাদের ঘরে নির্দিষ্ট ঝান্ডা উড়তো, দূর থেকে দেখেই তা চেনা যেত।

তৎকালীন সমাজে নারীদের কোনো মূল্য ছিল না। একেকজন পুরুষ ভেড়া-বকরির মতো যতজন ইচ্ছা নারীকে স্ত্রী হিসেবে ব্যবহার করতে পারত। স্ত্রীরা উত্তরাধিকার সম্পত্তি হিসেবে অন্যদের মালিকানায় চলে যেত। লোকজন ছেলে জন্ম নিলে খুশি হতো। মেয়ে জন্ম নিলে মানুষদের থেকে মুখ লুকিয়ে ফেলত। বহু লোক মেয়ে জন্মের পর গোত্রের তিরস্কারের আশঙ্কায় তাকে জীবিত পুঁতে ফেলত।

আরবের সবচেয়ে সুন্দর ও সামগ্রিক চিত্র বর্ণনা করেছেন নাজাশির দরবারে হজরত জাফর বিন আবু তালেব রাদিয়াল্লাহু আনহু, তিনি বলেন, 'আমরা তো এক মূর্খ জাতি ছিলাম। মূর্তিপূজা করতাম, মৃত প্রাণী ভক্ষণ করতাম। সবধরনের অশ্লীল ও গুনাহের কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হতাম। আমাদের মধ্যে সক্ষম ও শক্তিশালী ব্যক্তিরা অক্ষম ও দুর্বলদের লুটপাট ও অত্যাচার করত।[১২৫]

আবদুল মুত্তালিব

কুরাইশ সরদার হাশিম শাম থেকে বাণিজ্যসফর শেষ করে প্রত্যাবর্তনের সময় ইয়াসরিবে অবস্থান করতেন। একবার বনু নাজ্জারের এক সরদার আমর বিন লাবিদের কাছে অবস্থান করছিলেন। তাদের মাঝে এত আন্তরিক সম্পর্ক ছিল যে, হাশিমের অনুরোধে আমরের কন্যা সালামাকে তার কাছে বিয়ে দিয়ে দেন। হাশিম যুবাবয়সেই ইনতেকাল করেন। তার গর্ভবতী স্ত্রী সালামা ইয়াসরিবেই

১২৫. সিরাতে ইবনে হিশাম- ১/৩৩৬

ছিলেন। কিছুদিন পর ছেলে জন্মগ্রহণ করলে তার নাম রাখা হয় 'শাইবা'। এই এতিম বাচ্চা ছয় বছর পর্যন্ত নানাবাড়িতেই লালিত-পালিত হয়।

মক্কাতে হাশিমের উত্তরাধিকারীদের জানাই ছিল না যে, তার বংশের মধ্যে একটি অমূল্য রত্ন কোথাও আছে। সাত বছর পর হাশিমের ভাই মুত্তালিবকে ইয়াসরিব থেকে আগত এক ব্যক্তি সংবাদ দেয় যে, ইয়াসরিবের কিছু ছেলের সাথে তোমার এক ভাতিজাকেও দেখেছি। এমন মূল্যবান সন্তান থেকে বঞ্চিত থাকা ঠিক হবে না।'

এই সংবাদ শুনেই মুত্তালিব ইয়াসরিব অভিমুখী হন। হাশিমের স্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং তার অনুমতিক্রমে শাইবাকে মক্কায় নিয়ে আসেন। মক্কায় প্রবেশকালে শাইবা সওয়ারিতে তার সামনে বসে ছিল। লোকেরা দেখে ভাবে যে, মুত্তালিব হয়তো কমবয়সি গোলাম ক্রয় করে এনেছেন। সেদিন থেকে শাইবাকে তারা 'আবদুল মুত্তালিব' (আবদুল মুত্তালিবের গোলাম) বলে ডাকতে থাক। যুবাবয়সে পদার্পণ করার পর এই আবদুল মুত্তালিবই কুরাইশের সবচেয়ে খ্যাতিমান সরদার হন।[১২৬]

মুত্তালিব জীবনভর আপন ভাতিজার পরিপূর্ণ দেখভাল করার পাশাপাশি হাজিদের খেদমতও করেন। তিনি যখন কোনো এক সফরে ইয়েমেনের এক প্রত্যন্ত অঞ্চলে মারা যান, তখন ভাতিজা আবদুল মুত্তালিব বিন হাশিমকে তার স্থলাভিষিক্ত করা হয়। আবদুল মুত্তালিব হাজিদের পানাহারের এমন সুন্দর ব্যবস্থা করেন যে, ইতিপূর্বে কুরাইশের কারো মধ্যেই এর উদাহরণ পাওয়া যায় না।[১২৭]

আবদুল মুত্তালিব একাধিক বিয়ে করেন। তার অনেক সন্তান হয়। এক বিয়ে করেন নানাবাড়ি বনু নাজ্জারের মেয়ে ফাতিমা বিনতে আমর বিন আয়েজকে। এই বিবির গর্ভেই নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পিতা আবদুল্লাহর জন্ম হয়।[১২৮]

এই সময়েই আবদুল মুত্তালিব স্বপ্নে দেখেন এক ব্যক্তি জমজম কূপ খনন করার নির্দেশ দিচ্ছেন। জমজম কূপ দীর্ঘ সময় বন্ধ ছিল। বনু জুরহুম মক্কা ছেড়ে চলে যাওয়ার সময় জমজম কূপটি মাটি দিয়ে এমনভাবে ভরাট করে দেয় যে, তার কোনো নামনিশানা অবশিষ্ট থাকেনি।

আবদুল মুত্তালিব ঘুম থেকে জেগে ভোরেই ছেলে হারিসকে নিয়ে জমজম কূপের কাছে পৌঁছে যান। উভয়ে মিলে খনন করতে করতে পানির সন্নিকটে

১২৬. আলকামিল ফিত তারিখ- ১/৬১৩, ৬১৪, তারিখে ইবনে খালদুন- ২/৪০২

১২৭. তারিখে ইবনে খালদুন- ২/৪০২

১২৮. লুবাবুল আনসাব, ইবনে ফানদামাহ বাইহাকি- ১/৫

পৌঁছেন। এটা দেখে আবদুল মুত্তালিব যারপরনাই আনন্দিত হন। এভাবেই শতাব্দীকাল পর জমজম কূপ নতুন করে প্রবাহিত হয়।[১২৯] যেহেতু জমজম কূপের দ্বিতীয়বার প্রবাহিত হওয়ার ক্ষেত্রে আবদুল মুত্তালিবের একক অবদান, তাই এর খেদমতের জন্য তিনি অন্য কোনো খান্দানকে শরিক করতে চাইতেন না। কিন্তু কুরাইশের অন্য সরদারেরা তার সঙ্গে ঝগড়ায় লিপ্ত হয়। তাদের ইচ্ছা ছিল জমজমের তত্ত্বাবধানে বনু হাশিমও অংশীদার থাকুক। তখন আবদুল মুত্তালিব মানত করেন যে, তার যদি দশজন পুত্রসন্তান হয়, তা হলে তাদের থেকে একজনকে আল্লাহর রাস্তায় কুরবানি দেবেন।

আল্লাহর অপার কারিশমা যে, হারিসের পর আবদুল মুত্তালিবের আরো নয়টি ছেলে হয়। তারা হলেন জুবাইর, হাজাল, জিরার, মুকাওয়িম, আবু লাহাব, আবু তালেব, আবদুল্লাহ, আব্বাস এবং হামজা। হামজার জন্মের মধ্যদিয়ে যখন দশ পূর্ণ হয়, তখন তার সেই মানত পূরণ করা আবশ্যক হয়ে পড়ে।[১৩০]

আবদুল্লাহ

কোন ছেলেকে আল্লাহর রাস্তায় কুরবানি দেবেন, তা নির্ধারণ করার জন্য সবার নাম লিখে লটারি দেন। প্রতিবারই ছেলে আবদুল্লাহর নাম উঠে আসে। তার প্রতি আবদুল মুত্তালিবের সীমাহীন ভালোবাসা ছিল; তাই লটারিতে তার নাম ওঠায় ভীষণ কষ্ট পান তিনি। কিন্তু মানত পুরা করতে হবে বিধায় মনে পাথর বেঁধে আবদুল্লাহকে শুইয়ে দেন এবং জবাই করার জন্য ছুরি চালাতে যাবেন এমন সময় এক ছেলে এগিয়ে এসে আবদুল্লাহর পা ধরে টান দেয়।

ওদিকে কুরাইশ সরদারেরা দৌড়ে এসে আবদুল মুত্তালিবকে জোরপূর্বক এ কাজ থেকে বারণ করে বলে, 'তুমি এটা করলে তো মানুষ কুরবানির রীতি চালু হয়ে যাবে।' এরপর আবদুল মুত্তালিব কুরাইশের পরামর্শে দীর্ঘসফর করে খাইবারের এক নারী গণকের নিকট গমন করেন। তাকে ঘটনার বিবরণ শুনিয়ে তার পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করেন। ফলে আবদুল্লাহর পরিবর্তে একশ' উট কুরবানি দেন।[১৩১]

কিছুদিন পর আবদুল্লাহ বনু জুহরার এক কন্যা আমিনা বিনতে ওয়াহাবকে বিয়ে করেন। তিনি কুরাইশের অন্যান্য সকল নারী থেকে অধিক সম্ভ্রান্ত ও উঁচুবংশীয় ছিলেন। আল্লাহ তায়ালা এই আবদুল্লাহ ও আমিনার ললাটেই দয়ার

১২৯. সিরাতে ইবনে হিশাম- ১/১৪৩-১৪৬

১৩০. সিরাতে ইবনে হিশাম- ১/১৫১-১৫৩

১৩১. প্রাগুক্ত- ১/১৫৪ হজরত হাকিম বিন হিজাম রা. (তিনি হস্তীবর্ষের ১৩ বছর পূর্বে জন্মগ্রহণ করেন।) এর বক্তব্য অনুযায়ী এই ঘটনা নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্মের পাঁচ বছর পূর্বে সংঘটিত হয়। (আল-মুসতাদরাক, হাকিম- ৬০৪৩)

নবী দু-জাহানের বাদশাহ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পিতা-মাতা হওয়ার পরম সৌভাগ্য লিখে দেন।[১৩২]

আবদুল্লাহ পঁচিশ বছর বয়সেই কুরাইশের এক বাণিজ্য কাফেলার সঙ্গে শাম সফর করেন। প্রত্যাবর্তনের সময় পিতার নির্দেশ অনুযায়ী ইয়াসরিব গমন করেন সেখান থেকে খেজুর নিয়ে আসার জন্য। কিন্তু পথিমধ্যে প্রচণ্ড অসুস্থ হয়ে পড়েন তিনি। সফরের অযোগ্য হয়ে যান। আবদুল মুত্তালিব তা জানতে পেরে সঙ্গে সঙ্গে বড় ছেলে হারিসকে ইয়াসরিব পাঠিয়ে দেন। কিন্তু হারিস গন্তব্যে পৌঁছার পূর্বে এক মাস অসুস্থ থেকে অফাত বরণ করেন আবদুল্লাহ। তাকে নাবিগায়ে জু'দির কাছে দাফন করা হয়।[১৩৩]

আবদুল মুত্তালিব প্রিয় যুবক ছেলের আকস্মিক মৃত্যুতে ভীষণ ব্যথিত হন। তার জানা ছিল না আল্লাহ তায়ালা তাকে এমন দৌহিত্র দান করবেন, যে তার নাম কেয়ামত পর্যন্ত জিইয়ে রাখবেন।

জাজিরাতুল আরবের উপর ঐশী-তত্ত্বাবধান কেন?

সমগ্র পৃথিবী যখন ঘোর অমানিশা এবং কয়েক স্তরের গোমরাহির পর্দায় আবৃত হয়ে পড়েছিল, সে সময়ই শেষনবীর আগমন হয়। তার আগমন সম্পর্কে পূর্ববর্তী নবীগণের ভবিষ্যদ্বাণী তাদের প্রকৃত অনুসারীদের মুখে মুখে এবং বিভিন্ন গোত্র ও চিঠিপত্রে ব্যাপক প্রসার লাভ করেছিল। তবে এমন মুক্তি-মানবের আবির্ভাব শুষ্ক মরুভূমির দেশ আরবে হবে; কারোই তা আশা ছিল না। স্বয়ং আরবদের দিলেও এমন অভ্যুত্থানের চিন্তা কখনো আসেনি। তাদের এত নিকৃষ্ট দোষ, মন্দাচার থাকার পরেও আল্লাহ তায়ালা শেষনবীকে তাদের মাঝেই প্রেরণ করলেন এবং নবীর সাহায্য-সহায়তার জন্য তাদেরকেই নির্বাচন করলেন। এতে অনেক হেকমত ও প্রজ্ঞা রয়েছে।

১৩২. সিরাতে ইবনে হিশাম- ১/১৫৬
আমিনা বিনতে ওয়াহাব পিতার দিক থেকে কুরাইশের শাখাগোত্র বনু জাহরার অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। আর তার মা বাররাহ বিনতে আবদুল উযযার দিক থেকে বনু আবদুদ দার বিন কুসাইয়ের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। এই বাররাহই নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শ্রদ্ধেয়া নানি ছিলেন। [নাসাবু কুরাইশ, জুবাইরি, পৃষ্ঠা ২০, ২১]
তাই এই ধারণা ভুল যে, ইয়াসরিবের বনু নাজ্জার নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নানাবংশ ছিল। বরং নবীজির (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নানাবংশ মক্কাতেই ছিল। বনু নাজ্জার রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পিতার নানাবংশ ছিল।

১৩৩. আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া- ৩/৩৮২ (দারু হিজর সংস্করণ), আলকামিল ফিত তারিখ- ১/৬১২, ৬১৩
(আমি কিছু মারফতে শুনতে পেরেছি, কয়েক বছর পূর্বে মসজিদে নববির সম্প্রসারণের সময় আবদুল্লাহর কবরের সন্ধান পাওয়া যায়। কিন্তু জনসাধারণের ফিতনায় পড়ার আশঙ্কায় কবরের স্থান গোপন রাখা হয়। আল্লাহ তায়ালাই ভালো জানেন। - লেখক)

সবচেয়ে বড় হেকমত হচ্ছে- আরবদের চরম গোমরাহি এবং বিচ্যুতি সত্ত্বেও তাদের মধ্যে আভিজাত্য এবং মর্যাদাপূর্ণ কিছু বৈশিষ্ট্য তখনও অবশিষ্ট ছিল। হিন্দু এবং ইহুদিদের মতো তাদের মাঝে ধোঁকা, প্রতারণা এবং মিথ্যার অভ্যাস ছিল না। নিরক্ষরতা ও মূর্খতা সত্ত্বেও তারা নিখাঁদ সত্যবাদী ছিল। পাশাপাশি তারা ছিল বুদ্ধিমান ও সতর্ক। নিজে প্রতারিত হলেও অন্যকে ধোঁকা দিতে পছন্দ করত না। আরবরা বড় বড় নগরী এবং প্রাচীন সভ্যতাগুলোর ক্ষমতার প্রভাবে সৃষ্ট কাপুরুষতা, আরামপ্রিয়তা ও অলসতা থেকে মুক্ত ছিল। তাদের শিরায় তাজা রক্ত প্রবাহিত হতো। আর তারা স্বভাবতই যেকোনো বিপদ মোকাবেলার জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকত।

ইহুদিরা শত শত বছর গোলামি করার দরুন নিকৃষ্ট স্বভাবের হয়ে গিয়েছিল। চোরের মতো তারা লুকিয়ে লুকিয়ে চক্রান্ত আঁটত। ওদিকে রোমান ও পারস্য দীর্ঘসময় ধরে রাজত্ব করার কারণে তাদের মধ্যে আত্মগরিমা ও অহংকার চলে এসেছিল। আরবরা না কারো গোলাম ছিল, না কোনো শাসক ছিল। তারা তাদের সংক্ষিপ্ত পরিধিতে স্বাধীন ছিল। তারা কারো উপর না হামলা করত, না কারো কাছে বিক্রি হতো।

পৃথিবীর প্রাচীন সকল সভ্যতার বাসিন্দারা শিল্পকর্ম, জ্ঞানবিজ্ঞানে এমনভাবে আত্মতৃপ্তির সাথে মশগুল হয়ে যায় যে, কেউ-ই আচরণ-উচ্চারণে নিজের মূর্খতা এবং জ্ঞানের স্বল্পতার কথা স্বীকার করতে রাজি ছিল না। তার বিপরীতে আরবরা ছিল সরলপ্রকৃতির এবং সত্যান্বেষী। তাদের তনুমন কোনো বিভ্রান্তিকর দর্শনের চক্করে পড়ে বিকল হয়ে যায়নি। তাদেরকে কেবল এটুকু অনুভূতি দেওয়ার প্রয়োজন ছিল যে, তাদের বর্তমান পথটি সঠিক নয়। ব্যস, তাদের মতাদর্শ পরিবর্তন করতে অধিক সময়ের প্রয়োজন হতো না।

ভৌগোলিক দিক থেকেও বিশ্বব্যাপী দীন এবং পৃথিবী-বিস্তৃত উম্মাহর প্রধানকেন্দ্র হিসেবে আরবভূমি নির্বাচনই ছিল সর্বাধিক যুক্তিযুক্ত। কারণ, পৃথিবীর আবাসনের দিক থেকেও আরব একেবারে মধ্যস্থলে অবস্থিত, বিষুবরেখার তিনটি বড় অংশের মিলনস্থল: এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকার নিকটবর্তী অঞ্চল। পূর্ব-পশ্চিমের অধিকাংশ দেশ সমান দূরত্বে অবস্থিত। তাই এখান থেকে যেকোনো নির্দেশ জারি হলে, কোনো দাওয়াতের সূচনা হলে পুরো পৃথিবীতে খুব দ্রুত ছড়িয়ে যাবে। কিন্তু আরবের স্থানে যদি প্রাচীন সভ্যতার কেন্দ্রস্থল হিন্দুস্থান কিংবা গ্রিকদেরকে নতুন দীনের কেন্দ্রস্থল হিসেবে বেছে নেওয়া হয়, পূর্ব কিংবা পশ্চিম যেকোনো এক দিকে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়বে।

এক নতুন ধর্মের জন্য আরবকে নির্বাচন করা প্রতিরক্ষার দিক থেকেও অধিক

প্রজ্ঞাপূর্ণ ছিল। কারণ, আরব তিনদিক থেকে সমুদ্রবেষ্টিত, উত্তরদিকে রয়েছে ধু-ধু মরুভূমি। এজন্য এসব এলাকায় বহিঃশত্রুর আক্রমণ করে সফল হওয়া দুষ্কর। আর এ কারণেই হাজার বছর অতিক্রান্ত হলেও আরবদেরকে কারো গোলামি করতে হয়নি। গ্রিক গ্রেট আলেকজান্ডার, ব্যবিলনের বুখতু নাসার এবং ইরানের কুরিশের মতো দিগ্বিজয়ী বাদশাহরা আরবদের পার্শ্ব দিয়ে অতিক্রম করলেও তাদের বালুময় রাষ্ট্রে ভুলেও প্রবেশ করতে পারেনি।

সর্বশেষ রাসুলের জন্য এমন সরলমনা, দরিদ্র এবং কঠোর পরিশ্রমী আরবদেরকে নির্বাচন করার নেপথ্য হেকমত হিসেবে বলা হয়ে থাকে যে, আল্লাহ তায়ালা পৃথিবীকে তার কুদরতের কারিশমা প্রদর্শন করতে চান। শেষনবী যদি রোম-পারস্যের সঙ্গে সম্পর্ক রাখতেন, তা হলে প্রথমেই পৃথিবী দীনের দাওয়াতের ব্যাপারে এ কথা বলার সুযোগ পেয়ে যেত যে, ঐসব বড় বড় রাজ্যের ধনদৌলত এবং শক্তি-সামর্থ্যের কারণে দীন চমকে উঠেছিল। অন্যথায় এ দীন অভিনব কোনো কিছুই নয়।

বিশ্বজাহানের প্রতিপালক শেষনবীকে এক দুর্বল ও দরিদ্র সমাজে জন্ম দিয়ে ঐ ধনদৌলতের প্রতাপের দোহাই দেওয়ার সম্ভাবনা নাকচ করে দেন। চোখে আঙুল দিয়ে এই বাস্তবতা পৃথিবীকে দেখিয়ে দিয়েছেন যে, তিনি তার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করবেন। তার দীনের প্রচার-প্রসার এবং তার শেষ-রাসুলকে উভয় জাহানে সমুন্নত করার জন্য ধনদৌলত, বড় বড় ফওজ ও হুকুমতের প্রয়োজন নেই। তিনি চাইলে দুর্বল ও অক্ষমদের দিয়েও কাজ নিতে পারেন। আর তিনি যখন ইচ্ছা, যাকে ইচ্ছা এই জমিনের ক্ষমতা প্রদান করতে পারেন।

তদ্রূপ শেষনবী যদি গ্রিক, আলেকজান্দ্রিয়া কিংবা কুস্তনতুনিয়ার মতো প্রাচীন জ্ঞানকেন্দ্রগুলোর কোনো একটিতে প্রেরিত হতেন, তা হলে সন্দেহ হতো যে, এই নবী হয়তো প্রাচীন জ্ঞানবিজ্ঞান এবং দর্শনশাস্ত্র শিখে নতুন এক দীন আবিষ্কার করেছেন। তাদের সেই দর্শনশাস্ত্র নতুন ধাঁচে মানুষের সামনে পেশ করেছেন। এজন্য আল্লাহ তায়ালা শেষনবীকে নিরক্ষর-মূর্খ আরবজাতির মাঝে প্রেরণ করার মাধ্যমে এই বাস্তবতা তুলে ধরেছেন যে, এই দীন পূর্ববর্তী জ্ঞানবিজ্ঞানের নির্যাস কিছু নয়; বরং এটি সত্য নবীর উপর নাজিলকৃত আসমানি দীন। স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা তার সৃষ্টির জন্য এই দীন পছন্দ করেছেন।

***

ইতিহাসের শিক্ষা

- পূর্ববর্তী উম্মতের মধ্যে আমাদের জন্য অনেক শিক্ষা রয়েছে। আল্লাহ তায়ালার অবাধ্য কওমগুলো ধ্বংস হয়ে যায়; আর অনুগত বান্দারা দুনিয়া-আখেরাত উভয় জাহানে সফল।
- পূর্ববর্তী উম্মতের নির্ভরযোগ্য অবস্থা কুরআন কারিম ও হাদিস শরিফে পাওয়া যাবে। আর এটা প্রমাণ করে যে, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সত্য নবী। তিনি লেখাপড়া না শিখে, পাঠশালায় না পড়ে পূর্ববর্তী উম্মতের ইতিহাস কত পরিষ্কারভাবেই-না বর্ণনা করেছেন।
- কোনো কওম যখন আত্মপ্রবঞ্চনা এবং অহংকারবশত নবীগণের উপদেশ গ্রহণের ক্ষেত্রে যুক্তিকে প্রাধান্য দেয়, তখন তারা চরম গোমরাহির শিকার হয়। বনি ইসরাইলের উদাহরণ আমাদের সামনেই বিদ্যমান।
- আম্বিয়া ও তাদের কওমের মধ্যকার সমস্যা নিরসনে তারা কোনো ধরনের পদ্ধতি অবলম্বন করেছিলেন, অনুসন্ধান করলে সেখানেও একজন দাঈয়ের পাথেয় মিলে যাবে।
- কোনো দাঈ যদি তার কওমের মধ্যে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন, কওম মূর্খ হয়, মূর্তিপূজারি এবং মুশরিক হয়, দীর্ঘদিন মেহনত করার পরেও কোনো ফল দেখা যায় না; তো তার জন্য হজরত নুহ আলাইহিস সালামের জীবনের মাঝে নির্দেশনা আছে।
- কোনো জাতি যদি শক্তি-সামর্থ্য, পেশা, শিল্প এবং বিজ্ঞানে উৎকর্ষ সাধনের কারণে আত্মগরিমায় লিপ্ত হয়, আর এর ফলে সত্যপথ গ্রহণে অনাগ্রহ দেখায়, তা হলে তাদের জন্য হজরত হুদ আলাইহিস সালামের কওমের অবস্থা থেকে শিক্ষা নেওয়া যায়।
- চাষাবাদ, বাগ-বাগিচার পরিচর্যা এবং নির্মাণশিল্পে যদি কোনো কওম অত্যধিক দক্ষতা, পারদর্শিতা ও সাফল্য অর্জন করে, তা হলে এমন সমাজের সাথে দাওয়াতি কার্যক্রম পরিচালনার পদ্ধতি কেমন হবে, তা জানার জন্য হজরত সালেহ আলাইহিস সালামের জীবনী দেখুন।
- যদি লোকেরা মুশরিক, মূর্তিপূজক এবং ভ্রান্ত আকিদা বিশ্বাসী হয়, তাদেরকে বুঝানোর মতো মানুষও আপনি একা হন, হকের দাওয়াতের প্রচার-প্রসারে

জালেম ও প্রতাপশালী শাসকের অত্যাচারের মুখে পড়ার আশঙ্কা হয়, তা হলে হজরত ইবরাহিম আলাইহিস সালামের জীবনীতে দৃষ্টি বুলান।

- আপনি যদি আহলে হক পরিবারের লোক হন, তা হলে আপনি আপনার পূর্ববর্তী বুজুর্গদের উত্তরাধিকার বুকে ধারণ করুন, আর তাদের বাতলে যাওয়া আল্লাহর রাস্তায় আত্মোৎসর্গ করার জন্য উৎসাহী হোন। হজরত ইসমাইল আলাইহিস সালামের সেই ঈমানি স্পৃহা ও জজবা তার সুস্পষ্ট প্রমাণ।
- সমাজে যদি ঘুষ, ধোঁকাবাজি, নিরাপত্তাহীনতা, লুটতরাজ, অনিয়ম ছড়িয়ে পড়ে, এমন সমাজে দাওয়াতি কার্যক্রম পরিচালনা করার জন্য হজরত শুয়াইব আলাইহিস সালামের ঘটনাবলির প্রতি গভীর দৃষ্টিপাত করুন।
- যদি নিজেদের মধ্যেই মিথ্যা এবং আপনজনের বিচ্ছেদের শিকার হন, তা হলে হজরত ইয়াকুব আলাইহিস সালামকে দেখুন কত ধৈর্য ও আল্লাহর প্রতি আস্থার প্রমাণ দিয়েছেন।
- যদি আত্মীয়স্বজনের বিশ্বাসঘাতকতার শিকার হতে হয়, বন্ধুপ্রতিম লোকদের শত্রুতার কারণে কারানির্যাতন ভোগ করতে হয়, তা হলে হজরত ইউসুফ আলাইহিস সালামকে নিজের আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করুন। আর আল্লাহ তায়ালা যদি আপনাকে জিরো থেকে হিরো বানিয়ে দিয়ে আপনার শত্রুদের মুখে চুনকালি মেখে দেন; এক্ষেত্রেও হজরত ইউসুফ আলাইহিস সালামকে প্রকৃষ্ট উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করুন।
- আপনি যদি এমন সমাজে জন্ম নেন, যেখানে তাওহিদের কালিমা পাঠকারীরা খোদাদাবিদার শাসকদের গোলামে পরিণত হয়েছে; তাদেরকে হেদায়েতের সঠিক পথনির্দেশ হজরত মুসা আলাইহিস সালাম ও হজরত হারুন আলাইহিস সালামের দাওয়াতের তরিকা পর্যালোচনা করলে পাওয়া যাবে।
- আল্লাহ তায়ালা যদি জিহাদের সুযোগ দেন, তো হজরত দাউদ আলাইহিস সালামের জীবনী দেখা উচিত। তিনি তার শাসনব্যবস্থায় ন্যায়-ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করার মাধ্যমে আল্লাহর দীনের প্রসার করেছিলেন।
- আল্লাহ তায়ালা যদি উত্তরাধিকারসূত্রে নেতৃত্ব কিংবা ক্ষমতা প্রদান করেন, তা হলে দাউদ আলাইহিস সালামের পরিবারের মতো শোকরগুজার হওয়া উচিত। হজরত সুলাইমান আলাইহিস সালামের মতো রাষ্ট্রক্ষমতাকে আল্লাহর দীনের প্রচার-প্রসার এবং বান্দাদের খেদমতে ব্যবহার করা কর্তব্য।
- কোনো ভাগ্যবান ব্যক্তি যদি ইলম ও আধ্যাত্মিকতায় ভরপুর বংশে জন্ম নেয়; কিন্তু সমাজে মুসলমান থাকা সত্ত্বেও বদ আমল, ভ্রান্ত আকিদার কারণে

মানুষ পৃথিবীর গোলামিতে লিপ্ত হয় হজরত জাকারিয়া, হজরত ইয়াহইয়া, হজরত ঈসা আলাইহিমুস সালাম এবং মারিয়াম রাদিয়াল্লাহু আনহার জীবনী ও তাদের ধৈর্য-অবিচলতা উপাখ্যান অধ্যয়ন করুন।

- আল্লাহর দীন কারো মুখাপেক্ষী নয়। আল্লাহ যে-কারো মাধ্যমে তার দীনের হেফাজত, প্রচার-প্রসার ও উন্নতির কাজ নেন।
- অহংকার-আত্মগরিমা আল্লাহ তায়ালার একদম অপছন্দ। বনি ইসরাইল বংশীয় গরিমা প্রদর্শন করে সত্যের পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে যায়। যুগ যুগ ধরে তাদের শ্রেষ্ঠত্ব বহাল থাকে। আল্লাহ তায়ালা তাদের স্থানে বনু ইসমাইলকে পৃথিবীর নেতৃত্বের জন্য নির্বাচন করেন।
- জুলুম-অত্যাচার এবং অজ্ঞতা-মূর্খতার রাত যতই দীর্ঘ হোক, একদিন প্রভাতের আলো উদ্ভাসিত হবেই, হেদায়েতের প্রদীপ জ্বলবেই।

ইসলামপূর্ব ইতিহাস
শেষনবী হজরত মুহাম্মদ সা. এর জীবনী

হস্তীবর্ষ থেকে রবিউল আওয়াল ১১ হিজরি পর্যন্ত

৫৬৯ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ৬৩২ খ্রিষ্টাব্দ জুন পর্যন্ত

كمال علم و عمل کا پیکر، کرم مجسّم، تمام رحمت
جہاں میں ان خوبیوں کا انسان نہ آیا خیر البشر سے پہلے
পরিপূর্ণ ইলম ও আমলের চিত্র হলো
দয়ার আধার সর্বোত্তম মানব তিনি
ইতিপূর্বে তার মতো পরিপূর্ণ গুণাবলিসম্পন্ন মানব
এ ধরায় আসেনি।

মানবেতিহাসের সবচেয়ে বড় বিপ্লব

ভালোবাসা একটি প্রাকৃতিক উপাদান, যাকে কেন্দ্র করে মানুষ গড়ে তোলে জীবনের প্রতিটি অধ্যায়, যা বিরাজ করে প্রতিটি প্রাণীর সত্তায়। জীবনের প্রতিটি আশ্চর্যজনক বাঁকে এবং দৈনন্দিন কর্মব্যস্ততার ফাঁকে ভালোবাসার থাকে বিশাল অবদান। প্রতিটি ইতিবাচক পটপরিবর্তনের পেছনেই থাকে ভালোবাসার অনুদান। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য– বহুকাল এবং বহুবছর ধরে এই ভালোবাসাই অনুপস্থিত ছিল মানুষের মাঝে। মানবতার সঞ্জীবনে এবং সভ্যতার উদ্দীপনে কেউ একে কাজে লাগায়নি শতবর্ষ ধরে। মমতা-ভালোবাসার যেন মৃত্যু ঘটেছে প্রতিটি ঘরে, প্রতিটি মনে। হ্যাঁ, ভালোবাসা ছিল– তবে তা মমতা ও বেদনার নয়; বাহ্যিক চাকচিক্য ও সৌন্দর্যের প্রতি লালসার, রূপ-লাবণ্যে বিগলিত হওয়া কামনার।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আকৃতির মধ্যে মানবতার সেই হারানো সম্পদ মিলবে। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন মানুষ ছিলেন, যাকে আল্লাহ তায়ালা বহুগুণ দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। তার দর্শন লাভকারী বলতে থাকে যে, নবীজিকে (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যে ব্যক্তি হঠাৎ দেখত, সেই তার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে যেতো, প্রভাবিত হয়ে পড়তো, বলতে বাধ্য হতো যে, নবীজির মতো ইতিপূর্বে কাউকে দেখিনি এবং পরেও না।

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শুভাগমনে সত্য ও নিখাদ ভালোবাসার ঝরনাধারা উপচে পড়ে। উম্মতের প্রতিটি সদস্য তাকে এমনভাবে মহব্বত করতে থাকে যে, পৃথিবীর ইতিহাসে এমন প্রেমিকের সন্ধান পাওয়া যাবে না। উম্মত তার অনুসরণ-অনুকরণে নিজেকে মিটিয়ে দিয়েছে।'[১৩৪]

---

১৩৪. ইনসানী দুনিয়া পর মুসলমানোঁ কে উরূজ ওয়া যাওয়াল কে আছর, সাইয়ে আবুল হাসান আলী নদভী, পৃষ্ঠা ১১৮-১১৯

দুরূদ ও সালাম

اللهم اجعلْ صلواتك ورحمتك وبركاتك على سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين محمد عبدك ورسولك إمامِ الخير وقائد الخير ورسول الرحمة. اللهم ابعثه مقامًا محمودا يَغْبِطه الأولون والآخِرون.

হে আল্লাহ, আপনার খাস অনুগ্রহ, রহমত ও বরকত নাজিল করুন সাইয়িদুল মুরসালিন, ইমামুল মুত্তাকিন, খাতামুন নাবিয়্যিন হজরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর।

তিনি আপনার খাস বান্দা এবং রাসুল, পুণ্য এবং কল্যাণের পথের রাহনুমা ও পথপ্রদর্শক, দয়ার নবী।

হে আল্লাহ, তাকে আপনি 'মাকামে মাহমুদ' দান করুন, পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকলেই যার জন্য তাকে ঈর্ষা করবে।[১৩৫]

১৩৫. সুনান ইবনে মাজাহ- ৯০৬

আসন্ন বসন্তের পূর্বাভাস

হজরত আদম আলাইহিস সালাম পৃথিবীতে আগমনের পর মানবজাতির বয়সকাল কয়েক হাজার বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। ভূপৃষ্ঠে হাজারও জাতিগোষ্ঠীর বসবাস। পৃথিবীতে এমন কোনো অংশ নেই, যেখানে মানব-সভ্যতার ইতিহাস রচিত হয়নি। কিন্তু সেই ইতিহাসে বিশাল এক শূন্যতা রয়ে যায়। আর তা হলো সমগ্র বিশ্ববাসীর হেদায়েত ও হকের নির্দেশনা দেওয়া, যার পর পৃথিবীতে গোমরাহির কোনো আশঙ্কা থাকবে না। প্রয়োজন এমন শিক্ষার, যার পর কোনো অজ্ঞতা-মূর্খতা অস্তিত্বে আসবে না। এমন একটি আদর্শ সভ্যতা প্রয়োজন, যার ফলে সত্যিকার অর্থে তারা মানুষ হয়ে গড়ে উঠবে।

হাজারো বছর ধরে দুনিয়াতে নবী-আগমনের ধারাবাহিকতা চালু ছিল। কিন্তু কোনো নবীর শিক্ষাই সমগ্র পৃথিবীব্যাপী ছিল না। প্রত্যেক নবী বা রাসুলের দাওয়াত একটি নির্দিষ্ট জাতি, বংশ বা এলাকা পর্যন্ত সীমাবদ্ধ ছিল। সুতরাং এমন একজন নবীর প্রয়োজন ছিল, যিনি পুরো জগদ্বাসীর উদ্দেশে প্রেরিত হবেন, যিনি একইসময়ে সারা দুনিয়ার নেতৃত্ব দেবেন এবং বিভ্রান্ত মানবজাতিকে সঠিক পথের দিশা দেবেন।

যখন আল্লাহ তায়ালা তার মহান কুদরত আর হেকমতের অধীনে এই বিশাল দায়িত্ব দিয়ে কাউকে পাঠানোর ইচ্ছা করলেন। তখন এমন কিছু পরিস্থিতি তৈরি করে দেন, যা অচিরেই ঘটতে যাওয়া কোনো অস্বাভাবিক বিপ্লবের সংবাদ দিচ্ছিল।

আরবভূখণ্ড ছিল সেই চড়াই-উৎরাই পরিস্থিতির ময়দান। তার এক পার্শ্ব রোম এবং অপর পার্শ্ব কিসরা সাম্রাজ্যের সঙ্গে মিলিত ছিল। কিসরা ছিল প্রাচ্যের মুকুটধারী আর কায়সার এশিয়া ব্যতীত ইউরোপ-আফ্রিকার অনেকগুলো এলাকা দখল করে রেখেছিল। এরকম তিনদিক পরাশক্তি-বেষ্টিত একটি আরবভূখণ্ডে প্রকাশমান পরিবর্তনসমূহ নয়া জমানার বার্তা দিচ্ছিল।

বিপ্লবের ইঙ্গিতবহ প্রথম অস্বাভাবিক চিত্রটি ছিল আবরাহার কাবা শরিফ আক্রমণ এবং শিক্ষাপ্রদ পরাজয়। আবরাহা ঐ বাহিনীর একজন সালার ছিল। তাকে ৫০০ খ্রিষ্টাব্দে রোমের কায়সারের নির্দেশে হাবশার গভর্নর নাজাশি পাঠিয়েছিলেন ইয়েমেনের খ্রিষ্টানদের সাহায্যে, যেন সেখানকার ইহুদি শাসক ইউসুফ যু-নাওয়াসকে ক্ষমতাচ্যুত করতে পারে। ৭০ হাজার সৈন্য নিয়ে

বাহিনীপ্রধান আরিয়াত ইউসুফ যু-নাওয়াসের প্রধান কার্যালয়ে পৌঁছে তাকে পদচ্যুত করে নিজেই ক্ষমতা হাতে নেয়।

আরিয়াতের অধীনে আবরাহা দীর্ঘসময় চাকুরি করে। পরবর্তীতে তাদের মাঝে প্রচণ্ড মতবিরোধ দেখা দিলে তারা সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। আরিয়াতের আঘাতে আবরাহার নাক ও ঠোঁট কেটে যায়। তখন থেকেই আবরাহা 'নাককাটা' নামে প্রসিদ্ধ হয়ে যায়। আবরাহার চাকর সুযোগবুঝে মনিবের পক্ষে প্রতিশোধ নিতে আরিয়াতকে হত্যা করতে সক্ষম হয়। আবরাহা ছিল ভীষণ পাজি আর চতুর। সে চাটুকারিতামিশ্রিত বার্তা পাঠিয়ে নাজাশিকে বশ করে নেয়। ফলে সে ইয়েমেনে নাজাশির প্রতিনিধি এবং সেনাপ্রধানের দায়িত্ব গ্রহণ করে।

কিছুকাল পর আবরাহা তার গির্জাপূজারি প্রভুদের খুশি করার জন্য ইয়েমেনের রাজধানী সানআতে অত্যন্ত জাঁকজমকপূর্ণ একটি ভবন নির্মাণের উদ্যোগ নেয়। কয়েক বছরে তার নির্মাণকাজ শেষ হয়। গির্জা নির্মাণের জন্য সে ইয়েমেনের অধিবাসীদের উপর অকথ্য নির্যাতন করেছে। হাজার হাজার লোককে দিয়ে সে জোরপূর্বক কাজ করায়। সূর্যোদয়ের পূর্বেই শ্রমিকদের কাজ আরম্ভ করার নির্দেশ ছিল। সামান্য বিলম্ব করলেই হাত কেটে ফেলা হতো। নির্মাণ-উপকরণ হিসাবে সে ইয়েমেনের রানি বিলকিসের সুরম্য প্রাসাদ থেকে ইট, সোনা-রুপা, মরমর পাথর এবং মূল্যবান জিনিসপত্র খুলে খুলে নিয়ে আসত। তার এই অমানবিক নির্যাতনের কারণে ইয়েমেনিরা ভীষণ ক্ষুব্ধ ছিল।

তার ইচ্ছা ছিল আরব-গোত্রগুলো কাবা শরিফ থেকে বিমুখ হয়ে তার নির্মিত গির্জার প্রতি যেন আকৃষ্ট হয়ে যায়। নাজাশিকে পত্রমারফত তার অভিপ্রায় সম্পর্কে অবহিত করে। সে পত্রে লেখে- 'আরবরা যতক্ষণ না হজের জন্য এই গির্জার অভিমুখী হবে, ততক্ষণ আমি ক্ষান্ত হব না।'[১৩৬]

আরবরা যখন তার এই হীন মনোবাসনা সম্পর্কে অবগত হয়, তখন তারা আবরাহার প্রতি ভীষণ ক্রুদ্ধ হয়। কারণ, কাবার ভালোবাসা তাদের রন্ধ্রে রন্ধ্রে বহমান ছিল। কাবার পরিবর্তে অন্য কোনো ইবাদতখানার কল্পনাও তাদের অন্তরে ছিল না। তাই ফুকাইম (বিন কিনানা) গোত্রের একজন জজবাতি হাজি এক সুযোগে ঐ গির্জার ভেতরে ঢুকে নাপাক করে দিয়ে চলে আসে। আবরাহা যখন জানতে পারে যে, জনৈক আরব এহেন কাজ করেছে তখন সে কসম করে, কাবাঘর ধ্বংস না করে দম ফেলবে না।

৫৬৯ খ্রিষ্টাব্দের সেপ্টেম্বরে বিশাল সৈন্যবাহিনী নিয়ে আবরাহা মক্কার দিকে অগ্রসর হয়। বাহিনীতে ১৩টি জঙ্গি হাতি ছিল। আবরাহাকে মোকাবেলা

---

১৩৬. আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া- ৩/১৩৫-১৪১

করার সামর্থ্য আরবদের ছিল না। তারপরেও যু-নাফার এবং নুফাইল বিন হাবিব নামক দুই সরদার তাকে বাধা প্রদান করতে গিয়ে গ্রেফতার হয়। ফলে আবরাহার দম্ভ আরো বৃদ্ধি পায়। বিনাপ্রতিরোধে সে মক্কার নিকটে পৌঁছে যায়। বাহিনীর অগ্রবর্তী দলটি শহরে প্রবেশ করে বিভিন্ন এলাকায় লুটপাট করে। আবদুল মুত্তালিবের দুইশ উটও এই লুটপাটের শিকার হয়।

আবরাহা দূতমারফত কুরাইশ-নেতাদের কাছে সংবাদ পাঠায় যে, 'আমি তোমাদের সঙ্গে লড়াই করার জন্য আসিনি। আমার উদ্দেশ্য কেবল কাবা ধ্বংস করা। যদি তোমরা আমার কাজে বাধা না দাও, তবে তোমাদের সাথে আমার যুদ্ধ করার কোনো প্রয়োজন নেই।'

আবদুল মুত্তালিব একথা শুনে নির্ভীকতার সাথে উত্তর দেন, 'আমরা তার সঙ্গে লড়াই করতে চাই না। এটা তো আল্লাহর ঘর। নির্মাণ করেছেন ইবরাহিম খলিলুল্লাহ আলাইহিস সালাম। আল্লাহ যদি তার ঘর হেফাজত করতে চান, তা হলে তিনি নিজেই তা হেফাজত করবেন।'

দূত এই আজব উত্তর শুনে আবদুল মুত্তালিবকে আবরাহার কাছে নিয়ে যায়। দোভাষীর মাধ্যমে দুজনের মাঝে আলোচনা শুরু হয়। আবরাহা জিজ্ঞেস করে : তোমার কী চাই?

আবদুল মুত্তালিব বলেন, আমার দু'শ উট ফেরত চাই। আপনার সৈন্যরা ছিনিয়ে এনেছে।

আবরাহা বিস্মিত হয়ে বলে, আমি তোমাদের কাবাঘর ধ্বংস করার জন্য এসেছি। এর জন্য তোমাদের কোনো ভাবান্তর নেই! এই সময়ও তোমরা নিজেদের উটের ফিকির করছো! কাবাঘর তো তোমাদের পূর্ববর্তী বুজুর্গদের প্রতীক।

আবদুল মুত্তালিব নিশ্চিন্ত মনে বলেন, আমি তো আমার উটগুলোর মালিক। আর ঐ ঘরের মালিক আরেকজন। তিনি তাকে রক্ষা করবেন।

এবার আবরাহা দম্ভ ভরে বলতে থাকে, 'সেও আমার হাত থেকে আজ রক্ষা পাবে না।' এই বলে সে আবদুল মুত্তালিবের উটগুলো ফেরত দিয়ে দেয়।

আবদুল মুত্তালিব মক্কায় পৌঁছেই সবাইকে শহর খালি করার পরামর্শ দেন। লোকজন শহর ছেড়ে পাহাড়ে আশ্রয় নেয়। আবরাহার পরিণতি দেখার জন্য অধীর হয়ে অপেক্ষা করতে থাকে। ওদিকে আবদুল মুত্তালিব কাবার চৌকাঠ ধরে আল্লাহর দরবারে ফরিয়াদ করতে থাকেন, 'হে প্রভু, আবরাহা বাহিনীকে নিশ্চিহ্ন করে দিন।'

আবরাহা বাহিনী তখনও মক্কায় প্রবেশ করেনি। আচমকা দেখা গেল সবচেয়ে বড় জঙ্গি হাতিটি রাস্তায় বসে পড়েছে। বহু মারপিট করা সত্ত্বেও দাঁড়াচ্ছে না। কিন্তু যখনই ইয়েমেনের দিকে মুখ করা হলো, অমনি হাতিটা চলতে থাকল। তারপর পুনরায় মক্কার দিকে ফিরিয়ে দেওয়া হলে আবার মাটিতে বসে পড়ে। বুঝাই যাচ্ছিল যে, কোনো অদৃশ্য শক্তি মক্কায় প্রবেশে তাদেরকে বাধা দিচ্ছে।

পাহাড়ে আশ্রয়-নেওয়া-নগরবাসী হতবিহ্বল হয়ে এই দৃশ্য অবলোকন করছিল। ইত্যবসরে সমুদ্রের দিক থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে আসা ছোট ছোট পাখি আসতে দেখা গেল। প্রতিটির পায়ে এবং ঠোঁটে কঙ্কর। পাখিগুলো এসেই আবরাহা বাহিনীর উপর কঙ্কর নিক্ষেপ করতে শুরু করে। যার উপরই কঙ্কর পতিত হয়, সেই মারা পড়ছে। সৈন্যদের মাঝে তখন সীমাহীন আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে এবং তারা ভেগে যায়।

আবরাহা ক্ষতবিক্ষত হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। তখন লোকেরা তাকে উঠিয়ে ইয়েমেনের উদ্দেশ্যে রওনা দেয়। কিন্তু পথিমধ্যে তার দেহের একেকটি অংশ খসে খসে পড়তে থাকে। রাজধানী সানআতে পৌঁছার আগেই সে মারা যায়। তার দেহ এমনভাবে গলে গিয়েছিল যে, চামড়ার নিচে হৃদয় পর্যন্ত দেখা যাচ্ছিল।[১৩৭]

হস্তীবাহিনীর ঘটনা : একটি অদৃশ্য ইঙ্গিত

পাখির মতো একটি সাধারণ মাখলুকের মাধ্যমে বিশাল একটি বাহিনীর ধ্বংস হওয়া বিশ্ববাসীকে একথাই জানিয়ে দেয় যে, বিশ্বজগতের মালিক নিজের ঘর হেফাজত করেছেন।

হাবশি বাহিনীর এই পরিণতি বস্তুত কায়সারের গালে চপেটাঘাত ছিল, যে কায়সার প্রাচ্য-প্রতীচ্যের সবচেয়ে বড় ক্রুশপূজারি। এটা ছিল গির্জার পরাজয়, আরবের বিজয়। এর মাধ্যমে অনুমিত হচ্ছিল যে, অনতিবিলম্বে পৃথিবীতে বিপ্লব সৃষ্টিকারী এক মহানায়কের আবির্ভাব ঘটতে যাচ্ছে। আর তার কেন্দ্র হবে আরবভূমি। হাতিকে আরবিভাষায় 'ফীল' বলা হয়। এজন্য আবরাহার ঘটনাটি 'আসহাবে ফীলের ঘটনা' হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে।[১৩৮] আরবদের নিকট

১৩৭. আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া- ৩/১৪৩-১৪৮

১৩৮. হস্তীবাহিনীর ঘটনা এবং নবীজির জন্মের মাঝে কত সময়ের ব্যবধান? এক্ষেত্রে বিভিন্ন মত রয়েছে। কেউ বলে ৪০ দিন, কেউ বলে ৫৫ দিন। হাফেজ ইবনে কাসির ৫০ দিনের মতটি অধিক প্রসিদ্ধ বলেছেন। কিছু কিছু মত অনুযায়ী উক্ত ঘটনা নবীজির জন্মের ১০ বছর পূর্বে ঘটেছে। কিন্তু ইবনে কাসির রহ. সাহাবায়ে কেরামের কিছু বর্ণনার আলোকে প্রামাণিকভাবে শেষোক্ত মতটি খণ্ডন করেন। [আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া- ৩/৩৯৮]
ইবনে হাবিব (মৃত্যু ২৪৫ হিজরি) হস্তীবাহিনী ঘটনা ১৭ মহররম রবিবার বলেছেন। [আলমুহাব্বার- পৃষ্ঠা ১০] এই মত গ্রহণ করলে, তার ঠিক ৫৫ দিন পরই ১২ রবিউল আওয়াল হয়।

এই ঘটনা এতই গুরুত্ব পেয়েছিল যে, তারা এই বছরকে 'হস্তীবর্ষ' নামকরণ করে এবং পরবর্তী তারিখগুলোর গণনা তখন থেকে নতুনভাবে শুরু করে।

আবরাহার ধ্বংসের পর সামরিক স্বৈরশাসন বেশিদিন টেকেনি। আবরাহার ছেলে ইয়াকসুম কিছুদিন রাজত্ব করার পর মারা যায়। তারপর দ্বিতীয় ছেলে মাসরুক ক্ষমতায় বসে। কিন্তু সেও আরবদের বুকে দাউদাউ করে জ্বলতে-থাকা-প্রতিশোধের আগুন সামলাতে পারেনি। হিময়ার গোত্রের উঁচুবংশীয় এক ব্যক্তি সাইফ বিন যি-ইয়াযান উদ্ভূত পরিস্থিতি থেকে ফায়দা নেন। সৈন্যদের নিপীড়নের ফরিয়াদ নিয়ে পারস্যের বাদশাহ নওশেরওয়াঁর দরবারে গমন করে তার সাহায্য চান। নওশেরওয়াঁ হাবশিদের থেকে ক্ষমতা ছিনিয়ে নেওয়ার সুবর্ণ সুযোগ মনে করে তাকে সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দেন।

অবশেষে সাইফ বিন যি-ইয়াযান ইরানের একটি বড় বাহিনী নিয়ে জাজিরাতুল আরব উপস্থিত হয়ে মাসরুককে শক্তিপরীক্ষার আহ্বান জানান। তাদের মধ্যে একটি চূড়ান্ত লড়াই সংঘটিত হয়। যুদ্ধে মাসরুক মারা যায়। মাসরুক-বাহিনী পরাজিত হয়। ফলে জাজিরাতুল আরবের দক্ষিণে প্রতিষ্ঠিত খ্রিষ্টান হাবশিদের ৭২ বছরের একটি জুতসই মসনদ হাতছাড়া হয়ে যায়। সাইফ বিন যি-ইয়াযান আরবদের একজন গ্রহণযোগ্য শাসকে পরিণত হন। কারণ, তিনি আরবদের মুক্ত করেছেন বিদেশি শাসকদের অধীনতা থেকে।[১৩৯]

---

১৩৯. আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া- ৩/১৫৮-১৬০; তারিখে ইবনে খালদুন- ২/৭৪

নোট-১। হাবশিদের সাথে সাইফের সংঘাত নবীজির জন্মের পূর্বেই শুরু হয়েছিল। কিন্তু সমাপ্ত হয়েছিল তার জন্মের দুই বছর পর এবং সমগ্র ইয়েমেন তার দখলে চলে আসে। [দালাইলুন নুবুওয়াহ, বাইহাকি- ২/৯]

নোট- ২। মক্কার উপর আবরাহার যে হামলা হয়েছিল, সম্ভবত তা চান্দ্রবর্ষের পঞ্জিকা অনুযায়ী মহররম মাসে, আর মক্কি ক্যালেন্ডার অনুযায়ী সেটা ছিল রজব মাস (মার্চ ৫৬৯ খ্রিষ্টাব্দ)। আবরাহার আক্রোশ এজন্য ছিল যে, তার ঘোষণার পরেও কেন তার চার্চে কেউ হজের জন্য না গিয়ে বাইতুল্লাহয় গমন করল। জাহেলিযুগে হজ হতো মক্কি ক্যালেন্ডার অনুযায়ী, চান্দ্রবর্ষের পঞ্জিকা মোতাবেক নয়। আবরাহার আক্রমণের বছরও মক্কি ক্যালেন্ডার অনুযায়ী তার আক্রমণের পূর্বেই হজ সম্পন্ন হয়।

এটা যুক্তিসঙ্গত কথা নয় যে, আবরাহা হজের পরপরই হামলা করেছিল। কেননা, হজের পর আরো একটি ঘটনা ঘটেছিল। যে ঘটনার কারণে তার সেই ক্ষোভ আরও বৃদ্ধি পায়। ঘটনাটি ছিল- ফুকাইম (বিন কিনানা) গোত্রের এক আরব হাজি কাবার প্রতি প্রগাঢ় ভালোবাসার কারণে, এক সুযোগে আবরাহার সেই গির্জার ভেতরে ঢুকে তা নাপাক করে দিয়ে চলে আসে।' এ ধারণা করা নিতান্ত ভুল হবে যে, লোকটি কাবার হজ ছেড়ে দিয়ে ইয়েমেনে চলে গিয়েছে। যদি হজের পর তার ইয়েমেন যাত্রার কথা ধরা হয়, তা হলে তার সেখানে যেতে অবশ্যই মাসখানেক লাগবে। অর্থাৎ মহররমের মাঝামাঝিতে পৌঁছে সে গির্জা নাপাক করে। তা হলে এটা কীভাবে সম্ভব যে, সেই মহররম মাসেই আবরাহা মক্কায়

সৃষ্টির ঊষাকাল

অবশেষে সেই শুভমুহূর্ত ঘনিয়ে আসে, যার জন্য প্রতিটি অণু-পরমাণু অপেক্ষমাণ ছিল। হস্তীবাহিনীর ঘটনার চল্লিশ দিন পর সোমবার কুরাইশ-সরদার আবদুল মুত্তালিব বিন হাশিম তার ঘরে এক প্রভাতসূর্য উদিত হওয়ার সংবাদ পান। আল্লাহ তায়ালা তাকে একটি নাতি দিয়েছেন।[১৪০] মাসটি ছিল রবিউল আওয়াল।

পৌঁছে যায়। হ্যাঁ, এটুকু ধারণা করা যেতে পারে যে, হজের পর মাসখানেকের ভেতর আক্রমণ হয়; যদিও তা সুদূর সম্ভাবনা।

তবে অধিক যুক্তিযুক্ত কথা হলো ঐ নাপাকি-কাণ্ড ঘটানোর পর আবরাহার প্রস্তুতি নিতে কিছু সময় ব্যয় হয় এবং সৈন্যদের মক্কা পৌঁছতেও দেড়-দু'মাস লাগবে। ইবনে ইসহাকের রেওয়ায়েতের শব্দ থেকেও বুঝা যায় যে, আবরাহা খুব প্রস্তুতির পরই এসেছিল। ইবনে হিশাম লেখেন, 'তখন আবরাহা ভীষণ ক্রুদ্ধ হয় এবং শপথ করে যে, সে অবশ্যই কাবার কাছে গিয়ে তা ধ্বংস করবে। এরপর সে হাবশি বাহিনীকে প্রস্তুতি নেওয়ার নির্দেশ করে। বাহিনী প্রস্তুত হলে সে মক্কার উদ্দেশ্যে রওনা দেয়।' [সিরাতে ইবনে হিশাম- ১/৪৫]

এই হিসেবে আবরাহার হামলা ছ'মাস পর পরবর্তী মহররম (মহররম মাদানি পঞ্জিকা মোতাবেক রজবে মক্কি) হওয়াটায় অধিক যুক্তিসংগত।

১৪০. নবীজির জন্মতারিখ নিয়ে আলোচনা

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্মদিন সর্বসম্মতিক্রমে সোমবার ছিল। সহিহ হাদিসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে বলেন, ذاك يوم وُلِدتُ فيه 'এদিনে আমি জন্মগ্রহণ করেছি।' [সহিহ মুসলিম- ২৮০৪, কিতাবুস সিয়াম, বাবু ইসতিহবাবি সাউমি সালাসাতি আইয়ামিন মিন কুল্লি শাহর]

এর উপরও সকলেই একমত যে, বছরটি হস্তীবাহিনীর ঘটনার বছর ছিল। হজরত কায়েস বিন মাখরামা থেকে এমনটিই বর্ণিত হয়েছে। [সুনানু তিরমিজি- ৩৬১৯, মুসনাদ আহমাদ- ১৭৮৯১] যদিও এই হাদিসের সনদ যয়িফ। কিন্তু কাবাস বিন আশআম রা. এবং আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রা. থেকে ঐ হাদিসের সমর্থনে বর্ণনা পাওয়া যায়। [আলআহাদ ওয়াল মাছানি: ৯২৭ ইবনে আব্বাস থেকে, মুসনাদ বাযযার: ৪৭৬২]

এ হিসেবে উপর্যুক্ত হাদিস টিকে হাসান ধরে নেওয়া যায়।

অপরদিকে ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন,

وُلِد النبي صلى الله عليه وسلم يوم الإثنين، واستنبئ يوم الإثنين، وخرج مهاجرًا من مكة إلى المدينة يوم الإثنين، وقدم المدينة يوم الإثنين، وتوفي صلى الله عليه وسلم يوم الإثنين، ورفع الحجر الأسود يوم الإثنين

'অর্থাৎ তিনি নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সোমবারে জন্মগ্রহণ করেন, সোমবারে নবুওয়াতপ্রাপ্ত হন, সোমবারে মক্কা থেকে মদিনায় হিজরতের জন্য বের হন। সোমবারে মদিনায় আগমন করেন। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সোমবার ইনতেকাল করেন। সোমবারে হাজরে আসওয়াদ উত্তোলন করেন।' -[মুসনাদ আহমাদ-

তবে বিশুদ্ধ চান্দ্রবর্ষের পঞ্জিকা হিসেবে তা ছিল রমজান মাস। তারিখের ব্যাপারে মতানৈক্য রয়েছে। ৮, ৯, ১১ এবং ১২ হলো প্রসিদ্ধ তারিখ[১৪১]।

২৫০৬] এই বর্ণনাটি সনদের দিক থেকে যয়িফ। কারণ সনদে ইবনে লাহিয়াআ রয়েছে। সর্বোপরি উপর্যুক্ত হাদিসগুলো থেকে এটুকু প্রমাণিত হয় যে, নবীজির জন্ম হস্তীবর্ষের সোমবারে হয়েছে। ইবনে লাহিয়াআর রেওয়ায়েত গ্রহণ করা হলে তো হিজরত, নবুওয়াত, ওফাতের তারিখও এই তারিখই হয়। অপরদিকে ইমাম যুহরী রহ. মদিনায় আগমনের তারিখও ১২ রবিউল আওয়াল সোমবার উল্লেখ করেছেন। [তারিখুত তাবারি- ২/৩৯৩] ইমাম তাবারি রহ. এর বক্তব্য হলো, এসব বিষয়ে কারো কোনো দ্বিমত নেই। [তারিখুত তাবারি- ২/২৯৩]

১৪১. নবীজি কোন্ মাস এবং কত তারিখে জন্মগ্রহণ করেন, এ বিষয়ে হাদিসের কিতাবসমূহে কোন যয়িফ হাদিস ও বর্ণিত হয়নি। হ্যাঁ, ইতিহাস ও সিরাতগ্রন্থে কিছু যয়িফ বর্ণনা এসেছে। কিছু সনদ মুনকাতি, কিছু সনদবিহীন। একটি সনদও সহিহ কিংবা হাসান পর্যায়েও পৌঁছে না। সামনেই আমরা এগুলোর সনদসহ আলোচনা দেখতে পাব। উপরন্তু সনদের স্তর উল্লেখ করার দ্বারা উদ্দেশ্য এটা নয় যে, ঐতিহাসিক দিক থেকেও এগুলোর কোনো মূল্য নেই। বরং এখানে উদ্দেশ্য হলো, ঐসব রেওয়ায়েত দিয়ে শরিয়তের কোনো মাসআলা প্রমাণ করা যাবে না। ফলে নবীজির জন্মের নির্দিষ্ট কোনো তারিখ নির্ধারণ করে একটি শরিয়তসম্মত উৎসবের মর্যাদা দেওয়ার এবং সেদিনকে জাঁকজমকভাবে পালন করার সুযোগ নেই। যেহেতু এই তারিখগুলো জন্নি (আনুমানিক), কাতয়ি বা অকাট্য নয়; তাই কেউ যদি এই তারিখগুলো অস্বীকার করে, তা হলে তার দীন ও ঈমানের মধ্যে বিন্দুমাত্র কমতি আসবে না।

এবার আমরা নবীজির জন্মতারিখ সম্পর্কে প্রাচীন ঐতিহাসিক সূত্রগ্রন্থগুলো থেকে কিছু বক্তব্য উল্লেখ করব।

১২ রবিউল আওয়াল

১. ইবনে হিশাম (মৃত্যু ২১৩ হিজরি) মুহাম্মদ বিন ইসহাক (মৃত্যু ১৫১ হিজরি) থেকে বর্ণনা করেন, ইবনে ইসহাক বলেন, 'রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হস্তীবর্ষের ১২ রবিউল আওয়াল সোমবার জন্মগ্রহণ করেন।' [সিরাতে ইবনে হিশাম- ১/১৫৮] কিন্তু ইবনে ইসহাকের সিরাতগ্রন্থে তার এই বক্তব্যটি আমি খুঁজে পাইনি। হয়তো ইবনে হিশাম ইবনে ইসহাকের অন্য কোনো কিতাবে পেয়েছেন, যা আমাদের কাছে নেই। অথবা এই রেওয়ায়েতটি ইবনে ইসহাক থেকে কোনো মাধ্যমে নিয়েছেন। সর্বোপরি ইবনে হিশাম উক্ত রেওয়ায়েতটির সনদ উল্লেখ করেননি। কেবল 'ইবনে ইসহাক বলেছেন'- এটুকু বলেই থেমে গেছেন। এই রেওয়ায়েতটিই বাইহাকি, হাকিম, তাবারিও উল্লেখ করেছেন। সবারই ইবনে ইসহাক পর্যন্ত এসে তাদের সনদ শেষ হয়ে গেছে। [দালাইলুন নুবুওয়াহ- ১/৭৪; মুসতাদরাক- ৪১৮৭; তারিখুত তাবারি- ২/১৫৬]

সর্বাবস্থায় রেওয়ায়েতটি যয়িফ ও মুনকাতি সাব্যস্ত হয়। আর তিনশ' শতাব্দীতে এসে তা অধিক সনদে বর্ণিত হওয়ার দ্বারা শক্তিশালী হয়ে যাবে না। কারণ, প্রথম শতাব্দীর রাবি সম্পূর্ণ মাজহুল (অজ্ঞাত)।

২. হাফেজ ইবনে কাসির রহ. মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবার বরাতে হজরত জাবের ও আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রা. থেকে বর্ণনা করেন, 'রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হস্তীবর্ষের ১২ রবিউল আওয়াল সোমবার জন্মগ্রহণ করেন। এদিনই তিনি নবুওয়াত লাভ করেন। এদিনই তাঁকে উর্ধ্বাকাশে ভ্রমণ করানো হয়। এদিনই তিনি হিজরত করেন এবং ইনতেকাল করেন। [আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া- ৩/৩৭৫] ইবনে কাসির রহ. নিজেই এর

সনদ মুনকাতি বলেছেন (আমি অনেক খোঁজাখুঁজির পরেও মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবাতে উক্ত রেওয়ায়েতটি পাইনি এবং অন্যকোনো প্রাচীন ঐতিহাসিক সূত্রগ্রন্থেও তার সন্ধান মেলেনি)।

৩ মা'রুফ বিন খারবুজ মক্কি (মৃত্যু ১৫১ হিজরি) থেকে একটি মুনকাতি বর্ণনা রয়েছে। এতে তিনি ১২ রবিউল আওয়ালকে নবীজির জন্মতারিখ বলেছেন। [তারিখে দিমাশক- ৩/৬৯, ৭০]

২. ১২ রমজানুল মোবারক

১. হাফেজ ইবনে কাসির রহ. জুবাইর বিন বাক্কার (মৃত্যু ২৫৬ হিজরি) এর সূত্রে তার একটি বক্তব্য উল্লেখ করেন, যার দ্বারা মা আমিনার গর্ভধারণ শুরু হয়েছে আইয়ামে তাশরিকে, ৯ মাসের গর্ভধারণ সময়সীমা সমাপ্ত হয় রমজান মাসে এবং ১২ রমজানে জন্ম হয়। [আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া- ৩/৩৭৬]

এই বক্তব্যটি আল্লামা আবদুল আজিজ হামাবি এবং আল্লামা মাকরিযি উভয়ই উদ্ধৃত করেছেন। [আলমুখতাসারুল কাবির ফি সিরাতির রাসুল, পৃষ্ঠা ২২, ইমতাউল আসমা, মাকরিযি- ১/৬]

স্মর্তব্য, জুবাইর বিন বাক্কার একজন সিকাহ (নির্ভরযোগ্য) রাবি, হজরত আবদুল্লাহ বিন জুবাইর রা. এর বংশধর। ইবনে ইসহাকের ব্যাপারে কঠোর জারহ (আপত্তি) রয়েছে। কিন্তু জুবাইর বিন বাক্কার-এর ব্যাপারে তেমন জারহ নেই। কেবল আল্লামা সুলাইমানি তাকে জারহ করেছেন আর এটা সর্বসম্মতভাবে প্রত্যাখ্যাত। এ ছাড়া সবই তার তাওসিক বা নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে বক্তব্য। হাফেজ জাহাবি রহ. তার পরিচয় এভাবে দিয়েছেন, 'আল্লামা, হাফেজ (হাদিস) মক্কার কাজি ও আলেম' -[সিয়ারু আলামিন নুবালা- ১২/৩১১-৩১৫]। জুবাইর বিন বাক্কারের নির্ভরযোগ্যতার আলোচনার দ্বারা উক্ত হাদিসটি সহিহ কিংবা হাসান বানানো উদ্দেশ্য নয়; বরং সনদের মধ্যে ইনকিতা পাওয়া যাওয়ার দরুন ইবনে ইসহাকের রেওয়ায়েতের মতো যয়িফ রয়ে গেছে। উদ্দেশ্য হলো, এই রেওয়ায়েতটি ইবনে ইসহাকের রেওয়ায়েতের স্তরেই আছে, তা বর্ণনা করা।

২. জুবাইর বিন বাক্কারের রেওয়ায়েতের সমর্থনে হাফেজ ইবনে আসাকির ভিন্ন এক সনদে শুয়াইব বিন শুয়াইব তার পিতা এবং তিনি তার দাদা থেকে বর্ণনা করেন, 'রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মায়ের গর্ভে এসেছেন মহররমের আশুরাতে এবং রমজান মাসের ১২ তারিখে সোমবার তিনি জন্মগ্রহণ করেন।' কিন্তু এর সনদের মধ্যে দুজন দুর্বল রাবি আছেন, একজন মুহাম্মদ বিন উসমান (বিন আবি শাইবা -মৃত্যু ২৯৭ হিজরি)। কিছু মুহাদ্দিস তাকে নির্ভরযোগ্য বলেছেন, তবে অধিকাংশ মুহাদ্দিসই তাকে যয়িফ এবং মুনকার রেওয়ায়েত বর্ণনাকারী বলে কঠোর জারহ (সমালোচনা) করেছেন [মিযানুল ইতিদাল- ৩/৬৪২]। দ্বিতীয় জন মুসাইয়িব বিন শারিক (মৃত্যু ১৮১ হিজরি), তিনিও যয়িফ। [মিযানুল ইতিদাল- ৪/১১৪]

৩. ১লা রবিউল আওয়াল

ইমাম ফাকিহি নিজের সনদে ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণনা করেন, নবীজির জন্ম ও মৃত্যু উভয়ই হয়েছে ১লা রবিউল আওয়ালে। [আখবারু মক্কা, ফাকিহি- ৩/৩৮৪] এই রেওয়ায়েতটি খুবই দুর্বল। কারণ, তার সনদে মুআল্লা বিন আবদুর রহমান নামের একজন রাবি, তাকে কাজ্জাব বা মিথ্যুক বলা হয়েছে। [আযযুআফাউল কাবির, উকাইলি- ৪/২১৫]

৪. ২রা রবিউল আওয়াল

ওয়াকিদি আবু মা'শার মাদানি (মৃত্যু ১৭০ হিজরি) থেকে ২রা রবিউল আওয়ালের বক্তব্য উল্লেখ করেন। [তাবাকাতে ইবনে সাদ- ১/১০১] এর সনদও মুনকাতি (দুর্বল)। কারণ, আবু মা'শার মাদানি একজন দুর্বল রাবি। [তাকরিবুত তাহযিব- জীবনী নম্বর ৭১০০]

~~এই সংবাদ পেয়ে তিনি দৌড়ে আসেন। পুত্রবধূ আমিনা বিনতে ওয়াহাবের~~

৫. ৮ই রবিউল আওয়াল

ইবনুল জাওযি রহ. নিজের সনদে মুহাম্মদ বিন আহমাদ আলবারা (মৃত্যু ২৯১ হিজরি) থেকে নবীজির জন্ম ৮ই রবিউল আওয়ালে হয়েছে মর্মে বক্তব্য উল্লেখ করেছেন। [আলমুনতাজাম- ২/২৪৬] এর সনদও সুস্পষ্ট মুনকাতি। ইবনে হাবিব (মৃত্যু ২৪৫ হিজরি) উপর্যুক্ত দুটি বক্তব্য তথা ২ ও ৮ই রবিউল আওয়াল- এর কথা কোনো সনদ ছাড়াই উল্লেখ করেছেন। [আলমুহাব্বার- পৃষ্ঠা ৮, ৯]

প্রখ্যাত জ্যোতির্বিদ আল্লামা ইবনে কুনফুজ (মৃত্যু ৮১০ হিজরি) ৮ই রবিউল আওয়াল-এর তারিখকে প্রাধান্য দিয়ে লেখেন, অধিকাংশ লোকই ৮ তারিখকে বিশুদ্ধ বলেছেন।' [উসিলাতুল ইসলাম, পৃষ্ঠা ৪৪]

এ ছাড়া বহু বক্তব্য রয়েছে, যেমন- ১৭ তারিখ ইত্যাদির কথাও বলা হয়ে থাকে। কিন্তু সবকটিই পরিত্যাজ্য। প্রসিদ্ধ বক্তব্যগুলো আমরা আলোচনা করেছি। ১২ রবিউল আউয়ালের বক্তব্যটি অধিকাংশ সিরাত গবেষকরা ইবনে ইসহাক এবং ইবনে হিশামের অনুকরণে লিখেছেন। ইবনে কাসির রহ. এটাকেই জুমহুরের (অধিকাংশের) বক্তব্য বলেছেন। [আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া- ৩/৩৭৫]

অন্যদিকে রেওয়ায়েতের চেয়ে যুক্তির উপর অধিক নির্ভরকারী পঞ্জিকা এবং জ্যোতির্বিদ্যায় পারদশী ইতিহাসবিদদের নিকট ১২ রবিউল আওয়ালের স্থানে ২, ৮ কিংবা ৯ তারিখের বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তাদের যুক্তি হলো, হিজরত সর্বসম্মতিক্রম ৬২২ খ্রিষ্টাব্দে হয়েছে। সে হিসেবে হিজরতের ৫৩ বছর পূর্বে ১২ রবিউল আওয়াল কোনোভাবেই সোমবার হয় না। কিন্তু ২, ৮ কিংবা ৯ তারিখগুলো কোনো না কোনোভাবে ঐদিনের সাথে মিলে যায়।

রমজানুল মুবারকে জন্মের বিষয়টি কোনোভাবেই যুক্তিগ্রাহ্য নয়। কারণ সনদের বিচারে এটি ইবনে ইসহাকের রেওয়ায়েতের স্তরে। হাফেজ ইবনে কাসির রহ. এই বর্ণনার সমর্থনে উল্লেখ করেন যে, নবীজির (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) উপর ওহি অবতীর্ণ হওয়া শুরু হয় রমজানুল মুবারকে। আর নবীজির বয়স তখন চল্লিশ বছর ছিল।' [আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া- ৩/৩৭৬] সে হিসেবে জন্মের ঠিক চল্লিশ বছর পূর্বে রমজানুল মোবারক মিলে যাবে।

রবিউল আওয়াল এবং রমজানের বক্তব্যের কোনটি অধিক অগ্রগণ্য?

এখন প্রশ্ন হলো, রবিউল আওয়াল এবং রমজানুল মুবারকের বক্তব্যের কোনটি অধিক প্রাধান্য পাবে? মূলত এর মধ্যে কোনো মতানৈক্য নেই। আমরা যদি মক্কি-মাদানি পঞ্জিকার পার্থক্য সামনে রেখে হিজরতের ৫৫ বছর পূর্বের হিসাব মেলাই, তা হলে জন্মের বছর দুই স্থানে গিয়ে পৃথক পৃথক পঞ্জিকাতে রবিউল আওয়াল এবং রমজানুল মুবারক দেখা যাবে। আলি মুহাম্মদ খানের পঞ্জিকা মোতাবেক প্রথম স্থান- ১৩ রমজান মাদানি= ১৩ রবিউল আওয়াল মক্কি হয় ১৯ নভেম্বর ৫৬৭ খ্রিষ্টাব্দ। আর দ্বিতীয় স্থান- ১০ রমজান মাদানি= ১০ রবিউল আওয়াল মক্কি হয় ১৩ মে ৫৬৯ খ্রিষ্টাব্দ। [তাকউয়িমে আহদে নববি, পৃষ্ঠা ১১৫]

কিছু ওলামায়ে কেরাম উপর্যুক্ত দুটি তারিখের প্রথমটিকে এবং অন্যরা দ্বিতীয়টিকে নবীজির জন্মতারিখ সাব্যস্ত করেন। ইখতিলাফের কারণ নিয়ে একটা সংশয় হয় যে, রবিউল আওয়াল এবং রমজানুল মুবারকের প্রবক্তাদের মধ্যে কে মক্কি এবং কে মাদানি পঞ্জিকার উদ্ধৃতি দিয়েছেন?

নবীজির জন্মতারিখ ঘাঁটাঘাঁটি করে ইবনে হাবিবের একটি বক্তব্য থেকে তার সমর্থন পাওয়া যায়। তার এই বক্তব্য অনুযায়ী জন্মতারিখ মহররমের জুমাবার শুরু হয়। [আলমুহাব্বার- পৃষ্ঠা ১০] এই তারিখ ধরা হলে ৫৬৮ খ্রিষ্টাব্দ ১৮ মাদানি রমজান (মক্কি রবিউল আওয়াল) এবং ৫৬৯ খ্রিষ্টাব্দ অনুযায়ী ১২ মাদানি রমজান (মক্কি রবিউল আওয়াল) সোমবার হয়।

তবে আমার (লেখকের) মতে এ বিষয়ে আরো তাহকিক ও গবেষণা দরকার। উপর্যুক্ত

কোলে চাঁদের মতো এক সুদর্শন বাচ্চা দেখে তার অন্তর স্নেহ-মমতা ও ভালোবাসায় উদ্বেলিত হয়ে ওঠে। ছ'মাস পূর্বে তার সর্বকনিষ্ঠ ছেলে আবদুল্লাহর ইনতেকাল হয়। এই সন্তান সেই আবদুল্লাহরই প্রতিচ্ছবি। আবদুল মুত্তালিব বাচ্চাকে কোলে নিয়ে কাবাঘরে প্রবেশ করেন। আল্লাহ তায়ালার হামদ-সানা পাঠ করে বাচ্চার নাম খুঁজতে থাকেন। তখনই তার মনে একেবারেই নতুন একটি নাম উদিত হয়- 'মুহাম্মাদ'। ইতিপূর্বে আরবদের কারো মধ্যেই এই নাম পাওয়া যায়নি। আল্লাহ তায়ালা এমন অনন্য নামটি সর্বশেষ রাসুলের জন্য সংরক্ষণ করে রেখেছিলেন। এটিই আবদুল মুত্তালিবের অন্তরে ঢেলে দেন।

নবীর বংশধারা হলো- মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ বিন আবদুল মুত্তালিব, বিন হাশিম, বিন আবদে মানাফ, বিন কুসাই, বিন কিলাব, বিন মুররা, বিন কাব, বিন লুয়াই, বিন গালিব, বিন ফিহর, বিন মালিক, বিন নজর, বিন কিনানা, বিন খুযাইমা, বিন মুদরিকা, বিন ইলয়াস, বিন মুযার, বিন নিযার, বিন মাআদ, বিন আদনান।'

তারিখগুলো প্রমাণিত হওয়ার সম্ভাবনাও রয়েছে। হিসাবে কিছু জিনিস ঠিকমতো আসে না, আবার মানুষ হিসেবে এর ভুল হওয়ার সম্ভাবনাও আছে। অন্যদিকে এটাও হতে পারে যে, ভুল চাঁদ দেখার কারণে তারিখ গণনাতেও ভুল হয়েছে। আমরা গণনা করে এটা তো বলতে পারব যে, কোনো এক স্থানে চাঁদ দেখা গিয়েছে, কিন্তু সুনির্দিষ্টভাবে কোনো স্থানের কথা বলা সম্ভব নয়। কারণ, দিগন্ত এবং মৌসুমের বিভিন্ন অবস্থার কারণে চাঁদ দেখার ধরনেও প্রভাব পড়ে।

যাই হোক, এ কথা পরিষ্কার হয়ে গেছে যে, রমজান-রবিউল আওয়ালের মতানৈক্য চান্দ্র আর সৌরবর্ষপঞ্জির ভিন্নতার কারণে হয়েছে। এবার জানা প্রয়োজন চান্দ্র আর সৌরবর্ষপঞ্জির মাঝে পার্থক্য কী? এক্ষেত্রে আমরা প্রথমেই বলব, তৎকালে নিরেট চান্দ্রবর্ষপঞ্জি ছিল না; বরং সৌরবর্ষ মোতাবেক ৩৬৫ দিন হিসেবেই দিন গণনা করা হতো। এই হিসেবে নবীজির জন্ম ও হিজরতের মধ্যকার সময় কেবল চান্দ্রবর্ষপঞ্জির ৫৩ বছর হবে না; বরং ৫৪ বছর কয়েক মাস হবে। অথচ মক্কি পঞ্জিকা তথা সৌরবর্ষ অনুযায়ী ৫৩ বছর কয়েক মাস হবে। চান্দ্রবর্ষ হিসেবে পূর্ণ ৫৩ বছর ধরলেই নবীজির খ্রিষ্টীয় জন্মসনের সাথে বছর-মাসের হিসাব ভুল বের হয়।

ব্যাপকভাবে ৫৭১ খ্রিষ্টাব্দের এপ্রিল যদিও জন্মসন বলা হয়, কিন্তু শুদ্ধ হলো ৫৬৯ খ্রিষ্টাব্দের মে মাস কিংবা ৫৬৮ খ্রিষ্টাব্দের নভেম্বর মাস। এরপর পুনরায় এই আপত্তি আসে না যে, সিরাতগবেষকরা নবীজির জন্ম বসন্তকালে হয়েছে বলে উল্লেখ করে থাকেন, অথচ প্রথ মযুগের রাবিদের থেকে এই ধরনের বক্তব্য পাওয়া যায় না। কারণ, কিছু মানুষ রবিউল আওয়াল শব্দ থেকে ভুল ধারণা করে যে, এ মাস বসন্ত মৌসুমে আসে। আবার কিছু মানুষ ক্যালেন্ডার হিসেব করে বসন্ত মৌসুমের কথা বাড়িয়ে দেয়। যদিও এই গণনাটি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন।

গুরুত্বপূর্ণ দ্রষ্টব্য

আমি (লেখক) নববি সিরাতের তারিখ আলোচনায় মক্কি জীবনের ঘটনাবলি অধিকাংশই মক্কি তথা সৌরবর্ষ মোতাবেক উল্লেখ করেছি। কারণ, তৎকালে এটিই অধিক প্রচলিত ছিল। হ্যাঁ, কোনো তারিখ যদি দলিল কিংবা সংশ্লিষ্ট নিদর্শনের দ্বারা মাদানি তথা চান্দ্রতারিখও প্রমাণিত হয়, সেটা ভিন্ন কথা।

আদনানের পর কয়েক মাধ্যমে গিয়ে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বংশধারা হজরত ইসমাইল আলাইহিস সালামের সঙ্গে মিলে যায়। তিনি ছিলেন হজরত ইবরাহিম আলাইহিস সালামের বড় ছেলে এবং একজন সম্মানিত নবী।[১৪২]

পবিত্র শিশু

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুরুর দিকে কিছুদিন চাচা আবু লাহাবের বাঁদি সুয়াইবার দুধ পান করেছিলেন।[১৪৩] ঐ সময় আবদুল মুত্তালিব তার এতিম নাতির জন্য একজন দাইমা খুঁজছিলেন। আরবের রেওয়াজ ছিল তারা দুধের শিশুর লালন-পালনের জন্য পল্লী-অঞ্চলের দুধমায়ের হাতে সোপর্দ করত। গ্রামের স্বচ্ছ ও মুক্ত আবহাওয়ার মধ্যে তার সঠিক প্রতিপালন হয়। তার বিকাশ হয়। তা ছাড়া গ্রামের ভাষা হতো সুনির্দিষ্ট এবং বিশুদ্ধ। এ ভাষা শিখে শিশুরাও সুন্দর করে বলতে পারে।

তায়েফের নিকটবর্তী বসতি বনু সা'দ তার বিশুদ্ধতা ও অলংকারিত্বের কারণে প্রসিদ্ধ ছিল। এজন্য মক্কার সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা বনু সা'দের দুগ্ধপানকারিণী নারীদের দিয়ে সেবা নিতে খুব পছন্দ করতেন। অভ্যাস অনুযায়ী এ সময়েও বনু সা'দের কিছু দাইমা প্রতিপালনের জন্য বাচ্চা নিয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্যে মক্কায় আসে। কিন্তু কোনো দাই-ই রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নিতে রাজি হচ্ছিল না। কারণ, সময়টা ছিল দুর্ভিক্ষের। দাইমায়েরা চাচ্ছিল নিজেদের প্রয়োজন পূরণ করার জন্য ন্যায্য পারিশ্রমিক। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এতিম দেখে এই ঘর থেকে ন্যায্যমূল্য পাওয়ার আশা করেনি কেউ।

দাইমাদের ঐ কাফেলায় হালিমা সাদিয়া নামক এক পুণ্যবান নারী ছিলেন। তিনি কোনো বাচ্চাই পাচ্ছিলেন না। পরিশেষে মা আমিনার ঘরে প্রবেশ করার পর বাচ্চা দেখেই তার মহব্বত উথলে ওঠে। অতিরিক্ত পারিশ্রমিকের আশা না করেই তিনি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কোলে নিয়ে চলে আসেন। তাকে কোলে নেওয়ার পর থেকেই হালিমার সর্বদিকে বরকত হতে থাকে। দুর্বল প্রাণী সবল হয়ে যায়। অসচ্ছলতা সচ্ছলতায় বদলে যায়।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দৈহিক বিকাশ সাধারণ বাচ্চাদের থেকে ব্যতিক্রম ছিল। তার বয়স যখন দু'বছর হয়, তখন হালিমা সাদিয়া তাকে দুধ খাওয়ানো বন্ধ করে দেন। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার দুধভাই-বোনদের সাথে জঙ্গলে বকরি চড়াতে যেতে থাকেন। এ সময় একদিন আচমকা দুই ফেরেশতা অবতীর্ণ হয়ে নবীজির বুক ফেঁড়ে তার অন্তরটা

---

১৪২. সিরাতে ইবনে হিশাম- ১/১, ২, ৩

১৪৩. জামিউল উসুল, ইবনুল আসির জাজারি- ১২/৯১ (মাকতাবা হালওয়ানী সংস্করণ)

বের করে তা থেকে কালো ধরনের কী যেন বের করে ফেলেন এবং ঈমান ও হেকমত দিয়ে ভরে পুনরায় তা আপন স্থানে রেখে দেন। কিন্তু নবীজির বুক বিদীর্ণ করার কোনো চিহ্নই দেখা যায়নি।[১৪৪]

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চার বছর বনু সা'দে ছিলেন। এরপর হালিমা তাকে মায়ের কাছে ফেরত দেন।[১৪৫] কবিলা বনু সা'দের সাদাসিধে এবং পরিশ্রমী জীবন নবীজির স্বাস্থ্য, বিকাশ ও তরবিয়তে অনেক প্রভাব ফেলে। পরবর্তীতে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার সাহাবিদের বলতেন, 'আমি তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে বিশুদ্ধভাষী। আর আমি কবিলা বনু সা'দে দুধপান করেছি।'[১৪৬]

মায়ের সাথে ইয়াসরিব সফর

মক্কায় ফিরে আসার পর নবীজির বয়স যখন ছ' বছর হয়, তখন মা আমিনা তাকে নিয়ে ইয়াসরিব রওনা হন। পথিমধ্যে স্বামীর কবর জিয়ারতও হবে আবার ছেলেকে নানুবাড়ির আত্মীয়দের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া যাবে। তার হাবশি বাঁদি বারাকা (উম্মে আইমান)-ও তাদের সফরসঙ্গী ছিলেন। আবদুল্লাহর উত্তরাধিকার হিসেবে তাকে রেখে যান। আমিনা নানাবাড়ি বনু নাজ্জারে কিছুদিন বেড়ান। এখানে বনু আদি বিন নাজ্জারের একটি পুকুর ছিল। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেখানে সাঁতার শেখেন।[১৪৭]

মা আমিনার অফাত এবং আবদুল মুত্তালিবের তত্ত্বাবধান

ইয়াসরিব থেকে ফেরার পথে মা আমিনা 'আবওয়া' নামক স্থানে আসার পথে হঠাৎ ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং স্বল্প সময়ের ব্যবধানে এ স্থানেই তার ইনতেকাল হয়ে যায়। এই অনাবাদ বিরান ভূমিটি মক্কা ও ইয়াসরিবের ঠিক মধ্যখানে অবস্থিত ছিল। চারপাশ পাহাড়-বেষ্টিত একটি টিলাতে তাকে দাফন করা হয়। আবদুল্লাহর এতিম ছেলেটি ছয় বছর বয়সে মায়ের মমতা থেকে বঞ্চিত হয়। এমন দুর্দশা অবস্থায় তার পাশে এমন কোনো দূরসম্পর্কের আত্মীয়ও

---

১৪৪. সিরাতে ইবনে হিশাম- ১/১৬২-১৬৪; (সিনা বিদীর্ণ করার ঘটনা), মুসনাদ আবু ইয়ালা- ৭১৬৩, সহিহ ইবনে হিব্বান- ৬৩৩৫

১৪৫. দুধপান শেষ করার পর হালিমা রা. নবীজিকে মক্কায় নিয়ে এসেছিলেন। তার প্রতি এত মহব্বত তৈরি হয়েছিল যে, মা আমেনাকে অনুরোধ করে পুনরায় তাকে কবিলায় নিয়ে যান। [সিরাতে ইবনে হিশাম- ১/১৬৪] দু'বছর পর পুনরায় নিয়ে আসেন। [মিরআতুয যামান, সিবতু ইবনুল জাওযি- ৩/৪৯]

১৪৬. সিরাতে ইবনে হিশাম- ২/১৬৭

১৪৭. শারহুয যুরকানি আলাল মাওয়াহিবুল লাদুন্নিয়্যাহঃ ১/৩০৯ (দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যাহ সংস্করণ)

ছিল না, যে তার মাথায় হাত বুলিয়ে এবং বুকে জড়িয়ে একটু সান্ত্বনা দেবে। আল্লাহর তরফ থেকে অসাধারণ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষেরা তরবিয়তের এমন কিছু ধাপ অতিক্রম করে, যা বালুকে প্রক্রিয়াজাত করার পর সোনার অলংকারে পরিণত করে। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাঁদি বারাকাহ (উম্মে আইমান, তার বয়স তখন ষোলো-সতেরো বছরের বেশি ছিল না) অনেক কষ্ট করে তাকে মক্কায় নিয়ে আসেন। আবদুল মুত্তালিব এই অনন্য এতিম নাতিকে আদর-স্নেহের চাদরে আবৃত করে নেন। তিনি এক মুহূর্তের জন্যও তাকে দৃষ্টির আড়াল হতে দেননি। কাবার ছায়ায় যখন তার জন্য সরদার হিসেবে কোনো চাদর বিছিয়ে দেওয়া হতো, যার উপর অন্য কারো বসার অনুমতি ছিল না, তখনও তার দৌহিত্রকে তার সঙ্গে বসিয়ে নিতেন।[১৪৮]

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাত বছর বয়সে উপনীত হলে, কিছুদিনের জন্য আবদুল মুত্তালিব ইয়েমেন সফর করেন। ইয়েমেনে হাবশিদের ক্ষমতা বিলুপ্ত করে মসনদে আরোহণ করায় সেখানকার নতুন শাসক সাইফ বিন যি-ইয়াযানকে অভিনন্দন জানানোর জন্য সফর করেন।[১৪৯] এ ছাড়া আবদুল মুত্তালিব কখনো এই এতিম শিশুকে ছেড়ে কোথাও যাননি।

আবদুল মুত্তালিবের অফাতের পর

কিন্তু এই সীমাহীন মায়া-মমতার সময়টা প্রভাত-সমীরণের ন্যায় কেটে যায়। একদিন আবদুল মুত্তালিবও দুনিয়া থেকে বিদায় নেন। তখন নবীজির বয়স ছিল ৮ বছর ২ মাস ১০ দিন।[১৫০] দাদা ইনতেকালের পূর্বে ছেলে আবু তালিবকে নবীজির দেখভাল এবং তত্ত্বাবধান করার জন্য অসিয়ত করে যান।[১৫১]

---

১৪৮. সিরাতে ইবনে হিশাম- ২/১৬৮

১৪৯. আসসিরাতুল হালাবিয়াহ- ১/১৬৬, ১৬৮ (আলইলমিয়্যা সংস্করণ), আলমুনাম্মাক ফি আখবারি কুরাইশ, পৃষ্ঠা ৪২৭, তারিখে ইবনে খালদুন- ২/৭৪

১৫০. আলমুহাব্বার- ইবনে হাবিব, পৃষ্ঠা ১০

১৫১. সিরাতে ইবনে হিশাম- ১/১৭৯

আবদুল মুত্তালিবের ইনতেকালের সময় তার দুই ছেলে হামজা ও আব্বাস ছোট ছিলেন। কেবল জুবাইর ও আবু তালেব যুবক ছিলেন। তো নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কার তত্ত্বাবধানে থাকবেন? এ ব্যাপারে মুহাম্মদ বিন ইসহাক থেকে বর্ণিত আছে, তিনি আবদুল্লাহ বিন আবু বকর থেকে বর্ণনা করেন, আবদুল মুত্তালিব রাসুলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ব্যাপারে চাচা আবু তালিবকে অসিয়ত করে গিয়েছিলেন।' [তারিখুত তাবারি- ২/২৭৭]

এই বর্ণনানুযায়ী আবদুল মুত্তালিব তার নাতির দেখাশোনার জন্য আবু তালিবকে অসিয়ত করেছিলেন। সিরাতে ইবনে ইসহাক, তারিখুত তাবারি- সিরাতে ইবনে হিশাম, দালাইলুন নুবুওয়াহসহ অনেক সিরাতের কিতাবেই ঐ রেওয়ায়েতটি ইবনে ইসহাকের মুনকাতি

সনদের মাধ্যমে উল্লেখ করেছেন। যেহেতু এই রেওয়ায়েতের সনদ যয়িফ; তাই কিছু কিছু আলেম একে সম্পূর্ণ প্রত্যাখ্যান করে জুবাইরের দেখাশোনার দায়িত্বের কথা বলে থাকেন। কারণ আবদুল মুত্তালিবের পরবর্তী উত্তরাধিকার ছিলেন জুবাইর। তিনিই বড় চাচা এবং ধনী মানুষ ছিলেন। অপরদিকে আবু তালেব দরিদ্র ছিলেন। তাই এমন অবস্থায় তার কাছে কীভাবে দেখাশোনার দায়িত্ব অর্পণ করতে পারেন!' কিন্তু এটা কেবল দাবি ও যুক্তি। তার কোনো দালিলিক ভিত্তি নেই। জুবাইরের তত্ত্বাবধানের ব্যাপারে যত বর্ণনাই উল্লেখ করা হয়ে থাকে, কোনোটারই সনদ নেই। তা ছাড়া রেওয়ায়েতে সরাসরি নবীজির (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তত্ত্বাবধানের কথাও উল্লেখ নেই। বরং তাকে আবদুল মুত্তালিব কর্তৃক গোত্রের সরদারির দায়িত্বের কথা উল্লিখিত হয়েছে। [আলমুনাম্মাক ফি আখবারি কুরাইশ, পৃষ্ঠা ১২৬; আলমুহাব্বার- ইবনে হাবিব, পৃষ্ঠা ১৩২]

পরবর্তী উত্তরাধিকার হলেই যে বংশের ছোট-বড় সব কাজ তারই আঞ্জাম দিতে হবে, তা কিন্তু জরুরি নয়। তা ছাড়া আবু তালিব কর্তৃক নবীজির (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তত্ত্বাবধানের কথা কেবল মুহাম্মদ বিন ইসহাকের সনদেই নয়; বরং ভিন্ন সনদেও উদ্ধৃত হয়েছে। মুহাম্মদ বিন সাদ একাধিক সনদ উল্লেখ করেছেন, যদিও তা যয়িফ। তন্মধ্যে একটি সনদে মুয়াজ বিন মুহাম্মদ আলআনসারি (মৃত্যু ১৬০ হিজরি, ইবনে হিব্বান তাকে 'সিকাতে'র (নির্ভরযোগ্য) মধ্যে উল্লেখ করেছেন। তাহযিবুল কামাল- ৩৮/১৩১) আতা (বিন ইয়াসার, মৃত্যু ৯৪ হিজরি, তিনি বুখারি ও মুসলিমের রাবি) থেকে, তিনি ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণনা করেছেন। এই সনদটি সর্বনিম্ন হাসান পর্যায়ের হওয়ার মধ্যে কোনো সন্দেহ নেই। আর অন্যান্য রেওয়ায়েত মেলালে তা সহিহ লিগায়রিহি স্তরে পৌঁছে যাবে। তাই আবু তালেব রাসুলুল্লাহর তত্ত্বাবধায়ক হওয়ার রেওয়ায়েতগুলো গ্রহণযোগ্য। আর তার প্রত্যাখ্যান নিরেট সমালোচনা বৈ কিছুই নয়।

ইমাম বালাযুরি এ বিষয়েই কয়েকটি বক্তব্য উল্লেখ করে লেখেন,

فاقترع الزبير وأبو طالب أيهما يكفل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأصابت القرعة أبا طالب، فأخذه إليه، ويقال: بل اختاره رسول الله صلى الله عليه وسلم على الزبير، وكان ألطف عميه به، ويقال: بل أوصاه عبد المطلب بأن يكفله بعده

তখন জুবাইর ও আবু তালেব নবীজির (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) পরবর্তী তত্ত্বাবধায়ক কে হবেন, এ ব্যাপারে লটারি দেন। তখন লটারি আবু তালেবের পক্ষে যায়। বলা হয়, না বরং রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নিজেই তাকে জুবাইরের উপর প্রাধান্য দেন। কারণ, উভয়ের মাঝে তিনি ছিলেন অধিক কোমলপ্রকৃতির। কেউ কেউ বলেন, বরং আবদুল মুত্তালিবই আবু তালেবকে তার তত্ত্বাবধানের অসিয়ত করে যান।' [আনসাবুল আশরাফ- ১/৮৫]

উল্লেখ্য যে, আল্লামা হালাবি একটি বক্তব্য নকল করেছেন, যার মাধ্যমে বিরোধপূর্ণ বক্তব্যগুলোর মাঝে সামঞ্জস্য এসে যায়। তা হলো- আবদুল মুত্তালিবের ইনতেকালের পর জুবাইর ও আবু তালেব, উভয়ই নবীজির তত্ত্বাবধান করতে থাকেন। কিন্তু রাসুলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বয়স যখন চৌদ্দ বছর, তখন জুবাইর মারা যান। ফলে আবু তালেবের জিম্মাদারিতে চলে আসেন।' [আসসিরাতুল হালাবিয়াহ- ১/১৬৫] এখানেও কিন্তু আবু তালেবের তত্ত্বাবধানের কথা এসেছে।

তবে ইমাম বালাযুরি জুবাইরের তত্ত্বাবধান এবং নবীজির চৌদ্দ বছর বয়সে তার ইনতেকালের বিষয়টি তিনি দালিলিকভাবে প্রত্যাখ্যান করেন। তিনি লেখেন,

এই বছরই মারা যান আরবের প্রখ্যাত দানবীর এবং তাই গোত্রের সরদার হাতিম তাই। এ বছর পারস্যের প্রসিদ্ধ বাদশাহ নওশেরওয়াঁরও অফাত হয়।[১৫২]

সুন্দর শৈশব

সাধারণত বাল্যকাল উচ্ছৃঙ্খলতা আর দুষ্টুমিতে ভরপুর থাকে। কিন্তু নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথম থেকেই নেহায়েত শিষ্ট, সম্রান্ত, গম্ভীর এবং লাজুক ছিলেন। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরবদের মন্দচরিত্রে বিন্দুপরিমাণ প্রভাবিত হননি। শিরকি কার্যকলাপ, শরাবপান, গানবাদ্য থেকে সম্পূর্ণ দূরে ছিলেন। সততা, আমানতদারি, সহমর্মিতা, বিনয়, মানবিকতা, দয়া-মায়ার গুণে পরিপূর্ণ ছিলেন তিনি। তার পাশাপাশি তিনি প্রখর মেধাবী, সামাজিক, সাহসী ও সচেতন ছিলেন।[১৫৩]

শাম সফর এবং বাহিরা পাদরির সাক্ষ্য

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বারো বছর বয়সে যখন চাচা আবু তালেবের সঙ্গে শাম সফরে বের হন, তখন তাদের কাফেলা শামের সীমান্তবর্তী শহর বুসরার প্রধান রাস্তার পাশেই যাত্রাবিরতি দেয়। সেখানে বাহিরা নামক এক পাদরির সাধনাগৃহ ছিল।[১৫৪] বাহিরা তার এই সাধনাগৃহ থেকে সাধারণত

وروى بعضهم أن الزبير كفل النبي صلى الله عليه وسلم حتى مات، ثم كفله أبو طالب، وذلك غلط، لأن الزبير شهد حلف الفضول ولرسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ نيف وعشرون سنة، لا اختلاف بين العلماء في أن شخوص رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الشام مع أبي طالب بعد عبد المطلب بأقل من خمس سنين

কেউ কেউ বর্ণনা করেছেন, জুবাইর নবীজি সা কে তত্ত্বাবধান করেছেন, তারপর তার মৃত্যু হয়েছে, এরপর আবু তালেব তার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন; এটি ভুল কথা। কারণ, জুবাইর তো 'হিলফুল ফুযুল' অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। রাসুলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বয়স তখন বিশের উর্ধ্বে। ওলামায়ে কেরাম সকলেই একমত যে, আবদুল মুত্তালিবের ওফাতের প্রায় পাঁচ বছর পর আবু তালিবের সঙ্গে শাম সফর করেছেন।' [আনসাবুল আশরাফ- ১/৮৫]

সারকথা, ইমাম বালাযুরি আবু তালিবের তত্ত্বাবধানের রেওয়ায়েতটি প্রাধান্য দিয়েছেন। এখন যদি কেউ কেবল এই যুক্তি দেয় যে, আবু তালেব নিঃস্ব-দুর্বল ছিলেন, জুবাইর ধনবান ও সরদার ছিলেন এবং এই যুক্তিতে আবু তালিবের তত্ত্বাবধানের রেওয়ায়েতগুলো প্রত্যাখ্যান করে, তা হলে তা হবে ঠুনকো যুক্তি। আচ্ছা, দরিদ্ররা কী কোনো বাচ্চা লালন-পালন করেন না? তারা কি এতিমদের দেখভাল করেন না?

১৫২. তারিখুল খামিস ফি আহওয়ালিল আনফাসিন নাফিস- ১/২৫৫ (দারু সাদির সংস্করণ), আলবাদউ ওয়াত তারিখ- ৪/১৩৩ (মাকতাবতুস সাকাফাতিদ দীনিয়্যাহ সংস্করণ)

১৫৩. আসসিরাতুল হালাবিয়াহ- ১/১৭৮

১৫৪. তাবাকাতে ইবনে সাদ- ১/১২১। কুরাইশের এই শাম সফর হয়তো তাদের অভ্যাস অনুযায়ী সম্ভবত গ্রীষ্মকালেই হয়েছিল। [সুরা কুরাইশ, আয়াত ৩]

বের হতেন না। কিন্তু সেদিন বের হন এবং কাফেলার লোকদের পরখ করতে করতে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে পৌঁছে যান। তার হাত ধরে বলতে লাগলেন, 'এ পৃথিবীর সরদার, এ বিশ্বপ্রতিপালকের রাসুল, এ বিশ্বমানবতার প্রতি দয়া'।

কুরাইশের কিছু বৃদ্ধ বলল, তুমি তা কীভাবে জানলে?

বললেন, তোমরা যখন উপর থেকে নিচে নামছিলে, তখন আমি দেখলাম এখানকার প্রতিটি বৃক্ষ কিংবা পাথর তার সম্মানে অবনত হচ্ছে। এমন শুধু নবীদের জন্যই করা হয়ে থাকে। আর আমি তার দুই কাঁধের মাঝে মোহরে নবুওয়াত থাকার কারণে তাকে নবী হিসেবে চিনতে পেরেছি।'

ঐ পাদরি কাফেলার মেহমানদারি করলেন এবং আবু তালেব থেকে এই মর্মে শপথ নিলেন যে, এই বালককে শামে নিয়ে যাবেন না। কারণ, সেখানকার রোমানরা যদি তার এই নবুওয়াতের গুণাবলি জানতে পারে, তা হলে তারা তাকে মেরে ফেলবে।[১৫৫] ফলে আবু তালেব রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

---

১৫৫. সুনান তিরমিজি- ৩৬২০ (আবওয়াবুল মানাকিব, বাবু মা জাআ ফি বাদইন নুবুওয়াতিন নবী) আলবানি রহ. বলেছেন, হাদিসটি সহিহ; কিন্তু এখানে বেলালের উল্লেখ মুনকার। এই রেওয়ায়েতের কোনো রাবির ওয়াহমের কারণে 'আবু তালেব নবীজিকে আবু বকর ও বেলালের সঙ্গে ফেরত পাঠান' কথাটির সংযুক্তি এসেছে। আর এই অংশটুকুর কারণে পুরো রেওয়ায়ত ইমাম জাহাবি রহ. অগ্রহণযোগ্য বলেন। [মিযানুল ইতিদাল- ২/৫৮১]

তবে ইনসাফ ও মধ্যপন্থা হলো কেবল অযৌক্তিক সেই অংশটুকুই পরিত্যাজ্য হওয়া। যেমন: ইমাম ইবনুল কাইয়িম রহ. যাদুল মাআদে (এ গ্রন্থে তিনি সিরাতে নববিকে অত্যন্ত যত্ন ও সতর্কতার সাথে আলোচনা করেছেন) সেই ঘটনাটি উল্লেখ করেছেন এবং আলোচিত অংশটুকু অগ্রহণযোগ্য বলেছেন। তিনি লেখেন,

ووقع في كتاب الترمذي وغيره أنه بعث معه بلالا وهو من الغلط الواضح، فإن بلالاً إذا لعله لم يكن موجودا، وإن كان فلم يكن معه عمه ولا مع أبي بكر، وذكر البزار في مسنده هذا الحديث، ولم يقل: وأرسل معه عمه بلالا، ولكن قال: رجلاً

'তিরমিজি ও অন্যান্য কিতাবে এসেছে, আবু তালেব নবীজির সঙ্গে বেলালকে পাঠিয়েছেন; এটা সুস্পষ্ট গলদ। কারণ, বেলাল রা. হয়তো ঐ সফরে ছিলেন না, আর থাকলেও সঙ্গে অবশ্যই চাচা আবু তালেব এবং আবু বকরও ছিলেন না। ইমাম বাযযার তার মুসনাদে হাদিসটি উল্লেখ করেছেন। সেখানে 'চাচা তার সঙ্গে বেলালকে পাঠান'- এ কথাটি নেই; হ্যাঁ, সেখানে 'একজন লোক পাঠালেন'- কথাটি আছে। [যাদুল মাআদ- ১/৭৬, ৭৭]

অপরদিকে আল্লামা শিবলি নুমানি রহ. তার সুপ্রসিদ্ধ সিরাতগ্রন্থ 'সিরাতুন-নাবী'তে প্রাচ্যবিদদের আপত্তি খণ্ডন করতে গিয়ে ঐ রেওয়ায়েতটি শুধু মতন (পাঠ) এর দিক থেকেই নয়; বরং সনদের দিক থেকেও কঠিন জারহ ও সমালোচনা করে প্রত্যাখ্যান করেন।

প্রাচ্যবিদদের এই আপত্তি খুবই দুর্বল যে, 'নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এই সফরে বাহিরা সন্ন্যাসী থেকে বহু জ্ঞান অর্জন করেছেন।' আল্লামা শিবলি তার একটি যৌক্তিক উত্তর দেন যে, এত সংক্ষিপ্ত সময়ে এমন একটি ছোট বালকের সূক্ষ্ম জ্ঞান-প্রজ্ঞা অর্জন করা এবং এর মাধ্যমে এত বড় বিপ্লব ঘটানো সম্ভব? সর্বোপরি প্রাচ্যবিদদের আপত্তি

ওয়াসাল্লামকে একজন লোক দিয়ে মক্কা পাঠিয়ে দেন।[১৫৬]

হারবুল ফিজারে অংশগ্রহণ

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বয়স যখন দশ, তখন থেকেই মক্কার বিভিন্ন এলাকায় অনবরত যুদ্ধ চলতে থাকে। একে 'হুরুবুল ফিজার' বা

এমন গুরুত্বপূর্ণও নয় যে, এর কারণে আমাদের হাদিসের ভান্ডার পরিত্যাগ করতে পারি। এবার আমরা উক্ত হাদিসের উপর আলোকপাত করব। তিরমিজি রহ. এ হাদিসের সনদকে 'হাসানুন গারিবুন' বলেছেন। সনদটি হলো,

فضل بن سهل، عبد الرحمن بن غَزْوان، يونس بن أبي إسحاق، أبو بكر بن أبي موسى، أبو موسى الأشعري

ফযল বিন সাহল: বুখারি ও মুসলিমের রাবি। সাদুক। [তাকরিবুত তাহযিব- তরজমা নং ৫৪০৩]

আবদুর রহমান বিন গাজওয়ান: বুখারি ও মুসলিমের রাবি। সিকাহ। [তাকরিবুত তাহযিব- তরজমা নং ৩৯৭৭] ইমাম জাহাবি তাঁকে হাফেজ, ইমাম এবং সাদুক বলেছেন। ইমাম আহমাদ ও ইমাম ইয়াহইয়া বিন মাঈন তার শাগরিদ। [সিয়ারু আলামিন নুবালা- ৯/৫১৮]

ইউনুস বিন আবি ইসহাক: ইমাম মুসলিম রহ. তার রেওয়ায়েত গ্রহণ করেছেন। হাফেজ ইবনে হাজার তাকে 'সাদুকুন য়াহিমু' বলেছেন। [তাকরিবুত তাহযিব- তরজমা নং: ৭৮৯৯]

আবু বকর বিন মুসা : বুখারি ও মুসলিমের রাবি। সিকাহ। [তাকরিবুত তাহযিব- তরজমা নং: ৫৪০৩] অর্থাৎ প্রত্যেক রাবি-ই বুখারি-মুসলিম কিংবা উভয়ের রাবি। মিথ্যায় অভিযুক্ত কোনো রাবি নেই। এরপর রয়ে যায় হজরত আবু মুসা আশআরি রা. এর কথা। আল্লামা শিবলি নুমানি রহ. তার ব্যাপারে একটি প্রশ্ন তুলেছেন যে, এই হাদিসের সর্বশেষ রাবি আবু মুসা আশআরি রা. তো ঘটনায় উপস্থিত ছিলেন না, তিনি কার নিকট থেকে শুনেছেন, তা উল্লেখ করেননি।' [সিরাতুন নবী: ১/১১৪]

কিন্তু তার এই আপত্তি অহেতুক। কারণ, উসুলে হাদিসে আছে যে, সাহাবায়ে কেরামের মুরসাল হাদিস সর্বসম্মতিক্রমে গ্রহণযোগ্য।

ইমাম যারকাশি বলেন, 'সাহাবাগণের মুরসাল গ্রহণযোগ্য, যদিও তাবেয়িদের থেকে তাদের বর্ণনার সম্ভাবনা থাকে। কারণ, অধিকাংশ ক্ষেত্রে তারা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ছাড়া অন্যদের থেকে বর্ণনা করেন না। বিশেষকরে স্বাভাবিক অবস্থায়। তাই যখন কখনো ভিন্নরকম দেখা যাবে ঐ 'অধিকাংশ ক্ষেত্রের' উপর তার রেওয়ায়েতকে প্রযোজ্য হবে।' [আননুকাত আলা মুকাদ্দিমাতি ইবনিস সালাহ, যারকাশি: ১/৪৭৫]

আল্লামা সালাহুদ্দীন আলাঈ দিমাশকি লেখেন, জমহুর ওলামায়ে কেরাম সাহাবায়ে কেরামের মুরসাল গ্রহণে একমত।' [তাহকিকু মুনিফুর রুতবাহ, পৃষ্ঠা ৪৫]

ইমাম ইরাকি রহ. লেখেন, 'আর সাহাবায়ে কেরামের মুরসাল হলো মাওসুল হাদিসের হুকুমে।' [শারহুত তাবসিরা ওয়াত তাজকিরা আলফিয়াতুল ইরাকি: ১/২১৩]

সুনান তিরমিজির এই রেওয়ায়েতের গ্রহণযোগ্যতা প্রমাণিত হবার পর সিরাতে ইবনে হিশাম এবং তাবাকাতে ইবনে সাদের সেই যয়িফ সনদে বর্ণিত রেওয়ায়েতগুলো আর পরিত্যাজ্য থাকবে না, যেগুলোতে এর কাছাকাছি ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। তাই সিরাত গবেষকরা ঐ ঘটনাটি গুরুত্বের সাথেই উল্লেখ করেছেন। কারণ, এখানে এক অমুসলিমের জবানে রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর সত্যতার সাক্ষ্য মিলে।

১৫৬. যাদুল মাআদ- ১/৭৬, ৭৭ (মুসনাদবাযযারের সূত্রে)

ফিজার যুদ্ধ বলা হয়ে থাকে। এই যুদ্ধ প্রথম সংঘটিত হয় বনু কিনানা এবং হাওয়াজিনের মাঝে। দ্বিতীয়বার কুরাইশ ও হাওয়াজিনের মধ্যে, তৃতীয়বার হাওয়াজিন ও বনু নাসর বিন মুয়াবিয়ার মুখোমুখি যুদ্ধ।[১৫৭] চতুর্থ লড়াই হয় আগের চেয়ে ভয়াবহ ও রক্তক্ষয়ী। এই লড়াই 'ফিজারে রাবে' এবং 'ফিজারে বাররায' নামে প্রসিদ্ধ। কুরাইশ এবং বনু কায়সের মাঝে সংঘটিত হয়। এ সময় নবীজির বয়স পনেরো বছর ছিল।

যুদ্ধের দিন কুরাইশের বিচক্ষণ পুরুষেরা সারিবদ্ধভাবে ময়দানে দাঁড়ায়। বালকদেরকেও সাহায্যের জন্য তলব করা হয়। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও চাচাদের সাথে সাথে যান। তাদেরকে তিরন্দাজির দায়িত্ব দেওয়া হয়। এই যুদ্ধে ছিলেন বনু হাশিমের সরদার জুবাইর বিন আবদুল মুত্তালিবও উপস্থিত ছিলেন। কুরাইশের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন বনু উমাইয়ার সরদার হারব বিন উমাইয়া।

যুদ্ধের শুরুতেই শত্রুপক্ষ কুরাইশের উপর পুরো চড়াও হয়ে পড়ে। নবীজির চাচারা তির নিক্ষেপ করছিলেন আর তিনি দুশমনের তির কুড়িয়ে জমা করে রাখছিলেন, যেন তিরের সংকট তৈরি না হয়। দিনের শুরুতে বনু কায়সের যুদ্ধের পাল্লা ভারী ছিল। কিন্তু সূর্য ঢলার পর থেকেই কুরাইশের যুদ্ধের রূপ পালটে যায় এবং বনু কায়স পরাজিত হয়ে পশ্চাদপসরণ করে। এটাই ছিল নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুদ্ধে অংশগ্রহণের প্রথম অভিজ্ঞতা।[১৫৮]

সাইফ বিন যি-ইয়াযানের অফাত এবং দক্ষিণ আরবের উপর পারস্যের কর্তৃত্ব

---

১৫৭. মিরআতুয যামান, সিবতু ইবনুল জাওযি- ৩/৭২, ৭৩

১৫৮. সিরাতে ইবনে হিশাম- ১/১৮৪, আসসিরাতুল হালাবিয়্যাহ- ১/১৮৫-১৮৭

পুনশ্চ:

১. কারো মতে 'নিষিদ্ধ মাসসমূহে হওয়ার কারণে এগুলোকে 'হুরুবুল ফিজার' (তথা অপরাধ উদ্বেগকারী যুদ্ধসমূহ) বলা হয়। কিন্তু এই মতটি ঠিক নয়। কারণ, কিছু যুদ্ধ বছরের অন্য মাসেও সংঘটিত হয়েছিল। যেমন 'ফিজারে বাররায' যুদ্ধ শাওয়াল মাসে হয়েছিল। [উয়ূনুল আছার, ইবনু সাইয়িদিন নাসঃ ১/৬০, আসসিরাতুল হালাবিয়্যাহ- ১/১৮৬)।

অগ্রগণ্য মত হলো, অন্যায়ভাবে বহু পরিমাণে জান-মাল ধ্বংস হওয়ার কারণে তাকে 'ফিজার' নামকরণ করা হয়।

কায়স বিন মাখরামা রা. বলেন, 'তারা একে (ফিজার নাম দিয়েছে, কারণ) তারা অন্যায়কাজ করেছে, আগে যে সমস্ত কাজকে হারাম মনে করতো, তা হালাল করে ফেলেছিল।' [মাজমাউয যাওয়ায়িদঃ ১৩৯৩৯]

২. 'ফিজার' শব্দটি 'ফুজ্জার'ও পড়া যায়। 'ফুজ্জার' 'ফাজের' (পাপী) শব্দের বহুবচন। এদিক থেকে তার নামকরণের কারণ সুস্পষ্ট।

এ বছরই দক্ষিণ আরবে একটি অভ্যুত্থান ঘটে। ইয়েমেনের দেশপ্রেমিক আরব-শাসক সাইফ বিন যি-ইয়াযান পনেরো বছর শাসন করার পর ইহলোক ত্যাগ করেন। যেহেতু ইয়েমেনি হুকুমত কিসরার সামরিক মদদপুষ্ট ছিল; তাই সাইফের মৃত্যুর পরপরই কিসরা সরাসরি হুকুমত দখল করে পারসিক বংশোদ্ভূত লোকদের দিয়ে শাসনব্যবস্থা পরিচালনা করতে শুরু করে। ফলে জাজিরাতুল আরবের দক্ষিণাঞ্চল পুনরায় বিদেশি স্বৈরাচারী সরকারের হাতে চলে যায়।[১৫৯]

হালাল উপার্জনের জন্য পরিশ্রম

যৌবনে পদার্পণের পর নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার লক্ষ্যে জীবিকার খোঁজে বের হওয়ার চিন্তা করেন। বনু হাশিমের পেশা ছিল ব্যবসা-বাণিজ্য করা; কিন্তু নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে কোনো পুঁজি ছিল না। তাই তিনি পারিশ্রমিকের বিনিময়ে অন্যের ব্যবসায় শ্রম দিতে শুরু করেন। বনু সা'দে শৈশবকাল কাটানোর সুবাদে তার এই কাজের অভিজ্ঞতা ছিল।[১৬০] এরপর নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচা জুবাইরের সাথে ব্যবসা-বাণিজ্য করেন এবং তার সাথে ইয়েমেন সফরও করেন।[১৬১]

হিলফুল ফুযুল

মক্কার কিছু সম্মানিত ব্যক্তির উদ্যোগে তৎকালের সুপ্রসিদ্ধ সন্ধি সংঘটিত

---

১৫৯. আলকামিল ফিত তারিখ- ১/৪১০ (কিসরা বাদশাহ নওশেরওয়াহ বিন কুবাযের আলোচনা, তারিখু ইবনে খালদুন- ২/৭৪

১৬০. সহিহ বুখারি- ২২৬২ (কিতাবুল ইজারা, বাবু রা'য়িল গানাম আলা কারারিত্ব)

১৬১. ইবনুল জাওযি রহ. 'আলওয়াফা' গ্রন্থে বলেন,

لما أتت لرسول الله صلى الله عليه وسلم بضع عشرة سنة، خرج في سفرمع عمه الزبير

রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর বয়স যখন দশের উর্ধ্বে, তখন তার চাচা জুবাইরের সঙ্গে এক সফরে বের হন। [সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ- ২/১৩৯, হালাবি তার ব্যাখ্যায়: 'ইয়ামানে' অর্থাৎ সফর করেন। [আসসিরাতুল হালাবিয়্যাহ- ১/১৭০]

উপর্যুক্ত বক্তব্য দিয়ে নবীজির বয়স নির্দিষ্টভাবে জানা যায় না। কারণ, بضع শব্দটি তিন থেকে নয় পর্যন্ত সংখ্যাকে বুঝায়। [আসসিহাহ তাজুল লুগাহ: ৩/১১৮৬] কিন্তু অনুমান করা যেতে পারে। সময়টা ছিল ফিজারযুদ্ধ এবং হিলফুল ফুযুলের মাঝামাঝি সময়। হিলফুল ফুযুলে নবীজির (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বয়স ছিল বিশ বছর আর ফিজারযুদ্ধে পনেরো বছর।

এ ছাড়া কিছুদিন তিনি ছাগলও চড়িয়েছেন। ব্যবসার জন্য পর্যাপ্ত বয়স দরকার ছিল। তাই অনুমান করা যায় সফরের সময় নবীজির (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বয়স ১৮ বছরের কাছাকাছি ছিল। খুব সম্ভব এটি ইয়েমেনে কুরাইশদের গ্রীষ্মকালীন নিয়মিত সফর ছিল। [সুরা কুরাইশ : আয়াত ৩, তাফসিরে ইবনে কাসির দ্রষ্টব্য]

হওয়ার সময় নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বয়স ছিল বিশ বছর। এর দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, এমন নির্জীব এবং নিদ্রামগ্ন যুগেও কিছু মানুষের হৃদয় জাগ্রত ছিল।[১৬২]

এই সন্ধির মূলকথা তো ছিল, কুরাইশরা ইতিপূর্বে অহেতুক রক্তপাতে লিপ্ত হতো। তারা ন্যায়সঙ্গত সন্ধিচুক্তির মাধ্যমে সমাজে নিরাপত্তা ও শান্তি নিশ্চিত করতে চাচ্ছিলেন। তা ছাড়া এর তাৎক্ষণিক একটি কারণ ছিল যে, বনু জুবাইদ গোত্রের এক ব্যবসায়ী তার পণ্য নিয়ে মক্কায় আসে। জনৈক কুরাইশ-সরদার আস বিন ওয়াইল তার সব পণ্য ক্রয় করে নেয়; কিন্তু কোনো মূল্য পরিশোধ করে না। জুবাইদি ব্যবসায়ী অতিষ্ঠ হয়ে মক্কাবাসীর সাহায্য চায়। তখন কিছু সরদারের হৃদয়ে দয়া জাগ্রত হয়।

নবীজির চাচা জুবাইর বিন আবদুল মুত্তালিবের অনুমতিক্রমে তারা আবদুল্লাহ বিন জুদআন নামক সরদারের বাড়িতে একত্রিত হয়। তখন তাদের মাঝে চুক্তি হয় তারা জালেমের মোকাবেলায় এবং মজলুমের সাহায্যে প্রত্যেকেই পরস্পরের সহযোগী হবে। যিলকদ মাসে এই চুক্তি সম্পাদিত হয়। উক্ত শান্তিচুক্তিতে অংশগ্রহণকারী প্রসিদ্ধ তিন ব্যক্তির নাম ছিল ফযল, ফাযালা এবং মুফাযযাল; এজন্য তার নাম পড়ে যায় 'হিলফুল ফুযুল'।

নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও সেই চুক্তির মজলিসে উপস্থিত ছিলেন। তাদের এই ইনসাফপূর্ণ কথা ও স্বীকারোক্তিতে তিনি অনেক খুশি হন। পরবর্তীতে নবীজি বলেছিলেন, 'এই সন্ধির পরিবর্তে আমাকে যদি লাল উটও দেওয়া হতো, আমি তা গ্রহণ করতাম না। আজও যদি কেউ এমন সন্ধি করার দাওয়াত দেয়, আমি তাতে অংশগ্রহণ করতে প্রস্তুত।[১৬৩]

ঈর্ষণীয় তারুণ্য, ব্যবসা ও বিয়ে

নিজের পুঁজি না থাকায় অন্যের পুঁজি বিনিয়োগ করে লভ্যাংশের ভিত্তিতে ব্যবসা করতে থাকেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তার বয়স যখন পঁচিশ, তখন আল্লাহ তায়ালা তাকে ধনদৌলত দিয়ে সম্পদশালী বানিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করেন।

---

১৬২. তাবাকাতে ইবনে সাদ- ১/১২৮। উক্ত রেওয়ায়েতের উপর এই আপত্তি তোলা ভিত্তিহীন হবে যে, 'জুবাইর বিন আবদুল মুত্তালিব সে-সময় মৃত্যুবরণ করেছিলেন, আর তার মৃত্যু হয়েছিল নবীজির নবুওয়াতপ্রাপ্তির কয়েক বছর পূর্বে।' কারণ, বংশধারা সম্পর্কে প্রাজ্ঞ ইমাম বালাযুরি বলেন, জুবাইর যখন মারা যান, তখন রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর বয়স ছিল ত্রিশোর্ধ্ব।' [আনসাবুল আশরাফ- ২/২০]

১৬৩. তাবাকাতে ইবনে সাদ- ১/১২৮, আল-মুসতাদরাক, হাকিম- ২৮৭০, আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া- ৩/৪৫৫-৪৫৯, মিরআতুয যামান, সিবতু ইবনুল জাওযি- ৩/৭৯

খাদিজা বিনতে খুওয়াইলিদ নামের কুরাইশের একজন ধনী ও সম্ভ্রান্ত নারী ছিলেন। তিনি নির্ভরযোগ্য এবং দক্ষ লোকদেরকে নিজের পুঁজি দিয়ে ব্যবসায় নিয়োগ দিতেন। আর লভ্যাংশ থেকে পর্যাপ্ত বিনিময় প্রদান করতেন। তিনি নবীজির আভিজাত্য, দীনদারি এবং আরো গুণাবলি সম্পর্কে অবগত হয়ে অনেক পীড়াপীড়ি করে তাকে নিজের পুঁজি দিয়ে ব্যবসা করার জন্য শামদেশে পাঠান।

নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দীনদারি ও নৈতিকতার কারণে ব্যবসায় অনেক মুনাফা অর্জিত হয়। পাশাপাশি তার বহু গুণ বৈশিষ্ট্য সম্পর্কেও খাদিজা জানতে পারেন। তার কার্যক্রমে তিনি এতই মুগ্ধ হন যে, তার কাছে বিয়ের প্রস্তাব পাঠান। এর আগে বড় বড় শরিফ ও সরদাররা তাকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার প্রস্তাব কবুল করেন। চাচা আবু তালেব বিবাহ পড়ান। এ সময় নবীজির বয়স ছিল পঁচিশ এবং খাদিজার ছিল চল্লিশ বছর।[১৬৪]

বৈবাহিক জীবন

নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিঃস্ব ছিলেন। আল্লাহ তায়ালা তাকে বৈবাহিক জীবনের সাথে সাথে আর্থিক সচ্ছলতা দিয়েছিলেন। ওদিকে হজরত খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহা এমন জীবনসঙ্গী লাভ করেছিলেন যে, তিনি যতই এ নিয়ে গর্ব করতেন, মনে হতো হক আদায় হচ্ছে না। তিনি নিজের ধনসম্পদ, জায়গা-সম্পত্তি এবং ব্যবসায়িক পুঁজি সবই নবীজির খেদমতে সঁপে দেন। নবীজির সন্তুষ্টিই ছিল তার সন্তুষ্টি।

নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্ত্রীর ঘরেই বসবাস করতে থাকেন। সেই ঘরে দুটি বেডরুম এবং মেহমানখানা ছিল। এই বরকতময় ঘরেই নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যৌবনের আটাশটি বছর কাটিয়েছেন।[১৬৫]

নবীজির খেদমতে তখনও সেই হাবশি বাঁদি বারাকাহ নিয়োজিত ছিলেন। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন, 'আমার মায়ের পর তিনিই আমার মা ছিলেন।'

উম্মে আইমান নবীজি থেকে দশ-এগারো বছর বড় হবেন। তিনি নিজের বিয়ের সময় বাঁদির পড়ন্ত বয়স এবং পূর্বের অবদানের কথা চিন্তা করে কেবল তাকে আজাদই করে দেননি, বরং একজন অমায়িক মানুষ হারিস বিন যায়েদের সঙ্গে

---

১৬৪. সিরাতে ইবনে হিশাম- ১/১৮৭-১৯২। এটিই প্রসিদ্ধ। তবে ঐ সময় খাদিজা রা. এর বয়স ৩৫ও কারো বক্তব্যে এসেছে; এটা অনেকটাই যৌক্তিক।

১৬৫. কিছু ওয়েবসাইটের তথ্যমতে প্রাচীন প্রত্নতত্ত্ব বিষয়ে দক্ষ ব্যক্তিদের প্রচেষ্টায় খোদাই করে জায়গাটির সন্ধান পাওয়া গেছে। কিন্তু আমার (লেখকের) তা বিশ্বাস হয় নাই।

বিয়ে দিয়ে দেন। ফলে তিনিও নিজ স্বামীর ঘরে স্থির হয়ে যান। তার একটি ছেলে হয়, যার নাম রাখেন আইমান। তখন থেকেই ছেলের নামের দিকে সম্বন্ধ করে তাকে বারাকার পরিবর্তে উম্মে আইমান বলে ডাকা হয়।[১৬৬]

হজরত যায়েদ বিন হারিসার দায়িত্বগ্রহণ

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘরে স্ত্রী খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহা ছাড়াও আরেকজন ছিল। সে বনু কালবের হারিয়ে যাওয়া ছেলে যায়েদ বিন হারিসা। দুশমনরা তার গোত্রের উপর হামলা করে তাকে ছিনতাই করে উকাজ বাজারে নিয়ে গোলাম হিসেবে বিক্রি করে দেয়। তার বয়স ছিল তখন মাত্র আট বছর। হজরত খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহার ভাতিজা হাকিম বিন হিযাম তাকে খরিদ করে চাচিকে দিয়ে দেন। নবীজির সঙ্গে যখন খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহার বিয়ে হয়, তখন তিনি যায়েদকে তার খেদমতের জন্য প্রদান করেন।[১৬৭]

এক সময় যায়েদের পিতা হারিসা জানতে পারেন যে, তার হারানো সন্তান কুরাইশ গোত্রে গোলাম হিসেবে আছে। তিনি সোজা মক্কায় উপস্থিত হন। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট অনুনয়-বিনয় করে তার ছেলেকে ফিরিয়ে দেওয়ার অনুরোধ করেন এবং তার মুক্তিপণও পেশ করেন। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'যায়েদকে জিজ্ঞেস করুন। সে যদি যেতে চায়, তা হলে কোনো মুক্তিপণ ছাড়াই আপনি নিয়ে যান। আর সে যদি না যেতে চায়, তা হলে জোর করে তাকে পাঠাবো না।'

যায়েদকে ডাকা হলো। তখন তিনি পিতার সাথে যেতে অপারগতা প্রকাশ করে বলেন, 'আমি নবীজিকে ছাড়া কারো সঙ্গে-থাকা পছন্দ করি না।'

পিতা হতভম্ব হয়ে বললেন, বেটা, মুক্তজীবনের তুলনায় তুমি গোলামির জিন্দেগি বেছে নিচ্ছো?

যায়েদ বললেন, জি বাবা! আমি নবীজির মাঝে যে উত্তম গুণাবলি প্রত্যক্ষ করেছি, এগুলো ছাড়া আমার অন্য কিছু পছন্দ নয়।'

নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার প্রতি যায়েদের মহব্বত দেখে খুব মুগ্ধ হন আর তখনই মসজিদে হারামে গিয়ে ঘোষণা দেন যে, 'আমি একে পুত্র হিসেবে গ্রহণ করলাম।'

যায়েদের পিতা এই দৃশ্য দেখে আশ্বস্ত হন এবং নিশ্চিন্তে বাড়ি ফিরে যান।

---

১৬৬. আলইসাবাহ ফি তাময়িজিস সাহাবাহ, ইবনে হাজার আসকালানি- ৮/৩৫৮ (উম্মে আইমানে রা. জীবনী)

১৬৭. উসদুল গাবাহ, ইবনুল আসির জাজারি- ২/৩৫০ (যায়েদ বিন হারিসার জীবনী)

হজরত যায়েদ রাদিয়াল্লাহু আনহু প্রথম থেকেই নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সাথে থাকতেন; কিন্তু এ ঘোষণার পর থেকে তার এত ঘনিষ্ঠ হয়ে গেলেন যে, লোকেরা তাকে 'যায়েদ বিন মুহাম্মদ' বলে ডাকতে থাকে।[১৬৮]

নবীজির পারিবারিক জীবন

বিয়ের পর থেকে চল্লিশ বছর পর্যন্ত সময়টি ছিল নবীজির জীবনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ। যদিও সিরাতের কিতাবসমূহে খুব সংক্ষিপ্তভাবে তার আলোচনা এসেছে। এই পনেরো বছর নবীজি তারুণ্যদীপ্ত কর্মযজ্ঞ, সমাজকল্যাণ এবং পারিবারিক জীবনের মধ্যদিয়ে একটি ব্যস্ততম সময় পার করেছেন। যেহেতু তার জীবিকার মাধ্যম ছিল ব্যবসা-বাণিজ্য; তাই লেনদেন কার্যক্রমের জন্য তাকে দিনভর বিভিন্ন এলাকার মানুষের সঙ্গে ওঠাবসা করতে হতো।

ব্যবসায়ী জীবন এবং সামাজিক আচার-ব্যবহারে তার সুনাম-সুখ্যাতি তুঙ্গে ছিল। পুরো মক্কাতে তার চেয়ে সম্ভ্রান্ত, বুদ্ধিমান, সম্মানিত, উত্তম চরিত্রবান কেউ ছিল না। সকলেই তার সততা, দীনদারির কথা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করত। নিজেদের মূল্যবান জিনিসপত্র আমানত রাখার জন্য নবীজিকেই তারা বিশ্বস্ত মনে করত। সবাই তাকে 'সাদিক' এবং 'আমিন' বলে ডাকত।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সত্যবাদিতা এবং ওয়াদা-রক্ষার ব্যাপারে অত্যন্ত যত্নবান ছিলেন। মক্কার অধিবাসী আবদুল্লাহ বিন আবুল হামসা নামক এক ব্যক্তির সাথে নবীজির কিছু লেনদেন হয়। তখন আবদুল্লাহর কাছে ঋণ পাওনা হন। সে বলে, 'আপনার পাওনা আমি এখানে এনে পরিশোধ করে দিচ্ছি'- বলে সে তার বাড়ি চলে যায়। সে তার ওয়াদা পূরণের কথা ভুলে যায়। তৃতীয়দিন তার স্মরণ হতেই সে ঐ জায়গায় গিয়ে দেখে নবীজি সেখানেই তার জন্য অপেক্ষা করছেন। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে কেবল এটুকু বললেন, 'যুবক, তুমি আমাকে ক্লান্ত করে ফেললে।'[১৬৯]

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যৌথব্যবসাও করেছেন। আবু সাইব এবং কায়েস বিন সাইব নামে দুজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি তার ব্যবসায়ে পার্টনার ছিল। তারাও নবীজির দীনদারি এবং সুন্দর লেনদেনের স্বীকারোক্তি দেয়।[১৭০]

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পণ্য নিয়ে মক্কার বাইরেও যেতেন। মক্কার উত্তর-পূর্বে তায়েফের নিকটবর্তী সুপ্রসিদ্ধ 'উকাজ' বাজার। এখানে ব্যবসা ছাড়াও কবিতা আবৃত্তি এবং গল্পের আসর জমে উঠত। বিভিন্ন গোত্রের

---

১৬৮. উসদুল গাবা, ইবনুল আসির জাজারি- ২/৩৫০ (যায়েদ বিন হারিসার জীবনী)
১৬৯. উসদুল গাবা, ইবনুল আসির জাজারি- ৩/২১৮ (আবদুল্লাহ বিন আবুল হামসা-এর জীবনী)
১৭০. আলইসতিয়াব, ইবনু আবদুল বার- ৩/১২৮৮

ঝগড়াঝাটির ফয়সালাও এখানে হতো। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পণ্য নিয়ে এই বাজারেও গমন করতেন।[১৭১]

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অন্তরঙ্গ বন্ধু আবু বকর বিন আবু কুহাফা স্বভাব-প্রকৃতি, ধ্যানধারণা, অভ্যাস- সব গুণেই নবীজির সঙ্গে তার মিল ছিল। পাশাপাশি উভয়ে একই পেশার লোক ছিলেন। মূর্তিপূজা, মদপানসহ অন্যান্য মন্দ স্বভাব তিনি একদম পরিহার করে চলতেন।[১৭২]

ঐ পনেরো বছরের দিনলিপির এরচেয়ে বিস্তারিত আলোচনা পাওয়া যায় না। কিন্তু এটুকু বুঝা যায় যে, পুরো দিন তার ব্যবসা-বাণিজ্য, সামাজিক ও পারিবারিক কাজেই কেটে যেত। আর একাকিত্বে তিনি আল্লাহ তায়ালার কুদরত, দুনিয়ার সূচনা, ব্যবস্থাপনা এবং আপন কওমের অবস্থা নিয়ে গভীর চিন্তাভাবনা করতেন।

কাবা শরিফ নবনির্মাণ

কুরাইশ যখন মক্কা শরিফ নতুনভাবে নির্মাণের ইচ্ছা পোষণ করে, ততদিনে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বয়স পঁয়ত্রিশের কোটা পেরিয়ে গেছে।[১৭৩] রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চাচা আব্বাসের সঙ্গে নির্মাণকাজে আত্মনিয়োগ করেন। তারা পাহাড় থেকে পাথর বহন করে নিয়ে আসতেন।[১৭৪] নির্মাণ আরম্ভ হওয়ার পর দেওয়ালের গাঁথুনি যখন হাজরে আসওয়াদ পর্যন্ত পৌঁছে এবং এই মোবারক পাথর স্থাপনের সময় হয়, তখন নির্মাণকাজে অংশগ্রহণকারী সব গোত্র প্রচণ্ড ঝগড়ায় লিপ্ত হয়; প্রত্যেকেই হাজরে আসওয়াদ স্থাপনের গৌরব অর্জন করতে চায়।

বনু আদি এবং বনু আবদুদ দারের ক্রোধ-ক্ষোভ এ পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে, তারা আরবের যুদ্ধপ্রতিজ্ঞার নিয়মানুযায়ী রক্তের মধ্যে হাত ডুবিয়ে এ মর্মে কসম খায় যে, তাদেরকে যদি হাজরে আসওয়াদ স্থাপন করার সুযোগ না দেওয়া

---

১৭১. সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ- ২/১৮৬

১৭২. আসসিরাতুল হালাবিয়্যাহ- ১/৩৮৯; তারিখুল খুলাফা- পৃষ্ঠা ২৯

১৭৩. তাবাকাতে ইবনে সাদ গ্রন্থের দুই রেওয়ায়েত: 'কুরাইশরা নবীজির উপর ওহি অবতরণের পাঁচ বছর পূর্বে কাবা নির্মাণ করেছে।' (৩/৩৮১) এবং 'কুরাইশরা যখন কাবাঘর পুনর্নির্মাণ করে তখন নবীজির বয়স ছিল পঁয়ত্রিশ ছিল।' (৮/১৬)- একত্র করলে উল্লিখিত কথাই পাওয়া যায়।

মুসনাদ আহমাদের রেওয়ায়েত: 'সোমবার হাজরে আসওয়াদ উত্তোলন করেছেন' (হাদিস নং ২৫০৬) এর আগ-পিছের বর্ণনাভঙ্গি বলে যে, ঘটনাটি রবিউল আওয়াল মাসের ১২ তারিখ নির্ধারণ করে দেয়। কারণ, ঐ বর্ণনায় আসা অন্যান্য ঘটনাও এই তারিখেই ঘটেছে।

১৭৪. সহিহ বুখারি- ৩৮২৯ (কিতাবুল মানাকিব, বাবু বুনয়ানিল কাবা)

হয়, তা হলে তারা সবাই মিলে অধিকার আদায়ে যুদ্ধ করতে করতে জান দিয়ে দেবে। ওদিকে তাদের প্রতিপক্ষদের গোসসাও কম ছিল না। পরিস্থিতি রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে গিয়েছিল।

এ সময় কিছু দূরদর্শী বিচক্ষণ লোক তাদেরকে বুঝিয়েসুজিয়ে শান্ত করতে সক্ষম হয় এবং এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, মসজিদে হারামে এখন সর্বপ্রথম যে ব্যক্তি প্রবেশ করবে, সে-ই বর্তমান সংকট নিরসন করবে। তখন লোকেরা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রবেশ করতে দেখে সকলেই সমস্বরে বলতে থাকে, 'মুহাম্মদ আল আমিন (বিশ্বস্ত মুহাম্মদ) এসে গেছে। আমরা তার ফয়সালায় সন্তুষ্ট।'

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সংকট মোকাবেলায় একটি চমৎকার পদ্ধতি অবলম্বন করলেন। তাদেরকে একটি চাদর আনতে বললেন। চাদরের মধ্যখানে হাজরে আসওয়াদ রেখে প্রতিটি গোত্রের একজন নির্বাচিত ব্যক্তিকে চাদরের এক কোনায় ধরার জন্য বললেন। সবাই মিলে নির্দিষ্ট জায়গা পর্যন্ত নিয়ে যাওয়ার পর নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজহাতে তা কাবায় স্থাপন করেন। এভাবেই অত্যন্ত প্রজ্ঞা ও ইনসাফের সঙ্গে একটি বড় রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ থেকে সবাই বেঁচে যায়।[১৭৫]

ঘরোয়া দায়িত্ব

নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর ঘরের দায়িত্বও কম ছিল না। তার ছিল তিন কন্যা- যায়নাব, রুকাইয়া ও উম্মে কুলসুম তার বিয়ের বয়সে উপনীত হয়ে গিয়েছিলেন। তাদেরকে বিয়ে দেওয়ার কথা ভাবতে হচ্ছিল। আরবের এমন বিকৃত পরিবেশ এবং নষ্ট সমাজে বর খুঁজে পাওয়া সহজ ব্যাপার ছিল না।

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিয়ের পঞ্চম বছরে হজরত যায়নাব রাদিয়াল্লাহু আনহার জন্ম হয়। অষ্টম বছরে হজরত রুকাইয়ার জন্ম। এরপর যথাক্রমে উম্মে কুলসুম ও ফাতেমার জন্ম হয়। ফাতেমাই ছিলেন নবীজির সর্বকনিষ্ঠ কন্যা। তিনি নবীজির বিয়ের দশ বছর পর জন্মগ্রহণ করেন।[১৭৬]

চার কন্যার পিতা হওয়ার পর নবীজির দায়িত্ব কী পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছিল তা কন্যাসন্তানের পিতামাত্র অনুধাবন করতে পারে।

এ সময়ের মধ্যে নবীজির দুজন পুত্রসন্তানও হয়- কাসিম ও আবদুল্লাহ।

---

১৭৫. সিরাতে ইবনে হিশাম- ১/১৯০-১৯৯

১৭৬. তাবাকাতে ইবনে সাদে এভাবে এসেছে, কুরাইশ যখন কাবা পুনর্নির্মাণ করে, অর্থাৎ নবুওয়াতপ্রাপ্তির পাঁচ বছর পূর্বে ফাতেমা জন্মগ্রহণ করেন।' (৮/১৯-৩৮)

কাসেমের দিকে সম্বন্ধ করেই নবীজিকে 'আবুল কাসিম' উপনামে ডাকা হয়। আর আবদুল্লাহ 'তাইয়িব' ও 'তাহির' উপাধিতে প্রসিদ্ধি লাভ করেন।[১৭৭]

যায়েদ বিন হারিসার সঙ্গে উম্মে আইমানের বিয়ে

এদিকে হজরত উম্মে আইমান রাদিয়াল্লাহু আনহাকে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মায়ের মর্যাদা দিতেন। তার বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি ছিল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার বিয়োগ সইতে পারছিলেন না। আবার এই বয়সে তার দেখাশোনার জন্য একজন লোকেরও প্রয়োজন ছিল। তিনি হাবশি ছিলেন। আরবে তার কোনো আত্মীয়স্বজন ছিল না। এই বয়সে তাকে বিয়ে করতেও কেউ আগ্রহী হবে না। এই অবস্থায় নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পালকপুত্র যায়েদ বিন হারিসা তাকে বিয়ে করার জন্য রাজি হয়ে যান।

উম্মে আইমানের সঙ্গে যায়েদের বিয়ে অনুষ্ঠিত হয়। যায়েদ যদিও টগবগে তরুণ ছিলেন। কিন্তু তিনি উম্মে আইমানের সঙ্গে সুন্দর জীবনযাপন করেন। উম্মে আইমানের মরহুম স্বামীর ছেলে আইমানও তার সঙ্গে ছিল। তাদের পরিবারটি নবীজির পূর্ণ দায়িত্ব ও পরিবারভুক্ত ছিল।[১৭৮]

সৃষ্টির সেবা : নবীজির অনন্য বৈশিষ্ট্য

ব্যবসা-বাণিজ্য, ঘর ও পারিবারিক দায়িত্ব আঞ্জাম দেওয়ার পাশাপাশি নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সবচেয়ে পছন্দের কাজ ছিল সৃষ্টির সেবা করা। তিনি আল্লাহর দেওয়া ধনদৌলত, ইজ্জত-সম্মান, চিন্তাফিকির ও বুদ্ধিমত্তার নেয়ামতগুলো তার বান্দাদের কল্যাণে অকাতরে ব্যয় করতেন। ক্ষুধার্ত মানুষদের খাওয়ানো, বিধবা নারীদের সাহায্য করা, অভাবী লোকদের চাহিদা পূরণ করা নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অভ্যাস ছিল। অতিথিদের সম্মানে সৌজন্যমূলক আচরণ করা থেকে কখনো বিরত থাকতেন না।

বনু হাশিমের অভাবী পরিবারগুলোর প্রতি তার বিশেষ সহযোগিতা জারি ছিল। তার চাচা আবু তালিব, যিনি তাকে দেখভাল করেছেন, তিনি আর্থিকভাবে অসচ্ছল ছিলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার ছেলের প্রতি বিশেষভাবে যত্ন নিতেন। তাদেরকে ভ্রাতৃস্নেহ প্রদর্শন করতেন। তাদের মধ্যে আকিল রাদিয়াল্লাহু আনহু নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে দশ

---

১৭৭. তাবাকাতে ইবনে সাদ- ১/১৩৩। কিছু কিছু সিরাত-লেখকের কাছে 'তাইয়িব' এবং 'তাহির' দুই ছেলে ছিল। তবে এটি তাহকিক পরিপন্থি।

১৭৮. উসদুল গাবাহ- ৮/২৯০, আলইসাবাহ ফি তাময়িজিস সাহাবাহ, ইবনে হাজার আসকালানি- ৮/৩৫৮ (উম্মে আইমান রা. এর জীবনী)

বছর, জাফর বিশ বছর এবং আলি ত্রিশ বছর ছোট ছিলেন। একবার ভীষণ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলি রাদিয়াল্লাহু আনহুকে নিজের পরিবারে নিয়ে নেন এবং তিনি নবীজির কোলেই হেসে-খেলে প্রতিপালিত হন।[১৭৯]

বনু হাশিমের সূর্য

পরিবারের দায়িত্ব এবং ব্যবসায়িক ব্যস্ততার পাশাপাশি তিনি নিজ বংশ বনু হাশিমের গুরুত্বপূর্ণ সকল কাজে অংশগ্রহণ করতেন। বনু হাশিমের খুঁটি হিসেবে ছিলেন তখন চাচা আবু তালেব, আবু লাহাব, আব্বাস এবং হামজা।

আবু তালিব ছিলেন বয়স্ক এবং নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অভিভাবক। আবু লাহাব কঠোরপ্রকৃতির হওয়া সত্ত্বেও নবীজির সঙ্গে তার ভালো সম্পর্ক ছিল। নবীজি তার দুই কন্যা রুকাইয়া ও উম্মে কুলসুমের বিয়ে আবু লাহাবের দুই ছেলে উতবা এবং উতাইবার সঙ্গে দেন।[১৮০]

চাচা হজরত আব্বাস নবীজির তিন বছরের বড় ছিলেন এবং তার প্রতি অনেক খেয়াল রাখতেন। তিনি উচ্চ স্বরধ্বনির অধিকারী প্রভাবশালী মানুষ ছিলেন। জমিদারি তার পেশা ছিল। সচ্ছল জীবনযাপন করতেন। আবদুল মুত্তালিবের পর কাবার পুনর্নির্মাণ ও সংস্কার এবং হাজিদের পানি পান করানোর দায়িত্ব তিনি আঞ্জাম দিতেন।[১৮১]

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অন্তরঙ্গ চাচা হামজা তার থেকে মাত্র দুই বছরের বড় ছিলেন। তিনি আবু লাহাবের বাঁদি সুওয়াইবার দুধ পান করেছিলেন। এদিক থেকে তিনি নবীজির দুধভাইও ছিলেন। মানুষের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করতেন। অভাবীদের সাহায্যে এগিয়ে আসতেন। তিরন্দাজি এবং তরবারি চালনায় তার কোনো জুড়ি ছিল না। সফর ও শিকার তার ব্যস্ততা ছিল।[১৮২]

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ফুফু সাফিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহাও বনু হাশিমের একজন বড় নারীব্যক্তিত্ব ছিলেন। তিনি নবীজির সমবয়সি ছিলেন। তার বাহাদুরি ও সাহসিকতা ছিল প্রবাদতুল্য।[১৮৩] বনু হাশিমের মতো

---

১৭৯. সিরাতে ইবনে হিশাম- ১/২৪৫, ২৪৬; উসদুল গাবাহ- ১/৫৪১; (জাফর রা. এর জীবনী), ৪/৬১ (আকিল রা. এর জীবনী)

১৮০. আলজাওহারা ফি নাসাবিন নাবিয়্যি ওয়া আসহাবিহিল আশারাহ, আল্লামা বাররি তিলমিসানি (মৃত্যু ৬৪৫ হিজরি): ২/৪৪ (দারুর রিফাই সংস্করণ, রিয়াদ)

১৮১. আলইসতিয়াব, ইবনু আবদুল বার- ২/৮১১ (দারুল জীল সংস্করণ)

১৮২. তাবাকাতে ইবনে সাদ- ১/৯৫, ৩/১৩; আনসাবুল আশরাফ- ৪/২৮৫ (দারুল ফিকর, বৈরুত সংস্করণ)

১৮৩. আলইসাবাহ ফি তাময়িজিস সাহাবাহ, ইবনে হাজার আসকালানি- ৮/২১৩

এমন বড় খান্দানের মধ্যে নবীজির মর্যাদা ছিল সূর্যের ন্যায়। অন্তত এটা সবার জানা ছিল যে, বনু হাশিমের নেতৃত্ব নবীজির ভাগ্যেই জুটবে। কিন্তু কারোই কল্পনা ছিল না যে, তার বিরলপ্রজ নামের সাথে উভয়জাহানের নেতৃত্ব লিখে দেওয়া হয়েছে।

নবুওয়াতের আমানত যখন অর্পিত হলো

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বয়স চল্লিশ বছর হওয়ার পরপরই তার ধ্যান, অনুভব-অনুভূতির মধ্যে গভীরতা আসে। তিনি দেখতে পান পুরো পৃথিবী ধ্বংস ও বরবাদির পথে হাঁটছে। এখনই যদি তাদের সংশোধনের জন্য কোনো কার্যকর পদক্ষেপ না নেওয়া হয়, তা হলে সমগ্র মানবজাতির অবস্থা খুবই নাজুক আকার ধারণ করবে। এই চিন্তা-ফিকির ছাড়াও তার মধ্যে আশ্চর্য ধরনের এক অজানা বেচাইনি ও অস্থিরতা অনুভব হতো। বিগত সাত বছর যাবৎ তিনি মাঝেমধ্যেই ফেরেশতাদের আওয়াজ শুনতে পাচ্ছিলেন, অদৃশ্যের নুরের ঝলকও দেখতে পেতেন।[১৮৪] তখনও নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কল্পনা ছিল না যে, আল্লাহ তায়ালা তাকেই সর্বশেষ রাসুলের মর্যাদা দান করবেন।[১৮৫]

এই অবস্থা নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে একাকিত্ব-বান্ধব করে তোলে। ফলে তিনি মক্কার পাহাড় ও বিরানভূমিতে সময় অতিবাহিত করতে লাগলেন। এ সময় নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সত্য স্বপ্ন দেখানো হতো। কখনো কখনো উপত্যকা অতিক্রম করার সময় বৃক্ষ ও পাথর থেকে আওয়াজ শুনতেন 'আসসালামু আলাইকা ইয়া রাসুলাল্লাহ'। তখন তিনি পেছন ফিরে তাকাতেন। তখন কাউকে দেখা যেত না।[১৮৬]

জিনদের আসমান-গমন নিয়ন্ত্রণ

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর ওহি নাজিল শুরু হওয়ার পূর্বেই তা সংরক্ষণ করার সকল ব্যবস্থাপনা সম্পন্ন করা হয়। ইতিপূর্বে জিন-শয়তানরা আসমানের নিকটবর্তী হয়ে ফেরেশতাদের নিকট আসা বিধান এবং সংবাদ শুনে ফেলত। পৃথিবীতে এসে তারা গণক ও জাদুকরদের এগুলো অবগত করত। আর এরা একটার সাথে দশটা মিথ্যা মিশ্রণ করে মানুষকে অদৃশ্যের সংবাদ বলে ধোঁকা দিত। সর্বশেষ কিতাব নাজিল হওয়ার পূর্বেই জিনদের আসমানের নিকটবর্তী হওয়া এবং সংবাদ আহরণ করার উপর প্রহরার ব্যবস্থা

---

১৮৪. তাফসিরে ইবনে কাসির; সুরা কাসাস, আয়াত ৮৬

১৮৫. সহিহ মুসলিম, হাদিস ৬২৫০ (কিতাবুল ফাজাইল)

১৮৬. সিরাতে ইবনে হিশাম- ১/২৩৪। সে সময় কিছু পাথর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)কে-সালাম দিত, তিনি তা স্পষ্টভাবে বুঝতে পারতেন। (সহিহ মুসলিম- হাদিস ৬০৭৮) এই আলামতগুলোকে সিরাত-লেখকগণ 'ইরহাসাত' বলে ব্যক্ত করেন।

করা হলো। যদি কোনো জিন আগের মতো সেদিকে যায়, তা হলে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ দিয়ে তার পশ্চাদ্ধাবন করা হয়।

এই পরিস্থিতি দেখে জিনদেরও অনুমান হয়ে যায় যে, শীঘ্রই পৃথিবীতে বড় ধরনের ঘটনা ঘটতে যাচ্ছে। এক জ্যোতিষীর বক্তব্য হলো (যিনি পরবর্তীতে মুসলমান হয়েছিলেন), আমার কাছে এক পেত্নী আসত। একদিন সে হন্তদন্ত হয়ে এসে বলতে থাকে,

ألم تر الجنَّ وإبلاسَها، وبأسها من بعد إنكاسها، ولحوقها بالقِلاص وأحلاسها

কী, তুমি জিন ও তাদের পেরেশানি দেখোনি? তাদের হতাশা এবং অপদস্থতা, উটের চটের নিচে তাদের আশ্রয় নিতে দেখনি?[১৮৭]

পৃথিবীর এমন পরিবর্তনের কারণে জিনেরাও বুঝতে পেরেছিল যে, শেষনবীর আসার সময় ঘনিয়ে এসেছে। মনে হচ্ছিলজ্জযেমনিভাবে প্রবল বৃষ্টির পূর্বমুহূর্তে বাতাস থমকে থাকে, তেমনি ওহি নাজিলের পূর্বে যেন পুরো সৃষ্টি নির্জীব স্থবির হয়ে আছে।

১৮৭. সহিহ বুখারি- ৩৮৬৬ (বাবু ইসলামি উমর রা.)

প্রথম ওহি

(নবুওয়াতের ১ম বর্ষ)

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার ধ্যানমগ্নতার জন্য মক্কা থেকে দূরে হেরাগুহাকে বেছে নেন। নবীজির বয়স তখন চল্লিশ বছর। একাকী থাকা অবস্থায় একদিন তার সামনে এক ফেরেশতা আবির্ভূত হলেন।[১৮৮]

---

১৮৮. ওহি নাজিল শুরুর প্রসঙ্গে বিভিন্ন রেওয়ায়েতের মধ্যেও ভিন্নতা রয়েছে। ক্যালেন্ডারের হিসাবেও মতানৈক্য চলে আসছে। তবে সোমবার ওহি নাজিল হওয়ার ব্যাপারে সকলেরই মতৈক্য রয়েছে। সহীহে হাদিসে আছে, 'তাঁকে সোমবার রোজা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে বলেন, এদিন আমি জন্ম নিয়েছি এবং এদিনই আমার ওহি নাজিল (শুরু) হয়।' সহিহ মুসলিম-২৮০৭; কিতাবুস সাওম, বাবু ইসতিহবাবি সাওমি ছালাছাতি আইয়্যাম মিন কুল্লি শাহর]

সে সময় তার বয়স ছিল চল্লিশ বছর, এতেও কারো দ্বিমত নেই। শামায়েলে তিরমিজির (আরো অনেক মুহাদ্দিস এই হাদিস টি বর্ণনা করেছেন) এক সহিহ হাদিসে আছে, 'আল্লাহ তায়ালা তাঁকে চল্লিশ বছরের শুরুভাগে নবুওয়াত প্রদান করেন।' সাথে সাথে এতেও কারো মতানৈক্য নেই যে, নবুওয়াতের তেরো বছর পর হিজরত হয়েছে।

মাস এবং তারিখ নিয়ে হলো অধিক মতানৈক্য। প্রসিদ্ধ মত হলো রবিউল আওয়াল মাসে ওহি নাজিল শুরু হয়েছে। কারণ, ইবনে আব্বাস রা. এর রেওয়ায়েত আছে, 'রাসুলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বয়স যখন চল্লিশ, তখন তার উপর ওহি নাজিল হয়'। [সহিহ বুখারি- কিতাবুল মানাকিব-বাবু মাবআসিন নাবী] আর প্রসিদ্ধ মত অনুযায়ী নবীজির (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) জন্মতারিখ হয় ১২ রবিউল আওয়াল, তাই চল্লিশ বছর পূর্ণ হওয়ার পর নবুওয়াতের দিনও ১২ রবিউল আওয়াল নির্ধারিত হয়ে যায়। ১২ তারিখের পক্ষে হজরত ইবনে আব্বাস রা. এর একটি ভারি দলিল: 'রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) রবিউল আওয়ালের ১২ তারিখ সোমবার হস্তীবাহিনীর আক্রমণের বছরে জন্মগ্রহণ করেন। এ তারিখেই তিনি নবুওয়াতপ্রাপ্ত হন, এ তারিখেই তিনি হিজরত করেন এবং ওফাত বরণ করেন।' [আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া ৩/৩৭৫- ইবনে আবি শাইবার সূত্রে]

কাজি সুলাইমান মানসুরপুরি রহ. বলেন, নবুওয়াতের বছর ১২ রবিউল আওয়াল সোমবার হয় না, বরং ৯ রবিউল আওয়াল হলে সোমবার হবে। তাই ৯ তারিখই সুনির্দিষ্ট। এজন্য জন্ম-মৃত্যু উভয় ক্ষেত্রেই তিনি ৯ তারিখকে প্রাধান্য দিয়েছেন। [রাহমাতুল লিল আলামিন-১/৬৯, ৭৫, ২৪২]

কিছু কিছু পঞ্জিকাবিশেষজ্ঞের নিকট সোমবার ৯ তারিখ নয়; ৮ রবিউল আওয়াল হয়, আর এটিই নবুওয়াতপ্রাপ্তির তারিখ। [তাকউয়িম আহদি নববি, আলি মুহাম্মদ খান, পৃষ্ঠা ৮০] উপর্যুক্ত উভয়পক্ষই ৬১০ খ্রিষ্টাব্দ ৯ ফেব্রুয়ারি হওয়ার ব্যাপারে একমত।

অপরদিকে এক শ্রেণির নিকট নবুওয়াত এবং জন্ম উভয়টিই রমজান মাসে হয়েছে। রমজান মাসে নবীজির জন্ম হওয়ার ব্যাপারে তাদের দলিলসমূহ পিছনে আমরা টীকায় উল্লেখ করে এসেছি। তারা সহিহ বুখারির ঐ হাদিসকে প্রমাণ হিসেবে পেশ করে বলেন, চান্দ্রবর্ষ

অনুযায়ী চল্লিশ বছর পূর্ণ হতেই রমজান মাসে ওহি অবতীর্ণ হওয়া শুরু হয়। রমজানে নবুওয়াতপ্রাপ্ত হওয়ার দলিল হিসেবে তারা সুরা বাকারার ১৮৫ নং আয়াত (شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن) এবং সুরা আনফালের ৪১ নং আয়াত (وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان) পেশ করেন। (يوم التقى الجمعان) দ্বারা উদ্দেশ্য হলো গাজওয়ায়ে বদর, আর এটি সংঘটিত ১৭ রমজানে। (وما أنزلنا على عبدنا) অনুযায়ী (يوم الفرقان) কুরআন নাজিলের দিন হয়। আর কুরআন নাজিলের দিনও সেই সতেরো রমজান। [দালাইলুন নুবুওয়াহ- ২/১৩০]

হাফেজ ইবনে কাসির রমজানের নবুওয়াতপ্রাপ্তির মতটিকে প্রসিদ্ধ মত বলে ব্যক্ত করেন। [আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া- ৪/১৬] ইবনে ইসহাকের কাছে এটিই অগ্রগণ্য মত। [সিরাতে ইবনে ইসহাক- ১/১৩০]

ওয়াকিদি ইমাম বাকের রা. থেকে ১৭ রমজানে নবীজির নবুওয়াতপ্রাপ্তির বিষয়ে একটি সুস্পষ্ট বক্তব্য উল্লেখ করেছেন। [আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া ৪/১৬]

হজরত ইবনে আব্বাসের উপর্যুক্ত বক্তব্যটির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যা-ই হোক, ইবনে কাসির রহ. তা উল্লেখ করার পর মুনকাতি বলে তার দুর্বলতার দিকে ইঙ্গিত করেছেন।

উপর্যুক্ত রেওয়ায়েত এবং অভিমতগুলো সামনে রেখে পঞ্জিকার সাহায্যে সম্ভাব্য আরো কিছু তারিখ বর্ণনা করেছেন, এত সংখ্যক বক্তব্য থেকে অধিক উপযুক্ত মত চেনা বড় দুষ্কর। কিছু কিছু মত গ্রহণ করলে নবুওয়াত ও হিজরতের মাঝে ১৩ বছরের স্থানে ১৪ বছরেরও অধিক সময় হয়ে যায়। ফেব্রুয়ারি ৬০৯ খ্রিষ্টাব্দের মত গ্রহণ করলে ১৩ বছর ছ'মাস হয়ে যায়। অথচ ১৩ বছরের ব্যাপারে সকলেই একমত। আর কিছু মত গ্রহণ বুখারির (ابن أربعين) এবং তিরমিজির (على رأس أربعين سنة) এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় না। অর্থাৎ এমন একটি মতও নেই, যার মধ্যে সকল শর্ত রয়েছে, আর তা গ্রহণ করলে কোনো আপত্তিও থাকে না। আমার (লেখকের) অভিমত হলো, যদি নবুওয়াতের সময়টি ১৯ মে ৬০৯ খ্রিষ্টাব্দ ধরা হয়, তা হলে তুলনামূলক কম আপত্তি উত্থাপিত হয়। (মে ৬০৯ খ্রিষ্টাব্দ থেকে হিজরতের মাস সেপ্টেম্বর ৬২২ খ্রিষ্টাব্দের মাঝে ১৩ বছর চার মাস হয়।) ভাংতি মাসগুলো ফেলে দিলে এত পার্থক্য দৃষ্টিগোচর হবে না। এই মতটি গ্রহণ করার পূর্বে কয়েকটি বিষয় মানা আবশ্যক।

১. নবীজির জন্ম মক্কি রমজান মোতাবেক মাদানি রবিউল আওয়াল ৫৬৯ খ্রিষ্টাব্দের মে মাসে হওয়া।

২. চল্লিশ বছর বয়সে নবুওয়াতপ্রাপ্তি থেকে উদ্দেশ্য মক্কি পঞ্জিকা অনুযায়ী চল্লিশ বছর।

এবার লক্ষ করুন, ১৯ মে ৬০৯ খ্রিষ্টাব্দের মক্কি রমজানের ৯ তারিখ সোমবার পড়ে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে নিম্নোক্ত প্রকারগুলো তার অনুরূপ তারিখের সাথে মিলে যায় :

১. যে রেওয়ায়েত সোমবার দিন নবুওয়াতপ্রাপ্তির দলিল।

২. যে রেওয়ায়েত রমজান মাসে নবুওয়াতপ্রাপ্তিকে সমর্থন করে।

৩. যে রেওয়ায়েতে (ابن أربعين) কিংবা (على رأس أربعين سنة) শব্দ রয়েছে।

৪. যে রেওয়ায়েতে নবুওয়াতের ১৩ বছর পর হিজরতের কথা উল্লেখ আছে। বাকি থাকে রবিউল আওয়াল মাসে নবুওয়াতপ্রাপ্তি সম্পর্কে হাদিসগুলোর কথা। আলি মুহাম্মদ খান রহ. এর গবেষণা মোতাবেক ১৯ মে ৬০৯ খ্রিষ্টাব্দের দিন আরবের তৃতীয় ক্যালেন্ডার 'সৌর, চন্দ্র এবং বসন্ত' এর ৯ রবিউল আওয়ালের নিয়ম অনুযায়ী হয়। এভাবে আলহামদুলিল্লাহ উপর্যুক্ত সব মত ও রেওয়ায়েতের মাঝে সামঞ্জস্য হয়ে যায়। (আল্লাহ তায়ালাই অধিক অবগত)

তিনি ছিলেন জিবরাইল আলাইহিস সালাম। আল্লাহ তায়ালার হুকুমে সর্বশেষ রিসালাত এবং সমগ্র পৃথিবীর পথনির্দেশের দায়িত্ব রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে সঁপে দিতে এসেছিলেন। তিনি এসেই নিজের পরিচয় তুলে ধরে বলেন, 'হে মুহাম্মদ, আমি জিবরিল, আর আপনি আল্লাহর রাসুল।' এরপর ফেরেশতা সুরা আলাকের প্রথম কয়েকটি আয়াত তেলাওয়াত করলেন,

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ * خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ * اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ *الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ * عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ.

'পড়ুন আপনার পালনকর্তার নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টি করেছেন মানুষকে জমাট রক্ত থেকে। পাঠ করুন, আপনার পালনকর্তা মহা দয়ালু, যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন। শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে, যা সে জানত না।'[১৮৯]

এটাই ছিল সর্বশেষ উম্মতের প্রতি আখেরি নবীর মাধ্যমে প্রেরিত প্রথম আসমানি বার্তা। যাতে বলা হচ্ছিলজ্জপড়া, লেখা, রবের জিকির করা, তার কুদরত নিয়ে গভীরভাবে ভাবা, তার দয়ার প্রতি বিশ্বাস রাখা, ইলম বা জ্ঞানকে নিজের যোগ্যতার মাপকাঠি বানানো এবং কলমের মাধ্যমে ইলমের নির্দেশনা প্রচার করা মূল সংবিধানে পরিণত হলো।

পৃথিবীতে ইলম ও কলমের ধারণা

পৃথিবীর অবস্থা তখন এমন ছিল যে, সভ্য কওমগুলো পর্যন্ত কলমের বিশেষ মর্যাদা সম্পর্কে ধারণা রাখত না। প্রাচ্যের চীনকে দেখুন, তৎকালে তাং বংশের জনক লিউ আন শাসন করছিল। তারপর তাই শাং মসনদে বসে। এবং ৬২৭ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ৬৪৯ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত ক্ষমতায় থাকে। ভারতে মহারাজা হর্ষ বর্ধন ক্ষমতাসীন ছিল। তার ক্ষমতাকাল ৬০৬-৬৪৭ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত ছিল।

প্রাচ্যের তাহজিব-তামাদ্দুন ও সভ্যতা-সংস্কৃতির এই দুই বড় কেন্দ্রেও জ্ঞানবিজ্ঞান সম্পর্কে ধ্যানধারণার অবস্থা খুবই নাজুক ছিল। পাথর কর্তন, নাচগান, ধ্যানমগ্নতা এবং নীরবতাকে তারা কলমচর্চার উপর প্রাধান্য দিত। আফ্রিকার উত্তর-পশ্চিমে বার বার গোষ্ঠীর কর্তৃত্ব ছিল। তারা মূর্তিপূজারি ছিল। পশ্চিমা বিশ্বের দিকে দৃষ্টি দিলে দেখা যায়, তৎকালে বৃটেনে অ্যাংলো সেকসন গোত্রগুলোর বাদশাহদের অধীন শাসন চলত। তাদেরই অধীনস্থ কিং এডার্ন ৬০১ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ৬৩৩ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত শাসন করে। কিন্তু এ যুগটি ছিল বৃটিশ সভ্যতা-সংস্কৃতিতে চূড়ান্ত পর্যায়ের পশ্চাদপদ আর বিজ্ঞানচর্চাশূন্য।

১৮৯. সহিহ বুখারি- ৩ (বাবু কায়ফা কানা বাদউল ওহি), সিরাতে ইবনে ইসহাক- ১/১২১ (দারুল ফিকর সংস্করণ)

স্কটল্যান্ড এবং আয়ারল্যান্ডে নিম জঙ্গিগোষ্ঠীগুলোর রাজত্ব ছিল। পরবর্তীতে তারাই বৃটেনের মসনদে ক্ষমতার পালাবদল করত।

ফ্রান্সে সম্রাট প্রথম ডেকোর্ট (৬২৮-৬৩৯ খ্রিষ্টাব্দ) আপ্রাণ চেষ্টা করার পরেও নিজের বিলুপ্তপ্রায় রাজ্যের ভীত মজবুত করতে পারেননি। ইটালিতে 'গোথ' বংশের শাসক সায়বার্টের রাজত্ব চলছিল। তার সময়েই ইটালিতে ইহুদিদের বার বার ব্যবহার করা হয়। উপর্যুক্ত রাজ্যগুলোতে উঁচু-নিচু সব স্তর পর্যন্ত অজ্ঞতা-মূর্খতার সয়লাব ছিল। ইউরোপের অধিকাংশ এলাকায় নার্মান, সুইডিশ, সেলানি এবং ক্রিশিঙ্গের মতো গণ্ডমূর্খ এবং গোঁয়ার গোত্রগুলোর দৌরাত্ম্য ছিল।[১৯০]

মোটকথা, যে ইউরোপ আজ জ্ঞানবিজ্ঞানে নেতৃত্বের দাবি করে, তাদের কিন্তু শত শত বছর পর্যন্ত জ্ঞান, গবেষণা এবং কলমচর্চার সাথে দূরতম সম্পর্ক ছিল না। অপরদিকে আরবের মতো এমন অন্ধকারে নিমজ্জিত অঞ্চলে তাদের বহু পূর্বে জ্ঞানের আলোর প্রথম কিরণ 'ইকরা (পড়), 'আল্লামা' (তিনি শিখিয়েছেন), 'বিল কালাম' (কলমের সাহায্যে) এর মাধ্যমে আরবের অন্ধকারাচ্ছন্ন মানুষগুলো এমন উদ্ভাসিত হয়েছিল, যা পৃথিবীর ইতিহাসে আজও বিস্ময়কর ব্যাপার হয়ে আছে। নিঃসন্দেহে এটি এমন এক বিপ্লবের সূচনাপর্ব, যা মানব-সমাজের সংস্কারের লক্ষ্যে অধ্যয়ন, শিক্ষাদান এবং কলমচর্চার প্রতি উৎসাহ প্রদান করেছিল।

গুরুদায়িত্ব

ফেরেশতা থেকে এই বার্তা শুনে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ঘরে পৌছান, তখন ভয়-ভীতি এবং জিম্মাদারির সীমাহীন অনুভূতির কারণে তার দেহ মোবারক কাঁপছিল। নবীজির মনে হচ্ছিল এই কাজের চিন্তাফিকির এবং গুরুভারের কারণে তার প্রাণবায়ূই হয়তো উড়ে যাবে। তিনি ঘরে পৌছেই প্রিয়তম স্ত্রী খাদিজাতুল কুবরাকে বলতে লাগলেন, 'আমার গায়ে কম্বল জড়িয়ে দাও, আমার গায়ে কম্বল জড়িয়ে দাও, আমার প্রাণ উড়ে যাবে মনে হচ্ছে।'[১৯১]

স্ত্রীর অনুরোধে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হেরাগুহার আদ্যোপান্ত ঘটনা বর্ণনা করেন। হজরত খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহা একজন অভিজ্ঞ এবং বুদ্ধিমান নারী ছিলেন। তিনি তার প্রিয়তম স্বামীর অবস্থান ও মর্যাদা খুব ভালো করেই জানতেন। তাই তিনি সান্ত্বনা দিয়ে বলেন, 'আল্লাহ তায়ালা আপনাকে

১৯০. রাহমাতুললিল আলামিন- ১/৭৫, মাজাল্লাতুস সিরাহ, রমাজান ১৪২৪ হিজরি, পৃষ্ঠা ৯১-৯৩, (প্রফেসর নেসার আহমাদের প্রবন্ধ)

১৯১. এর থেকে বুঝা যায়, নবুওয়াতপ্রাপ্তির বছর গ্রীষ্মকালেই হয়েছে। অন্যথায় শীতকালে তো মানুষ সাধারণত উষ্ণ কাপড়ই পরিধান করে থাকে। এই পয়েন্টটি নবুওয়াত 'মে মাসে হয়েছে' -এ মতের পক্ষে যায়।

কখনোই লাঞ্ছিত করবেন না। আপনি আত্মীয়দের খোঁজখবর নেন। সত্য কথা বলেন। অসহায় লোকদের বোঝা লাঘব করেন। নিঃস্বদের সহায়তা করেন। মেহমানদের আপ্যায়ন করেন এবং হকের উপর আপতিত সকল বিপদে আপনি সাহায্য করেন।'

এরপর তিনি নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তার চাচাত ভাই ওয়ারাকা বিন নওফেলের কাছে নিয়ে যান। তিনি পূর্ববর্তী আসমানি কিতাব অধ্যয়ন করতেন। হয়তো কোনো পরামর্শ ও পথনির্দেশ পাওয়া যাবে এই উদ্দেশ্যে তার কাছে গেলেন।

ওয়ারাকা ঘটনা শুনে বললেন, 'আল্লাহর কসম, তুমি এই উম্মতের নবী হবে। এ তো সেই ফেরেশতা, যে হজরত মুসা আলাইহিস সালামের কাছেও এসেছিলেন। দেখবে, একসময় তোমার কওম তোমাকে দেশ থেকে বের করে দেবে।'

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ কথা শুনে বড় পেরেশান হন যে, কুরাইশ তো আমাকে সত্যবাদী, বিশ্বস্ত উপাধি দিয়েছে। এরপরও তারা আমার সঙ্গে এমন আচরণ করতে পারে! তাই তিনি অবাক-বিস্ময়ে প্রশ্ন করেন, এরা কি আমায় বের করে দেবে?

ওয়ারাকা বললেন, হ্যাঁ, যে ব্যক্তিই তোমার মতো এমন পয়গাম নিয়ে পৃথিবীতে আগমন করেছে, তার সঙ্গেই এমন দুশমনি করা হয়েছে। আর আমি যদি তোমার যুগ পাই, তবে অবশ্যই তোমাকে পূর্ণ সহযোগিতা করব।'[১৯২]

ওহি বন্ধ হওয়া এবং নবীজির বেচাইনি

এই ঘটনার পর কিছু সময় পর্যন্ত ফেরেশতা দ্বিতীয়বার ওহি নিয়ে আসেননি। ফলে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুবই পেরেশান এবং অস্থির হয়ে মক্কার উপত্যকা এবং পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরতে থাকেন। মনে কোনো প্রশান্তি ছিল না। প্রভু তার কাছ থেকে কী চান? এই গুরুদায়িত্ব তিনি কীভাবে আদায় করবেন? কিছুই তার জানা ছিল না। এমন পেরেশানি এবং কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থায় মাঝেমধ্যে-ই গায়ব থেকে আওয়াজ আসত: নিঃসন্দেহে আপনি সত্য রাসুল'- তখন মনে কিছুটা প্রশান্তি অনুভব করতেন। পরিশেষে এই আয়াত নাজিল হলো-

يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ* قُمْ فَأَنْذِرْ * وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ.

হে চাদর আবৃত, উঠুন এবং সতর্ক করুন। আর আপনার প্রভুর বড়ত্ব প্রকাশ করুন।[১৯৩]

---

১৯২. সহিহ বুখারি- ৩ (বাবু কায়ফা কানা বাদউল ওহি)
১৯৩. সুরা মুদ্দাসসির, আয়াত ১-৩

গোপনে দাওয়াত

(নবুওয়াত ১ম বর্ষ-৩য় বর্ষ)

উক্ত আয়াতে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দীনের দাওয়াত দেওয়ার জন্য সুস্পষ্ট নির্দেশ ছিল। এবার কর্মপদ্ধতি পেয়ে গেলেন। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কালবিলম্ব না করে দাওয়াতের গুরুদায়িত্ব আঞ্জাম দেওয়া শুরু করে দেন। সূচনা তিনি আপন ঘর থেকেই করেন স্ত্রীর মাধ্যমে। হজরত খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহা সর্বপ্রথম এই সত্যধর্ম গ্রহণ করেন। হজরত আলি রাদিয়াল্লাহু আনহুর দশ বছর বয়স ছিল তখন। তিনিও তখন ইসলাম কবুল করেন। হজরত যায়েদ বিন হারিসা রাদিয়াল্লাহু আনহুও কোনোরূপ ইতস্ততভাব ছাড়াই ইসলাম গ্রহণ করেন।

এই তিন জনই ছিলেন ঘরের লোক। বাইরের পরিচিত লোকদের মধ্যে নবীজির বন্ধু হজরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু সর্বপ্রথম তার দাওয়াতে সাড়া দেন। প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষদের মধ্যে তিনিই প্রথম মুসলমান ছিলেন। হজরত আবু বকর রা. নিজেও অত্যন্ত সম্মানিত ও অভিজাত ছিলেন। সেজন্য তিনিও তার পরিচিতজনদের এই দাওয়াত দিতে থাকেন।[১৯৪]

ইসলামি দাওয়াতের ধরন কী ছিল?

ইসলামের সূচনালগ্নে দাওয়াত কেবল 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ'র স্বীকারোক্তির উপরই সীমাবদ্ধ ছিল। তাওহিদ (একত্ববাদ) ও রিসালাত (নবুওয়াত)-এর এমন মৌলিক বার্তার মাধ্যমেই এই মহান দাওয়াতের সূচনা হয়। 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু'র উদ্দেশ্য ছিল সকলকে এই বিশ্বাসে বিশ্বাসী করে তোলা যে, সৃষ্টিজগতের প্রতিটি বস্তুর সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তায়ালা। সবকিছুর মালিক আল্লাহ। সফলতা-অকৃতকার্যতা, সুস্থতা-অসুস্থতা, জীবন-মৃত্যু; সবই আল্লাহ তায়ালার হাতে। সবকিছু তার নির্দেশে হয়। তার নির্দেশ ও অনুমতি ছাড়া মাখলুক কিছুই করতে পারে না। মূর্তি, দেব-দেবীর কোনো ক্ষমতা নেই। সবকিছুর একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকারী কেবল আল্লাহ। তাই ইবাদতও কেবল তারই হওয়া উচিত।'

'মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ'র উদ্দেশ্য ছিল মুহাম্মদ আল্লাহর সর্বশেষ রাসুল। তার সব কথা বিশ্বাস করা আবশ্যক। তার অনুসরণ করার মধ্যেই রয়েছে দুনিয়া-

---

১৯৪. সিরাতে ইবনে হিশাম- ১/২৪০-২৪৯

আখেরাতের সফলতা। তার নির্দেশ অমান্য করার মধ্যে রয়েছে উভয় জাহানের বরবাদি।'

যেহেতু মক্কার মুশরিক-সমাজে এই দাওয়াত একটি অপরিচিত বিষয় ছিল, কুরাইশ সরদারদের পক্ষ থেকে প্রচণ্ড বাধা আসার আশঙ্কা ছিল, তাই দাওয়াত গোপনে গোপনেই চলতে থাকে। সত্যানুসন্ধানী লোকেরা এই দাওয়াতের কথা শুনেই অনুভব করতে পারতেন যে, এটাই একমাত্র মুক্তির পথ। হজরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহুর দাওয়াতে উসমান বিন আফফান, জুবাইর বিন আওয়াম, আবদুর রহমান বিন আউফ, সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস এবং তালহা বিন উবাইদুল্লাহর (রাদিয়াল্লাহু আনহুম) মতো অসাধারণ যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিরা ইসলাম গ্রহণ করেন।[১৯৫]

দাওয়াত প্রদানের ক্ষেত্রে কোনো গোত্র, কোনো বংশ নির্ধারিত ছিল না। বরং প্রত্যেক এমন ব্যক্তিকেই দাওয়াত দেওয়া হতো, যাদের মধ্যে হক গ্রহণের আলামত দেখা যেত। এ কারণেই আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহ, আরকাম বিন আবুল আরকাম, উবাইদা বিন হারিস, উসমান বিন মাজউন এবং সাঈদ বিন যায়েদ (রাদিয়াল্লাহু আনহুম) এর মতো তরুণরা মুসলমান হয়ে যান। আর এভাবেই গোপন দাওয়াতের আওয়াজ মক্কার দুর্বল, দরিদ্র ও গোলামদের কাছে পৌঁছে যায়।[১৯৬]

উমাইয়া বিন খালফের হাবশি গোলাম বিলাল বিন রাবাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু কালিমা পড়ে মুসলমান হয়ে যান। খাব্বাব বিন আরাত রাদিয়াল্লাহু আনহু একজন বিত্তবান মহিলার গোলাম ছিলেন এবং তিনি কামারের কাজ করতেন; তিনিও ইসলাম গ্রহণ করেন। সুহাইব রুমি রাদিয়াল্লাহু আনহু একজন বিদেশি তরুণ ছিলেন; তিনিও মুসলমান হয়ে যান। হজরত ইয়াসিরের পরিবার ছিল অত্যন্ত নিঃস্ব। গোটা পরিবারই এ সময় মুসলমান হয়ে যায়। পরিবারে ছিলেন হজরত ইয়াসির, তার স্ত্রী সুমাইয়া এবং তার পুত্র আম্মার (রাদিয়াল্লাহু আনহুম)।[১৯৭]

আবদুল্লাহ বিন মাসউদ বালক ছিলেন। উকবা বিন আবু মুয়াইতের ছাগল চড়াতেন। একবার তিনি মাঠে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে পড়েন এবং তাওহিদের দাওয়াত শুনেই তিনি কালিমা পড়ে মুসলমান হয়ে যান।[১৯৮]

---

১৯৫. সিরাতে ইবনে হিশাম- ১/২৫০-২৫২

১৯৬. প্রাগুক্ত- ১/২৫২-২৫৪

১৯৭. উসদুল গাবা, বেলাল, খাব্বাব এবং ইয়াসির রা. এর জীবনী দ্রষ্টব্য।

১৯৮. মুসনাদ আহমাদ- ৩৫৯৮, আলমুজামুস সাগির, তাবারানি- ১/৩১০ (দারু আম্মার সংস্করণ), আলইসাবাহ, আবদুল্লাহ বিন মাসউদ রা. এর জীবন দ্রষ্টব্য।

কুরআন করিমও ধারাবাহিক নাজিল হতে শুরু করে। ইসলামের দাওয়াতের শুরুর দিনগুলোতে আল্লাহ তায়ালা নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নামাজ শেখান। হজরত জিবরাইল আলাইহিস সালাম তার কাছে এসে অজু করেন এবং নামাজ পড়ে দেখিয়ে দেন। তিনি নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলেন, পবিত্রতা এবং আল্লাহ তায়ালার ইবাদতের এটি হলো শরয়ি পদ্ধতি। তখন নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও অন্যান্য মুসলমানকে অজু ও নামাজ শিখিয়ে দেন।[১৯৯]

ইসলামি দাওয়াতে গোপনীয়তা রক্ষা এবং সতর্কতা

দাওয়াত প্রচারে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রজ্ঞাপূর্ণ পদ্ধতি ছিল যে, তিনি কট্টরপন্থি এবং গোঁড়াপ্রকৃতির লোকদের থেকে দূরত্ব বজায় রেখে চলতেন, সে আত্মীয় হোক কিংবা অনাত্মীয়। মুসলমানরাও এ তরিকা পুরোপুরি অনুসরণ করতেন। আবু লাহাব চাচা হলেও যেহেতু গোঁয়ার এবং কট্টর মুশরিক ছিল; তাই তাকেও এ বিষয়ে অবহিত করা হলো না। এর থেকেই নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গভীর চিন্তা, বুদ্ধিমত্তা এবং কর্মপদ্ধতি নির্ধারণের যোগ্যতা অনুমান করা যায়।

বনু হাশিমের শীর্ষ ব্যক্তিদের মধ্যে কেবল চাচা আবু তালিবই এই দাওয়াত সম্পর্কে অবগত ছিলেন। তিনিও ঘটনাক্রমে এ ব্যাপারে জানতে পারেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং হজরত আলি রাদিয়াল্লাহু আনহুকে একদিন চুপিসারে নামাজ আদায় করতে দেখে ফেলেন। তিনি ঈমান না আনলেও নবীজির মুহাফেজ এবং গোপনীয়তা রক্ষাকারী অভিভাবক ছিলেন। ছেলে আলির ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারে তিনি কোনো আপত্তি করেননি।[২০০] বরং তার আরেক সন্তান জাফরকে (যিনি হজরত আলি থেকে দশ বছর বড় ছিলেন)[২০১] রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গোপন মজলিসে উপস্থিত হওয়ার জন্য উৎসাহ দেন। ফলে হজরত জাফর বিন আবু তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহুও 'আসসাবিকুনাল আওয়ালুন' তথা প্রথম ইসলামগ্রহণকারী সাহাবিদের কাতারে শামিল হয়ে যান।[২০২]

আব্বাসও এই দাওয়াতের কথা জেনে গিয়েছিলেন। তিনি যদিও প্রথমে ইসলাম গ্রহণ করেননি; কিন্তু বিরোধিতাও করেননি। বরং যথাসম্ভব তিনি রাসুলুল্লাহ

১৯৯. মুসনাদ আহমাদ, হাদিস ১৭৪৮০,(আর-রিসালাহ সংস্করণ), সহিহ বুখারি- হাদিস ৫২১ (কিতাবু মাওয়াকিতুস সালাহ)

২০০. মুসনাদ আহমাদ- ৭৭৬

২০১. সিয়ারু আলামিন নুবালা- ১/২০৬ (আর-রিসালাহ সংস্করণ)

২০২. তারিখে দিমাশক- ৫৪/১৬৫

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথিদের সাহায্য করতেন।[২০৩]

ধীরে ধীরে তাওহিদের এই দাওয়াতের সংবাদ কুরাইশের একাধিক সরদারের কর্ণগোচর হয়।[২০৪] তারপরও নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই দাওয়াত এমন গোপনে চলছিল যে, বিক্ষুব্ধ হওয়ার কোনো সুযোগ ছিল না। কোনো মুসলমান ও মুশরিক কোথাও মুখোমুখি হচ্ছিল না। বনু হাশিমের সম্মান ও মর্যাদাও কুরাইশ সরদারদের নিশ্চুপ থাকার আরেক কারণ ছিল। কিন্তু ভেতরে ভেতরে রাগে জ্বললেও মনে তাদের প্রবোধ ছিল যে, এই দাওয়াত দুর্বল লোকদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে এবং একদিন তা নিজে নিজেই নিষ্প্রভ হয়ে যাবে।

সম্ভবত তারা এই দাওয়াতকে জাহিলিযুগে উমাইয়া বিন আবু সাল্‌ত এবং যায়েদ বিন আমর বিন নুফাইলের মতো ব্যক্তিদের মতাদর্শের মতো মনে করেছিল। কারণ, তারাও ধর্ম নিয়ে আলোচনা করতেন এবং এক উপাস্যের কথা বলতেন। কিন্তু পূর্ববর্তী সংস্কারকদের মতাদর্শের তুলনায় ইসলামি দাওয়াতের মধ্যে অকল্পনীয় ক্ষমতা ছিল।

আবু জর গিফারির ইসলামগ্রহণ

মক্কায় আল্লাহ তায়ালার ঘর হওয়ায় মানুষের আশ্রয়স্থল ছিল। বাইরে থেকে আগত জিয়ারতকারীদের আগমন-প্রস্থান সর্বদা লেগেই থাকত। উপযুক্ত মওকা পেলে ঐসব জিয়ারতকারীর মধ্যেও দাওয়াতি কার্যক্রম চলে। এর ফলে ইসলামের সংবাদ খুব দ্রুত দূরদূরান্তের এলাকা পর্যন্ত পৌঁছে যায়। আর সত্যানুসন্ধানী লোকেরা এক-দুজন করে মক্কায় এসে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে যায়। মক্কার সরদাররা প্রথমদিকে নবীজির সাক্ষাৎ লাভকারী প্রত্যেকের উপর নজরদারি করতে থাকে। তিনিও নতুন লোকদের সঙ্গে সাক্ষাতের ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করতে থাকেন।

ঐ সময়েই ডাকাত-কবিলা গিফারের এক যুবক আবু জর গিফারি (যিনি মূর্তিপূজার প্রতি বীতশ্রদ্ধ ছিলেন) তার ভাইয়ের মুখে একজন নতুন নবী এবং নতুন ধর্মের সংবাদ শুনতে পান। তিনি সোজা মক্কায় চলে আসেন। তার জানা ছিল নবুওয়াতের দাবিদার ব্যক্তির সঙ্গে সাক্ষাৎ করা নিজের উপর অযথা

২০৩. হজরত আব্বাস রা. নওমুসলিম হজরত আবু যার গিফারি রা. কে হারাম শরিফে কুরাইশদের হাত থেকে রক্ষা করেছেন। সহিহ হাদিসেই তার বর্ণনা রয়েছে। ইমাম মুসলিম রহ. পুরো ঘটনা বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন। [সহিহ মুসলিম- ৬৫১৩, ৬৫১৬]
এটিই প্রমাণ করে যে, হজরত আব্বাস রা. ইসলামের গোপন দাওয়াত সম্পর্কে অবগত এবং মুসলমানদের সাহায্যকারী ছিলেন।

২০৪. সিরাতে ইবনে হিশাম- ১/২৬২, দালাইলুন নুবুওয়াহ- ২/১৭৫

বিপদ ডেকে আনার নামান্তর। তাই তিনি মসজিদে হারামে অবস্থান করে অপেক্ষা করতে লাগলেন। কোনো দিন হয়তো রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে মোলাকাত হয়ে যেতে পারে।

পরিশেষে হজরত আলি রাদিয়াল্লাহু আনহু তার হালপুরসি করেন। তারপর তার আগমনের উদ্দেশ্য জেনে তিনি নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সাক্ষাৎ করিয়ে দেন। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে জিজ্ঞেস করেন, তুমি কোন গোত্রের?

বললেন, গিফার গোত্রের।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এটা শুনে অস্থিরতা এবং খুশিতে তার ললাট ঘেমে গিয়েছিল।

আবু জর গিফারি ইসলাম গ্রহণ করলেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে ইসলাম গোপন রাখার তাগিদ দেন। কিন্তু তিনি ফিরে যাওয়ার পথে মসজিদে হারামে গিয়ে মুশরিকদের ভরা মজলিসে গিয়ে উচ্চৈঃস্বরে কালিমায়ে তাওহিদ পাঠ করেন।

এটাই ছিল হকের প্রথম সুউচ্চ ধ্বনি। কুরাইশরা তা সহ্য করতে পারেনি। তারা এই যুবকের উপর নির্দয়ভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ে। হজরত আব্বাস তা দেখে হুমড়ি খেয়ে তার উপর পড়ে যান আর বলতে থাকেন 'এই দুর্ভাগারা, এই লোক (ডাকাত গোত্র) গিফারের সন্তান। শাম থেকে আসা তোমাদের বাণিজ্য-কাফেলাগুলোর কিন্তু তাদের এলাকা দিয়ে অতিক্রম করতে হয়!'

এ কথা শুনে লোকেরা পিছু হটে। কারণ, ডাকাতরা প্রতিশোধ নিতে তাদের বাণিজ্য-কাফেলায় হামলা করতে পারে। পরদিন সেই মুজাহিদ আবু জর পুনরায় মসজিদে হারামে উপস্থিত হয়ে কালিমায়ে তাওহিদ বুলন্দ আওয়াজে পাঠ করেন। আবার মারপিটের শিকার হন। এবারও আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু তাকে রক্ষা করেন।

আবু জর গিফারি রাদিয়াল্লাহু আনহু নিজ গোত্রে ফিরে গিয়ে নিজের মা ও ভাইকে দাওয়াত দিলে তারা ইসলাম গ্রহণ করেন। এরপর সমগ্র গোত্রে তিনি দাওয়াত দিতে থাকলে খুব দ্রুত গোত্রের সকলেই ইসলামের ছায়ায় আশ্রয় নেয়।[২০৫]

অনুরূপ বনু বুজাইলা গোত্রের আমর বিন আবাসা নিজের এলাকা থেকে এসে উকাজের মেলায় নবীজির সঙ্গে সাক্ষাৎ করে ইসলাম গ্রহণ করেন। নবীজি তাকে

২০৫. সহিহ মুসলিম- ৬৫১৩, ৬৫১৬ (কিতাবু ফাজায়িলুস সাহাবাহ, বাবু ফাজায়িলু আবু যার গিফারি রা.) দারুল জীল সংস্করণ, আলইসাবাহ, আবু যার গিফারি রা. এর জীবনী দ্রষ্টব্য

বলেন, 'আমাদের পাল্লা যখন ভারী হওয়ার সংবাদ পাবে, দ্বিতীয়বার আসবে।'[২০৬]

তিন বছর পর্যন্ত গোপনে দাওয়াতের ধারা চলমান থাকে। সাফা পাহাড়ের কিনারে অবস্থিত হজরত আরকাম বিন আবুল আরকামের ঘরই এই মহান মেহনতের প্রথম কার্যালয় ছিল।[২০৭]

২০৬. আলইসাবাহ, আমর বিন আবাসাহ রা. এর জীবনী দ্রষ্টব্য, আলকামিল ফিত তারিখ- ১/৬৫৭, সিয়ারু আলামিন নুবালা- ২/৪৫৬, ৪৫৭

২০৭. উসদুল গাবাহ- আরকাম বিন আবুল আরকাম রা. এর জীবনী দ্রষ্টব্য

তাওহিদের ঘোষণা এবং মুমিনদের পরীক্ষা

তিন বছর পর আল্লাহ তায়ালা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রকাশ্যে ইসলামের দাওয়াত দেওয়ার নির্দেশ দেন। এরই প্রথম ধাপ হিসাবে আল্লাহ তায়ালা নবীজিকে বলেন, 'আপনি আপনার আত্মীয়স্বজনকে (শিরকি কর্মকাণ্ডের ব্যাপারে) ভীতি প্রদর্শন করুন (এবং তাদেরকে তাওহিদের দাওয়াত দিন)।'[২০৮]

আত্মীয়স্বজনের মধ্যে সর্বাগ্রে ঘরের লোকদের দাওয়াত দেন। এক এক করে সবাইকে সম্বোধন করে বুঝান। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'হে প্রিয় ফুফু সাফিয়া, হে আবদুল মুত্তালিবের সন্তানেরা, তোমরা জাহান্নাম থেকে বাঁচার চিন্তা করো। কারণ, আল্লাহর দরবারে সেদিন আমি তোমাদের জন্য কিছুই করতে পারব না।'[২০৯]

বিশিষ্ট ব্যক্তি এবং বন্ধুবান্ধবদের ইসলামের দাওয়াত দেওয়ার চেয়ে পরিবারের লোকদের দাওয়াত দেওয়া অনেক কষ্টকর ছিল। এজন্য তিনি ভীষণ ঘাবড়ে গিয়ে বনু হাশিমের প্রত্যেক সদস্যকে একত্রিত করেন। তাদের মধ্যে চাচা আবু তালেব, আব্বাস, হামজা, আবু লাহাবসহ ৪০-৪৫ লোক জমা হয়। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গোশত, দুধ ও রুটি দিয়ে আপ্যায়নের ব্যবস্থা করেন। অলৌকিকভাবে সবার খাওয়ার পরেও কিছু খাবার রয়ে যায়। খাওয়ার পর নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর হামদ-সানা পাঠ করার পর বলেন, 'কোনো ব্যক্তি তার পরিবারের লোকদের কাছে কখনো গলদ কথা বলে না। ঐ আল্লাহর কসম, যিনি ছাড়া কোনো মাবুদ নেই, আমি সবার জন্য সামগ্রিকভাবে এবং আপনাদের জন্য বিশেষভাবে আল্লাহর প্রেরিত রাসুল।

'হে আবদুল মুত্তালিবের সন্তানেরা, নিঃসন্দেহে কোনো ব্যক্তি তার কওমের নিকট এমন উত্তম ও শ্রেষ্ঠ কথা নিয়ে আসতে পারেনি, যা আমি আপনাদের নিকট নিয়ে এসেছি। আমি দুনিয়া-আখেরাতে সফলতার বার্তা নিয়ে এসেছি।

'আল্লাহর শপথ, আপনারা যেভাবে শুয়ে বিশ্রাম নেন, তেমনি একদিন আপনাদের মরতে হবে, যেভাবে আপনারা জাগ্রত হন, সেভাবেই একদিন আপনাদের হিসাব-নিকাশের জন্য পুনরুত্থিত হতে হবে। আর সেখানেই

---

২০৮. সুরা শুআরা, আয়াত ২১৪

২০৯. আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া- ৪/৯৭, ৯৮

আপনাদের আমলের প্রতিদান দেওয়া হবে। নিশ্চয় জান্নাত চিরস্থায়ী ঠিকানা, দোজখও চিরস্থায়ী ঠিকানা।'

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা শুনে আবু তালেব উৎসাহব্যঞ্জক উত্তর দেন। কিন্তু আবু লাহাব প্রতিবাদ ও অহংকারমূলক কথা বলে। তার উত্তর থেকে যেন তখন আগুন উদ্‌গিরণ হচ্ছিল। সে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দাওয়াতের সবচেয়ে কঠিন বাধা প্রদান করে।[২১০]

২১০. আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া- ৪/১০১

প্রকাশ্য দাওয়াত

(নবুওয়াতের চতুর্থবর্ষ)

কিছুদিন পর আল্লাহ তায়ালার তরফ থেকে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রকাশ্যে দাওয়াত দেওয়ার হুকুম করে আয়াত নাজিল হয়,

فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ

> আপনার যার আদেশ করা হয়েছে, তা পরিষ্কারভাবে শুনিয়ে দিন এবং মুশরিকদের কোনও পরোয়া করবেন না।[২১১]

তখন নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাফা পাহাড়ের চূড়ায় উঠে আহ্বান করতে লাগলেন, 'ইয়া সাবাহাহ'! দুশমন যখন মাথার উপর এসে যেত, তখন আরবরা এই বাক্যের মাধ্যমে সাহায্যের আবেদন করত। এই বাক্য উচ্চারণ করার পরপরই কুরাইশের সবাই এসে সেখানে জমায়েত হয়ে যায়। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন বলতে শুরু করলেন, 'হে বনু আবদুল মুত্তালিব, হে বনু ফিহর, হে বনু কাব, আমি যদি তোমাদের সংবাদ দিই যে, পাহাড়ের পেছনে একটি বাহিনী আক্রমণের জন্য ঘাঁপটি মেরে আছে, তা হলে কী তোমরা আমার কথা বিশ্বাস করবে?'

নবীজির সততার প্রতি সবার এত অগাধ বিশ্বাস ছিল যে, তারা নির্দ্বিধায় বলে, হ্যাঁ, আমরা বিশ্বাস করব।'

তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমি তোমাদের ব্যাপারে কঠিন শাস্তির ভয় করছি, যা তোমাদের একেবারে নিকটে।'

কুরাইশরা এ কথা শুনে ভয় পেয়ে যায়। কিন্তু আবু লাহাব অগ্নিশর্মা হয়ে বলে,

---

২১১. সুরা হিজর, আয়াত ৯৪

হাদিস থেকে এই নির্দেশ কখন এসেছে তার সুনির্দিষ্ট সময় জানা যায় না। হ্যাঁ, এটুকু জানা যায় যে, তখন নবুওয়াতের তিন বছর পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। যাদের নিকট নবুওয়াতপ্রাপ্তির ঘটনা রবিউল আওয়ালে হয়েছে, তাদের মত অনুযায়ী এই নির্দেশ নবুওয়াতপ্রাপ্তির ঠিক তিন বছর পর রবিউল আওয়াল মাসে।

আর যাদের নিকট নবুওয়াতপ্রাপ্তির ঘটনা রমজানে হয়েছে, তাদের মত অনুযায়ী এই নির্দেশ রমজান মাসে হওয়া বাঞ্ছনীয়। হাফেজ ইবনে কাসির রহ. নবুওয়াতপ্রাপ্তি রমজান মাসে হওয়ার মতটিই প্রাধান্য দিয়েছেন। (আমরাও এই মতটি গ্রহণ করেছি।)

তাই উপর্যুক্ত মত অনুযায়ী প্রকাশ্য দাওয়াত দেওয়ার নির্দেশ চার রমজানে ঘটেছে।

تَبًّا لك سَائرَ اليوم، أَلِهذا جمعتَنا؟

ধ্বংস হও তুমি! এজন্য তুমি আমাদের জমায়েত করেছো?' (নাউজুবিল্লাহ)

এরপর সকলেই ক্রুদ্ধ হয়ে আপন গন্তব্যে ফিরে যায়।[২১২]

আবু লাহাবের ধৃষ্টতার জবাব ও সুরা লাহাব নাজিল

আবু লাহাবের সেই ধৃষ্টতার জবাবে সুরা লাহাব নাজিল হয়। পবিত্র কুরআনে তার (تَبًّا لك) বাক্যের অত্যন্ত বিশুদ্ধ ও অলংকারপূর্ণ উত্তর দেওয়া হয়েছে। কুরআনে বলা হয়েছে,

تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ

আবু লাহাবের হাত বিনষ্ট হোক এবং ধ্বংস হয়ে যাক।

এমন অলৌকিক পদ্ধতিতে জবাব দেওয়ার ফলে আবু লাহাব পুরো মক্কায় অপমানিত হয়। এতে ক্ষুব্ধ হয়ে সে তার ছেলে উতবা এবং উতাইবাকে আদেশ করে নবীজির কন্যা রুকাইয়া ও উম্মে কুলসুমকে তালাক প্রদান করার জন্য। এদের মাত্রই বিয়ে হয়েছিল। তখনও উঠিয়ে নেওয়া হয়নি। আবু লাহাবের ছেলেরা পিতার নির্দেশে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কন্যাদের তালাক দিয়ে দেয়।[২১৩]

আবু লাহাব ও তার স্ত্রীর উৎপীড়ন

এই ঘটনার পর থেকে আবু লাহাব এবং তার স্ত্রী উম্মে জামিল নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কষ্ট দিতে কোনো পদ্ধতিই বাদ রাখেনি। আবু লাহাবের ঘর নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘরের কাছাকাছি ছিল। এজন্য প্রতিমুহূর্তেই তার দুষ্টামির শিকার হতে হতো। উম্মে জামিল রাতেরবেলা নবীজির চলার পথে কাঁটা পুঁতে রাখত। আবু লাহাব ঘরের সমস্ত আবর্জনা এনে পথে রেখে দিত।

নবীজির ঘরের অপর পার্শ্বে ছিল আরেক শত্রু উকবা বিন আবি মুয়াইত। সেও কষ্ট দেওয়ার জন্য ঘরের ময়লা-আবর্জনা নবীজির ঘরের দরজায় রেখে দিত।[২১৪]

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'আমি দুজন নিকৃষ্ট প্রতিবেশীর মাঝে বসবাস করি; আবু লাহাব এবং উকবা বিন আবি মুয়াইত।'[২১৫]

২১২. সহিহ বুখারি (কিতাবুত তাফসির, 'তাব্বাত ইয়াদা আবি লাহাবিও ওয়া তাব্বা'-আয়াতের তাফসির)

২১৩. সহিহ বুখারি (কিতাবুত তাফসির, 'তাব্বাত ইয়াদা আবি লাহাবিও ওয়া তাব্বা'-আয়াতের তাফসির)

২১৪. উসদুল গাবাহ (রুকাইয়া, উম্মু কুলসুম রা. এর জীবনী দ্রষ্টব্য)

২১৫. তাফসিরে ইবনে কাসির; সুরা লাহাব, আখবারু মাক্কাহ, ফাকিহানি- ৩/৩৮৫ (দারু খিযির)

আবু লাহাব সর্বদা নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পর্যবেক্ষণ করত দাওয়াত-তাবলিগের জন্য তিনি কখন কোথায় যান। তিনি যেখানেই যেতেন, সে তার পিছু পিছু গিয়ে উচ্চবাচ্য শুরু করত; যেন নবীজির কথা শোনা না যায়।'[২১৬]

আবু তালেবের উপর কুরাইশের বলপ্রয়োগ : নবীজির জবাব

কুরাইশের অন্য সরদাররাও সরাসরি নবীজির বিরোধিতা করত। এই দাওয়াত প্রতিহত করার জন্য মাঝেমধ্যে বিভিন্ন পরিকল্পনায় অংশ নিত। এরাই আবু তালেবের কাছে একটি প্রতিনিধিদল প্রেরণ করে বলে, 'আপনি আপনার ভাতিজাকে বাধা দিন। আমরা আমাদের পূর্বপুরুষ এবং উপাস্যদের গালমন্দ আর সহ্য করতে পারব না। আপনি তাকে সংযত করুন, অন্যথায় আমাদের সাথে আপনার এবং আপনার ভাতিজার সব সম্পর্ক চুকে যাবে।'

আবু তালেব ঘাবড়ে গিয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পৃথকভাবে ডেকে কুরাইশের দাবি উল্লেখ করে বললেন, 'আমার এবং তোমার জানের পরোয়া তো করো! আমার উপর এত বড় বোঝা চাপিয়ে দিয়ো না। আমি তা সইতে পারব না।'

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বুঝে গেলেন তার উপর কঠিন বলপ্রয়োগ করা হয়েছে এবং তিনি এর চেয়ে অধিক সহ্য করতে পারবেন না। কিন্তু তিনি এই মহান দায়িত্ব কীভাবে ছেড়ে দেবেন! এর উপরই তো নির্ভর করে দুনিয়ার অস্থিরতা থেকে মুক্তি। এই দাওয়াত তো তার আত্মার চেয়েও বড়। এটিই তার জজবা, এটিই তার প্রত্যয়। তাই নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'চাচাজান, আল্লাহর কসম, যদি আমার এই ডান হাতে সূর্য এবং বাম হাতে চাঁদ এনে রেখে দেওয়া হয়, আর এর বিনিময়ে আমাকে এই দাওয়াত পরিত্যাগ করতে বলা হয়, তা হলেও আমি তা পরিত্যাগ করব না। এমনকি আল্লাহ তায়ালা যদি এ দীনকে বিজয়ী করেন কিংবা এই জিহাদে আমার প্রাণও চলে যায়, তারপরেও আমি এই দাওয়াত ছাড়তে পারব না।' এটুকু বলতেই নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চোখ দিয়ে অশ্রু বয়ে পড়তে থাকে, তিনি কাঁদতে কাঁদতেই বাইরে চলে যান।

আবু তালেব এই অবস্থা দেখার পর তার ভেতরে আবেগ উদ্বেলিত হয়ে ওঠে, তাকে পুনরায় ডেকে এনে বললেন, 'ভাতিজা, তোমার যা মন চায়, তাই বলো। যেভাবে তোমার দাওয়াত দিতে মন চায়, দাও; আমি তোমাকে কখনোই একা ছেড়ে দেব না।'[২১৭]

---

২১৬. আসসিরাতুল হালাবিয়্যা- ১/৪৪৭

২১৭. আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া- ৪/১০৬

সাহাবিদের উপর জুলুম-অত্যাচার

কুরাইশ-সরদাররা যখন দেখল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দাওয়াত ও তাবলিগ থেকে বিরত রাখতে আবু তালেবের পৃষ্ঠপোষকতা থেকে দূর করতে পারছে না, তখন তারা ভীষণ ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। বনু হাশিমের লোকজনের মাঝে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আলাদা ইজ্জত-সম্মান ছিল। উপরন্তু আবু তালেবের মতো একজন হৃদয়বান সম্মানিত ও শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিও বিষয়টির প্রতি তেমন গুরুত্ব দিচ্ছেন না। তাই নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর হাত ওঠানো তাদের জন্য খুব সহজ ছিল না।

অধিকাংশ মুসলমানই যেহেতু অত্যন্ত নিঃস্ব ও সম্বলহীন ছিল, তাই এবার কুরাইশদের সব আক্রোশ ও প্রতিশোধ তাদের থেকে নিতে লাগল। কুরাইশের প্রত্যেক সরদার তাদের গোত্রের মুসলমানদের টার্গেট করতে থাকে। তাদের মধ্যে যারা ছিল একেবারেই নিঃস্ব, বন্ধুবান্ধব ও মদদশূন্য, তারাই ছিল সবচেয়ে বেশি নির্যাতনের শিকার।

হজরত খাব্বাব বিন আরাত রাদিয়াল্লাহু আনহুকে অঙ্গারের উপর শোয়ানোর কারণে তার কোমর একেবারে ঝলসে যায়। হজরত বিলাল রাদিয়াল্লাহু আনহু উমাইয়া বিন খালফের গোলাম ছিলেন। সে হজরত বিলালকে মরুভূমির তপ্ত বালুতে ফেলে বুকের উপর ভারি পাথর রেখে বলত- 'মুহাম্মদকে অস্বীকার করে লাত-উজ্জার পূজা কর; অন্যথায় তোর প্রাণ এভাবেই নিঃশেষ হয়ে যাবে।' কখনো-বা তাকে লোহার পোশাক পরিয়ে তপ্ত বালুতে বসিয়ে রাখা হতো। তিনি এই কষ্টের ভেতরেও বলতেন 'আহাদুন! আহাদুন! (তিনি এক, তিনি একক)। কখনো তার গলায় রশি বেঁধে দুষ্ট ছেলেদের দিয়ে সারা শহর ঘুরাত।[২১৮]

কাহতানি বংশোদ্ভূত আম্মার বিন ইয়াসির এবং তার পিতা-মাতা (ইয়াসির ও সুমাইয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুমা); মক্কাতে তাদের কোনো আত্মীয়স্বজন ছিল না। কুরাইশ সরদার তাদের তিনজনকে ধরে মরুভূমিতে নিয়ে এসে সীমাহীন নির্যাতন করত। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে এই অবস্থায় দেখে বলতেন, 'ইয়াসিরের পরিবার! ধৈর্য ধরো, তোমাদের ঠিকানা জান্নাত।'

হজরত ইয়াসির বয়স্ক দুর্বল মানুষ ছিলেন। এমন অনবরত নির্যাতন সহ্য করতে না পেরে তিনি মৃত্যুর মুখে ঢলে পড়েন। এরপর তার স্ত্রী সুমাইয়াকে অভিশপ্ত আবু জাহল অত্যন্ত নির্দয়ভাবে অত্যাচার করে বর্শা মেরে শহিদ করে দেয়। তাকেই ইসলামের প্রথম নারী শহিদ বলা হয়ে থাকে।[২১৯]

---

২১৮. সিরাতে ইবনে হিশাম- ১/২৬৬; আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া- ৪/১০৬

২১৯. সিরাতে ইবনে হিশাম- ১/৩১৮; তাবাকাতে ইবনে সাদ- ৩/২৬; মুসতাদরাক হাকিম- ৫২৩৮

এমনিভাবে হজরত সুহাইব রুমি রাদিয়াল্লাহু আনহু আবদুল্লাহ বিন জারআনের আজাদ-করা গোলাম ছিলেন। বংশগতভাবে ছিলেন অনারব। তাকে প্রচণ্ড মারপিট করা হতো। মাঝেমধ্যে তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়তেন।[২২০]

কুরাইশের জুলুম-অত্যাচার এতই বৃদ্ধি পায় যে, বড় বড় সম্ভ্রান্ত, অভিজাত এবং সম্পদশালী ব্যক্তিরা পর্যন্ত তাদের হাত থেকে রেহাই পাননি। হজরত উসমান বিন আফফান রাদিয়াল্লাহু আনহুর চাচা হাকিম বিন আবুল আস তাকে বেঁধে রাখে, এবং ইসলাম ত্যাগ না করলে তাকে মুক্তি দেওয়া হবে না বলে জানিয়ে দেয়। কিন্তু তিনি ইসলামের উপর অবিচল থাকেন।[২২১]

হজরত মুসআব বিন উমাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু মক্কার একজন বড় সম্পদশালী, সম্ভাবনাময় এবং বিলাসিতায় লালিত-পালিত-হওয়া নওজোয়ান ছিলেন। ইসলাম গ্রহণের পর তার পরিবারের লোকেরা একটা কুঠরিতে তাকে বন্দি করে রাখে। দীর্ঘ সময় পর্যন্ত তিনি সেখানে আটক অবস্থায় কাটান।[২২২]

আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর উপর অত্যাচার

হজরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু মক্কার সর্বোচ্চ সম্মানিত ব্যক্তিদের একজন ছিলেন। অনুরূপ তালহা বিন উবাইদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহুও মক্কার সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের মধ্যে গণ্য হতেন। কিন্তু যখনই এই দুজন ইসলাম গ্রহণ করলেন, তখন কুরাইশ সরদার নাওফিল বিন খুওয়াইলিদ উভয়কে পাকড়াও করে একই রশিতে বেঁধে খুব নির্যাতন করে। তখন থেকেই এই দুজনকে 'কারিনাইন' তথা দুই নিষ্ঠাবান সঙ্গী' বলা হতো।২২৩

আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর প্রাণপ্রিয় ব্যক্তিত্ব নবীজি

একদিন হজরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহু রাস্তায় রাস্তায় লোকজনকে ইসলামের দাওয়াত দিতে লাগলেন। মুশরিকরা তখন ভীষণ ক্রুদ্ধ হয়ে তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। তাকে মারতে মারতে অজ্ঞান করে ফেলে। উতবা বিন রবিয়া তার মোটা জুতা দিয়ে হজরত আবু বকরের চেহারায় আঘাত করতে থাকে। চেহারা এতই বিক্ষত হয় যে, তাকে চেনাই মুশকিল হয়ে পড়ে। আত্মীয়স্বজনরা তাকে মৃতপ্রায় অবস্থায় উঠিয়ে ঘরে নিয়ে যায়। সবার একিন হয়ে গিয়েছিল তিনি আর বাঁচবেন না। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা তাকে বাঁচিয়ে রাখেন। সন্ধ্যার আগমুহূর্তে তার হুঁশ ফিরে আসে। তখন তার মুখ দিয়ে সর্বপ্রথম এই বাক্যটি

---

২২০. তাবাকাতে ইবনে সাদ- ৪/১৩৬, ৮/২৬৪

২২১. তাবাকাতে ইবনে সাদ- ৩/২২৭

২২২. আলমুনতাযাম- ৪/৩৩৫

২২৩. আলইসতিয়াব- ৪/৭৪

বের হয়- 'নবীজি ভালো আছেন তো?' যখন বলা হলো যে হ্যাঁ, তিনি ভালো আছেন, তখন তিনি বললেন, আমি যতক্ষণ না স্বচক্ষে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখব, ততক্ষণ মুখে খাবার তুলবো না।'

অবশেষে যখন রাতের অন্ধকার নেমে আসে, তখন তার আম্মা উম্মুল খায়ের এবং আরেকজন আত্মীয় উম্মে জামিলের কাঁধে ভর করে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটে আসেন। প্রিয় বন্ধুর এমন শোচনীয় অবস্থা দেখে নবীজির চোখ অশ্রুসজল হয়ে ওঠে। হজরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুও কাঁদতে থাকেন। তার আম্মা উম্মুল খায়ের তখনও মুসলমান হননি।

হজরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আবেদন করেন যেন তার মায়ের হেদায়েতের জন্য দোয়া করেন। তখন নবীজি তার মায়ের জন্য দোয়া করেন। দোয়ার তাৎক্ষণিক বরকত দেখা দেয়। উম্মুল খায়ের রাদিয়াল্লাহু আনহা তখনই ইসলাম গ্রহণ করেন। এটি ছিল দাওয়াত-তাবলিগ এবং জুলুম-অত্যাচারের উপর সবরের নগদ পুরস্কার।[২২৪]

নবীজিকে অপমান

এত তীব্র জুলুম-অত্যাচারের পরেও মুসলমানরা তাদের দীনের উপর অটল-অবিচল থাকে। ফলে কুরাইশ সরদাররা আরো ক্ষীপ্ত হয়। এবার তারা নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মুখের সাথে সাথে দৈহিক নির্যাতনও শুরু করে দেয়। তারা শহরের ইতরশ্রেণির লোকদের দায়িত্ব দেয় যে, তারা যেখানেই নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখবে উত্যক্ত করবে, হইচই শুরু করবে, কবি, জাদুকর, পাগল বলবে এবং বিভিন্নভাবে কষ্ট দেবে।

তাদের এই কর্মকাণ্ড জোরদারভাবেই আরম্ভ হয়ে গিয়েছিল। তাদের এহেন কার্যকলাপে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মন ভীষণ ভেঙে পড়ত। দিলের ব্যথা যখনই অনেক বেড়ে যেত, তখনই তাকে সান্ত্বনা দিয়ে ওহি নাজিল হতো।

একদিন নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘর থেকে বের হওয়ার পর সারাদিন এ ধরনের নির্যাতনের শিকার হলেন। এমনকি মক্কার গোলামরা পর্যন্ত তাকে সরাসরি অপমান করে এবং মিথ্যাবাদী বলে। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সীমাহীন ব্যথিত ও ভারাক্রান্ত হয়ে ঘরে ফিরে আসেন এবং চাদর গায়ে দিয়ে শুয়ে পড়েন। আর তখনই ওহি নাজিল হয়- 'ইয়া আইয়ুহাল

---

২২৪. তাবাকাতে ইবনে সাদ- ৩/২১৪ (তালহা রা. এর জীবনী)

মুদ্দাসসির' (হে চাদরাবৃত)। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মন প্রশান্তি লাভ করে।[২২৫]

মক্কাবাসীর অধিকাংশ তিরস্কার, দোষারোপের উত্তরে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নীরবতা অবলম্বন করতেন। কিন্তু যখনই ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে যেত, তখন তিনি তাদেরকে বলতেন, তোমরা তো নিজেরাই নিজেদের ধ্বংসের উপকরণ তৈরি করছ।

একদা নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাবাঘর তাওয়াফ করছিলেন। সে সময় মক্কার সরদাররা কাবার সম্মুখে উপবিষ্ট ছিল। তিনি যখনই তাওয়াফ করতে করতে তাদের কাছে আসতেন, তাকে নিয়ে ওরা ঠাট্টা করত। তৃতীয় তাওয়াফের সময় তিনি তাদের কাছে এসে থেমে গিয়ে বলতে থাকেন, 'হে কুরাইশের লোকেরা, আল্লাহর কসম করে বলছি, তোমরা আসলে ততক্ষণ পর্যন্ত তাওবা করবে না, যতক্ষণ না আল্লাহর আজাব তোমাদের উপর আপতিত হয়। শুনে রাখো, আমি তোমাদের ধ্বংসের সংবাদ নিয়ে এসেছি।' এ কথা শোনার পর সবার লোম দাঁড়িয়ে যায় এবং ভয়ে চুপসে যায়।

ওদিকে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার সাহাবিদেরকে বললেন, 'আল্লাহ তায়ালা তার দীনকে নিশ্চয়ই বিজয়ী করবেন।'[২২৬]

পরবর্তী দিন নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন তাওয়াফ করতে এলেন, তখন ঐ লোকগুলো ঘিরে ধরে তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। দুর্ভাগা উকবা বিন আবি মুয়াইত নবীজির চাদর দিয়ে তার গলায় এমনভাবে চেপে ধরে যে দম বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হচ্ছিল। সে নবীজির পায়ের উপর উঠে বসে। ভাগ্য ভালো ছিল যে, হজরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু ঘটনাস্থলে গিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন। তিনি উকবা বিন আবি মুয়াইতকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে বলতে লাগলেন,

أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟

> তোমরা কি একজন মানুষকে কেবল এ কারণে হত্যা করছো যে তিনি বলেন, আমার রব আল্লাহ?

এ কথা শুনে মুশরিকরা নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ছেড়ে দিয়ে

২২৫. সহিহ বুখারি (কিতাবুল মানাকিব, বাবু মা লাকিয়া রাসুলুল্লাহ ওয়া আসহাবুহু মিনাল মুশরিকিনা বি মাক্কাতা) সম্ভবত এই আয়াত নবীজিকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য দ্বিতীয়বার নাজিল হয়। অন্যথায় এটি পূর্বে নাজিল হয়েছিল।

২২৬. প্রাগুক্ত, উয়ূনুল আছার- ১/১৪০

আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর উপর চড়াও হয় এবং এত আঘাত করে যে, তার মাথা ফেটে যায়।[২২৭]

আবু জাহলের নোংরামী

কুরাইশের প্রসিদ্ধ সরদারদের মধ্যে আমর বিন হিশাম ওরফে আবু জাহল নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সবচেয়ে বড় দুশমন ছিল। সে ছিল অত্যন্ত বিশুদ্ধভাষী, চতুর এবং ধূর্ত। অধিকাংশ সময় সে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অপমান করার জন্য অন্যদের উসকানি দিত আর নিজে দূর থেকে তামাশা দেখত। কখনো কখনো জনসমক্ষেই নবীজিকে লাঞ্ছিত করত। একবার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাবাঘরের পাশে নামাজ পড়ছিলেন। যখন তিনি সেজদায় গেলেন, তখন এই হতভাগা তার মাথায় আঘাত করার জন্য এগিয়ে আসে। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা অলৌকিকভাবে তার নবীকে হেফাজত করেন। সে তার সামনে মুখ ব্যাদান-করা এক ভয়ানক উট দেখতে পায়। ফলে সে পিছপা হয়ে যায়।[২২৮]

এতসব নিদর্শন দেখার পরেও সে তার কর্মকাণ্ড থেকে ফিরে আসেনি। যখনই কুরাইশের কাউকে ইসলামধর্ম গ্রহণ করতে কিংবা ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হতে দেখত, যদি সে গোত্রপতি কিংবা নেতৃস্থানীয় কেউ হতো, মারমুখী হয়ে তাকে সতর্ক করত যে, 'তুমি তোমার বাপ-দাদার ধর্ম ত্যাগ করছ, অথচ তোমার বাপ-চাচারা তোমার থেকে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। অতএব, সামনে থেকে তোমাদের চরিত্র সম্পর্কে কোনো ভরসা রাখবো না। তোমাদের মতামতেরও কোনো মূল্য নেই এবং মান-ইজ্জত কিছুই অবশিষ্ট নেই।'

আর যদি ব্যবসায়ী হতো তা হলে তাকে এভাবে ধমকাত যে, 'তুমি যদি মুসলমান হও, তবে আমরা তোমার ব্যবসায় মন্দা এনে দেব, তোমার ধনসম্পদ নষ্ট করেই ছাড়ব।'

আর যদি কোনো ভিনদেশি লোক মুসলমান হতো, তা হলে আবু জাহল সরাসরি তার উপর লাথি, ঘুষি এবং লাঠি ব্যবহার করত।[২২৯]

নবুওয়াতের দায়িত্ব এবং পারিবারিক জীবন

নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার দাওয়াত ও আধ্যাত্মিক কাজে নিমগ্নতা সত্ত্বেও নিজের পরিবার সম্পর্কে কখনো বেখবর ও অমনোযোগী ছিলেন

---

২২৭. সহিহ বুখারি (কিতাবুল মানাকিব, বাবু মা লাকিয়া রাসুলুল্লাহ ওয়া আসহাবুহু মিনাল মুশরিকিনা বি মাক্কাতা)

২২৮. আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া- ৪/১১৬

২২৯. আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া- ৪/১৪৭

না। তিনি বড় মেয়ে হজরত যায়নাব রাদিয়াল্লাহু আনহাকে তার খালাতো ভাই আবুল আস বিন রাবির কাছে বিয়ে দেন। হজরত খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহার বোন হালা'র পুত্র ছিল আবুল আস। একজন সম্ভ্রান্ত নওজোয়ান ব্যবসায়ী ছিলেন তিনি। যদিও তিনি তখনো ঈমান আনেননি। সে সময় মুসলমানই ছিল হাতেগোনা কয়েকজন। তার চেয়ে উত্তম খান্দানি মানুষ কেউ ছিল না। মুশরিকদের সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে তখনও কোনো বিধান অবতীর্ণ হয়নি।

দ্বিতীয় কন্যা রুকাইয়া রাদিয়াল্লাহু আনহা, যাকে আবু লাহাবের পুত্র তালাক দিয়ে দিয়েছিল, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে অত্যন্ত লজ্জাশীল তরুণ হজরত উসমান বিন আফফানের সঙ্গে বিয়ে দেন। তিনি প্রথম ইসলাম গ্রহণকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। অর্থনৈতিকভাবেও ছিলেন সচ্ছল। হজরত খাদিজা ও নবীজির এই দুই কন্যা দাওয়াত ইলাল্লাহর ক্ষেত্রে তার পূর্ণ সহযোগী এবং সহমর্মী ছিল।

হজরত যায়নাব রাদিয়াল্লাহু আনহা যেহেতু পরিবারের বড় মেয়ে ছিলেন, তাই তিনি পিতার প্রতি বিশেষ খেয়াল রাখতেন। তিনি কোথায় যাচ্ছেন, কোন অবস্থায় আছেন? নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাট-বাজার, অলিগলিতে তাওহিদের বাণী শোনাতে গিয়ে কাফেরদের নির্যাতন সহ্য করতে করতে তার অবস্থা শোচনীয় হয়ে পড়ত, তখন হজরত যায়নাব বাবাকে খুঁজতে খুঁজতে সেখানে পৌঁছে যেতেন এবং শত্রুদের কষ্ট ও অনিষ্ট থেকে বাঁচানোর আপ্রাণ চেষ্টা করতেন।

হারিস বিন হারিস তার বাল্যকালে স্বচক্ষে দেখা একটি ঘটনা বর্ণনা করেন। তার পিতার সঙ্গে তিনি যখন মক্কায় পৌঁছেন, তখন এক জায়গায় মানুষের জটলা দেখতে পান। আমি জিজ্ঞেস করলাম, বাবা, এখানে কীসের জটলা? বাবা উত্তর দেন, 'বেটা, এরা একজন বেদীন লোককে ঘিরে আছে।' তখন পিতা-পুত্র দুজনই সওয়ারি থেকে নেমে সেই জটলার কাছে যান। দেখেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকজনকে ঈমান ও তাওহিদের দাওয়াত দিচ্ছেন আর তারা তা প্রত্যাখ্যান করছে এবং একইসাথে তারা বিভিন্নভাবে তাকে কষ্টও দিচ্ছে।

এভাবে কিছু সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পর জটলা ভেঙে যায়। তখনই একজন নারী পানির পেয়ালা এবং রুমাল নিয়ে সেখানে উপস্থিত হয়ে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পানি পান করান, অজু করান। লোকদের জিজ্ঞাসা করে জানতে পারি এই নারী নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কন্যা যায়নাব।

মুনিব আজদি নামের আরেক ব্যক্তি এ প্রসঙ্গে বলেন যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জনসমাগমের মধ্যে গিয়ে বলতেন, 'লোকসকল, তোমরা

লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলো, তা হলে সফল হবে।' কিন্তু মানুষ তাকে গালি দিত। কেউ কেউ তো থালার মধ্যে বালু ভরে এমনভাবে ছুড়ে মারত, তার পুরো দেহ ধুলোয় ধূসরিত হয়ে যেত। এক বদবখত নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মোবারক চেহারায় থুথুও নিক্ষেপ করে। এমন সময় একটি মেয়ে পানির পেয়ালা নিয়ে এগিয়ে এসে তার চেহারা মোবারক ধুয়ে দেন। নবীজি তাকে বলেন, 'বেটি, তোমার বাপের ব্যাপারে এমন আশঙ্কা করো না যে, তিনি অকস্মাৎ মারা যাবেন কিংবা লাঞ্ছিত হবেন।' এই মেয়ে ছিলেন হজরত যায়নাব বিনতে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।[২৩০]

নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন মসজিদে হারামে নামাজ পড়ছিলেন। তখন আবু জাহল বলে, 'এমন কেউ কি আছে, যে উটের ভুঁড়ি এনে মুহাম্মদ যখন সেজদায় যাবে তার পিঠের উপর রেখে দেবে?'

আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘোর দুশমন উকবা বিন আবি মুয়াইত গিয়ে উটের নাড়িভুঁড়ি নিয়ে এসে নবীজি যখন সেজদাবনত হলেন, সে তার পিঠে নাড়িভুঁড়ি রেখে দেয়।

মুশরিকরা এই নস্টামি দেখে এত মজা পায় যে, তারা হাসতে হাসতে একে অপরের গায়ে পড়তে থাকে। ইতোমধ্যে কেউ নবীজির ঘরে গিয়ে তার কন্যা ফাতেমাকে অবহিত করলে, (তখন তার বয়স কম ছিল) তিনি দৌড়ে এসে বড় কষ্ট করে পিতার পিঠ থেকে নাড়িভুঁড়ি সরিয়ে ফেলেন। এরপর কাফেরদের লক্ষ করে গালমন্দ করেন। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেজদা থেকে মাথা উঠানোর পর তার কাপড় নাপাক হয়ে গিয়েছিল। মুশরিকরা তখনও হাসিতে লুটোপুটি খাচ্ছিল।

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনন্যোপায় হয়ে আল্লাহ তায়ালার কাছে ওদের জন্য বদদোয়া করতে থাকেন। এটা শুনে মুশরিকদের চেহারা বিবর্ণ হয়ে যায়। তাদের আশঙ্কা হচ্ছিল- না জানি এই বদদোয়া কবুল হয়ে যায়।[২৩১]

২৩০. মাজমাউয যাওয়ায়িদ, হাইসামি- ৯৮২৭, ৯৮২৮ (মাকতাবাতুল কুদসি, কায়রো সংস্করণ)

২৩১. সহিহ মুসলিম- ৪৭৫০, (কিতাবুল জিহাদ বাবু মা লাকিয়ান নাবিয়্যু সা.), সিরাত ইবনে ইসহাক- ১/২১১

সহিহ মুসলিম এবং ইবনে ইসহাকের রেওয়ায়েতেই এসেছে যে, রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যতজনের ব্যাপারে বদদোয়া করেছিলেন, প্রত্যেকেই বদরযুদ্ধে মারা যায়।

হজরত ফাতেমা রা. এর বয়স তখন নয়-দশ বছরের কাছাকাছি। কারণ, অগ্রগণ্য মত অনুযায়ী তিনি কুরাইশদের কাবাঘর পুনর্নির্মাণের বছর তার জন্ম হয়। তখন নবীজির বয়স ছিল পূর্ণ ৩৫ বছর [তাবাকাতে ইবনে সাদ- ৮/১৯, আলইসাবাহ- ৮/২৬৩]। এর পাঁচ বছর পর নবীজি নবুওয়াত পান। সর্বোচ্চ তিন বছর পর্যন্ত গোপনে দাওয়াতি কার্যক্রম পরিচালনা করেন। এরপরই কষ্ট, নির্যাতনের ধাপ আরম্ভ হয়। আর এই ঘটনাটিও সেই পরীক্ষাযুগের।

এই ঘটনাগুলোই প্রমাণ করে যে, ইসলামের জন্য কুরবানি দেওয়ার ক্ষেত্রে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার জানমাল, পরিবার-পরিজনসহ সকলেই অংশগ্রহণ করেছিলেন। আর এটিই একজন সত্যিকার দাঈ এবং পূর্ণতর রাহবারের শান ও বৈশিষ্ট্য।

সম্ভবত এ বছরই নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মা (মৌখিক) হজরত উম্মে আইমান এবং পালকপুত্র যায়েদ বিন হারিসার ঔরসে একটি ছেলের জন্ম হয়। মায়ের মতোই সুশ্রী ছিল। তার নাম রাখা হয় উসামা। শিশু উসামাকে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অত্যন্ত মহব্বত করতেন।[২৩২]

পুত্রসন্তানদের মৃত্যু এবং মুশরিকদের দোষারোপ

ইতিমধ্যে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর অনেক বড় একটি বিপদ নেমে আসে। তার বড় পুত্র কাসিম আল্লাহ তায়ালার সান্নিধ্যে চলে যান। তিনি নবুওয়াতের পূর্বে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং এতটুকু বয়স হয়েছিল যে, ঘোড়ায়ও চড়তে পারতেন। কিছুদিন পর দ্বিতীয় ছেলে আবদুল্লাহও দুনিয়া ত্যাগ করেন। এর ফলে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোনো পুত্রসন্তান জীবিত থাকল না। সন্তানের বিয়োগব্যথা কম হৃদয়বিদারক ছিল না।

মুশরিকরা নবীজির অন্তরকে আরো বিক্ষত করার উদ্দেশ্যে বলতে থাকে, মুহাম্মদ 'আবতার' তথা পুত্রসন্তানহারা হয়ে গেল। ভবিষ্যতে তার নাম নেওয়ার মতো কোনো প্রজন্ম বাকি রইল না। তখন আল্লাহ তায়ালা নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য সুরাতুল কাউসার নাজিল করে বলে দেন 'নিশ্চয়ই আপনার দুশমনেরা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।'[২৩৩]

ছেলেদের মৃত্যু ও আল্লাহ তায়ালার হেকমত

আল্লাহর নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পুত্রসন্তানদের এত দ্রুত নিয়ে যাওয়ার পেছনে সবচেয়ে বড় হেকমত হলো নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শেষনবী হওয়া চূড়ান্ত ছিল। ফলে তার ছেলেরা বড় হয়েও যদি নবী না হতো, তখন কারো সন্দেহ হতে পারত যে, হয়তো পূর্ববর্তী নবীগণ অধিক যোগ্য ও উপযুক্ত ছিলেন। এবং তাদের সন্তানদের উত্তম অভিভাবক ছিলেন, তাই সন্তানরাও নবী হয়েছেন। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যদি এতই যোগ্য নবী হবেন, তা হলে তার ছেলেরা নবী হলো না কেন? এ কারণে আল্লাহ তায়ালা তাকে পুত্রসন্তানের নেয়ামত থেকে বঞ্চিত করেননি। আর দ্রুত ফেরত নিয়ে যান, কারো মনে যেন সংশয় তৈরি না হয়।

২৩২. আলইসাবাহ- উসামা বিন যায়েদ রা. এর জীবনী দ্রষ্টব্য

২৩৩. তাফসিরে ইবনে কাসির; সুরা কাউসার

নতুন উম্মতের সৃষ্টি

সময়টা ছিল পরীক্ষা, বালা-মুসিবত, ধৈর্য-সহনশীলতা, অবিচলতা, দূরদর্শিতা, তরবিয়ত ও দীক্ষার। ইসলামের ইতিহাসে এই যুগটি সোনার হরফে লিখে রাখার মতো। কারণ, এ সময়ে এমন কিছু ব্যক্তিত্ব তৈরি হয়, যাদের উপর ভবিষ্যতে সমগ্র উম্মাহর নেতৃত্ব এবং দিকনির্দেশনা নির্ভর করবে। কাফেরদের কঠোরতা ও কটাক্ষ, দৈহিক ও মানসিক নির্যাতন, বাধ্যবাধকতা, কাজকর্মের নিত্যনতুন পদ্ধতি, গোপন ষড়যন্ত্র, প্রকাশ্য বাধার মুখে নবীজির প্রজ্ঞাপূর্ণ জবাব, ধৈর্য-সহনশীলতা, সংযম ও নম্রতা, বিচক্ষণতা ও সতর্কতা এবং প্রতিটি লোককে আল্লাহ তায়ালার দিকে দাওয়াত দেওয়ার মধ্যদিয়ে সে সময়টা অতিক্রান্ত হয়েছিল।

সাহাবায়ে কেরামও তখন সকাল-সন্ধ্যা গোপন ও প্রকাশ্যে মানুষকে আল্লাহর দিকে আহ্বান করতেন। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দিনের বেলার অধিকাংশ সময় সাফাপর্বতের পাশে অবস্থিত হজরত আরকাম রাদিয়াল্লাহু আনহুর ঘরে অবস্থান করতেন। এটিই ইসলামি দাওয়াতের প্রথম কেন্দ্র এবং প্রথম মাদরাসা। প্রতিদিন তিনি সকাল-সন্ধ্যা আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর ঘরে যেতেন এবং উভয়ে মিলে পরামর্শ করতেন।

কাফেরদের মোকাবেলায় নবীজি এবং সাহাবিদের হাতে কোনো হুকুমত, ধনদৌলত, জনশক্তি ছিল না। তখন একমাত্র হাতিয়ার ছিল আল্লাহর উপর মজবুত ঈমান, তার মদদ ও নুসরতের পূর্ণ একিন, সর্বাবস্থায় তার সাথে সম্পর্ক বজায় রাখা এবং তার নিকটই কায়মনোবাক্যে রোনাজারি করা।

মুসলমানদের সবচেয়ে বড় অজিফা ছিল কালিমায়ে তাইয়েবা। এটিই দাওয়াতের সারাংশ এবং এটিই ছিল আধ্যাত্মিকতার সূতিকাগার। তারা নিজেদের মজলিসে খুশি-আনন্দ প্রকাশের জন্য আল্লাহু আকবার ধ্বনি তুলত। নামাজ তখনও ফরজ হয়নি; তবে তার পদ্ধতি বাতলে দেওয়া হয়েছিল। অজু-গোসল এবং নামাজের পদ্ধতি শেখানো হয়েছিল।

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তার সাহাবিগণ দু'রাকাত করে নামাজ আদায় করতেন। সাধারণত তারা ঘরে কিংবা গোপন জায়গায় নামাজ পড়তেন। কিন্তু নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাবা-চত্বরে গিয়ে নামাজ পড়তেন। কোনো কোনো সময় রাতের একাংশে যখন দীর্ঘ সময় নামাজে কাটিয়ে দিতেন, তখন অত্যন্ত একাগ্রচিত্তে তেলাওয়াত করতেন। অপরদিকে অধিকাংশ সাহাবি কুরাইশের ভয়ে হারাম শরিফে নামাজ পড়তে পারতেন না। আর সেখানে তো জামাআতের সঙ্গে নামাজ আদায় করার প্রশ্নই আসে না।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং সাহাবিগণের জন্য সবচেয়ে বড় সান্ত্বনা ও শক্তি ছিল অহি। ধারাবাহিকভাবে তা নাজিল হচ্ছিল। কাফেররা গবেষণা করে নতুন নতুন আপত্তি তুলত; কিন্তু কুরআন মাজিদের দুই-তিন আয়াত তাদেরকে নিরুত্তর করে দিত। ওরা কষ্ট দিত; ওহি এসে মুসলমানদের আশ্বস্ত করত, সাহস যোগাত, নিশ্চিত বিজয় ও মুক্তির বার্তা দিত। কাফেরদের বাধাপ্রদানে কী করণীয়- জমিনে আল্লাহর প্রতিনিধি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কদমে কদমে তা শেখাচ্ছিলেন।

কুরআন কারিম লেখা, সংরক্ষণ করা এবং তার পাঠদান প্রথমযুগেই আরম্ভ হয়ে গিয়েছিল। নতুন আয়াত নাজিল হওয়ামাত্র লিপিবদ্ধ করা হতো। সাহাবায়ে কেরাম তা শেখা, অপরকে শেখানো এবং মুখস্থ করা শুরু করে দিয়েছিলেন।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইসলামগ্রহণকারী সাথিদের অনেক খোঁজখবর রাখতেন। তাদের পারিবারিক ও অন্যান্য অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে আশ্বস্ত হতেন। যারা নিঃস্ব দরিদ্র হতেন, তাদের সম্পর্ক জুড়ে দিতেন সচ্ছল মুসলমানদের সাথে, যাতে করে তাদের দেখভাল হয়ে যায় এবং কুরাইশ সরদারদের দ্বারস্থ না হতে হয়। যেমন দরিদ্র সাহাবি হজরত খাব্বাব রাদিয়াল্লাহু আনহুকে হজরত সাইদ বিন যায়েদ রাদিয়াল্লাহু আনহুর সাথি বানিয়ে দেন। হজরত খাব্বাব রাদিয়াল্লাহু আনহু তাকে কুরআন পড়াও শেখাতেন।[২৩৪]

নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মর্জি অনুযায়ী ধনী মুসলমানরাও দরিদ্র এবং অভাবী মুসলিম ভাইদের সমস্যা সমাধান করাকে সৌভাগ্য মনে করত। হজরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু হজরত বিলাল বিন রাবাহ রাদিয়াল্লাহু আনহুকে উমাইয়া বিন খালফের গোলামি থেকে আজাদ করেন। তদ্রূপ যিন্নিরা, নাহদিয়া এবং উম্মে উমাইসও (রাদিয়াল্লাহু আনহুন্না) মুশরিকদের বাঁদি ছিলেন। তারা মুসলমান হওয়ার কারণে কঠিন নির্যাতনের শিকার হন। হজরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাদেরকেও ক্রয় করে আজাদ করে দেন।[২৩৫]

অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছিল হজরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর সম্পদ ইসলামের জন্য উৎসর্গ করে দিয়েছিলেন।

---

২৩৪. মা'রিফাতুস সাহাবা, আবু নুআইম- ৭৭৯১

২৩৫. জাওয়ামিউস সিরাতিন নববিয়্যাহ, ইবনে হাযম, পৃষ্ঠা ৪৪ (দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ সংস্করণ), শুআবুল ঈমান, বাইহাকি- ১৫১৪ (মাকতাবাতুর রুশদ সংস্করণ)

দাওয়াতি তৎপরতা

হজের মৌসুম যখন ঘনিয়ে আসে, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রত্যাশা বেড়ে যায়। কারণ দূরদূরান্ত থেকে আগত লোকদের তাওহিদের দাওয়াত দেওয়ার এরচেয়ে মোক্ষম সুযোগ দ্বিতীয়টি নেই। অপরদিকে কুরাইশ সরদাররা ভীষণ চিন্তিত ছিল। কারণ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বদনাম করা এবং মানুষের কাছে দাওয়াতকে অকার্যকর করার জন্য নিত্যনতুন পদ্ধতি অবলম্বন করেও আশানুরূপ ফল তারা দেখছিল না। তারা নবীজিকে (নাউজুবিল্লাহ) ধর্মত্যাগী, পাগল ও কবি বলে প্রচার করা সত্ত্বেও এক-দুজন করে মুসলমান হওয়া অব্যাহত ছিল। এই অবস্থা প্রত্যক্ষ করে কুরাইশ সরদাররা এক জরুরি মিটিং আহ্বান করে। তাদের মধ্যে স্বনামধন্য সরদার ওয়ালিদ বিন মুগিরা বলল, 'হজের মৌসুম আসন্ন। আরবের বিভিন্ন গোত্রের লোকজন আসবে। তাদের কানে অবশ্যই এই ধর্মের কথা পৌঁছেছে। তাই ব্যক্তি মুহাম্মদের ব্যাপারে আমাদের ঐকমত্যে পৌঁছতে হবে। এমন যেন না হয় যে আমাদের পরস্পরের কথার মাঝে বৈপরীত্য থাকে।'

অনেক আলোচনা-পর্যালোচনার পর যখন নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধে মজবুত আপত্তি তুলতে ব্যর্থ হয়, তখন ওয়ালিদ বলল, 'সর্বাধিক যুক্তিযুক্ত কথা হলো, তোমরা তাকে জাদুকর বলো। সে তার জাদুর বলে ভাইকে ভাই থেকে, স্বামীকে স্ত্রী থেকে, বংশের লোকদের পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে।'

তারা এ কথার উপরই একমত হয় এবং হাজিদের আগমনের পথে তারা ঐসব কথা প্রচার-প্রসারের উদ্দেশ্যে বসে যায়। এটা নবুওয়াতের চতুর্থ বছরের অবস্থা।[২৩৬]

উকাজ বাজারে ইসলামের দাওয়াত (শাওয়াল নবুওয়াত ৪বর্ষ)

আরব জাহানে শাওয়াল থেকে জিলহজ মাসের শেষপর্যন্ত সময়টুকু আনন্দ-উল্লাস, মিল-মহব্বত এবং জমিচাষের দিন ছিল। বিভিন্ন দিক থেকে কাফেলা আসা-যাওয়ার কারণে চতুর্দিকে আনন্দোৎসব। এই দিনেই আরবদের প্রসিদ্ধ মেলা এবং হাট বসত। সবচেয়ে বড় বাজার ছিল মক্কা ও তায়েফের মধ্যবর্তী স্থান নাখলা নামক স্থান-লাগোয়া উকাজ বাজার। উকাজ মক্কা থেকে পায়দল সফরে তিনদিনের দূরত্বে ছিল।

---

২৩৬. সিরাতে ইবনে হিশাম- ১/২৭০

হজে যেতে ইচ্ছুক ব্যক্তিরা এবং বাণিজ্যিক কাফেলাগুলো পুরো শাওয়াল মাস এখানে অবস্থান করত। জিলকদ মাসে মানুষের এই ঢল মক্কা অভিমুখী হতো এবং যি-মাজান্নাহর মধ্যে যিলকদের ২০ দিন এভাবে কাটত যে, বিরান ভূমিও আবাদ হওয়ার ব্যবস্থা হয়ে যেত। ১লা যিলহজের এই আয়োজন মক্কার থেকে পাঁচ মাইল (৮ কিলোমিটার) দূরে অবস্থিত জাবালে কাবকাবের পার্শ্বে 'যুলমাজাযে' তারা চলে যেত। এই জায়গাটি আরাফাত থেকে তিন মাইল তথা পৌনে পাঁচ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। ৮ তারিখ পর্যন্ত মেলার পসরা সাজাত। ৯ যিলহজ সবকিছু ত্যাগ করে তারা হজ আদায় করে আরাফার ময়দানের দিকে রওনা হতো।

নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই জনসমাগমকে পূর্ণরূপে কাজে লাগানোর সিদ্ধান্ত নেন এবং তাদের মাধ্যমে স্বল্পসময়ে দূরদূরান্তের গোত্রগুলোর নিকট ইসলামের দাওয়াত পৌঁছে দেওয়ার ইচ্ছা করলেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি নবুওয়াতের চতুর্থ বর্ষের শাওয়াল মাসে তিন দিন সফর করে মক্কা থেকে উকাজ বাজারে পৌঁছলেন এবং বিভিন্ন গোত্রের সামনে দীনের দাওয়াত পেশ করলেন। এরপর তিনি যুলমাজাযের বাজারে আসেন এবং সেখানেও দিনরাত মেহনত করেন।

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই দাওয়াতি প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে দেওয়ার জন্য আবু লাহাব তার পিছে পিছে যায়। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাট-বাজারের বিভিন্ন আসরে উপস্থিত হয়ে মানুষদের আল্লাহর দিকে আহ্বান করতেন। তিনি বলতেন, হে মানবমণ্ডলী, তোমরা বলো 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' (আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই), তা হলে তোমরা সফল হয়ে যাবে।'

আবু লাহাব রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পিছে লেগেই থাকত। তার চোখে-মুখে ঘৃণা-বিদ্বেষের আগুন ঠিকরে পড়ত। ক্রোধ-গোসসায় সে প্রতিনিয়ত দগ্ধ হতো। সে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর মাটি নিক্ষেপ করে চিৎকার করতে থাকত- আরে, তোমরা কি দেখো না! এই লোক তোমাদেরকে তোমাদের দীন থেকে সরিয়ে নিচ্ছে!! সে চাচ্ছে তোমরা লাত-উজ্জার উপাসনা পরিত্যাগ করো।'

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার কথায় কোনো ভ্রুক্ষেপ না করে আপন দাওয়াত প্রচারে নিমগ্ন থাকতেন।[২৩৭]

---

২৩৭. আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া- ৪/১০৬

জিমাদ আযদির ইসলামগ্রহণ

মক্কাতে নবীজির দাওয়াতি তৎপরতা চলমান ছিল, সাথে কুরাইশের শত্রুতাও। সে সময়েই 'আয্দ' গোত্রপতি জিমাদ মক্কায় আসেন। মুশরিকরা তাকে ভয় দেখায় সে যেন নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথায় প্রভাবিত না হয়। তাদের কথা বিশ্বাস করানোর জন্য নবীজিকে তারা পাগল বলল (নাউজুবিল্লাহ)। যিমাদের ঝাড়ফুঁক করার অভিজ্ঞতা ছিল। সে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বলে, 'আমার হাতে আল্লাহ বহু মানুষকে আরোগ্য দান করেছেন। আপনি চাইলে আপনাকেও আমি ফুঁক দিতে পারি।'

নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,

إن الحمد لله، نحمده ونستعينه، من يَهدِه الله فلا مُضلَّ له، ومن يُضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد-

জিমাদ দম বন্ধ করে উপর্যুক্ত কথাগুলো শোনে। তার অন্তরে বিশ্বাস তৈরি হয় যে, ইতিপূর্বে সে এমন কথা কোনো দিন শোনেনি। স্বতঃস্ফূর্তভাবে সে বলে ফেলে 'আবার শোনান।'

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঐ শব্দমালাই পুনরায় শোনালেন। জিমাদ বলতে থাকে, জ্যোতিষ, জাদুকর, কবিদের কথা আমি শুনেছি। কিন্তু আপনার বলা কথার মতো কখনো শুনিনি। এ তো দেখছি ভাষার অলংকারের সাগর।'

জিমাদ রাদিয়াল্লাহু আনহু ইসলাম কবুল করেন এবং তার কওমের পক্ষ থেকেও নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতে বায়আত গ্রহণ করে নিজ গোত্রের নিকট ফিরে যান।[২৩৮]

কুরআনের প্রভাবের ব্যাপারে মুশরিকদের স্বীকারোক্তি

ইসলামের শত বিরোধিতা করা সত্ত্বেও পবিত্র কুরআনের প্রভাব-প্রতিক্রিয়ার ব্যাপারে মুশরিকদের নিকট কোনো উত্তর ছিল না। তাদের যেসব সরদারের কবিতার উন্নত রুচিবোধ ছিল, সেই তারাই মুখিয়ে থাকত কুরআনের সুরে আকর্ষিত হওয়া এবং তার সাহিত্যরস থেকে স্বাদ নেওয়ার জন্য। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন রাতেরবেলা কুরআন তেলাওয়াত করতেন, আবু জাহল, আবু সুফিয়ান ও আখনাস বিন শারিক তখন চুপিসারে এসে তা শুনত।

সুবহে সাদিক পর্যন্ত নীরবে কান পেতে তারা কুরআন শুনত। ভোরের আলো ফুটতেই তারা ফিরে যেত। রাস্তার কোনো মোড়ে গিয়ে যখন তাদের পরস্পরে

---

২৩৮. সহিহ মুসলিম- ২০৪৫ (কিতাবুল জুমুআ, বাবু তাখফিফিস সালাহ ওয়াল খুতবা)

সাক্ষাৎ হয়ে যেত, একে অন্যকে তিরস্কার করে বলত, 'আগামীতে এমন করবে না। কেননা, কওমের অন্যান্য লোক যদি তা জানতে পারে তা হলে তাদের অবস্থা কী হবে?' কিন্তু পরবর্তী রাতেও একই অবস্থা হতো। এভাবে যখন কয়েকদিন হয়ে গেল, তো একদিন আখনাস বিন শারিক লাঠি নিয়ে আবু জাহলের কাছে যায় এবং তাকে জিজ্ঞেস করে, বলো, মুহাম্মদ থেকে যে তেলাওয়াত শোন, তার ব্যাপারে তোমার অভিমত কী?'

আবু জাহল বলে, 'আমরা এবং বনু হাশিম সম্মান ও গৌরবের সকল বিষয়ে পরস্পরে তুলনা করছিলাম। আমরা যখন প্রায় বরাবর হয়ে গিয়েছিলাম তখন তারা বলে যে, আমাদের মাঝে নবীও আছে। তার উপর ওহি অবতীর্ণ হয়। আল্লাহর কসম, আমরা কখনো এই কথা বিশ্বাস করি না।'[২৩৯]

কুরাইশ সরদার ওয়ালিদ বিন মুগিরা একবার রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে কুরআন তেলাওয়াত শুনে অনেক প্রভাবিত হয়। ফিরে আসার পর তার পরিবর্তীত অবস্থা দেখে আবু জাহল তাকে তিরস্কার করে এবং তাকে এমন কথা বলতে পীড়াপীড়ি করে, যদ্বারা সে কুরআন অস্বীকার করে বুঝা যায়।

ওয়ালিদ উত্তরে বলে, 'আমি কী বলব! তোমরা তো জানো, কবিতা, রণকাব্য আমার চেয়ে অধিক জ্ঞাত আর কেউ নেই। আল্লাহর কসম, তার কথাগুলো এমন, উপর্যুক্ত কোনো বিষয়ের সাথেই যার সাদৃশ্য নেই। তার কথার মধ্যে বিস্ময়কর মাধুর্য রয়েছে। সেটি এমন কালাম, যা সবকিছুর উপর প্রাধান্য পাবে। তার উপর কোনো কিছু প্রাধান্য লাভ করতে পারবে না। এই কালাম অন্যান্য সব কালামকে উলট-পালট করে দেয়।'

আবু জাহল বলে, 'তোমার তো এমন কোনো শব্দ ব্যবহার করা উচিত, যদ্বারা তোমার কওম সন্তুষ্ট হয়।'

ওয়ালিদ গভীরভাবে ভেবে উত্তর দেয়, 'একে জাদু বলা যেতে পারে।'[২৪০]

কিন্তু নজর বিন হারিস (লোকেরা যাকে মানবরূপী শয়তান বলতো) কুরাইশের এই প্রতিরোধ আন্দোলনকে অনর্থক বলে সাব্যস্ত করে। সে কুরআনের প্রতিক্রিয়াকে আরবের প্রচলিত দীনের জন্য সবচেয়ে বিপজ্জনক আখ্যা দেয়। একদিন সে উচ্চৈঃস্বরে বলতে থাকে-'কুরাইশের লোকেরা, আল্লাহর কসম, তোমরা আজ এমন সমস্যার সম্মুখীন হয়েছ, ইতিপূর্বে তার কোনো নজির নেই। তোমরা জানো যে, মুহাম্মদ তোমাদের বংশেরই একজন। এখানেই সে

২৩৯. আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া- ৪/১৬১, দালাইলুন নুবুওয়াহ, বাইহাকি- ২/২০৬
২৪০. মুসতাদরাক, হাকিম- ৩৮২৭

বড় হয়েছে। সে তোমাদের সবচেয়ে প্রিয় ব্যক্তি, সবচেয়ে সত্যবাদী, সর্বাধিক আমানতদার। এবার মাঝবয়সে এসে সে যখন নতুন বার্তা নিয়ে এল, তোমরা তাকে জাদুকর বলতে শুরু করলে। আল্লাহর কসম, সে জাদুকর নয়। কেননা, আমরা জাদুকর এবং তাদের ঝাড়ফুঁক সম্পর্কে ভালো করেই জানি। তাকে কখনো বলো জ্যোতিষী। আল্লাহর কসম, সে জ্যোতিষী নয়। কেননা, আমরা জ্যোতিষী এবং তাদের অবস্থা খুব ভালো করেই প্রত্যক্ষ করেছি। কখনো বলো পাগল। আল্লাহর কসম, সে পাগল নয়। কেননা আমরা পাগলামি এবং তার নিদর্শনাবলি সম্পর্কে ভালোভাবেই অবগত। কুরাইশের লোকেরা, তোমাদের কর্মতৎপরতা ভালো করে ঠিক করে নাও। সত্যিই কি তোমাদের উপর অনেক বড় আপদ নেমে এসেছে?'[২৪১]

উতবা বিন রবিয়ার সঙ্গে কথোপকথন

একদিন কুরাইশের শীর্ষস্থানীয় সরদাররা মিলে তাদের সবচেয়ে বুদ্ধিমান সরদার উতবা বিন রবিয়াকে বুঝিয়েসুজিয়ে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট পাঠায়। সে নবীজির কাছে গিয়েই বলে, তুমি উত্তম নাকি তোমার বাপ-দাদা উত্তম?'

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো উত্তর দিলেন না। নবীজিকে নীরব দেখে সে বলতে থাকে, তারাই যদি উত্তম হয় তা হলে তারা তো বিভিন্ন উপাস্যের পূজা করতেন, তুমি যেগুলো ভুল বলছো। আর যদি তুমিই উত্তম হয়ে থাক, তা হলে তোমার অবস্থান পরিষ্কার করো, আমরা শুনব। আমাদের নিকট তো তোমার চেয়ে অধিক ক্ষতিকর কেউ জন্ম নেয়নি, যে আমাদের সমাজে বিভক্তি সৃষ্টি করেছে এবং আরবদের মাঝে আমাদের কলঙ্কিত করেছে। প্রচলিত হয়ে গেছে যে, কুরাইশের মধ্যে একজন জাদুকর ও জ্যোতিষী রয়েছে।

জনশ্রুতি আছে যে, কুরাইশের মধ্যে একজন জাদুকর আছে, একজন জ্যোতিষী রয়েছে। হ্যাঁ, আমাদের অবস্থা তো তরবারি নিয়ে পরস্পরে সঙ্ঘাতে লিপ্ত হওয়ার মতো। ভাই! তুমি যদি কোনো নারী চাও, তো আমরা তোমাকে দশ জন নারীর সঙ্গে বিয়ে করিয়ে দেব। আর যদি ধনদৌলত চাও, তা হলে আমরা তোমাকে এত সম্পদ দেব যে, তুমিই কুরাইশের সবচেয়ে বড় সম্পদশালী হয়ে যাবে।'

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিশ্চুপ হয়ে সব কথা শোনার পর বললেন, 'তোমার যা বলার ছিল, সবকিছু বলা শেষ হয়েছে?' সে বলল, হ্যাঁ। তখন তিনি এই আয়াতগুলো পাঠ করলেন,

---

২৪১. দালাইলুন নুবুওয়াহ, বাইহাকি- ২/২০১

حم * تَنْزِيلٌ مِنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ * كِتَابٌ فُصِّلَتْ آيَاتُهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ * بَشِيرًا وَنَذِيرًا فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ.

'হা-মিম, এটা অবতীর্ণ পরম করুণাময়, দয়ালুর পক্ষ থেকে। এটা কিতাব, এর আয়াতসমূহ বিশদভাবে বিবৃত আরবি কুরআনরূপে জ্ঞানী লোকদের জন্য, সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে, অতঃপর তাদের অধিকাংশই মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে, তারা শোনে না।'[২৪২]

নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তেলাওয়াত করছিলেন আর উতবা মাটিতে হাতে ভর দিয়ে মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে শুনছিল। নবীজি যখন এই আয়াতে পৌঁছলেন,

فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنْذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ

(অতঃপর তারা যদি মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে বলুন, আমি তোমাদেরকে সতর্ক করলাম এক কঠোর আজাব সম্পর্কে আদ ও সামুদের আজাবের মতো)[২৪৩] তখন উতবা এই আয়াত শোনার পর একেবারে দাঁড়িয়ে গিয়ে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুখে হাত রেখে আত্মীয়তার দোহাই দিয়ে এর চেয়ে অধিক তেলাওয়াত না করার অনুরোধ করে। পবিত্র কুরআনের আয়াত তাকে এমন কাবু করে ফেলে যে, সে ঘর থেকেই বের হতে পারছিল না।

এরপর অন্য মুশরিকরা এসে তার কুশল জিজ্ঞেস করে। সে পুরো ঘটনা বলে এবং রাসুলের মুখে হাত রাখার কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে বলে, তোমরা তো জানো, মুহাম্মদ যা-ই বলে তা সত্য হয় এবং বাস্তবে ঘটে। আমি তো সে সময় 'আদ ও সামুদের বজ্রধ্বনি' কথাটি ছাড়া কিছুই বুঝিনি। তার কথা শুনে আমার তখন মনে হচ্ছিল সে যেন বলছে- না জানি বাস্তবেই তোমাদের উপর আজাব নাজিল হয়ে যায়।'

এরপর সে আরো বলে, 'আল্লাহর কসম, মুহাম্মদ যা শুনিয়েছে, তা না জাদু, না কবিতা, না কোনো তন্ত্রমন্ত্র। তোমরা আমার একটা কথা মেনে নাও, এরপর আর কোনো কথা মান আর না-ই মান; এই ব্যক্তিকে তার অবস্থায় ছেড়ে দাও। ও যা বলে নিশ্চিত তার বাস্তবায়ন হবে। আরবরা যদি তাকে কাবু করে ফেলতে পারে, তা হলে তো তোমাদের কিছু করার দরকার নেই। আর সে যদি আরবদের উপর বিজয়ী হয়, তা হলে তার বিজয় তোমাদেরই বিজয়। তার ইজ্জত-সম্মান তোমাদেরই গৌরব হবে।'

---

২৪২. সুরা হামিম সিজদা, আয়াত ১-৪

২৪৩. সুরা হামিম সিজদা, আয়াত ১৩

কুরাইশের শীর্ষস্থানীয় সরদাররা উঠতে উঠতে বলে, 'মুহাম্মদের জাদু তোমাকেও কাবু করে ফেলেছে।'[২৪৪]

তুফাইল বিন আমর দাওসির ইসলামগ্রহণ

এই সময়েই ইয়েমেনের দাওস গোত্রের একজন সম্ভ্রান্ত এবং বুদ্ধিমান ব্যক্তি তুফাইল বিন আমর মক্কায় আগমন করেন। মুশরিকরা অভ্যাস অনুযায়ী তাকে সাবধান করে দেয়। এখানে এক লোক এমন নতুন ধর্ম নিয়ে এসেছে, যা পিতা-পুত্র, ভাই-ভাই, স্বামী-স্ত্রীর মাঝে বিচ্ছেদ ঘটায়। তোমারও তার দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আশঙ্কা আছে। তাই তার কথা শুনতে যেয়ো না।

তুফাইল বিন আমর পেরেশান হয়ে কানে তুলা দিয়ে রাখলেন। কিন্তু একদিন তিনি নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কাবার নিকটে নামাজ পড়তে দেখলেন। তখন তার নিকটে গেলেন। নবীজির তেলাওয়াতের আওয়াজ শুনতে পেলেন। আল্লাহ তায়ালার কালামের মাধুর্য এবং অলৌকিকতা তাকে একেবারে নির্বাক করে দিয়েছিল। স্বগতোক্তির মতো করে তিনি বলতে থাকলেন, 'আমি তো নিজেই কবি এবং প্রখর স্মৃতিধর ব্যক্তি। কথার ভালো-মন্দ যাচাই করার সক্ষমতা আমার আছে। তা হলে এই ব্যক্তির কথা শুনতে সমস্যা কোথায়! ভালো হলে তো ঠিক আছে, অন্যথায় পরিত্যাগ করব।'

নামাজ শেষ হওয়ার পর নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে তার মোলাকাত হলো। তাওহিদের দাওয়াত শুনে তিনি ইসলামে দীক্ষিত হন। ইয়েমেন ফিরে গিয়ে তিনি প্রথমে পরিবারকে ইসলামের দাওয়াত দেন। পিতা এবং স্ত্রী তৎক্ষণাৎ মুসলমান হয়ে যান। এরপর কওমের মধ্যে দাওয়াত দিতে শুরু করেন। কিন্তু কওম সাড়া দেয়নি।[২৪৫]

কিছুদিন পর তিনি দ্বিতীয়বার মক্কায় এসে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আরজ করেন, 'ইয়া রাসুলাল্লাহ, দাউস গোত্র জেদি। তারা ইসলাম গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানিয়ে দিয়েছে। আপনি তাদের উপর বদদোয়া করুন।'

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দোয়া করলেন, 'হে আল্লাহ, দাউস গোত্রকে আপনি হেদায়েত দান করুন এবং তাদেরকে এখানে নিয়ে আসুন।'[২৪৬]

---

২৪৪. মুসান্নাফ ইবনে আবি শাইবাহ- ৩৬৫৬০; মুসতাদরাক, হাকিম- ৩০০২; আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া- ৪/১৫৫-১৬০
হাফেজ ইবনে কাসির রহ. এই ঘটনা একাধিক সনদে বর্ণনা করেছেন। আমরা এখানে তিন-চার সনদের সারসংক্ষেপ উল্লেখ করেছি।

২৪৫. সিরাতে ইবনে হিশাম- ১/৩৮৩, ৩৮৪

২৪৬. সহিহ বুখারি- ৬৩৯৭ (কিতাবুদ দাওয়াত, বাবুদ দোয়া আলাল মুশরিকিন) এই দোয়া কয়েক বছর পর কবুল হয়। দাউস গোত্র মুসলমান হয় এবং তাদের মধ্য থেকে আশিটি পরিবার ৭

অভয়াশ্রমের খোঁজে : হাবশায় হিজরত

কুরাইশের জুলুম-অত্যাচার যখন চরম আকার ধারণ করে, মক্কার জমিন মুসলমানদের জন্য সংকীর্ণ হয়ে যায়, তখন নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুব চিন্তিত হয়ে পড়েন। শত্রুতা ও বৈরিতায় কুরাইশের সীমালংঘন করার দরুন নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিরীহ মজলুম মুসলমানদের জন্য একটি নিরাপদ আশ্রয় খোঁজা জরুরি মনে করছিলেন। কিছু সাহাবি অপারগ হয়ে নিজ থেকেই নবীজির নিকট অন্যকোনো দেশে চলে যাওয়ার আবেদন নিয়ে আসেন। কিন্তু অন্য দেশে যাওয়াটাও একদম মামুলি ব্যাপার ছিল না।

আরবভূমির সবচেয়ে নিকটবর্তী বড় শহর ছিল ইয়াসরিব। এর সাথে বনু হাশিমের আত্মীয়তার সম্পর্কও ছিল। কিন্তু ইয়াসরিবে দুই আরব কবিলা আউস-খাযরাজ তো নিজেরাই মুশরিক এবং মূর্তিপূজারি ছিল। উপরন্তু তারা মক্কার কুরাইশদের সাথে সম্পর্ক বিনষ্ট করতে চাইত না। বিশেষত ঐ সময় তাদের অভ্যন্তরীণ শত্রু ইহুদিরা তাদেরকে হেয় করার জন্য বিভিন্ন পাঁয়তারা করছে। এই অবস্থায় যদি তারা মক্কার মুসলমানদেরকে আশ্রয় দেয়, তা হলে তাদের শত্রুতার মাত্রা আরো বেড়ে যাবে।

ইয়াসরিবে আশ্রয় নেওয়া এজন্যও উপযুক্ত ছিল না যে, হিজাজের এই অঞ্চলটি সর্বদা যুদ্ধে যুদ্ধে উত্তাল থাকত। কুরাইশই কেবল এমন রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ থেকে আত্মরক্ষা করতে সক্ষম হয়েছিল, অন্যথায় তারাও ইয়াসরিব এবং তার পার্শ্ববর্তী এলাকায় বিরতিহীনভাবে চলা যুদ্ধ-বিবাদের বলি হতো। আউস-খাযরাজের অধীনস্থ গোত্রগুলো বার বারই পরস্পর ঝগড়ায় লিপ্ত হতো।

বনু নাযির, বনু কুরাইজ ও বনু কাইনুকার ইহুদিরা এই যুদ্ধের পালে হাওয়া দিয়ে যাচ্ছিল এবং তাতে পূর্ণোদ্দমে শরিক হয়েছিল। যুদ্ধবিগ্রহের এই ধারাকে 'হারবে সুমাইর' দ্বারা আরম্ভ হয়েছিল। এরপর অনবরত ইয়াওমুস সারারা, হারবু ফারি', হারবু হাতিব, ইয়াওমুর রাবি, ইয়াওমুল বাকি, ইয়াওমু ফিজার'-এর যুদ্ধ সংঘটিত হয়। প্রতিটি ঘরেই নিহতের ওয়ারিস ছিল, প্রত্যেক্যের বুকেই প্রতিশোধের আগুন জ্বলছিল। এমন লোকেরা কীভাবে অন্যদের সমস্যার সমাধানের প্রতি আগ্রহী হবে?[২৪৭]

হিজরিতে মদিনায় আগমন করে। [সিরাতে ইবনে হিশাম- ১/৩৮৫]

২৪৭. আলকামিল ফিত তারিখ- ১/৫৮৩-৬০১ (দারুল কিতাবিল আরাবি সংস্করণ)

দক্ষিণ দিকে আরেক নিকটবর্তী দেশ ইয়েমেন। কিন্তু সেখানে সাবা এবং হিময়ার হুকুমতের অবসান হয়ে তিন দশক ধরে পারস্যের শাসন চলছে। তাদের মতো অহংকারী, গোঁড়া এবং স্বার্থপূজারি লোকেদের কাছ থেকে ভালো আচরণ আশা করা যায় না।

পশ্চিম আফ্রিকা মহাদেশের উপকূলীয় রাষ্ট্র হাবশা এমন একটি স্থান, যেখানে নিরীহ ও নিপীড়িত মুসলমানরা আশ্রয় নিতে পারে। যদিও মুসলমানদের জন্য তা সম্পূর্ণ অপরিচিত ভূমি ছিল। উপরন্তু সেখানকার হুকুমত ও প্রজারা খ্রিষ্টান হওয়ার কারণে তাদের থেকে কোনোরূপ প্রতিরক্ষা এবং পৃষ্ঠপোষকতা পাওয়ার আশাও ছিল না। তবে সেখানকার বাদশাহর ব্যাপারে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে তথ্য ছিল যে, তিনি ন্যায়-ইনসাফ পছন্দ করেন, কারো উপর জুলুম করার সুযোগ দেন না।

হাবশা লোহিতসাগরের তীরে হওয়ার কারণে আরবের অন্যান্য নগরীর তুলনায় মক্কার কুরাইশদের আয়ত্তের বাইরে ছিল এবং তাদের সামরিক অভিযান থেকেও ছিল সম্পূর্ণ নিরাপদ। সর্বোপরি সেখানে যাওয়ার পথও প্রসিদ্ধ ছিল। কারণ, আরব-ব্যবসায়ীরা একটা সময় পর্যন্ত জেদ্দা উপকূল থেকে নৌকায় পণ্যসামগ্রী বোঝাই করে হাবশায় নিয়ে যেত।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই বাস্তবতা সঠিকভাবেই উপলব্ধি করতেন যে, হাবশা ইসলামের প্রচার-প্রসারের কেন্দ্র হওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু পরিস্থিতির নাজুকতা ও অবস্থার ক্রমাগত অবনতির কারণে এমন একটি ঠিকানার প্রয়োজন ছিল, যেখানে অন্তত মুসলমানরা শত্রুদের কবল থেকে নিরাপদ থাকবে এবং সেখানে প্রয়োজন হলেই মুসলমানরা আশ্রয় নিতে পারবে।

হাবশায় প্রথম হিজরত

(রজব - নবুওয়াত ৫ম বর্ষ)

উপর্যুক্ত বিষয়গুলোর আলোকে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকে হাবশায় হিজরতের পরামর্শ দেন। তার নির্দেশনা অনুযায়ী নবুওয়াতের পঞ্চম বছর রজব মাসে কয়েকটি মুসলিম-পরিবার গোপনে মক্কা থেকে হাবশা যাওয়ার জন্য প্রস্তুতি নেয়।[২৪৮] তাদের মধ্যে এগারো জন পুরুষ এবং চার জন নারী মুহাজির ছিলেন। এখানে তাদের সবার নাম উল্লেখ করা হলো :

১. হজরত উসমান বিন আফফান রাদিয়াল্লাহু আনহু।

২. তার স্ত্রী হজরত রুকাইয়া রাদিয়াল্লাহু আনহা।

৩. হজরত আবু সালামা রাদিয়াল্লাহু আনহু।

৪. তার স্ত্রী উম্মে সালামা রাদিয়াল্লাহু আনহা।

৫. হজরত আমের বিন রবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু।

৬. তার স্ত্রী লায়লা বিনতে আবু হাসমা (উম্মে আবদুল্লাহ)।

৭. হজরত আবু হুযায়ফা বিন উকবা।

৮. তার স্ত্রী হজরত সাহলা বিনতে সুহাইল।

৯. হজরত যুবায়ের ইবনুল আওয়াম।

১০. হজরত আবদুর রহমান বিন আউফ।

১১. হজরত উসমান বিন মাজউন।

১২. হজরত মুসআব বিন উমাইর।

১৩. হজরত আবু মাসিরা বিন আবি রুহ্‌ম।

১৪. সুহাইল বিন বায়যা এবং

১৫. আবু হাতিব বিন আমর রাদিয়াল্লাহু আনহুম।[২৪৯]

স্বাভাবিকতই মনে করা হয় যে, হাবশার মুহাজির কেবল নিঃস্ব ও নিরীহ ব্যক্তিরাই ছিলেন। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় এই কাফেলায় সর্বস্তরের লোকই অংশগ্রহণ করেছিলেন। তাদের মধ্যে ছিলেন উসমান বিন আফফান রাদিয়াল্লাহু আনহুর মতো অভিজাত এবং আমির-পর্যায়ের ব্যক্তি। ছিলেন জুবাইর ইবনুল

২৪৮. আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া- ৪/১৬৫

২৪৯. তারিখুত তাবারি- ২/২৩০; আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া- ৪/১৬৫; সিরাতে ইবনে হিশাম- ১/৩২১; সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ- ২/৩৬৩

আওয়াম রাদিয়াল্লাহু আনহু, যিনি বাহাদুরি ও সাহসিকতায় প্রবাদতুল্য ছিলেন। অপরদিকে হজরত বিলাল বিন রাবা ও আম্মার বিন ইয়াসির রাদিয়াল্লাহু আনহুর মতো সবচেয়ে নিপীড়িত ব্যক্তিরাও ছিলেন। এসব মুহাজির সাহাবি আত্মগোপন করে থাকতেন। তারা এতটাই অক্ষম ছিলেন যে, মক্কা থেকে বের হওয়াই তাদের জন্য অসম্ভব ছিল। আল্লাহ ও তার রাসুলের সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য তারা হাসিমুখে সকল নির্যাতন সহ্য করতেন।

হিজরতে বের হওয়ার পরিকল্পনা এভাবে করা হলো যে, একটি নির্দিষ্ট সময়ে এক-দুজন করে মক্কা থেকে বের হবেন এবং দূরবর্তী জায়গায় গিয়ে সবাই মিলিত হবেন, যাতে করে মক্কাবাসীরা তাৎক্ষণিক টের না পায়।[২৫০]

উম্মে আবদুল্লাহ এবং উমর বিন খাত্তাবের কথোপকথন

হজরত আমের বিন রবিয়া ও তার স্ত্রী উম্মে আবদুল্লাহ তাদের সামানা উটের উপর বেঁধে মক্কা থেকে বের হয়ে গিয়েছিলেন, কিন্তু আমের রাদিয়াল্লাহু আনহুর খুব জরুরি কাজের কথা মনে পড়ে যায়। ফলে তিনি তার স্ত্রীকে সেখানে রেখেই শহরে ফিরে আসেন।

সে সময় বনু আদির দুঃসাহসী যুবক উমর বিন খাত্তাবের সঙ্গে মুসলমানদের সম্পর্ক ছিল। আল্লাহ তাকে বোধশক্তি, আত্মসম্ভ্রম এবং আভিজাত্য দিয়েছিলেন। কিন্তু তার সামনে ন্যায় ও সত্য বিষয়টি পরিষ্কার না হওয়ায় তখনও তিনি মুসলমান হননি। এজন্য স্বদেশি মুসলমানদেরকে পুরোনো ধর্মে ফিরিয়ে নিতে তার চেষ্টা অব্যাহত ছিল। দুর্ভাগ্য হলো, উম্মে আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহা যেখানে আসবাবপত্র নিয়ে উটে বসে ছিলেন, অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে উমর যখন সেখানে এসে তাকে দেখলেন, তখন পেরেশান হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'কোথায় যাচ্ছো?'

পরবর্তীতে উম্মে আবদুল্লাহ এই ঘটনা বর্ণনা করার পর বলেছিলেন, 'উমর বিন খাত্তাব মুসলমানদের কঠোর বিরোধী ছিলেন।' কিন্তু সেদিন আল্লাহ তায়ালা তার এক বান্দির মুখে সত্য উচ্চারণ করার মতো সাহস দিয়েছিলেন। ফলে তিনি সাতপাঁচ না বলে নির্ভয়ে সুস্পষ্টরূপে বলেন, 'তোমরা আমাদের ইসলাম গ্রহণ করার কারণে নির্যাতন করো। তো আমরা আল্লাহর জমিনের এমন এক জায়গায় যাচ্ছি, যেখানে আমরা আল্লাহর ইবাদত করতে পারব, কেউ আমাদেরকে কোনো কষ্ট দেবে না।'

না জানি এই শব্দগুলো কত দরদি দিল থেকে উৎসারিত হয়েছিল, যা উমর বিন খাত্তাবের অন্তরেও আঘাত করেছে। তার চেহারায় অনুতাপ এবং দয়া-

২৫০. সামনে উল্লেখকৃত মুজামে কাবির তাবারানির বর্ণনা থেকে এই বিন্যাস বুঝা যায়।

মায়ার ছাপ পরিলক্ষিত হয়। মুখে শুধু এটুকু বলেন, 'আল্লাহ তোমাদের সঙ্গী হোন।' -এতটুকু কথা বলে ভারীপদে তিনি প্রস্থান করেন। পরিষ্কার বুঝা যাচ্ছিল মুসলমানদের আপন দেশ ছেড়ে যাওয়াটা উমর বিন খাত্তাবের নিকট অত্যন্ত পীড়াদায়ক ছিল। উম্মে আবদুল্লাহও নীরব হয়ে গেলেন। ইতোমধ্যে আমের বিন রবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু এসে পড়েন। স্ত্রী সঙ্গে সঙ্গে তাকে বলেন, এইমাত্র উমর এখান দিয়ে গেলেন। তবে আপনি যদি তার চেহারার সেই ব্যাকুলতা, পেরেশানি দেখতেন!'

আমের রাদিয়াল্লাহু আনহু অবাক হয়ে বলেন, কী, তোমার তার ইসলাম গ্রহণের আশা হচ্ছে?

স্ত্রী বললেন, হ্যাঁ।

আমের রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, যতদিন না খাত্তাব ইসলাম গ্রহণ করবে, ততদিন খাত্তাবপুত্রও ইসলামধর্ম গ্রহণ করবে না।'[২৫১]

হাবশায় আশ্রয়

মুহাজির সাহাবিগণ কিছু পায় হেঁটে আর কিছু সওয়ার হয়ে মক্কা থেকে বের হয়ে লোহিতসাগরের পাড়ে পৌঁছেন। ভাগ্য সুপ্রসন্ন ছিল। হাবশাগামী দুটি বাণিজ্যিক জাহাজ প্রস্তুত ছিল। আধা দিনার ভাড়ার বিনিময়ে তাদেরকে জাহাজে ওঠায়।

মুসলমানদের বেরিয়ে যাওয়ার সংবাদ কুরাইশদের কাছে একটু দেরিতে পৌঁছে। ফলে তারা যখন পিছু ধাওয়া করে উপকূলে আসে, ততক্ষণে জাহাজ-দুটি ছেড়ে দিয়েছিল। এভাবেই মুসলমানরা হাবশা পৌঁছে যায়। নাজাশি এই বিদেশি লোকদেরকে অত্যন্ত সম্মানের সঙ্গে নিজ দেশে থাকার সুযোগ দেন। মুসলমানরাও আফ্রিকার এমন তীব্র গরম এবং অনুন্নত দেশে মক্কার তুলনায় অনেক সুখেই জীবনযাপন করতে লাগলেন।[২৫২]

২৫১. আলমুজামুল কাবির, তাবারানি- ২৫/২৯
আমের বিন রাবিয়া মূলত হজরত উমরের ইসলামের কট্টর বিরোধিতা দেখে এমনটি বলেছিলেন। তার জানা ছিল না এই উমরই একদিন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দ্বিতীয় নিকটতম সাহাবি হবেন এবং মুসলমানদের দ্বিতীয় খলিফা হবেন। আসলে হেদায়েত এবং ইজ্জত-সম্মান তো আল্লাহ তায়ালার হাতে।

২৫২. তারিখুত তাবারি- ২/৩২৯; আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া- ৪/১৬৫; আসসিরাতুল হালাবিয়াহ- ১/৪৫৮
অনেক বর্ণনাকারী প্রথম মুহাজিরদের মধ্যে হজরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ, জাফর বিন আবু তালিব এবং তার স্ত্রী আসমা বিনতে উমাইসকেও অন্তর্ভুক্ত করে থাকেন। কিন্তু সঠিক কথা হলো, এই সাহাবিরা প্রথমবার নয়, দ্বিতীয় হিজরতে শামিল ছিলেন। সামনে সূত্রসহ তার আলোচনা আসবে।

নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দেশত্যাগী মুসলমানদের নিয়ে চিন্তা করতেন। আপন কন্যা রুকাইয়া এবং জামাতা উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুর ব্যাপারেও তিনি পেরেশান ছিলেন। তাদের কোনো খবর পাচ্ছিলেন না। তিনি মক্কা থেকে বের হয়ে আগত মুসাফিরদের নিকট হাবশার মুহাজিরদের কুশলাদি জিজ্ঞেস করতেন। অবশেষে আফ্রিকা থেকে আগত কিছু নারী তাদের সম্পর্কে ভালো সংবাদ প্রদান করে বলে যে, 'আমি আপনার কন্যার সওয়ারিতে বসে এবং তার লাগাম ধরে দেখে এসেছি।'

নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার কলিজার টুকরা কন্যা এবং জামাতার জীবিত থাকা এবং নিরাপদ থাকার ব্যাপারে আশ্বস্ত হয়ে বলেন, 'আল্লাহ তায়ালা তাদের সঙ্গী হোন। নিঃসন্দেহে উসমান লুত আলাইহিস সালামের পর পরিবার-পরিজন নিয়ে হিজরতকারী প্রথম ব্যক্তি।'[২৫৩]

সাহাবায়ে কেরামের ধৈর্য ও অবিচলতার বিধান

মুসলমানরা হাবশায় হিজরত করে চলে যাওয়ার পর মক্কায় থেকে যাওয়া সাহাবিগণের উপর কাফেররা পূর্বের চেয়ে অধিক নির্যাতন-নিপীড়ন শুরু করে। তারাও কাফেরদের সবরকম নিপীড়ন সীমাহীন ধৈর্যের সাথে সয়ে যাচ্ছিলেন। ইচ্ছা করলে তারা শক্তি প্রয়োগ করতে পারতেন। কিন্তু আল্লাহর নির্দেশে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে বিরত রাখেন।

একদিন তো হজরত আবদুর রহমান বিন আউফ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেই ফেলেন যে, 'আল্লাহর রাসুল, আমরা মুশরিক অবস্থায় তো ইজ্জত-সম্মানের সাথে ছিলাম। কিন্তু ইসলাম গ্রহণ করে আমরা দুর্বল ও নিঃস্ব হয়ে গেলাম!!'

তখন নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, 'আমাকে ক্ষমা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তাই তোমরা সংঘাতে জড়াবে না।'[২৫৪]

এর পেছনে হেকমত ছিল, দুর্বলদের উপর সবলদের সাময়িক প্রাবল্য দেখা গেলেও, পুরোপুরি কর্তৃত্ব তাদের হাতে কখনোই আসবে না। ফলে শত্রুদের কেবল বৈরিতা বৃদ্ধি পাবে এবং তাদের উপর বিপর্যয়ও বেড়ে যাবে।

---

২৫৩. ইতহাফুল খিয়ারাতিল মাহারাহ- ৬৬২৭, উসদুল গাবাহ- (রুকাইয়া বিনতে রাসুলিল্লাহর জীবনী দ্রষ্টব্য), আলআহাদ ওয়াল মাসানি, ইবনে আবি আসিম- ১২৩

২৫৪. সুনান নাসায়ি- ৩০৮৬

(يا رسول الله! إنا كنا في عز ونحن مشركون، فلما آمنا صرنا أذلة، فقال: إني أمرت بالعفو فلا تقاتلوا)

ইসলামের নতুন ত্রাণকর্তা

ইসলামের নাম নেওয়ার মতো মানুষের সংখ্যা কম ছিল। দীন ইসলাম তখনও অজানা পৃথিবীতেই ছিল। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা তার দীনের জন্য একজন মদদগার তৈরি করার ফয়সালা করলেন। নবীজির চাচা হামজা বিন আবদুল মুত্তালিব ৪০-৪৫ বছর বয়সি একজন বিখ্যাত বীর এবং বড়মাপের যোদ্ধা ছিলেন। তিনি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কেবল তরবারি দ্বারা রক্ষাই করেননি বরং ইসলামেও দীক্ষিত হন।

একদিন আবু জাহল সাফা পাহাড়ের উপর দাঁড়িয়ে অনেক মানুষের সামনে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অনেক অপমান ও গালিগালাজ করে। একজন সর্বোচ্চ পর্যায়ের সম্মানিত ব্যক্তিকে রাজপথে বেইজ্জতি ও লাঞ্ছিত করার দৃশ্য ন্যূনতম অনুভূতিসম্পন্ন কোনো মানুষ সহ্য করতে পারবে না। হামজা বিন আবদুল মুত্তালিব সেদিন তার অভ্যাসমতো শিকার ও তিরন্দাজি শেষ করে ঘরে ফিরছিলেন। পথিমধ্যে একজন মহিলা তাকে দেখে বলে, 'আবু উমারা, আজ তো তোমার ভাতিজাকে আবু জাহল অনেক কষ্ট দিয়েছে। গালিগালাজ করেছে এবং অনেক মন্দ কথা বলেছে।' -এ কথা শুনেই হামজা অগ্নিশর্মা হয়ে আবু জাহলকে খুঁজতে থাকেন। দেখলেন, সে সাফা-মারওয়ার মাঝখানে কুরাইশের একটা মজলিসে বসে আছে। সেখানে গিয়েই দুই হাত উত্তোলন করে ধনুক দিয়ে আবু জাহলের খুপড়িতে এত জোরে আঘাত করলেন, তার মাথা রক্তে রঞ্জিত হয়ে গেল।'

কুরাইশ তখন হামজাকে বিদ্রুপ করে বলতে থাকে, 'আবু উমারা, তুমি তো আগে এতটা অথর্ব ছিলে না; তুমিও কি মুসলমান হয়ে গেছো?'

মুহূর্তটি ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সত্যের সাক্ষ্য দিতে গিয়ে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হওয়ার জন্য এটিই ছিল মোক্ষম সুযোগ। হজরত হামজা হৃদয়ের গভীর থেকে তার ভাতিজার সততা বিশ্বাস করতেন। তাই তিনি কালবিলম্ব না করে ঘোষণা দেন, 'হ্যাঁ, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি মুহাম্মদ আল্লাহর রাসুল। সে আল্লাহর নিকট থেকে সত্য দীন নিয়ে এসেছে।' এরই সাথে তিনি কুরাইশকে সতর্ক করে দেন, 'আজকে তো ছিল ধনুকের আঘাত, আগামীতে তলোয়ারের মার হবে।'

কুরাইশের সরদারদের মধ্যে ভীতি ছড়িয়ে পড়ল। তাদের আশঙ্কা হতে থাকে, এমন বাহাদুর ব্যক্তিদের ইসলামগ্রহণের কারণে মুসলমানদের প্রতিহত করা দুষ্কর হয়ে পড়বে।[২৫৫]

২৫৫. আল-মুসতাদরাক, হাকিম- ৪৮৭৮

হজরত উমরের ইসলাম গ্রহণ

(যিলহজ নবুওয়াতের ৫ম বর্ষ)

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি কুরাইশের এত শত্রুতা, নির্যাতন সত্ত্বেও তিনি এমনসব বিশেষ ব্যক্তির হেদায়েতের ব্যাপারে আশাবাদী ছিলেন, যাদের মধ্যে সত্যান্বেষণ, সত্যের জন্য আত্মোৎসর্গ এবং নেতৃত্বের অসাধারণ যোগ্যতা ছিল। যদিও তারা ইসলামের অনেক বিরোধিতা করত এবং নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকেও বহু কষ্ট দিত।

এটা ছিল প্রিয়নবী হজরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মহানুভবতা এবং দিলের প্রশস্ততা। এমন গুণসম্পন্ন ব্যক্তিদের হেদায়েতের জন্য আল্লাহর নিকট তিনি দোয়াও করতেন। কুরাইশের দুই ব্যক্তির মাঝে তিনি নেতৃত্বের অসাধারণ যোগ্যতা প্রত্যক্ষ করেছিলেন।

একজন আমর বিন হিশাম (আবু জাহল); বিরোধিতা, দুষ্টামি এবং নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধে নিত্যনতুন পদ্ধতি প্রয়োগ করার ক্ষেত্রে সে ছিল সিদ্ধহস্ত। অপরজন ছিলেন অত্যন্ত বাহাদুর ও দুঃসাহসী বীর। আটাশ বছর বয়সি যুবক উমর বিন খাত্তাব। বীরত্ব, হিম্মত এবং রণকৌশলে তিনি ছিলেন অনন্য। এক দুটি ঘটনা এমন ছিল, যার বদৌলতে তার দিলে ইসলামের সত্যতা সম্পর্কে কিছুটা অনুভূতি তৈরি হয়েছিল।

আশার বাণী

নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রকাশ্যে দীনের প্রচার-প্রসারের কাজ শুরু করার কয়েকদিন পূর্বে উমর একদা হারামের চত্বরে শুয়ে ছিলেন। তখন একজন লোক এসে মূর্তির সামনে প্রাণী জবাই করল। এমন সময় বিকট আওয়াজ শোনা গেল। এক ব্যক্তি বলছে,

«يا جَلِيح! أمرٌ نَجِيح، رجل فصيح، يقول: لا إله إلا الله».

'হে জালিহ, খুশির কথা, একজন বিশুদ্ধভাষী লোক বলছে, আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই।'

হজরত উমর এই আওয়াজ শুনে যারপরনাই বিস্মিত হন। তিনি বক্তাকে খুঁজতে থাকেন। কিন্তু কোথাও তার হদিস পেলেন না। এর কয়েকদিন পর থেকেই

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়াতের আলোচনা হতে থাকে।[২৫৬]

হজরত উমরের চুপিসারে নবীজির তেলাওয়াত শ্রবণ

একদিন নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে হারামে নামাজে সুরা হাক্কাহ তেলাওয়াত করছিলেন। হজরত উমর চুপিসারে তা শুনছিলেন। কুরআন কারিমের স্বর ও মর্মের সৌন্দর্য তাকে বিমোহিত করে তোলে, মনে মনে বলতে লাগলেন, 'এই ব্যক্তি তো কবি'। আর তখনই নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তেলাওয়াত করলেন,

وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ

এটি কোনো কবির কথা নয়, তোমরা খুব কমই ঈমান আন।

হজরত উমর পেরেশান হয়ে পড়লেন। তিনি আমার দিলের কথা কীভাবে জানলেন! নিশ্চয় তিনি জাদুকর। এ সময়ই নবীজিকে পড়তে শুনলেন,

وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ

এটি কোনো জাদুকরের কথা নয়, তোমরা খুব কমই উপদেশ গ্রহণ কর।

সেদিনই হজরত উমরের দিলে ইসলামের বীজ রোপিত হয়।[২৫৭]

হজরত হামজা রাদিয়াল্লাহু আনহু যখন ইসলাম কবুল করেন, তখন কুরাইশরা ভীষণ পেরেশান হয়ে পড়ে। ইসলামকে তারা কীভাবে নিশ্চিহ্ন করে দেবে, সেজন্য তাদের দৌড়ঝাঁপ বেড়ে যায়।

একদিকে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুক্রবার রাত থেকে এই দোয়া করছিলেন, 'হে আল্লাহ, আমর বিন হিশাম কিংবা উমর বিন খাত্তাবের মাধ্যমে ইসলামকে শক্তিশালী করুন।' অপরদিকে কুরাইশ নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হত্যা করার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল।

হজরত হামজা রাদিয়াল্লাহু আনহু মুসলমান হয়েছেন তিন দিন হলো। আবু জাহলের উসকানিতে কুরাইশের প্রতিশোধের আগুন প্রশমিত করার দায়িত্ব হজরত উমর বিন খাত্তাব নিজের কাঁধে তুলে নেন। তিনি তরবারি উঁচিয়ে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হত্যার উদ্দেশ্যে রওনা হন। পথিমধ্যে নুয়াইম বিন আবদুল্লাহ আন-নাহহাম (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এর সঙ্গে আকস্মিক সাক্ষাৎ হয়ে যায়। তিনি গোপনে মুসলমান হয়ে গিয়েছিলেন। হজরত উমরের ভাবমূর্তি দেখে জিজ্ঞেস করেন, 'উমর, কোথায় যাওয়ার ইচ্ছা করেছেন?'

বললেন, মুহাম্মদের উদ্দেশে যাচ্ছি। সে তো কুরাইশের প্রাজ্ঞ লোকদের

২৫৬. সহিহ বুখারি- ৩৮৬৬ (কিতাবুল মানাকিব, বাবু ইসলামি উমর বিন খাত্তাব রা.)
২৫৭. মুসনাদ আহমাদ- ১০৭, কানযুল উম্মাল- ৩৫৭৩৯

মূর্খ আখ্যা দিচ্ছে। আমাদের উপাস্যদের মন্দ বলে এবং আমাদের সমাজের বিরোধিতা করে।'

হজরত নুয়াইম রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, উমর, অত্যন্ত খারাপ কাজে যাচ্ছেন। যদি মুহাম্মদকে হত্যা করেন, তা হলে বনু হাশিম, বনু জুহরা আপনাদেরকে এমনিতেই ছেড়ে দেবেন?'

কিন্তু হজরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তার সিদ্ধান্তে অনড় ছিলেন। অবস্থা বেগতিক দেখে হজরত নুয়াইম তার চিন্তা অন্যদিকে ঘুরিয়ে দেওয়ার কৌশল আঁটলেন। তার আত্মসম্মানে আঘাত করার চিন্তা করলেন। বললেন, উমর, প্রথমে তো নিজের ঘরের খবর নেন! বোন ফাতেমা এবং ভগ্নীপতি সাঈদও তো মুসলমান হয়ে গেছে।'[২৫৮]

হজরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু যখন বোনের বাড়িতে পৌঁছেন, তখন ভেতর থেকে কুরআন পড়ার এবং পাঠদানের আওয়াজ ভেসে আসছিল। হজরত খাব্বাব রাদিয়াল্লাহু আনহু কুরআন পড়াচ্ছিলেন। হজরত উমর খুব জোরে দরজার কড়া নাড়েন। বোন জিজ্ঞেস করলেন, কে? উত্তর এল, 'উমর'। তিনি ঘাবড়ে যান। হজরত খাব্বাব রাদিয়াল্লাহু আনহু তখন ত্বরিত গতিতে কোনো নিভৃত কামরায় গিয়ে আত্মগোপন করেন। এরপর ফাতেমা বিনতে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহা দরজা খুলে দেন। উমর ঘরে প্রবেশ করেই জিজ্ঞেস করেন, তোমরা সবাই কী পড়ছিলে?

বোন-ভগ্নীপতি উত্তর দেন, আমরা তো পরস্পর কথা বলছিলাম।

উমর তখন হুংকার ছেড়ে বললেন, 'আমি জানি তোমরা বিধর্মী হয়ে গেছো।'

সাঈদ বিন যায়েদ রাদিয়াল্লাহু আনহু তখন বলেন, 'আচ্ছা উমর, যদি তোমাদের দীন ছাড়া অন্য দীনের মধ্যে সততা মিলে, তা হলে তুমি কী করবে?'

এটা শুনেই উমর সাঈদ বিন যায়েদকে মাটিতে ফেলে নির্দয়ভাবে পেটাতে

---

২৫৮. স্বাভাবিকতই মনে হবে- হজরত উমর রা. আগে থেকে তার বোন এবং ভগ্নীপতির ইসলামগ্রহণ সম্পর্কে জানতেন না; এ কথা সহিহ নয়। কারণ, স্বয়ং সাঈদ বিন যায়েদ রা. বলেন, উমর রা. এর ইসলামগ্রহণের পূর্বে আমার এবং তার বোনের মুসলমান হওয়ার কারণে তিনি আমাদেরকে শেকলে বেঁধে রাখতেন। [সহিহ বুখারি- কিতাবুল মানাকিব, বাবু ইসলামি সাঈদ বিন যায়েদ রা., আততারিখুল আওসাত, বুখারি- ১/১১২, দারুল ওয়ী সংস্করণ]
তাই হজরত উমরের ইসলামগ্রহণের সময়ই তিনি তার বোন এবং ভগ্নীপতির মুসলমান হওয়ার কথা জানতে পারেন- কথাটি ভুল। বাস্তবতা হলো, তিনি আগে থেকেই জানতেন; কিন্তু তিনি ক্রোধে অগ্নিশর্মা অবস্থায় যখন এমন খোঁচা শুনতে পান, তখন প্রথমে এই মাসআলা খতম করার কথা মাথায় চড়ে বসে এবং যে উদ্দেশ্যে বের হয়েছিলেন, তার কথা ভুলে যান।

লাগলেন। বোন ফাতিমা বিনতে খাত্তাব স্বামীকে রক্ষা করতে গেলে উমর তাকে এত জোরে থাপ্পড় দেন যে তার মুখ দিয়ে রক্ত বের হতে থাকে। ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহা তখন কাঁদতে কাঁদতে বলেন, 'খাত্তাবের পুত্র, তোমার যা মন চায় করো। আমরা তো ইসলাম গ্রহণ করেছি, আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই, আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি মুহাম্মদ আল্লাহর রাসুল।'

বোনের মুখে এই কথা শুনে এবং তার চেহারায় রক্ত দেখে হজরত উমরের রাগ পড়ে যায়। তিনি চৌকির উপর বসে বোনকে বলতে লাগলেন, 'তোমরা কী পড়ছিলে, আমাকে দেখাও।'

বোন বললেন, 'তুমি অপবিত্র। এই গ্রন্থ কেবল পবিত্র লোকেরাই স্পর্শ করতে পারে। তাই প্রথমে তুমি গোসল করে এসো।'

হজরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু গোসল করার কারণে দেহের অভ্যন্তরে ঘনীভূত হয়ে থাকা ময়লা-আবর্জনাও পরিষ্কার হয়ে যায়। এবার বোন ওহি লেখা কাগজগুলো তার সম্মুখে পেশ করেন। কাগজে তখন সুরা তহার আয়াত লেখা ছিল, যা তখন নাজিল হয়েছিল।

হজরত উমর আয়াত পড়তে থাকেন আর দিলের মধ্যে ঈমানের আলোয় আলোকিত হতে থাকেন। এরপর তিনি অস্থির হয়ে বলতে থাকেন, 'আমাকে নবীজির নিকট নিয়ে চলো।'[২৫৯]

---

২৫৯. হজরত উমরের ইসলামগ্রহণের সময়কাল সংক্রান্ত আলোচনা:

হজরত হামজা রা. এর ইসলামগ্রহণের তিনদিন পর হজরত উমর রা. মুসলমান হন। [দালাইলুন নুবুওয়াহ- আবু নাঈম, পৃষ্ঠা ২৪১]

এ ব্যাপারেও সকলে একমত যে, ইসলামের এই শক্তি অর্জন হাবশায় প্রথম হিজরত এবং তাদেরকে ফিরিয়ে আনার জন্য গমনকারী কুরাইশ প্রতিনিধিদলের ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসার পরই সংঘটিত হয়েছে। নিচের আরবিপাঠ দেখুন-

كان إسلام عمر بعد خروج من خرج من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحبشة

'উমরের ইসলামগ্রহণ হাবশায় (১ম) হিজরতকারী মুসলমানদের মক্কা থেকে বের হয়ে যাওয়ার পর।' [সিরাতে ইবনে ইসহাক- ১/১৮১, সিরাতে ইবনে হিশাম- ১/৩৪২, সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ- ২/৩৭০]

এ সময় চল্লিশের কিছু বেশি মানুষ মুসলমান হয়েছিল। [তাবাকাতে ইবনে সাদ- ৩/২৬৯]

তন্মধ্যে ১১ জন পুরুষ এবং ৪ জন মহিলা হাবশা হিজরত করে চলে গিয়েছিল। [আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া,৪/১৬৫]

মোদ্দাকথা, প্রথম হাবশা হিজরতের পরের ঘটনা এটি। পাশাপাশি এটাও নিশ্চিত হয়ে যায় যে, প্রথম হাবশা হিজরত রজব পঞ্চম নবুওয়াতবর্ষে হয়। [আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া,৪/১৬৫]

এর ক'দিন পর হজরত উমর রা. ইসলাম গ্রহণ করেন?

ইবনুল জাওযি রহ. নবুওয়াতবর্ষের কথা উল্লেখ করেন। [আলমুনতাযাম- ২/৩৮৪৮]==

হজরত উমরের এই কথা শুনে খাব্বাব রাদিয়াল্লাহু আনহু কামরা থেকে বের হয়ে এসে বলেন, 'উমর, তোমাকে মোবারকবাদ! জুমার রাতে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দোয়া করেছিলেন, 'হে আল্লাহ, আমর বিন হিশাম কিংবা উমর বিন খাত্তাবের মাধ্যমে ইসলামকে শক্তিশালী করে দিন।' মনে হচ্ছে আল্লাহ তায়ালা তোমার ক্ষেত্রে নবীজির দোয়া কবুল করেছেন।[২৬০]

হজরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু সোজা সাফা পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত

==আল্লামা সালেহ আশশামি আরেকটু বিস্তারিত বর্ণনা দিয়ে বলেন, এটি নববি ষষ্ঠবর্ষের যিলহজ মাসে এবং প্রথম হিজরত ও দ্বিতীয় হাবশা হিজরতের মাঝামাঝি সময় সংঘটিত হয়। [সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ- ২/৩৭০]

কিন্তু ঐ সময়টাকে যদি তার বাহ্যিক দৃশ্যপটের উপর বিবেচনা করি, তা হলে তার অর্থ দাঁড়ায়, হজরত উমর রা. মুসলমান হয়েছেন মুসলমানদের প্রথম হাবশা হিজরতের (রজব ৫ নববি-বর্ষ) দেড় বছর পর। ঘটনার গতিবিধির দিকে লক্ষ করলে দেখা যায়, তার ইসলামগ্রহণ এবং হাবশা হিজরতের মাঝে তেমন পার্থক্য নেই। কারণ, স্বয়ং প্রথম হিজরত ও দ্বিতীয় হাবশা হিজরতের মাঝেই সর্বোচ্চ দেড় বছর তারতম্য।

মূলকথা হলো, তাদের এই বছর গণনা মূলত নবুওয়াতের সময়টাকে মূল ধরে হতো। ফলে এক মত অনুযায়ী বছর হয় রবিউল আওয়াল থেকে রবিউল আওয়াল। আরেক মত অনুযায়ী রমজান থেকে রমজান। কিন্তু ঐতিহাসিকদের অধিকাংশই মহররম থেকে মহররম পর্যন্ত বছর গণনা করেছেন। যদিও কেউ কেউ কোথাও কোথাও এর বিপরীত রীতি অনুসারে বছরের হিসাব করেছেন। কিন্তু একে সাধারণ নববি-বর্ষের হিসাবের সাথে যুক্ত করলে দ্বিধা-সংশয়ে পড়তে হয়। এ স্থানে কিছু বর্ণনাকারী যে যিলহজের কথা বলেছেন, মূল বর্ষ গণনা, অর্থাৎ রমজান থেকে রমজানের হিসাব অনুসারে নববি ষষ্ঠ বর্ষের চতুর্থ মাস ছিল। সাধারণ হিসাব অনুযায়ী তা পঞ্চম নববি-বর্ষের যিলহজ মাস হয়। অপরদিকে পঞ্চম নববি-বর্ষের রজব মাস এবং উমর রা. এর ইসলামগ্রহণের মাঝে কেবল পাঁচ মাস অতিক্রান্ত হয়। এখন ঘটনার বিবরণ এরকম হয় যে, পঞ্চম নববি-বর্ষের রজব মাসে প্রথম হাবশা হিজরত হয়। আর এর জন্যই হজরত উমর ক্ষিপ্ত হন। পরবর্তী সময়ে তিনি চুপিসারে নবীজির তেলাওয়াত শুনতেন। এরপর যিলহজ মাসে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। আর তখন থেকেই মুসলমানদের উপর ব্যক্তিগত নির্যাতনওহ্রাস পায়। সাধারণভাবেই উক্ত সংবাদগুলো বিভিন্ন উপায়ে হাবশা পৌঁছে। ফলে তারা ষষ্ঠ নববি-বর্ষের মাঝামাঝিতে মক্কা ফিরে আসেন।

মুশরিকরা অস্থির হয়ে বনু হাশিমের উপর চাপপ্রয়োগ করে এবং অন্যান্য মুসলমানের উপর সামাজিক অত্যাচারে লিপ্ত হয়। যার কারণে বড় সংখ্যক মুসলমান দ্বিতীয়বার হাবশা হিজরত সফর করতে বাধ্য হন। এরপর হয় শেবে আবু তালিবের বয়কট। এক মত অনুযায়ী তা হয়েছিল ৭ নববি-বর্ষ মহররম মাসে। আরেক মত অনুযায়ী ৮ নববি-বর্ষ মহররম মাসে। এর থেকে অনুমিত হয় যে, শিআবে আবু তালিবের বয়কটের কিছুদিন পূর্বে হাবশায় দ্বিতীয় হিজরত হয়েছিল। এক-দু'জন করে হিজরতের ধারা বয়কটের পরেও চালু ছিল। যেমন হজরত আবু বকর রা. এর হাবশা হিজরত-প্রচেষ্টার কথা সিরাতে ইবনে হিশামে শেবে আবু তালিবে বয়কটের আলোচনায় উল্লেখ করা হয়েছে।

২৬০. কানযুল উম্মাল- ৩৫৭৪০; দালাইলুন নুবুওয়াহ, বাইহাকি- ২/২১৫-২২৩ (বাবু যিকরে ইসলামি উমর)

হজরত আরকামের ঘরের কাছে পৌঁছে গেলেন। এখানে নবীজি তার প্রায় চল্লিশ জন সাহাবিকে নিয়ে (যারা হাবশা হিজরত করেননি) পুরো পৃথিবীতে দীন ইসলামকে জিন্দা করার ফিকিরে মশগুল ছিলেন। তাদের মধ্যে হজরত আবু বকর, আলি এবং হামজা রাদিয়াল্লাহু আনহুমও উপস্থিত ছিলেন।

হজরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু দরজার কড়া নাড়লেন। এক সাহাবি দরজার ফোঁকড় দিয়ে দেখে বললেন, 'উমর তলোয়ার নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন।'

হজরত হামজা রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, 'তাকে আসতে দাও। যদি সে সৎ উদ্দেশ্যে এসে থাকে, তা হলে তো ভালো। অন্যথায় আমরা তার তলোয়ার দিয়েই তাকে হত্যা করব।'

হজরত উমর যখন ঘরে প্রবেশ করেন, তখন তার কিছু বলার পূর্বেই নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে তিরস্কার করে বলেন, 'উমর, আল্লাহর তরফ থেকে লাঞ্ছনা এবং শাস্তি আসার পূর্বে কি তোমার সংযত হওয়ার সময় হবে না?'

এরপর নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পুনরায় দোয়া করলেন, 'হে আল্লাহ, এ হলো উমর বিন খাত্তাব। হে প্রভু, তার মাধ্যমে দীনের ইজ্জত ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি করে দিন।'

এবার হজরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলতে থাকেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আপনি আল্লাহর রাসুল।'

মুসলমানরা তা শুনে এত উচ্চৈঃস্বরে 'আল্লাহু আকবার' স্লোগান দেন যে, পুরো মক্কার অলিগলিতে যেন তা গুঞ্জরিত হয়েছে।

হজরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু ইসলাম গ্রহণ করার পরপরই নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আরজ করেন, তিনি যেন এখন থেকে প্রকাশ্যে তাবলিগ করেন।[২৬১]

হজরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু পরদিন সকালে মসজিদে হারামে গিয়ে কাফেরদের সম্মুখে নিজের ইসলামগ্রহণের ঘোষণা দেন। কাফেররা একযোগে তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। তিনি একাই তাদের মোকাবেলা করেন। দীর্ঘসময় পর্যন্ত তাদের মাঝে ঝগড়া হয়। পরিশেষে কাফেররা হতাশ হয়ে পিছু হটে। হজরত উমরের ইসলামগ্রহণের সংবাদে সমগ্র মক্কায় হইচই পড়ে যায়।

---

২৬১. সিরাতে ইবনে হিশাম- ১/৩৪৩-৩৪৬, কানযুল উম্মাল- ৩৫৭৪০, দালাইলুন নুবুওয়াহ, বাইহাকি- ২/২১৫-২২৩ (বাবু যিকরি ইসলামি উমর) যদিও হজরত উমর রা. এর ইসলামগ্রহণের রেওয়ায়েতগুলো সনদের দিক থেকে দুর্বল, কিন্তু সকল সিরাতগ্রন্থকারই তা গ্রহণ করে নিয়েছেন। তাই এগুলোকে প্রত্যাখ্যান করার কোনো কারণ নেই।

আবদুল্লাহ বিন মাসউদ বলতেন, 'উমর বিন খাত্তাবের ইসলামগ্রহণ ছিল ইসলামের বিজয়। তার ইসলাম কবুলের পূর্বে আমরা কাবার সামনে স্বাধীনভাবে নামাজ আদায় করতে পারতাম না। তিনি যখন মুসলমান হলেন, তখন তিনি কুরাইশের সঙ্গে লড়াই করেন এবং কাবার সামনে নামাজ আদায় করেন। তার সাথে সাথে আমরা নামাজ পড়ি।'[২৬২]

২৬২. সিরাতে ইবনে হিশাম- ১/৩৪২। এর দ্বারাই পরিষ্কার হয় যে, হজরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ রা. প্রথমবার হাবশা হিজরতকারীদের মধ্যে শামিল ছিলেন না।

হাবশার মুহাজিরদের প্রত্যাবর্তন

(নবুওয়াত ষষ্ঠবর্ষের মাঝামাঝি)

হাবশার মুহাজিরদের নিকট এই মর্মে সংবাদ পৌঁছে যে, নবীজি এবং মুসলমানদের উপর কুরাইশদের নির্যাতন বন্ধ হয়েছে। এই কথা এভাবে চাউর হয় যে, একদিন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে হারামে নামাজে সুরা নাজম তেলাওয়াত করছিলেন। এটিই প্রথম সুরা, যার মধ্যে সেজদার আয়াত নাজিল হয়। সুরার শেষ আয়াত পড়ে যখন তিনি সেজদায় গেলেন, তখন মুসলমানদের পাশাপাশি উপস্থিত মুশরিকদেরও এমন অবস্থা হলো যে, তারাও মুসলমানদের সঙ্গে সেজদাবনত হয়। এমনকি জিনরাও সেজদা করে। দৃশ্যপটের প্রত্যক্ষদর্শী হজরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, কেবল একজন মুশরিক দাঁড়িয়ে একমুষ্ঠি মাটি নিয়ে তার কপালে রেখে দেয়। পরবর্তীতে সে বদরযুদ্ধে নিহত হয়।[২৬৩]

উপর্যুক্ত সংবাদটা অনেক বাড়িয়ে-চড়িয়ে হাবশায় প্রচার করা হয়। যেহেতু সুরা নাজমে কাফেরদের উপাস্য লাত-মানাত-উজ্জার আলোচনা এসেছে, তাই এর মধ্যে কিছু শব্দ বাড়িয়ে মক্কার কাফেররা প্রচার করতে থাকে যে, (নাউজুবিল্লাহ) নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেই তাদের মূর্তির প্রশংসা করছেন।[২৬৪]

২৬৩. সহিহ বুখারি- ৪৮৬২, ৪৮৬৩ (কিতাবুত তাফসির)
আল্লামা হালাবি এই ঘটনার তারিখ পঞ্চম নববি-বর্ষ রমজান মাস উল্লেখ করেছেন। [সিরাতে হালাবিয়্যাহ- ১/৪৫৮] তবে আনুমানিক যিলকদ, যিলহজের মাঝেই এই সংবাদ হাবশায় পৌঁছে গিয়ে থাকবে। এর উপর নির্ভর করেই বলা যায় ষষ্ঠ নববি-বর্ষের প্রারম্ভেই মুহাজিরিনে হাবশার প্রত্যাবর্তন শুরু হয়।

২৬৪. কিছু তাফসির যেমন তারিখুত তাবারি- তাবাকাতে ইবনে সাদ ইত্যাদি কিতাবের কিছু রেওয়ায়েতে এসেছে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুরা নাজম পড়তে পড়তে যখন তিনি লাত-মানাতের আলোচনার আয়াতে পৌঁছেন, তখন শয়তান নবীজির জবানে এই শব্দগুলো উচ্চারিত করান:

تلك الغرانيق العُلى* وإن شفاعتهن لتُرتجى

(অর্থাৎ এই মূর্তিগুলো শ্রদ্ধার পাত্র এবং এগুলোর শাফাআতও গ্রহণযোগ্য) =

এটা শুনে কাফেররা বড় আনন্দিত হয় এবং ভাবে যে নবীজিও তাদের স্বধর্মী হয়ে গেছেন। ফলে আয়াতে সেজদার সময় তার সঙ্গে সেজদাও করে। [তারিখুত তাবারি- ২/৩৪০, তাবাকাতে ইবনে সাদ- ১/২০৫]

এ ধরনের সকল রেওয়ায়েত সনদ এবং মতনের দিক থেকে বাতিল। আল্লামা==

এর বিপরীতে কিছু লোক যখন নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে মক্কার কাফেরদেরকেও সেজদা করতে দেখে, তখন তারা মুখে মুখে ছড়িয়ে দেয় যে, কাফেররাও সেজদা করেছে এবং সকলেই মুসলমান হয়ে গেছে। অথচ বাস্তবতা ছিল ভিন্ন। প্রকৃত সেজদাকারীরাও বিশেষ এক পদ্ধতিতে সেজদা করেছে।

অন্যদিকে আবু জাহল, নজর বিন হারিস, উকবা বিন আবি মুয়াইত, আস বিন আবু ওয়াইলের মতো ইসলামের বড় বড় দুশমনরা (কাফের অবস্থাতেই যাদের মৃত্যু হয়) কিন্তু সেজদাকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না।[২৬৫] এজন্য সবার মুসলমান হয়ে যাওয়ার সংবাদ ভুল ছিল। কিন্তু এই ভুল সংবাদই হাবশায় পৌঁছে যায়।

==ইবনুল জাওযি রহ. বলেন, 'এই কথাটি শয়তান জিন বা মানব শয়তানের ছিল, যা মুশরিকরা শুনতে পেয়েছিল; কারণ তাদের অভ্যাসই ছিল নবীজির তেলাওয়াতের সময় হট্টগোল করা, চেঁচামেচি করা। পবিত্র কুরআনে তাদের এই অভ্যাস সম্পর্কে বলা হয়েছে, 'তোমরা এই কুরআন শোনো না, এবং তার তেলাওয়াতের সময় গোলমাল বাঁধিয়ে দাও।' [সুরা হামিম সাজদাহ- ২৬]

এই সুরা শোনার পর কিছু শয়তান আগের আয়াতের সাথে সামঞ্জস্য রেখে উক্ত শব্দগুলো উচ্চারণ করে। মুশরিকরা তখন ভাবে এটা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন। কারণ, এই শব্দগুলো নবীজির তেলাওয়াতের সময়ই উচ্চারিত হয়। প্রশ্ন হয় যে, এধরনের বাক্য উচ্চারিত হওয়া কি নবীজির পবিত্র জবান থেকে সম্ভব? উত্তর- এটা কখনোই সম্ভব নয়। আপনারা কিছু কিছু তাফসিরগ্রন্থে এই শব্দগুলো লেখা দেখে কেউ ধোঁকা খাবেন না যে, এসব শব্দ নবীজির মুখে উচ্চারিত হয়েছে। যদি এগুলো বিশুদ্ধ মেনে নেওয়া হয়, তা হলে সত্য-মিথ্যার মাঝে মিশ্রণ হয়ে যাবে। বিশুদ্ধ ও অকাট্য উদ্ধৃতির ক্ষেত্রেও কখনো এমন সন্দেহ জাগতে পারে যে, এটাও হয়তো শয়তানের কথা। অথচ আল্লাহ তায়ালা শয়তান থেকে নবীদের মাহফুজ রেখেছেন। আল্লাহ তায়ালা ওহিকে শয়তান থেকে মাহফুজ রাখার ব্যাপারে ইরশাদ করছেন, 'আল্লাহ তায়ালা তার আগে-পিছনের মুহাফিজ ফেরেশতা পাঠিয়েছেন।' (সুরা জিন, আয়াত ২৭) [কাশফুল মুশকিল মিন হাদিসিস সাহিহাইন: ১/২৭৪, ২৭৫]

একাধিক গবেষক উক্ত রেওয়ায়েত অত্যন্ত কঠোরভাবে প্রত্যাখ্যান করেছেন। [উমদাতুল কারি- ৭/১০০, মিরকাতুল মাফাতিহ- ২/৮০৯] শায়েখ নাসিরুদ্দীন আলবানি রহ. এ বিষয়ে 'নাসবুল মানাজিক লিনাসফি কিসসাতিল গারানিক' নামে একটি পুস্তিকা লিখেছেন। এতে তিনি প্রমাণ করেছেন, উক্ত রেওয়ায়েতের কোনো সহিহ সনদ নেই। পুস্তিকাটি অধ্যয়নযোগ্য।

২৬৫. আবদুল্লাহ বিন মাসউদ রা. ঐ ঘটনার বিবরণ দিতে গিয়ে মুশরিকদের মধ্যে উমাইয়া বিন খালাফের অবস্থা বিশেষভাবে বর্ণনা করেছেন।

যার দ্বারা বুঝা যায়, যেসব মুশরিক সেজদায় শরিক হয়েছিল, পরবর্তীতে তাদের ইসলামগ্রহণের তাওফিক হয়েছিল এবং সুন্দর মৃত্যুও হয়েছিল। [ফাতহুল বারি- ২/৫৫৪] অন্যদিকে আবু জাহল, উকবা বিন আবু মুয়াইত, আস বিন আবু ওয়াইল, যারা কাফের অবস্থায় মারা গেছে; সম্ভবত তারা ঘটনাস্থলে উপস্থিতই ছিল না।

মুহাজিররা তা শুনেই আপন দেশে প্রত্যাবর্তনের জন্য রওনা দিয়ে দেয়।[২৬৬]

সর্বোপরি, মুহাজিররা যখন মক্কার সন্নিকটে পৌঁছেন, তখন তাদের কর্ণগোচর হয় যে, কুরাইশ ইসলামের শত্রুতার ব্যাপারে আপন অবস্থাতেই আছে। তখন মুহাজিররা পেরেশান হয়ে যান। কেউ কেউ তো সেখান থেকেই পুনরায় হাবশা চলে যান। বাকিরা সাময়িক বা কোনো কুরাইশির নিরাপত্তা ও আশ্রয় নিয়ে মক্কায় প্রবেশ করেন। যেমন আবু সালামা এবং তার স্ত্রী উম্মে সালামা রাদিয়াল্লাহু আনহা আবু তালেবের আশ্রয়ে চলে আসেন। উসমান বিন মাজউন রাদিয়াল্লাহু আনহু ওয়ালিদ বিন মুগিরার আশ্রয় গ্রহণ করেন। এভাবে সাময়িকের জন্য হলেও কুরাইশের নেতাগিরি থেকে রেহাই পান।[২৬৭]

আবারো জুলুমের সম্মুখীন

যেসব মুসলমান কারো আশ্রয় গ্রহণ করতে পারেননি, তারা পুনরায় অত্যাচার ও নিষ্ঠুরতার শিকার হন। এটা দেখে একদিন হজরত উসমান বিন মাজউন রাদিয়াল্লাহু আনহুর আত্মসম্মানবোধ জেগে ওঠে। তিনি ওয়ালিদকে বলেন, 'তোমার পৃষ্ঠপোষকতা এবং প্রতিরক্ষা আমার আর প্রয়োজন নেই।'

মুশরিকরা তো এই সময়ের অপেক্ষাতেই ছিল। ফলে এ জায়গায় এক মুশরিক তাকে এই পরিমাণ প্রহার করে যে, একটি চোখ প্রচণ্ড আঘাতপ্রাপ্ত হয়। ওয়ালিদ তখন তাকে তিরস্কার করে বলে, 'আগে তোমার চোখ সংরক্ষিত ছিল, তুমি শক্তিশালী একটি আশ্রয়ে ছিলে।'

হজরত উসমান দ্বিধাহীনচিত্তে বলেন, 'আল্লাহর কসম, আমার অপর চোখটিও এমন বিপদের জন্য প্রস্তুত রয়েছে।'[২৬৮]

---

২৬৬. এখানে এটাও উল্লেখযোগ্য যে, হজরত হামজা এবং হজরত উমর-এর ইসলামগ্রহণে মুশরিকরা তাৎক্ষণিক ঘাবড়ে গিয়েছিল এবং মুসলমানদের উপর তাদের নির্যাতনের মাত্রা তুলনামূলক হ্রাস পেয়েছিল। তাই হতে পারে, এই প্রেক্ষাপটের সংবাদও মুহাজিরদের স্বদেশ প্রত্যাবর্তনে অনুপ্রাণিত করে।

২৬৭. সিরাতে ইবনে হিশাম- ১/৩৬৯

২৬৮. প্রাগুক্ত- ১/৩৭০-৩৭১

দ্বিতীয়বার হাবশা হিজরত

(ষষ্ঠ নববিবর্ষের শেষে)

পূর্বের তুলনায় মুসলমানদের জন্য জীবনযাপন করা কঠিনতর হয়ে যায়। বিশেষ করে নাজাশির নিকট শান্তি ও নিরাপত্তার সঙ্গে দিনাতিপাত করার পর কুরাইশের এই অত্যাচার ও কঠোরতা বরদাশত করা সত্যিই কঠিন ছিল। ফলে আরেকবার নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট তারা হাবশায় হিজরতের অনুমতি চান। তিনি সাহাবিদের সানন্দেই অনুমতি প্রদান করেন।

সাবেক মুহাজিরদের সাথে এবারের কাফেলায় আরো মুসলমান যুক্ত হয়। এবার হিজরত করেছিলেন ৮৮ জন পুরুষ এবং ১৯ জন নারী। তাদের মধ্যে আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহ, আবদুল্লাহ বিন মাসউদ, জাফর বিন আবু তালেব, মিকদাদ বিন আসওয়াদ, শুরাহবিল বিন আবদুল্লাহ (শুরাহবিল বিন হাসানা), সাকরান বিন আমর ও তার স্ত্রী সাওদা বিনতে জামআ, উম্মে হাবিবা বিনতে আবি সুফিয়ান, তার স্বামী উবাইদুল্লাহ বিন জাহাশ এই কাফেলায় ছিলেন। হজরত জাফর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে কাফেলার আমির নিযুক্ত করা হয়।[২৬৯]

উপরন্তু প্রথম হিজরতকারী কয়েকজন সাহাবি যেমন: হজরত রুকাইয়া, উসমান বিন আফফান, উসমান বিন মাজউন প্রমুখ দ্বিতীয় কাফেলায় শরিক না হয়ে মক্কার কাফেরদের জুলুম-নির্যাতন সহ্য করেছিলেন।[২৭০]

২৬৯. আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া- ৪/১৬৯

কিছু কিছু বর্ণনায় মুহাজিরদের মধ্যে হজরত জুবাইর, আবদুল্লাহ বিন মাসউদ, আবু সালামা এবং তার স্ত্রী উম্মে সালামা রা. এর নাম উল্লেখ করা হয় না, বরং তারা প্রথমবার হিজরতে শামিল ছিলেন। অথচ সহিহ সনদে বর্ণিত আছে, উল্লিখিত সবাই দ্বিতীয় ৮০ জনের কাফেলায় শামিল ছিলেন এবং তাদের আমির ছিলেন জাফর রা.। আবদুল্লাহ বিন মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসুলুল্লাহ সা আমাদেরকে নাজাশির নিকট পাঠিয়েছেন, আমরা ছিলাম প্রায় আশি জন লোক। তন্মধ্যে আবদুল্লাহ বিন মাসউদ, জাফর... ।' [মুসনাদ আহমাদ- ৪৪০০]

হাবশা পৌঁছার পর নাজাশির দরবারে জাফর রা. এর বক্তব্য বর্ণিত আছে। উম্মে সালামা রা. এর বর্ণনাও গভীরভাবে চিন্তা করার বিষয়। তার বর্ণনায় তিনি জাফর রা. এর বক্তব্য দিয়েই শুরু এবং কুরাইশ প্রতিনিধির ব্যর্থতার কথা উল্লেখ করার পর তিনি বলেন, 'এরপর আমরা তার নিকট উত্তম ঘরে উত্তম প্রতিবেশী হিসেবে অবস্থান করেছি।' তারপর নাজাশির দুশমনদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের প্রস্তুতির কথা আলোচনা করতে গিয়ে উম্মে সালামা রা. হজরত জুবাইর রা. এর দুঃসাহসিকতার ঘটনা শোনান। [মুসনাদ আহমাদ- ২২৪৯৮, সনদ হাসান]

২৭০. আলইসতিয়াব, আলইসাবাহ, উসদুল গাবা, মারিফাতুস সাহাবাহ পড়ুন তাদের==

নাজাশির দরবারে কুরাইশের প্রতিনিধিদল

(সপ্তম নববিবর্ষের শুরুতে)

কুরাইশরা যখন জানতে পারে মুসলমানরা হাবশায় গিয়ে নিরাপদ ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে বসবাস করছে, তখন তাদের খুব গোসসা হয়। তারা আমর বিন আস এবং আবদুল্লাহ বিন আবু রবিয়াকে দূত হিসেবে হাবশার বাদশাহ নাজাশির নিকট এ দাবি দিয়ে প্রেরণ করে যে, এ লোকগুলো বিধর্মী এবং বিশৃঙ্খলাকারী। তাদেরকে আপনার দেশে থাকার অনুমতি না দিয়ে আমাদের হস্তান্তর করুন।

নাজাশি একজন বুদ্ধিমান এবং ইনসাফপ্রিয় বাদশাহ ছিলেন। তিনি একপক্ষের অভিযোগ শুনেই কোনো ফয়সালা না দিয়ে মুসলমানদের আত্মপক্ষ সমর্থন করার সুযোগ দেন এবং তাদের আপত্তির জবাব তলব করেন। তখন হজরত জাফর বিন আবু তালেব রাদিয়াল্লাহু আনহু মুসলমানদের প্রতিনিধিত্ব করে বিদেশের মাটিতে অত্যন্ত চমৎকার এবং হৃদয়গ্রাহী ভাষায় ইসলামের পরিচয় তুলে ধরেন। তিনি বলেন, 'হে বাদশাহ, আমরা ইতিপূর্বে মূর্খ ছিলাম, মূর্তিপূজক ছিলাম, মৃত প্রাণীর গোশত খেতাম, পাপাচার, চরিত্রহীনতা, আত্মীয়স্বজনের সাথে দুর্ব্যবহারে আমরা অভ্যস্ত ছিলাম। আমাদের মধ্যে যারা সবল ছিল, তারা দুর্বলদের গ্রাস করত।

'এমন পরিস্থিতিতে আমাদের মাঝে আল্লাহ তায়ালা একজন রাসুল প্রেরণ করেছেন, যিনি আমাদেরই বংশের। আমরা তার বংশধারা, সত্যবাদিতা, আমানতদারি, আভিজাত্য, চরিত্র সম্পর্কে ভালো করেই অবগত। তিনি আমাদেরকে দাওয়াত দেন যে, আল্লাহকে এক মানো। তার সঙ্গে কাউকে শরিক করো না। আত্মীয়স্বজনের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখো। প্রতিবেশীদের সঙ্গে সুন্দর ব্যবহার করো।

তিনি আমাদের হারাম কাজ থেকে নিষেধ করেছেন। রক্তপাত করা, মিথ্যা বলা, এতিমের সম্পদ আত্মসাৎ করা থেকে আমাদের বারণ করেছেন। আমরা যখন তার এই দাওয়াত শুনতে পেলাম, তার উপর ঈমান আনলাম। তার নির্দেশিত কথার উপর আমল করার কারণে আমাদের কওম আমাদের পিছু লেগে যায়।

==সে সময়কার অবস্থা জানার জন্য। তাদের রেওয়ায়েতগুলোতে দৃষ্টি বুলালে জানা যায়, তারা দ্বিতীয়বার হাবশা যাননি, বরং কয়েক বছর পর নবীজির নির্দেশে মক্কা থেকে মদিনাতে হিজরত করেন। আর ৭ম হিজরিতে হাবশার মুহাজিররাও মদিনায় চলে আসেন।

আমাদের উপর পাহাড় পরিমাণ নির্যাতন-নিপীড়ন চালায়। আমরা নিরুপায় হয়ে এই আশা নিয়ে আপনার দেশে এসেছি যে, অন্তত এখানে আমাদের উপর জুলুম হবে না।'

নাজাশি তার বক্তব্য শুনে বললেন, 'তোমাদের নবীর আনীত কিছু বিষয় আমাকে শোনাও।'

তখন জাফর রাদিয়াল্লাহু আনহু সুরা মারিয়ামের প্রথম কয়েকটি আয়াত তেলাওয়াত করে শোনান। নাজাশি এবং দরবারে উপস্থিত পাদরিরা তেলাওয়াত শুনে এ পরিমাণ কাঁদেন যে, তাদের দাড়ি ভিজে যায়।

নাজাশি বলেন, 'এই কালাম এবং মুসা আলাইহিস সালামের আনীত কালাম একই জায়গা থেকে উৎসারিত।' এরপর তিনি কুরাইশ দূতদের সম্বোধন করে বলেন, 'তোমরা চলে যাও। তাদেরকে আমি কিছুতেই তোমাদের হাতে তুলে দেব না।'

নাজাশির উত্তর শুনে কুরাইশরা অনেক লজ্জিত হয়। পরদিন তারা নতুন অভিযোগ নিয়ে রাজদরবারে উপস্থিত হয়। বলে, 'এরা ঈসা বিন মারিয়ামের ব্যাপারে অনেক বেয়াদবিমূলক কথা বলে। ঈসা আলাইহিস সালামকে একজন সাধারণ বান্দা হিসাবে মানে।'

কুরাইশ দূতরা মনে করেছিল নাজাশি যেহেতু খ্রিষ্টান, তাই এই অভিযোগ শুনে তিনি ক্ষুব্ধ হবেন এবং মুসলমানদের হত্যার নির্দেশ দেবেন। কিন্তু নাজাশি তদন্ত ছাড়া কোনো ফয়সালা দিতে নারাজি প্রকাশ করেন। মুসলমানদেরকে দ্বিতীয়বার দরবারে ডেকে পাঠান। তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন, তোমরা হজরত ঈসা বিন মারিয়াম আলাইহিস সালাম সম্পর্কে কী বলো?'

হজরত জাফর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, 'আমরা তা-ই বলি, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে যা বলেছেন। তিনি (ঈসা) আল্লাহর বান্দা এবং তার রাসুল ছিলেন। আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রদত্ত রুহের ধারক ছিলেন। তিনি ছিলেন আল্লাহর এমন হুকুম, যা কুমারী মারিয়াম রাদিয়াল্লাহু আনহার মাধ্যমে অস্তিত্ব লাভ করেছে।'

নাজাশি এটা শুনে দাঁড়িয়ে গিয়ে বললেন, হজরত ঈসা আলাইহিস সালাম নিজের সম্পর্কে এর থেকে বেশি একটুও বলেননি।'

এভাবে কুরাইশ প্রতিনিধি ব্যর্থ হয়ে ফিরে যায়। অপরদিকে মুহাজিররা হাবশায় নিরাপত্তার সঙ্গে দিনাতিপাত করতে থাকেন।[২৭১]

---

২৭১. মুসনাদ আহমাদ- ২২৪৯৮ (সনদ হাসান), সিরাতে ইবনে হিশাম- ১/৩৩৪-৩৩৮

নাজাশির সাহায্যের জন্য মুসলমানদের ভাবনা এবং প্রস্তুতি

কিছুদিন পর নাজাশির বিরুদ্ধে একজন দুশমন মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। তাকে দমন করার জন্য নাজাশিকে নীলনদের পাড়ে যেতে হয়। সাহাবায়ে কেরাম তখন অনুভব করেন, এখনই কৃতজ্ঞতার প্রমাণ দেওয়ার মোক্ষম সময়। তারা সিদ্ধান্ত নেন-সবার পক্ষ থেকে একজন গিয়ে নদীর তীরে যুদ্ধের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করবে এবং প্রয়োজনে যুদ্ধেও অংশগ্রহণ করবে।

হজরত জুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন সবচেয়ে কমবয়সি মুহাজির। তিনি এই কাজের জন্য নিজের নাম প্রস্তাব করেন। সম্মতি লাভের পর তিনি মশকে পানি ভরে তার উপর ভর করে সাঁতার কেটে নদী পার হয়ে রণাঙ্গনে পৌঁছে যান। ওদিকে সাহাবায়ে কেরাম নাজাশির বিজয়ের জন্য দোয়া করতে থাকেন। হজরত জুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু খুব দ্রুতই সংবাদ পাঠান যে, আল্লাহ তায়ালা বিজয় দান করেছেন। সাহাবায়ে কেরাম এতে দারুণ খুশি হন।[২৭২]

হাবশার মুহাজিরদের প্রত্যাবর্তনের সময়কাল

হাবশায় হিজরতকারীদের মধ্যে জুবাইর ইবনুল আওয়াম,[২৭৩] আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহ,[২৭৪] আবু সালামা, উম্মে সালামা,[২৭৫] সাকরান বিন আমর, সাওদা[২৭৬]

---

২৭২. মুসনাদ আহমাদ- ২২৪৯৮

২৭৩. 'জুবাইর হাবশায় হিজরতে দু'বারই শরিক ছিলেন।' 'জুবাইর যখন মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত করেন, তখন তিনি মুনজির বিন মুহাম্মদের নিকট অবস্থান করেন।' [তাবাকাতে ইবনে সাদ- ৩/৭৫]
সম্ভবত হজরত জুবাইর রা. মক্কা থেকে মদিনা হিজরতকারী প্রথম দলের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তারা ১২ নববি-বর্ষে মক্কা থেকে রওনা হন। এই কাফেলায় হজরত মুসআব বিন উমাইর, আবদুল্লাহ বিন উম্মে মাকতুমও ছিলেন। কারণ, তিনি নবীজি সা এর হিজরতের পূর্বেই মদিনাতে ব্যবসা-বাণিজ্য আরম্ভ করে দিয়েছিলেন। ব্যবসার উদ্দেশ্যে তিনি শামেও আসা-যাওয়া করতেন। আর শাম থেকে প্রত্যাবর্তনের সময়ই মদিনার কোনো এলাকায় নবীজির সঙ্গে তার মোলাকাত হয়। [সহিহ বুখারি- ৩৯০৬-কিতাবুল মানাকিব, বাবু হিজরাতিন নাবী সা.]

২৭৪. হাবশায় দ্বিতীয় হিজরতে শামিল ছিলেন। [তাবাকাতে ইবনে সাদ- ৩/৪০৯]
অন্যান্য সাহাবির সঙ্গে তিনিও মদিনায় হিজরত করেন। [তাবাকাতে ইবনে সাদ- ৩/৪১০]
গাজওয়ায়ে বদরে তার অংশগ্রহণের ঘটনা অনেক প্রসিদ্ধ। [আলইসতিয়াব: ৪/১৭১০]
এর থেকে পরিষ্কার বুঝা যাচ্ছে, তিনি হাবশায় কিছুদিন থেকে মক্কায় ফিরে এসেছিলেন।

২৭৫. উম্মে সালামা রা. নিজেই তার প্রত্যাবর্তনের ঘটনা বর্ণনা করেন, 'আমরা নাজাশির কাছে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে জীবনযাপন করি, এরপর আমরা মক্কায় নবীজির নিকট ফিরে আসি।' [মুসনাদ আহমাদ- ২২৪৯৮]

২৭৬. সাউদা বিনতে জামআ রা. তার স্বামী সাকরান বিন আমরের সঙ্গে মদিনায় হিজরতের পূর্বে হাবশা থেকে মক্কা এসেছিলেন। মক্কাতেই স্বামীর ওফাত হয়। [আলইসতিয়াব: ২/৬৮৫, ৬৮৭] এরপর নবীজি সা ১০ নববি-বর্ষের রমজানে তাঁকে বিবাহ করেন।==

বিনতে জামআ-সহ অনেকেই নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মদিনায় হিজরতের পূর্বেই মক্কায় প্রত্যাবর্তন করেন।

অনেকেই মদিনায় হিজরতের পূর্বপর্যন্ত হাবশাতেই অবস্থান করেন। সেখানে একটি নিরাপদ ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে যখন পর্যাপ্ত তথ্য পান, তখন সঙ্গে সঙ্গে তারা মদিনায় চলে আসেন। যেমন হজরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু।[২৭৭]

==গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ

মুহাম্মদ বিন ইসহাক হাবশা থেকে মক্কায় ফিরে আসা মুহাজিরদের সংখ্যা ৩৩ জন উল্লেখ করে তাদের নামের তালিকা তুলে ধরেছেন। বাহ্যিকভাবে এই তালিকা দেখলে মনে হবে এটা প্রথম হাবশা হিজরতকারীদের থেকে প্রত্যাবর্তনকারী মুহাজিরদের তালিকা। কিন্তু এটা কিছুতেই সম্ভব নয়। কারণ, প্রথম মুহাজির ছিলেন সর্বোচ্চ ১৫ কি ১৬জন। তাই তালিকাটি ১ম ও ২য় হিজরতে অংশগ্রহণকারীদের মধ্য থেকে প্রত্যাবর্তনকারী মুহাজিরদের সামষ্টিক তালিকা। এই তালিকায় যারা কেবল প্রথম কিংবা দ্বিতীয় হিজরতে শামিল ছিলেন, তাদের নামও ছিল। (কেউ কেউ মনে করেন, এই তালিকা কেবল উভয় হিজরতে শামিল লোকদের, আবার কেউ মনে করেন প্রথম হিজরতে শামিল ব্যক্তিদের মধ্য থেকে মক্কা প্রত্যাবর্তনকারীদের নামের তালিকা; কিন্তু এটা ভুল ধারণা।) যেমন- হজরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ ২য় হিজরতে শামিল ছিলেন, হজরত জুবাইর বিন আওয়াম, উম্মে সালামা, আবু সালামা ১ম-২য় উভয় হিজরতে শামিল ছিলেন। আয়েশা রা. এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী নবীজির হিজরতের পূর্বেই হাবশার মুহাজিরদের এক বড় সংখ্যা তার মদিনা হিজরতের সংবাদ অবগত হওয়ার পর তারা সোজা হাবশা থেকে মদিনায় চলে যান।

رجع عامة من كان هاجر بأرض الحبشة إلى المدينة، وتجهز أبو بكر إلى المدينة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على رِسْلِك

হাবশায় যারা হিজরত করেছিলেন, তাদের অনেকেই মদিনায় হিজরত করেন। হজরত আবু বকর সিদ্দিক রা.-ও মদিনায় হিজরতের জন্য প্রস্তুতি নেন। তখন রাসুলুল্লাহ সা তাঁকে বললেন, অপেক্ষা করুন।' [সহিহ বুখারি- ৩৯০৫]

২৭৭. আবদুল্লাহ বিন মাসউদ রা. ২ হিজরিতে গাজওয়ায়ে বদরের কিছুদিন পূর্বে মদিনায় পৌছেন। হাদিসের কিতাবগুলোতে এভাবে তার বর্ণনা এসেছে যে, 'তারপর আবদুল্লাহ বিন মাসউদ তড়িঘড়ি মদিনায় পৌছলে গাজওয়ায়ে বদরে অংশগ্রহণ করতে সক্ষম হন।' [মুসনাদ আহমাদ- ৪৪০০, মাজমাউয যাওয়াইদ: ৯৮৪১]

আরেক রেওয়ায়েত দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যায় আবদুল্লাহ বিন মাসউদ রা. হাবশা থেকে মদিনায় ঐসময় ফিরে আসেন, যখন নামাজে কথা বলা নিষিদ্ধ হয়ে যায়।

তিনি নবীজিকে নামাজ পড়া অবস্থায় সালাম দিলে, উত্তর না পেয়ে পেরেশান হয়ে গিয়েছিলেন।' [সুনান নাসায়ি- ১২২১, আলবানি রহ. বলেছেন, হাসানুন সহিহ]

অগ্রগণ্য মত অনুযায়ী কথা নিষিদ্ধ হওয়ার এই বিধান মদিনায় অবতীর্ণ হয়। কারণ, নামাজ ফরজ হয়েছে হাবশার দ্বিতীয় হিজরতের তিন চার বছর পরে মেরাজে। এরপর নামাজের বিধানের মধ্যে ধীরে ধীরে উন্নতি লাভ করে মদিনায় পূর্ণতা পায়।

হজরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ হাবশায় দ্বিতীয়বারের হিজরত থেকে মদিনায় ফিরে আসেন (মক্কায় নয়)। তার ভাষায়: 'আমরা নবীজিকে হাবশার ভূমিতে আসার পূর্বে মক্কা==

অনেকে আবার প্রায় দশ বছর সেখানে অবস্থান করেন। সেখানেই তাদের সন্তানরা লালিত-পালিত হচ্ছিল। তারা এক-দুজন করে মদিনায় আসতে থাকেন। যেমন: উম্মে হাবিবা রাদিয়াল্লাহু আনহা ৬ হিজরিতে শুরাহবিল বিন হাসানা রাদিয়াল্লাহু আনহুর সঙ্গে মদিনায় চলে আসেন।[২৭৮] সর্বশেষ আবদুল্লাহ বিন জাফর তার স্ত্রী আসমা বিনতে উমাইস এবং অন্যান্য মুহাজিরকে নিয়ে খাইবারযুদ্ধ চলাকালে মদিনায় আগমন করেন।[২৭৯]

হাবশায় হিজরতের প্রভাব-প্রতিক্রিয়া

বাহ্যত হাবশায় আশ্রয়প্রার্থী হয়ে মুসলমানদের গমন যদিও বিদেশি শরণার্থীদের মতো মনে হয়; কিন্তু বাস্তবে তার সুদূরপ্রসারী প্রভাব রয়েছে। কারণ, ইসলাম তার শুরুর ধাপেই এশিয়া থেকে বের হয়ে আফ্রিকায় পৌঁছে গিয়েছিল। মুসলমানদের নীরবতার কারণে তৎকালীন পৃথিবীর বড় পরাশক্তিগুলোরও তাদের এই স্থানপরিবর্তনের প্রভাব-প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে অনুমান করা সম্ভব ছিল না।

হজরত জাফর বিন আবু তালেব রাদিয়াল্লাহু আনহুসহ অনেক সাহাবি বছরের পর বছর আফ্রিকার এমন অশিক্ষিত, অনুন্নত দেশে পড়ে থাকেন। তারা এখানে পূর্ণ নীরবতার সঙ্গেই কাটান। এই মুষ্টিমেয় মুসলমানরা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন তারা হাবশায় ইসলামের প্রচারের জন্য আসেননি, বরং আশ্রয়ের জন্য এসেছেন। সম্ভবত এ কারণেই হাদিস ও সিরাতের ভাণ্ডারে এখানে দাওয়াত ও তাবলিগের কর্মতৎপরতার কোনো উল্লেখ নেই। হতে পারে তারা গোপনে গোপনে ব্যক্তিকেন্দ্রিক কাজ করেছেন।

কিন্তু আফ্রিকা থেকে কোনো নওমুসলিম কাফেলা মক্কা-মদিনায় দেখা যায়নি। এর থেকে অনুমান করা যায়, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশনার আলোকে আরবের তৎকালীন প্রতিকূল পরিস্থিতি বিবেচনায় প্রজ্ঞার দাবিও এটা ছিল যে, হাবশার মুহাজিরদের কোনো কর্মকাণ্ডের দ্বারা এই শান্তি-নিরাপত্তা হুমকির মুখে না ফেলা, স্থানীয় সরকার এবং পাদরিদের কোনো ভুল বোঝাবুঝি ও ক্রোধের শিকার না হওয়া। যথাসম্ভব সরকারের অফাদারি ও বিশ্বস্ততার প্রমাণ দিয়ে জীবনযাপন করাই ছিল অধিক যুক্তিযুক্ত।

হাবশার মুহাজিরদের এমন নিরাপদ ও শৃঙ্খলিত জীবনপদ্ধতিরও প্রভাব ছিল। সেখানকার অধিবাসীরা নিশ্চিত তাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। কারণ, পরবর্তীতে হাবশার শাসক ইসলামের শিক্ষা, মুসলমানদের আচার-ব্যবহার

==থাকাকালে (নামাজে) সালাম দিতাম।' [মুসনাদ আহমাদ- ৩৫৭৫]

২৭৮. সিয়ারু আলামিন নুবালা- ২/২২০, ২২১

২৭৯. সহিহ বুখারি- ৪২৩০ (বাবু গাজওয়াতি খায়বার)

ও কর্মতৎপরতা এবং নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মোবারক জিন্দেগির প্রতিচ্ছবি দেখে তিনি অত্যন্ত মুগ্ধ হন এবং ইসলামের শীতল ছায়ায় আশ্রয় নেন।

প্রথম যুগে আফ্রিকাতে যদিও এশিয়ার মতো ইসলামের তেমন বিস্তার ঘটেনি; তবে হজরত উসমান, জাফর বিন আবু তালেব, আবদুল্লাহ বিন মাসউদ, রুকাইয়া, উম্মে সালামা, উম্মে হাবিবা প্রমুখ সাহাবির মতো ঈমানদার ব্যক্তির পদধূলিতে ধন্য ছিল। যার ফলে এই অঞ্চলটি পৃথিবীর মানচিত্রে ইসলামের অনেক বড় ঘাঁটিতে পরিণত হয়। আজও আফ্রিকার বিভিন্ন অঞ্চলে মুসলমানদের সংখ্যা বেশি। এজন্যই পশ্চিমারা আফ্রিকাকে 'মুসলিম মহাদেশ' বলে আখ্যা দিয়ে থাকে।

হাবশা হিজরতের শিক্ষা

হাবশা হিজরতের উপর গভীরভাবে দৃষ্টিপাত করলে এই শিক্ষা পাওয়া যায় যে, মুসলমানরা যখন পৃথিবীর কোথাও নিরীহ ও নির্যাতিত হবে এবং ইসলামের দুশমনদের দ্বারা অবরুদ্ধ হবে, তখন তাদেরকেও এমন একটি নিরাপদ আশ্রয় খুঁজে নেওয়া আবশ্যক, যেন তারা নিজেদের জীবন-যোগ্যতা বাঁচিয়ে ভবিষ্যতের বিভিন্ন ফলপ্রসূ কর্মযজ্ঞে নিয়োজিত হতে পারে।

এই শিক্ষাও পাওয়া যায় যে, মুসলমানরা যদি কোনো অমুসলিম দেশে শান্তি ও নিরাপত্তা, ন্যায়-ইনসাফের ছায়ায় জীবনযাপন করতে পারে, তা হলে সেখানে এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি করা থেকে বেঁচে থাকবে, যা অযথা মানুষের মধ্যে ক্ষোভ এবং ভুল বোঝাবুঝির উদ্রেগ করবে। ব্যক্তিগত সমস্যা, রাষ্ট্রীয় অবস্থা, বৈশ্বিক পরিস্থিতির দিকে লক্ষ রেখে পরিপূর্ণ সতর্কতা, প্রজ্ঞা এবং চিন্তাফিকিরের সঙ্গে দাওয়াতি কার্যক্রমে ধীরস্থিরতার সাথে অগ্রসর হতে হবে। আর অমুসলিমদের ইসলামের দাওয়াত দেওয়ার জন্য উপযুক্ত সময়ের অপেক্ষা করা জরুরি।

সামাজিক বয়কট

(মহররম, অষ্টম নববিবর্ষ)

হাবশায় মুসলমানদের একটি নিরাপদ আশ্রয় লাভ করা এবং হজরত হামজা ও উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমার মতো সাহসী ব্যক্তিদের ইসলাম গ্রহণ করাতে কুরাইশ যদিও তাৎক্ষণিক বিচলিত হয়ে যায়; কিন্তু পরক্ষণেই তাদের মধ্যে পূর্বের প্রতিশোধস্পৃহা জেগে ওঠে। তারা ইসলামকে চিরতরে মিটিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হত্যা করে তাদের হীন উদ্দেশ্য সফল করতে চায়।

আবু তালেব যখন কুরাইশের এই ঘৃণ্য চক্রান্ত সম্পর্কে অবগত হন, তখন তৎক্ষণাৎ বনু হাশিমকে একত্রিত করে তাদেরকে নির্দেশনা দেন যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যেন অনতিবিলম্বে কোনো নিরাপদ জায়গায় সরিয়ে নেওয়া হয় এবং কেউ যেন তার কোনো ক্ষতি করতে না পারে সেজন্য কড়া প্রহরার ব্যবস্থা করা হয়।

কুরাইশদের এই আশঙ্কা ছিল যে, তাদের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের পথে সবচেয়ে বড় বাধা হবে বনু হাশিম। ফলে তারা বনু হাশিমের সাথে সামাজিক এবং পারিবারিক সবধরনের সম্পর্ক ছিন্ন করার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতিরক্ষা-দায়িত্ব পরিত্যাগ করার জন্য বনু হাশিমকে তারা বাধ্য করে। তারা সকলে মিলে একটি চুক্তিপত্র লেখে, যার সারকথা ছিল 'বনু হাশিমের সঙ্গে বিবাহ এবং যেকোনো ধরনের আত্মীয়তার সম্পর্ক রাখা যাবে না। তাদের সাথে লেনদেন করা যাবে না।'

চুক্তিনামার দৃঢ়তার জন্য কাবা শরিফে তা ঝুলিয়ে দেওয়া হয়।[২৮০] রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বয়স ছিল তখন ৪৮ বছর।

শা'বে আবু তালেবে সীমাহীন কষ্ট-দুর্দশা

বৃদ্ধ আবু তালেব হাশিম পরিবারগুলোকে সঙ্গে নিয়ে মক্কার ঐসব পাহাড়ি ঘাঁটিতে অবস্থান করা শুরু করেন, যেগুলো তাদের বংশীয় সম্পত্তি ছিল। তাকে

২৮০. আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া- ৪/২০৭-২১৬, ২৩৬-২৩৯

মুহাম্মদ বিন ইসহাক এবং ওয়াকিদির বর্ণনা অনুযায়ী এটি মহররম ৭ম নববি-বর্ষের ঘটনা। [তাবাকাতে ইবনে সাদ- ১/২০৯]

অন্যদিকে আল্লামা ইবনুল জাওযি রহ. এটাকে ৮ম নববি-বর্ষের ঘটনার অধীনে উল্লেখ করেছেন। [আলমুনতাযাম- ২/৩৮৮]

'শে'বে বনু হাশিম' বলা হয়।[২৮১] অবরুদ্ধ লোকদের মধ্যে নারী এবং নিষ্পাপ শিশুরাও ছিল। তাদের মধ্যে যারা ইসলাম গ্রহণ করেছিল, তারা ঈমানি স্পৃহায় আর যারা ইসলাম গ্রহণ করেনি, তারা বংশীয় সম্মান-গৌরবের খাতিরে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে ছিল। কেবল আবু লাহাব তাদের সঙ্গ দেয়নি; বরং ইসলামের প্রতি তার বৈরিতা আরো বৃদ্ধি করে দিয়ে বনু হাশিমের সাথে রয়ে যায়।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্ত্রী খাদিজা এবং সন্তানদের নিয়ে ঘাঁটিতে বসবাস শুরু করেন। চাচা হামজা রাদিয়াল্লাহু আনহু তার দেহরক্ষী ছিলেন।[২৮২] হজরত আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুও সেখানে ছিলেন। আর সেই ঘাঁটিতেই আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু জন্মগ্রহণ করেন।[২৮৩]

বনু হাশিম পানাহারের যাবতীয় সামগ্রী সাথে নিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু কয়েক সপ্তাহে সব ফুরিয়ে যায়। অভাব-অনটন শুরু হয়ে যায়। নিষ্পাপ শিশুদের ক্ষুধাজনিত চিৎকারের আওয়াজ বহুদূর থেকে শোনা যেত। কুরাইশের এই সামাজিক বয়কট এতই কঠোর ছিল যে, বনু হাশিমকে মক্কার হাট-বাজারে যাওয়া পর্যন্ত নিষিদ্ধ করে দেয়।

বাইরে থেকে কোনো সওদাগর যদি পণ্য নিয়ে আসতে চাইত, তাদের সব পণ্য কুরাইশরা ক্রয় করে গুদামজাত করত; উদ্দেশ্য ছিল বনু হাশিম যেন কিছুই না পায়। কোনো মুসলমান যদি বনু হাশিমকে কোনো ধরনের সহায়তা ও সহমর্মিতা দেখাতে গিয়ে তরি-তরকারি নিয়ে আসত, কুরাইশ তার থেকেও সবকিছু ছিনিয়ে নিত।

কখনো কখনো এমন হতো যে, একজন গোপনে কিছু খাদ্য পৌঁছে দিতে সক্ষম হতো। যার ফলে অবরুদ্ধ লোকদের কোনোরকম জীবনধারণ করা সহজ হতো। তা ছাড়া অধিকাংশ সময়ই তাদেরকে গাছের পাতা খেয়ে জীবন কাটাতে হয়েছে। শরীরের চামড়াও শুকিয়ে আসছিল।[২৮৪]

অভাবের একটি চিত্র

বনু হাশিম ছাড়াও অনেক মুসলমান এই বন্দিখানায় আটকা পড়েছিল। সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হাশিমি বংশোদ্ভূত বনু জুহরার লোক

২৮১. এ স্থানের প্রাচীন নাম এটি। পরবর্তীতে 'শেবে আবি তালেব' হিসেবে পরিচিত পায়। [সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ- ২/৩৮২]

২৮২. সিরাতে ইবনে হিশাম- ১/৩৫১-৩৫৪

২৮৩. হাকিম নিশাপুরি রহ. বলেন, তিনি 'শেবে আবু তালেবের মধ্যে হিজরতের তিন বছর পূর্বে জন্মগ্রহণ করেন।' [মুসতাদরাক হাকিম- ৬২৭৭]

২৮৪. আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া- ৪/২০৭-২১৬

ছিলেন (অর্থাৎ আবদে মানাফের বংশধর)। তিনিও সেই ঘাঁটিতে বন্দি ছিলেন। অন্যদের সঙ্গে তিনিও এই ভয়াবহ সংকটে পতিত হয়েছিলেন। তিনি বলেন, 'একদিন পেশাব করতে বসলে মাটিতে বাতাসের কারণে পাশেই কিছু নড়ার শব্দ পেলাম। তাকিয়ে দেখি উটের চামড়ার শুকনো টুকরো। আমি সেটা নিয়ে ধুলাম, ঘষলাম, পানিতে ভিজিয়ে পান করলাম। এভাবে তিনদিন কেটে গেল।'[২৮৫]

ব্যস, এই একটি ঘটনা থেকেই অনুমান করা যায় এই ঘাঁটিতে তখন অভাব-অনটনের কী শোচনীয় অবস্থা ছিল!

কাফেররা কেবল হজের মৌসুমে লড়াই করাকে হারাম মনে করত। আর তখনই অবরুদ্ধ মানুষগুলোর কিছুটা স্বাধীনতা মিলত। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই সময়টাকে কাজে লাগান। হাজিদের দাওয়াত দেওয়ার জন্য তিনি বের হতেন। কিন্তু আবু লাহাব তার পিছু ছাড়ত না। তার কথার মধ্যে হইচই করত। এই সময়ে বনু হাশিম ছাড়াও অন্যান্য মুসলিম পরিবারও তাদের ঘরে একরকম অবরুদ্ধ ছিল।[২৮৬]

রোম-পারস্যের লড়াই এবং কুরআনের ভবিষ্যদ্বাণী

সময়টা তখন অষ্টম নববিবর্ষ। এ বছরই রোম-পারস্যের মাঝে এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ হয়। একে রোমান এবং পারস্যের মাঝে চূড়ান্ত লড়াই হিসেবে বিবেচনা করা হয়। মুশরিকরা তো শুরু থেকেই মুসলমানদের নির্যাতন করে দাম্ভিকতায় ভুগছিল। তাদের এই অহংকার এখন আবার বৃদ্ধি পাচ্ছে। কারণ, তারা বিশ্বাসগতভাবে নিজেদেরকে পারসিকদের সঙ্গে এবং মুসলমানদেরকে রোমানদের অধিক সামঞ্জস্যশীল বলে মনে করত। ওরা অহংকারবশত বলতে থাকে যে, যেমনিভাবে আমাদের পারসিক ভাইয়েরা রোমান আহলে কিতাবদের পরাজিত করে নিঃশেষ করে দিয়েছে, তেমনি আমরাও তোমাদের খতম করে দেব।

মুশরিকদের এই আত্মম্ভরিতার জবাবে কুরআন শরিফে সুরা রুমের প্রথম আয়াতগুলো নাজিল হয়। আয়াতে বলা হয়, রোমকরা পরাজিত হওয়ার পরেও কয়েক বছরের মধ্যে তারা পুনরায় বিজয় লাভ করবে।'[২৮৭]

মুশরিকরা ঠাট্টা করতে থাকে, রোমকদের এমন শোচনীয় পরাজয়ের পর পুনরায় তাদের বিজয়ী হওয়া কীভাবে সম্ভব? এর উত্তরে হজরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেন যে, যদি পাঁচ বছরের ভিতর রোমকরা বিজয়ী না

২৮৫. সিরাতে ইবনে ইসহাক- ১/১৯৪, আররাউযুল উনুফ- ৩/২১৬-২১৭

২৮৬. রাহমাতুললিল আলামিন- ১/৯১

২৮৭. তাফসিরে ইবনে কাসির; সুরা রুম, আয়াত ১-৪

হয়, তা হলে তোমরা জিতে গেলে, অন্যথায় নয়। পরাজিতরা বিজয়ীদের কী প্রদান করবে, তাও নির্ধারিত হলো। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এই শর্তারোপের সংবাদ পৌঁছলে, তিনি কুরআনের بِضْعِ سِنِيْنَ শব্দের আলোকে হজরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে পাঁচ বছরের জায়গায় নয় বছর করার পরামর্শ দেন। তখন তিনি তার শর্তের সংশোধনী আনেন। সাত বছর পর কুরআনের ভবিষ্যদ্বাণী সত্য প্রমাণিত হয়। রোমানরা পারসিকদের অত্যন্ত শোচনীয়ভাবে পরাজিত করে।[২৮৮]

২৮৮. সুনান তিরমিজি: ৩১৯৩ (আবওয়াবুত তাফসির), দালাইলুন নুবুওয়াহ- ২/৩৩২, ৩৩৩

ফায়েদা : এই ধরনের শর্তারোপ করা জুয়া। কিন্তু জুয়া হারামের বিধান তখনও নাজিল হয়নি। সাত বছর পর গাজওয়ায়ে বদরের পর (২ হিজরিতে) রোমকরা পারস্যকে অত্যন্ত শোচনীয়ভাবে পরাজিত করে। ফলে কুরআনের সেই ভবিষ্যদ্বাণীও পূর্ণতা পায়। [শারহু মুশকিলিল আছার, তাহাবি, ২৯৮৭, ২৯৮৯]

ফায়েদা : নবীজি সা যখন শেবে আবু তালেবে অবরুদ্ধ তখনই আবু বকর রা. হাবশা হিজরতের অনুমতি গ্রহণ করেছিলেন এবং সেসময়ই তিনি কাফেরদের সঙ্গে শর্তারোপ করেন ও নবীজির পরামর্শে শর্তের মধ্যে সংশোধনী আনেন। এর দ্বারা প্রমাণিত হয়, তিনি বয়কটের আওতার বাইরে ছিলেন এবং নবীজির সঙ্গে প্রতিনিয়ত সাক্ষাৎ করতেন।

হাবশার পথে হজরত আবু বকরের রওনা এবং মাঝপথ থেকেই ফেরত আসা

(নববি ৯ বর্ষ)

বনু হাশিম অবরুদ্ধ হবার পর পরিস্থিতি অত্যন্ত কঠিন হয়ে যায়। মনে হচ্ছিল দুনিয়াতে মুসলমানদের আশ্রয়ের কোনো ঠিকানা নেই। এই অবস্থায় হজরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর মতো এমন পর্বতসম অবিচল মানুষও হাবশায় হিজরত করতে বাধ্য হন।[২৮৯]

এই ঘটনাটি সহিহ বুখারিতে হজরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে এভাবে বর্ণিত হয়েছে, 'যেদিন আমার জ্ঞানবুদ্ধি হয়েছে সেদিন হতেই আমি আমার আব্বা-আম্মাকে দীনের অনুসারী হিসেবেই পেয়েছি। আমাদের এমন কোনো দিন যায়নি, যে দিনড়সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের গৃহে আসেননি।'

মুসলমানরা কঠিন বিপদের সম্মুখীন হলেন। এ সময় হজরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু হাবশা-অভিমুখে যাত্রা করেন। যখন তিনি 'বিরকুল গিমাদ'[২৯০] নামক (মক্কা থেকে পাঁচ মঞ্জিল দূরবর্তী সমুদ্র অভিমুখী) স্থানে এসে পৌঁছলেন, তখন সেখানে 'কারা' গোত্রের সরদার ইবনে দাগিনা তার সাথে সাক্ষাৎ করে।

সে বলল, আবু বকর, আপনি কোথায় যাওয়ার এরাদা করেছেন?

আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, আমার গোত্র আমাকে বের করে দিয়েছে, তাই আমি ইচ্ছা করেছি দেশে দেশে ঘুরে বেড়াব আর আমার প্রতিপালকের ইবাদত করব।

ইবনে দাগিনা বলল, আপনার মতো লোক বেরিয়ে যেতে পারে না এবং আপনার মতো লোককে বহিষ্কার করাও চলে না। কেননা আপনি নিঃস্বকে

---

২৮৯. সিরাতে ইবনে হিশাম- ১/৩৭২

قال ابن إسحاق: وكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه حين ضاقت عليه مكة وأصابه الأذى ورأى من تظاهر قريش على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ما رأى، استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهجرة، فأذن له، فخرج أبوبكر رضي الله عنه مهاجرا، حتى إذا سار من مكة يوما أو يومين لقيه ابن الدغنة

২৯০. বারকুল গিমাদ : লোহিতসাগরের পূর্ব উপকূলে অবস্থিত একটি বন্দর নগরী। মক্কা থেকে প্রায় ৫০০ কিলোমিটার দক্ষিণে অবস্থিত একটি বন্দর। বর্তমানে বিরক নামে প্রসিদ্ধ। মুজামুল মাআজিমিল জুগরাফিয়া ফিস সিরাতিন নাবিবিয়্যা, পৃষ্ঠা ৪২ (অনুবাদক)

সাহায্য করেন। আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করেন। অক্ষমের বোঝা বহন করেন। মেহমানদারি করেন এবং দুর্যোগের সময় মানুষকে সাহায্য করেন। আমি আপনাকে আশ্রয় দিচ্ছি। কাজেই আপনি মক্কায় ফিরে চলুন এবং শহরে গিয়ে আপন প্রতিপালকের ইবাদত করুন।

তারপর আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে সঙ্গে নিয়ে সে ফিরে এল। কাফের কুরাইশদের নেতারা তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করল এবং তাদেরকে বলল, আবু বকর-এর মতো লোক বেরিয়ে যেতে পারে না এবং তার মতো লোককে বহিষ্কার করাও চলে না। আপনারা এমন একজন লোককে বহিষ্কার করতে চান, যে নিঃস্বকে সাহায্য করে, আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করে, অক্ষমের বোঝা বহন করে, মেমহমানকে আপ্যায়ন করে এবং দুর্যোগের সময় মানুষকে সাহায্য করে।'[২৯১]

কুরাইশ ইবনে দাগিনার আশ্রয় প্রদান মেনে নিল এবং তারা আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে নিরাপত্তা দিয়ে আশ্রয়দাতাকে বলল, আপনি তাকে বলে দিন যেন তিনি নিজ বাড়িতে তার প্রতিপালকের ইবাদত করেন। সেখানেই যেন নামাজ আদায় করেন এবং তার যা ইচ্ছা তা যেন পড়েন। এ ব্যাপারে তিনি যেন আমাদেরকে কোনো কষ্ট না দেন এবং তিনি যেন প্রকাশ্যে নামাজ ও তেলাওয়াত না করেন। কেননা, আমরা আশঙ্কা করছি, তিনি (প্রকাশ্যে এসব করে) আমাদের স্ত্রী-পুত্রদের ফেতনায় ফেলে দেবেন।

ইবনে দাগিনা এসব কথা আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বলল। ফলে তিনি শর্তানুযায়ী নিজ বাড়িতেই ইবাদত করতে থাকেন। নিজ বাড়ি ছাড়া অন্য কোথ াও প্রকাশ্যে নামাজ আদায় এবং কুরআন তেলাওয়াত করতেন না।

কিছুদিন পর আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর অন্য এক খেয়াল উদয় হলো। তিনি নিজ ঘরের আঙিনায় একটি মসজিদ বানালেন[২৯২] এবং ঘর থেকে বেরিয়ে সেই মসজিদে নামাজ আদায় এবং তেলাওয়াত করতে লাগলেন। ফলে মুশরিকদের স্ত্রী-পুত্ররা তার কাছে ভিড় জমাতে থাকল। তাদের কাছে তা ভালো লাগত এবং তার প্রতি তারা তাকিয়ে থাকত।

---

২৯১. লক্ষ করে দেখুন, হুবহু এই শব্দগুলোর মাধ্যমেই হজরত খাদিজা রা. প্রথম ওহি নাজিলের পর নবীজিকে (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সান্ত্বনা দিয়েছিলেন।
সেটা তো সনদসহ রেওয়ায়েত বর্ণনার যুগ ছিল না যে, যার বদৌলতে ইবনে দাগিনার কাছে হজরত খাদিজা রা. এর শব্দগুলো পৌঁছাতে পারবে। তাই এটি নিশ্চিত করেই বলা যায় যে, হজরত আবু বকর রা. এর মধ্যে নবীজির (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) চারিত্রিক সৌন্দর্যের প্রতিফলন দেখতে পেয়েই ইবনে দাগিনা কথাগুলো বলেছিল।

২৯২. এটিই ছিল উম্মতে মুহাম্মদির নির্মিত প্রথম মসজিদ। মসজিদে কুবা, মসজিদে নববি থেকেও পাঁচ বছর পূর্বে তা নির্মিত হয়।

আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু আল্লাহর ভয়ে অনেক কাঁদতেন। যখন তিনি কুরআন তেলাওয়াত করতেন, তখন অশ্রু সংবরণ করতে পারতেন না। এসব কারণে কুরাইশের নেতৃস্থানীয় লোকেরা ঘাবড়ে গেল। তারা ইবনে দাগিনাকে ডেকে পাঠাল। সে তাদের কাছে আসার পর তারা তাকে বলল, আমরা তো আবু বকরকে এই শর্তে আশ্রয় ও নিরাপত্তা দিয়েছিলাম যে, তিনি নিজ গৃহে তার প্রতিপালকের ইবাদত করবেন।

কিন্তু তিনি তা লঙ্ঘন করে নিজ গৃহের আঙিনায় মসজিদ বানিয়ে নিয়েছেন এবং (তাতে) প্রকাশ্যে নামাজ আদায় এবং কুরআন তেলাওয়াত করছেন। আমাদের ভয় হচ্ছে, তিনি আমাদের স্ত্রী-পুত্রদের ফেতনায় লিপ্ত করবেন। কাজেই আপনি তাকে বলুন, তিনি যদি নিজ গৃহে তার প্রতিপালকের ইবাদত সীমাবদ্ধ রাখতে চান, তবে তিনি তা করতে পারেন। আর যদি তিনি অস্বীকার করেন এবং প্রকাশ্যে এসব করতে চান তবে আপনি তাকে বলুন, তিনি যেন আপনার জিম্মাদারি ফিরিয়ে দেন। কেননা আমরা যেমন তার সাথে আপনার অঙ্গীকার ভঙ্গ করতে পছন্দ করি না, তেমনি আবু বকরের প্রকাশ্যে ইবাদত করাটাও মেনে নিতে পারি না।

ইবনে দাগিনা হজরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বলল, 'যে শর্তে আমি আপনার জিম্মাদারি নিয়েছিলাম, তা আপনার জানা আছে। হয়তো আপনি সে শর্তের উপর সীমাবদ্ধ থাকবেন, নয়তো আমার জিম্মাদারি আমাকে ফেরত দেবেন। কেননা, কারো সাথে আমার নিরাপত্তার চুক্তি হওয়ার পর আমার পক্ষ হতে তা ভঙ্গ করা হয়েছে, এমন একটা কথা আরবজাতি শুনতে পাক, তা আমি একদম পছন্দ করি না।'

আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, 'আমি আপনার জিম্মাদারি ফেরত দিচ্ছি এবং আল্লাহর আশ্রয়েই আমি সন্তুষ্ট।'[২৯৩]

শে'বে আবু তালেবের বয়কট থেকে মুক্তি

শে'বে আবু তালেবের এই বয়কট প্রায় আড়াই বছর অব্যাহত ছিল। এরপর আল্লাহ তায়ালা কুরাইশ সরদারদের দিল নরম করে দেন। তাদের মধ্যে হিশাম বিন আমর, যুহাইর বিন আবু উমাইয়া এবং মুতইম বিন আদি ছিলেন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি। এই নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা কুরাইশ সরদারদের লজ্জা দিয়ে ঐ চুক্তিনামা

---

২৯৩. সহিহ বুখারি (কিতাবুল হাওয়ালাত, বাবু জিওয়ারি আবি বাকরিন ফি আহদিন নাবিয়্যি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওয়া আকদিহি)

বর্জন করেন। এভাবেই ঐ নিষ্ঠুর বয়কটের সমাপ্তি হয়। বনু হাশিম এমন নির্মম ঘাঁটি থেকে মুক্তি পায়।[২৯৪]

হজরত খাদিজার ইনতেকাল

শা'বে আবু তালেবের কষ্ট ও নির্দয়তা ৮৫ বছর বয়সি আবু তালেবের স্বাস্থ্যের উপর অনেক প্রভাব ফেলে। এর ফলে তিনি শয্যাশায়ী হয়ে পড়েন। অনুরূপ নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রিয়তমা স্ত্রী হজরত খাদিজার বয়সও পয়ষট্টি হয়ে গিয়েছিল। এই দীর্ঘ কষ্ট-যাতনা তাকে মৃতপ্রায় করে দিয়েছিল। বয়কট থেকে মুক্তি পাওয়ার কিছুদিন পরই তার ইনতেকাল হয়ে যায়। সময়টা ছিল তখন ১০ রমজান নববি ১০ম বর্ষ।

---

২৯৪. আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া- ৪/২৩৬-২৩৯

ফায়দা : ১। ওয়াকিদি, ইবনে ইসহাকের মত অনুযায়ী এই বয়কট ৭ নববি-বর্ষের মহররমে শুরু হয়ে তিন বছর (তথা ১০ম বর্ষের মহররম) পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। অন্যদিকে উবাইদুল্লাহ বিন মুসার মত অনুযায়ী দু'বছর পর্যন্ত চলে। [তাবাকাতে ইবনে সাদ- ১/২০৯, ২১০]

ইবনুল জাওযি রা. আলমুনতাযাম গ্রন্থে ঐ বয়কটের সূচনা ৮ম নববি-বর্ষের ঘটনাতে উল্লেখ করেছেন। ইবনুল জাওযির মতই অগ্রগণ্য বলে মনে হয়। কারণ, তার মত অনুযায়ী অন্যান্য বক্তব্যের সাথে সামঞ্জস্য দেওয়া সম্ভব। অর্থাৎ এভাবে বলা যাবে যে, ৮ম নববি-বর্ষের মহররমে আরম্ভ হয়ে ১০ম বর্ষের মহররমের মাঝেই তা অব্যাহত থাকে। তাবাকাতে ইবনে সাদের ইবারত [১/২১০]- «وكان خروجهم من الشعب في السنة العاشرة»-এদিকেই ইঙ্গিত করে যে, দশম বছরের কোনো এক মাসে তা হয়। তবে সেই মাসটি নির্দিষ্টীকরণ এভাবে হতে পারে যে, ঘাঁটি থেকে বের হওয়ার ছ'মাস পর আবু তালেবের মৃত্যু হয়। [আলমুহাব্বার- পৃষ্ঠা ১১]

অধিকাংশ ঐতিহাসিকের মত হলো, তার ওফাত ১৫ শাওয়াল হয়েছে। যদি ছ'মাস দ্বারা পূর্ণ ছ'মাস উদ্দেশ্য হয়, তা হলে বয়কট ১৫ রবিউল আখির মাসে সমাপ্ত হওয়া প্রমাণিত হয়। এতে করে বয়কটের সময়কাল দু'বছর তিন মাস হয়। এটাকেই কিছু ঐতিহাসিক তিন বছর এবং কিছু ঐতিহাসিক তিন বছর পূর্ণ না হওয়ায় দু'বছর বলেছেন (আল্লাহ তায়ালাই সর্বাধিক অবগত)।

ফায়দা : ২। মক্কি-মাদানি ক্যালেন্ডার অনুযায়ী ৭ম নববি-বর্ষ এবং ৮ম নববি-বর্ষ একই থাকবে। উভয় ক্যালেন্ডারে বয়কট শুরু-সমাপ্তির বছর এক। [তাকউয়িমে আহদে নববি, আলি মুহাম্মদ খান]

ফায়দা : ৩। কিছু কিছু বর্ণনায় চুক্তিনামা সমাপ্ত হওয়ার কারণ উল্লেখ করা হয় যে, চুক্তিপত্রে উইপোকা ধরে এবং আল্লাহর নাম ছাড়া তার সবকিছু মুছে যায়।' [সিরাতে ইবনে হিশাম- ১/৩৭৭] এই যয়িফ রেওয়ায়েতগুলো বাদ দিলেও, বংশীয় রীতিনীতি এবং চারিত্রিক দৃষ্টিকোণ থেকেও আরবদের মধ্যে যদি চুক্তিনামা নষ্ট হয়ে যেত, তখন চুক্তিও বাতিল বলে গণ্য হতো। উপরন্তু এটুকু তো বলা যায় যে, চুক্তিপত্রে উইপোকা পড়ে যাওয়া বয়কট সমাপ্তিকে আরো জোরালো করে। তবে মূল কারণ তো ছিল চুক্তিসম্পন্নকারী লোকেরা নিজেরাই লজ্জিত হয় এবং কিছু বুদ্ধিমান লোকের অভিশাপ ও তিরস্কারের কারণে তাদের বোধোদয় হয়েছিল যে, তারা একটি অমানবিক কাজে জড়িয়ে পড়েছে। এতে করে সমগ্র আরবজাতির কাছে তারা ছোট হয়ে যাচ্ছে।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে 'হাজুন' কবরস্থানে দাফন করেন। তিনি নিজে কবরে নামেন। তখনও জানাজা নামাজের বিধান নাজিল হয়নি।[২৯৫]

হজরত খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহার সঙ্গে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পূর্ণ পঁচিশ বছর দাম্পত্য জীবন অতিবাহিত করেন। তিনি নবীজির প্রতি কদমের, প্রতি মুহূর্তের সহমর্মী হতেন এবং প্রশান্তির পরশ ছড়িয়ে দিতেন।

এমন একজন অদ্বিতীয় জীবনসঙ্গিনীর অন্তর্ধান ও বিয়োগব্যথা নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অনেক বড় ধাক্কা দেয়। তার জীবন প্রায় অসহনীয় করে তোলে।[২৯৬]

---

২৯৫. দালাইলুন নুবুওয়াহ, বাইহাকি- ২/৩৫৩, তাবাকাতে ইবনে সাদ- ৮/১৮

২৯৬.

«لما توفيت خديجة اشتد ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى خُشي عليه حتى تزوج عائشة»

হজরত খাদিজা রা. যখন ইনতেকাল করেন, নবীজির (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তখন অবস্থা আশঙ্কাজনক হয়ে যায়। এরপর তার হজরত আয়েশার সঙ্গে বিয়ে হয়। [মাজমাউয যাওয়ায়িদ : ১৫২৮৮, এই হাদিসের বর্ণনাকারীগণ সহিহ বুখারির রাবি]

হজরত খাদিজার ওফাতের সময় নিয়ে পর্যালোচনা

এটা সর্বজনসিদ্ধ যে, হজরত খাদিজার ইনতেকাল হিজরতের তিন বছর পূর্বে হয়েছে। [সহিহ বুখারি- ৩৮৯৬, বাবু হিজরাতিন নাবিয়্যি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম]

তবে কোন্ মাসে ওফাত হয়েছে, এ নিয়ে মতানৈক্য রয়েছে। অধিকাংশ ঐতিহাসিকের মতে আবু তালেবের ওফাত ১ম নববি-বর্ষের ১৫ শাওয়ালে হয়েছে। [আলমুনতাযাম- ৩/৭] আর হজরত খাদিজার ওফাত তার ৩৫ দিন পূর্বে হয়েছে। [দালাইলুন নুবুওয়াহ, বাইহাকি- ২/৩৫৩] এ হিসাবমতে খাদিজার ইনতেকাল হয়েছে ১০ রমজানে।

দ্রষ্টব্য : সিরাত-লেখকরা যখন অমুক বছর কিংবা অমুক নববি বছর বলেন, তখন সর্বদা তাদের সবার একই উদ্দেশ্য হয় না। কারণ, একশ্রেণির নিকট নবুওয়াতের সূচনা রবিউল আওয়ালে হয়েছে। তারা এই মাস থেকেই ১ম নববি-বর্ষ, দ্বিতীয় নববি-বর্ষ; এভাবে গণনা করেন। আর যারা রমজান মাসকে নবুওয়াতের সূচনার মাস গণ্য করে থাকেন, তারা এ মাস থেকেই বছর গণনা করেন।

তৃতীয় আরেকটি শ্রেণি রবিউল আওয়াল কিংবা রমজান মাসের মতানৈক্য থেকে বাঁচার জন্য মক্কি ক্যালেন্ডার অনুযায়ী মহররম মাস থেকে বছর গণনা করে থাকেন এবং সহজ ও সুবিধার জন্য অধিকাংশ লেখকের রীতি এটিই চলে আসছে। তবে সম্ভবত এর কারণ এটিও হতে পারে যে, হিজরত মক্কি ক্যালেন্ডার মোতাবেক মহররম মাসে হয়েছে। আর এর মাধ্যমেই হিজরতপূর্ব পূর্ণ তেরো বছর নববি-বর্ষ হিসেবে গণনা করা হয়।

তবে এই পদ্ধতির একটি সমস্যা রয়েছে, এর মাধ্যমে নববি-বর্ষের বাস্তবতা বাকি থাকে না। কারণ, কারো নিকটই মহররম মাসে নবুওয়াতের সূচনা হয়নি। তা ছাড়া মহররম থেকে নবুওয়াতের বছর গণনা করার দ্বারা কিছু মাসেও কমবেশি হয়। যেমন- প্রসিদ্ধ মত অনুযায়ী আবু তালেবের ওফাত এবং নবীজির তায়েফ সফর নববি ১০ম বছরের শাওয়াল মাসে বলা হয়ে থাকে। ফলে যাদের নিকট রমজানে নবুওয়াতের সূচনা হয়েছে, তাদের হিসাব মতে দশম বছর শেষ হয়ে ১১তম আরম্ভ হয়ে গেছে।

আর যদি রবিউল আওয়াল মাসে নবুওয়াতের সূচনা ধরা হয়, তা হলে শাওয়াল মাসে==

আবু তালেবের অফাত

হজরত খাদিজার ইনতেকালের পঁয়ত্রিশ দিন পর আবু তালেবও আখেরাতের যাত্রী হন। এটা ছিল নবুওয়াতের এগারোতম বছরের ঘটনা।[২৯৭]

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য এ দিনটি ছিল সীমাহীন দুশ্চিন্তা ও পেরেশানির। তাই পুরো বছরকে 'আমুল হুজ্ন' তথা দুশ্চিন্তার বছর বলা হয়ে থাকে।

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পঁয়তাল্লিশটি বছর আবু তালেবের স্নেহছায়ায় কেটেছে। প্রতিটি কদমে তিনি নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সমর্থন এবং পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন। স্ত্রী ও চাচার মৃত্যুর পর নিজেকে খুব একা অনুভব করতে থাকেন।[২৯৮]

হজরত সাওদা ও হজরত আয়েশার সাথে বিবাহ

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একাকিত্ব জীবনের অবসান ঘটে, যখন সাহাবি সাকরান বিন আমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর বিধবা স্ত্রী সাওদা বিনতে জামআ রাদিয়াল্লাহু আনহার সঙ্গে বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়। এটি ১১তম নববিবর্ষের রমজান মাসের ঘটনা।[২৯৯]

পরবর্তী বছর হজরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমত এবং সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের কথা ভেবে আপন কন্যা হজরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহাকে বিয়ে দেন। এই সময় শুধু বিয়ের আকদ হয়। উঠিয়ে নেওয়া হয় তার তিন বছর পর।[৩০০]

==দশম বর্ষ তখন পর্যন্ত পূর্ণ হয় না, বরং নবম বর্ষ হয়। বছর গণনার ভুল থেকে বাঁচার জন্য কর্তব্য হলো নবুওয়াতের সূচনা প্রকৃত মাস থেকে বছর শুরু ও সমাপ্তিকে সামনে রাখা।

২৯৭. আলমুনতাযাম- ৩/৭, দালাইলুন নুবুওয়াহ, বাইহাকি- ২/৩৫৩

২৯৮. আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া- ৪/৩০৪-৩১৬

২৯৯. তাবাকাতে ইবনে সাদ- ৮/৫৩ (সাওদা রা. জীবনী দ্রষ্টব্য) এ থেকে বুঝা যায় যে, হজরত সাওদার রা. এর বিবাহ রমজানের শেষদিকে হয়েছে। কারণ, ১০ রমজানে খাদিজার ইনতেকাল হয়। এরপর কিছুদিন প্রচণ্ড দুশ্চিন্তায় অতিক্রান্ত হয়। ফলে কিছু সময়ের ব্যবধান অবশ্যই ছিল।

৩০০. এর উপর সবার ঐকমত্য যে, হজরত আয়েশাকে বিয়ের তিন বছর পর শাওয়াল মাসে উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে। কোন্ মাসে উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে, তা নিয়ে মতানৈক্য। কারো মতে ২রা হিজরির শাওয়াল মাসে। [সিয়ারু আলামিন নুবালা- ২/১৩৫]
ইবনে সাদের রেওয়ায়েত মতে হিজরতের আট মাস পর শাওয়াল মাসে হয়েছে। [তাবাকাতে ইবনে সাদ- ৮/৫৮ আয়েশা রা. এর জীবনী দ্রষ্টব্য] এই হিসেবে আকদে নিকাহের প্রকৃত তারিখ অনুযায়ী তাকে উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে ১২ নববি-বর্ষের শাওয়াল মাসে।==

চাঁদ বিদীর্ণ হওয়ার অলৌকিক ঘটনা

এই সময়েই মুশরিকরা নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বেকায়দায় ফেলার জন্য দাবি করে যে, তুমি যদি সত্য নবীই হয়ে থাক, তা হলে এই চাঁদকে কিছু করে দেখাও। আল্লাহ তায়ালা নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতে মুজিজা প্রকাশ করলেন। তার আঙুলের ইশারায় চাঁদ দুই টুকরো হয়ে যায়। কিছুক্ষণ পর টুকরো-হওয়া-চাঁদ পুনরায় জোড়া লেগে যায়। কিন্তু মুশরিকরা তারপরও ফিরে আসেনি। তারা তাকে জাদুকর বলতে থাকে।[৩০১]

==(যেমন মহররম থেকে মহররম পর্যন্ত বছর গণনার ক্ষেত্রে শাওয়াল হয় ১১তম নববি-বর্ষ।) আর এটিই অগ্রগণ্য মত। হাফেজ ইবনে হাজার রহ.-ও এটি গ্রহণ করেছেন। [আলইসাবাহ- ৮/৩৩২]

৩০১. আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া- ৪/২৯৩-৩০৩, তাফসিরে ইবনে কাসির; সুরা কামার, আয়াত ১, ২

দ্রষ্টব্য : ১। চাঁদ দ্বিখণ্ডিত হওয়ার ঘটনার বিষয়ে শুরুর দিকের সিরাতগ্রন্থগুলো থেকে বুঝা যায়, এই ঘটনা শেবে আবু তালেবের বয়কট থেকে মুক্তির পরে হয়েছে। তবে মুক্তির পরপরই তা ঘটে গেছে, এমন উদ্দেশ্য নেওয়া মনে হয় ঠিক হবে না। কারণ, পূর্বের ঘটনাবলির ধারাবাহিকতা দেখলে একটি পর্যায়ক্রমিক কাল ক্ষেপণ বুঝা যায়। প্রথমে হজরত খাদিজার ইনতেকাল, এরপর আবু তালেবের মৃত্যু হয়। তারপরই নবীজির উপর কাফেরদের বাধা-বিপত্তি এবং ঠাট্টা-বিদ্রুপ এই পরিমাণ বেড়ে যায় যে, তারা চাঁদ দ্বিখণ্ডিত করার মতো দাবি উত্থাপন করে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে ঐ ঘটনা নববি দশম বছরের শেষে যিলকদ কিংবা যিলহজ মাসের। (আল্লাহ তায়ালাই ভালো জানেন)

দ্রষ্টব্য : ২। প্রসিদ্ধি আছে যে, চাঁদ দ্বিখণ্ডিত হওয়ার অলৌকিক ঘটনাটি হিন্দুস্তানেও দেখা গিয়েছিল। মালাবারের রাজা নিজ দেশে এই দৃশ্য দেখে কিছু লোককে আরবদেশে পাঠায়। অবস্থা পর্যবেক্ষণ এবং ইসলাম সম্পর্কে জানার পর তিনি মুসলমান হয়ে যান। [তাফসিরে উসমানি, সুরা কামার]

কিন্তু এই কথা প্রামাণিক পর্যায়ে পৌঁছে না। তবে এই রাজার ইসলামধর্মে দীক্ষিত হওয়ার ঘটনা তাবেয়িদের যুগে হয়েছে। তিনি তাবেয়িদের থেকে এই অলৌকিক ঘটনা শুনে অনেক বিস্মিত হন এবং ইসলাম কবুল করেন। [আযওয়া আলাল হিন্দ, আবদুল মুনঈম আননামির, পৃষ্ঠা ৬২-৬৪]

তায়েফ সফরের মর্মান্তিক ঘটনা

আবু তালেবের ইনতেকালের পর মুশরিকরা সর্বদিক থেকে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরোধিতা শুরু করে দেয়। তাকে কষ্ট ও নির্যাতনের মোক্ষম সুযোগ পেয়ে যায়। কিন্তু তাদের বিরোধিতা, শত্রুতা, গোঁয়ার্তুমি দিনদিন কেবল বাড়তেই থাকে। চাঁদ দিখণ্ডিত হওয়ার মতো অলৌকিক ঘটনাকেও তারা মিথ্যাপ্রতিপন্ন করে। কুরাইশদের এলাকায় ইসলামপ্রসারের তেমন লক্ষণ দেখতে না পেয়ে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইসলামের হেফাজত এবং প্রচার-প্রসারকেন্দ্র হিসেবে গ্রহণ করার মতো একটি উপযুক্ত স্থান খুঁজে বের করতে বাধ্য হন, যেখানকার লোকেরা আল্লাহর নাম নেবে, তারই ইবাদত করবে।

মক্কা থেকে ৭৫ মাইল দূরে অবস্থিত (১২০ কিলোমিটার) তায়েফে বসবাসকারী সাকিফ গোত্র জনসংখ্যার আধিক্যের দিক থেকে খুব শক্তিশালী ছিল। এখানকার লোকেরা সুখ-শান্তিতে জীবনযাপন করত। কুরাইশের বিত্তবানরা পর্যন্ত এখানে জমি খরিদ করে রেখেছিল। তায়েফের বাইরে তাদের বাগ-বাগিচা ছিল। গ্রীষ্মকালে লোকেরা ওখানে আমোদ-প্রমোদের জন্য অবস্থান করত।

তায়েফের অনতিদূরেই অবস্থিত বনু সা'দের বসতি। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শৈশবকাল এখানেই অতিবাহিত হয়। এবং দুধমাতা হজরত হালিমা রাদিয়াল্লাহু আনহার বাড়িও এখানে। এজন্য তার আশা ছিল সেখানকার লোকেরা তাকে দুধভাইয়ের সম্পর্কের খাতিরে সাদরে বরণ করে নেবে। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা মনোযোগ দিয়ে শুনবে। তারা যদি মুসলমান হয়ে যায়, তা হলে মুসলমানদের উপর থেকে বড় মুসিবত কেটে যাবে এবং দীনের প্রচার-প্রসারের একটি কেন্দ্রের বন্দোবস্ত হবে।

দশম নববিবর্ষের শাওয়াল মাসে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বড় আশা নিয়ে তায়েফের উদ্দেশে রওনা হন। সঙ্গে ছিলেন তার আজাদকৃত গোলাম যায়েদ বিন হারেসা রাদিয়াল্লাহু আনহু।[৩০২]

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তায়েফে দশ দিন লোকজনকে গোপনে-প্রকাশ্যে, একাকী, সামগ্রিকভাবে দাওয়াত দেন। তিনি বাজারে দাঁড়িয়ে কুরআনে

---

৩০২. তাবাকাতে ইবনে সাদ- ১/২১১

কারিমের আয়াত শোনাতেন এবং লোকদেরকে তার সাহায্য-সহযোগিতার দিকে মনোযোগ আকর্ষণ করতেন।

আবদুর রহমান বিন খালিদ উদওয়ানি তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, 'আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে (তায়েফের একটি নগরী) বনু সাকিফের পূর্বদিকের একটি এলাকায় তার লাঠি কিংবা ধনুকের উপর ভর করে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছি। তিনি তাদের কাছে সাহায্য-সহযোগিতার জন্য এসেছিলেন। আমি নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সুরা তারিক তেলাওয়াত করতে শুনেছি। সে সময় আমি মুশরিক ছিলাম। কিন্তু শুনে শুনেই সেই সুরাটি মুখস্থ করে ফেলি।

বনু সাকিফের (সরদাররা) আমার কাছে এসে বলে, তুমি এই ব্যক্তির মুখে কী শুনেছো? আমি তাদেরকে সুরা তারিক শুনিয়ে দিই। বনু সাকিফের সরদারদের কাছে কুরাইশ গোত্রের লোকও ছিল। তারা বলে, আমরা এই লোককে ভালো করেই চিনি। আমরা যদি তাকে সত্য মনে করতাম, তা হলে আমরাই সর্বপ্রথম তাকে গ্রহণ করে নিতাম।'[৩০৩]

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ব্যাপক দাওয়াতের পাশাপাশি ব্যক্তিগত সাক্ষাতের মাধ্যমেও দাওয়াত দিতেন। তায়েফের বনু সাকিফ গোত্রের তিন ভাইজ্জআবদে ইয়ালিল, মাসউদ এবং হাবিবকে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর দীনের দাওয়াত দেন এবং ইসলামের প্রচার-প্রসারে তাকে নুসরত ও সহায়তা করার জন্য উদ্বুদ্ধ করেন। তারা তো দীন কবুল করেইনি; এমনকি আরবের আতিথেয়তার রেওয়াজটুকু পর্যন্ত রক্ষা করেনি। উপরন্তু তারা নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কঠোরভাবে জবাব দেয়।

তাদের একজন বলে, 'তুমি তো এমন বিধর্মী, যে কাবার গিলাফকে অসম্মান করেছে।'

আরেকজন বলে, 'আল্লাহ কি রাসুল হিসেবে প্রেরণ করার মতো তোমাকে ছাড়া কাউকে পাননি?'

তৃতীয়জন বলে, 'আমি তো তোমার সঙ্গে কথা বলতেই নারাজ। কারণ, তুমি যদি সত্যিই নবী হয়ে থাক, তা হলে তো অস্বীকার করলে বিপদ আছে; আর যদি মিথ্যা নবী হয়ে থাক, তা হলে আমি এমন ব্যক্তির সঙ্গে কথা বলতে চাই না।'

---

৩০৩. মুসনাদ আহমাদ- ৩১/২৮৯, আলআহাদ ওয়াল মাছানিঃ ১২৭৪, আততারিখুল কাবির, বুখারি- ৩/১৩৮

বনু সাকিফের সরদাররা নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওখানে অবস্থান করার অনুমতি পর্যন্ত নাকচ করে দেয়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আশাহত হয়ে তখন অন্যান্য লোকের সঙ্গে কথা বলার ইচ্ছা করেন। কিন্তু কেউই তার দিকে মনোযোগ দিচ্ছিল না। বরং বেয়াদবি করে বলে যে, আমাদের শহর থেকে এই মুহূর্তে বের হয়ে যাও এবং যেখানে মন চায়, সেখানে যাও।

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন নিরাশ হয়ে ফিরে যাচ্ছিলেন, তখন ঐ বদমাশরা শহরের দুষ্ট ছেলেদেরকে উপহাস করতে উসকানি দেয়। তারা তাকে পাথর মারার জন্য পেছনে পেছনে দৌড়াতে থাকে। পাথরের বর্ষণে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভীষণ আহত হলেন। কষ্টের আতিশয্যে তিনি মাঝেমধ্যেই বসে পড়তেন। তখন লোকেরা তার হাত ধরে উঠিয়ে দিত। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জোরপূর্বক চলার চেষ্টা করতেন। আর তখনই ওরা আবার পাথর-বর্ষণ শুরু করত।

তায়েফের ভূমিতে সৃষ্টির সেরা ও পবিত্র মানুষটির এত রক্ত প্রবাহিত হয় যে, জুতা-জোড়া রক্তাক্ত হয়ে যায়। সফরসঙ্গী হজরত যায়েদ বিন হারিসার উপর এত পাথর বর্ষিত হয় যে, তার মাথা ফেঁটে যায়।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এভাবে আঘাত খেতে খেতে শহর থেকে বের হয়ে গেলেন। পথিমধ্যে একটি বাগিচা দৃষ্টিগোচর হলে সেখানে প্রবেশ করেন। তখন পেছনে পেছনে আসা ঐসব দুষ্ট লোক ফিরে যায়। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি খেজুর গাছের ছায়ায় বসে পড়েন। জখমে নেতিয়ে পড়া দুর্বল শরীর এবং ভারাক্রান্ত হৃদয় নিয়ে আল্লাহর কাছে দোয়া করেন, 'হে আল্লাহ, আমি আপনার নিকট আমার দুর্বলতা, অসহায়ত্ব, মানুষের লাঞ্ছনার অনুযোগ করছি। হে আরহামুর রাহিমিন, আপনিই তো দুর্বলদের প্রভু! আপনিই তো আমার রব! আপনি আমাকে কার কাছে সোপর্দ করেছেন? এমন অপরিচিত লোকদের কাছে, যারা আমাকে দেখেই মুখ ফিরিয়ে নেয়, ভ্রুকুঞ্চিত করে, নাকি কোনো শত্রুর কাছে সোপর্দ করে দিয়েছেন, যে আমার উপর কর্তৃত্ব খাটাবে?

'হে আল্লাহ, আপনি যদি আমার উপর সন্তুষ্ট থাকেন, তা হলে কোনো কিছুর ব্যাপারেই আমার পরোয়া নেই। আপনার হেফাজতই আমার জন্য যথেষ্ট। আপনার চেহারার সেই নুরের অসিলায়, যার মাধ্যমে অন্ধকার আলোকিত হয়, দুনিয়া-আখেরাতের সববিষয় বিশুদ্ধ হয়- পানাহ চাচ্ছি যেন আমার উপর আপনার ক্রোধ বর্ষিত না হয় কিংবা আপনি যেন আমার উপর অসন্তুষ্ট না হন। আমার প্রতি সন্তুষ্ট হওয়ার আগ পর্যন্ত আপনার অসন্তোষ আমার থেকে দূরে রাখুন। আপনি ছাড়া কোনো শক্তি-ক্ষমতা কারো নেই।'

এমন হৃদয় নিংড়ানো ফরিয়াদ করার পর আল্লাহ তায়ালার শাহি দরবারে জোশ আসে। তিনি তৎক্ষণাৎ জিবরাইল আলাইহিস সালামকে পাঠিয়ে দেন। ফেরেশতা এসে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আরজ করেন, 'আল্লাহ তায়ালা আপনার সঙ্গে কওমের সব কথা শুনেছেন। তো, পাহাড়ের দায়িত্বশীল ফেরেশতা আপনার খেদমতে হাজির। আপনি তাকে যেকোনো নির্দেশ দিতে পারেন।'

এবার পাহাড়ের ফেরেশতা সালাম দিয়ে বলল, 'আপনার আদেশ হলে দুই পার্শ্বের পাহাড়কে চাপা দিতে পারি। ফলে এই গোত্র একেবারে চ্যাপ্টা হয়ে যাবে।'

কিন্তু রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তর দেন, 'আমি আশাবাদী, এই লোকেরা মুসলমান না হলেও তাদের সন্তানদের এমন কেউ মুসলমান হবে, যে আল্লাহর ইবাদত করবে।'

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে বাগানে বসেছিলেন, তা ছিল দুই কুরাইশ-সরদার উতবা ও শাইবার মালিকানাধীন। ঘটনাক্রমে তারা দুজন সেখানেই অবস্থান করছিল। দূর থেকে তারা পরিস্থিতি অবলোকন করছিল। নবীজির শারীরিক অবস্থা তখন এতই নাজুক ছিল যে, তাদের দিলেও চোট লাগে। ফলে তারা তাদের গোলাম 'আদ্দাস'কে আঙুরের একটি থোকা দিয়ে পাঠায়।

আদ্দাস আঙুর নিয়ে হাজির হলে নবীজি খাওয়ার আগে পড়লেন 'বিসমিল্লাহ'।

আদ্দাস অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে, 'এই শব্দ তো এখানকার লোকেরা উচ্চারণ করে না!'

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তখন মনে হলো, এমন অচেনা শহরে আর কেউ না হোক অন্তত এই গোলামকে যদি ইসলামের দাওয়াত দেওয়া হয়, তা হলে মুসলমান হয়ে যাবে। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার অন্তরঙ্গ হয়ে বললেন, 'আদ্দাস, তোমার বাড়ি কোথায়? এবং ধর্ম কী তোমার?'

সে বলে, 'নিনাওয়া এলাকায়। আমি খ্রিষ্টান।'

নবীজি বললেন, নেককার ব্যক্তি হজরত ইউনুস বিন মাত্তার শহরের (অধিবাসী তুমি)?

আদ্দাস বিস্মিত হয়ে বলে, আপনি কীভাবে জানেন? বললেন, তিনি আমার ভাই। তিনিও নবী ছিলেন, আমিও নবী।'

আদ্দাস তখন বুঝতে পারে যে, তিনি সত্য নবী। ফলে সে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতে চুমু খেয়ে বিদায় নেয়।[৩০৪]

---

৩০৪. আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া- ৪/৩৩৭-৩৪২ (কিছু কিছু রেওয়ায়েত মোতাবেক আদ্দাস==

জিনদের ইসলামগ্রহণ

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তায়েফ থেকে ফেরার পথে 'নাখলা' নামক স্থানে যাত্রাবিরতি দেন। সেখানে একরাতে তিনি নামাজে তেলাওয়াত করছিলেন। তখন ৭ অথবা ৯ জন জিনের ছোট একটি দল সেদিক দিয়ে যাচ্ছিল। তারা কুরআন কারিমের তেলাওয়াত শুনেই বুঝতে পারে এটি সত্য ধর্ম। তারা মুসলমান হয়ে যায় এবং কওমের নিকট গিয়ে তাদের ইসলাম গ্রহণের সংবাদ দেয়।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাড়ভাঙা পরিশ্রমের পর এমন হৃদয় শীতলকারী ফল এল। পরবর্তীতে জিনদের একটি বড় দল এসে মুসলমান হয়ে যায়।[৩০৫]

দ্বিতীয়বার মক্কায় প্রবেশ

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তায়েফ সফরের লক্ষ্য ছিল সেখানে ইসলামের একটি নিরাপদ ও সুরক্ষিত ঘাঁটি তৈরি করা। বাহ্যিকভাবে ফলপ্রসূ সফর ছিল না এটা। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিপর্যস্ত অবস্থায় মক্কায় প্রত্যাবর্তনে বাধ্য হন। কিন্তু এর মধ্যেও অনেক ভয় ও শঙ্কা ছিল। কারণ, তার অনুপস্থিতিতে কুরাইশদের ক্রোধ-গোসসা অনেক বেড়ে গিয়েছিল। এখন তো নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পৃষ্ঠপোষক আবু তালেব বেঁচে নেই, যার কারণে কুরাইশরা তার উপর হাত তুলতে পারত না, সবাই যাকে শ্রদ্ধা করত।

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আশঙ্কা করছিলেন মক্কায় প্রবেশের সময় কুরাইশরা তার প্রাণনাশের চেষ্টা করবে, কিংবা কোনো কঠিন নির্যাতন করবে। আরবদের একটা রীতি ছিলজ্জকেউ যদি কারো কাছে আশ্রয় চাইত, তা হলে তাকে আশ্রয় দিতে অস্বীকার করা অসম্মানজনক মনে করত। তারা এই আশ্রয়প্রার্থীকে নিজের জানমাল দিয়ে হেফাজত করত।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কার একজন মহৎ সরদার মুতয়িম বিন আদির নিকট আশ্রয় নেওয়ার জন্য বার্তা পাঠান। মুতয়িম বিন আদি তার

==তখনই মুসলমান হয়, কিন্তু পরে প্রকাশ পায়। [আল ইগাবাহ- ৪/৩৮৬]

৩০৫. আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া- ৪/৩৪২, তাফসিরে ইবনে কাসির; সুরা আহকাফ: আয়াত ২৯-৩১

قال ابن إسحاق وابن سعد وغيرهما: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما انصرف من الطائف راجعا إلى مكة، حين يئس من خير ثقيف، حتى إذا كان بنخلة، قام من جوف الليل يصلي، فمر به النفر من الجن الذين ذكرهم الله تعالى: (سبل الهدى والرشاد: ২/৪৪৩)

অস্ত্রসজ্জিত ছেলেকে নিয়ে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বরণ করে নেন। হারাম শরিফে এসে ঘোষণা দেন, 'মুহাম্মদ আমার আশ্রয়ে রয়েছে।'

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং সাহাবায়ে কেরাম পরবর্তী সময়ে মুতয়িম বিন আদির এই ভালো কাজটির প্রশংসা করেছেন।[৩০৬]

মুতয়িম বিন আদির আশ্রয়ে আসার পর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দাওয়াতি কার্যক্রম সীমিত হয়ে গিয়েছিল। কারণ, আশ্রয়দাতা এ ব্যাপারে রক্ষণশীল ছিল যে, মক্কায় থাকা অবস্থায় প্রকাশ্যে দাওয়াত দেওয়া যাবে না। তবে মক্কার বাইরে গিয়ে বিশেষ করে হজের মৌসুম উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠিত হাট-বাজারে এবং মিনার জনসমাগমে দাওয়াত দিতে কোনো সমস্যা নেই। এরই পাশাপাশি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরেকটি আশ্রয়ের খোঁজ করছিলেন।

---

৩০৬. আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া- ৪/৩৪৩-৩৪৪

তায়েফ সফরের সময়কাল

ইবনে সাদের মত অনুযায়ী তায়েফ সফর শাওয়ালের শেষের দিকে শুরু হয় এবং সেখানে তিনি দশ দিন অবস্থান করেন। [তাবাকাতে ইবনে সাদ- ১/২১১]

ইমাম বালাযুরি রহ. এর মত অনুযায়ী সফরের (রওনা ও প্রত্যাবর্তন) সময়কালটা ছিল ২৭ শাওয়াল থেকে ২৩ যুলকাদার মাঝামাঝিতে। [আনসাবুল আশরাফ- ১/২৩৭]

যেহেতু হজের মৌসুমের কারণে মক্কা ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে দাওয়াতি কার্যক্রম পরিচালনা করার সুযোগ অনেক থাকে, রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যিলকদের শেষের দিকে ফিরে আসেন, যেন অভ্যাস অনুযায়ী হজে আগত লোকেদের মাঝে তাবলিগ করতে পারেন। এইবার হজে তাবলিগ করলে নগদ ফল দেখতে পান যে, ছ' ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করে। সামনে তার বিস্তারিত বর্ণনা আসছে।

হিজরতভূমি

মক্কা থেকে দুশো নয় মাইল (তথা ৩৩৬ কিলোমিটার) দূরে অবস্থিত 'ইয়াসরিব'। এই স্থানটিকেই আল্লাহ তায়ালা তার শেষনবীর হিজরতভূমি, মুসলমানদের হেফাজত ও নুসরত, ইসলামের প্রভাব-প্রতিপত্তি, দাওয়াত, তাওহিদের প্রচার-প্রসারের জন্য নির্বাচন করেছিলেন।

এই শহরটি ভৌগোলিকভাবে এতই সুরক্ষিত ছিল যে, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং সাহাবায়ে কেরাম (রাদিয়াল্লাহু আনহু) ভেতরে থেকেই নির্বিঘ্নে দুশমনের সঙ্গে লড়তে পারতেন। শহরটির দক্ষিণ দিকে ঘনবসতি এবং খেজুর বাগান দিয়ে এমনভাবে পরিবেষ্টিত ছিল যে, বাইরে থেকে কেউ আক্রমণ করত, তা হলে ওখানের দুর্বোধ্য রাস্তাঘাট এবং গলিতে ঘুরেই ঘুরেই খেই হারিয়ে ফেলবে। নগরীর পূর্বদিকের অংশকে 'হাররায়ে ওয়াকিম' এবং পশ্চিমের অংশকে 'হাররায়ে ওয়াবারাহ' বলা হতো। আগ্নেয়গিরি থেকে সর্বদা লাভা উদগিরণ হতো। এজন্য কাফেলা ব্যতিত একাকী চলাফেরা করা কঠিন ছিল।

নগরীর উত্তরদিক কেবল উন্মুক্ত ছিল। সাধারণ কাফেলার যাতায়াতপথও এদিক দিয়েই ছিল। কোনো দুশমন আক্রমণ করলেও এদিক দিয়েই করত। কিন্তু 'ইয়াসরিব' নগরবাসী যেন পূর্ণরূপে নগরী রক্ষা করতে পারে, সেজন্য জায়গায় জায়গায় দুর্গসদৃশ বিভিন্ন পাঁচিল নির্মাণ করে। এগুলোকে আরবিতে 'আতাম' বলা হতো।

ইয়াসরিবের রাজনৈতিক পরিবেশও মক্কা থেকে ভিন্ন ছিল। এখানে কোনো গোত্রের একচ্ছত্র ক্ষমতা ও শাসন চলত না। ইয়েমেন থেকে আগত দুই কবিলা- আউস ও খাযরাজ, তাদের প্রত্যেকের নিজস্ব মর্যাদা এবং বলয় ছিল। উভয় গোত্রই অসাধারণ বাহাদুরি ও সাহসিকতার অধিকারী ছিল। অপরদিকে ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্পকর্ম এবং ধর্মীয় জ্ঞানবিজ্ঞানের দক্ষতায় ইহুদিদেরও একটা অবস্থান ছিল। তারা শহরতলীতে দুর্গ নির্মিত বস্তিতে বসবাস করত।[৩০৭]

ইয়াসরিবের প্রথম মুসলমান

আউস এবং খাযরাজের মধ্যে চরম শত্রুতা ছিল। একদিনের ঝগড়াতেই তাদের একাধিক লোক মারা যেত। সপ্তম নববিবর্ষে আউস গোত্রের শাখা বনু আবদুল

---

৩০৭. আসসিরাতুন নববিয়্যাহ, আবুল হাসান আলি নদবি- পৃষ্ঠা ২০৬, ২০৭

আশহালের কিছু লোক খাযরাজের বিপক্ষে কুরাইশকে নিজেদের জোটবদ্ধ করানোর জন্য মক্কায় আসে।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের আগমনের সংবাদ শুনে তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বলেন, 'আমি তোমাদেরকে এরচেয়ে উত্তম কথা শোনাব।' এরপর তিনি তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দেন। তখন বনু আবদুল আশহালের একজন কমবয়সি তরুণ ইয়াস বিন মুয়াজ বলেন, 'ভাইয়েরা, আল্লাহর কসম, এই কথা গ্রহণ করে নাও। তোমরা যেজন্য এসেছ, এর চেয়ে এটি অধিক উত্তম।' কিন্তু অন্যান্য লোকজন নীরব রইল, এই দাওয়াতের প্রতি কোনো ভ্রুক্ষেপ করল না।[৩০৮]

বুআস যুদ্ধ এবং তার প্রভাব

আউস গোত্রের লোকেরা কুরাইশকে নিজেদের পক্ষে ভিড়াতে সক্ষম না হলেও সপ্তম নববিবর্ষে সংঘটিত রক্তক্ষয়ী বুআস যুদ্ধে প্রথমে সে তাদের সমপর্যায়ের ইহুদি কবিলা বনু নাযির এবং বনু কুরাইযাকে মিত্র বানিয়ে নিজেদের পাল্লা ভারী করে নেয়। ফলে খাযরাজ গোত্র জানপ্রাণ দিয়ে লড়াই করেও পিছু হটতে বাধ্য হয়।[৩০৯]

আউস ও খাযরাজের এই রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে তাদের প্রবীণ ও বরেণ্য সরদার প্রায় সবাই নিহত হয়। মদিনার নেতৃত্ব রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য খালি করতে তার আগমনের পূর্বেই আল্লাহ তায়ালা এমন পরিস্থিতি তৈরি করে দেন।[৩১০]

ইহুদিরা বিজয়ীদের মিত্র হয়ে থাকে। এর থেকে আউস-খাযরাজ উভয়েরই আশঙ্কা হয় যে, ইহুদিরা পুনরায় ক্ষমতাধর হয়ে উঠবে। এই আশঙ্কার কারণেই

---

৩০৮. আলমুনতাযাম- ২/৩৮৬

ফায়দা : ১। ইবনুল জাওযি রহ. এই ঘটনাটি ৭ম নববি-বর্ষের অধীনে উল্লেখ করেছেন। এর থেকে বুঝা যায়, শেবে আবু তালেবের বয়কট পরবর্তী বছর (৮ম নববি-বর্ষে) হওয়ার মতটি অগ্রগণ্য।

ফায়দা : ২। এই ইয়াস বিন মুয়াজ ঈমান এনেছিল। কিন্তু দেশে ফেরার পর তাকে বনু খাজরাজ হত্যা করে ফেলেছিল। আর সে কালিমায়ে শাহাদাত পড়তে পড়তে দুনিয়া ত্যাগ করে। [মারিফাতুস সাহাবাহ, আবু নুয়াইম: ১/২৯৩] তার শাহাদাতের কিছুদিন পরই 'বুআস' যুদ্ধ সংঘটিত হয়। [আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া- ৪/৩৬৬]

৩০৯. আলকামিল ফিত তারিখ- ১/২০১, ২০২. এই যুদ্ধ বনু কুরাইযার দুর্গের নিকটবর্তী 'বুআস' উপত্যকায় সংঘটিত হয়েছিল। [আলকামিল ফিত তারিখ- ১/২০২]

৩১০. সহিহ বুখারি- ৩৯৩০ (কিতাবুল মানাকিব, বাবু মাকদামিন নাবিয়্যি ওয়া আসহাবিহিল মাদিনাহ)

দুই গোত্রের বুদ্ধিমান লোকেরা- যারা আগে থেকেই তাদের মধ্যকার যুদ্ধের ব্যাপারে অসন্তুষ্ট ছিল- একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ক্ষমতা এবং সুদৃঢ় নিরাপত্তা ব্যবস্থা তৈরি করতে বাধ্য হয়।

উভয় কবিলার নেতৃত্বের ক্ষেত্রে খাযরাজের সরদার আবদুল্লাহ বিন উবাই বিন সালুল ছিল একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি। সে বুআস যুদ্ধে নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করে। বিচক্ষণতা, চাটুকারিতা, দূরদর্শিতায় সে সবার চেয়ে অগ্রগামী ছিল। আউস ও খাযরাজের সরদাররা এটাও ভাবে যে, ভবিষ্যতে পারস্পরিক সংঘাত থেকে বাঁচতে এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ নিরাপত্তা-ব্যবস্থা জোরদার করতে এই সুরতও হতে পারে যে, আবদুল্লাহ বিন উবাই বিন সালুলকে সমগ্র ইয়াসরিবের শাসক হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হবে। নতুন সরকারের অধীনে নগর-পরিচালনা করা হবে।[৩১১]

৩১১. সহিহ বুখারি- ৪৫৬৬ (কিতাবুত তাফসির, মানাকিব, বাবু ওলা তাসমাউন্না মিনাল্লাযিনা উতুল কিতাবা), আসসিরাতুন নববিয়্যাহ, আবুল হাসান আলি নদবি- পৃষ্ঠা ২০০- ২০২

ইয়াসরিবের প্রথম কাফেলার ইসলামগ্রহণ

(নববি দশম বর্ষ)

আউস-খাযরাজের কল্পনাতেও ছিল না যে, আল্লাহ তায়ালা খুব শীঘ্রই তাদেরকে অনেক বড় সৌভাগ্য নসিব করতে যাচ্ছেন। তাদেরকে এমন নেয়ামত প্রদান করবেন, যার মধ্যে তাদের কোনো অংশীদার থাকবে না। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তায়েফ থেকে ফেরার পরপরই ১১ নববিবর্ষের হজে তার অভ্যাসমতো বিভিন্ন গোত্রকে ইসলামের দাওয়াত দেওয়ার জন্য বাইরে বের হন।

মিনার বড় জামরার নিকটবর্তী পাহাড়ের এক ঘাঁটিতে খাযরাজ গোত্রের কিছু লোকের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হয়। তারা ইয়াসরিব থেকে হজের উদ্দেশ্যে আগমন করেছেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে তাওহিদের দাওয়াত দেন এবং কুরআন কারিম থেকে পড়ে শোনান।

ইয়াসরিবের লোকেরা তাদের প্রতিবেশী ইহুদিদের থেকে অনেক শুনেছে যে, খুব শীঘ্রই একজন নবীর আবির্ভাব হবে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নুরানি অবয়ব, উন্নত চরিত্র এবং পবিত্র দাওয়াতে তারা অনেক প্রভাবিত হয়। তাদের বিশ্বাস- তিনিই সেই নবী, যিনি মানবতার মুক্তির অগ্রদূত হবেন। পাশাপাশি তাদের এটাও অনুভব হয় যে, তাদের পারস্পরিক যুদ্ধের সমাপ্তি, দেশের জীবিকা এবং চাষাবাদের উপর জেঁকে বসা ইহুদিদের থেকে মুক্তি পাওয়ার এটিই একমাত্র পথ যে, আমরা সকলেই নবীর প্রতি ঈমান আনব। ফলে তারা নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলে, 'আমাদের কওমের মধ্যে যত অনিষ্ট, বিশৃঙ্খলা ও ফ্যাসাদ রয়েছে, তা দুনিয়ার অন্য কোথাও নেই। হতে পারে আল্লাহ তায়ালা আপনার মাধ্যমে আমাদেরকে ঐক্যবদ্ধ করবেন।'

ইয়াসরিবের ছ' ব্যক্তি সর্বপ্রথম ঈমান আনেন। আসআদ বিন যুরারা, আউফ বিন আফরা, রাফি বিন মালিক, জাবির বিন আবদুল্লাহ, কুতবা বিন আমির এবং উকবা বিন আমির রাদিয়াল্লাহু আনহুম। তারা দেশে ফিরে ইসলামের দাওয়াত দিতে শুরু করেন। কিছুদিনের মধ্যেই সর্বত্র দাওয়াতের প্রচার-প্রসার হয়ে যায়। তখন বহুলোক ইসলাম গ্রহণ করে।[৩১২]

---

৩১২. সিরাতে ইবনে হিশাম- ১/৪২৯, আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া- ৪/৩৭১, ৩৭২

ইয়াসরিবের ঘরে ঘরে আলোচিত হতে থাকে যে, মক্কাতে একজন সত্য নবীর আবির্ভাব হয়েছে। তিনি তার গোত্রের কঠিন নির্যাতন-নিপীড়ন ভোগ করেছেন। তিনি কুরাইশি এবং হাশিমি বংশোদ্ভূত। আবদুল মুত্তালিবের দৌহিত্র এবং আবদুল্লাহর পুত্র। ইয়াসরিববাসীর কাছে এই বংশের পরিচয় অজানা ছিল না। তারা জানত কিছুদিন পূর্বে তাদেরই এক বংশ বনু নাজ্জারের কন্যা সালামা বিন আমর কুরাইশি সরদার হাশিমের সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়। তারা এটাও জানত যে, আবদুল মুত্তালিব বাল্যকালে এখানকার অলিগলিতেই খেলাধুলা করে কাটিয়েছেন। এই এলাকারই মেয়ে ফাতিমা বিনতে আমরকে তিনি বিবাহ করেছিলেন। তার গর্ভেই পুত্র আবদুল্লাহ জন্মগ্রহণ করেছিলেন। বনু নাজ্জারের বয়স্ক নারীদের সেদিনকার কথা মনে আছে, যেদিন আবদুল্লাহ বিন আবদুল মুত্তালিব এখানেই অসুস্থ হয়ে মারা গেছেন এবং এই এলাকাতেই তাকে দাফন করা হয়। এরপর আমিনা বিনতে ওয়াহাবের স্বামীর কবর জিয়ারতের উদ্দেশ্যে আসা, ফিরে যাওয়ার পথে আবওয়াতে মৃত্যুবরণ করার কথাও তারা ভোলেননি। ছয় বছর বয়সি মুহাম্মদ তার সাথেই ছিলেন। আর আজ সেই 'মুহাম্মদ'ই একজন পথপ্রদর্শক ও নবী হিসেবে আবির্ভূত হয়েছেন। মানুষকে আল্লাহ তায়ালার দিকে আহ্বান করছেন। আসমানি বিধানের প্রতি ডাকছেন; যদিও এটা তাদের আকাঙ্ক্ষা ছিল না, তারপরও তাদের মধ্যে যেন অন্যরকম অন্তরঙ্গতা অনুভূত হচ্ছিল।

প্রথম আকাবার বাইয়াত

(নববি ১১ বর্ষ)

পরবর্তী বছর তথা ১১তম নববি বর্ষে আউস ও খাযরাজের ১২ ব্যক্তি হজে এসে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট যান। তারা পূর্বেই ঈমান এনেছিলেন। এখন তারা নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জিয়ারত ছাড়াও তার মদদ-নুসরত এবং দীনের তালিম নেওয়ার জন্য উপস্থিত হয়েছেন। এই ১২ জনের মধ্যে হজরত আসআদ বিন যুরারা, উকবাহ বিন আমির, উবাদা বিন সামিত এবং মালিক বিন তাইয়িহান (রাদিয়াল্লাহু আনহুম)-ও ছিলেন। পরবর্তীতে এই ব্যক্তিরা প্রখ্যাত সাহাবিদের মধ্যে গণ্য হয়েছিলেন।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের বাইয়াত গ্রহণ করেন। শিরক, চুরি, ব্যভিচার, সন্তান হত্যা করা থেকে বেঁচে থাকা, সকল পুণ্য কাজে আনুগত্য করার উপর অঙ্গীকার ও প্রতিশ্রুতি নেন। এটাকেই 'প্রথম আকাবার বাইয়াত' বলা হয়ে থাকে।[৩১৩] রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হজরত মুসআব বিন উমাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং অন্ধ কারি আবদুল্লাহ বিন উম্মে মাকতুম রাদিয়াল্লাহু আনহুকে কুরআন কারিমের শিক্ষক হিসেবে তাদের সাথে প্রেরণ করেন।[৩১৪]

হজরত আসআদ বিন যুরারার ঘরে হজরত মুসআব ও হজরত আবদুল্লাহ বিন উম্মে মাকতুম অবস্থান করে ইসলামের নতুন কেন্দ্রে তাওহিদের দাওয়াত, নামাজের ইমামতি, কুরআন শিক্ষা দেওয়ার দায়িত্ব আঞ্জাম দিতেন।[৩১৫]

চার বছর পূর্বে বিগত হওয়া আউস-খাযরাজের মধ্যকার ঐতিহাসিক 'বুআস' যুদ্ধে উভয় গোত্রের বড় বড় সরদাররা অনেক নৈপুণ্য প্রদর্শন করেছিলেন। ফলে পরবর্তীতে আউসের নেতৃত্ব সাদ বিন মুয়াজ এবং খাযরাজের নেতৃত্ব সাদ বিন উবাদার নিকট আসে। হজরত মুসআব বিন উমাইর এবং আসআদ বিন

---

৩১৩. সিরাতে ইবনে হিশাম- ১/৪২৯, আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া- ৪/৩৭১, ৩৭২

৩১৪. তাবাকাতে ইবনে সাদ- ১/২৩৪, সহিহ বুখারি- ৩৯২৪ (বাবু হিজরাতিন নাবিয়্যি সা., কিতাবুল মানাকিব)

কুরআনে কারিম শিক্ষা দেওয়ার ক্ষেত্রে সূচনা থেকেই অন্ধ কারিদের অনেক বড় অবদান রয়েছে। আর পরবর্তী সকলেই হজরত আবদুল্লাহ বিন উম্মে মাকতুমের উত্তরাধিকার। আল্লাহ তায়ালা তাদের সকলকে উত্তম জাযা দান করুন। আমিন।

৩১৫. সিরাতে ইবনে হিশাম- ১/৪২৯, আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া- ৪/৩৭১, ৩৭২

যুরারা রাদিয়াল্লাহু আনহু যখন ইসলামের তাবলিগ করা আরম্ভ করেন, তখন আউস গোত্রের সরদার সাদ বিন মুয়াজ কালিমা পড়ে মুসলমান হয়ে যান। তার চাচাত ভাই উসাইদ বিন হুদাইরও ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি গোত্রের নায়েব-সরদার এবং বাহিনীপ্রধান ছিলেন।

ইসলামের এই তাজা উৎসাহ-উদ্দীপনা আউস-খাযরাজের পুরোনো শত্রুতাকে কেবল ধুয়ে-মুছে সাফই করেনি; বরং নগরীতে এক নতুন ঐক্য এবং সংঘবদ্ধ হুকুমত প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এর ফলে তারা আবদুল্লাহ বিন উবাই বিন সালুলকে একচ্ছত্র শাসক হিসেবে নিযুক্ত করার যে চিন্তা করেছিল, তা ত্যাগ করে। কারণ, সুদৃঢ় নিরাপত্তা এবং স্বাধীন ঐক্যবদ্ধ শাসন প্রতিষ্ঠার কর্মকৌশল তারা ইসলামের বদৌলতেই লাভ করেছিল।[৩১৬]

৩১৬. তারিখে ইবনে-খালদুন- ২/৪১৯, আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া- ৪/৩৮৮, ৩৮৯

মেরাজ সফর

বিগত কয়েক বছর যাবৎ যেভাবে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর একের পর এক মুসিবত নেমে আসছিল, তার সীমাহীন ব্যথা ও বেদনা উপশম করার লক্ষ্যে আল্লাহ তায়ালা নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এমন সম্মানে ভূষিত করলেন, ইতিপূর্বে কোনো মানুষের তা নসিব হয়নি। এটি ছিল 'মেরাজ সফর'-এর গৌরব। এই সফরে আল্লাহ তায়ালা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর সম্মাননা এবং নেয়ামতের বৃষ্টি বর্ষণ করেন।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে হারামে শুয়ে ছিলেন। ফেরেশতাদের সরদার জিবরাইল আলাইহিস সালাম সেখানে আগমন করেন। সঙ্গে ছিল তার ঘোড়াসদৃশ পালকযুক্ত এক প্রাণী। একেই 'বুরাক' বলা হয়। হজরত জিবরাইল আলাইহিস সালাম নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তার উপর সওয়ার করিয়ে তিনিও উঠলেন এবং মসজিদে হারাম থেকে শামের দিকে নিয়ে চললেন। বুরাকের গতি এত দ্রুত ছিল যে, তার দৃষ্টি যতদূর যেত, তার পা-ও সেখানে পড়ত। সফরের এই প্রথম ধাপ তথা ইসরা বাইতুল মাকদাস নগরীর মসজিদে আকসাতে গিয়ে শেষ হয়। সেখানে হজরত আদম আলাইহিস সালাম থেকে নিয়ে হজরত ঈসা আলাইহিস সালাম পর্যন্ত প্রায় এক লক্ষ চব্বিশ হাজার নবী তার সংবর্ধনার জন্য উপস্থিত ছিলেন। সকলেই নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইমামতিতে নামাজ আদায় করেন। এর মাধ্যমে বাস্তবে প্রমাণিত হলো যে, তিনিই 'নবীকুল শিরোমণি'।

মসজিদে আকসা থেকে সফরের দ্বিতীয় ধাপ আরম্ভ হলো; একে বলে মেরাজ। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিবরাইল আলাইহিস সালামের সঙ্গে উচ্চ আসমানে পৌঁছেন। তার সঙ্গে আসমান সফর করেন। প্রতিটা আসমানের দরজাতেই ফেরেশতারা তাকে সাদর অভ্যর্থনা জানান। প্রথম আসমানে হজরত আদম আলাইহিস সালাম, দ্বিতীয় আসমানে ঈসা আলাইহিস সালাম ও ইয়াহইয়া আলাইহিস সালাম, তৃতীয় আসমানে ইউসুফ আলাইহিস সালাম, চতুর্থ আসমানে ইদরিস আলাইহিস সালাম, পঞ্চম আসমানে হারুন আলাইহিস সালাম, ষষ্ঠ আসমানে মুসা আলাইহিস সালাম এবং সপ্তম আসমানে ইবরাহিম আলাইহিস সালামের সঙ্গে নবীজির মুলাকাত হয়। হজরত ইবরাহিম আলাইহিস সালাম বাইতুল মামুরের দরজায় বসে ছিলেন, যা সোজা বাইতুল্লাহর বরাবর

উপরে অবস্থিত। প্রতিদিন সত্তর হাজার ফেরেশতা তার তাওয়াফ করে থাকে।

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দোজখ এবং নাফরমানদের শাস্তির বিভিন্ন ধরন স্বচক্ষে দেখে এসেছেন। তদ্রূপ জান্নাতের নেয়ামতও অবলোকন করেছেন। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরশে আজিমের নিচে একটি পবিত্র কুলবৃক্ষ 'সিদরাতুল মুনতাহা' পৌঁছলেন। এখানে ফেরেশতাদের সর্বদা ভিড় লেগে থাকে।

সবশেষে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তায়ালার একান্ত দরবারে গিয়ে পৌঁছলেন এবং তার শান মোতাবেক দিদার লাভ করলেন। এই সাক্ষাতেই আল্লাহ তায়ালা মুসলিম উম্মাহকে পঞ্চাশ ওয়াক্ত ফরজ নামাজ হাদিয়া দিলেন। হজরত মুসা আলাইহিস সালামের পরামর্শে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কমানোর দরখাস্ত করেন। সবশেষে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ফরজ হিসেবে রয়ে যায়। কিন্তু সাওয়াব ঠিকই পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামাজের দেওয়া হবে বলে সুসংবাদ দান করেন।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন এই সফর শেষ করে সসম্মানে আপন জায়গায় ফিরে আসেন, তখনও পৃথিবীর এত স্বল্প সময় অতিক্রান্ত হয়েছিল যে, নবীজির বিছানাটি পর্যন্ত উষ্ণ ছিল।

ভোর হলে তিনি যখন এই ঘটনা বর্ণনা করেন, তখন মুশরিকরা অভ্যাসমতো হাসিঠাট্টা করতে থাকে। আবু জাহল আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে তিরস্কার করতে গিয়ে বলে, 'তোমার সাথি বলে সে নাকি এক রাতেই বাইতুল মাকদাস এবং আকাশ ভ্রমণ করে এসেছে। তুমি কি এটাকেও সত্য মনে করবে?'

হজরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহু নির্দ্বিধা এবং নিশ্চিন্তে বলেন, হ্যাঁ, আমি সর্বাবস্থায় তার কথা সত্য মনে করি।'

মোটকথা, মুসলমানরা এই ঘটনাকে সত্যায়ন করে এবং আল্লাহর উপর তাদের ঈমান আরো মজবুত হয়। পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পাবন্দির সঙ্গে আদায় করার কারণে আল্লাহ তায়ালার সঙ্গে তাদের সম্পর্ক ও ঘনিষ্ঠতা আরো জোরদার হয়। মেরাজের এই ঘটনা জাগ্রত ও চেতনা অবস্থার কোনো স্বপ্ন ছিল না। কারণ, স্বপ্ন হলে এটাকে মুজিজা এবং বিস্ময়কর ঘটনা বলে বর্ণনা করার কিছু নেই। আর মুশরিকরাও এটা নিয়ে হাসিঠাট্টা করত না। কারণ, স্বপ্নে তো মানুষ কত কিছুই দেখে থাকে।[৩১৭]

---

৩১৭. আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া- ৪/২৭৬-২৮৫ (দারু হিজর সংস্করণ), আলকামিল ফিত তারিখ- ১/৬৫০, ৬৫১ (দারুল কিতাবিল আরাবি)

নোট : মেরাজের ঘটনার মাস ও বছর নিয়ে কঠিন মতানৈক্য রয়েছে। ২৭ রজব ১০==

মেরাজের ঘটনা এই বাস্তবতা স্পষ্ট করে দেয় যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পুরো পৃথিবীর নেতৃত্ব ও পরিচালনার জন্য আগমন করেছেন। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়াত কোনো এক শহর-নগর বা রাজ্যের জন্য ছিল না। এর পরিধি সারা দুনিয়া নয় কেবল, বরং সমগ্র সৃষ্টির উপর। পূর্ববর্তী সব উম্মতেরও তার অনুসরণ করা ছাড়া মুক্তি পাবে না। কারণ, পূর্বেকার নবী-রাসুলগণও তার মুকতাদি হয়ে নামাজের জন্য একই কাতারে দণ্ডায়মান।

মেরাজের ঘটনা এদিকেও ইঙ্গিত করে যে, মুসলমানদের নিঃসঙ্গতা, দুর্বলতা এবং জনস্বল্পতার পরেও যথাশীঘ্রই ইসলাম পৃথিবীর দূরদূরান্ত পর্যন্ত পৌঁছে যাবে। সত্য উদ্ভাসিত হওয়ার সময় অত্যাসন্ন।

==নববি-বর্ষ মতটি প্রসিদ্ধ আছে।

আল্লামা আইনি রহ. ১২ নববি-বর্ষকে অগ্রগণ্য হিসেবে গ্রহণ করেছেন। [উমদাতুল কারি- ৪/৩৯]

হাফেজ আবদুল গনি মাকদাসি রহ. তার 'সিরাত নববিয়্যাহ' গ্রন্থে '১২ রবিউল আওয়াল সোমবার' মতটি প্রাধান্য দিয়েছেন। কিন্তু ইবনে আব্বাস রা. এর যে রেওয়ায়েত তিনি দলিল হিসেবে পেশ করেছেন, হাফেজ ইবনে কাসির রহ. তাকে মুনকাতি বা দুর্বল বলেছেন।

হাফেজ ইবনে কাসির রহ. তার 'আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া' [৪/২৭০] গ্রন্থে উপর্যুক্ত বক্তব্য ছাড়াও নিম্নোক্ত মতগুলো উল্লেখ করেছেন:

১ ইবনে আসাকির রহ. এর নিকট নবুওয়াতের প্রথম বছরগুলোতে হয়েছে (অর্থাৎ হিজরতের ৫ বছর পূর্বে)।

২ ইবনে ইসহাক রহ. এর নিকট নবুওয়াতের দশম বছরে হয়েছে (মাস জানা নেই)।

৩ সুদ্দি রহ. এর মত হলো হিজরতের ১৬ মাস পূর্বে (যিলকদ ১২ নববি-বর্ষে) তা সংঘটিত হয়।

৪ যুহরি রহ. এর মত হলো হিজরতের এক বছর পূর্বে (রবিউল আওয়াল ১৩ নববি-বর্ষে) তা সংঘটিত হয়।

হাফেজ ইবনে হাজার রহ. 'হিজরতের পাঁচ বছর পূর্বে সংঘটিত হওয়ার' মতটি দলিলের আলোকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। এরপর তিনি মেরাজের সময় সম্পর্কে দশটি মত উল্লেখ করেন। সুদ্দি রহ. থেকে তিনি তার এই বক্তব্য নকল করে -হিজরতের ১৭ মাস পূর্বে সংঘটিত হয়- বলেন যে, এই হিসেবে মেরাজের ঘটনাটি রমজান কিংবা শাওয়ালে সংঘটিত হয়ে থাকবে। অন্যান্য মতের কোনটিই তিনি অগ্রগণ্য মত বলে মন্তব্য করেননি। [ফাতহুল বারি- ৭/২০৩]

সর্বোপরি, উপর্যুক্ত মতগুলো থেকে কোনো একটি অগ্রগণ্য সাব্যস্ত করা অনেক কঠিন। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, সবকটি মতই দুর্বল রেওয়ায়েতের উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এমন অবস্থায় উত্তম পদ্ধতি হলো পূর্বের ঘটনাবলির ধারাবাহিকতা লক্ষ করা, ফলে আলোচ্যবিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট কোনো প্রমাণ ও ইঙ্গিত মিলে যেতে পারে। হিজরতের পাঁচ বছর পূর্বে কিংবা এক বছর পূর্বে; কোনোটিই পূর্বের ঘটনাবলির ধারাবাহিকতা ও গতির সঙ্গে খাপ খায় না। তবে হিজরতের ১৭ মাস পূর্বে'র যে মতটি ইবনে হাজার আসকালানি রহ. সুদ্দি রহ. থেকে বর্ণনা করেছেন, তা যুক্তিসঙ্গত।

এক্ষেত্রে সবচেয়ে সুস্পষ্ট হলো ইবনে সাদের বক্তব্য, এটি সুদ্দির মতেরও কাছাকাছি। তিনি বলেন, 'হিজরতের আঠারো মাস পূর্বে রমজানের ১৭ তারিখ শনিবার রাত যখন হলো...'। [তাবাকাতে ইবনে সাদ- ১/২১৩]

১৭ রমজান মাদানি পঞ্জিকা অনুযায়ী, মক্কি পঞ্জিকা মোতাবেক ১৭ রজব হয়। আর যদি মক্কি পঞ্জিকার ২৭ রজবের প্রসিদ্ধ বক্তব্য মেনে নেওয়া হয়, তা হলে মাদানি পঞ্জিকা তথা চান্দ্রবর্ষ অনুযায়ী তা ২৭ রমজান ১২ নববি-বর্ষের ঘটনা হবে। তার খ্রিষ্টাব্দ তারিখ হবে ২৬ এপ্রিল ৬২১ সাল। আলি মুহাম্মদ খান এই মতটি গ্রহণ করেছেন। [তাকওয়ীমে আহদে নববি, পৃষ্ঠা ৮০, ১১৬]

দ্বিতীয় আকাবার বাইয়াত

(নববি ১২ম বর্ষ)

১২ নববিবর্ষে হজরত মুসআব বিন উমাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু ইয়াসরিব থেকে হাজিদের বড় একটি কাফেলা নিয়ে মক্কায় আসেন। হজের পর ১২ যিলহজ রাতে মিনার সেই ঘাঁটিতেই সকলে সমবেত হন।[৩১৮] তারা ছিলেন ৭৫ জন। তন্মধ্যে ৭৩ জন পুরুষ এবং ২ জন নারী। এই কাফেলা নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে জানমাল সর্বস্ব উৎসর্গ করার প্রতিশ্রুতি দেওয়া এবং তাদের দেশে নবীজিকে আমন্ত্রণ জানানোর উদ্দেশ্যে আগমন করেছিল।

নবীজির চাচা হজরত আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু তখনও মুসলমান হননি। তবে তিনি তার নিরাপত্তায় নিয়োজিত থাকতেন সর্বক্ষণ। ইয়াসরিববাসীর আগ্রহ ও ব্যাকুলতা দেখে তিনি বলেন, বুঝে নিও, তোমরা যে আবদার করছো, সত্যি সত্যিই যদি তোমরা তাকে দুশমন থেকে রক্ষা করতে পার, তা হলে তো ঠিক আছে। অন্যথায় এখনই অপারগতা প্রকাশ কর। কারণ, মুহাম্মদ আমাদের হেফাজতে রয়েছে। এমন যেন না হয় যে, তাকে তোমাদের সঙ্গে নিয়ে গিয়ে আবার দুশমনের হাতে সোপর্দ করে দিলে।'

তারা উত্তর দেয়, 'নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের থেকে যে প্রতিশ্রুতিই নিতে চান, আমরা তা দিতে প্রস্তুত।'

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'প্রতিশ্রুতি দাও যে, তোমরা তোমাদের স্ত্রী-সন্তানদের যেভাবে হেফাজত করো, সেভাবে আমারও হেফাজত করবে।'

হজরত বারা বিন মারুর রাদিয়াল্লাহু আনহু আবেগের আতিশয্যে নবীজির হাত ধরে বাইয়াত করতে গিয়ে বলেন, ঐ সত্তার কসম, যিনি আপনাকে সত্য দীন দিয়ে পাঠিয়েছেন, আমরা আপনাকে এমনভাবে হেফাজত করব, যেমন আমরা আমাদের পরিবার-পরিজনকে হেফাজত করি। আমরা যুদ্ধবাজ জাতি। যুদ্ধ করা আমাদের ঐতিহ্যগত স্বভাব।' এর উপর উপস্থিত সকলেই বাইয়াত গ্রহণ করে। তখন মালিক বিন তাইয়িহান রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, 'আল্লাহর রাসুল, এমন হবে না তো যে, আল্লাহ তায়ালা যখন আপনাকে বিজয়ী করবেন, তখন আমাদেরকে ছেড়ে নিজের কওমের নিকট ফিরে আসবেন?'

---

৩১৮. আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া- ৪/৫১৩

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, না, এটা হবে না। তোমরা নিশ্চিন্ত থাকো। তোমরা যাদের বিরুদ্ধে লড়বে, আমিও তাদের বিরুদ্ধে লড়ব। যাদের সঙ্গে তোমাদের সন্ধি হবে, আমিও তাদের সঙ্গে সন্ধি করব। তোমাদের নিরাপত্তা-চুক্তি আমারই চুক্তি, তোমাদের সম্মান, আমারও সম্মান।'

এটি এমন মজবুত প্রতিশ্রুতি ছিল, যা পৃথিবীর এক আদর্শ সমাজ-ব্যবস্থাতেই সীমাবদ্ধ। একেই দ্বিতীয় বাইয়াতে আকাবা বলা হয়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের জন্য বারো জন দায়িত্বশীল নির্ধারণ করে দেন। তারা হলেন-আসআদ বিন যুরারা, সাদ বিন রাবি, সাদ বিন উবাদা, উসাইদ বিন হুদাইর, আবদুল্লাহ বিন রাওয়াহা, বারা বিন মারুর, উবাদা বিন সামিত, রাফি বিন মালিক, আবদুল্লাহ বিন আমর, মুনজির বিন আমর, সাদ বিন খায়সামা, আবুল হায়সাম মালিক বিন তাইয়িহান। রাদিয়াল্লাহু আনহুম।[৩১৯]

বাইয়াতে উপস্থিত আরো কিছু প্রসিদ্ধ ব্যক্তি

বাইয়াত-অনুষ্ঠানে আরো কয়েকজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। যেমন : আবদুল্লাহ বিন জুবাইর (উহুদযুদ্ধে শহিদ), আবু আইয়ুব আনসারি (খালেদ বিন যায়েদ), আউস বিন সাবিত, আবু তালহা আনসারি (যায়েদ বিন সাহল), সাদ বিন রাবি (গাজওয়া উহুদে শাহাদাত বরণকারী), আবদুল্লাহ বিন যায়েদ (যিনি স্বপ্নে আজান দেখেছিলেন), খাল্লাদ বিন সুওয়াইদ (খন্দকযুদ্ধে শহিদ), মুয়াজ বিন জাবাল এবং উবাদা বিন সামিত রাদিয়াল্লাহু আনহুমের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ্য।[৩২০]

বনু মাজিনের যায়েদ বিন আসিম রাদিয়াল্লাহু আনহু তার পুরো পরিবার নিয়ে এসেছিলেন। তাদের মধ্যে স্ত্রী উম্মে উমারা (নুসাইবা বিনতে কাব) এবং দুই ছেলে হাবিব বিন যায়েদ এবং আবদুল্লাহ বিন যায়েদ রাদিয়াল্লাহু আনহুমা অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।[৩২১]

---

৩১৯. সিরাতে ইবনে হিশাম- ১/৪৪৮

৩২০. সিরাতে ইবনে হিশাম- ১/৪৬০-৪৬৮

৩২১. এই মাজিন খান্দানের আত্মোৎসর্গের কাহিনি বড়ই বিস্ময়কর। যায়েদ বিন আসিম রা. বদরযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন।
উহুদযুদ্ধে তার স্ত্রী উম্মে উমারা (নুসাইবা বিনতে কা'ব) রা. এবং তার দুই ছেলে: আবদুল্লাহ রা. ও হাবিব রা. অংশগ্রহণ করেছিলেন।
উহুদযুদ্ধে উম্মে উমারা নবীজির (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) প্রতিরক্ষায় যে বীরত্ব প্রদর্শন করেছিলেন, তা আজও ইসলামি ইতিহাসে বিস্ময়কর হয়ে আছে।
পরবর্তীতে ভণ্ডনবী মুসাইলামা কাজ্জাবের বিরুদ্ধে যুদ্ধে গিয়ে হাবিব রা. শহীদ হন। উম্মে উমারা রা. মুসাইলামা-বিরোধী যুদ্ধে ছেলে আবদুল্লাহ রা. নিয়ে শরিক হন। অনেক বড় আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে তার এক হাতও কাটা পড়ে। তার ছেলে আবদুল্লাহই মুসাইলামা==

বাইয়াতে আকাবাতে অংশগ্রহণকারী মুসলমানরা যে প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন, তা বাস্তবে পূর্ণ করে দেখান। এই লোকগুলোই পরবর্তীতে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য জানমাল উৎসর্গ করেন এবং বদর, উহুদ ও খন্দকযুদ্ধে তাদের অধিকাংশ অংশগ্রহণ করেন এবং অনেকেই শাহাদাত বরণ করেন।

সাহাবিদের হিজরত

দ্বিতীয় বাইয়াতে আকাবার কিছুদিন পর ১৩ নববিবর্ষে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কার মুসলমানদের আল্লাহ তায়ালার দীনের খাতিরে স্থায়ীভাবে আপন দেশ ও পরিবার ছেড়ে ইয়াসরিব চলে যাওয়ার জন্য নির্দেশ দেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে বলেন, 'আমি স্বপ্নে দেখেছি আমি মক্কা থেকে একটি খেজুরভূমির দিকে হিজরত করে যাচ্ছি, আমার মনে হচ্ছে তা ইয়ামামা কিংবা হাজারের কোনো এলাকা হবে। কিন্তু সেটা তো মূলত ইয়াসরিব নগরী।'[৩২২] দেশত্যাগের এই আমলকে হিজরত বলা হয়। মুসলমানরা ধীরে ধীরে ইয়াসরিব চলে যেতে থাকেন। হজরত বিলাল রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং আম্মার বিন ইয়াসির রাদিয়াল্লাহু আনহু সবার আগে হিজরতকারীদের মধ্যে ছিলেন।[৩২৩]

কুরাইশরা এই সংবাদ পেয়ে গিয়েছিল যে, আউস ও খাযরাজ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আশ্রয় দেওয়ার ব্যাপারে প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেছে। ফলে তারা যথাসম্ভব হিজরতকারীদের পথরোধ করতে থাকে। পরিবারসহ সর্বপ্রথম আবু সালামা রাদিয়াল্লাহু আনহু বের হন। তিনি তার স্ত্রী উম্মে সালামা রাদিয়াল্লাহু আনহা ও দুধের শিশু সন্তানকে নিয়ে রওনা হন। পথিমধ্যে মুশরিকরা তাকে ঘিরে ধরে। তারা বলে, তুমি যদি যেতে চাও, একা যেতে পারো; কিন্তু স্ত্রী-সন্তানকে আমাদের কাছে ছেড়ে যেতে হবে।'

আবু সালামা রাদিয়াল্লাহু আনহু তখন তাদেরকে আল্লাহর নিকট সোপর্দ করে বের হয়ে যান। হজরত উম্মে সালামা রাদিয়াল্লাহু আনহা এক বছর পর্যন্ত পিতার বাড়িতে অবরুদ্ধ থাকেন। আর সন্তান মা-বাপ থেকে দূরে চাচাদের কাছে লালিত-পালিত হচ্ছিল।

==কাজ্জাবকে কুপোকাত করে। এই আবদুল্লাহ বিন যায়েদই মদিনায় প্রসিদ্ধ হাররা যুদ্ধে ইয়াযিদের বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই করে শহীদ হন। [আলইসবাব, উসদুল গাবাহ, আলইসতিয়াব: নুসাইবা, আবদুল্লাহ বিন যায়েদ ও হাবিব বিন যায়েদ রা. এর জীবনী দ্রষ্টব্য]

৩২২. সহিহ বুখারি- কিতাবুল মানাকিব, বাবু হিজরাতিন নাবিয়্যি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)

৩২৩. সহিহ বুখারি- ৩৯২৪, কিতাবুল মানাকিব, বাবু হিজরাতিন নাবিয়্যি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)

সুহাইব রুমি রাদিয়াল্লাহু আনহু হিজরতের জন্য বের হলে কুরাইশ পিছু নিয়ে তার পথরোধ করে। অবশেষে তিনি তার সমুদয় সম্পত্তি তাদেরকে দিয়ে মুক্তি পান। কেবল হজরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু এমন এক ব্যক্তি ছিলেন, যিনি পুরোদস্তুর ঘোষণা দিয়ে হিজরত করেন এবং তার পথরোধ করার দুঃসাহস কারো হয়নি।[৩২৪]

---

৩২৪. আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া- ৪/৪২০-৪৩৭...। সাহাবায়ে কেরামের হিজরতে সময়ে নবুওয়াতের তেরো বছর পূর্ণ হয়ে চৌদ্দতম বছরের ৩য় মাস চলছিল।

নবীজির হিজরত

(রবিউল আওয়াল ১লা হিজরি/ সেপ্টেম্বর ৬২২)

আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে তখনও রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হিজরতের নির্দেশ দেওয়া হয়নি। হজরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহুও নবীজির নির্দেশের অপেক্ষায় ছিলেন। তার আন্তরিক ইচ্ছা ছিল নবীজির সঙ্গে সফরের সৌভাগ্য অর্জন করা। তিনি সফরের উদ্দেশ্যে দুটি উষ্ট্রী চার মাস যাবৎ বাবলা বৃক্ষের পাতা খাইয়ে পালছিলেন।[৩২৫]

সাহাবায়ে কেরাম মক্কা থেকে চলে যাচ্ছিলেন। হজরত উসমান বিন আফফান, আবদুর রহমান বিন আউফ, সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস, জুবাইর ইবনুল আওয়াম, তালহা বিন উবাইদুল্লাহ, যায়েদ বিন খাত্তাব, হামজা বিন আবদুল মুত্তালিব, যায়েদ বিন হারিসাসহ ধীরে ধীরে সকল সাহাবিই মদিনায় হিজরত করতে থাকেন। কেবল এমন কিছু সাহাবি রয়ে যান, যারা কাফেরদের একেবারে নখদর্পণে থাকার দরুন হিজরত করতে একেবারেই অপারগ ছিলেন।[৩২৬]

হিজাজের বিভিন্ন এলাকায় এমন কিছু সাহাবি ছিলেন, যাদের এলাকা

---

৩২৫. সহিহ বুখারি- ৩৯০৫, কিতাবুল মানাকিব, বাবু হিজরাতিন নাবিয়্যি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)

ফায়দা : ১। দ্বিতীয় বাইয়াতে আকাবা ১২ নববি-বর্ষ যিলহজে অনুষ্ঠিত হয়। ১৩ নববি-বর্ষে হিজরতে হুকুম নাজিল হলে সাহাবায়ে কেরামের হিজরত আরম্ভ হয়। আর সে সময়ই হজরত আবু বকর রা. নবীজির নিকট হিজরতের অনুমতি প্রার্থনা করা শুরু করে দেন এবং এ উদ্দেশ্যে দুটি উটও খরিদ করেন। [وعلف راحلتين كانتا عنده ورق السمر وهو الخبط أربعة أشهر সহিহ বুখারি- ৩৯০৫]

ফায়দা : ২। সওয়ারিকে বাবলা বৃক্ষের পাতার মতো এমন উন্নত পুষ্টিকর খাদ্য খাওয়ানোর উদ্দেশ্য ছিল, হিজরতের সফরে দুশমনের পিছু নেওয়ার আশঙ্কা ছিল। উষ্ট্রী যদি সুস্থ-সবল হয় এবং তার খাদ্যভান্ডারে খাবার সঞ্চিত থাকে, তা হলে সে দ্রুত ও বিরতিহীনভাবে দীর্ঘ সফর করতে সক্ষম হবে। উটের জায়গায় উষ্ট্রী বেছে নেওয়ার পিছনে হেকমত হয়তো এটা ছিল যে, মরুভূমিতে যদি খাবার না পাওয়া যায় তা হলে উটের দুধ পান করা যাবে।

ফায়দা : ৩। ঐ দুটি উষ্ট্রী উন্নতজাতের ছিল। হজরত আবু বকর রা. দুটিকে আটশ' দিরহাম (বর্তমান সময়ে যা দুই হাজার ডলার) দিয়ে ক্রয় করেছিলেন। [তাবাকাতে ইবনে সাদ- ১/২২৮] এর মধ্যে একটি উষ্ট্রীর নাম ছিল 'কাসওয়া'। নবীজির শেষজীবন পর্যন্ত তা উত্তম সওয়ারি হিসেবে ব্যবহৃত হয়। তার নাম জাদআ এবং আযবাও ছিল। [তাবাকাতে ইবনে সাদ- ১/৪৯২]

৩২৬. সহিহ বুখারি- ৪৯৪১, আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া- ৪২০-৪৩৭

নিরাপদ আশ্রয় ছিল। ফলে তারা নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আতিথেয়তার সৌভাগ্য অর্জনের আকাঙ্ক্ষা করতেন। তন্মধ্যে ইয়েমেনের দাউস গোত্রের এক বাহাদুর তুফাইল বিন আমর নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে তার দুর্ভেদ্য দুর্গে আসার জন্য আবদার করেন। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা এই সৌভাগ্য আনসারদের ভাগ্যে লিখে রেখেছিলেন। এজন্য রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তুফাইল বিন আমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর দরখাস্ত কবুল করেননি।[৩২৭]

হত্যার ষড়যন্ত্র

মুসলমানরা একে একে মক্কা ত্যাগ করতে থাকায় কুরাইশদের মনে আশঙ্কা জাগে, তারা সেখানে গিয়ে হয়তো এমন ঘাঁটি তৈরি করবে, যা মক্কার জন্য বিপজ্জনক হয়ে যাবে। তাই নবীজি সম্পর্কে এমন এক সিদ্ধান্তে পৌঁছতে হবে, এই নতুন ধর্ম যেন আর প্রসার লাভ করতে না পারে। এই উদ্দেশ্যে মক্কার বড় বড় নেতারা 'দারুন নদওয়া'তে পরামর্শে বসে। বৈঠকে প্রত্যেক বংশের একজন সরদার আহ্বান করা হয়। উমাইয়া বিন খালফ, আবু সুফিয়ান, আবু জাহল, নজর বিন হারিস গং উপস্থিত ছিল। কেউ কেউ প্রস্তাব দেয় যে, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বন্দি করা হোক। কেউ বলে, তাকে দেশান্তর করাই যথেষ্ট।

আবু জাহলের মত ছিল তাকে কতল করা হোক। বৈঠকের অন্যরা এই মতটিই প্রাধান্য দেয়। কিন্তু সমস্যা ছিল, তৎকালীন সমাজে গোত্রের প্রত্যেক সদস্যের জীবন রক্ষা করা প্রত্যেকের উপর কর্তব্য হিসেবে মনে করা হতো। আশঙ্কা ছিল, এই সিদ্ধান্তের কারণে বনু হাশিম এবং বনু আবদু মানাফের সকল শাখা হয়তো প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য একজোট হয়ে যাবে। ফলে মক্কা রণক্ষেত্রে পরিণত হবে। তখন অনেক আলোচনা-পর্যালোচনার পর সিদ্ধান্ত হয় যে, প্রত্যেক খান্দান থেকে একজন করে লোক নির্বাচন করা হবে এবং সম্মিলিতভাবে তারা আজ রাতেই নবীজির বাড়ি ঘেরাও করবে এবং সকলে একযোগে আক্রমণ করবে।[৩২৮]

হিজরতের নির্দেশ : আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর ঘরে নবীজি

সেদিনই আল্লাহ তায়ালা নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাৎক্ষণিক হিজরতের হুকুম করেন।[৩২৯] কুরাইশের অনেক লোকই নবীজির প্রতি চরম

---

৩২৭. সহিহ মুসলিম- ৩২৬, (কিতাবুল ঈমান)
৩২৮. সুরা আনফাল, আয়াত ৩০; সিরাতে ইবনে হিশাম- ১/৪৮০-৪৮২
৩২৯. সহিহ বুখারি- ৩৯০৫

দুশমনি থাকার পরেও নিজেদের মূল্যবান জিনিসপত্র ঠিকই আমানত রাখত। তিনি ঐসব আমানত হজরত আলি রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে সোপর্দ করে তা নির্দিষ্ট মালিকদের কাছে পৌঁছে দিয়ে তাকেও ইয়াসরিব চলে যাওয়ার নির্দেশ দেন।[৩৩০]

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার ঘর ত্যাগ করলেন। এই ঘরে তিনি হজরত খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহার সঙ্গে বিয়ের পর দীর্ঘ আটাশ বছর অতিবাহিত করেছেন। কিন্তু আজ কেবল এই ঘরই না; বরং এই পবিত্র শহর ছেড়ে তাকে চলে যেতে হবে। তাকে তখন স্ত্রী হজরত সাওদা রাদিয়াল্লাহু আনহা এবং ছোট দুই কন্যা উম্মে কুলসুম ও ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহুমাকেও ছেড়ে যেতে হচ্ছে। বড় কন্যা যায়নাব রাদিয়াল্লাহু আনহাও মক্কায় স্বামী আবুল আসের ঘরে ছিলেন। আবুল আস তখনও মুসলমান হননি।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রওনা হওয়ার ব্যাপারে অত্যন্ত গোপনীয়তা অবলম্বন করেন। যখন আল্লাহর তরফ থেকে হুকুম আসে সেদিন ভোর পর্যন্ত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুও জানতেন না যে, আজই তারা রওনা হবেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুপুরের তীব্র গরমের সময় মাথায় রুমাল দিয়ে ঘর থেকে বের হয়ে সোজা আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর গৃহে গমন করেন। তাকে বলেন যে, 'আল্লাহর পক্ষ থেকে হিজরতের হুকুম এসেছে।'

হজরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, 'আমার পিতামাতা আপনার জন্য উৎসর্গ হোক! আপনার সাহচর্য কি আমি পাব?'

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'তুমি আমার সঙ্গে যাবে।'[৩৩১]

আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু আনন্দে গদগদ হয়ে ওঠেন। আবেগে উদ্বেলিত হয়ে কেঁদে ফেলেন[৩৩২] এবং আরজ করেন, 'আমার দুটি উষ্ট্রীর একটি আপনি গ্রহণ করুন।'

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'ঠিক আছে, তবে মূল্য দিয়ে।'[৩৩৩]

হজরত আয়েশা এবং আসমা রাদিয়াল্লাহু আনহুমা অত্যন্ত দ্রুত সফরের জন্য খাবার-পানির আসবাবপত্র প্রস্তুত করেন। কিন্তু খাবারের থলি এবং পানির মশক বাঁধার জন্য কোনো রশি খুঁজে পাচ্ছিলেন না। ফলে আসমা রাদিয়াল্লাহু আনহা আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বললেন, 'বাঁধার জন্য কোমরবন্দ ছাড়া কিছুই নেই।'

---

৩৩০. সিরাতে ইবনে হিশাম- ১/৪৮৫

৩৩১. সহিহ বুখারি- ৩৯০৫

৩৩২. সিরাতে ইবনে হিশাম- ১/৪৮৫

৩৩৩. সহিহ বুখারি- ৩৯০৫

পিতা বললেন, 'এটা ছিঁড়ে দু'ভাগ করে এক ভাগ দিয়ে খাবারের থলি, আরেক ভাগ দিয়ে পানির মশকের মুখ বেঁধে দাও।' তিনি তাই করেন। এই কারণেই তাকে 'জাতুন নিতাকাইন' তথা দুই কোমরবন্দওয়ালী বলা হয়ে থাকে।[৩৩৪]

হজরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু তার কন্যা আসমা, আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা এবং অন্ধ বৃদ্ধ পিতা আবু কুহাফাকে একা ফেলে যাচ্ছিলেন। তার ঘরের সব অর্থকড়ি নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতের জন্য নিয়ে নেন।[৩৩৫] এরপর তিনি নবীজিকে নিয়ে ঘরের পেছনের দরজা দিয়ে বের হয়ে যান।[৩৩৬]

তারা বের হয়ে যাওয়ার পর হজরত আবু কুহাফার (রাদিয়াল্লাহু আনহু) যখন সন্দেহ হয়, তখন আসমা রাদিয়াল্লাহু আনহাকে জিজ্ঞেস করেন, 'আমার মনে হচ্ছে আবু বকর তোমাদের কষ্টে ফেলে অর্থকড়ি সব নিয়ে গেছে।'

হজরত আসমা রাদিয়াল্লাহু আনহা তখন তাকে আশ্বস্ত করার জন্য বললেন, 'না না, তিনি তো আমাদের জন্য অনেক রেখে গিয়েছেন।' তারপর আসমা রাদিয়াল্লাহু আনহা যেই তাকে মুদ্রা রাখা হতো, সেখানে ছোট ছোট পাথর রেখে দিয়ে তা কাপড় দিয়ে ঢেকে দেন। এরপর অন্ধ দাদার হাত ধরে সেই কাপড়ের উপর স্পর্শ করান। ফলে দাদা আশ্বস্ত হয়ে বলেন, 'ঠিক আছে, যদি এত কিছুই রেখে গিয়ে থাকে, তা হলে তো সে খুব ভালো করেছে। তোমাদের দিনকাল স্বাচ্ছন্দ্যেই কেটে যাবে।'[৩৩৭]

---

৩৩৪. সহিহ বুখারি- ২৯৭৯ (কিতাবুল জিহাদ, বাবু হামলিয যাদ ফিল গাযবি)

৩৩৫. মুসনাদ আহমাদ- ২৬৯৫৭, সহিহ বুখারি- ৩৯০৫ (কিতাবুল মানাকিব), সহিহ ইবনে হিব্বান- ৬২৭৭

ফায়েদা : নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) দুপুরে বের হওয়ার পিছনে হেকমত ছিল যে, কুরাইশ তার হিজরতের ব্যাপারে আঁচ করতে পেরেছিল, কিন্তু তারা নিশ্চিত ছিল যে, তিনি রাতের বের হবেন। রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাদের ধারণাতীত সময় দুপুরে বের হন, এ সময় সাধারণত লোকেরা বিশ্রামে থাকে। রওনা হন তিনি মাদানি রবিউল আওয়াল (মক্কি মহররম মাস) মোতাবেক সেপ্টেম্বর মাসে অর্থাৎ গ্রীষ্মের মৌসুমে। কিন্তু কিছু আলেম ইবনে ইসহাকের এই রেওয়ায়েত যেখানে হজরত আলি রা.কে চাদর দিয়ে ঢেকে নবীজির (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বিছানায় শুইয়ে রাখার' কথা এসেছে; তাকে তারা 'মক্কি রবিউল আওয়াল (মাদানি জুমাদাল উলা) মোতাবেক নভেম্বর বলে উল্লেখ করেন। অথচ নভেম্বরের শীতের মৌসুমে কেউ-ই আঙিনায় শুয়ে থাকে না। বরং সেপ্টেম্বরের শেষদিকে তো এমন হয় যে, রাতেরবেলা আঙিনায় বিশ্রাম নেওয়া হয়। আর এমন স্বাভাবিক উষ্ণতার মধ্যেও চাদর গায়ে দেওয়া কোনো আশ্চর্যের বিষয় নয়। তাই এটি নিঃসন্দেহে সেপ্টেম্বর মাস ছিল।

৩৩৬. সিরাতে ইবনে হিশাম- ১/৪৮৫

৩৩৭. মুসনাদ আহমাদ, ২৬৯৫৭

হিজরতের সফরের দূরদর্শিতা

যেহেতু মক্কা থেকে সোজা পথে ইয়াসরিব গেলে আশঙ্কা ছিল কুরাইশ পিছু নিয়ে আটক করে ফেলবে। তাই খুব বুঝে-শুনে তারা বের হলেন। হজরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু তার পুত্র আবদুল্লাহ এবং আজাদকৃত গোলাম আমের বিন ফুহাইরাকেও যুক্ত করে নেন। আবদুর রহমান বিন আবু বকর যেহেতু তখনও মুসলমান হননি, তাই তাকে কিছুই জানানো হলো না। সিদ্ধান্ত হয়, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু মক্কার বাইরে গারে সাউরে গিয়ে তিনরাত আত্মগোপন করে থাকবেন। এ সময় মক্কাবাসীর অবস্থাদি সম্পর্কে অবগত করার কাজ করতেন আবদুল্লাহ বিন আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু। তৃতীয়দিন যখন কুরাইশ ক্লান্ত হয়ে ক্ষান্ত দেয়, তখন তারা উষ্ট্রীতে চড়ে অপ্রসিদ্ধ পথে গন্তব্যের দিকে রওনা দেন। অপরিচিত রাস্তায় পথনির্দেশনা দেওয়ার জন্য পারিশ্রমিকের বিনিময়ে আবদুল্লাহ বিন উরাইকিত নামক একজন পেশাদার গাইড ভাড়া নেওয়া হয়। সে মুশরিক হলেও, গোপনীয়তা রক্ষায় ঝানু এবং বিশ্বস্ত ছিল।[৩৩৮]

আমার কওম যদি আমাকে না বের করে দিত!

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু উষ্ট্রীতে করে মক্কা থেকে বের হয়ে পড়লেন। একটি টিলায় উঠে তিনি পবিত্র নগরীকে সম্বোধন করে বলেন, 'হে মক্কা, আল্লাহর কসম, তুমি তো ভূপৃষ্ঠের সর্বোত্তম নগরী এবং আল্লাহ তায়ালার সবচেয়ে প্রিয় স্থান। আমাকে যদি আমার কওম বের করে না দিত, আমি কখনোই তোমার থেকে বের হতাম না।'[৩৩৯]

এই ঘটনা ২৮ সফর (মাদানি) ১লা হিজরি (১০ সেপ্টেম্বর ৬২২ খ্রিষ্টাব্দ)-এর।[৩৪০]

কুরাইশ ধারণা করেছিল রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতের বেলা হিজরত করবেন। তারা সে রাতেই নবীজির ঘর ঘেরাও করে। সে সময় নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশনা মোতাবেক হজরত আলি

---

৩৩৮. ঘটনার এই বর্ণনাবিন্যাস বিশুদ্ধ রেওয়ায়েত থেকেই পাওয়া যায়। দেখুন সহিহ বুখারি- ৩৯০৫, বাবু হিজরাতিন নাবিয়্যি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম), সহিহ ইবনে হিব্বান- ৬২৭৭

৩৩৯. সুনান তিরমিজি- আবওয়াবুল মানাকিব, বাবুন ফি ফাজলি মাক্কাহ

৩৪০. তাবাকাতে ইবনে সাদ- ১/২২৪ (خرج منها في صفر وقدم المدينة في شهر ربيع الأول)
অন্যান্য রেওয়ায়েত দ্বারা হিজরতের দিন সোমবার এবং রবিউল আওয়াল মাস সুনির্দিষ্ট। এর মাঝে এভাবে সামঞ্জস্য দেওয়া যায় যে, সফরের শেষদিকে ঘর থেকে বের হয়ে গারে সাওরে যান। সেখানে তিনরাত লুকিয়ে থাকার পর রবিউল আওয়ালের প্রথম সোমবার মদিনার উদ্দেশ্যে রওনা হন। এই হিসেবে গারে সাওরের মধ্যে আত্মগোপনের দিন ২৭ রজব শুক্রবার হয়।

রাদিয়াল্লাহু আনহু তার বিছানায় চাদর গায়ে দিয়ে ঘুমিয়ে ছিলেন।[৩৪১] কুরাইশ ধোঁকা খায়। তাদের কাছে আত্মীয়স্বজনের ঘরে অনুমতি ছাড়া প্রবেশ করা ছিল দোষের বিষয়। এজন্য তারা চারদিক থেকে ঘেরাও করে রাখে। দেওয়াল নিচু হওয়ার পরেও তারা বাইরেই দাঁড়িয়ে থাকে। ভোরের আলো ফুটে উঠলে তারা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে যায়।[৩৪২]

আবু জাহল সোজা হজরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর ঘরে যায়। হজরত আসমা রাদিয়াল্লাহু আনহাকে জিজ্ঞেস করলে তিনি অজ্ঞতার কথা জানালেন। আবু জাহল তাকে এত জোরে থাপ্পড় মারে যে, কানের দুল খুলে পড়ে। কিন্তু এরপরেও আল্লাহর এই বান্দি মুখ খোলেননি।[৩৪৩]

---

৩৪১. সিরাতে ইবনে হিশাম- ১/৪৮৩

ফায়েদা : ১। ইবনে ইসহাকের রেওয়ায়েত দুর্বল। মূলনীতি হলো, দুর্বল রেওয়ায়েত তখনই গ্রহণযোগ্য হবে, যখন তা সহিহ রেওয়ায়েত পরিপন্থি না হবে। ইবনে ইসহাকের উল্লিখিত রেওয়ায়েতের কিছু কথা গ্রহণযোগ্য। যেমন হজরত জিবরিল আমিন নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে বলেন, আজ রাতে আপনি আপনার বিছানায় ঘুমাবেন না।' এতে কোনো আপত্তি নেই। কারণ, এটা হওয়ার সম্ভাবনা অধিক যে, ভোরেই তাঁকে এই নির্দেশনা দেওয়া হয়েছিল।

তদ্রুপ হজরত আলি রা.-ও নবীজির বিছানায় শোয়ার ক্ষেত্রে কোনো প্রশ্ন নেই। কারণ, রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) দুপুরবেলা বের হওয়ার সময় তাঁকে এই নির্দেশ দিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু এটা মেনে নেওয়া খুবই কঠিন যে, মুশরিকদের মাথায় ধুলোবালি উড়িয়ে তিনি রাতেরবেলা ঘর থেকে বের হয়ে যান।

আল্লামা শিবলি রহ. এই দুই রেওয়ায়েতের মাঝে এভাবে সামঞ্জস্য দিয়েছেন যে, নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) দুপুরবেলা আবু বকর রা. এর ঘরে গিয়ে হিজরতের প্রস্তুতি নেওয়ার হুকুম দিয়ে আসেন। তার এক দু'দিন পর রাতেরবেলা নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তার ঘর থেকে হিজরতের জন্য বের হন।

কিন্তু সহিহ বুখারির রেওয়ায়েতে দেখা যায়, হজরত আবু বকর রা. এর ঘরে এমন তাড়াহুড়ো পড়ে যায় যে, খাবারের থলে এবং পানির মশকের মুখ বাঁধার মতো কোনো রশি না পাওয়া যাওয়ায় পরিধেয় কাপড় ছিঁড়ে তা বাঁধা হয়।' এই বর্ণনার সঙ্গে তো উপর্যুক্ত সামঞ্জস্য খাপ খায় না।

ফায়েদা : ২। রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যেভাবে শোয়ার সময় চাদর মুড়িয়ে শুতেন, সেভাবেই হজরত আলি রা. শুয়ে ছিলেন। রেওয়ায়েতে এসেছে-

فبات فيه عليّ وتغشى بردا أحمر حضرميا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام فيه

যারা হিজরতের ঘটনা শীতকালে হয়েছে বলেন, তারা তাদের দাবি জোরদার করার জন্য উপর্যুক্ত বর্ণনায় উল্লিখিত চাদরকে 'পশমি চাদর' হিসেবে ব্যক্ত করেন। অথচ 'পশমি' বুঝায় এমন কোনো আরবি শব্দ রেওয়ায়েতে ব্যবহৃত হয়নি।

৩৪২. সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ- ৩/২৩৪

৩৪৩. সিরাতে ইবনে হিশাম- ১/৪৮৭। এক যয়িফ বর্ণনা অনুযায়ী হজরত আসমা রা. রাতেরবেলা গারে সাওরে খাবারও নিয়ে যেতেন। [আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া- ৪/৪৪৭]

গারে সাওরে আত্মগোপন এবং কুরাইশের টোপ

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গারে সাওর পৌঁছেই দুটি উষ্ট্রী আবদুল্লাহ বিন উরাইকিতকে দিয়ে[৩৪৪] তৃতীয় রাতে এখানে আসার জন্য বলে দেন। পরিকল্পনা অনুযায়ী আবদুল্লাহ বিন আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু যেহেতু অনেক চতুর বালক ছিলেন, তাই প্রতিদিন সন্ধ্যায় মক্কাবাসীর সকল শলাপরামর্শ এবং পুরস্কার ঘোষণার সংবাদ গুহায় পৌঁছে দিত। রাত গুহাতেই কাটাত। আমের বিন ফুহাইরা সারাদিন বকরি চড়িয়ে সন্ধ্যার পর বকরির দুধ পরিবেশন করতেন।[৩৪৫]

কুরাইশ নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে শহরে খুঁজে না পেয়ে রাস্তায় রাস্তায় তল্লাশি করতে শুরু করে। তাকে হত্যা কিংবা গ্রেফতার করে আনতে পারলে একশ' উট পুরস্কার ঘোষণা করে।[৩৪৬] এমন লোভনীয় পুরস্কারের ঘোষণা শুনে বহুলোক তাদের সন্ধানে বেরিয়ে পড়ে। ঘটনাক্রমে খোঁজ করতে করতে কিছু কিছু লোক গারে সাওরের মুখ পর্যন্ত পৌঁছে যায়। তখন হজরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর পেরেশানি চরম আকার ধারণ করে। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রাণনাশের আশঙ্কায় তিনি অত্যন্ত বিচলিত হয়ে যান। অস্থির হয়ে বলেন, 'ইয়া রাসুলাল্লাহ, এই লোকগুলো যদি তাদের পায়ের দিকে তাকায়, তা হলেই তো আমাদের দেখে ফেলবে'। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিশ্চিন্তে উত্তর দেন, 'আবু বকর, ঘাবড়াবে না। আল্লাহ আমাদের সঙ্গে আছেন।'

কুরাইশরা এত কাছে পৌঁছেও বিফল হয়ে ফিরে যায়।[৩৪৭]

---

৩৪৪. বুখারি ও ইবনে হিব্বানের সহিহ বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, রাতে ঘর থেকে বের হওয়ার রেওয়ায়েতগুলো সহিহ নয়। তা ছাড়া সনদের দিক থেকেও সেগুলো দুর্বল। তদ্রূপ পায়ে হেঁটে গারে সাওর পর্যন্ত যাওয়ার কথাও সহিহ নয়। কারণ, ইবনে হিব্বানের সহিহ রেওয়ায়েতে সুস্পষ্ট উল্লেখ আছে যে, 'এরপর তারা দু'জন উষ্ট্রীতে আরোহণ করে গারে সাওরে পৌঁছেন।' হ্যাঁ, একটি যয়িফ রেওয়ায়েতে এসেছে, পাহাড়ের এমন দুর্গম পথে হজরত আবু বকর রা. নবীজি সা কে কাঁধে উঠিয়ে নিয়েছিলেন। [আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া- ৪/৪৫০]

তবে যৌক্তিক হলো, গারে সাওর পাহাড়ের যতটুকু পর্যন্ত যাওয়া যায়, তারা দু'জন সওয়ারিতে করেই গিয়েছেন। এরপরের দুর্গম পথ পায়দল অতিক্রম করেছেন। সহিহ বুখারির রেওয়ায়েত থেকেও সম্ভবত এদিকেই ইঙ্গিত পাওয়া যায়। [সহিহ বুখারি- ৪০৯৩ - فانطلقا حتى أتيا الغار]

৩৪৫. সহিহ বর্ণনার মাধ্যমে আমের বিন ফুহাইরার কর্মতৎপরতা অনেক গুরুত্বপূর্ণ বুঝা যায়। তিনি দুধ পান করানোর জন্য বকরিগুলোকেও সঙ্গে নেওয়ার পেছনে কারণ ছিল বকরিগুলোর আসা-যাওয়ার ফলে মানুষের পদচিহ্ন মুছে যাবে। কেননা, কুরাইশ পদচিহ্নের মাধ্যমে খুঁজে নিতে পারদর্শী ছিল। [সিরাতে ইবনে হিশাম- ১/৪৮৬]

৩৪৬. সহিহ বুখারি- ৩৯০৫ (বাবু হিজরাতিন নাবিয়্যি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম), সহিহ ইবনে হিব্বান- ৬২৭৭

৩৪৭. সুরা তাওবা, আয়াত ৪০; সহিহ বুখারি- ৩৬৫৩ (বাবু মানাকিবিল মুহাজিরিন, সহিহ ইবনে হিব্বান- ৬২৭৮

গারে সাওর থেকে হিজরতভূমির উদ্দেশে

তিনরাত লুকিয়ে থেকে রাতের শেষপ্রহরে পুনরায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু গুহা থেকে বের হন।[৩৪৮] বাহন হিসেবে দুই উষ্ট্রী আগে থেকেই প্রস্তুত ছিল। পথনির্দেশক আবদুল্লাহ বিন উরাইকিত এবং আমের বিন ফুহাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহুও এসে পৌঁছেছিল। এবার চার ব্যক্তির কাফেলা একটি দুর্বোধ্য রাস্তা দিয়ে চলা শুরু করল। এটি সাধারণ জনপদের তুলনায় উপকূলের নিকটবর্তী রাস্তা ছিল।

১লা হিজরি রবিউল আওয়াল (১৩ সেপ্টেম্বর ৬২২ খ্রিষ্টাব্দ) সোমবার আপন গন্তব্যের উদ্দেশে তারা যাত্রা করেন। এক রাত এবং পরবর্তী দিন খুব দ্রুততার সাথে তারা পথ চলেন। প্রচণ্ড গরম ছিল। দূরদূরান্ত পর্যন্ত কোনো মানুষ দেখা যেত না। গরম, ক্লান্তি ও অবসাদের কারণে দ্বিপ্রহরের সময় তারা ছায়া তালাশ করতে লাগলেন। এক জায়গায় তারা একটি উঁচু চওড়া পাথর দেখতে পান। তার কিছু ছায়া দেখা যায়। হজরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু নিজে জমিনে চাদর বিছিয়ে দিয়ে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলেন, 'ইয়া রাসুলাল্লাহ, আপনি আরাম করুন।'

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিশ্রাম করছিলেন, আর হজরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু চতুর্দিকে পায়চারি করে দেখছিলেন কেউ তাদের পেছনে পেছনে আসছে কি না। কিছুক্ষণ পর এক রাখাল তার বকরির পাল নিয়ে ছায়ার খোঁজে এদিক দিয়ে যাচ্ছিল। হজরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কার রাখালি করো? সে কুরাইশের এক ব্যক্তির নাম বলল। সিদ্দিকে আকবার রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, 'তোমার কাছে কি কোনো

---

৩৪৮. শহর থেকে হেরাগুহা পর্যন্ত যেতে দুই প্রহর সময় লাগে। [সহিহ বুখারি- ৩৯০৫, ৩৯০৭]। আর গুহা থেকে মূল সফর রাতে শুরু হয়েছিল। সহিহ বুখারিতে হজরত আবু বকর রা. এর শব্দ থেকেও তা বুঝা যায়: (فخرجنا ليلا فاحثثنا ليلتنا:) (৩৬১৫ :اسرينا ليلتنا ومن الغد ويومنا ৩৯৭১) কিন্তু হজরত আবু বকর রা. এর (২২৬৪ :صبح ثالث: رواه البخاري) থেকে এটাও পরিষ্কার হয়, সফর রাতের শেষপ্রহরে আরম্ভ হয়েছে। আর এটাকেই তিনি 'সুবহ' শব্দ দিয়ে ব্যক্ত করেছেন।

এই দৃষ্টিকোণ থেকে গারে সাওরে পূর্ণ তিনদিন (৭২ ঘণ্টা) নয় বরং ৬০ ঘণ্টার কাছাকাছি সময় অবস্থান করেছেন। অর্থাৎ জুমার দুপুরে তিনি ঘর বের হওয়ার পর আনুমানিক তিন ঘণ্টা তথা ষষ্ঠপ্রহরে তারা গারে সাওরে পৌঁছে যান। জুমার দিন ষষ্ঠপ্রহর থেকে নিয়ে রবি এবং সোমবারের মাঝামাঝি রাতের শেষপ্রহর পর্যন্ত সেখানে অবস্থান করেন।

ফলে আত্মগোপনের সময়কাল পূর্ণ তিন দিন তিন রাত নয়, বরং দুই দিন তিন রাত হয়। বুখারির রেওয়ায়েত [হাদিস : ৩০৯৫] 'তিন রাত' থেকেও উপর্যুক্ত বক্তব্য সুস্পষ্ট প্রমাণিত হয়।

দুধাল বকরি আছে?' সে ইতিবাচক উত্তর দিলে তিনি বললেন, আমাদেরকে দুধ পান করাবে?'

রাখাল তখন পাত্র নিয়ে দুধ দোহন করার জন্য বসে যায়। কিন্তু আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, প্রথমে তুমি বকরির ওলান, পাত্র এবং তোমার হাত ধুলোবালি থেকে পরিষ্কার করে নাও। রাখাল সব পরিষ্কার করে নেয়। এরপর সে দুধ দোহন করে তাদের সম্মুখে পরিবেশন করে।

হজরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জাগাতে চাচ্ছিলেন না। কিন্তু দুধ নিয়ে কাছে আসতেই তিনি জেগে উঠলেন। আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু তার কাছে থাকা মুখ-বাঁধা মশক থেকে দুধের সাথে পরিষ্কার পানি মেশান এবং এই ঠান্ডা দুধ নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে পরিবেশন করে বলেন, 'ইয়া রাসুলাল্লাহ, এইটুকু আপনি পান করুন!' পান করা শেষ হলে জিজ্ঞেস করলেন, 'ইয়া রাসুলাল্লাহ, আমাদের রওনা হওয়ার সময় হয়েছে কি?'

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হ্যাঁ, অবশ্যই হয়েছে!'[৩৪৯]

সূর্য তখন ঢলে পড়েছিল। সফর পুনরায় শুরু হয়। বিরান পথ শেষ হয়ে গেছে। এখন এমন কিছু গোত্র সামনে পড়ছিল, যা আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু চিনতেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চিনতেন না। হজরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে দেখতে বয়স্ক মনে হতো, অপরদিকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে একেবারে নওজোয়ান ও তরুণ দেখাত। লোকেরা আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে জিজ্ঞেস করত, 'আবু বকর, তোমার সঙ্গে উনি কে?' তিনি উত্তর দিতেন, هذا الرجل يهديني السبيل 'উনি আমাকে পথ দেখান।'[৩৫০] মানুষ মনে করত তিনি সাধারণ গাইড। আর আবু বকর

---

৩৪৯. সহিহ বুখারি- ৩৬১৫ (বাবু আলামাতিন নুবুওয়াহ), বাবু মানাকিবিল মুহাজিরিন, হাদিস : ৩৬৫২, বাবু হিজরাতিন নাবিয়্যি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম- হাদিস ৩৯১৭

৩৫০. সহিহ বুখারি- ৩৯১১ বাবু হিজরাতিন নাবিয়্যি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-

কিছু উপকারী তথ্য

১.সহিহ বুখারির এই দৃশ্যপট বর্ণনা বলে দিচ্ছে যে, হিজরত শীতে নয়, বরং গ্রীষ্মকালে হয়েছিল। অন্যথায় শীতকালে ধূমায়িত জিনিসই প্রিয়, ঠান্ডা পানীয় নয়।

২.নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গুহা থেকে বের হয়ে সর্বপ্রথম যে জায়গায় বিশ্রাম করেন, তার নাম 'কুদাইদ' ছিল। [তাবাকাতে ইবনে সাদ- ১/২৩২] এটি মক্কা মুকাররমা থেকে ১০০ মাইল দূরে অবস্থিত। এ থেকে বুঝা যায়, প্রথম ১০ ঘণ্টার সফর খুব দ্রুত ছিল। প্রতি ঘণ্টায় ১০ মাইল অতিক্রম করা হয়।

৩.যে অপ্রসিদ্ধ রাস্তা দিয়ে হিজরতের এই দীর্ঘ সফর সংঘটিত হয়েছিল, তার দৈর্ঘ্য ছিল ৪৪৬ কিলোমিটার (২৭৭ মাইল) অর্থাৎ ১৭ মঞ্জিল। এই দীর্ঘপথ মাত্র সাতদিনে পাড়ি দেন। তার

রাদিয়াল্লাহু আনহুর উদ্দেশ্য ছিল তিনি সঠিক পথের দিশারি।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিশ্চিন্তে কুরআনে কারিমের তেলাওয়াত করছিলেন। আর আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু চতুর্দিকে সজাগ দৃষ্টি রাখছিলেন। কারণ, তখনও কারো পিছু নেওয়ার আশঙ্কা ছিল। বাস্তবেও বিপদ তাদের মাথার উপর ছিল। বনু মুদলাজের এক ঘোড়সওয়ার সুরাকা বিন মালিক কুরাইশের সেই একশ উট পুরস্কারের ঘোষণা শুনে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসন্ধানে লাগে। অবশেষে সে মরুভূমিতে দূর থেকে নবীর কাফেলার সন্ধান পেয়ে যায়। সুরাকা ঘোড়ায় চাবুকাঘাত করে দ্রুত ঘোড়া ছুটিয়ে কাফেলা থেকে তার দূরত্ব কমিয়ে আনে। একপর্যায়ে সে এত নিকটে চলে আসে যে, সে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তেলাওয়াতের আওয়াজও শুনতে পায়। হজরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু দ্রুত ধাবমান একটি ঘোড়সওয়ার আসতে দেখে বললেন, 'এ ঘোড়সওয়ার তো আমাদের নিকটে পৌঁছে যাবে?'

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তর দেন, 'বিচলিত হবে না। আল্লাহ তায়ালা আমাদের সঙ্গে আছেন।' এরপর তিনি দোয়া করেন, 'হে আল্লাহ, তাকে দাবিয়ে দিন।' সাথে সাথে সুরাকা বিন মালিক ঘোড়াসহ ভূমিতে দেবে যায়। সুরাকার তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সত্যবাদিতা এবং তার আসন্ন বিজয় সম্পর্কে একিন হয়ে যায়। এজন্য কালবিলম্ব না করে নবীজির নিকট ক্ষমা ও নিরাপত্তার আবেদন করে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশে আমের বিন ফুহাইরা একটি চামড়ায় নিরাপত্তা-পত্র লিখে দেন। এরপর নবীজি তাকে নির্দেশ দেন, 'তুমি এই রাস্তায় থাক, কাউকে এদিকে আসতে দেবে না।' সুরাকা তার নির্দেশ পালনের প্রতিশ্রুতি দেয়।[৩৫১]

অর্থ হলো, সফরের গতি অস্বাভাবিকের চেয়ে দ্রুত ছিল। হজরত আবু বকর রা. এর [أحثثنا: সহিহ বুখারি- ৩৯৭১] শব্দও দ্রুতগতির কথা সুস্পষ্ট প্রমাণ করে। বাহ্যিক উপকরণের দিক থেকে দুই উষ্ট্রীকে হজরত আবু বকর রা. এর চার মাস প্রতিপালন ভালো ফল দিয়েছে।

৪.হাদিসের রাবিগণ সফরের রাস্তার পূর্ণ বিবরণ সংরক্ষণ করেছেন। ইবনে সাদ এর রেওয়ায়েত মোতাবেক হিজরতের সফরে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিম্নোক্ত স্থানগুলো দিয়ে অতিক্রম করেছেন : কুদাইদ, খাররার, সানিয়াতুল মাররা, লাক্‌ফ, মাদলাজাতু লাক্‌ফ, মাদলাজাতু মিজাজ, মিরহাজু মিজাজ, বাতনে মিরজা, বাতনে যাতু কাশদ, আলহাদায়িদ, আল-ইযাখির, বাতনে রায়েগ, যু-সালম, মাদলাজা, উসানিয়া, বাতনুল কাহাহ, আল-আরজ, আল-জাদাওয়াত, আল-গাবির (রাকুবার ডানে), বাতনুল আকিক, জিসজাসা, কুবা। [তাবাকাতে ইবনে সাদ- ১/২৩২, ২৩৩]

৩৫১ সহিহ বুখারি- ৩৬৫২, ৩৬১৫ (বাবু আলামাতিন নুবুওয়াহ), বাবু মানাকিবিল মুহাজিরিন, হাদিস : ৩৬৫২,
বাবু হিজরাতিন নাবিয়্যি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম; হাদিস ৩৯১৭; সহিহ মুসলিম,

সুরাকা বিন মালিকের জন্য সুসংবাদ

ইসলামের ইতিহাসে যখন দুর্দিন চলছিল, স্বয়ং নবীজির জীবনই যেখানে বিপন্ন ছিল, সেই মুহূর্তে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুরাকা বিন মালিককে এমন সুসংবাদ দেন, যা ইসলামের সত্যতার প্রমাণ বহন করে এবং মুসলমানদের জন্য একটি উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জানান দেয়। তিনি সুরাকাকে বলেন, 'সুরাকা, তোমার তখন কেমন লাগবে যখন তোমার হাতে কিসরার কঙ্কণ পরিয়ে দেওয়া হবে?'

সুরাকা বিন মালিক তখন সীমাহীন বিস্ময় নিয়ে ফিরে যাচ্ছিল। সাথে সাথে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পূর্ণতার উপর তার একিন হয়ে গিয়েছিল। কে জানত যে, মাত্র পনেরো বছর পর নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দ্বিতীয় খলিফা হজরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর যুগে কিসরার ধনভান্ডার মুসলমানদের পদানত হবে এবং নওশেরওয়াঁর কঙ্কণ সুরাকার হাতে পরিয়ে দেওয়া হবে?'[৩৫২]

সুরাকা বিন মালিক তার প্রতিশ্রুতি পূরণ করে এবং সেদিকে আগত সকল মুশরিককে এ বলে ফিরিয়ে দেয় যে, আমি এদিক খুঁজে চলে এসেছি।[৩৫৩] পরবর্তীতে সুরাকা ইসলাম গ্রহণ করে সাহাবিদের কাফেলায় শামিল হয়ে যান।

অবশেষে এই মুবারক কাফেলা তার গন্তব্যের কাছাকাছি প্রসিদ্ধ জনপথে উঠে যান। এখানেই সর্বপ্রথম সাক্ষাৎ হয় শাম থেকে প্রত্যাবর্তনকারী মুসলমানদের একটি বাণিজ্য-কাফেলার সঙ্গে। এদের মধ্যে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ফুফাতো ভাই, হজরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর জামাতা জুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুও ছিলেন। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাপড়চোপড় ধুলোয় ধূসরিত হয়ে গিয়েছিল। ফলে হজরত জুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাকে একটি সাদা কাপড় হাদিয়া দেন।[৩৫৪]

৭৭০৬ (আয-যুহদ ওয়ার রাকায়িক, বাবুন ফি হাদিসিল হিজরাহ), দারুল জীল সংস্করণ

নোট : বিস্ময়কর ব্যাপার হলো, উপকরণহীন এমন সফরেও লেখাপড়ার উপকরণ ঠিকই সঙ্গে নিয়েছিলেন। অথচ এ ধরনের সফরে এমন জিনিসের প্রয়োজন পড়ার আশঙ্কা ছিল খুবই ক্ষীণ। এতেই বুঝা যায়, ইসলামে লেখালেখির গুরুত্ব কত।

৩৫২. দালাইলুন নুবুওয়াহ- ৬/৩২৫

৩৫৩. সহিহ মুসলিম, ৭৭০২ (আযযুহদ ওয়ার রাকায়িক, বাবুন ফি হাদিসিল হিজরাহ), দারুল জীল সংস্করণ

৩৫৪. সহিহ বুখারি- ৩৯০৫ (বাবু হিজরাতিন নাবিয়্যি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)

হিজরতের সফরনামা এত লম্বা করে এজন্য উল্লেখ করা হয়েছে যে-

প্রথমতঃ ইসলামের ইতিহাসে ঘটনাটির অত্যন্ত গুরুত্ব ও তাৎপর্য রয়েছে। আর এজন্যই ইমাম বুখারি রহ. তার নিকট সংক্ষিপ্ততা পছন্দ হওয়া সত্ত্বেও সহিহ বুখারিতে হিজরতের==

পাঠকবৃন্দ আশা করি সুস্পষ্টভাবে বুঝে গিয়েছেন যে, এই ঐতিহাসিক হিজরত সফরের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত হজরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু পরিবারসহ জানমাল দিয়ে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গ দিয়েছেন। হিজরত শুরুও হয়েছে তার ঘর থেকেই। গুহায় আত্মগোপনের বিষয়টি প্রকাশ হতে না দেওয়ার দায়িত্বও আদায় করেছে তার পরিবার। সর্বশেষ তার পরিবারের সদস্যই হাদিয়া পেশ করার গৌরব অর্জন করেন। এর থেকেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর মাঝে গভীর সম্পর্ক এবং তার উপর আস্থাশীলতার পরিমাণ অনুমান করা যায়।

গারে সাওরের আয়াতের আলোকে হজরত আবু বকরের মর্যাদা

হিজরতের এই স্মরণীয় ও ঐতিহাসিক সফরের কথা কুরআনে কারিমেও আলোচিত হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা গারে সাওরের নিঃসঙ্গতায় রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও হজরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর সাহচর্যের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন। ইরশাদ হয়েছে,

إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللهَ مَعَنَا فَأَنْزَلَ اللهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَى وَكَلِمَةُ اللهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

'যদি তোমরা তাকে (রাসুলকে) সাহায্য না কর, তবে মনে রেখ, আল্লাহ তার সাহায্য করেছিলেন, যখন তাকে কাফেররা বের করে দিয়েছিল, তিনি ছিলেন দুজনের একজন। যখন তারা গুহায় ছিলেন তখন তিনি আপন সঙ্গীকে বললেন, বিষণ্ন হয়ো না, আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন। অতঃপর আল্লাহ তার প্রতি স্বীয় সান্ত্বনা নাজিল করলেন এবং তার সাহায্যে এমন বাহিনী পাঠালেন, যা তোমরা দেখনি। বস্তুত আল্লাহ কাফেরদের মাথা নিচু করে দিলেন আর আল্লাহর কথাই সদা সমুন্নত এবং আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।'[৩৫৫]

ইমাম রাজি রহ. এর তাত্ত্বিক আলোচনা

ইমাম রাজি রহ. তার 'তাফসিরে কাবির' গ্রন্থে উপর্যুক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় হজরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর কিছু বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করেন। আমরা নিচে তার সারকথা তুলে ধরছি-

==সফরকাহিনি সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন।

দ্বিতীয়তঃ সিরাতের কিতাবসমূহে হিজরতের কাহিনি সংশ্লিষ্ট অনেক যয়িফ বরং মাওজু রেওয়ায়েতও এসেছে। অথচ সহিহ রেওয়ায়েতসমূহে কিছু বিস্তারিত আলোচনা আসেনি। এজন্য আমরা চেষ্টা করেছি সহিহ রেওয়ায়েতের আলোকে হিজরতের মূল চিত্রটা পাঠকের সামনে তুলে ধরতে। কিছু টুকরো কথা ছাড়া অধিকাংশ তথ্যই সহিহ বুখারি থেকে নিয়েছি।

৩৫৫. সুরা তাওবা, আয়াত ৪০

হিজরতের সফর মূলত কুরাইশের নিপীড়ন ও শত্রুতা থেকে মুক্তির উদ্দেশ্যে সংঘটিত হয়েছিল। হজরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর ঈমানের ব্যাপারে যদি নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিন্দুপরিমাণ সংশয় থাকত, তা হলে তাকে কখনোই সঙ্গে নিতেন না। কেননা, আশঙ্কা রয়ে যেত যে, সে আবার দুশমনকে অবহিত করে দেয় কি না। কেবল হজরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়াই তার উপর নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস প্রমাণ করে এবং এই বাস্তবতারও মজবুত দলিল যে, তিনি তার একজন নিষ্ঠাবান, মুখলিস, বিশ্বস্ত ও অনুগত সঙ্গী ছিলেন।

হিজরত আল্লাহ তায়ালার বিশেষ নির্দেশে হয়েছে। এত সাহাবি এবং আত্মীয়স্বজন থাকতে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কেবল হজরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বেছে নেওয়াই সবার উপর তার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করে।

আল্লাহ তায়ালা হজরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে 'দুজনের একজন' বলে উল্লেখ করেছেন। ঐতিহাসিকভাবেও প্রমাণিত যে, তিনিই মান-মর্যাদার অধিকাংশ আসনে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দ্বিতীয় ব্যক্তি তথা সবচেয়ে নিকটতম ব্যক্তি ছিলেন। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পর তিনিই দ্বিতীয় ব্যক্তি ছিলেন, যার মধ্যে তাওহিদ ও আকিদা ভরপুর ছিল। তিনিই দ্বিতীয় ব্যক্তি, যার প্রচেষ্টায় হজরত তালহা, জুবাইর, উসমান বিন আফফানসহ বড় বড় সাহাবিরা মুসলমান হন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন হিজরত করে মদিনায় পৌঁছেন, তখন সঙ্গে কেবল হজরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুই ছিলেন। আনসাররা নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে যে দ্বিতীয় ব্যক্তিকে দেখেছিল, তিনি হলেন হজরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু। তিনি প্রতিটি গাজওয়াতে শরিক হয়েছিলেন। এক মুহূর্তের জন্যও তিনি নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে পৃথক হননি।

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মৃত্যুপূর্ব অসুস্থতার সময়ও 'দুজনের একজন' ছিলেন। তিনিই নামাজের ইমামতি করেন।

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সবচেয়ে নিকটবর্তী স্থানে দাফন হয়ে তিনি ঐ জগতেও 'দুজনের একজন' হয়ে থাকেন।

গারে সাওরে যখন নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতিরক্ষায় বিচলিত হয়ে পড়েছিলেন, এমন নাজুক পরিস্থিতিতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছিলেন,

ما ظنُّك باثنين الله ثالثُهما

ওই দুই ব্যক্তির ব্যাপারে তোমার কী ধারণা, যাদের তৃতীয় জন আল্লাহ?

এই শর্ত গুলো চিরকালের জন্য নবীজির সংশ্রব এবং আল্লাহ তায়ালার সাহায্যের সার্টিফিকেট ছিল। এর চেয়ে বড় কোনো সম্মাননা হতে পারে না।

মুফাসসিরগণ একমত যে, إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ দ্বারা হজরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু উদ্দেশ্য। আল্লাহ তায়ালা لِصَاحِبِهِ বলে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবি বলে স্বীকৃতি দিয়েছেন। এজন্য ওলামায়ে কেরাম বলেন, 'যে ব্যক্তি হজরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে সাহাবি না মানবে, সে উক্ত আয়াত অস্বীকার করার কারণে ইসলামের গণ্ডি থেকে বের হয়ে যাবে।[৩৫৬]

***

৩৫৬ তাফসিরু মাফাতিহুল গায়েব (আততাফসিরুল কাবির), ফখরুদ্দীন রাজি : ১৬/৫০-৫৪ (দারু ইহয়াতিত তুরাসিল আরাবি সংস্করণ)

প্রথম ইসলামি হুকুমত

শহরের লোকদের কাছে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মক্কা থেকে রওনা হওয়ার সংবাদ পৌঁছে গিয়েছিল (সম্ভবত তাদের কাছে এই সংবাদ পৌঁছেছিল যে, তিনি রাতদিন সফর করছেন, এর মাঝে বিরতি ও বিশ্রামও নিচ্ছেন)। এজন্য ইয়াসরিববাসী প্রতিদিন ফজর নামাজ আদায় করে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগমনের অপেক্ষায় শহরের বাইরে গিয়ে দূরদূরান্ত পর্যন্ত তাকিয়ে থাকত। যখন সূর্যের তাপ তীব্র হয়ে উঠত, তখন তারা ঘরে ফিরে যেত।[৩৫৭]

কুবায় আগমন

অবশেষে একদিন যখন সূর্য ভালোভাবে উদিত হলো, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন ইয়াসরিবের পার্শ্ববর্তী বসতি 'কুবা'র সন্নিকটে এসে পৌঁছান। মদিনার অধিবাসীরাও তখন তাদের অভ্যাসমতো অপেক্ষা করে করে সূর্যতাপ তীব্র হলে ঘরে ফিরে যাচ্ছিল। ইতোমধ্যে এক ইহুদি নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তার সঙ্গীকে সাদা কাপড় পরিহিত অবস্থায় আসতে দেখে। মরুভূমির মরীচিকায় তাদের শুভ্র পোশাক চিকচিক করছিল। ইহুদি তখন অকপটে বলতে থাকে- 'হে আরববাসী, তোমাদের সৌভাগ্য এসে গেছেন, যার জন্য তোমরা অপেক্ষা করছিলে।'

এ কথা শুনেই আনসাররা আরবদের সংবর্ধনারীতি অনুযায়ী হাতিয়ার ধারণ করে এবং নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আশেকরা তাকে বরণ করে নেওয়ার জন্য দৌড়াতে থাকে। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের অভ্যর্থনার ভেতর দিয়েই চলতে চলতে কুবার বনু আমর বিন আউফের বসতিতে পৌঁছেন। (এখানেই অধিকাংশ মুহাজির অবস্থান করছিলেন। খোলা ময়দানে এসে থামলেন এবং চুপচাপ বসে পড়লেন। হজরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ভিড় থেকে বাঁচানোর জন্য নিজেই দাঁড়িয়ে লোকদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে থাকেন।

যারা ইতিপূর্বে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেনি, তারা আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুকেই সালাম দিতে থাকে। এভাবে যখন সূর্য মাথার উপর ওঠে এবং গরম অসহ্য রকম তীব্র হয়, তখন আবু বকর রাদিয়াল্লাহু

৩৫৭. সহিহ বুখারি : হাদিস নং ৩৯০৬ (বাবু হিজরাতিন নাবিয়্যি -সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম), সিরাতে ইবনে হিশাম : ১/৪৯২

আনহু চাদর দিয়ে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ছায়া দেন। এবার সকলেই খাদেম-মাখদুম (সেবক-মণিব) চিনতে সক্ষম হয়।[৩৫৮]

এটি ৮ রবিউল আওয়াল (২০ সেপ্টেম্বর ৬২২) সোমবারের ঘটনা।[৩৫৯]

মসজিদে কুবা নির্মাণ

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বনু আমর বিন আউফে অবস্থান করেন। সেখানে একটি মসজিদের গোড়াপত্তন করেন, যা আজও 'মসজিদে কুবা' নামে প্রসিদ্ধ। এখানেই তিনি নামাজ আদায় করতেন।[৩৬০] এটিই ছিল রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্মিত প্রথম মসজিদ।

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানুষের আমানত ফেরত দেওয়ার

---

৩৫৮. সহিহ বুখারি : হাদিস নং ৩৯০৬

ফায়দা : উক্ত হাদিসে রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সীমাহীন বিনয় এবং আবু বকর রা. এর সুউচ্চ আদবের বহিঃপ্রকাশ ঘটে। এমন ঐতিহাসিক মুহূর্তেও তিনি নিজেকে প্রকাশ করার চেষ্টা করেননি। হজরত আবু বকর রা. কর্মতৎপরতার দ্বারা চূড়ান্ত আদব ও শিষ্টাচারের উপমা পেশ করেছিলেন। হাতে চুমু দেওয়া, জুতা ওঠানোই কেবল আদব নয়; আসল আদব তো হলো মাখদুমের আরামের ব্যবস্থা করা এবং তাকে ভিড় থেকে বাঁচানো।

রাসুলুল্লাহ (সাল্ল্াল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এক দীর্ঘ সফর সমাপ্ত করে বড় বড় ঝক্কি-ঝামেলা সয়ে এসেছেন। তার ঐ মুহূর্তে বিশ্রামের প্রয়োজন ছিল। আর এখানে আরাম এটাই ছিল যে, তাকে মানুষের ভিড় ও সাক্ষাতের ঝামেলা থেকে মুক্ত রাখা। সালাম, মুসাফাহা থেকে তাৎক্ষণিক রেহাই দেওয়া। ফলে খাদেমই তার পক্ষ থেকে এগুলো আঞ্জাম দেন। এতে কোনো ধরনের বড়ত্ব কিংবা অহমিকার (নাউজুবিল্লাহ) লেশমাত্র ছিল না। কারণ, এই আবু বকরই কিছুক্ষণ পর ছায়া দিতে তার মাথার উপর চাদর মেলে ধরেছেন। একেই বলে খেদমত। এ-ই হলো আদব।

৩৫৯. সহিহ বুখারিতে আছে- (৩৯০৬: رقم: ذلك يوم الإثنين من شهر ربيع الأول)

ইবনে সা'দ রহ. নবীজির কুবা-আগমনের তারিখ সম্পর্কে দু'টি বক্তব্য উল্লেখ করেছেন। ২ রবিউল আওয়াল সোমবার। ১২ রবিউল আওয়াল সোমবার [তাবাকাতে ইবনে সা'দ : ১/২৩৩]।

কিন্তু বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ ও ঐতিহাসিক আল্লামা ইবনে কুনফুয ৮ রবিউল আওয়ালকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন [উসিলাতুল ইসলাম, পৃষ্ঠা ৪৬]। কেননা, অন্যান্য ক্যালেন্ডারের তারিখ অনুযায়ী সোমবার দিনের সঙ্গে মেলে না। ক্যালেন্ডার মোতাবেক ঐ বছর ১ ও ৮ রবিউল আওয়াল সোমবার, আর ১২ রবিউল আওয়াল শুক্রবার ছিল।

আমি (লেখক) এ প্রসঙ্গে যথাসম্ভব প্রমাণাদি এবং ক্যালেন্ডার সামনে রেখেই কাজ করেছি। ফলে আমার নিকট এটি প্রাধান্য পেয়েছে যে, নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কুবাতে আগমন করেছেন ৮ রবিউল আওয়ালে এবং মদিনাতে গমন করেছেন ১২ রবিউল আওয়ালে। আলি মুহাম্মদ খান রচিত 'তাকউয়িমে আহদে নবী' গ্রন্থে এমনই বলা হয়েছে।

৩৬০. সহিহ বুখারি : হাদিস নং ৩৯০৬

জিম্মাদারি হজরত আলি রাদিয়াল্লাহু আনহুকে দিয়ে এসেছিলেন। তিনি তিনদিনের মধ্যে এই দায়িত্ব পালন করে ইয়াসরিব রওনা হয়ে যান এবং কুবাতে এসে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে মিলিত হন।[৩৬১]

মদিনায় আশেকে রাসুলদের এক অবিস্মরণীয় সংবর্ধনা

কুবাতে চারদিন অবস্থান করে জুমার দিন ১২ রবিউল আওয়াল (২৪ সেপ্টেম্বর) মদিনার উদ্দেশে রওনা হন। পথিমধ্যে বনু সালিম বিন আউফ মহল্লার মসজিদে জুমার নামাজ আদায় করেন। মদিনার বুকে এটিই ছিল নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রথম জুমার নামাজ।[৩৬২]

সেদিন সন্ধ্যায় তিনি মদিনায় প্রবেশ করেন। লোকেরা তখন নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে একনজর দেখার জন্য রাস্তা, গলি এবং বাড়ির ছাদে ভিড় করে। সর্বত্র স্লোগান চলতে থাকে-'আল্লাহু আকবার, মুহাম্মদ এসেছেন, আল্লাহু আকবার, আল্লাহর রাসুল এসেছেন।'[৩৬৩]

নিষ্পাপ শিশুরা আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে কবিতা আবৃত্তি করতে থাকে,

طلع البدرُ علينا * من ثنيّات الوَداع
وجبَ الشُّكر علينا * ما دعا لله داعي
أيها المبعوثُ فينا * جئتَ بالأمر المُطَاع

'ঐ দেখো, 'সানিয়্যাতুল ওদা' থেকে
উদিত হয়েছে আমাদের আকাশে- পূর্ণিমার চাঁদ!
আল্লাহর পথে আহ্বানকারী যতদিন আহ্বান করবে,
ততদিন শুকরিয়া আদায় করা আমাদের মহান দায়িত্ব!
আমাদের মাঝে প্রেরিত হে মহান রাসুল!
আপনি এসেছেন এমন বিষয় নিয়ে,
যা আমাদেরকে অনুসরণ করতেই হবে![৩৬৪]

মদিনা আগমনের পরেও তিনি ১৪দিন কুবাতে বনু আমর বিন আউফের সরদার কুলসুম বিন হিদ্‌মের ঘরে ছিলেন। ২২ রবিউল আওয়াল সোমবার নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বনু নাজ্জারের সশস্ত্র লোকদের স্বাগত-মিছিলের

---

৩৬১. সিরাতে ইবনে হিশাম : ১/৪৯৩
৩৬২. সিরাতে ইবনে হিশাম : ১/৪৯৪
৩৬৩. মুসনাদে আহমদ : হাদিস নং ৩, মুসনাদ বাযযার : হাদিস নং ৫০
৩৬৪. সিরাতে ইবনে হিব্বান : ১/১৩৯, ১৪০, আসসিরাতুল হালাবিয়াহ : ২/৭৪, দালাইলুন নুবুওয়াহ, বাইহাকি : ২/২০৭

সাথে মদিনার প্রাচীন বসতিতে অবস্থানের জন্য গমন করেন।[৩৬৫]

সেদিন বাচ্চারা এই বলে দৌড়াচ্ছিল যে, 'ওই দেখো রাসুলুল্লাহ এসে পড়েছেন।'[৩৬৬]

কেউ বলছিল, 'আল্লাহর নবী এসে গেছেন, আল্লাহর নবী এসে গেছেন।'[৩৬৭]

বনু নাজ্জারের শিশুদের গান

সঙ্কীর্ণ গলিতে লোকেরা দলে দলে এসে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উষ্ট্রী তাদের নিকটে থামানোর জন্য অনুরোধ করতে থাকে। কিন্তু তিনি তাদের উত্তরে বলছিলেন, ' উষ্ট্রীকে যেতে দাও। এ আল্লাহর হুকুমের অনুগত।' রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন তার নানাবাড়ি বনু নাজ্জারের গলিতে পৌঁছেন, তখন উষ্ট্রী স্বেচ্ছায় এক স্থানে বসে পড়ে। বনু নাজ্জারের ছোট ছোট মেয়েরা আনন্দে নেচে নেচে গাইতে থাকে,

نحنُ جَوَارٍ من بني النجَّار * يا حَبَّذا محمدٌ من جار

> আমরা বনু নাজ্জার গোত্রের মেয়ে, কত খুশি ও আনন্দের কথা যে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের প্রতিবেশী হয়েছেন।

পাশেই ছিল হজরত আবু আইয়ুব আনসারি রাদিয়াল্লাহু আনহুর দোতলা বাড়ি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার অনুরোধের ভিত্তিতে বাড়ির নিচতলায় অবস্থান করতে সম্মত হন।[৩৬৮]

ইহুদি আলেম আবদুল্লাহ বিন সালাম সেদিন তার বাগানে খেজুর পাড়ছিলেন। তিনি নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে উপস্থিত হয়ে নবুওয়াতের আলামতগুলো ভালোভাবে চিনতে পেরে মুসলমান হয়ে যান।[৩৬৯]

---

৩৬৫. সহিহ বুখারি : হাদিস নং ৩৯৩২ (বাবু মাকদামিন নাবিয়্যি আলমাদিনাতা), সিরাতে ইবনে হিশাম : ১/৪৭৮

৩৬৬. সহিহ বুখারি : হাদিস নং ৪৯৪১ (কিতাবুত তাফসির, বাবু লাতারকাবুন্না তাবাকান আন তাবাক)

৩৬৭. সহিহ বুখারি : হাদিস নং ৩৯১১ (বাবু হিজরাতিন নাবিয়্যি -সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)

৩৬৮. সহিহ বুখারি : হাদিস নং ৩৯১১ (বাবু হিজরাতিন নাবিয়্যি -সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম), দালাইলুন নুবুওয়াহ, বাইহাকি : ২/২০৮, ২০৯

৩৬৯. সহিহ বুখারি : হাদিস নং ৩৯১১ (বাবু হিজরাতিন নাবিয়্যি -সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)। বুখারির রেওয়ায়েতে এই শব্দ এসেছে, وهو في النخل لأهله يخترف لهم।
হাদিসের এই শব্দগুলো থেকেই কিছু কিছু আলেম হিজরত শীতকালে হয়েছে বলে যে দলিল পেশ করেন, তা খণ্ডন হয়ে যায়। কারণ, খেজুর শীতকালে আহরণ করা হয় না। তারচেয়ে বড় দলিল হলো, তখন হেমন্তকালের শুরু তথা সেপ্টেম্বর মাস ছিল।

ইয়াসরিব এখন মদিনাতুন-নবী, নবীজির শহর

এই শহর এখন নবীজির শহর। এখানেই তার বাসস্থান। তার আশেকদের দেশ এটিই। ইসলামের প্রথম কেন্দ্র এই মদিনা। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগমনের পর নগরীর সবকিছুই নতুন সাজে সজ্জিত হয়েছে। সর্বত্র এমন আলো ও দ্যুতি বিচ্ছুরিত হচ্ছে, যাকে আমরা নবীপ্রেম ছাড়া কিছুই বলতে পারি না।

এটি ছিল ইতিহাসের এক বিস্ময়কর ঘটনা। কোথাও এবং কখনো এমন হতে দেখা যায়নি যে, শত শত বছরের প্রাচীন কোনো শহরের বাসিন্দারা কোনো ব্যক্তির মহব্বতে এমনভাবে মজে গেছে, যার জন্য তাদের নাম-নিশানা বিলীন করে দিয়েছে এবং শহরের কবিলাগুলো তাদের বংশধারার গৌরব মিটিয়ে দিয়ে কেবল এক ব্যক্তির দিকে সম্বন্ধযুক্ত হতে পছন্দ করেছে! কিন্তু এখানে এমনটিই হয়েছে। ইয়াসরিববাসী তাদের শহরের নাম ভুলে যায়। এখন এটি নবীর শহর। তখন থেকেই 'মাদিনাতুন নবী' বলা শুরু হয়। মদিনার প্রথম অধিবাসী আউস-খাযরাজ এবং তাদের শাখাগোত্রগুলোর খোঁজ নিয়ে দেখা গেল- তাদের মধ্যকার বিভেদ মিটে গেছে এবং পারস্পরিক ঐক্য ও সৌহার্দ্য তৈরি হয়েছে।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে 'আনসার' নামে ভূষিত করেন। এর মাধ্যমে দীন ও ইসলামের জন্য তাদের ত্যাগ ও কুরবানি এবং নুসরত-সাহায্যের উদাহরণ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। মক্কা থেকে আগত মুসলমানদের তিনি 'মুহাজির' উপাধি দেন। এই শহর এখন নবীর শহর। শহরের বাসিন্দা হলেন মুহাজির ও আনসার সাহাবিগণ। সবকিছুতেই ইসলামের রঙ। দীনের খাতিরে আত্মীয়তার বন্ধন বিসর্জন ও উৎসর্গ করার উপর প্রতিষ্ঠিত এই শহর।

মসজিদে নববি : ইসলামের নতুন কেন্দ্র

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনাতে এসে সর্বপ্রথম হজরত আবু আইয়ুব আনসারি রাদিয়াল্লাহু আনহুর বাড়ির সামনের খোলা অংশে একটি মসজিদ নির্মাণ করতে মনস্থ হন। এই জায়গাটি দুই এতিম- সাহল এবং সুহাইলের মালিকানাধীন ছিল। তারা মসজিদ নির্মাণের জন্য জায়গাটি উপহার হিসেবেই দিতে চাচ্ছিল। কিন্তু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জোর করে মূল্য পরিশোধ করেন। এরপর তিনি মসজিদের নির্মাণকাজ শুরু করেন। মসজিদের কিবলা বাইতুল মাকদাসের দিকে ছিল। দেয়াল কাঁচা ইট, খুঁটি খেজুর গাছের কাণ্ড আর ছাদ খেজুরের ডাল দিয়ে তৈরি করা হয়। তার দৈর্ঘ্য ছিল ১০৫ ফিট আর প্রস্থ ৯০ ফিট।[৩৭০]

---

৩৭০. সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ : ৩/৩৩৮

মসজিদের নির্মাণকাজে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে অংশগ্রহণ করেন। তিনি ইট বহন করে নিয়ে যেতেন। মুসলমানরা তা দেখে অত্যধিক জোশ ও স্পৃহার সঙ্গে কাজ করতে থাকে। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের হিম্মত ও উদ্দীপনা দেখে বলেন,

اللهم إن الأجرَ أجرُ الآخرة * فارحَمِ الأنصارَ والمهاجرَة

হে আল্লাহ, প্রকৃত প্রতিদান তো আখেরাতের প্রতিদান, অতএব আপনি আনসার ও মুহাজিদের উপর রহম করুন।[৩৭১]

ইসলামি ভ্রাতৃত্ব বন্ধন

মুহাজিরদের আবাসনের ব্যবস্থা করা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল। কারণ, তারা সবকিছু ত্যাগ করে এখানে হিজরত করেছেন। এই সমস্যা নিরসনকল্পে তিনি 'ভ্রাতৃত্ব বন্ধন' স্থাপন করার মাধ্যমে নিঃস্ব মুহাজিরদেরকে সচ্ছল আনসারিদের ভাই বানিয়ে দেন, যেন কষ্ট ও পেরেশানির সময় আত্মীয়স্বজনের অভাব অনুভূত না হয়।

আনসাররা এক অপূর্ব দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেন। অগ্রাধিকার ও নিঃস্বার্থতার অনন্য উদাহরণ পেশ করেন। মুহাজির ভাইদের জন্য নিজেদের বাসস্থান, বাগ-বাগিচা এবং সম্পদ দু'ভাগ করে অর্ধেক তাদেরকে দিয়ে দেন। কিন্তু মুহাজিররা কৃতজ্ঞতা এবং অল্পতুষ্টির দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেন। কেবল প্রয়োজন পরিমাণ সাহায্য-সহযোগিতা তাদের থেকে গ্রহণ করেন।[৩৭২]

পরিবারকে মক্কা থেকে মদিনায় স্থানান্তর এবং তাদের আবাসনের ব্যবস্থা

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাতমাস যাবৎ হজরত আবু আইয়ুব রাদিয়াল্লাহু আনহুর বাড়িতে অবস্থান করেন। এর মাঝেই তিনি তার খাদেম যায়েদ বিন হারিসা এবং আবু রাফেকে গোপনে মক্কায় পাঠান, যেন সেখানে রয়ে যাওয়া তার পরিবার-পরিজনঃ হজরত সাওদা, হজরত উম্মে কুলসুম, হজরত ফাতেমাকে মদিনায় নিয়ে আসেন। হজরত রুকাইয়া রাদিয়াল্লাহু আনহা আগেই উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুর সঙ্গে মদিনায় চলে এসেছিলেন। তবে বড় মেয়ে যায়নাব রাদিয়াল্লাহু আনহা তার স্বামী আবুল আসের সঙ্গে মক্কায় ছিলেন।[৩৭৩]

---

৩৭১. সহিহ বুখারি : হাদিস নং ৩৯৩২ (বাবু মাকদামিন নাবিয়্যি আলমাদিনাতা), সিরাতে ইবনে হিশাম : ১/৪৯৯, ৫০৪, ৫০৫

৩৭২. সহিহ বুখারি : হাদিস নং ২৭৮০, ২৭৮১, ২৭৮২, (কিতাবুল মানাকিব, বাবু ইখাইন নাবী), সিরাতে ইবনে হিশাম : ১/৪৯৯, ৫০৪, ৫০৫

৩৭৩. আলবিদায়া ওয়ান নিহায়া : ৪/৪৯৯

ওদিকে হজরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুও তার মেয়ে হজরত আসমা, হজরত আয়েশা এবং ছেলে আবদুল্লাহকে মদিনায় নিয়ে আসেন। যখন মসজিদে নববি এবং তার পাশেই নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাসস্থান নির্মাণ পরিপূর্ণ হয়ে যায়, তখন নবীজি নিজের বাড়িতে ওঠেন। নবীজির সেই বাড়িতে হজরত সাওদা ও হজরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহুমার জন্য পৃথক পৃথক কামরা তৈরি করেন। আর সেখানেই হজরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহাকে অত্যন্ত অনাড়ম্বরভাবে নবীজির ঘরে কনে হিসেবে উঠানোর আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন হয়। এটি ১ হিজরির শাওয়াল মাসের ঘটনা।[৩৭৪]

আসহাবে সুফফাহ : ইসলামের প্রথম মাদরাসা

কুরআনুল কারিম ধারাবাহিকভাবে অবতীর্ণ হচ্ছিল। নতুন ইসলামি হুকুমত হিসেবে মদিনার পরিবেশ অনুযায়ী আয়াত নাজিল হচ্ছিল। বিধিবিধানের ক্ষেত্রে মক্কায় অবতীর্ণ সুরাসমূহের তুলনায় মদিনায় অবতীর্ণ সুরাসমূহের মধ্যে সামঞ্জস্য বেশি ছিল।

মুহাজিরদের মধ্যে এমন নিঃস্ব এবং অসহায় লোকও ছিলেন, যাদের তখনও কোনো ঘরবাড়ি এবং জীবিকার ব্যবস্থা হয়নি, তাদেরকে মসজিদে নববির দক্ষিণ কোণে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হুজরাসমূহের নিকটবর্তী চত্বরে থাকার ব্যবস্থা করে দেওয়া হলো। এরা আসহাবে সুফফা নামে খ্যাতি লাভ করেন। তারা সারাদিন সেখানেই থাকতেন। কুরআনের আয়াত, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নসিহত শুনতেন এবং মুখস্থ করতেন। আর রাতের খাবারের জন্য যেসকল মুহাজির সাহাবির জীবিকার ব্যবস্থা হয়ে গিয়েছিল, তাদের সঙ্গে সুফফার সদস্যদের পাঠিয়ে দিতেন। সুফফার কিছু দরিদ্র সাহাবিকে স্বয়ং নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘরে নিয়ে যেতেন।

যুহর, আসর ও ইশার চার রাকাত নামাজ ফরজ হওয়া এবং আজানের বিধান অবতীর্ণ

তখনও পর্যন্ত জোহর, আসর এবং ইশার দুই রাকাত করে আদায় করা হতো। মদিনায় আসার কিছুদিন পরই দুই রাকাতের পরিবর্তে চার রাকাত ফরজ করা হয়।[৩৭৫]

সে সময়ে মুসলমানরা সময় অনুমান করে নামাজের জন্য মসজিদে উপস্থিত হতো। নামাজের জন্য আহ্বান করার কোনো স্বীকৃত পদ্ধতি ছিল না। ইহুদি-

---

৩৭৪. আলকামিল ফিত তারিখ : ২/৬

৩৭৫. মুখতাসার সিরাতুর রাসুল, শায়েখ মুহাম্মদ বিন আবদুল ওয়াহহাব, পৃষ্ঠা ১৪০, ১৪১ (সউদি ধর্মমন্ত্রণালয় সংস্করণ)

নাসারাদের আরাধনার সময় বাঁশি কিংবা ঘণ্টা বাজানোর পদ্ধতি নবীর পছন্দ ছিল না। আল্লাহ তায়ালা আবদুল্লাহ বিন যায়েদ রাদিয়াল্লাহু আনহুকে স্বপ্নে আজানের পদ্ধতি শিখিয়ে দিলেন। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওই পদ্ধতি চালু করার নির্দেশ দেন। আজান দেওয়ার এই গৌরব সর্বপ্রথম বিলাল হাবশি রাদিয়াল্লাহু আনহুর ভাগ্যে জোটে। সেই থেকে তিনি মসজিদে নববির মুয়াজ্জিন নিযুক্ত হন।[৩৭৬]

শত শত বছর পর আল্লাহ তায়ালার বান্দাদের জন্য পৃথিবীর বুকে এমন নিরাপদ জনপদের ব্যবস্থা হয়েছে, যেখানে তারা স্বাধীনভাবে আল্লাহর নাম নিতে পারছে। নির্বিঘ্নে তার তাওহিদ ও একত্বের দাওয়াত দিতে পারছে এবং দীনের প্রচার-প্রসারের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে সক্ষম হচ্ছে। অথচ এটা ছিল এমন এক সমাজ, যেখানের অধিবাসীরা শত বছর ধরে মানবতা খুঁজে ফিরছিলো। যেমন: ইহুদিদের সবচেয়ে বড় পণ্ডিত আবদুল্লাহ বিন সালাম সত্যান্বেষী ছিলেন। ইসলাম ও ইসলামের নবী সম্পর্কে পূর্ববর্তী কিতাবসমূহে বর্ণিত গুণাবলি নিজ চোখে পরখ করতে পেরে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন।

হজরত সালমান ফারেসি বহু বছর পূর্বেই মূর্তিপূজা থেকে তাওবা করেছিলেন এবং ইরান থেকে বের হয়ে সত্যের খোঁজে অনেক পাদরি ও সন্ন্যাসীর সেবা করেছেন! তিনি নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে একনজর দেখেই বুঝে ফেলেন যে, তিনিই মুক্তির দূত, তার আনুগত্যেই রয়েছে মুক্তি। আত্মার ডাকেই তিনি মুসলমান হয়ে যান। সত্য ও হক অন্বেষণকারীরা তাদের সেই তৃষ্ণা নিবারণের ঝর্না হিসেবে মদিনাকে পেয়ে যায়।[৩৭৭]

ইসলামি হুকুমতের সামনে নতুন বিপদ

মদিনাতে নিরাপত্তা ও শান্তির পরিবেশ বিস্তার লাভ করার পরেও ইসলামি হুকুমত শত্রুদের দুশমনিমুক্ত ছিল না। মদিনাতে দুইটি পক্ষ মুসলমানদের ঘোরবিরোধী ছিল। এক. মুনাফিক। দুই. ইহুদিজাতি।

মুনাফিক হলো ঐসব দুর্ভাগা, যারা এত নিকট থেকে ইসলামের রশ্মি দেখেও বঞ্চিত হয়েছে। তাদের মধ্যে নেফাক বা কপটতার ব্যাধি ছিল। নেফাক এমন দু'মুখো মানসিক ও নৈতিক ব্যাধি, যার সূচনা হয় হিংসা, ঘৃণা-বিদ্বেষ, ক্রোধ থেকে। যেখানে কারো সাথে সরাসরি বিবাদে যাওয়া, দুশমনি করা সম্ভব হতো

৩৭৬. সিরাতে ইবনে হিশাম : ১/৫০৮, ৫০৯।
আবদুল্লাহ বিন যায়েদ রা. ছাড়াও হজরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুও এমন স্বপ্ন দেখেছিলেন। [ফাতহুল বারি : ২/৮০, ৮১]

৩৭৭. উসদুল গাবাহ : আবদুল্লাহ বিন সালাম এবং সালমান ফারেসি রাদিয়াল্লাহু আনহুর জীবনী দ্রষ্টব্য

না, সেখানেই তারা নেফাকের আশ্রয় নিত। এই ব্যাধিতে আক্রান্ত হতো বেশির ভাগই ঐসব লোক, যারা স্বভাবতই হিংসা-বিদ্বেষ এবং অহমিকায় লিপ্ত। এজন্য সত্য কথা তাদের হজম হতো না। পাশাপাশি তারা কাপুরুষতা, চাতুর্য এবং চাটুকারিতায় ছিল সিদ্ধহস্ত। এসব লোক কাপুরুষ হওয়ার কারণে প্রকাশ্যে ইসলামের বিরোধিতা করার সাহস পেত না। আর যেহেতু তারা অসাধারণ বাকশক্তি এবং অনন্য বাক-চাতুর্যের অধিকারী ছিল, তা-ই নিজেদের ভ্রান্ত ধারণা এবং ধ্বংসাত্মক কর্মতৎপরতার মানসিকতাকে আড়াল করে বিশ্বস্ততা, কল্যাণকামিতা এবং সহমর্মিতার বহিঃপ্রকাশ ঘটাতে পারত।

মক্কায় দুশমনদের ইসলামের বিরুদ্ধে শক্তিপ্রয়োগের ক্ষমতা ছিল। ফলে সেখানে কারো মুনাফিক হওয়ার কোনো প্রশ্নই আসে না। মদিনাতে ইসলামের শক্তি অর্জিত হয়েছিল। এজন্য ইসলাম এবং নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শত্রুরা অবদমিত হয়ে যায়। আর তাদের বিরোধিতাই মুনাফিকির রূপে প্রকাশিত হয়। অধিকাংশ মুনাফিক আউস-খাযরাজ গোত্রের ছিল। যদিও তাদের মধ্যে মুসলমানের সংখ্যাই বেশি ছিল; কিন্তু তাদেরই মধ্যে কোথাও মুনাফিকরা চুপটি মেরে ছিল।

আবদুল্লাহ বিন উবাই : মুনাফিকদের সরদার

মুনাফিকি স্বভাবের ক্ষেত্রে সর্বাগ্রে যার নাম উচ্চারিত হয়, সে হলো খাযরাজ গোত্রের সরদার আবদুল্লাহ বিন উবাই বিন সালুল, যাকে কিছুদিন পূর্বেই আউস-খাযরাজ গোত্রের সমন্বিত শাসক হিসেবে মেনে নেওয়ার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছিল। যেদিন থেকে তার অধীনস্থ লোকদের এই নতুন বিশ্বাসের দিকে ঝুঁকতে দেখেছে, সেদিন থেকেই সে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি চরম হিংসা-বিদ্বেষ পোষণ করতে থাকে। সে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তার একচ্ছত্র শাসক হওয়ার স্বপ্নভঙ্গের জন্য দায়ী মনে করত। তাই সে মদিনার বিপ্লব থেকে এক রকম সম্পর্কহীনতার অবস্থান গ্রহণ করে এবং দৃশ্যপটের বাইরে চলে যায়। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মদিনায় আগমন করার পর সে তার হাতে বাইয়াত নিতেও টালবাহানা করে।

উল্লেখ্য, অধিকাংশ মুনাফিকই ছিল বৃদ্ধ ও পৌঢ়। হাতেগোনা এক-দুজন ছিল যুবক। কারণ, তরুণদের মধ্যে সত্য গ্রহণের যোগ্যতা অধিক পরিমাণে থাকে। হকের পথে কুরবানি দেওয়ার জন্য তারাই দ্রুত উদগ্রীব হয়ে পড়ে। অন্যদিকে বুড়োরা-সাধারণত-তাদের অভিজ্ঞতা, স্বার্থ ও সম্মান রক্ষার জন্য সত্যের সামনে নত হতে অনীহা প্রকাশ করে।

মক্কায় ইসলাম গ্রহণকারী ব্যক্তিরাও অধিকাংশ নওজোয়ান ছিলেন। মদিনায়ও এমন ঘটনা ঘটল। স্বয়ং আবদুল্লাহ বিন উবাইয়ের ছেলে আবদুল্লাহ এবং কন্যা জামিলা প্রকৃত অর্থেই ইসলাম গ্রহণ করেন। কিন্তু তাদের পিতা কপটতার উপরই অবিচল থাকে।

একদিন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কয়েকজন সাহাবিকে নিয়ে গাধায় সওয়ার হয়ে বনু হারিস বিন খাযরাজের মহল্লার দিকে যাচ্ছিলেন। মদিনার কিছু লোক তখনও ইসলাম থেকে দূরে ছিল। পথিমধ্যে এক জায়গায় কিছু মুসলিম, অমুসলিম আরব ও ইহুদি একসঙ্গে বসে ছিল। আবদুল্লাহ বিন উবাইও তাদের সাথে ছিল। সওয়ারি তাদের পাশ দিয়ে অতিক্রম করার সময় ইবনে উবাই কাপড় দিয়ে মুখ ঢেকে ফেলে এবং ঘৃণাভরা কণ্ঠে বলে যে, 'ধুলা উড়াবে না'!

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাওয়াত দেওয়ার নিয়তে সেখানে থেমে যান। সবাইকে সালাম দিয়ে কুরআনের কিছু আয়াত শোনান। আবদুল্লাহ বিন উবাই বলতে লাগল, 'জনাব, আপনার কথা সত্যও যদি হয়, তবু আমার কাছে এই পদ্ধতিটি পছন্দ হয় না। আমাদের মজলিসগুলোতে এসে আমাদেরকে দীনের দাওয়াত দেবেন না। যারা আপনার কাছে যায়, তাদেরকে দীন শোনান।'

এই দুঃসাহস প্রদর্শন করার কারণে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবিগণ জ্বলে উঠলেন এবং পরস্পরে হামলে পড়ার উপক্রম হলো। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিষয়টা বুঝতে পেরে সবাইকে ধমক দিয়ে থামিয়ে দেন।

যা হোক, উপর্যুক্ত ঘটনা থেকে এটুকু পরিষ্কার বুঝা যায় যে, আবদুল্লাহ বিন উবাই বিন সালুলের অন্তরে কী পরিমাণ হিংসার আগুন জ্বলছিল।[৩৭৮]

মদিনায় আবদুল্লাহ বিন উবাইয়ের সমমনা আরো কিছু লোক ছিল, যারা মনে করত সে-ই মদিনার শাসক হওয়ার একমাত্র উপযুক্ত ব্যক্তি এবং মুহাজিররা এখানে এসে তাদের অধিকার হরণ করেছে। ফলে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তার সাহাবিদের প্রতি ঘৃণা-বিদ্বেষে তাদের অন্তর পরিপূর্ণ ছিল।

স্বচক্ষে তারা ইসলামের সত্যতার প্রকৃষ্ট প্রমাণাদি দেখার পরেও চোখ বন্ধ করে ফেলে এবং নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দাওয়াতকে রাজনৈতিক নেতৃত্ব হাসিল করার একটি কৌশল মনে করতে থাকে। এসব

---

৩৭৮. সহিহ বুখারি : হাদিস নং ৬২৫৪; কিতাবুল ইসতিজান, বাবুত তাসলিম ফি মাজলিসিন ফি আখলাতিম মিনাল মুসলিমিনা ওয়াল মুশরিকিনা।

লোক সহজতাপ্রিয় এবং কাপুরুষতার ব্যাধিতে আক্রান্ত ছিল। যেকোনো বিষয়ে তারা পার্থিব স্বার্থকে প্রাধান্য দিত। যেখানে তাদের জানমাল সংরক্ষিত থাকবে, ধনদৌলত, পদপদবি লাভ হবে সেদিকেই তারা পা বাড়াত। অপরদিকে তাদের অধিকাংশ আত্মীয়স্বজনই মুসলমান হয়ে গিয়েছিল। তাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করাটাও তাদের জন্য দুষ্কর ছিল। ফলে আবদুল্লাহ বিন উবাই এবং তার কিছু মুনাফিক বন্ধু বাহ্যত ইসলাম গ্রহণ করে নেয়। কিন্তু ভেতরে ভেতরে ঠিকই এই নতুন ধর্মের গোড়া কেটে ফেলা এবং তার হাতছাড়া-হওয়া সরদারি ফিরে পাওয়ার জন্য উতলা হয়ে থাকে।

ইহুদি

মুনাফিকদের চেয়েও অভ্যন্তরীণ বড় সমস্যা ছিল প্রতিবেশী ইহুদিরা। কারণ, তারা ছিল অস্ত্রধারী যুদ্ধবাজ, অর্থনীতি এবং জীবন-জীবিকার দিক থেকেও তারা মুসলমানদের থেকে সমৃদ্ধ ছিল; যদিও তারা তাওহিদ, রিসালাত এবং আসমানি কিতাবসমূহের প্রতি ঈমান ও একাধিক শরয়ি বিধানের ক্ষেত্রে মুশরিকদের তুলনায় মুসলমানদের নিকটবর্তী ছিল। হিজরতের আগে মুসলমান ও মক্কার কুরাইশদের মধ্যকার সমস্যার ক্ষেত্রে তাদের কোনো পক্ষাবলম্বন ছিল না। কিন্তু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মদিনায় আসেন, তখন তাদের স্বার্থে কুঠারাঘাত পড়ে। ইতিপূর্বে তারা সংখ্যালঘু হওয়া সত্ত্বেও আউস-খাযরাজের তুলনায় তাদেরকে শক্তিশালী গণ্য করা হতো। কারণ, তখন উভয় আরব গোত্রই পরস্পর যুদ্ধংদেহী ছিল। কিন্তু নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মদিনায় আগমনের পর সকলেরই তার ঝান্ডাতলে একীভূত হওয়ার পরিষ্কার মর্ম হচ্ছে মদিনার ইহুদিদের মাথা উঠিয়ে দাঁড়ানোর সময় শেষ হয়ে এসেছে।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রিসালাতের বৈশিষ্ট্য, নিদর্শন এবং গুণাবলি সম্পর্কে ইহুদিদের চেয়ে অধিক আর কোনো জাতি জানত না; কিন্তু তাদের বংশীয় অহংবোধ এবং আত্মপ্রবঞ্চনা তাদেরকে এ কথার প্রকাশ ও প্রচার থেকে বিরত রাখত। বনি ইসরাইল ছাড়া কোনো গোত্রের নবীর উপর তারা ঈমান আনবে না। ফলে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনায় আসার পর থেকেই ইহুদিদের যেকোনো চক্রান্ত ও অনিষ্ট থেকে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখার ব্যাপারে সতর্ক থাকেন।

মদিনার অঙ্গীকার

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হুকুমতকে শক্তিশালী ও সুবিন্যস্ত করা এবং অভ্যন্তরীণ ও বহিঃশত্রুর ঝুঁকি থেকে নিরাপদ রাখার জন্য যথাসম্ভব ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। তাই তিনি মদিনা ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকাগুলোতে

বসবাসকারী গোত্র এবং ইহুদিদের থেকে একটি প্রতিশ্রুতি নেন। এই প্রতিশ্রুতিতে বলা হয়েছে, রাষ্ট্রীয় আইন মেনে চলা, জুলুম ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ থাকা, বহিঃশত্রুর আক্রমণের সময় সম্মিলিতভাবে প্রতিরোধ করা, মতাদর্শের ক্ষেত্রে স্বাধীনতা, পরস্পরকে শ্রদ্ধা করা, পরস্পরে ধোঁকা ও প্রতারণা করা থেকে বিরত থাকা, সমাজের দুর্বল ও নিঃস্ব লোকদের সহায়তা করা, পূর্বের ভালো কাজের ধারা বহাল রাখা ইত্যাদি।

এই প্রতিশ্রুতিকে বলা হয় 'মদিনা সনদ'। পৃথিবীতে এটি ছিল প্রথম ইসলামি হুকুমতের সংবিধান। এই প্রতিশ্রুতি নেওয়ার বদৌলতে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুহাজির ও আনসার ছাড়াও মদিনায় বসবাসরত সকল গোত্রকে একতাবদ্ধ করতে সক্ষম হন।

মদিনা সনদের গুরুত্বপূর্ণ ধারাগুলো ছিল নিম্নরূপ।

- আমরা সকলেই বহিঃআক্রমণ মোকাবেলায় ঐক্যবদ্ধ থাকব।
- রক্তপণ এবং মুক্তিপণের ক্ষেত্রে পূর্বের নিয়ম বহাল থাকবে।
- অপরাধী যে-ই হোক, নিজের পুত্র হলেও তাকে অবশ্যই সাজা পেতে হবে।
- মুসলমানরা কাফেরদের বিরুদ্ধে পরস্পরে সহায়তা করবে।
- চুক্তিতে অংশগ্রহণকারী কোনো ব্যক্তি কোনো অমুসলিম কুরাইশিকে আশ্রয় দিতে পারবে না।
- ইহুদিরা তাদের মতাদর্শে সম্পূর্ণ স্বাধীন থাকবে। মুসলমান তার দীন, আর ইহুদিরা তাদের মতাদর্শের চর্চা করবে।
- ইহুদি ও মুসলমান প্রত্যেকের পৃথক ব্যয়খাত থাকবে। যুদ্ধের সময় ইহুদিরা মুসলমানদের আর্থিক সহায়তা প্রদান করবে।
- মদিনার উপর কোনো হামলা হলে কিংবা কোনো বাহিনীর মুখোমুখি হলে, এই প্রতিশ্রুতিতে অংশগ্রহণকারী সকলকেই ঐক্যবদ্ধভাবে মোকাবেলা করতে বাধ্য থাকবে।
- মদিনা সনদে অংশগ্রহণকারী প্রত্যেকের যেকোনো মতবিরোধ, দ্বন্দ্ব রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদালতে পেশ করতে হবে।[৩৭৯]

এই ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনার মতো ছোট শহরে একটি আদর্শ হুকুমতের ভিত্তিস্থাপন করলেন, যেখানে প্রতিটি মানুষের দীন, ঈমান, ইজ্জত, সম্মান, আবরু, জানমাল পরিপূর্ণ সংরক্ষিত থাকবে।

---

৩৭৯. সিরাতে ইবনে হিশাম : ১/৫০১-৫০৪

এটি ছিল মানুষকে তাদের রবের পক্ষ থেকে প্রদত্ত হুকুম-আহকাম ও বিধানাবলি সফলভাবে পালন করার যোগ্য করে গড়ে তোলার প্রথম সফল প্রচেষ্টা। এটি এমন নিরাপদ সামাজিক ব্যবস্থা ছিল, যা খুব দ্রুত কেবল মদিনার বাইরেই নয়, বরং জাজিরাতুল আরবসহ সমগ্র দুনিয়ায় প্রভাব বিস্তারের মতো সমর্থ ছিল।

কুরাইশ কর্তৃক মুসলমানদের মদিনা থেকে বের করে দেওয়ার অপচেষ্টা

এই জায়গাতে এসেও মুসলমানরা শকুনের থাবা থেকে নিরাপদ হয়নি। কুরাইশদের দৃষ্টি মদিনাতেও এসে পড়ে। ইসলামের প্রচার-প্রসার তারা দেখতে পাচ্ছিল। ফলে কার্যকর পদক্ষেপের অংশ হিসেবে তারা মদিনার গোত্রপতিদের মগজধোলাইয়ের চেষ্টা করে এবং তাদেরকে এ বলে শাসায় যে, মুসলমানদের আশ্রয় দিয়ে তারা ভালো কাজ করেনি। কুরাইশরা খাযরাজ-সরদার আবদুল্লাহ বিন উবাইয়ের কাছে পত্রে লেখে, 'তোমরা আমাদের লোকদের তোমাদের এলাকায় আশ্রয় দিয়েছো। আমরা আল্লাহর শপথ করে বলছি, তোমরা যদি তাদেরকে বের করে না দাও, তা হলে আমরা বাহিনী নিয়ে তোমাদের উপর আক্রমণ করব, তোমাদেরকে হত্যা করে তোমাদের স্ত্রীদের বাঁদি বানাবো।'[৩৮০]

কুরাইশের এ কথা নিশ্চিত জানা ছিল না যে, মুসলমানদের আগমনে আবদুল্লাহ বিন উবাই কী পরিমাণ ক্ষুব্ধ হয়েছে, তাদেরকে মদিনা থেকে বের করে দিতে তার কত তামান্না! কিন্তু খোদ আবদুল্লাহ বিন উবাইয়ের কবিলার অধিকাংশ লোক মুসলমান হয়ে গিয়েছিল। ফলে ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও কুরাইশের দাবি অনুযায়ী কাজ করা তার পক্ষে সম্ভব ছিল না।

কুরাইশ কর্তৃক পথ-অবরোধ

পাশাপাশি কুরাইশরা মদিনাকে অবরোধে ফেলে দেওয়ার প্রচেষ্টায় লিপ্ত হয়। মক্কা থেকে মদিনা পর্যন্ত বসবাসরত অধিকাংশ কবিলা কুরাইশের মিত্র ছিল। কুরাইশ সকলকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে উসকে দেয় এবং দক্ষিণদিক থেকে মুসলমানদের আসা-যাওয়ার পথ বন্ধ করে দেয়। ফলে ইয়ামান ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের লোকেদের ইসলাম গ্রহণের পর মদিনায় আসা কিছু সময়ের জন্য অনেক দুষ্কর হয়ে পড়ে। কারণ, পথ অবরোধের ফলে কুরাইশ ও তার মিত্রদের মধ্য দিয়ে সবাইকে অতিক্রম করতে হতো।[৩৮১]

---

৩৮০. সুনানে আবু দাউদ : হাদিস নং ৩০০৪ (বাবুন ফি খাবারি নাযির), আলমাকতাবাতুল মিসরিয়্যাহ, বৈরুত সংস্করণ

৩৮১. সহিহ বুখারি : হাদিস নং ৫৩ (কিতাবুল ঈমান, বাবু আদাইল খুমুসি মিনাল ঈমান), সহিহ মুসলিম, হাদিস নং : ১২৪ (কিতাবুল ঈমান, বাবুল আমরি বিল ঈমানি বিল্লাহ ওয়া রাসুলিহি)

মদিনার উপর কুরাইশের আক্রমণের আশঙ্কা

কুরাইশের এসব তৎপরতার কারণে মুসলমানরা আশঙ্কা করতে লাগল, যেকোনো সময় তারা মদিনায় আক্রমণ করতে পারে। তাই আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য মুসলমানদের সর্বক্ষণ প্রস্তুত হয়ে থাকতে হতো। তারা হাতিয়ার কোমরে বেঁধে সশস্ত্র অবস্থায় বিছানায় যেতেন।[৩৮২]

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরাইশের এই ঘৃণ্য অপচেষ্টার সংবাদ পেয়ে এতই অস্থির ছিলেন যে, রাতের বেলায়ও তিনি সজাগ-সতর্ক থাকতেন।[৩৮৩]

এই সময়ে একবার মক্কার এক সরদার কুরয বিন জাবির ফিহরি মদিনার চারণভূমিতে আক্রমণ করে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গবাদিপশু ছিনিয়ে নেয়।

এই ঘটনা ২য় হিজরির রবিউল আওয়াল মাসের।[৩৮৪]

জিহাদের অনুমতি

কুরাইশের এসব পদক্ষেপ মূলত অশনি সংকেতই বহন করছিল। এ মুহূর্তে মদিনার ইসলামি হুকুমতের নিশ্চুপ হয়ে থাকা ছিল নিজেদের নিরাপত্তা ও অস্তিত্ব ঝুঁকির মধ্যে ফেলে দেওয়ার নামান্তর। তখনই কুরআনে কারিমে জিহাদের অনুমতি দেওয়া হয়। সুরা হজের এই আয়াতগুলো নাজিল হয়।

> أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ * الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللهُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللهِ كَثِيرًا وَلَيَنْصُرَنَّ اللهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ
>
> যুদ্ধের অনুমতি দেওয়া হলো তাদেরকে, যাদের সাথে কাফেররা যুদ্ধ করে; কারণ তাদের প্রতি অত্যাচার করা হয়েছে। আল্লাহ তাদেরকে সাহায্য করতে অবশ্যই সক্ষম। যাদেরকে তাদের বাড়িঘর থেকে অন্যায়ভাবে বহিষ্কার করা হয়েছে শুধু এই অপরাধে যে, তারা বলে আমাদের পালনকর্তা আল্লাহ। আল্লাহ যদি মানবজাতির একদলকে

---

৩৮২. লুবাবুন নুকুল ফি আসবাবিন নুযুল, সুয়ুতি, সুরাতুন নুর, আয়াত ৫৫

৩৮৩. সুনানে কুবরা, নাসায়ি, হাদিস নং ৮১৬০ -كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما قدم المدينة يسهر من الليل- (কিতাবুল মানাকিব, বাবু সাদ বিন মালিক রা.)

৩৮৪. আলইসাবাহ : কুরয বিন জাবির রা. এর জীবনী দ্রষ্টব্য। কিছুদিন পরই কুরয বিন জাবির রা. ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন এবং মক্কা বিজয়ের সময় তিনি শহীদ হন। [আলইসতিয়াব : ৩/১৩১০]

অপর দল দ্বারা প্রতিহত না করতেন, তবে (খ্রিষ্টানদের) নির্জন গির্জা, ইবাদতখানা, (ইহুদিদের) উপাসনালয় এবং মসজিদসমূহ বিধ্বস্ত হয়ে যেত, যেগুলোতে আল্লাহর নাম অধিক স্মরণ করা হয়। আল্লাহ নিশ্চয়ই তাদেরকে সাহায্য করবেন, যারা আল্লাহর সাহায্য করে। নিশ্চয়ই আল্লাহ পরাক্রমশালী, শক্তিধর।[৩৮৫]

প্রাথমিক অবস্থায় কেবল জিহাদের অনুমতি প্রদান করা হয়। ফরজ বিধান তখনও অবতীর্ণ হয়নি। সম্ভবত ধীরে ধীরে সাহাবায়ে কেরামের হিম্মত ও দিল চাঙ্গা করা উদ্দেশ্য ছিল। আয়াতে বাহ্যিকভাবে শুধু অনুমতিই বুঝা যাচ্ছে। কিন্তু পরিস্থিতি প্রতিকূল হওয়ায় এই অনুমতিপত্র নিয়েই তারা লড়াইয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে বাধ্য হন।

মক্কায় কেন জিহাদের অনুমতি দেওয়া হয়নি?

মক্কায় থাকাকালীন (كُفُّوْا أَيْدِيَكُم) 'তোমাদের হাত সংযত রাখ'-এর বিধান ছিল; যদিও তখন হজরত উমর, হামজা, সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস, যুবাইর বিন আওয়াম (রাদিয়াল্লাহু আনহুম)-এর মতো সাহসী ও শক্তিশালী বীরেরা ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন, নবীজির নির্দেশে প্রয়োজন পড়লে তারা কাফেরদের অন্যায়ের বিরুদ্ধে তরবারি ধরতে পারতেন, ছোট ছোট হাঙ্গামা হতো, দু'চারজন মুশরিক মারা যেত, তাদের বাড়িঘর এবং ব্যবসায়িক পণ্যের গুদামগুলো জ্বালিয়ে দিতে পারতেন; কিন্তু এসব সাময়িক আবেগী কার্যক্রমের দ্বারা কাফেরদের ক্ষোভ আরো বৃদ্ধি পেতো এবং ঢিলেতালে চলতে থাকা নগণ্য দাওয়াতি কার্যক্রম বন্ধই হয়ে যেত, মুসলমানদের উপর নির্যাতন-নিপীড়নের মাত্রা বেড়ে যেত। এজন্য ধৈর্য এবং সহনশীলতা প্রদর্শনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

পরিস্থিতি এখন বদলে গেছে। নতুন হুকুমত কায়েম হয়েছে। রাষ্ট্রীয় বিষয়াদি নিয়ন্ত্রণ করার নাম হলো রাজনীতি। আর রাজনীতিরই একটি অংশ হলো সামরিক ব্যবস্থাপনা। যদি দীনকে সমুন্নত করার জন্য সৈন্যবাহিনী পরিচালনা করা হয়, তা হলে একে ইসলামে জিহাদ বলা হয়ে থাকে এবং একে অনেক বড় ফজিলতপূর্ণ ইবাদত বলে গণ্য করা হয়েছে।

মক্কায় যেহেতু ইসলামি রাষ্ট্রব্যবস্থা, জিহাদ কোনোটাই সম্ভব ছিল না, মদিনায় এসে তা সম্ভব হয়েছে। ফলে স্বাভাবিকতই সরকার গঠন করার পাশাপাশি তার কর্ণধারদের উপর রাষ্ট্রের হেফাজত ও প্রতিরক্ষার দায়িত্বও বর্তায়। তদ্রূপ হুকুমতের শত্রুদের দমন করা এবং তাদের প্রতিরোধ করারও প্রয়োজন ছিল। এই প্রয়োজনীয়তার দিকে লক্ষ রেখেই জিহাদের বিধান দেওয়া হয়েছে।

---

৩৮৫. সুরা হজ, আয়াত ৩৯-৪০

জিহাদের উদ্দেশ্য

জিহাদের উদ্দেশ্য এটা ছিল না যে, মানুষদের জোরপূর্বক মুসলমান বানানো হবে। ইসলাম হলো 'মনেপ্রাণে তার সত্যতা বিশ্বাস করে জবানের মাধ্যমে এর স্বীকৃতি দেওয়ার নাম।' বাস্তবে আত্মার এই সিদ্ধান্ত শক্তিপ্রয়োগের মাধ্যমে হয় না, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা ভালো করেই জানতেন। এ কারণেই তার জীবনের কোথাও এমন একটি উদাহরণও খুঁজে পাওয়া যাবে না যে, তিনি কাউকে জোর করে মুসলমান বানিয়েছেন। মক্কার মুহাজির, মদিনার আনসার, কিংবা অন্যান্য এলাকার মুসলমান, সকলেই দাওয়াতে প্রভাবান্বিত হয়ে স্বেচ্ছায় এবং স্বতঃস্ফূর্তভাবে ইসলাম গ্রহণ করেছে। এর থেকে পরিষ্কার বুঝা যায় যে, ইসলাম তার মতাদর্শ প্রচার-প্রসারে তরবারি চালনার হুকুম দেয় না; বরং ইসলাম উৎসাহ-উদ্দীপনা এবং প্রমাণাদি উপস্থাপনপদ্ধতি গ্রহণের পক্ষে।

শত্রুর আক্রমণ প্রতিরোধ এবং ইসলামবিরোধী শক্তির কর্তৃত্ব খতম করার লক্ষ্যে তরবারির প্রয়োজন রয়েছে। কেননা, সাধারণত মানুষ যখন কোনো সমাজ কিংবা সরকারের অধীনস্থ থাকে, সে অবস্থায় তাদের বিপরীত কোনো দাওয়াত শোনার জন্য আগ্রহী থাকে না। বরং জাতীয়তাবোধ এবং ধর্মীয় গোঁড়ামির কারণে তাদের রাষ্ট্রীয় প্রভাব-প্রতিপত্তি প্রদর্শন করতে একটুও বিলম্ব করে না। এক্ষেত্রে তারা শক্তির মাধ্যমেই প্রত্যুত্তর দিতে চায়। এজন্য ইসলামও বিরোধীশক্তিগুলোকে অবদমিত করা, নিজের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা এবং ইসলামি রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা এবং মানবজাতিকে অন্যান্য ভ্রান্ত রাষ্ট্রব্যবস্থার অন্যায়-অত্যাচার থেকে মুক্তি দিতে জিহাদের পথ বেছে নেয় এবং তার অনুসারীদেরকেও জিহাদ করার হুকুম দেয়।

জিহাদ ফরজ করার উদ্দেশ্য কোনোভাবেই এটা নয় যে, মানুষের গর্দানে তরবারি ধরে তাকে মুসলমান হওয়ার জন্য বাধ্য করা হবে। ইসলাম জিহাদের সাথে সাথে জিজিয়া তথা কর দেওয়ার সুযোগ দিয়ে রেখেছে। ইসলাম তো রাষ্ট্রে কাফেরদেরকে অমুসলিম হিসেবে জিম্মি সাব্যস্ত করে তার জানমাল হেফাজত করার নিশ্চয়তা দেয়। এর মাধ্যমেও পরিষ্কার হয় যে, ইসলাম কখনোই অমুসলিমদেরকে ইসলাম গ্রহণ করতে বাধ্য করে না।

এরপর রয়েছে জিহাদের উসুল (মূলনীতি) এবং আদব (শিষ্টাচার)। যুদ্ধ চলাকালেও ইসলাম শুধু ঐসব লোককে হত্যা করার অনুমতি দেয়, যারা রণাঙ্গনে উপস্থিত হয় কিংবা ইসলামকে মিটিয়ে দেওয়ার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। নারী, শিশু, বৃদ্ধ এবং ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ, যুদ্ধে যাদের কোনোরূপ অংশগ্রহণ

নেই, তাদেরকেও নিরাপত্তা দিয়েছে। যেসব লোক নিরুপায় হয়ে রণাঙ্গনে আসে, তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার নির্দেশও ইসলাম দিয়েছে।

গাজওয়ায়ে বদরে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, 'বনু হাশিমের কোনো লোক যদি মুখোমুখি হয়, তাকে যেন হত্যা না করা হয়। কারণ, তারা স্বেচ্ছায় যুদ্ধে আসেনি; বরং জোর করে তাদের আনা হয়েছে।'[৩৮৬]

ইসলামি জিহাদ পশ্চিমা জাতিগোষ্ঠীর মতো কোনো বিশৃঙ্খল ও এলোপাথাড়ি লড়াই নয় যে, নারী, পুরুষ, শিশুসহ শহরের পর শহর অত্যন্ত মর্মান্তিকভাবে ধ্বংস করে দেওয়া হবে। জিহাদ হলো দুশমনকে দমন করা, মজলুমের প্রতি ইনসাফ করা, জালেমকে প্রতিহত করা, দাওয়াতে তাওহিদের পথে সকল বাধা-বিপত্তি দূর করা এবং ইসলামকে সমুন্নত করার লক্ষ্যে সর্বস্ব বিলিয়ে দেওয়া। আর একজন মুসলমান আল্লাহর সন্তুষ্টি, পরকালের প্রতিদান এবং জান্নাত পাওয়ার নিয়তে জিহাদ করে থাকে।

অভ্যন্তরীণ ও বহিঃআক্রমণের আশঙ্কা

'জিহাদ'-এর এই প্রাথমিক পর্যায়েও রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে তার স্বচ্ছ ও সুস্পষ্ট মর্ম পরিষ্কারভাবেই বিদ্যমান ছিল। ইসলামি হুকুমত পরিচালনা এবং তার অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার একটি গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ ছিল জিহাদ। জিহাদ নিছক তরবারি চালনা এবং আক্রমণ করার নামই নয়; বরং ইসলামি রাষ্ট্র সংরক্ষিত রাখা, তার শত্রুদের নির্মূল করা, রাষ্ট্রের প্রশাসনিক শক্তি-সামর্থ্য বৃদ্ধি করা, দীনের প্রসার এবং কাফেরদের সকল ষড়যন্ত্র নস্যাৎ করে দেওয়ার নাম হলো জিহাদ।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইতোপূর্বে কোনো বাহিনী অথবা কবিলার সরদার ছিলেন না। নবুওয়াতের পরেও তার দিনরাত কেটেছে কেবল একজন দাঈ, আধ্যাত্মিক মুরুব্বি এবং শিক্ষক হিসেবে। কিন্তু মদিনায় আসার পর যখন তাকে প্রথম রাষ্ট্রের দায়িত্বভার গ্রহণ করতে হলো, সৈন্যবাহিনী পরিচালনার প্রয়োজন পড়ল, তখন তিনি অলৌকিক যোগ্যতার মাধ্যমে অত্যন্ত উৎকর্ষ ও পূর্ণ নৈপুণ্যের সঙ্গে তা আঞ্জাম দেন।

মদিনার ইসলামি হুকুমতের জন্য সবচেয়ে বড় বহিঃশত্রু ছিল কুরাইশ এবং অভ্যন্তরীণ ঝুঁকি ছিল ইহুদিরা। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'মদিনা সনদে'র মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ শত্রুদের কিছুটা হলেও নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। কিন্তু বহিঃশত্রুর শঙ্কা তখনও রয়ে গিয়েছিলো। কুরাইশরা

৩৮৬. তারিখুল ইসলাম, জাহাবি : ২/৫৮ (তাদমুরি সংস্করণ)

মদিনার নতুন হুকুমত মেনে নিতে পারছিল না। মদিনার সুদৃঢ় ঐক্যের বিরুদ্ধে তাদের ষড়যন্ত্র চলমান ছিল। মক্কা থেকে মদিনা পর্যন্ত বসবাসকারী অধিকাংশ কবিলাই কুরাইশের মিত্র ছিল। আর এদেরকেই তারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করে। সবচেয়ে উদ্বেগজনক বিষয় ছিল- মদিনার নিকট ও পার্শ্ববর্তী রাস্তাগুলো কুরাইশরা আগের মতো এখনও শামের ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য ব্যবহার করে যাচ্ছে। অথচ নতুন পরিস্থিতিতে মদিনার হুকুমত থেকে অনুমতি নিয়ে তাদের এই রাস্তা ব্যবহার করার কথা ছিল। কারণ, রাস্তাগুলো ছিল মদিনার সীমান্তবর্তী। কিন্তু মুসলমানদের সাথে দূতালি করবে এবং তাদের থেকে রাস্তায় চলাচলের অনুমতি নিবে, কুরাইশের দম্ভ এতে সায় দিচ্ছিল না। ফলে তারা জোরপূর্বক আসা-যাওয়া করে নিজেদের দাপট প্রদর্শন করে।

প্রাথমিক তৎপরতা

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরাইশের পূর্বেকার স্বভাব-প্রকৃতি স্মরণ হওয়ার পর ইসলামি হুকুমতকে তাদের যেকোনো চক্রান্ত এবং ঝুঁকি থেকে নিরাপদ রাখার জন্য বিভিন্ন কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করেন। মদিনার পশ্চিম উপকূল পর্যন্ত আবাদ কবিলাগুলোর সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়ে তাদেরকে ঐক্যবদ্ধ করার চেষ্টা চালান। এরই ধারাবাহিকতায় তিনি ষাটজন মুহাজিরকে নিয়ে সফর করেন। একে 'গাজওয়ায়ে আবওয়া' বলা হয়। এটি ওই স্থান, যেখানে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মা আমেনা তাকে একা রেখে মারা যান। এখানেই তার কবর রয়েছে। এখানকার অধিবাসীরা বনু জামরার সঙ্গে ঐক্য ও পারস্পরিক সহায়তাচুক্তি সম্পন্ন করেন। এটি ২য় হিজরির সফর মাসের ঘটনা।[৩৮৭]

জুমাদাল উলা মাসে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উশাইরা যান এবং বনু মুদলাজের সাথে চুক্তি সম্পাদন করেন।[৩৮৮] তদ্রূপ জুহাইনা গোত্র মদিনা থেকে ত্রিশ মাইল (৪৯ কিলোমিটার) দূরে পাহাড়ে বসবাস করত। তাদের সঙ্গেও এটুকু বিষয়ে সম্মত করতে সক্ষম হন যে, তারা কুরাইশের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নিরপেক্ষ থাকবে।[৩৮৯] ওই বছরেই রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শাবানের শুরুর দিকে ইয়ানবু গিয়েছেন। তারপর শাবানের

---

৩৮৭. আলবিদায়া ওয়ান নিহায়া : ৫/২২। (ইবনে হাবিবের মত অনুযায়ী ২রা হিজরির সফর মাসের শুরুর দিকে তিনি রওনা হয়েছেন এবং ১লা রবিউল আওয়াল মাসে ফিরে এসেছেন। [আলমুহাব্বার : পৃষ্ঠা ১১০]

৩৮৮. সিরাতে ইবনে হিশাম : ১/৫৯৮, ৫৯৯

৩৮৯. আলমুহাব্বার : পৃষ্ঠা ১১১

মাঝামাঝিতে সাফওয়ান গিয়ে সেখানকার বনু গিফার, বনু আসলামের সঙ্গে মৈত্রীচুক্তি সম্পন্ন করেন।[৩৯০]

উপর্যুক্ত সবকটি কবিলা মদিনা ও লোহিতসাগর-উপকূলের মধ্যবর্তী শামগামী পথের নিকট ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় বসবাস করত। তারা মদিনার হুকুমতের অধীনস্থ হয়ে যাওয়া কুরাইশের জন্য সত্যিই উদ্বেগজনক ছিল। কারণ, এর ফলে তাদের বাণিজ্য-কাফেলার আসা-যাওয়া অনেক ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে যায়। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরাইশের বাণিজ্য কাফেলার উপর এত কড়া প্রহরার ব্যবস্থা করেননি যে, তাদের আসা-যাওয়া বন্ধ হয়ে যাবে। আর বাস্তবেও তা একটি নতুন সরকারের জন্য কঠিন ছিল।

কুরাইশের দুর্বলতা : অরক্ষিত বাণিজ্যপথ

মক্কাবাসী আউস-খাযরাজের সঙ্গে শত্রুতা তৈরি করতে চাচ্ছিল না। কারণ, মদিনা তাদের বাণিজ্য-কাফেলার আসা-যাওয়ার পথে ছিল। এখানকার লোকদের সঙ্গে শত্রুতা পোষণ করলে মক্কাবাসীকে চড়ামূল্য দিতে হতো। এটা ছিল কুরাইশের দুর্বল দিক, আনসার সাহাবিরা তা খুব ভালো করেই জানতেন। সময় গড়িয়ে যাওয়ার পর এটি তারা প্রকাশও করেন।

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মদিনায় আসার কিছুদিন পর আউস গোত্রের সরদার সা'দ বিন মুআজ রাদিয়াল্লাহু আনহু উমরা করার জন্য মক্কা যান। তার সাথে উমাইয়া বিন খালাফের পুরোনো বন্ধুত্ব ছিল। এজন্য মক্কায় গেলে তার বাড়িতে অবস্থান করেন। একদিন তিনি উমাইয়ার সাথে কাবা শরিফ তাওয়াফের জন্য যান। সেখানে আবু জাহলের সাথে সাক্ষাৎ হয়। সে সা'দ বিন মুআজকে ধমকের স্বরে বলে, 'তোমরা ধর্মদ্রোহী এবং বেদীনদের আশ্রয় দিয়েছ। তাই তোমরা যদি কাবা জিয়ারতে আসো, আমার তা সহ্য হয় না। যদি তোমার সাথে উমাইয়া না থাকত, তা হলে তুমি এখান থেকে জীবিত ফিরে যেতে পারতে না।'

তখন সা'দ বিন মুআজ রাদিয়াল্লাহু আনহু তার শক্ত উত্তর দেন। বলেন, 'যদি তোমরা আমাদেরকে কাবা জিয়ারত করতে বাধা প্রদান কর, তা হলে আমরাও তোমাদের বাণিজ্যিক পথ বন্ধ করে দেব।'[৩৯১]

পরবর্তীতে উভয়পক্ষের পালটাপালটি হুমকি-ধমকি বাস্তবে রূপ নেয়।

---

৩৯০. সহিহ বুখারি : হাদিস নং ৩৯৫০ (কিতাবুল মাগাজি, বাবু যিকরিন নাবিয়্যি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাইয়ুকতালু বিবাদ্‌র)

৩৯১. সহিহ বুখারি : হাদিস নং ৩৯৫০ (কিতাবুল মাগাজি, বাবু যিকরিন নাবিয়্যি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাইয়ুকতালু বিবাদ্‌র)

কুরাইশের তৎপরতা এতই শত্রুতাপূর্ণ ছিল যে, মুসলমানদের কাবা জিয়ারত দূরের কথা, মক্কার কাছেধারেও তাদের ঘেঁষতে দিত না। ফলে মুসলমানরা কুরাইশ কাফেলার উপরও তাদের ক্ষোভ ঝাড়তে থাকে।

গাজওয়া এবং সারিয়া

হুকুমত প্রতিষ্ঠা এবং জিহাদ অনুমোদনের পর নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সীমান্তরক্ষা, দুশমনের আঘাতের পালটা জবাব প্রদান এবং ইসলামি হুকুমতের সীমান্তবর্তী রাস্তা দিয়ে নিয়ম ভঙ্গ করে গমনাগমনকারী কাফেলাগুলোকে বাধা দেওয়ার জন্য মাঝেমধ্যেই সাহাবায়ে কেরামের সশস্ত্র বাহিনী পাঠাতেন। এই বাহিনীগুলোকে সিরাত-লেখকদের ভাষায় 'সারায়া' বলা হয়।

'গাজাওয়াত' এবং 'সারায়া' এ দুটির মর্ম এখানে ভালো করে বুঝে রাখুন, সামনের ঘটনাবলি বুঝতে যেন কোনো সমস্যা না হয়।

মদিনার ইসলামি হুকুমতের সংরক্ষণ, এই কেন্দ্রের মাধ্যমে ইসলামকে সমুন্নত করা, আর তা বাস্তবায়নের জন্য সুবিন্যস্ত প্রচেষ্টা, বিভিন্ন কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ এবং সফরের প্রয়োজন হয়; এগুলোকেই গাজাওয়াত এবং সারায়া বলা হয়। গাজাওয়াত 'গাজওয়াতুন'-এর বহুবচন। এর দ্বারা সেইসব রাজনৈতিক, সামরিক, দাওয়াতি সফর উদ্দেশ্য, যাতে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বয়ং উপস্থিত থাকতেন।

সারায়া 'সারিয়াতুন'-এর বহুবচন। এটা ওইসব অভিযানকে বলে, যেসব অভিযানে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবিদেরকে বিন্যাস্ত করে পাঠাতেন; কিন্তু তিনি শরিক থাকতেন না। 'গাজওয়া' কিংবা 'সারিয়া' যুদ্ধের সমার্থক শব্দ নয়। বরং এ দুটির অর্থে অনেক ব্যাপকতা রয়েছে।[৩৯২]

৩৯২. নিম্নোক্ত কিসিমের সকল সফরের উপর 'গাজওয়া' কিংবা 'সারিয়াহ'র অর্থ প্রয়োগ হয় :

১. প্রতিরক্ষা কিংবা শত্রুকে পরাজিত করার জন্য সফর, যার মধ্যে যুদ্ধও সংঘটিত হয়। যেমন গাজওয়া হুনাইন, গাজওয়ায়ে খাইবার।
২. প্রতিরক্ষা কিংবা শত্রুকে পরাজিত করার জন্য সফর, কিন্তু কোনো যুদ্ধ সংঘটিত হয়নি। যেমন: গাজওয়ায়ে তাবুক।
৩. যুদ্ধের জন্য সফর না হোক, কিন্তু যুদ্ধের পূর্বে হওয়া। যেমন: গাজওয়া বদর।
৪. বিদ্রোহীদের নির্মূল অভিযান। যেমন: গাজওয়া বনু কায়নুকা, গাজওয়া বনু কুরাইজা।
৫. সীমান্ত-রক্ষায় টহলদার বাহিনী। অধিকাংশ সারিয়্যা এই ধরনের ছিল।
৬. দীনের তাবলিগ ও তালিমের প্রতিনিধিদলের সফর, যাদের দায়িত্ব ছিল সংবাদ সংগ্রহ কিংবা কোন মিত্রের সাহায্য করা। যেমন সারিয়্যা রাজি।
৭. দীনের তাবলিগ ও তালিমের সফরে গিয়ে কোন চুক্তি সম্পন্ন হওয়া। যেমন গাজওয়া ওয়াদ্দান, গাজওয়া বুওয়াত।

গাজওয়ার সংখ্যা হজরত যায়েদ বিন আরকাম রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত সহিহ রেওয়ায়েত অনুযায়ী ১৯টি।[৩৯৩] অন্যদিকে জাবের বিন আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহুর বর্ণনা অনুযায়ী ২১টি। কিছু কিছু রেওয়ায়েতে ২৭টির বর্ণনা রয়েছে।[৩৯৪] সারিয়ার সংখ্যা ৩৮, ৪৭ এবং ৫৬টি বলা হয়।[৩৯৫] সংখ্যার এই ভিন্নতার কারণ হলো, কোনো কোনো সময় একই সফরে বিভিন্ন স্থানে যাওয়া হয়েছে। একাধিক অভিযান পরিচালনা করা হয়েছে। ফলে কেউ এক সফরে সংঘটিত-হওয়া একাধিক কর্মসূচিকে একটি গণ্য করেছেন। কেউবা ভিন্ন ভিন্ন গণনা করেছেন; এজন্যই সংখ্যার মধ্যে তারতম্য দেখা দিয়েছে।[৩৯৬]

প্রাচ্যবিদরা এসব অভিযানকে ডাকাতি বলে অভিহিত করে। কারণ, তারা নাকি কুরাইশ কাফেলা লুটপাট করতেন। এই আপত্তি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। কুরাইশ

---

৮. ঐ সফর, যাতে দুশমনের আক্রমণ-ঝুঁকি কিংবা ক্ষয়ক্ষতি ছিল। যেমন গাজওয়া যাতুর রিকা।

৯. শত্রুকে ভয় দেখানোর জন্য সফর করা। যেমনঃ গাজওয়া বনি লিহয়ান, গাজওয়া হামরাউল আসাদ, গাজওয়া বদরুল মাওয়িদ।

১০. কোনো ডাকাতি, ব্যভিচার কিংবা কোনো আঘাতের জবাবে পরিচালিত অভিযান। যেমনঃ গাজওয়া যু কিরদাহ, গাজওয়া সাফওয়ান।

১১. দুশমনের সংবাদ আহরণের জন্য প্রেরিত বাহিনী। যেমনঃ সারিয়্যা আবদুল্লাহ বিন জাহশ রা.।

১২. দুশমনের গতিরোধ করার জন্য বাহিনী প্রেরণ। যেমনঃ সারিয়্যা আবু উবাইদা বিন জাররাহ, সারিয়্যা যু কিরদাহ।

১৩. কোনো গোত্রের সঙ্গে চুক্তি সম্পাদনের জন্য সফর। যেমনঃ গাজওয়া ওয়াদ্দান, গাজওয়া বুওয়াত, গাজওয়া উশাইরাহ।

১৪. ইবাদত আদায়ের সফরে গিয়ে কোনো কওমের সঙ্গে সন্ধি হওয়া। (এজন্য হুদাইবিয়া সন্ধিকে গাজওয়ার মধ্যে শামিল করা হয়।)

১৫. সুনির্দিষ্ট কোনো শত্রুকে হত্যা করার জন্য পরিচালিত অভিযান। যেমনঃ সারিয়্যা মুহাম্মদ বিন মাসলামা, সারিয়্যা আবদুল্লাহ বিন আতিক.. [রাহমাতুলল্লিল আলামিন : ২/৪৫৪-৪৫৬]

যেসব গাজওয়াতে যুদ্ধ হয়েছিল, তার সংখ্যা ১১টি :

১. গাজওয়ায়ে বদর। ২. গাজওয়ায়ে উহুদ। ৩. গাজওয়ায়ে বনু কায়নুকা। ৪. গাজওয়ায়ে বনু নজির। ৫. গাজওয়ায়ে বনু মুসতালিক। ৬. গাজওয়ায়ে খন্দক। ৭. গাজওয়ায়ে বনু কুরাইজা। ৮. গাজওয়ায়ে খাইবার। ৯. গাজওয়ায়ে ফাতহে মক্কা। ১০ গাজওয়ায়ে হুনাইন। ১১ গাজওয়ায়ে তায়েফ।

কিছু কিছু আলেম এই তালিকায় গাজওয়ায়ে বনু নজিরকে অন্তর্ভুক্ত করেন না। কারণ, এতে কেবল অবরোধ হয়েছিল। আর গাজওয়ায়ে বনু কুরাইজাকে তারা গাজওয়ায়ে খন্দকের সম্পূরক হিসেবে গণ্য করেন। এতে করে যুদ্ধ সংঘটিত হওয়া গাজওয়ার সংখ্যা হয় ৯টি।

৩৯৩. সহিহ বুখারি : হাদিস নং ৩৯৪৯ (কিতাবুল মাগাজি)

৩৯৪. দালাইলুন নুবুওয়াহ, বাইহাকি : ৫/৪৫৭-৪৬২

৩৯৫. সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ : ৬/৩

৩৯৬. শারাফুল মুসতফা : ৩/১০

কাফেলার উপর হামলা করাকে তখনই ডাকাতি বলা যাবে, যখন কুরাইশ নির্দোষ হবে। দ্বিতীয়ত তাদের কাফেলার উপর হামলা রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে না, সাধারণ জনগণ করত। জালেম থেকে বদলা নেওয়াই ইনসাফ। আর যখন দুই হুকুমতের মাঝে সম্পর্কের টানাপোড়েন শুরু হয়, তাদের মধ্যে কোনোরূপ চুক্তি স্বাক্ষরিত না হয়, এমন অবস্থায় উভয়পক্ষের মধ্যে জানমালের ক্ষয়ক্ষতির বিচ্ছিন্ন কিছু ঘটনাকে পৃথিবীর কোন ভাষায় ডাকাতি বলে?

সংবাদ সংগ্রহপদ্ধতি

গুপ্তচরবৃত্তি এবং আগাম সংবাদ সংগ্রহপদ্ধতি ছাড়া সামরিক ও রাজনৈতিক কার্যক্রম চলতে পারে না। কারণ, এসব ব্যবস্থাপনা ব্যতীত গোড়ার সংবাদ পাওয়া সম্ভব নয়; নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যদিও কিছু সংবাদ ওহী কিংবা ফেরেশতার মাধ্যমে পেতেন। এ ছাড়া তিনি সংবাদ আহরণের ক্ষেত্রে অনেক সময় গুপ্তচরদের উপর নির্ভর করতেন।

একজন দক্ষ সেনানায়ক হিসেবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বদা সঠিক সংবাদ আহরণে যথাসাধ্য ব্যবস্থা গ্রহণ করতেন। মক্কা থেকে কুরাইশের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত সম্পর্কে অবগত হতে তিনি কখনো এমন লোকদের নিয়োগ দিতেন, যারা তখনও কুরাইশের কাছে তাদের ইসলামগ্রহণের কথা লুকিয়ে রেখেছিল। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের থেকে প্রাপ্ত তথ্যাদির সূত্র কখনোই প্রকাশ করতেন না। তাই অধিকাংশ সময়ই বুঝা যেত না যে, এটা কি ওহীর মাধ্যমে অবগত হয়েছেন, না গোয়েন্দা-মারফত জানতে পেরেছেন।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিশ্চয় গোয়েন্দা নিয়োগ করে রেখেছিলেন। তবে সে যুগে ভ্রাম্যমান কাফেলাগুলোর সংবাদ সংগ্রহের ক্ষেত্রে কোনো গোয়েন্দার সংবাদ এমন উপযুক্ত সময়ে পৌঁছাতে পারত না যে, কোনো বাহিনী প্রস্তুত করে শত্রুদের প্রতিহত করা যাবে। কখনো কাফেলা আচানক রাস্তা পরিবর্তন করে মদিনা থেকে ৫০-৬০ মাইল (৮০-৯৫ কিলোমিটার) দক্ষিণ দিক দিয়ে বেরিয়ে তাদের মিত্রগোত্রগুলোর নিকট পৌঁছে যেত। এজন্য কুরাইশের অনেক কাফেলাই সশস্ত্র সাহাবিদের টহলদার বাহিনীর দৃষ্টি ফাঁকি দিয়ে চলে যেতে পারত। তবে কুরাইশ এটুকু সতর্ক বার্তা তো অবশ্যই লাভ করেছে যে, তারা এখন থেকে একটি ইসলামি রাষ্ট্রের সীমানা অতিক্রম করে শামে যাওয়া-আসা করছে। এদিক দিয়ে তাদেরকে স্বাধীনভাবে চলাফেলা করার সুযোগ দেওয়া হবে না।

স্বাভাবিকতই ঐসব টহলদার বাহিনীকে প্রয়োজনে অস্ত্র ব্যবহারের অনুমতিও দেওয়া হয়েছিল। কাউকে আবার শুধু দুশমনের গতিবিধি লক্ষ করার নির্দেশ দেওয়া হতো। এভাবে মদিনার ইসলামি হুকুমত সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা দেয় যে, কুরাইশের ব্যবসা-বাণিজ্য এবং অর্থনীতির প্রাণ এখন মুসলমানদের করুণার উপর নির্ভর। অতএব, তারা যদি এখনও তাদের দুশমনি থেকে সংযত না হয়, তা হলে তারা কঠিন আর্থিক সঙ্কটে পড়বে।

উল্লেখ্য যে, এসব অভিযান নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কেবল মুহাজিরদের মাধ্যমে সম্পন্ন করতেন। কুরাইশদের হাতে কঠিন নির্যাতন সংবরণকারী মজলুম মুহাজিরদেরকে তাদের সম্মুখে সৈনিক হিসেবে প্রেরণ করাটাই ছিল তাদের মধ্যে ভয় ও আতঙ্ক সৃষ্টি করার অধিক কার্যকর উপায়। তা ছাড়া আনসারদের থেকে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার হেফাজত এবং মদিনার উপর যেকোনো আক্রমণ প্রতিহত করার প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলেন। মদিনার বাইরে কোনো অভিযানের ব্যাপারে তাদের থেকে প্রতিশ্রুতি নেননি; যদিও আনসাররা নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামান্য ইশারায় জান দিতে প্রস্তুত ছিলেন। তারপরও তিনি যথাসম্ভব তার প্রতিশ্রুতির উপর অটল থাকতে চাচ্ছিলেন।

হিজরতের সপ্তম মাস রমজানে হজরত হামজা রাদিয়াল্লাহু আনহুর নেতৃত্বে জিহাদের প্রথম অভিযান রওনা হয়। এই অভিযানে ত্রিশজন মুহাজির অংশগ্রহণ করেছিলেন। তাদের টার্গেট ছিল কুরাইশের বাণিজ্য-কাফেলা, যা আবু জাহলের নেতৃত্বে মদিনার পথ এড়িয়ে উপকূলের পথ ধরে শামের দিকে যাওয়ার চেষ্টা করে। মুসলমানরা তাদের মুখোমুখি হয়ে কেবল সতর্ক করে চলে যায়।

দ্বিতীয় অভিযান ছিল শাওয়াল মাসে। এই বাহিনী হজরত উবাইদা বিন হারিসের নেতৃত্বে বাতনে রাবেগের দিকে প্রেরণ করা হয়। সেখানে আবু সুফিয়ানের নেতৃত্বে এক বাণিজ্য কাফেলা আসছিল। এই অভিযানে হজরত সা'দ বিন আবু ওয়াক্কাস রাদিয়াল্লাহু আনহুও ছিলেন। তিনি কাফেরদের উপর তির নিক্ষেপ করেন। এটিই ছিল ইসলামের ইতিহাসে শত্রুর উপর ছোড়া প্রথম তির। এবারও কাফেলাকে শুধু সন্ত্রস্ত করে তোলাই যথেষ্ট মনে করে ফিরে আসা হয়েছিল।[৩৯৭]

সারিয়ায়ে আবদুল্লাহ বিন জাহাশ

২য় হিজরির জুমাদাল আখিরার শেষদিকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরাইশের ইয়ামানমুখী বাণিজ্য-কাফেলাগুলোকে অরক্ষিত করার লক্ষে দুঃসাহসী পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। হজরত আবদুল্লাহ বিন জাহাশ রাদিয়াল্লাহু

৩৯৭. যাদুল মাআদ : ৩/১৬৩

আনহুর নেতৃত্বে বারোজন মুহাজির সাহাবিকে দিয়ে একটি চিরকুট হাতে ধরিয়ে দেন এবং বলেন, 'দু-দিন সফর করার পর এইটা খুলবে।'

দু-দিন পর তিনি খুলে দেখেন চিরকুটে লেখা যে, 'নাখলা নামক স্থানে গিয়ে ওত পেতে থাকবে এবং কুরাইশের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করবে।' এতদূর সফর করে এসে তারা তখন দুশমনের এলাকার বিপজ্জনক পয়েন্টে অবস্থান করছিলেন। এজন্য হজরত আবদুল্লাহ বিন জাহাশ রাদিয়াল্লাহু আনহু চিরকুট পড়ে সাথিদের বললেন, 'আমার সঙ্গে কেবল তারাই আসবে, যারা শাহাদাতের তামান্না রাখে।' এ কথা বলার পর কেউ পিছপা হননি।[৩৯৮]

দলটি নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছে যায়। ততক্ষণে কুরাইশের একটি ছোট কাফেলা চামড়া ও কিশমিশ নিয়ে সামনে অগ্রসর হয়ে গেছে। রজবের চাঁদ উদিত হয়ে গিয়েছিল। এই মাসটি আরবদের কাছে নিষিদ্ধ মাসের অন্তর্ভুক্ত ছিল, যেগুলোতে তারা কোনো যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত হতো না। ইসলামেও তখন এই বিধান বহাল ছিল। কিন্তু সাহাবিগণ জুমাদাল আখিরার শেষদিন মনে করেন।[৩৯৯] ফলে তারা কাফেলার উপর হামলা করে বসেন। এতে কাফেলার সরদার আমর বিন হাজরামি মারা যায়, দুজন গ্রেফতার হয় এবং তাজা শাক-সব্জি গনিমত হিসাবে তাদের হস্তগত হয়।

অভিযান সমাপ্ত করে তারা যখন নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট ফিরে যান, তখন তিনি তাদেরকে বলেন, আমি তোমাদেরকে রজব মাসে লড়াই করার অনুমতি দেইনি।' ফলে তিনি বন্দি ও গনিমতের মাল-সামানা সবকিছু মক্কায় ফিরিয়ে দেন।

নিহত আমর বিন হাজরামি কুরাইশের একজন প্রখ্যাত সরদার ছিল। তার নিহত হওয়াতে তারা ভীষণ ক্ষিপ্ত হয়। ওরা প্রচার করতে থাকে যে, মুসলমানরা হারাম মাসেও যুদ্ধ-বিগ্রহ বৈধ মনে করে। তাদের এই প্রোপাগান্ডার জবাবে নাজিল হয়-

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ

তারা আপনাকে হারাম মাস সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে।[৪০০]

---

৩৯৮. সিরাতে ইবনে হিশাম : ১/৬০২। স্মর্তব্য, নাখলা মক্কার দক্ষিণপূর্বে তায়েফের পথে অবস্থিত।

৩৯৯. সিরাতে ইবনে হিশাম : ১/৬০৩। আর তারিখুল মাদিনা, ইবনে শাব্বাহ : ২/৪৭২ এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী দিনটি ছিল রজবের শেষদিন এবং সাহাবায়ে কেরামের তা জানা ছিল। অন্যদিকে ইমাম তাহাবি রহ. [শারহু মুশকিলিল আসার : হাদিস নং ৪৮৮০] এক রেওয়ায়েতে বলেছেন, সাহাবায়ে কেরামের জানা ছিল না যে, এটা জুমাদাল উলার শেষদিন নাকি রজবের প্রথম দিন। সনদ ও যুক্তির আলোকে এটিই যুক্তিযুক্ত।

৪০০. সুরা বাকারা, আয়াত ২১৭।
মনে রাখবেন, সারিয়্যা আবদুল্লাহকে যে রজব মাসে পাঠানো হয়েছিল, তা ছিল মক্কি রজব,

আয়াতে বলা হয়েছে, মুসলমানদের সেই ভুলের তুলনায় কাফেরদের ভ্রান্ত আকিদা, কুফর, শিরক, জুলুম আরও জঘন্য। তাদের ওই অন্যায়-অপরাধ ভুলে গিয়ে মুসলমানদের একটা ভুল নিয়ে এত হইচই করার কিছু নেই।[৪০১]

কাবাকে কিবলা বানাবার বিধান অবতীর্ণ

মুসলমানরা তখনও বাইতুল মাকদাসের দিকে ফিরে নামাজ আদায় করছিল। কিন্তু নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তামান্না ছিল নামাজের জন্য কিবলা হিসেবে কাবা শরিফকে নির্বাচন করা। কেননা, হাজার বছর ধরে এটিই তাওহিদ ও ঈমানের কেন্দ্র হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে। আল্লাহ তায়ালার প্রথম ঘর এটিই। তার ইজ্জত-সম্মান পৃথিবীর সকল ইবাদতগাহ থেকে উত্তম। হিজরতের এক বছর চার মাস পর ২য় হিজরির ১৫ শাবানে আল্লাহ তায়ালা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং মুসলমানদেরকে কাবা শরিফের দিকে ফিরে নামাজ আদায় করার নির্দেশ দেন। ইহুদিরা তার উপর যেসব আপত্তি আরোপ করে, কুরআন সেগুলোর দাঁতভাঙা জবাব দেয়।[৪০২]

আশুরার রোজা

মক্কার মুশরিকরাও (১০ মহররম) আশুরার দিনে রোজা পালন করত এবং এদিন কাবা শরিফে নতুন গিলাফ পরাত। ইসলামে আশুরার রোজা ফরজ করা হলো। মুসলমানরা পূর্ণ গুরুত্বের সাথে এই রোজা পালন করতে থাকেন।[৪০৩]

নিরেট চান্দ্র রজব ছিল না। এজন্য মুসলমানরা মূলত কোনো অপরাধ করেননি। কিন্তু কুরাইশ যেহেতু তাকে মনগড়াভাবে সম্মানিত মনে করত, তাই তাদের লালিত মতাদর্শকে মেনে নিয়েই কুরআনে উত্তর প্রদান করা হয়েছে।

৪০১. সিরাতে ইবনে হিশাম : ১/৬০২-৬০৪

৪০২. তাফসিরে ইবনে কাসির, সুরা বাকারা, আয়াত ১৪০-১৫০; আলবিদায়া ওয়ান নিহায়া : ৫/৪৫
কিবলা পরিবর্তন প্রসঙ্গে একাধিক মত রয়েছে। কারো নিকট হিজরতের ১৭ মাস পরে অর্থাৎ রজব মাসে হয়েছে। কারো নিকট ১৮ মাস তথা শাবান মাসে হয়েছে। হাফেজ ইবনে কাসির রহ. শাবান মাসে হওয়ার বিষয়টি প্রাধান্য দিয়েছেন। [আলবিদায়া ওয়ান নিহায়া : ৫/৪৫]
আর এটা নিশ্চিত যে, মাদানি শাবানে হয়েছে। সহিহ বুখারির রেওয়ায়েত অনুযায়ী হিজরতের ১৬ কিংবা ১৭ মাস পর্যন্ত বাইতুল মাকদিস-অভিমুখী হয়ে নামাজ আদায় করেছিলেন। [হাদিস ৪০ বাবুস সালাত মিনাল ঈমান, কিতাবুল ঈমান]
এর থেকে বুঝা যায় যে, হিজরত থেকে মাদানি রজব ২রা হিজরি মাদানি ক্যালেন্ডার অনুযায়ী ১৭ আর মক্কি ক্যালেন্ডার মোতাবেক (নাসি তথা বিলম্ব মাস অনুসারে) ১৬ মাস অতিক্রান্ত হয়েছিল। এ সময় নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বাইতুল মাকদিসের দিকে ফিরে নামাজ আদায় করতেন। ১৮ মাস অর্থাৎ শাবান মাসে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বাইতুল্লাহর দিকে ফিরে নামাজ আদায়ের নির্দেশপ্রাপ্ত হন।

৪০৩. সহিহ বুখারি : হাদিস নং ১৫৯২ (কিতাবুল হজ, বাবু কাওলিল্লাহ : جعل الله الكعبة) হাদিস নং ১৮৯৩ (কিতাবুস সাওম, বাবু ওজুবি সাওমি রামাযান) [ফাতহুল বারি : ৪/২৪৮]

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেসময় মদিনায় আগমন করেন, তখন এখানকার ইহুদিরাও ১০ মহররমে রোজা পালন করত। কারণ হিসেবে তারা বলত, 'এটি একটি বরকতময় দিন। এইদিনে আল্লাহ তায়ালা বনি ইসরাইলকে তাদের শত্রু ফেরাউনের কবল থেকে মুক্তি দিয়েছেন, তখন মুসা আলাইহিস সালামও রোজা রেখেছিলেন।' তখন নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, মুসা আলাইহিস সালামের সঙ্গে তোমাদের তুলনায় আমি অধিক সম্পর্ক রাখার হকদার।' এরপর তিনি অভ্যাস অনুযায়ী ১০ মহররম রোজা রাখেন এবং মুসলমানদেরকেও রোজা রাখার নির্দেশ দেন।[৪০৪]

প্রাচ্যবিদদের এই আপত্তি সম্পূর্ণ নিরর্থক যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহুদিদের অনুসরণ করে রোজা রেখেছেন। আসল কথা হলো, মুসলমানরা মক্কা থেকেই এই রোজা পালন করতেন। এখানে এসে শুধু এই কথা বলে দেওয়া হলো যে, মুসা আলাইহিস সালামের প্রকৃত অনুসারী আমরা, তোমরা নও।[৪০৫]

রমজানের রোজা ফরজ হওয়া

২য় হিজরির শাবান মাসে রমজানের রোজা ফরজের বিধান নাজিল হয়।[৪০৬] আশুরার রোজা নফল হয়ে যায়। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলে দেন যে, যারা চায় রাখবে, যাদের ইচ্ছা রাখবে না।[৪০৭] কিন্তু রমজানের রোজা রাখার ব্যাপারে জোর তাগিদ দেন, তার গুরুত্ব ও তাৎপর্য পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করেন। তিনি বলতেন, 'যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে সওয়াবের আশায়

৪০৪. সহিহ বুখারি : হাদিস নং ২০০৪ (কিতাবুস সাওম, বাবু সাওমি আশুরাহ)

৪০৫. রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মদিনায় গমন করেছেন ১২ রবিউল আওয়াল মাদানি মোতাবেক ২৪ সেপ্টেম্বরে।
মক্কি ক্যালেন্ডার মোতাবেক তখন মহররম শুরু হয়ে গিয়েছিল। তখন ইহুদিদের নিজস্ব ক্যালেন্ডার অনুযায়ীও তা ছিল প্রথম মাস 'তাশরি', যা প্রতিবছর নাতিশীতোষ্ণ মৌসুম হেমন্তকালে শুরু হয় (অর্থাৎ সেপ্টেম্বরের শেষে এবং অক্টোবরের শুরুতে)।
ইহুদিরা মাসের ১০ তারিখকে 'আশুরা' মনে করে রোজা রাখত; সে দিন চান্দ্র ক্যালেন্ডার হিসেবে ১০ তারিখ হোক বা না হোক। অথচ ইসলাম মক্কি ক্যালেন্ডার রহিত করে দিয়েছে সুরা তাওবার ৩৬, ৩৭নং আয়াতের মাধ্যমে। এর পূর্বে মুসলমানরা আশুরাসহ রমজানের রোজা মক্কি ক্যালেন্ডার অনুযায়ীই পালন করতেন। তখন ইসলামেও তা বৈধ ছিল। যেমন: কেবলা পরিবর্তনের পূর্বে কাবা শরিফের পরিবর্তে বাইতুল মাকদাসের দিকে ফিরে নামাজ আদায় করাই শরিয়তসম্মত ছিল।

৪০৬ . তাবাকাতে ইবনে সা'দ : ৪/২৪৮, আলবিদায়া ওয়ান নিহায়া : ৫/৩১২, আলমুনতাজাম, ইবনুল জাওযি : ৩/৯৬

৪০৭. সহিহ বুখারি : হাদিস নং ১৫৯২ (কিতাবুল হজ, বাবু কাওলিল্লাহ) হাদিস নং ১৮৯৩ (কিতাবুস সাওম, বাবু ওজুবি সাওমি রামাযান)

রমজানের রোজা রাখবে, রাতেরবেলা পাবন্দির সাথে তারাবিহ পড়বে, তার পূর্বের সকল গুনাহ মাফ করে দেওয়া হবে।'[৪০৮]

রমজানের ফরজ রোজা আল্লাহ তায়ালার মহব্বতে সকল প্রিয় জিনিস ত্যাগ করার বাস্তব অনুশীলন ছিল। এর মাধ্যমে আত্মার পবিত্রতা, অন্তরের পরিচ্ছন্নতা এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে পাপাচার থেকে সংযত রাখার দীক্ষা ছিল। রমজানের রোজা প্রসঙ্গে কুরআন এবং হাদিসে যে ফজিলত বর্ণনা করা হয়েছে, তার দরুন সাহাবায়ে কেরামের নিকট এই রোজা সবচেয়ে প্রিয় আমলে পরিণত হয়। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তার সাহাবিগণ রমজান ছাড়াও মাঝেমধ্যে রোজা রাখতেন।

***

৪০৮. সুনানে তিরমিজি : হাদিস নং ৬৮৩ (আবওয়াবুস সাওম)

গাজওয়ায়ে বদর

(২য় হিজরি রমজান/ মে ৬২২ খ্রিষ্টাব্দ)

সারিয়ায়ে আবদুল্লাহ বিন জাহাশেই (রাদিয়াল্লাহু আনহু) কুরাইশের বিরুদ্ধে প্রথম তরবারির ব্যবহার হয় এবং একজন মারা যায়। এতে করে কুরাইশের সরদাররা কওমকে উত্তেজিত করার সুবর্ণ সুযোগ হাতছাড়া করতে চাইল না। তারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে বড় একটি বাহিনী তৈরিতে মশগুল হয়ে যায়। যুদ্ধের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো সামরিক প্রস্তুতি। কুরাইশরা তাদের সবকিছু দিয়ে আবু সুফিয়ানের নেতৃত্বে এক বিরাট বাণিজ্য কাফেলা শামে পাঠিয়ে দেয়, যার মুনাফা দিয়ে সামরিক সরঞ্জাম প্রস্তুত করা হবে।[৪০৯]

এই কাফেলা যাওয়ার সময় মুসলমানদের টহলদার বাহিনীকে ফাঁকি দিয়ে বের হয়ে যায়। ফেরার সময় রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গোয়েন্দা জুতসই স্থানে উপস্থিত ছিল। যথাসময়ে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সংবাদ পেয়ে যান। ফলে ২য় হিজরির ৮ রমজানে মুহাজির ও আনসারদেরকে তাৎক্ষণিক প্রস্তুত করে, তাদেরকে সাথে নিয়ে আবু সুফিয়ানের কাফেলার গতিরোধ করার জন্য তিনি রওনা দেন।[৪১০]

শিশুদের জিহাদি স্পৃহা

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনা থেকে বের হয়ে ১ মাইল (সোয়া এক কিলোমিটার) দূরে অবস্থিত 'বিরে আকাবা'র নিকটে পৌঁছে অবস্থা পর্যবেক্ষণ করলেন। সেখানে তিনি কমবয়সি কিছু বালককে দেখতে পান। জিহাদের অদম্য স্পৃহার কারণে তারাও সঙ্গে বের হয়েছিল। তিনি তাদের ফিরে যাওয়ার নির্দেশ দেন। তাদের মধ্যে ছিলেন উসামা বিন যায়েদ, রাফে বিন খাদিজ, বারা বিন আযেব, যায়েদ বিন আরকাম এবং যায়েদ বিন সাবিত রাদিয়াল্লাহু আনহুম।

৪০৯. আলকামিল ফিত তারিখ : ২/১২

৪১০. সিরাতে ইবনে হিশাম : ১/৬১২

গাজওয়া বদর গ্রীষ্মকালে সংঘটিত হয়েছিল। আবদুল্লাহ বিন মাসউদ রা. বলেন, 'তখন গরমকাল ছিল'। [সহিহ বুখারি : হাদিস নং ৩৯৬০, কিতাবুল মাগাজি] তা ছাড়া সাহাবিদের নিকটবর্তী স্থানে পানির সন্ধান করা, নবীজির (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) জন্য ছাপড়া তৈরি করা গ্রীষ্মকাল হওয়ার সম্ভাবনাকে জোরালো করে।

লক্ষ করুন, ২রা হিজরির মাদানি রমজান মার্চে হয়, অন্যদিকে মক্কি রমজান হয় মে মাসে। এই মৌসুমি নিদর্শনগুলোই বলে দেয় যে, রাবিগণ এই গাজওয়ার সময়কাল মক্কি ক্যালেন্ডার অনুযায়ী বর্ণনা করেছেন।

তাদের মধ্যে ১৬ বছর বয়সি সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস রাদিয়াল্লাহু আনহুর ছোট ভাই উমাইর বিন আবি ওয়াক্কাস রাদিয়াল্লাহু আনহুও ছিলেন। তিনি নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দৃষ্টি থেকে চেহারা আড়াল করে রাখছিলেন। ভাই সাদ রাদিয়াল্লাহু আনহু এটা দেখে জিজ্ঞেস করলেন, কী হলো? উমাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, 'ভয় পাচ্ছি, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যদি আমাকে দেখে ফেলেন, তা হলে আমাকেও ছোট ভেবে ফেরত পাঠিয়ে দিতে পারেন। আমি আল্লাহর রাস্তায় বের হতে চাই। আল্লাহ তায়ালা হয়তো আমাকে শাহাদাত নসিব করবেন।'

ভাই সাদ রাদিয়াল্লাহু আনহু তাকে নিয়ে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে যান। তিনি তখন অভ্যাস অনুযায়ী তাকেও ফিরে যাওয়ার নির্দেশ দেন। এটা শুনে উমাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু কাঁদতে লাগলেন। অবশেষে নবীজি তার জজবা ও আগ্রহ দেখে অংশগ্রহণের অনুমতি প্রদান করেন।[৪১১]

মুসলমানদের সংখ্যা ছিল ৩১৩ জন। বাহিনীতে কেবল দুটি ঘোড়া এবং সত্তরটি উট ছিল। একেকটি উটে তিনজন করে পালাক্রমে আরোহণ করতেন।[৪১২]

বাণিজ্য-কাফেলার পরিবর্তে মক্কার সশস্ত্র বাহিনীর মুখোমুখি

এদিকে কুরাইশ কাফেলার সরদার আবু সুফিয়ান মুসলমানদের এগিয়ে আসার খবর সম্পর্কে অবহিত হয়। এজন্য সে সাধারণ পথ পরিহার করে সমুদ্রের উপকূলবর্তী এলাকা ধরে কাফেলা নিয়ে দ্রুত অগ্রসর হয় এবং অনতিবিলম্বে একজন আরোহীকে এ সংবাদ দিয়ে মক্কায় পাঠায় যে, তারা যেন নিজেদের বাণিজ্য-কাফেলার সাহায্যে দ্রুত এগিয়ে আসে।

কুরাইশ বাহিনী পূর্ব থেকেই মদিনা আক্রমণের সুযোগ-সন্ধানে ছিল। তাই উক্ত সংবাদ মদিনায় পৌঁছামাত্র তৎক্ষণাৎ ৯৫০ জনের এক সশস্ত্রবাহিনী প্রস্তুত হয়ে গেল। তন্মধ্যে দুইশ অশ্বারোহী, সাতশ' উষ্ট্রারোহী এবং ছয়শ বর্মপরিহিত যোদ্ধা ছিল। এই বাহিনীতে কুরাইশের বড় বড় নেতারা শরিক হয়েছিল।[৪১৩]

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সংবাদ পেলেন যে, ব্যবসায়িক কাফেলা নাগালের বাইরে চলে গেছে আর কুরাইশদের সশস্ত্র বাহিনী মোকাবেলার জন্য অগ্রসর হচ্ছে। তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবিদের সঙ্গে পরামর্শ করলেন। হজরত আবু বকরসহ সকল সাহাবি নিজেদের জীবন উৎসর্গ করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করলেন।

---

৪১১. আলইসাবাহ : উমাইর বিন সাদ রা. এর জীবনী দ্রষ্টব্য

৪১২. সিরাতে ইবনে হিশাম : ১/৬১৩; আলবিদায়া ওয়ান নিহায়া : ৫/৬৬

৪১৩. সিরাতে ইবনে হিশাম : ১/৬০৭; আলবিদায়া ওয়ান নিহায়া : ৫/৬৩-৬৪

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আনসার সাহাবিদের অভিপ্রায় জানতে চাচ্ছিলেন। কারণ, আনসারি সাহাবিগণ যদিও আল্লাহর রাসুলকে হেফাজত করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে মদিনায় এনেছিলেন, কিন্তু তাদের প্রতিশ্রুতির স্বাভাবিক অর্থ হলো, মদিনার সীমানার মধ্যে তার হেফাজতের ব্যবস্থা করা। তাদের সেই প্রতিশ্রুতির মধ্যে স্পষ্টভাবে এই অঙ্গীকার ছিল না যে, মদিনার বাইরে কুরাইশের সঙ্গে যুদ্ধ বাধলেও তারা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সাহায্য-সহযোগিতা করবে। এজন্য রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আনসারিদের মতামত জানার জন্য অপেক্ষা করছিলেন।

বিষয়টি উপলব্ধি করে আউস গোত্রের সরদার হজরত সাদ ইবনে মুআজ রাদিয়াল্লাহু আনহু পরিষ্কার ভাষায় বললেন- 'আপনি সম্ভবত আমাদের অভিমত জানতে চাচ্ছেন। আল্লাহর রাসুল, আপনি যার সঙ্গে ইচ্ছা সন্ধি করুন, যার সঙ্গে ইচ্ছা লড়াই করুন। আমরা আপনার উপর ঈমান এনেছি। আল্লাহর শপথ, আমরা আপনার কথায় সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়তে প্রস্তুত আছি।'

আরেক সাহাবি, হজরত মিকদাদ রাদিয়াল্লাহু আনহু উঠে দাঁড়িয়ে বললেন- 'আল্লাহর রাসুল, আমরা বনি ইসরাইল নই, যারা হজরত মুসা আলাইহিস সালামকে বলেছিল, 'আপনি এবং আপনার প্রভু গিয়ে যুদ্ধ করুন। আমরা এখানে বসে থাকব।' বরং আমরা তো আপনার সামনে থাকব, পেছনে থাকব, ডানে থাকব এবং বামে থাকব।'[৪১৪]

মদিনা থেকে ১২০ কিলোমিটার দক্ষিণে একটি উপত্যকার নাম বদর। কুরাইশ বাহিনী সেদিকেই অগ্রসর হচ্ছিল। মুসলিম-বাহিনীর পতাকা সাদা ছিল। এবং তা ছিল হজরত মুসআব বিন উমাইরের হাতে। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে দুটি কালো রঙের পতাকা ছিল। একটি হজরত আলি রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাতে, অপরটি হজরত সাদ ইবনে মুআজ রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে।[৪১৫]

এদিকে কুরাইশ বাহিনীর কতিপয় গোলাম সাহাবায়ে কেরামের হাতে ধরা পড়ে। এরা পানির সন্ধানে বের হয়েছিল। কুরাইশ বাহিনীর সৈন্যসংখ্যা সম্পর্কে তথ্য দেওয়ার জন্য সাহাবায়ে কেরাম তাদেরকে প্রহার করতে উদ্যত হন। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে বারণ করলেন এবং নিজেই জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করলেন।

---

৪১৪. সিরাতে ইবনে হিশাম : ১/৬১৫

৪১৫. আলবিদায়া ওয়ান নিহায়া : ৫/৬৫-৬৬

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন-কুরাইশ বাহিনী দৈনিক কয়টি করে উট জবাই করে? তারা বলল, নয়টি।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে ছেড়ে দিলেন এবং সাহাবায়ে কেরামকে বললেন, শত্রুর সংখ্যা ৯০০ থেকে ১০০০ হবে।[৪১৬]

এটি ছিল রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সূক্ষ্ম দূরদর্শিতা। সাধারণভাবে একটি উট একশত লোকের জন্য যথেষ্ট হতে পারে। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তৎক্ষণাৎ অনুমান করে নিলেন কুরাইশ বাহিনীর সৈন্যসংখ্যা কত হতে পারে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুমান সঠিক হলো। কুরাইশের সৈন্যসংখ্যা ছিল সাড়ে নয়শ।

কুরাইশ বাহিনী সামনে অগ্রসর হয়ে বদরের সেই প্রান্তে পৌঁছে গেল, যেখানে পানির ব্যবস্থা ছিল। বিপরীতে মুসলমানদের ছাউনি প্রথমে স্থাপিত হয় পানির জায়গা থেকে অনেক দূরে। অতঃপর হজরত হুবাব ইবনে মুনযির রাদিয়াল্লাহু আনহুর পরামর্শে পানির একটি কূপের নিকট ছাউনি স্থাপন করা হয়। তখন আল্লাহ তায়ালা রহমতের বারিধারা বর্ষণ করেন। আর তাতে মুসলিমদের অবস্থানস্থলের বালুভূমি শক্ত হয়ে যায়। এই বৃষ্টি কাফেরদের জন্য ক্ষতিকর প্রমাণিত হলো। কারণ, এতে তাদের অবস্থানস্থল কর্দমাক্ত এবং পিচ্ছিল হয়ে পড়ে।

দ্বিতীয় হিজরির ১৭ই রমজান। কুরাইশ বাহিনী তাদের যুদ্ধের প্রস্তুতি সম্পন্ন করেছে।[৪১৭] এদিকে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলিম-বাহিনীর যুদ্ধের কাতার ঠিক করতে লাগলেন। নবীজি ময়দানের অবস্থা স্বচক্ষে দর্শন করে যেন দিকনির্দেশনা দিতে পারেন এজন্য হজরত সাদ ইবনে মুআজ রাদিয়াল্লাহু আনহুর পরামর্শে একটি টিলার উপরে খেজুর গাছের ডাল ও পাতা দ্বারা তার জন্য একটি ছাউনি নির্মাণ করা হয়। পেছনদিকে কয়েকটি দ্রুতগামী ঘোড়া প্রস্তুত রাখা হয়। আল্লাহ না করুক, যদি মুসলমানরা পরাজয় বরণ করে তা হলে যেন মদিনায় গিয়ে আত্মরক্ষা করার উপায় থাকে। হজরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে রাসুলুল্লাহর দেহরক্ষী নিযুক্ত করা হয়।[৪১৮]

সকালবেলা কুরাইশ বাহিনী সম্মুখে এসে পড়ল এবং কিছুটা দূরত্বে কাতারবন্দি হয়ে দাঁড়াল। এটি ছিল ইসলাম ও কুফরের মধ্যকার প্রথম মীমাংসাকারী যুদ্ধ।

---

৪১৬. দালাইলুন নুবুওয়াহ : ৩/৪৩ (দারুল কুতুব আলইলমিয়াহ সংস্করণ)

৪১৭. আলবিদায়া ওয়ান নিহায়া : ৫/৫৫

নোট : বদরযুদ্ধের তারিখের ব্যাপারে ১৯ অথবা ২০ রমজানে সংঘটিত হওয়ার মতও রয়েছে। কিন্তু হাফেজ ইবনে কাসিরসহ সংখ্যাগরিষ্ঠ ঐতিহাসিক ১৭ রমজানের মতটি প্রাধান্য দিয়েছেন। [আলবিদায়া ওয়ান নিহায়া : ৫/৮১)

৪১৮. সিরাতে ইবনে হিশাম : ২২৬-২২৭, ২২০

একদিকে ছিল ৩১৩জন মুসলমান, যাদের যুদ্ধের সরঞ্জাম ছিল অতি অল্প। অপরদিকে ছিল তিনগুণ কাফের, যারা সর্বোচ্চ সমরাস্ত্রে সজ্জিত।

তখন নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অত্যন্ত ব্যাকুলচিত্তে রোনাজারি করতে লাগলেন। আল্লাহর দরবারে ফরিয়াদ করে বললেন, 'হে আল্লাহ, আজ যদি মুসলমানদের এই জামাত ধ্বংস হয়ে যায়, তা হলে কেয়ামত পর্যন্ত তোমার ইবাদত করার কেউ থাকবে না।' রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন ব্যাকুলচিত্তে দোয়া করছিলেন যে, কাঁধ মোবারক থেকে বার বার চাদর পড়ে যাচ্ছিল। হজরত সিদ্দিকে আকবর রাদিয়াল্লাহু আনহু চাদর ঠিক করে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, আল্লাহর রাসুল, আপনি নিজের প্রভুর কাছে অনেক প্রার্থনা করেছেন। আপনার সাথে কৃত ওয়াদা তিনি অবশ্যই পূর্ণ করবেন। তিনি অবশ্যই আপনাকে সাহায্য করবেন এবং আপনাকে বিজয়ী করবেন।[৪১৯]

যুদ্ধ যখন শুরু হলো, ঠিক সেই মুহূর্তে দুজন সাহাবি যুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য পৌঁছলেন। তাদের দেখে সাহাবায়ে কেরামের মনে আনন্দের ঢেউ জাগে। কারণ সে-সময় মুসলমানরা তাদের সংখ্যার স্বল্পতা খুব ভালোভাবেই অনুভব করছিলেন। এই মুহূর্তে একজন লোকের আগমনও ছিল রত্নতুল্য। সদ্য আগত সাহাবি-দুজন বললেন, পথিমধ্যে কাফের বাহিনীর হাতে আমরা আটকা পড়েছিলাম। তারা বলেছিল, তোমরা মুহাম্মদকে সাহায্য করার জন্য যাচ্ছো। আমরা নিরুপায় হয়ে বলতে বাধ্য হই যে, না, আমরা যুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য যাচ্ছি না। তারা যুদ্ধে শরিক না হবার অঙ্গীকার নিয়ে আমাদের ছেড়ে দেয়। ঘটনা শুনে রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উভয় সাহাবিকে যুদ্ধ করতে বারণ করলেন এবং বললেন, 'আমরা সর্বাবস্থায় প্রতিশ্রুতি রক্ষা করব। আমাদের জন্য আল্লাহর সাহায্যই যথেষ্ট।'[৪২০] এমনভাবে প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা কেবল আল্লাহর নবীর জন্যই সম্ভব ছিল।

যুদ্ধের সূচনা

যুদ্ধের সূচনা এভাবে হয় যে, কাফেরদের সারি থেকে একজন নেতৃস্থানীয় প্রবীণ ব্যক্তি উতবা ইবনে রবিয়া তার ভাই শাইবা এবং ছেলে ওয়ালিদকে সঙ্গে নিয়ে রণাঙ্গনে অবতীর্ণ হলো। তিনজনই ছিল বিখ্যাত যোদ্ধা। ময়দানে এসে তারা হাঁক ছাড়ল- 'হে মুসলমানেরা, আমাদের সঙ্গে মোকাবেলা করার কেউ থাকলে বের হয়ে এসো।' এই ঘোষণা শোনামাত্র তিনজন আনসারি নওজোয়ান বের হয়ে এলেন। তারা হলেন মুআওয়িজ, আউফ এবং আবদুল্লাহ বিন রাওয়াহা।[৪২১]

৪১৯. সিরাতে ইবনে হিশাম : ১/৬২৭
৪২০. সহিহ মুসলিম, হাদিস নং ৪৭৪০
৪২১. আলকামিল ফিত তারিখ : ২/১৯-২০

উতবা জিজ্ঞেস করল, তোমাদের পরিচয় কী? আনসারিগণ নিজেদের পরিচয় দিলে উতবা বলল, তোমাদের সঙ্গে আমাদের কোনো কাজ নেই। আমাদের সমপর্যায়ের লোকদের ময়দানে পাঠাও।

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম টিলার উপর থেকে তাদেরকে ফিরে আসতে নির্দেশ দিলেন এবং উচ্চৈঃস্বরে বললেন, হে উবাইদা ইবনে হারেস, উঠ। হে হামজা, উঠ। আলি, উঠ। এই তিনজনই ছিলেন বিখ্যাত কুরাইশ যোদ্ধা। তখন উবাইদা রাদিয়াল্লাহু আনহুর বয়স ছিল ৬৫, হামজা রাদিয়াল্লাহু আনহুর বয়স ছিল ৫৭ এবং হজরত আলি রাদিয়াল্লাহু আনহুর বয়স ছিল মাত্র ২৫ বছর। এখন যুদ্ধ পূর্ণতা পেল। সমপর্যায়ের ব্যক্তিদের লড়াই শুরু হলো। কেননা কাফেরদের পক্ষে উতবা ছিল বয়স্ক। শায়বা ছিল আরেকটু কমবয়সি এবং ওয়ালিদ ছিল নওজোয়ান।

সাহাবি তিনজন কাতার থেকে বের হয়ে তাদের মুখোমুখি হলেন। তাদের মাথা এবং মুখ ঢাকা ছিল। উতবা জিজ্ঞেস করল, তোমাদের পরিচয় কী? তারা নিজেদের নাম বললেন। এবার সে বলল, হ্যাঁ, তোমরা আমাদের সমকক্ষ।

হজরত উবাইদা ইবনে হারেস রাদিয়াল্লাহু আনহু উতবার সঙ্গে, হজরত হামজা রাদিয়াল্লাহু আনহু শায়বার সঙ্গে এবং হজরত আলি রাদিয়াল্লাহু আনহু ওয়ালিদের সঙ্গে সংঘাতে জড়িয়ে পড়লেন। তুমুল সংঘর্ষ চলছে। হজরত হামজা রাদিয়াল্লাহু আনহু শায়বাকে নিঃশ্বাস ত্যাগ করার অবকাশ দেননি। বরং এক আঘাতেই কাফেরটাকে জাহান্নামে পাঠিয়ে দেন। হজরত আলি রাদিয়াল্লাহু আনহুর সম্মুখে ওয়ালিদ টিকতে না পেরে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে।

হজরত উবাইদা ইবনে হারেস রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং উতবা উভয়ই অভিজ্ঞ লড়াকু ছিলেন। তাই উভয়ের মাঝে দীর্ঘক্ষণ যুদ্ধ চলতে থাকে। অবশেষে হজরত উবাইদা রাদিয়াল্লাহু আনহু আহত হন। হজরত হামজা রাদিয়াল্লাহু আনহু ও আলি রাদিয়াল্লাহু আনহু সে দিকে অগ্রসর হয়ে উতবার জীবনলীলা সাঙ্গ করে দেন (এভাবে নিজের সঙ্গীর সাহায্যে এগিয়ে আসা তৎকালীন সমরনীতির পরিপন্থি ছিল না, অন্যথায় মুশরিকরা অবশ্যই আপত্তি উত্থাপন করত)। অতঃপর তারা হজরত উবাইদা রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বহন করে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে নিয়ে যান।

হজরত উবাইদা রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কদম মোবারকে মাথা রেখে জিজ্ঞাসা করেন, আল্লাহর রাসুল, আমি কি শহিদ গণ্য হব? প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তর দেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি- তুমি শহিদ। তিনি এ কথা শুনে আনন্দচিত্তে বলতে লাগলেন, আজ যদি

আবু তালেব জীবিত থাকত, তা হলে তার একথা মানা ছাড়া উপায় ছিল না যে, তার পঙ্‌ক্তিমালার পরিপূর্ণ উপযুক্ত ব্যক্তি আমি।

ونسلمه حتى نصرع حوله * ونذهل عن ابنائنا والحلائل

যতদিন না আমাদের দেহে থাকবে প্রাণ
তোদের হাতে দেব না মোদের প্রিয়ের মান।
তার তরে বিস্মৃত হবো মোরা স্ত্রী-সন্তান।[৪২২]

শাহাদাতের তামান্না

উতবা, শায়বা ও ওয়ালিদ নিহত হওয়ার পর তুমুল সংঘর্ষ শুরু হয়। মুসলমানদের মধ্য থেকে সর্বপ্রথম হজরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর গোলাম মিহজা রাদিয়াল্লাহু আনহু সম্মুখপানে অগ্রসর হয়ে শাহাদাত বরণ করেন। এদিকে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই বলে মুসলমানদের অনুপ্রাণিত করে যাচ্ছিলেন যে, 'শপথ সে-ই সত্তার, যার হাতে আমার প্রাণ, যে ব্যক্তি আজ মুশরিকদের মোকাবেলায় অবিচল থেকে যুদ্ধ করবে, পৃষ্ঠপ্রদর্শন করবে না, আল্লাহ তায়ালা তাকে জান্নাতে বাসস্থান দান করবেন।'

কিছু সৈন্য রিজার্ভ ফোর্স হিসাবে শেষকাতারে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট অবস্থান করছিলেন। হজরত উমায়ের ইবনে হুমাম রাদিয়াল্লাহু আনহু তাদের একজন ছিলেন। তিনি কয়েকটি খেজুর খাচ্ছিলেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুসংবাদ শোনামাত্র তিনি আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে জানতে চাইলেন, আমিও কি তাদের অন্তর্ভুক্ত হতে পারি? রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'তুমি তাদেরই একজন।' এ কথা শুনে তিনি বলে উঠলেন, 'বাহ্ বাহ্! আমার এবং জান্নাতের মাঝে ব্যবধান হলো শুধু আমার মৃত্যু।' এটুকু বলে তিনি খেজুরগুলো ছুড়ে ফেললেন এবং তরবারি কোষমুক্ত করে শত্রুর দিকে দ্রুত অগ্রসর হলেন। কয়েকজন কাফেরের জীবনপ্রদীপ নিভিয়ে অবশেষে নিজেই শাহাদাতের অমীয় সুধা পান করে।[৪২৩]

আনসারি তরুণদের জিহাদি জযবা

যুদ্ধে আনসারি তরুণদের আবে-উদ্দীপনা ছিল দেখার মতো। হজরত আবদুর রহমান বিন আউফ রাদিয়াল্লাহু আনহুর পাশেই অবস্থান করছিল দুই আনসারি তরুণ। একজন মুআজ ইবনে আফরা। অপরজন মুআওয়িজ ইবনে আফরা। তারা হজরত আবদুর রহমান বিন আউফ রাদিয়াল্লাহু আনহুকে জিজ্ঞেস করলেন- চাচাজান, আপনি কি আবু জাহলকে চেনেন?

---

৪২২. আল কামিল ফিত তারিখ : ২/২০

৪২৩. আলবিদায়া ওয়ান নিহায়া : ৫/১০৬; ১১১

তিনি জবাব দিলেন- হ্যাঁ, তা তো চিনি। কিন্তু তাকে দিয়ে তোমাদের কী কাজ? তারা বললেন, শুনেছি সে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শানে অশালীন কথা বলে। আল্লাহর শপথ, আমরা যদি তাকে দেখতে পাই তা হলে কিছুতেই তার রক্ষা নেই।

ঘটনাক্রমে আবু জাহল সে-সময় তার বাহিনীর মাঝে যুদ্ধের অনুপ্রেরণা জাগাতে জাগাতে তাদের সামনে দিয়েই যাচ্ছিল। সঙ্গে সঙ্গে হজরত আবদুর রহমান বিন আউফ রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, ওই যে দেখো, তোমাদের শিকার যাচ্ছে! এ কথা শোনামাত্র তারা উভয়ে বিদ্যুৎগতিতে আবু জাহলের দিকে ছুটে গেল। মুআজ বিন আমর বিন জামুহ নামের আরেক আনসারি তরুণ পূর্ব থেকেই আবু জাহলকে খুঁজে ফিরছিল। দেখামাত্র সেও আবু জাহলের উপর ক্ষুধার্ত ব্যাঘ্রের ন্যায় আক্রমণ করে বসে এবং তার পায়ের গোছা কেটে ফেলে। আবু জাহলের ছেলে ইকরিমা যখন পিতাকে আঘাতপ্রাপ্ত হতে দেখল, তখন মুআজ বিন আমর বিন জামুহ রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাঁধে তরবারি দিয়ে ভীষণ আঘাত করে। যার ফলে তার বাহু কেটে যায়। কিন্তু সামান্য চামড়া অবশিষ্ট ছিল। কর্তিত বাহুটি তখন ঝুলতে থাকে। হজরত মুআজ বিন আমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর সেই বাহু নিয়ে যুদ্ধ করতে কষ্ট হচ্ছিল। তাই ঝুলে-থাকা-হাতটি তিনি নিজের পায়ের নিচে রেখে সজোরে ঝটকা টান দিলে তা চামড়া থেকে পৃথক হয়ে যায়। তখন নিজের বাহুকে ছুড়ে ফেললেন। এদিকে মুয়াওয়িজ রাদিয়াল্লাহু আনহু আবু জাহলের উপর দ্বিতীয় আক্রমণ করে তাকে গুরুতর আহত করেন এবং যুদ্ধ করতে করতে নিজেও শাহাদাত বরণ করেন।

আবু জাহল রক্তাক্ত হয়ে ঘোড়া থেকে পড়ে গিয়েছিল। মুআজ বিন আফরা এবং মুআজ বিন আমর বিন জামুহ (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) ভাবলেন সে মারা গেছে। তারা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হয়ে ঘটনার বিবরণ শোনান। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেন, তোমাদের মধ্যে কে তাকে হত্যা করেছে? দুজনই জবাব দিল আমি।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কি তরবারি পরিষ্কার করে নিয়েছ? তারা জবাব দিল, জি না। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উভয়ের তরবারি দেখলেন। তখন হজরত মুআজ বিন আমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর তরবারি সাক্ষ্য দিচ্ছিল যে, এই তরবারির আঘাতে সে নিঃশেষ হয়েছে। তবু রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উভয়ের উৎসাহ বৃদ্ধির জন্য বললেন, তোমরা উভয়েই তাকে হত্যা করেছ।

এরপর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু জাহলের দেহের কাপড় এবং বর্ম মুআজ বিন আমরকে দেবার সিদ্ধান্ত দেন।[৪২৪]

৪২৪. আবু জাহলকে হত্যার ঘটনার উপরোক্ত বিন্যাস সহিহ বুখারি এবং সহিহ মুসলিমের রেওয়ায়েতের আলোকে উল্লেখ হয়েছে। ঘটনাপ্রবাহের বৈপরীত্য দূরীকরণ এবং ঘটনার অংশবিশেষ পরিষ্কার করার জন্য সিরাতে ইবনে হিশামের সহযোগিতা গ্রহণ করা হয়েছে। এ ছাড়া শরহে নববি, ফাতহুল বারি এবং উমদাতুল কারির ব্যাখ্যা থেকে সাহায্য নেওয়া হয়েছে। মূলত আবু জাহলের হত্যাকারী তরুণ কে ছিল এ বিষয়টি মতভেদপূর্ণ। এ বিষয়ে দু'টি মত প্রসিদ্ধ :

এক আবু জাহলের প্রাণবিনাশকারী ছিল আফরা রা. এর দুই ছেলে মুআজ এবং মুআওয়িজ রা.। এই মতটি অধিক প্রসিদ্ধ। সহিহ বুখারির ৩৯২৮ নং হাদিসে এবং সহিহ মুসলিমের ৪৭৬৩ নং হাদিসে উক্ত মতের সমর্থন পাওয়া যায়।

দুই মুআজ বিন আফরা এবং মুআজ বিন আমর বিন জামূহ। সহিহ মুসলিমসহ অনেক কিতাবে এ মতের সমর্থন পাওয়া যায়।

সিরাতে ইবনে হিশামে এ প্রসঙ্গে মুআজ বিন আমর রা. এর প্রত্যক্ষ বর্ণনা তার থেকেই উদ্ধৃত হয়েছে। তিনি বর্ণনা করেছেন, কীভাবে তিনি আবু জাহলের পায়ের গোছা কর্তন করেছেন এবং আবু জাহলের ছেলে ইকরিমা কীভাবে তার বাহু কর্তন করেছে ইত্যাদি। [সিরাতে ইবনে হিশাম : ১/৬৩৫]

হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানি রহ. বলেন, মুআজ বিন আফরা এবং মুআওয়িজ বিন আফরা রা. একসঙ্গে আবু জাহল-এর উপর আক্রমণ করেছেন। এতে সে মারাত্মকভাবে আহত হয়। অতঃপর মুআজ বিন আমর বিন জামুহ রা. সেদিক অতিক্রমকালে অপ্রতিরোধ্য আক্রমণে আবু জাহলকে ধরাশায়ী করেন। সবশেষে হজরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ রা. তার মস্তক বিচ্ছিন্ন করে দেন। [ফাতহুল বারি : ৭/৬৯৬]

ইমাম নববি রহ. এর মতে, মুআজ বিন আফরা, মুআওয়িজ বিন আফরা এবং মুআজ বিন আমর বিন জামুহ রা. এই তিনজনই আক্রমণে শরিক ছিলেন। তবে অধিকতর প্রাণনাশী আক্রমণ করেছিলেন হজরত মুআজ বিন আমর বিন জামুহ রা.। তাই আবু জাহলের লৌহবর্ম তাকে প্রদান করা হয়েছিল। আর আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. মস্তক ছিন্ন করেছিলেন। এজন্য তাকে আবু জাহলের তরবারি প্রদান করা হয়। [শরহে নববি]

অধম লেখকের মত হলো, অধিকতর স্পষ্ট বিষয় যে, আফরা রা. এর দুই ছেলে মুআজ এবং মুআওয়িজ রা. সর্বপ্রথম আক্রমণ করেছেন; যেমনটি হজরত আবদুর রহমান বিন আউফ রা. এর বর্ণনা থেকে সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়। কিন্তু আবু জাহল যেহেতু একজন দক্ষ ও অভিজ্ঞ ব্যক্তি ছিল, তাই তারা তাকে ধরাশায়ী করতে সক্ষম হননি। এদিকে মুআজ বিন আমর বিন জামুহ রা. পূর্ব থেকেই আবু জাহলের সন্ধানে ছিলেন। তিনিও তৎক্ষণাৎ সেখানে পৌঁছে যান। আর তিনি যেহেতু অভিজ্ঞ ছিলেন, তাই অধিকতর প্রাণনাশী আক্রমণ তিনিই করেছেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার তরবারির রক্তিম অবস্থা দেখেই অনুমান করে নিয়েছিলেন যে, প্রাণঘাতী আক্রমণ তারই ছিল। [শরহে নববি ১২/৬৩; উমদাতুল কারি ১৫/৬৬]

এজন্য মুআজ বিন আমর বিন জামুহ রা. কে আবু জাহালের লৌহবর্ম প্রদান করা হয়েছে। অনেক মুহাদ্দিস তা-ই সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন। [আলমুজামুল কাবির, তাবারানি : ২০/১৭৭; সহিহ ইবনে হিব্বান : ১১/১৭৩; মুসতাদরাকে হাকিম : হাদিস নং ৫৭৯৬]

মুশরিকদের শোচনীয় পরাজয়

যুদ্ধের চূড়ান্তপর্যায়ে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহু উপরস্থ ছাউনি থেকে রণাঙ্গনে নেমে আসেন এবং যুদ্ধে শরিক হয়ে যান। হজরত আলি রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, বদরযুদ্ধের বিভীষিকাময় মুহূর্তে আমি নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উট টেনে নিয়েছিলাম।[৪২৫]

যুদ্ধ যখন চূড়ান্ত রূপ ধারণ করল তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুশমনদের লক্ষ করে এক মুষ্ঠি মাটি নিক্ষেপ করে বললেন-'এই চেহারাগুলো লাঞ্ছিত হোক! হে আল্লাহ, আপনি দীনের এই দুশমনদের অন্তর্জগৎ আতঙ্কে ভরে দিন এবং তাদেরকে সমূলে নিপাত করুন।'

পাশাপাশি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকে সিদ্ধান্ত অনুযায়ী চূড়ান্ত আক্রমণের নির্দেশ দেন।[৪২৬] আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে এই ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করে বলেন-

وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى

> আর যখন আপনি নিক্ষেপ করেছিলেন তখন আপনি নিক্ষেপ করেননি; বরং আল্লাহই নিক্ষেপ করেছিলেন।[৪২৭]

ঐ এক মুষ্ঠি ধূলিকণা আল্লাহর কুদরতে প্রত্যেক কাফেরের চোখে গিয়ে পড়েছিল। তারা তখন ইতস্তত ছুটোছুটি শুরু করল। এদিকে সাহাবায়ে কেরাম জোরদার আক্রমণ চালালে মুশরিকরা পরাজয় স্বীকার করে পলায়ন করতে আরম্ভ করে। মুসলিম-বাহিনী তাদের পশ্চাদ্ধাবন করে অনেককে কতল করেন এবং বিপুলসংখ্যক কাফেরকে গ্রেফতার করে নিয়ে আসেন।[৪২৮]

---

৪২৫. মুসনাদে আহমদ, হাদিস নং ৬৫৪

৪২৬. সিরাতে ইবনে হিশাম : ১/৬২৮

৪২৭. সুরা আনফাল , আয়াত ১৭

৪২৮. ফায়দা :

মুআজ বিন আফরা, মুআওয়িজ বিন আফরা এবং মুআজ বিন আমর বিন জামুহ রা. শিশু ছিলেন না; বরং বয়সে তারা তরুণ ছিলেন।

কারণ, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শিশুদেরকে জিহাদের ময়দানে নিতেন না। বদর, ওহুদ এবং খন্দকের যুদ্ধে রওনা হওয়ার পূর্বেই মুজাহিদদের মাঝে অনুসন্ধান চালিয়ে নাবালেগ বাচ্চাদের ফেরত পাঠানো হয়েছে। [সহিহ ইবনে হিব্বান, হাদিস নং ৪৭২৭; আল মুজামুল আওসাত, হাদিস নং ৯২৩২]

মুআজ বিন আফরা, মুআওয়িজ বিন আফরা রা. এর জন্মসাল জানা যায় না। হ্যাঁ, এতটুকু জানা যায় যে, হজরত মুআজ বিন আফরা রা. হজরত আলি রা. এর খেলাফতকালে মৃত্যুবরণ করেন। [তারিখে খলিফা, পৃষ্ঠা- ২০২]

ফেরেশতার মাধ্যমে সাহায্য

এই যুদ্ধে আল্লাহ তায়ালা মুসলমানদেরকে ফেরেশতাদের মাধ্যমে সাহায্য করেছেন। সুরা আনফালে ইরশাদ হয়েছে-

> إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ
>
> সেই সময়ের কথা স্মরণ করুন, যখন আপনি স্বীয় প্রভুর কাছে ফরিয়াদ করেছিলেন, আর তিনি আপনার ডাকে সাড়া দিয়ে বলেছিলেন, আমি আপনাকে ১ হাজার ফেরেশতার মাধ্যমে সাহায্য করব, যারা ধারাবাহিকভাবে অবতরণ করবে।[৪২৯]

ফেরেশতাদের আগমনে কাফেরদের অন্তরে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। তারা অনুধাবন করে যে, মুসলমানদের সঙ্গে মহান আল্লাহর সাহায্য রয়েছে। ফেরেশতাগণ কিছু মুশরিকের ইহলীলা সাঙ্গ করেছেন। কিন্তু সাধারণভাবে তারা যুদ্ধে অংশ নেননি। অন্যথায় একজন ফেরেশতাই পুরো কাফেরগোষ্ঠীর ধ্বংসের জন্য যথেষ্ট ছিল। ফেরেশতাদের অবতরণের উদ্দেশ্য ছিল কেবল মুসলমানদের মনোবল বৃদ্ধি এবং কাফেরদের অন্তরে আতঙ্ক সৃষ্টি করা।[৪৩০]

তাই সুনির্দিষ্টভাবে বলা যায় না যে, বদরযুদ্ধের সময় তাদের বয়স কত ছিল। তবু অপরাপর দলিলের মাধ্যমে এ বিষয়টি প্রতীয়মান হয়েছে যে, সে সময় তারা তরুণ ছিলেন। মুআজ বিন আফরা রা. বাইয়াতে আকাবাতেও শামিল ছিলেন। [তারিখুল ইসলাম, জাহাবি : ১/৩০৬] তেমনি হজরত মুআওয়িজ বিন আফরা রা. এর বয়স তার মেয়ে রুবাইয়্যি এর বয়সের মাধ্যমে অনুমান করা যায়। তার বিবাহ হয়েছিল বদরযুদ্ধের কয়েক বছর পর। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও সেই বিবাহে উপস্থিত ছিলেন। [সহিহ বুখারি, হাদিস নং ৫১৪৭, কিতাবুন নিকাহ]

হজরত রুবাইয়্যি রা. জিহাদে অংশগ্রহণ করতেন। তিনি বর্ণনা করেন, আমরা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে যুদ্ধে শরিক হতাম, আহতদের পানি পান করাতাম, তাদের ক্ষতস্থানে ব্যান্ডেজ পরাতাম, তাদের সেবা করতাম, আহত এবং নিহতদের মদিনায় পৌঁছে দিতাম। [সহিহ বুখারি : হাদিস নং ২৮৮২, ২৮৮৩, কিতাবুল জিহাদ]

উক্ত বর্ণনা দ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়, সে সময় তিনি প্রাপ্তবয়স্ক ছিলেন। কেননা যুদ্ধের ময়দানে নাবালেগ ছেলেদেরই যখন নেওয়া হতো না, তা হলে নাবালেগ মেয়েদের নেওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। উক্ত আলোচনার মাধ্যমে বিষয়টি প্রমাণিত হলো যে, বদরযুদ্ধের সময় তার বাবা মুআওয়িজ রা. যুবক ছিলেন।

যৌক্তিক কথা হলো, মুআওয়িজ রা. এর বিবাহ অল্প বয়সে সংঘটিত হয়, ফলে রুবাইয়্যি রা. এর জন্ম দ্রুত হয়। অনুমান করা যায় যে, বাবা ও মেয়ের বয়সের মধ্যে ১৫/১৬ বছরের পার্থক্য হয়ে থাকবে। যদি বদরযুদ্ধের সময় রুবাইয়্যি রা. এর বয়স ১০/১১ বছর হয়ে থাকে, তা হলে মুআওয়িজ রা. এর বয়স তখন ২৬ বছর ছিল।

৪২৯. সুরা আনফাল, আয়াত ৯

৪৩০. আলবিদায়া ওয়ান নিহায়া : ৫/১০১

বদরযুদ্ধের সময় যখন মুশরিকরা রণাঙ্গন ছেড়ে পলায়ন করছিল তখন একজন আনসারি সাহাবি এক মুশরিকের পশ্চাদ্ধাবন করছিলেন। আচমকা তিনি চাবুক মারার শব্দ শুনতে পান, আর সঙ্গে সঙ্গে একটি আওয়াজ ভেসে আসে, 'হাইযুম, অগ্রসর হও!'

দেখতে না দেখতেই উক্ত সাহাবির চোখের সামনে সেই কাফের নিহত হয়ে লুটিয়ে পড়ল। সেই সাহাবি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে উপস্থিত হয়ে যখন এই বিস্ময়কর ঘটনাটি শোনালেন, রাসুলুল্লাহ বললেন, তুমি সত্যি বলেছো। তিনি ছিলেন চতুর্থ আসমান থেকে অবতীর্ণ ফেরেশতা, যিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে মুসলমানদের সাহায্য করার জন্য অবতরণ করেছিলেন। হাইজুম হলো সেই ফেরেশতার ঘোড়ার নাম।[৪৩১]

বদরের দিন মুশরিকদের সাহায্যের জন্য ইবলিস স্বয়ং উপস্থিত হয়েছিল। কারণ সে জানত, এটি ইসলাম ও কুফরের মাঝে চূড়ান্ত যুদ্ধ। আজ যদি সত্যের জয় হয়, তা হলে ইসলামের অগ্রগতি কেউ রোধ করতে পারবে না। ইবলিস সাধারণত সরাসরি এসে কাউকে সাহায্য করে না। কিন্তু সেদিন কুফরিশক্তির পরাজয় রোধ করতে ইবলিস এতটাই চিন্তাযুক্ত ছিল যে, সে নিজেই সুরাকা ইবনে মালিক কেনানি নামের এক কাফের সরদারের আকৃতি ধারণ করে মুশরিকদের সাহায্য করার জন্য সশরীরে উপস্থিত হয়। সঙ্গে নিয়ে আসে নিজের সাঙ্গ-পাঙ্গদের এক বিশাল বাহিনী।

ইবলিস মুশরিকদের মনোবল বৃদ্ধির জন্য বলল, আজ কেউ তোমাদের উপর বিজয়ী হতে পারবে না। আমি তোমাদের সার্বিক সাহায্য-সহযোগিতা করব।

কিন্তু যখন হজরত জিবরাইল আলাইহিস সালাম অন্যান্য ফেরেশতাকে নিয়ে মুসলমানদের সাহায্য করার জন্য অবতরণ করলেন, তখন সে তার চেলা-চামুণ্ডাদের নিয়ে পলায়ন করল। মক্কার মুশরিকরা মনে করল, সুরাকা পলায়ন করেছে। যুদ্ধে পরাজিত হয়ে মক্কায় পৌঁছে তারা সুরাকাকে গালমন্দ করে বলল, তুমি সর্বপ্রথম বিশ্বাসঘাতকতা করে যুদ্ধের সারি থেকে পলায়ন করেছ।

সুরাকা অবাক হয়ে বলল, আমার তো কিছুই জানা নেই। আমি তো বদরের ময়দানেই যাইনি। কিন্তু মুশরিকরা ভাবল, সুরাকা মিথ্যে বলছে।[৪৩২]

---

৪৩১. আলবিদায়া ওয়ান নিহায়া : ৫/১১৪

৪৩২. তাফসিরে ইবনে কাসির, সুরা আনফাল, আয়াত ৪৮

উমাইয়া ইবনে খালাফকে হত্যা

পরাজয় বরণ করে কাফেরবাহিনী যখন পলায়ন করছিল, তখন মুসলমানরা গনিমতের সম্পদ কুড়িয়ে নিচ্ছিলেন। হজরত আবদুর রহমান বিন আউফ রাদিয়াল্লাহু আনহুও তাদের একজন ছিলেন। তিনি কাফেরদের রেখে যাওয়া বর্ম কুড়াচ্ছিলেন। ইতোমধ্যে কাফের-সরদার উমাইয়া ও তার ছেলের উপর তার দৃষ্টি পড়ে। উভয়ে তখন অস্থিরচিত্তে এদিক-ওদিক ছোটাছুটি করছিল। উমাইয়াও আবদুর রহমান বিন আউফ রাদিয়াল্লাহু আনহুকে দেখতে পায়। ইসলামপূর্ব যুগে যেহেতু উভয়ের মাঝে বন্ধুত্ব ছিল, তাই উমাইয়া চিৎকার করে বলতে থাকে, 'হে ইবনে আউফ, এই বর্মগুলোর তুলনায় তোমার জন্য আমিই উত্তম হব।' অর্থাৎ তুমি আমাদেরকে বন্দি করে মুসলমানদের হাতে কতল হওয়া থেকে রক্ষা করো। তা হলে তুমি যে মুক্তিপণ লাভ করবে, বর্মের তুলনায় তার মূল্য অধিক হবে।'

আচমকা হজরত বেলাল রাদিয়াল্লাহু আনহুর দৃষ্টি উমাইয়ার উপর পড়ল। এ তো সেই উমাইয়া, মক্কায় যে তার মনিব ছিল এবং ইসলামগ্রহণের কারণে তার উপর অমানবিক ও অবর্ণনীয় নির্যাতন করেছিল। উমাইয়াকে দেখামাত্র হজরত বেলাল রাদিয়াল্লাহু আনহুর মানসপটে সেসব জুলুম-অত্যাচারের চিত্র ভেসে ওঠে এবং তার রক্ত টগবগ করে ওঠে। তিনি চিৎকার করে বললেন, এই হলো কাফের-সরদার উমাইয়া বিন খালাফ; যদি বেঁচে যায়, তবে আমার বেঁচে থাকায় কোনো লাভ নেই।

হজরত আবদুর রহমান বিন আউফ রাদিয়াল্লাহু আনহু তখন অস্থির হয়ে বলেন, বেলাল, সে তো আমার কয়েদি। তুমি কি তাকে মেরে ফেলবে?

বেলাল রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর কথায় কর্ণপাত করলেন না। তিনি উচ্চৈঃস্বরে কেবল বলতে থাকেন, হে আনসারগণ, হে দীনের সাহায্যকারীগণ, আজ যদি এই কাফের সরদার বেঁচে যায়, তা হলে আমার বেঁচে থেকে লাভ নেই।'

পলায়নপর কাফেরদের পশ্চাদ্ধাবনকারী আনসারি সাহাবিগণ ছুটে এসে উমাইয়া ও তার ছেলের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। উমাইয়া ছিল স্থূলদেহী। হজরত আবদুর রহমান বিন আউফ রাদিয়াল্লাহু আনহু তাকে বাঁচানোর জন্য নিজের দেহ দিয়ে আড়াল করলেন। কিন্তু আনসারি সাহাবিগণ তার নিচ দিয়ে তরবারি ঢুকিয়ে তাকে হত্যা করে ফেলে। তাদের একজনের তরবারির আঘাত আবদুর রহমান বিন আওফ রাদিয়াল্লাহু আনহুর পায়েও লেগে যায়। হজরত আবদুর রহমান বিন আউফ রাদিয়াল্লাহু আনহু পরবর্তীতে এই ঘটনা বর্ণনা করে

বলতেন, 'আল্লাহ তায়ালা বেলালের উপর রহম করুন, তার কারণে আমি বর্ম ও কয়েদি দুটোই হারালাম তো বটেই। উলটো আহত হয়ে এলাম।[৪৩৩]

এভাবেই বদরের ময়দানে মক্কার এক মজলুম তার নির্যাতনের পূর্ণ প্রতিশোধ গ্রহণ করে।

এই উম্মতের ফেরাউন

যুদ্ধ যখন সমাপ্ত হলো, তখন নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু জাহলের লাশ খুঁজে বের করার হুকুম দিলেন। হজরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু তার তালাশে বের হন। কাছে গিয়ে দেখতে পেলেন তার জীবনের কিছুটা এখনো বাকি আছে। তিনি তার ঘাড়ের উপর পা রেখে বললেন, 'হে আল্লাহর দুশমন, দেখেছিস আল্লাহ আজ তোকে কীভাবে অপদস্থ করেছেন?'

একথা বলে তিনি তার মাথা ধড় থেকে পৃথক করে ফেললেন এবং নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত করে বললেন, 'আল্লাহর রাসুল, এটা আল্লাহর দুশমন আবু জাহলের মাথা।'

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন বললেন, 'সকল বড়ত্ব সেই মহান সত্তার, যিনি ছাড়া কোনো মাবুদ নেই।' এরপর তিনি আবু জাহলের তরবারি আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহুকে দান করলেন।[৪৩৪]

অতঃপর আবু জাহলের লাশের নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন, 'এ ছিল এই উম্মতের ফেরাউন।'[৪৩৫]

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু মুশরিকদের সারি সারি লাশের মধ্য দিয়ে হেঁটে চললেন এবং কবিতা আবৃত্তি করতে থাকলেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি পঙ্‌ক্তির প্রথম অংশ পাঠ করতেন এবং অবশিষ্ট অংশ হজরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু পূর্ণ করতেন। উদাহরণস্বরূপ কবিতার একটি পঙ্‌ক্তি নিম্নে উদ্ধৃত হলো-

نفلق هاما من رجال أعزه * علينا وهم كانوا أعق وأظلما

আমরা সেসব লোকের শির বিচ্ছিন্ন করে দিই, যারা আমাদের উপর
কঠোরতা করে। আর এরা ছিল জালেম ও অবাধ্য।

উপর্যুক্ত কবিতার মধ্য থেকে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুধু نفلق هاما অংশটি আবৃত্তি করেন আর হজরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু

---

৪৩৩. সহিহ বুখারি : হাদিস নং ২৩০১; কিতাবুল ওকালাহ; আলবিদায়া ওয়ান নিহায়া : ৫/১৩২-১৩৪

৪৩৪. আলবিদায়া ওয়ান নিহায়া : ৫/১৪৮-১৪৯

৪৩৫. মুসনাদে আবু দাউদ তায়ালিসি : হাদিস নং ৩২৬

কবিতাটি সম্পূর্ণ করেন। এভাবে তারা উভয়ে কবিতা আবৃত্তি করতে করতে কাফেরদের লাশের মাঝে দিয়ে হেঁটে চললেন।[৪৩৬]

বদরযুদ্ধে উভয়পক্ষে হতাহতের সংখ্যা

বদরযুদ্ধে মাত্র ১৪জন মুসলমান শাহাদাত বরণ করেন। তন্মধ্যে ৬জন মুহাজির এবং ৮জন আনসারি ছিলেন। হজরত সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রাদিয়াল্লাহু আনহুর তরুণ ভাই উমাইর ইবনে আবি ওয়াক্কাস রাদিয়াল্লাহু আনহু এই যুদ্ধে শহিদ হন। উবাইদা ইবনে হারেস রাদিয়াল্লাহু আনহু, যিনি উতবার সঙ্গে মল্লযুদ্ধে কঠিনভাবে আহত হয়েছিলেন, যুদ্ধের শেষদিকে সফর থেকে ফেরার পথে শাহাদাত বরণ করেন। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ হাতে তাকে কবরস্থ করেন।[৪৩৭]

এ যুদ্ধে কুরাইশদের ৭০জন নিহত হয়। তন্মধ্যে তাদের প্রসিদ্ধ সেনাপতি এবং নেতৃবৃন্দও ছিল। ৭০জন কাফের গ্রেফতার হয়। তাদেরকে যুদ্ধবন্দি হিসেবে মদিনায় নিয়ে আসা হয়। তাদের মধ্যে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচা আব্বাস, জামাতা আবুল আস এবং হজরত আলি রাদিয়াল্লাহু আনহুর বড় ভাই আকিলও ছিলেন। পরবর্তীতে তারা সবাই ইসলাম গ্রহণ করেন।[৪৩৮]

যুদ্ধবন্দিদের সঙ্গে আচরণ

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন যুদ্ধবন্দিদের বিষয়ে পরামর্শ করলেন, তখন হজরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন- 'আল্লাহর রাসুল, এরা আপনার বংশের লোক। আমার মত হলো, এদেরকে মুক্তিপণ নিয়ে ছেড়ে দেওয়া হোক। তা হলে আমাদের অর্থনৈতিক শক্তি বৃদ্ধি পাবে। তা ছাড়া এই আশাও তো করা যায় যে, তাদের প্রতি সদাচরণের কারণে তারা ইসলামের ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করবে।

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হজরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার মত কী?

তিনি বললেন, 'আল্লাহর রাসুল, এসব লোক আপনাকে মিথ্যাপ্রতিপন্ন করেছে, স্বদেশ থেকে বহিষ্কার করেছে এবং আপনার সঙ্গে যুদ্ধ করেছে। আমার মত হলো, এই কয়েদিদের মধ্য থেকে যারা আমার আত্মীয় রয়েছে, তাদেরকে আমার হাতে সোপর্দ করা হোক; আমি নিজ হাতে তাদের জীবনের স্বাদ মিটিয়ে

---

৪৩৬. আসসিরাতুন নাবাবিয়্যাহ, ইবনে কাসির, ২/৪৪৯; সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ : ৪/৫৪
৪৩৭. সিরাতে ইবনে হিশাম : ১/৭০৬-৭০৮
৪৩৮. সিরাতে ইবনে হিশাম : ২/৩-৮

দেব। আকিলকে তার ভাই আলির হাতে এবং আব্বাসকে তার ভাই হামজার হাতে সোপর্দ করা হোক। তা হলে সবাই অনুধাবন করতে পারবে আমাদের অন্তরে মুশরিকদের কোনো জায়গা নেই।'

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন নীরব থাকলেন। কিছুক্ষণ পর হুকুম করলেন, বন্দিদের মুক্তিপণ নিয়ে ছেড়ে দেওয়া হোক। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুজন-চারজন সাহাবির হাতে একেকজন কয়েদিকে সোপর্দ করলেন এবং নির্দেশ প্রদান করলেন যে, তাদের আরামের প্রতি যেন লক্ষ রাখা হয়। ফলে কোনো কোনো সময় এমন পরিস্থিতির উদ্ভব হয় যে, দায়িত্বপ্রাপ্ত সাহাবির ঘরে খাদ্যসঙ্কট দেখা দেয়, আর তার ঘরে যে স্বল্প পরিমাণ খাবার থাকত, তাই কয়েদির সামনে পরিবেশন করতেন। আর তিনি পরিবার-পরিজন নিয়ে খেজুর খেয়ে দিনাতিপাত করেন।

হজরত মুসআব ইবনে উমাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুর ভাই আবু আজিজও যুদ্ধবন্দি ছিলেন। তিনি বলেন, আমাকে যেসব আনসারি সাহাবির হাতে সোপর্দ করা হয়েছিল, তারা যখন খাবারের সময় হতো, তখন আমার সম্মুখে রুটি রেখে দিতেন আর নিজেরা শুধু খেজুর খেয়ে সন্তুষ্ট থাকতেন।'

কয়েদিদের আত্মীয়স্বজন মুক্তিপণ দিয়ে তাদেরকে মুক্ত করে নিতে আরম্ভ করে। যেসব কয়েদি অভাবগ্রস্ত ছিল এবং মুক্তিপণ দিতে সক্ষম ছিল না, তাদের সঙ্গে উদারতা প্রদর্শন করা হলো। তাদের মধ্যে কতিপয় কয়েদি শিক্ষিত ছিল। তাদের প্রতি শর্তারোপ করা হয়, যদি তারা মদিনার দশটি শিশুকে অক্ষরজ্ঞান শিক্ষা দিতে পারে, তা হলে তাদের ছেড়ে দেওয়া হবে।

এসব কিছুর পর আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে সুরা আনফালের কয়েকটি আয়াতে এইভাবে মুক্তিপণ নিয়ে ছেড়ে দেওয়ার ব্যাপারে সতর্কবাণী অবতীর্ণ হয়। এতে প্রমাণিত হয়, ওহী হজরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর মতের সাথে সামঞ্জস্যশীল ছিল।[৪৩৯]

রাসুলুল্লাহর জামাতার গ্রেফতারি

বদরযুদ্ধে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জামাতা আবুল আস-ও গ্রেফতার হয়ে এসেছিল। যেহেতু আইনের দৃষ্টিকোণ থেকে সবাই সমান, তাই তার কাছে মুক্তিপণ দাবি করা হলো। কিন্তু তার ঘরে দেবার মতো কিছুই ছিল না। বাধ্য হয়ে তার স্ত্রী হজরত যায়নাব রাদিয়াল্লাহু আনহা আপন স্বামীর মুক্তির জন্য নিজের স্বর্ণের হার রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে পাঠিয়ে দেন। কন্যার হার দেখে স্নেহপরায়ণ পিতার চক্ষুদ্বয় অশ্রুসজল হয়ে

---

৪৩৯. আলবিদায়া ওয়ান নিহায়া : ৫/১৬১-১৬৪

ওঠে। বিশেষত এই কারণে যে, তা ছিল রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী হজরত খাদিজা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) -এর স্মৃতি, যা তিনি কন্যাকে বরের বাড়িতে পাঠাবার সময় উপহার হিসাবে প্রদান করেছিলেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কন্যার সঙ্গে কোমল আচরণ করার ইচ্ছা করলেন। তিনি চাইলে কোনো প্রকার উপায় অবলম্বন ব্যতিরেকে এমন করতে সক্ষম ছিলেন। কিন্তু রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এতটাই সাবধানতা অবলম্বন করলেন যে, এ ব্যাপারে সাহাবায়ে কেরামের সঙ্গে পরামর্শ করলেন এবং বললেন- 'তোমরা যদি সঙ্গত মনে করো তা হলে এই হার ফেরত পাঠাবো এবং আবুল আসকে মুক্ত করে দেব।'

সাহাবায়ে কেরাম রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এক চিলতে হাসির জন্য সর্বস্ব বিলিয়ে দিতে প্রস্তুত ছিলেন। তারা নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মনোবাঞ্ছা সানন্দে মেনে নেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবুল আসকে এই শর্তে মুক্ত করে দেন যে, তিনি মক্কায় পৌছামাত্র হজরত যায়নাব রাদিয়াল্লাহু আনহাকে মদিনায় পাঠানোর ব্যবস্থা করবেন।

এটি এজন্য আবশ্যক ছিল যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কন্যার দারুল কুফরে অবস্থান করা ইসলামের শান পরিপন্থি ছিল। তা ছাড়া এটাও হতে পারে যে, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সদ্যপ্রয়াত কন্যা হজরত রুকাইয়া রাদিয়াল্লাহু আনহার বিরহবিচ্ছেদ গভীরভাবে উপলব্ধি করছিলেন। আবুল আস ওয়াদা পূর্ণ করে। মক্কা পৌঁছে আপন ভাই কিনানা ইবনে রবির সঙ্গে যায়নাব রাদিয়াল্লাহু আনহাকে মদিনায় পাঠিয়ে দেয়।[৪৪০]

শরিয়তে সদকাতুল ফিতরের বিধান

বদরযুদ্ধের পর রমজান মাসের শেষদিকে সদকাতুল ফিতর ওয়াজিব হয়েছে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ২৭ রমজান নেসাবের মালিক সাহাবিদের হুকুম করলেন, ঈদের নামাজের পূর্বেই খেজুর, কিশমিশ অথবা জবের মধ্য থেকে যেকোনো এক প্রকারের মাধ্যমে ১ সা' তথা ৩ কেজি ২৭০ গ্রাম, আর গম দিয়ে হলে অর্ধ সা' তথা এক কেজি ৬৩৫ গ্রাম সদকাতুল ফিতর হিসেবে যেন প্রত্যেকে আদায় করে দেয়। তা হলে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর অভাব পূরণ হবে।[৪৪১]

শরিয়তে ঈদের নামাজের বিধান

শরিয়তে ঈদুল ফিতর এবং ঈদুল আযহার বিধান একইসঙ্গে এসেছে। দ্বিতীয় হিজরির প্রথম শাওয়াল সর্বপ্রথম মদিনার মধ্যে ঈদুল ফিতরের নামাজ আদায়

৪৪০. তাবাকাতে ইবনে সা'দ

৪৪১. তাবাকাতে ইবনে সা'দ ১/২৪৮; আলবিদায়া ওয়ান নিহায়া : ৫/৩১২

করা হয়। এই বছরে যিলহজ মাসে ঈদুল আযহা পালন করা হয়। এরপর থেকে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিয়মিত প্রতি বছরই যিলহজ মাসে কুরবানি করতেন।[৪৪২]

জাহেলিযুগ থেকেই মদিনায় দুটি উৎসবের প্রচলন ছিল। ইসলাম সে সব শিরকি অনুষ্ঠানের অবসান ঘটিয়েছে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন-'আল্লাহ তায়ালা এই দুটি উৎসবের পরিবর্তে আরও উত্তম দুটি উৎসব তোমাদেরকে দান করেছেন; ঈদুল ফিতর এবং ঈদুল আযহা।[৪৪৩]

ঈদের মাঠে রাসুলুল্লাহর নিয়মিত আমল

ঈদগাহে যাবার সময় হজরত বেলাল রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের লাঠি নিয়ে সামনে সামনে চলতেন। এই লাঠির মাথা ছিল ধারালো। হাবশার বাদশাহ আসহামা নাজাশি হজরত যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে লাঠিটি উপহার হিসাবে প্রদান করেছিলেন। আর যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু তা উৎসর্গ করেন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে। ঈদের মাঠে এই লাঠিটি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মুখে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হতো। ঈদের নামাজের পরে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুটি খুতবা প্রদান করতেন।[৪৪৪]

মাতৃজাতির উদ্দেশ্যে বিশেষ নসিহত

ঈদের মাঠে সবশেষে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাতৃজাতির উদ্দেশ্যে নসিহত প্রদান করতেন। এতে সাধারণত তিনি তাদেরকে আখেরাতের ফিকির, স্বামীদের আনুগত্য এবং দান-সদকার প্রতি উৎসাহ প্রদান করতেন। হজরত বেলাল রাদিয়াল্লাহু আনহু মাতৃজাতির কাতারের সম্মুখ দিয়ে একটি কাপড় প্রসারিত করে অতিক্রম করতেন, আর তারা নিজেদের আংটি, চুড়ি, কানের দুল ইত্যাদি পর্যন্ত আল্লাহর রাস্তায় দান করতেন।[৪৪৫]

জাকাতের বিধান

দ্বিতীয় হিজরির শেষলগ্নে নেসাবের মালিকের উপর জাকাত ফরজ হয়। জাকাত সেই ইবাদত, যার মাধ্যমে বান্দা প্রায়োগিকভাবে এই বিষয়টি প্রকাশ করে যে, তার নিকট যা কিছু আছে সবই আল্লাহপ্রদত্ত এবং তার দেওয়া সম্পদ সে তার সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে আনন্দচিত্তে ব্যয় করতে প্রস্তুত।

---

৪৪২. তাবাকাতে ইবনে সা'দ ১/২৪৮; আলবিদায়া ওয়ান নিহায়া : ৫/৩১২

৪৪৩. সুনানে আবু দাউদ : হাদিস নং ১১৩৪

৪৪৪. তারিখুত তাবারি : ২/৪১৮

৪৪৫. সহিহ বুখারি : হাদিস নং ৭৩২৫; সহিহ মুসলিম, হাদিস নং ২০৮১, ২০৮৫

সম্পদের আসক্তি স্বভাবগতভাবেই মানুষের মধ্যে বিদ্যমান থাকে। কিন্তু অতিমাত্রায় বৃদ্ধি পেলে তখন তা সম্পদপূজায় রূপ নেয়। সমাজদেহের এই বিষাক্ত পদার্থ বের করার সর্বোত্তম উপায় হলো জাকাতব্যবস্থা। জাকাতের মাধ্যমে সমাজের দরিদ্র ও অভাবগ্রস্ত লোকদের সহযোগিতা হয়, নিঃস্ব এবং অসহায় লোকেরা নিজেদের পায়ে দাঁড়াতে সক্ষম হয়। জাকাত সমাজের মধ্যে সম্পদ পুঞ্জীভূত করে রাখাকে প্রতিহত করে এবং তা অর্থনৈতিকভাবে নিম্নশ্রেণিদের পর্যন্ত পৌঁছে দেয়।[৪৪৬]

বদরযুদ্ধের প্রভাব

বদরযুদ্ধের কারণে সমগ্র আরববাসীর অন্তরে মুসলমানদের প্রভাব-প্রতিপত্তি স্থান করে নেয়। এ যুদ্ধের মাধ্যমে প্রমাণিত হলো, ইসলাম মজবুতভাবে শেকড় গেড়েছে। ইসলামের পতাকাবাহীরা এখন শুধু নিজেদের প্রতিরক্ষা করতেই সক্ষম নয়; বরং বিরোধীদের দাঁতভাঙা জবাব দিতে বদ্ধপরিকর। মুষ্টিমেয় মুসলমানের বদরের ময়দানে সংখ্যায় তিনগুণ দুশমনকে পরাজিত করা এ কথার প্রমাণ বহন করে যে, আসমানি সাহায্য মুসলমানদের সঙ্গে রয়েছে। এই ঘটনা আরবের মধ্যে বড় ধরনের বিপ্লবের ডঙ্কা বাজিয়ে দেয়, যার আওয়াজ বহুদূর থেকে শোনা যাচ্ছিল।

একদিকে মুসলমানগণ আনন্দে উদ্বেলিত ছিলেন, অপরদিকে কাফেরদের ঘরে ঘরে প্রবহমান ছিল শোকের ঝঞ্ঝাবায়ু। এই পরাজয়ের সংবাদ শোনার ৯ দিন পরেই আবু লাহাবের মৃত্যু হয়।

কুরাইশরা বদরযুদ্ধে তাদের নিহতদের প্রতিশোধ নেওয়ার শপথ করেছিল। উমাইয়া বিন খালাফের ছেলে সাফওয়ান পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নিতে এমন ক্ষুব্ধ ছিল যে, সে বন্ধু উমাইর বিন ওয়াহাবকে বিষমিশ্রিত খঞ্জর দিয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হত্যা করার জন্য মদিনা পাঠিয়ে দেয়। তবে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে দেখেই বলে ফেলেন, তুমি এবং সাফওয়ান বিন উমাইয়া মিলে আমাকে হত্যা করার নীলনকশা এঁকেছ। উমাইর নবীজির এই মুজিজা দেখে তৎক্ষণাৎ ইসলাম গ্রহণ করে।[৪৪৭]

হাবশা অভিমুখে কুরাইশদের প্রতিনিধিদল

বদরের পরাজয়ের পর কুরাইশ একথা অনুধাবন করতে সক্ষম হয় যে, মুসলমানদের সঙ্গে মোকাবেলা করা সহজসাধ্য নয়। এজন্য তাদেরকে ব্যাপক প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে। তাই তারা শাম থেকে আগত একটি বড়

---

৪৪৬. আলবিদায়া ওয়ান নিহায়া : ৫/৩১২; আলবিনায়া : ৩/২৮৮

৪৪৭. দালাইলুন নবুওয়াহ, বাইহাকি : ৩/১৪৮

বাণিজ্য-কাফেলার সম্পূর্ণ পুঁজি এক মহা যুদ্ধের প্রস্তুতির জন্য সমর্পণ করে।[৪৪৮] একইসঙ্গে কুরাইশের দৃষ্টি হাবশায় বসবাসকারী মুসলমানদের প্রতি নিবদ্ধ হয়, যারা কয়েক বছর যাবৎ নিরাপদে সেখানে জীবনযাপন করে আসছিল।

কুরাইশরা দেখতে পেল মদিনায় মুসলমানদের শাসন চলছে। কিন্তু হাবশা খ্রিষ্টান রাষ্ট্র হওয়া সত্ত্বেও কেবল বাদশাহর ন্যায়-ইনসাফের কারণে সেখানে মুসলমানরা আশ্রয় পেয়েছে। তারা হাবশায় বসবাসকারী মুসলমানদের সেখান থেকে বের করে দেওয়ার ষড়যন্ত্র করে।[৪৪৯] এজন্য তারা আমর বিন আস এবং উমারা বিন ওয়ালিদকে দূত হিসেবে হাবশার বাদশাহ নাজাশির দরবারে পাঠায়। তারা উভয়ে নাজাশির কাছে অভিযোগ করে বলে এসব লোক অপরাধী। আপনি তাদের আশ্রয় দেবেন না; বরং আমাদের হাতে সোপর্দ করুন।

কিন্তু এবারও তাদের চেষ্টা বিফল হয়। নাজাশির দরবার থেকে তারা ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসে।[৪৫০]

হজরত আলির সঙ্গে হজরত ফাতেমার শুভবিবাহ

এ বছরই রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কনিষ্ঠকন্যা হজরত ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহার বিবাহ সম্পন্ন হয়। তার জন্য রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপন চাচাতো ভাই হজরত আলি রাদিয়াল্লাহু আনহুকে নির্বাচন করেন। এই বিবাহ বদরযুদ্ধের পর সম্পন্ন হয়। অত্যন্ত সাদামাটাভাবে দোজাহানের বাদশাহর আদরের দুলালি হজরত ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহার বিবাহ অনুষ্ঠান হয়।[৪৫১]

---

৪৪৮. সিরাতে ইবনে হিশাম : ৪/৬০

৪৪৯. আততারিখুল আওসাত, বুখারি : ১/৩

৪৫০. মাজমাউয যাওয়ায়েদ : হাদিস নং ৯৮৪৫

পূর্বেও মক্কার কাফেরদের পক্ষ থেকে হাবশায় একটি প্রতিনিধিদল উপস্থিত হয়েছিল, যার বিস্তারিত বিবরণ ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। অধিকাংশ ইতিহাস রচয়িতার ধারণা, কাফেরদের প্রতিনিধিদল হাবশায় কেবল একবার গিয়েছিল। .

এই কারণেই এই মতানৈক্য সৃষ্টি হয়েছে যে, কাফেরদের প্রতিনিধিদল মুসলমানগণ হাবশা হিজরতের পরপর গিয়েছিল নাকি বদরযুদ্ধের পরে? সঙ্গে এই মতানৈক্যও সৃষ্টি হয়েছে যে, প্রতিনিধিদলে আমর ইবনুল আসের সঙ্গীর নাম আবদুল্লাহ ইবনে আবি রবিয়া নাকি উমর ইবনুল ওয়ালিদ। যদি প্রতিনিধিদল একাধিক ধরে নেওয়া হয় তা হলে কোনো মতানৈক্য থাকে না। ইবনে সাইয়্যিদিন নাস রহ. এর মতে প্রতিনিধিদল দু'টি ছিল। [উয়ুনুল আসার : ১/১৩৫]

৪৫১. তাবাকাতে ইবনে সা'দ : ৮/২২

এক বর্ণনা মোতাবেক ফাতেমা রা. এর বিবাহ হিজরতের পাঁচ মাস পরে প্রথম হিজরির রজব মাসে সংঘটিত হয়। কিন্তু এই বর্ণনাটি সঠিক নয়। বিশুদ্ধ কথা হলো, বিবাহ এবং উঠিয়ে

নেওয়া হয়েছে দ্বিতীয় হিজরিতে। উঠিয়ে নেওয়ার প্রস্তুতির বিষয়ে হজরত আলি রা. বর্ণনা করেন, আমার কাছে দু'টি উষ্ট্রী ছিল। একটি বদরযুদ্ধে গনিমত হিসেবে পেয়েছি। অপরটি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে উপহার প্রদান করেছিলেন। সে দু'টি উষ্ট্রী দ্বারা ঘাস বোঝাই করে এনে বনু কাইনুকার একজন স্বর্ণকারের মাধ্যমে আমি তা বিক্রি করার পরিকল্পনা করছিলাম। এ সময় হজরত হামজা রা. নেশার ঘোরে উষ্ট্রী-দু'টি জবাই করে ফেলেন। [সহিহ বুখারি, কিতাবুল মুসাকাত; সহিহ মুসলিম, হাদিস নং ৫২৪২]

হজরত হামজা রা. উহুদযুদ্ধে শাহাদাত বরণ করেন। বুখারি এবং মুসলিমের বর্ণনা এ বিষয়ে অভিন্ন যে, হজরত ফাতেমা রা. এর উঠিয়ে নেওয়ার সময় বদর এবং ওহুদযুদ্ধের মাঝামাঝি কোনো মাসে সংঘটিত হয়েছিল। কিন্তু তা কোন্ মাস ছিল উপরোক্ত বর্ণনা দ্বারা অনুমান করা যায়। কারণ, এই বর্ণনায় হজরত আলি রা. এর বনু কাইনুকার একজন স্বর্ণকারের সাথে যৌথ কারবারের কথা উল্লেখ রয়েছে। এই বিষয়টি প্রমাণিত যে, বদরযুদ্ধের মাত্র ২৮ দিন পর ১৫ শাওয়াল বনু কাইনুকার যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এই যুদ্ধে বনু কাইনুকার সকল সদস্যকে দেশান্তর করা হয়।

সুতরাং বনু কাইনুকার যুদ্ধের পরে সেখানকার কোনো স্বর্ণকারের সঙ্গে যৌথ কারবার করা সম্ভব ছিল না। সুতরাং কনে উঠিয়ে নেওয়ার অনুষ্ঠান বদরযুদ্ধ এবং বনু কাইনুকাযুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়ে সংঘটিত হয়েছিল।

উল্লেখ্য, ইমাম দুলাবি রহ. এর বর্ণনা মোতাবেক দ্বিতীয় হিজরির সফর মাসে বিবাহ এবং যিলহজ মাসে স্বামীর ঘরে পাঠানো হয়। [আলমুনতাজাম : ৩/৮৪)

তবে এখানে যে যিলহজ মাসের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তা মক্কি যিলহজ হতে পারে না। কেননা তা বনু কাইনুকাযুদ্ধের দুই মাস পরে হয়। বরং এখানে বর্ণনাকারীর উদ্দেশ্য, মাদানি যিলহজ মাস।

তবে এখানে একটি শক্তিশালী আপত্তি উত্থাপিত হয়। তা হলো, সে বছর মাদানি যিলহজ মাস মক্কি রমজান মাসের একই সময় চলে আসছিল। এ মাসে সর্বপ্রথম রোজা ফরজ হয়েছিল। রমজান মাসে হজরত হামজা রা. কর্তৃক মদপানের ঘটনা সংঘটিত হওয়া সম্ভব নয়। তবে রমজানের পরে মদ পান করা অসম্ভব ছিল না। কেননা আরবদের মাঝে মাদকের ব্যাপক প্রচলন ছিল। আর তখন পর্যন্ত ইসলামে মদ্যপান নিষিদ্ধ হয়নি।

এই আপত্তির উপর ভিত্তি করে একটি মত এমনও এসেছে যে, শাওয়ালের শুরুলগ্নে ঈদের সময় হজরত হামজা রা. কর্তৃক মদ্যপানজনিত উপরোক্ত আচরণ সংঘটিত হয়েছিল। এই বছর অর্থাৎ দ্বিতীয় হিজরিতে সর্বপ্রথম ঈদুল ফিতরের বিধান শরিয়তে এসেছে। [মিরকাতুল মাফাতিহ : ৩/১০৬০]

এর পরপরই বনু কাইনুকাযুদ্ধের পূর্বে রুখসতি হয়ে যায়। অর্থাৎ রুখসতি (কনেকে বরের ঘরে পাঠানোর) অনুষ্ঠান প্রথম দশকে অনুষ্ঠিত হয়। এ মতটি আপন স্থানে শক্তিশালী। তবে হামজা রা. এর মদপানের ঘটনা ইফতারের পর সন্ধ্যা অথবা রাত্রিবেলা ধরে নেওয়া হলে উক্ত আপত্তির অবসান ঘটে।

ইহুদিদের বিরুদ্ধে প্রথম অভিযান
গাজওয়ায়ে বনু কাইনুকা

বদরের যুদ্ধে মুসলমানদের বিজয়ের ফলে একদিকে মক্কার কুরাইশরা সীমাহীন বিচলিত ছিল অপরদিকে তা মদিনার ইহুদি সম্প্রদায়ের জন্যও উদ্বেগের কারণ হলো। অথচ মদিনার ইহুদি সম্প্রদায় রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে ঐক্য ও সংহতির চুক্তিতে আবদ্ধ ছিল। বনু কাইনুকার ইহুদিরা স্বর্ণকার ও পেশাজীবী হওয়ার কারণে বেশ সচ্ছল ও সম্পদশালী ছিল। তারা বদরযুদ্ধের পর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে অঙ্গীকার ভঙ্গ করে মক্কার কুরাইশদের সঙ্গে একজোট হবার জন্য নিরলস প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখে।[৪৫২]

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের বিশ্বাসঘাতকতা সম্পর্কে অবহিত হয়ে নিজে তাদের এলাকায় গমন করেন, যা ছিল মদিনার অদূরেই অবস্থিত। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে সমবেত করে ইসলামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র থেকে বিরত থাকার উপদেশ এবং ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত প্রদান করলেন। কিন্তু তারা নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই অপমানজনক উত্তর দিল যে, আপনি মক্কার আনাড়ি সম্প্রদায়ের মুখোমুখি হয়েছেন বটে; কিন্তু আমাদের মতো লড়াকু সৈনিকদের মুখোমুখি হননি।

তাদের এই মনোভাব যুদ্ধ ঘোষণারই নামান্তর ছিল। তবু রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা প্রদর্শন করলেন।

কয়েকদিন পরের ঘটনা। বনু কাইনুকার মুদ্রাবাজারে অলংকার বানানোর জন্য আগমন করে একজন সম্ভ্রান্ত মুসলিম নারী। কিন্তু ইতর-স্বভাবের ইহুদিরা ষড়যন্ত্রমূলক তাকে বিবস্ত্র করে ছাড়ে। এক মুসলমান এ দৃশ্য অবলোকন করে সেই কুলাঙ্গার ইহুদিকে সেখানেই হত্যা করে। পরিণামে ইহুদিরা সেই মুসলমানকে হত্যা করে। প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য তৎক্ষণাৎ মুসলমানগণ ছুটে আসেন। উভয়পক্ষের মধ্যে যুদ্ধাবস্থা বিরাজ করতে শুরু করে। ইহুদিরা তখন দুর্গে আশ্রয় নেয়। এই নিকৃষ্ট কর্মের পর ইহুদি সম্প্রদায় কোনো প্রকার দয়া-মায়ার উপযুক্ত থাকেনি।

---

৪৫২. আততারিখুল ইসলামি আলআম, ড আলি ইবরাহিম হাসান, পৃষ্ঠা ১৯৬

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উক্ত সংবাদ শোনার পর সৈন্যবিন্যাস করেন এবং তাদের দুর্গ অবরোধ করেন। এটি ২য় হিজরির ১৪ শাওয়ালের ঘটনা। ইসলামি ইতিহাসের এটাই প্রথমযুদ্ধ, যাতে মুসলমানগণ দুর্গে আবদ্ধ দুশমনের মুখোমুখি হয়। ১৫ দিন আবদ্ধ থাকার পরে বনু কাইনুকা পরাজয় স্বীকার করে। শাস্তিস্বরূপ তাদেরকে দেশান্তরিত করা হয়। তারা মদিনা থেকে বের হয়ে সিরিয়ার সীমান্ত এলাকা 'আযরুয়াতুশ শামে' বসতি স্থাপন করে।[৪৫৩]

গাজওয়ায়ে সাবিক

মুসলমান এবং ইহুদিদের মাঝে সম্পর্কের অবনতি লক্ষ করে কুরাইশরা ইহুদিদের সঙ্গে জোট করার পরিকল্পনা করে। প্রথমে তারা মদিনায় বসবাসকারী ইহুদিদের সঙ্গে গোপনে মৈত্রীচুক্তি স্থাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এই দায়িত্ব উমাইয়া গোত্রের সরদার আবু সুফিয়ানের উপর ন্যস্ত হয়। আবু জাহল, আবু লাহাব এবং উতবার পর আবু সুফিয়ানকে কুরাইশের মধ্যে সর্বাধিক গণ্যমান্য মনে করা হতো। আবু সুফিয়ান ২০০ সদস্যের একটি বাহিনী নিয়ে মদিনায় পৌঁছে এবং বনু নাজির ইহুদিদের সঙ্গে দুর্গে অবস্থান করে।

বনু নাজিরের সরদার সাল্লাম ইবনে মিশকামের সঙ্গে ঐক্য ও সহযোগিতার জন্য অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়। ফিরে যাবার সময় আবু সুফিয়ান মদিনার একটি খেজুর বাগানে অগ্নিসংযোগ করে এবং একজন আনসারিকে শহিদ করে। খবর পাওয়ামাত্র নবীজি তাদেরকে ধাওয়া করেন। কিন্তু তারা ঊর্ধ্বশ্বাসে পলায়ন করে মক্কায় পৌঁছে যায়। পলায়নের সময় তারা নিজেদের বোঝা হালকা করার জন্য ছাতু ফেলে যায়। ছাতুকে আরবিতে সাবিক বলা হয়। তাই এই অভিযানকে সাবিক অভিযান নামে অভিহিত করা হয়।[৪৫৪]

কাব বিন আশরাফের গুপ্তহত্যা

বনু নাজির কুরাইশের সশস্ত্র যোদ্ধাদের মদিনা আক্রমণের ব্যবস্থা করে দেওয়ার মাধ্যমে মদিনাবাসীর সঙ্গে তাদের কৃত শান্তিচুক্তির মূলে কুঠারাঘাত করে। বনি নাজিরের সরদার কাব বিন আশরাফ নামক জনৈক সরদার মুসলমানদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে সদাসক্রিয় ছিল। সে ছিল কবি। কবিতার মাধ্যমে সে সভা-সমাবেশে বিদ্রোহের আগুন প্রজ্বলিত করত এবং মুসলিম নারীদের প্রতি কুরুচিপূর্ণ মন্তব্য ছুঁড়ে দিত। এমনকি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকেও তার অশালীন বাক্যের টার্গেট বানাতে কুণ্ঠাবোধ করেনি। বিশেষ করে এ সময় তার ইসলামবিরোধী কার্যকলাপ চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে। সে মক্কায় পৌঁছে

৪৫৩. সিরাতে ইবনে হিশাম : ২/২৮-২৯; সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ : ৪/১৭২

৪৫৪. আলকামিল ফিত তারিখ : ২/৩২; সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ : ৪/১৭২

কুরাইশ নেতাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে। বদরের নিহত মুশরিকদের স্মরণে এমন শোকাবহ কবিতা আবৃত্তি করে যে, উপস্থিত জনতা আপাদমস্তক প্রতিশোধের আগুনে দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকে। মদিনার সঙ্গে কৃত শান্তিচুক্তির বিপরীত তার এই সক্রিয় ভূমিকা ছিল ইসলামি হুকুমতের সঙ্গে প্রকাশ্য বিদ্রোহ এবং শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

তৎক্ষণাৎ বনু নাজিরের সঙ্গে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ার ইচ্ছা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ছিল না। অপরদিকে সীমাহীন বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীদের ছেড়ে দেওয়াও উচিত হতো না। এজন্য একদিন তিনি বললেন, 'কাব বিন আশরাফের সঙ্গে বোঝাপড়া করার মতো কে আছে?'

মুহাম্মদ বিন মাসলামা এই কাজের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। পাশাপাশি তিনি কাব বিন আশরাফের সঙ্গে কিছু কথা বলার জন্য নবীজির অনুমতি প্রার্থনা করেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে অনুমতি প্রদান করেন। মুহাম্মদ বিন মাসলামা করয নেওয়ার বাহানায় কাব বিন আশরাফের নিকট গেলেন এবং সাক্ষাৎকালে এমন কিছু কথা বললেন, যার মাধ্যমে বুঝা যায়, ইসলামের জন্য সদকা দিতে দিতে তিনি অর্থনৈতিকভাবে দুর্দশাগ্রস্ত হয়ে পড়েছেন। তখন কাব বিন আশরাফ বলল, 'আল্লাহর শপথ, এই নবী তোমাদের আরও সঙ্কটে ফেলবে।'

যখন ঋণের আলোচনা এলো তখন কাব ইবনে আশরাফ বন্ধক হিসাবে স্ত্রী অথবা সন্তানদের রাখার দাবি জানায়। মুহাম্মদ বিন মাসলামা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, 'তুমি আরবের সবচেয়ে সুদর্শন ব্যক্তি। তোমার কাছে স্ত্রীদের কীভাবে রাখা যায়?' আর সন্তানদের যদি ঋণের বদলায় বন্ধক রাখা হয়, তা হলে তারা মানুষের তিরস্কারের পাত্র হবে। হ্যাঁ, আমার অস্ত্রপাতি তোমার কাছে বন্ধক রাখতে পারি।'

কাব বিন আশরাফ এতে সম্মত হয়। মুহাম্মদ বিন মাসলামা দুই-তিনজন সাথি নিয়ে রাত্রিবেলা অস্ত্রসহ কাব বিন আশরাফের দুর্গে পৌঁছে যান। মুহাম্মদ বিন মাসলামা রাদিয়াল্লাহু আনহু সাথি-সঙ্গীদের বুঝিয়ে দিলেন, যখন আমি ইশারা করব তখন তোমরা তার উপর আক্রমণ করবে।

একপার্যায়ে কাব বিন আশরাফের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হয়। কাব খুবই উৎকৃষ্টমানের খোশবু ব্যবহার করেছিল। মুহাম্মদ বিন মাসলামা বললেন, 'আমি কখনো এমন মনমাতানো সুবাস গ্রহণ করিনি।'

সে তখন অহংকারে বুক ফুলিয়ে বলল, 'হ্যাঁ, আমার কাছে আরবের সবচেয়ে অধিক সুবাসিনী ও অনিন্দ্যসুন্দরী নারী রয়েছে।'

মুহাম্মদ বিন মাসলামা বললেন, 'আমি কি একটু তোমার মাথার ঘ্রাণ শুঁকতে পারি?

কাব সম্মতি জ্ঞাপন করে যখনই মাথা অবনত করল, মুহাম্মদ বিন মাসলামা তার মাথা সম্পূর্ণই নিজের আয়ত্তে এনে সাথিদের বললেন, 'এখনই আল্লাহর দুশমন এর মাথা নিয়ে নাও।'

এভাবেই ইসলামের এই চিরশত্রুর জীবনলীলা সাঙ্গ হয়। দ্বিতীয় হিজরির রবিউল আউয়াল মাসে এই ঘটনা সংঘটিত হয়।[৪৫৫]

হজরত উম্মে কুলসুম রা. এর বিবাহ

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কন্যা উম্মে কুলসুম রাদিয়াল্লাহু আনহা তখনও অবিবাহিত ছিলেন। এদিকে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মেয়ে হজরত রুকাইয়া রাদিয়াল্লাহু আনহার অফাতের পর হজরত উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু নিঃসঙ্গ হয়ে পড়েন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মে কুলসুম রাদিয়াল্লাহু আনহার জন্য উপযুক্ত পাত্র খুঁজে উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুর চেয়ে উত্তম কাউকে পেলেন না। তাই তৃতীয় হিজরির জুমাদাল আখিরা মাসে তার সাথে হজরত উম্মে কুলসুম রাদিয়াল্লাহু আনহার বিয়ে দেন।[৪৫৬]

সারিয়া যিকারদা

কুরাইশরা একদিকে তো বদরের প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য যুদ্ধের প্রস্তুতি সম্পন্ন করছিল, অপরদিকে সে বছর তারা গ্রীষ্মকালের ব্যবসায়ী কাফেলা সিরিয়ার পরিবর্তে ইরাকে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিল। কারণ মদিনার নিকটবর্তী এলাকা অতিক্রম করা তাদের জন্য বেশ বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

সাফওয়ান বিন উমাইয়া এবং আবু সুফিয়ানের নেতৃত্বে কাফেলা মক্কা থেকে ইরাক অভিমুখে রওনা হয়। এই কাফেলার পুঁজির মধ্যে বিপুল পরিমাণ রুপা ছিল। কিন্তু নজদের পাথুরে ভূমি অতিক্রমকালে তারা 'কারদা' নামক স্থানে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সশস্ত্র বাহিনীর মুখোমুখি হয়। সে বাহিনীর কমান্ডার ছিলেন হজরত যায়েদ বিন হারিসা রাদিয়াল্লাহু আনহু। মক্কাবাসী সবকিছু ছেড়ে পলায়ন করতে বাধ্য হয়। মুসলমানগণ গনিমতের সম্পদরূপে তাদের থেকে এক লাখ দিরহাম হস্তগত করেন।[৪৫৭]

---

৪৫৫. সহিহ বুখারি, হাদিস নং ৪০৩৭; আলমাগাজি, ওয়াকিদি : ১/১৮৪-১৯০

৪৫৬. তাবাকাতুল কুবরা, ইবনে সা'দ : ৮/৩৮

৪৫৭. আলকামিল ফিত তারিখ : ২/৩৬; সিরাতে ইবনে হিশাম : ২/৫০

গাজওয়ায়ে উহুদ

(শাওয়াল ৩হিজরি)

মদিনায় কুরাইশদের আক্রমণ করার একাধিক কারণ একত্র হয়েছিল। তাদের ব্যবসা-বাণিজ্যের রুদ্ধপথ অবমুক্ত করতে মুসলমানদের নিরস্ত্র করা, বদরযুদ্ধে তাদের আত্মীয়স্বজনের হত্যার প্রতিশোধ নেওয়া। আরবের রীতি ও পরিস্থিতি বিবেচনায় যুদ্ধের সিদ্ধান্ত নেওয়া ছাড়া তাদের কোনো উপায় ছিল না।

কুরাইশ তাদের ব্যবসার সকল মুনাফা ব্যয় করে বিশাল বাহিনী তৈরি করে। বিভিন্ন মিত্র কবিলা এবং আহাবিশের[৪৫৮] যোদ্ধারাও এই বাহিনীতে যোগ দেয়। তাদের সম্মিলিত সৈন্যসংখ্যা ছিল ৩ হাজার। তন্মধ্যে দুইশ অশ্বারোহী, সাতশ পদাতিক। পনেরোজন শোকগাথা আবৃত্তিকারী নারীও ছিল, যারা বদরে নিহতদের জন্য বিলাপ করে করে বাহিনীকে প্ররোচিত ও উত্তেজিত করছিল। এই বাহিনী রওনা হতেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচা আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বনু গিফারের এক দ্রুতগামী অশ্বারোহীকে চিরকুট দিয়ে মদিনায় প্রেরণ করে। ফলে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাহিনী পৌঁছার কয়েকদিন পূর্বেই তার আক্রমণের সংবাদ পেয়ে যান।[৪৫৯]

মদিনার দক্ষিণে যেহেতু আগ্নেয়গিরি রয়েছে, সেদিক দিয়ে যুদ্ধ করা দুষ্কর। তাই কুরাইশ বাহিনী বহুদূর ঘুরে মদিনার উত্তরপ্রান্তে পৌঁছে যায় এবং উহুদ পাহাড়ের পশ্চিমে 'যাগাবা'য় তাঁবু স্থাপন করে। এটি ৩য় হিজরির শাওয়ালের প্রথম দশকের ঘটনা।

কুরাইশ বদরযুদ্ধের প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য বদ্ধপরিকর ছিল। স্থির হওয়ার পর তারা সেখান থেকে ধীরে ধীরে মদিনার দিকে অগ্রসর হচ্ছিল। কারণ, অন্য দু'পাশ পর্বত ও বাগ-বাগিচার প্রাচীর-ঘেরা ছিল।

ওদিকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকে নিয়ে যুদ্ধের বিষয়ে পরামর্শে বসলেন। কারণ, মুষ্টিমেয় সৈন্য নিয়ে এত বড় বাহিনীর মোকাবেলা করার মধ্যে অত্যধিক প্রাণহানির আশঙ্কা রয়েছে। তাই নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মত ছিল শহরে থেকেই মোকাবেলা করা।

৪৫৮. মক্কার উপকণ্ঠে বসবাসকারী বনু কিনানা এবং বনু মুদরিকের কিছু কবিলাকে 'আহাবিশ' বলা হয়। [আততারিখুল ইসলামি আলআম, পৃষ্ঠা ১০৮]

৪৫৯. আলমাগাজি, ওয়াকিদি : ১/২০৩, ২০৪

আবদুল্লাহ বিন উবাই তার কাপুরুষতার কারণে ভেতরে ভেতরে শত্রুর সাথে সম্মুখযুদ্ধের সংবাদ শুনে ঘাবড়ে গিয়েছিল। ফলে সে নবীজির মতের সঙ্গে একাত্মতা পোষণ করে। কিন্তু নওজোয়ানরা তাদের বীরত্ব প্রকাশ করার জন্য অস্থির ছিল। তারা মদিনার বাইরে গিয়ে প্রতিরোধ করার জন্য পীড়াপীড়ি করতে থাকে। তাদের অনেকেই বদরযুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে না পেরে অত্যন্ত ভারাক্রান্ত ছিল। তারা ছিল শাহাদাতের স্পৃহায় সীমাহীন উদগ্রীব।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামের উৎসাহ-উদ্দীপনা দেখে নীরবে ঘরে চলে যান এবং একটু পর বর্ম পরে তরবারি কোমরে বেঁধে সাহাবিদের মজলিসে হাজির হন।[৪৬০]

নবীজির এভাবে বেরিয়ে আসা ছিল খোলাপ্রান্তরে যুদ্ধ করার ঘোষণা। ফলে সাহাবায়ে কেরাম তখন বিচলিত হন এবং তাদের মত প্রত্যাহার করে আরজ করেন, 'আপনি যদি পছন্দ করেন তা হলে ভেতরে থেকেই যুদ্ধ করা যায়।' তখন তিনি ইরশাদ করেন, 'নবী যখন হাতিয়ার পরিধান করে ফেলেন, তখন তার জন্য যুদ্ধ করা ছাড়া কোনো পথ বেছে নেওয়া সমীচীন নয়।'[৪৬১]

এখান থেকে বুঝা যায়, কোনো প্রজ্ঞাপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে তা রদবদল করা উচিত নয়।

উহুদ পাহাড়ের দিকে অগ্রসরতা এবং মুনাফিকদের বিরোধিতা

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জুমার নামাজ আদায় করে বাহিনী প্রস্তুত করলেন এবং দ্বিপ্রহরের সময় তাদের নিয়ে শহরের মহল্লা ও অলিগলি পার হয়ে কুরাইশের অবস্থানস্থল উত্তরদিকে যাত্রা করেন। খুব সন্তর্পণে জুতসই স্থানে পৌঁছানো আবশ্যক ছিল। তাই নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো নতুন রাস্তা দিয়ে মদিনা থেকে বের হওয়ার ইচ্ছা করেন। ফলে শহরের এক প্রান্তে অবস্থিত বনু হারিসার মহল্লায় পৌঁছে বলেন, 'এমন কেউ কি আছে যে আমাদেরকে এমন রাস্তা দিয়ে নিয়ে যাবে, যা শত্রুর মুখোমুখি না হয়েই আমাদের নিরাপদ স্থানে পৌঁছে দেবে?'

আবু খাইসামা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, 'ইয়া রাসুলাল্লাহ, আমি এই খেদমতের জন্য প্রস্তুত আছি।'

আবু খাইসামা রাদিয়াল্লাহু আনহু একটি বাগানের ভেতরের রাস্তা দিয়ে সবাইকে বসতির বাইরে নিয়ে আসেন। মুনাফিকরা এ সময় ইসলামের প্রতি তাদের

---

৪৬০. সিরাতে ইবনে হিশাম : ২/৬২, ৬৩

৪৬১. মুসনাদে আহমদ : হাদিস নং ১৪৭৮৭, সুনানে দারেমি : হাদিস নং ২২০৫

শত্রুতা ও বিদ্বেষের পূর্ণ বহিঃপ্রকাশ ঘটায়। মিরবা বিন কাইজা নামক এক মুনাফিকের বাগিচা অতিক্রম করার সময় সে অনুমতি দেবে না বলে বিলাপ করতে থাকে। কিন্তু পরিস্থিতি এত নাজুক ছিল যে, কারো কূটকৌশলের কারণে হুকুমতের নিরাপত্তা ঝুঁকির মধ্যে ফেলা সম্ভব ছিল না। ফলে মুসলমানরা তার আপত্তি আমলে না নিয়ে খুব সতর্কতার সাথে বাগিচার ভেতর দিয়েই গন্তব্যের দিকে যাত্রা করে।

এমন দুঃসময়ে মুনাফিক সরদার আবদুল্লাহ বিন উবাই হঠাৎ যুদ্ধে যাওয়ার ব্যাপারে অনীহা প্রকাশ করে। সে অজুহাত পেশ করে যে, 'তার মত ছিল শহরে থেকেই যুদ্ধ করা। এই মত কেন মানা হলো না!' সে তখন এ কথা বলে ফিরে যাচ্ছিল যে, 'তা হলে আমরা কেন অযথা জান বিলিয়ে দেব।' আরো প্রায় তিনশ লোক তার সঙ্গে চলে যায়।

এর মাধ্যমে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, মদিনাতে তখন শত শত মুনাফিকের অবস্থান ছিল। এরা সর্বদা ইসলামের ক্ষতি ও মূলোৎপাটনের জন্য মোক্ষম সুযোগের সন্ধানে থাকত। এই অবস্থায় গাদ্দারদের প্রতিরোধের চেষ্টা করার মানে ছিল আরেকটি যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়া। তাই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নীরবতা অবলম্বন করলেন।

মুসলিম-বাহিনীর এক-তৃতীয়াংশ কমে গেল। এখন লোকসংখ্যা প্রায় সাতশ। মুনাফিকরা প্রথমেই সরে গেলে অবস্থা এত খারাপ হতো না। কিন্তু আচমকা তাদের সটকে পড়াই মুসলিম-বাহিনীতে ধাক্কা লাগে। তবে আল্লাহর রহমত এবং নবীজির মতো মহান সেনাপতির নেতৃত্বে তারা হিম্মত হারায়নি।[৪৬২]

প্রতিরক্ষা-কৌশল

প্রকৃতপক্ষে মদিনাকে ইতোপূর্বে এমন কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়নি। বদরযুদ্ধ মদিনা থেকে ৭০ মাইল (১১২ কিলোমিটার) দূরে সংঘটিত হয়। তাই শহর আক্রান্ত হওয়া থেকে নিরাপদ দূরত্বে ছিল। কিন্তু এখন তো যুদ্ধের ডঙ্কা মদিনার দোরগোড়ায় উপনীত। সংখ্যার দিক থেকেও বদরযুদ্ধের চেয়ে এবারের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। তখন কাফেররা ছিল তিনগুণ, আর এবার চারগুণ বেশি। কারণ, আবদুল্লাহ বিন উবাইয়ের সটকে পড়ার দ্বারা মুসলিম-বাহিনীর সৈন্যসংখ্যা দাঁড়ায় সাতশ, আর কুরাইশ বাহিনীর সৈন্যসংখ্যা তিন হাজার। তারা শহর থেকে কেবল তিন মাইল দূরত্বে ডেরা ফেলেছে। তাদের যদি মুসলমানদের বহুসংখ্যক সশস্ত্র যোদ্ধার আশঙ্কা না থাকত, তা হলে তারা

---

৪৬২. আলবিদায়া ওয়ান নিহায়া : ৫/৩৫৫

সম্ভবত শহরে প্রবেশেরও কোশেশ করত। তাই তারা প্রথমে উন্মুক্ত ময়দানে সশস্ত্র মুসলিমদের খতম করার পরিকল্পনা আঁটে।

বাহ্যত সম্মুখসমরে মুসলমানদের বিজয়ের সম্ভাবনা কম ছিল। কিন্তু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈমান, দৃঢ় সঙ্কল্প, আল্লাহর উপর ভরসা এবং সাহসিকতায় পূর্ণ ছিলেন। তিনি সম্ভাব্য প্রতিরোধ-ব্যবস্থা নিয়ে গভীরভাবে ভাবছিলেন। অন্যদিকে কুরাইশরা মদিনার বাইরে ডেরা গেড়ে নিশ্চিন্ত সময় পার করছিল। তারা মদিনা থেকে বের হওয়ার রাস্তা বন্ধ করার প্রয়োজনীয়তা বিন্দুমাত্র অনুভব করেনি। তা ছাড়া যুদ্ধের জন্য কোনো জুতসই স্থান খোঁজ করার গুরুত্বও তারা আমলে নেয়নি।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের অসতর্কতা কাজে লাগান। তিনি কুরাইশের তাঁবু বামদিকে রেখে নগরী থেকে পর্যাপ্ত পরিমাণ দূরত্বে বের হয়ে আসেন এবং উহুদ পাহাড়ের পাদদেশে পৌঁছে যান। বাহ্যিকভাবে এটি অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ প্রয়াস ছিল। কারণ, কুরাইশ মুসলমানদের এই স্বল্পসংখ্যক সৈন্য দেখে মদিনা ও ইসলামি বাহিনীর মাঝে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারত। কিন্তু রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিশ্বাস ছিল যুদ্ধের চূড়ান্ত ফয়সালা হওয়ার পূর্বে কুরাইশ মদিনায় প্রবেশের দুঃসাহস দেখাবে না। কেননা, এতে করে পেছন থেকে মুসলিম-বাহিনী কর্তৃক অবরুদ্ধ হওয়ার আশঙ্কা ছিল।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের সৈন্য-স্বল্পতার দরুন অনুভব করতে পারছিলেন যে উন্মুক্ত প্রান্তরে যুদ্ধে জয়ী হওয়া কঠিন; তাই তিনি এমন একটি বিশেষ জায়গা খোঁজ করছিলেন, যার মাধ্যমে নিজের সৈন্যদেরও প্রতিরক্ষা হবে এবং শত্রুর উপরও সফল আক্রমণ পরিচালনা করা যাবে। এটি তখনই হবে, যখন পেছন ও ডান-বাম থেকে অবরুদ্ধ হওয়ার আশঙ্কা না থাকবে। আর তা উহুদ পাহাড়ের পাদদেশেই সম্ভব ছিল। এটি মদিনার সবচেয়ে উঁচু পর্বত। শহর থেকে পাঁচ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। এটি নগরীর দক্ষিণপূর্ব থেকে নিয়ে উত্তরপূর্ব পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তার দৈর্ঘ্য পাঁচ মাইল (৮ কিলোমিটার) আর প্রস্থ দুই মাইল (সোয়া ৩ কিলোমিটার)।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নতুন করে বাহিনীর পরিসংখ্যান নেন। আবদুল্লাহ বিন উমর, উসামা বিন যায়েদ, যায়েদ বিন আরকাম, বারা বিন আযিব, যায়েদ বিন সাবিত এবং আবু সাঈদ খুদরী (রাদিয়াল্লাহু আনহুম) তখন কেবল চৌদ্দ বছরের বালক ছিলেন। কিন্তু জিহাদের অদম্য স্পৃহার কারণে বাহিনীর সঙ্গে চলে এসেছেন। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের ফেরত পাঠিয়ে দেন। তবে রাফি বিন খাদিজ রাদিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন পনেরো

বছরের কিশোর। তিনি দক্ষ তিরন্দাজ ছিলেন। তাই তাকে যুদ্ধে অংশগ্রহণের অনুমতি দেওয়া হলো। তাকে তিরন্দাজদের দলে অন্তর্ভুক্ত করে দেন। অনুরূপ সামুরা বিন জুনদুব রাদিয়াল্লাহু আনহুও পনের বছর বয়সি ছিলেন। তিনি রাফি বিন খাদিজ রাদিয়াল্লাহু আনহুকে কুস্তিতে হারিয়ে দিয়ে নিজের শক্তিপ্রদর্শন করায় নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে অনুমতি প্রদান করেন।[৪৬৩]

৩য় হিজরির ১৫ শাওয়াল শনিবার (৩০ মার্চ ৬২৫ খ্রিষ্টাব্দ) সকালে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সৈন্যবিন্যাস করেন এবং বিভিন্ন ঘাঁটিতে সৈন্যদের নিয়োজিত করেন। এর ফলে উহুদ পাহাড় পেছনে এবং মদিনা মুসলমানদের বাঁ দিকে পড়ে।[৪৬৪]

কুরাইশ বাহিনীর কিছু উল্লেখযোগ ব্যক্তি

দিনের আলো বাড়তেই কুরাইশ বাহিনী মুসলমানদের দিকে অগ্রসর হতে থাকে। তাদের দুজন দক্ষ জেনারেল খালিদ বিন ওয়ালিদ ডানদিকে এবং ইকরিমা বিন আবু জাহল বামদিকে কয়েকশ' ঘোড়সওয়ারের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন। খালিদের সমরবিদ্যা প্রবাদতুল্য ছিল। অন্যদিকে ইকরিমা তার পিতা আবু জাহলের হত্যার প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য অস্থির হয়ে উঠেছিল।

কুরাইশ বাহিনীর সাথে আবু আমের রাহেব নামের একজন প্রসিদ্ধ দরবেশ ছিল। সে মদিনার বাসিন্দা ছিল এবং ইসলামপূর্ব যুগে ইবাদত ও মুজাহাদার কারণে খ্যাতি লাভ করে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনায় আগমনের পর তার সেই কপট আধ্যাত্মিকতার মুখোশ উন্মোচিত হয়ে যায়। ফলে সে হিংসা ও প্রতিশোধের আগুনে দগ্ধ হতে থাকে। তার ক্রোধ

---

৪৬৩. আলবিদায়া ওয়ান নিহায়া : ৫/৩৫৩, তারিখে ইবনে খালদুন : ২/৪৩৪

৪৬৪. গাজওয়া উহুদের তারিখ নিয়ে মতানৈক্য রয়েছে। ইবনে ইসহাক '১৫ শাওয়াল' বলেন। কাতাদা বলেন, '১১ শাওয়াল শনিবার'। [আলবিদায়া ওয়ান নিহায়া : ৫/৩৩৮]
আমি (লেখক) পূর্ববর্তীদের থেকে অন্য কোনো তারিখের ব্যাপারে সুস্পষ্ট বক্তব্য পাইনি। যদিও পরবর্তীদের থেকে ৬, ৭ এবং ৮ তারিখের মত পাওয়া যায়। [আসসিরাতু ওয়াদ দাওয়াহ ফিল আহদিল মাদানি, আহমদ গালওয়াশ, পৃষ্ঠা ৩২০]
ইবনে ইসহাকের মতটি অগ্রগণ্য মনে হয়। কেননা এটি সর্বজনসম্মত যে, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জুমার নামাজ আদায় করে উহুদ পাহাড়ে যান। আর তার পরদিনই যুদ্ধ সংঘটিত হয়। সেদিনটি নিশ্চিত শনিবার ছিল। পঞ্জিকা অনুযায়ী শনিবার ৮ কিংবা ১৫ তারিখ হয়। তবে ৮ তারিখ কেবল অনুমাননির্ভর। অন্যদিকে ১৫ তারিখ পঞ্জিকা মোতাবেক হওয়ার পাশাপাশি ইবনে ইসহাকের মতের সঙ্গেও মেলে। তাই এটিই অগ্রগণ্য।
এখানে এও মনে রাখা রাখবেন যে, আমার (লেখক) অনুসন্ধান মতে গাজওয়ায়ে উহুদের ১৫ শাওয়াল তারিখটি চান্দ্রবর্ষ তথা মাদানিপঞ্জিকা মোতাবেক। যদিও মাওলানা ইসহাকুন নবী আলাবি রহ. এর মত হলো এটি মক্কি শাওয়াল (মাদানি মহররম ৪ হিজরি)। [নুকুশ, রাসুল নম্বর, খণ্ড ২] কিন্তু তার মতের পক্ষে উল্লিখিত প্রমাণাদি তেমন মজবুত নয়।

চরমে পৌঁছে, যখন তার পুত্র হানযালাও ইসলাম গ্রহণ করেন। তখন সে তার কয়েকজন শিষ্যকে নিয়ে মক্কা চলে যায়। আর আজ সে তার পুরোনো প্রতিশোধ গ্রহণের অভিলাষে কুরাইশ বাহিনীর সঙ্গে এসেছে।

কুরাইশ বাহিনীতে জুবাইর বিন মুতইমের গোলাম ওয়াহশি বিন হারবও ছিল। বর্শা নিক্ষেপে তার নিশানা ছিল অব্যর্থ। বদরযুদ্ধে হজরত হামজা রাদিয়াল্লাহু আনহু কুরাইশের সেনাপতি উতবাকে হত্যা করার কারণে তার প্রতি জুবাইর বিন মুতইম অনেক ক্ষিপ্ত ছিল। ফলে জুবাইর ওয়াহশিকে প্রতিশ্রুতি দেয়, সে যদি হামজাকে (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হত্যা করতে পারে, তা হলে তাকে আজাদ করে দেবে।[৪৬৫]

কুরাইশ নারীরা বাহিনীর পেছনে দফ বাজিয়ে বাজিয়ে উৎসাহব্যঞ্জক এই রণসঙ্গীত গাইছিল :

إن تُقبلوا نُعَانِق* ونَفرِشُ النَّمارق
أو تُدْبِروا نُفَارق * فِراق غيرَ وامِق

তোমরা যদি অগ্রসর হও, তা হলে তোমাদের বুকে টেনে নেব
এবং তোমাদের জন্য ফুলেল বিছানা বিছিয়ে দেব।

কিন্তু তোমরা যদি পিছপা হয়ে যাও, তা হলে তোমাদেরকে আমরা পরিত্যাগ করব, সারা জীবনের জন্য তোমাদের ছেড়ে চলে যাব।'[৪৬৬]

মুসলিম-বাহিনীর সৈন্যবিন্যাস

মুসলমানদের প্রায় সকলেই পদাতিক ছিলেন। কেবল দুজন ছিলেন অশ্বারোহী। শত্রু বাহিনীর দুইশ অশ্বারোহী খুব সহজেই উন্মুক্ত ময়দানে মুসলিম পদাতিক বাহিনীকে ঘিরে ফেলতে পারত। তাই নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপত্যকার সঙ্কীর্ণ স্থান থেকে সতর্কতামূলক অগ্রসর হয়ে সেনাবিন্যাস করেন, যেন প্রয়োজনের মুহূর্তে মুসলমানদের পিছু হটে তাদের সৈন্যশিবিরে আসতে সমস্যা না হয়। আর তাদের সেনাশিবিরের পেছনে পাহাড় রক্ষাপ্রাচীর হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। উপত্যকার এই সঙ্কীর্ণ স্থানে দুশমনের অশ্বারোহী সৈন্যরা সহজে চলাফেলা করতে সক্ষম হবে না। অন্যদিকে মুসলমান পদাতিকরা দ্রুত স্থান বদল করে তাদের আঘাত করতে সক্ষম হবে।

---

৪৬৫. আলবিদায়া ওয়ান নিহায়া : ৫/৩৫০, ৩৫৬। জুবাইর বিন মুতইম কুরাইশের সম্ভ্রান্ত লোকদের অন্তর্ভুক্ত ছিল। সম্পর্কে নবীজির চাচা ছিল। মক্কাবিজয়ের সময় ইসলাম গ্রহণ করেন। তার থেকে কয়েকটি হাদিসও বর্ণিত হয়েছে। ৫৯ হিজরিতে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। [সিয়ারু আলামিন নুবালা : ৩/৯৯]

৪৬৬. আলবিদায়া ওয়ান নিহায়া : ৫/৩৫৫

উহুদ পাহাড়কে পেছনে রেখে কাতারবন্দি হওয়ার মধ্যে এই রহস্য ছিল যে, এর ফলে মুসলমানরা পশ্চিমমুখী হয়ে ছিলেন। আর দুশমন ফৌজ পূর্বমুখী হয়ে কাতারবন্দি হচ্ছিল। সূর্যের আলো তাদের দৃষ্টি ধাঁধিয়ে দিচ্ছিল, এতে তাদের অগ্রসরতা ব্যাহত হচ্ছিল।

মুসলমানদের পেছনে একটি অত্যন্ত দুর্গম ঢালু পথ ছিল। ঘোড়ায় চড়ে তা অতিক্রম করা সম্ভব ছিল না। বিপর্যয়ের সম্মুখীন হলে পদাতিক মুসলমানরা সেই ঢালুতে গিয়ে কুরাইশ অশ্বারোহীদের উপর তির ও পাথর নিক্ষেপ করে আত্মরক্ষা করতে পারবে। আর পেছন থেকে আক্রমণ করতে চাইলে কুরাইশের কোনো দলকে বহুদূর ঘুরে মুসলমানদের বামবাহুর উপর আক্রমণ করতে হবে। এটা যদিও কষ্টসাধ্য ছিল, কিন্তু অসম্ভব ছিল না।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই আশঙ্কা অনুধাবন করতে পেরে তিনি একটি অস্বাভাবিক পদ্ধতি অবলম্বন করেন। রণাঙ্গন থেকে মুসলিম-বাহিনীর বামবাহুর দিকে একটি লম্বা-চওড়া টিলা ছিল। পেছন দিকটি স্বাভাবিক উঁচু ছিল। তার উপর অশ্বারোহী চড়তে পারত। সম্মুখের ময়দানটি তুলনামূলক সমতল ও নিচু ছিল। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবদুল্লাহ বিন জুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুর নেতৃত্বে পঞ্চাশজন তিরন্দাজকে সেই টিলার উপর নিয়োজিত করেন। তাদের নির্দেশ দেন, 'কোনো অবস্থাতেই তোমরা তোমাদের স্থান ত্যাগ করবে না।'

তিরন্দাজরা টিলার উপর থেকে চারদিকের দূরদূরান্ত পর্যন্ত ভালোভাবে দেখতে পারত। তাদের পেছনে ছিল উহুদ পাহাড়। বাম দিকে মদিনা এবং সম্মুখে দুশমন। তাদের উপস্থিতিতে মুসলমানদের পেছন দিক থেকে কাফেরদের আক্রমণ করার জন্য এই টিলা অতিক্রম করার সুযোগ ছিল না। তারা যদি মদিনায় ঘেঁষার চেষ্টা চালাত, তবু তিরন্দাজদের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হতো এবং নবীজি তৎক্ষণাৎ তাদের তৎপরতার সংবাদ পেয়ে যেতেন। আর যদি কুরাইশরা ঘুরে এসেও মুসলমানদের পেছন থেকে আক্রমণ করার পাঁয়তারা করত, তখনও তিরন্দাজদের খতম না করে অগ্রসর হওয়া সম্ভব ছিল না।

যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগে কুরাইশ সেনাপতি আবু সুফিয়ান সর্বশেষ বার্তাস্বরূপ আনসারদের কাছে সংবাদ পাঠায় যে, 'তোমরা আমাদের ভাতিজার সঙ্গ ত্যাগ করো, তা হলেই আমরা ফিরে যাবো। তোমাদের সাথে আমাদের যুদ্ধ করার কোনো প্রয়োজন নেই।'

আনসাররা এই চিঠির কঠিন জবাব দিয়ে বার্তাবাহককে পাঠিয়ে দেয়।[৪৬৭]

---

৪৬৭. আলবিদায়া ওয়ান নিহায়া : ৫/৩৬৯

আবু দুজানা রাদিয়াল্লাহু আনহুর বীরত্ব

উভয়পক্ষ আক্রমণের জন্য প্রস্তুত ছিল। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন শক্তিশালী প্রতিপক্ষকে প্রথমেই মানসিকভাবে অবদমিত করতে চাইলেন। আর তা অসাধারণ বাহাদুরি ও সাহসিকতা প্রদর্শনের মাধ্যমেই সম্ভব ছিল। তাই রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামের জিহাদি জজবা বৃদ্ধির জন্য নিজের তরবারি উঁচিয়ে বলতে লাগলেন, 'এটি কে ধারণ করবে?'

একাধিক জানবাজ হাত বাড়িয়ে দেন। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তরবারি সরিয়ে নেন এবং বললেন, 'এর হক আদায় করার নিশ্চয়তা কে দিতে পারবে?' আনসারদের প্রখ্যাত যোদ্ধা আবু দুজানা রাদিয়াল্লাহু আনহু দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'হক দ্বারা উদ্দেশ্য কী?' নবীজি বললেন, 'এটি অত্যধিক ব্যবহার করে রক্তরঞ্জিত করে ফেলা।' আবু দুজানা রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, 'আমি তার হক আদায়ের নিশ্চয়তা দিচ্ছি।'

তরবারি নিয়েই তিনি মাথায় একটি লাল পট্টি বেঁধে ফেলেন। যুদ্ধের ময়দানে এটি তার অভ্যাস ছিল। তা লক্ষ করে সবাই বলতে থাকেন, 'আবু দুজানা মৃত্যুর পট্টি বেঁধে ফেলেছে।'

আবু দুজানা রাদিয়াল্লাহু আনহু খোলা তরবারি নিয়ে দুই সারির মাঝে বীরদর্পে ঘোরাঘুরি করছিলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা দেখে বললেন, 'আল্লাহ তায়ালা কেবল এই স্থানে (রণাঙ্গনে) এমন অহংকারী ভঙ্গিমা পছন্দ করেন।'

এরপরই শুরু হয় উভয়পক্ষের একক মোকাবেলা। মুশরিকদের বিখ্যাত পালোয়ান তালহা বিন আবু তালহা উটে সওয়ার হয়ে ময়দানে অবতীর্ণ হয়। মুসলমানদের পক্ষ থেকে আসেন যুবাইর বিন আওয়াম রাদিয়াল্লাহু আনহু পায়ে হেঁটে। তিনি তালহার উটের উপর চড়াও হলে সে ধপাস করে মাটিতে পড়ে যায়। আর সাথে সাথেই যুবাইর রা. তরবারি দিয়ে তার মুণ্ডুপাত করেন। এরপর তার ভাই আবু সাদ ময়দানে অবতীর্ণ হলে সা'দ বিন আবু ওয়াক্কাস রাদিয়াল্লাহু আনহু তার ইহলীলা সাঙ্গ করেন। তা দেখে তালহার দুই ভাতিজা মুসাফি এবং জুলাস ময়দানে নেমে আসে। তখন হজরত আসিম বিন সাবিত রাদিয়াল্লাহু আনহু ধনুকে তির নিক্ষেপ করে দুজনকেই শেষ করে দেন।[৪৬৮]

---

৪৬৮. আলবিদায়া ওয়ান নিহায়া : ৫/৩৬৯

সামষ্টিক হামলা এবং মুসলমানদের বিজয়

উভয়বাহিনী স্লোগান দিয়ে তুমুল যুদ্ধে লিপ্ত হয়। আবু দুজানা রাদিয়াল্লাহু আনহু নবীজির তরবারি এত দ্রুত চালান যে, শত্রুসারি ভেদ করে একেবারে তাদের পেছনে নারী-ছাউনির কাছে পৌছে যান। এমনকি হিন্দ বিনতে উতবাও তার তরবারির আওতায় চলে আসে; কিন্তু নারী বলে তাকে ছেড়ে দেন।

মুহাজির ও আনসাররা প্রত্যেকেই প্রতিযোগিতামূলক তরবারি চালনা করছিলেন। হজরত হামজা রাদিয়াল্লাহু আনহুর তরবারিতে মুশরিকরা কচুকাটা হচ্ছিল। আরতাত বিন আবদে শুরাহবিল এবং সিবা বিন আবদুল উজ্জা যেই উচ্চবাচ্চ করছিল, নিমেষেই তাদের আগুন নিভে যাচ্ছিল। ওদিকে হজরত আলি রাদিয়াল্লাহু আনহুর আঘাতে মুশরিকদের ঝান্ডাবাহী তালহা বিন উসমান আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে ঝান্ডাসহ জমিনে লুটিয়ে পড়ে।

কুরাইশ অশ্বারোহীরা মুসলমানদের ঈমানিবল এবং জিহাদিস্পৃহা দেখে রণাঙ্গন ছেড়ে ভাগতে থাকে। মুসলমানরা তাদের পিছু নিয়ে তাদের শিবির পর্যন্ত ধাওয়া করে এবং গনিমতের মাল সংগ্রহে মশগুল হয়ে পড়ে।[৪৬৯]

মুশরিক নারীরা লেজ গুটিয়ে পালিয়ে যায়। টিলায় নিযুক্ত তিরন্দাজরা এই দৃশ্য দেখে মনে করে যুদ্ধের ফয়সালা হয়ে গেছে। তাই তারাও গনিমতের সম্পদ সংগ্রহের জন্য টিলা থেকে নেমে যেতে উদ্যত হয়। তখন আমির আবদুল্লাহ বিন জুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাদের বাধা দিতে চেষ্টা করেন এবং 'কোনো অবস্থাতেই তোমরা তোমাদের স্থান ত্যাগ করবে না'নবীজির এই নির্দেশ স্মরণ করিয়ে দেন। কিন্তু গমনেচ্ছুরা ভাবে এই নির্দেশ যুদ্ধ চলাকালীন প্রযোজ্য ছিল; এখন তো যুদ্ধ শেষ।[৪৭০]

যুদ্ধের পটপরিবর্তন

তখন কেবল ১৪-১৫ জন তিরন্দাজ টিলার উপর অবশিষ্ট ছিলেন। মুশরিক অশ্বারোহী বাহিনীর সালার খালিদ বিন ওয়ালিদ পিছপা হওয়ার সময় টিলা শূন্য হয়ে যাওয়ার দৃশ্য অবলোকন করেন। আর এই দুর্বলতার সদ্ব্যবহার করতে বিলম্ব করেননি তিনি। তৎক্ষণাৎ তার বাহিনী নিয়ে টিলা অতিক্রম করে মুসলমানদের পশ্চাৎদেশে পৌছে যান।[৪৭১]

টিলায় অবশিষ্ট রক্ষীরা তাদেরকে রুখতে ব্যর্থ হন এবং লড়তে লড়তে শহিদ হয়ে যান। তারপর খালিদ বিন ওয়ালিদ গনিমত সংগ্রহকারী বেখবর

৪৬৯. আলকামিল ফিত তারিখ : ২/৪৪, ৪৫

৪৭০. সহিহ বুখারি : হাদিস নং ৩০৩৯ (কিতাবুল জিহাদ, বাবু মা যুকরাহু মিনাত তানাযু ওয়াল ইখতিলাফ)

৪৭১. কিছু গবেষকের মতে খালিদ বিন ওয়ালিদ পুরো পাহাড় ঘুরে এসে আক্রমণ করেছিলেন।

মুসলমানদের উপর অতর্কিত আক্রমণ করে বসেন এবং বহু মুসলমানকে শহিদ করে দেন। ওদিকে পলায়নরত মুশরিকরাও ফিরে আসে। ফলে মুসলমানরা উভয়দিক থেকে কঠিন ঘেরাওয়ে পড়ে যায়।

ওয়াহশি ইবনে হারব সুযোগ পেয়ে হামজা রাদিয়াল্লাহু আনহুর উপর বর্শা ছুঁড়ে মারে। যার দরুন তার নাভি ভেদ করে এফোঁড়-ওফোঁড় হয়ে যায়। মুসলিম-বাহিনীর ঝান্ডাবাহী মুসআব বিন উমাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু শহিদ হয়ে যান। জমিনে ঝান্ডা লুটিয়ে পড়তেই মুসলমানরা হীনম্মন্য হয়ে পড়ে। এরই সাথে মুখে মুখে প্রচার হতে থাকে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শহিদ হয়ে গেছেন। এই সংবাদে মুসলমানরা ভীষণ মুষড়ে পড়ে। মুসলিম-বাহিনীতে দুঃখ-বেদনা, অস্থিরতা, বিশৃঙ্খলা ও হুলস্থুল পড়ে যায়। এ সময়ও কিছু মুসলমান শহিদ হন। আর অনেকেই দলে দলে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন।[৪৭২]

নবীজির হেফাজতে সাহাবিদের তুলনাহীন জানবাজি

মুখে মুখে প্রচারিত সংবাদটি মিথ্যা ছিল। এই নাজুক পরিস্থিতিতেও নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রণাঙ্গনে উপস্থিত ছিলেন। কুরাইশের একাধিক যোদ্ধা নবীজিকে খুঁজছিল। তাদের হীনতৎপরতা থেকে নবীজিকে রক্ষা করার জন্য কয়েকজন সাহাবি তাদের বেষ্টনীতে নবীজিকে নিয়ে নেন এবং সিসাঢালা প্রাচীরের মতো তাকে ঘিরে রাখেন। তন্মধ্যে ছিলেন আবু বকর, তালহা, যুবাইর, হারিস বিন সিম্মাহ এবং আরো কিছু আনসারি সাহাবি।

নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুদ্ধের শুরুতেই আত্মরক্ষার পরিকল্পনা হিসাবে কাব বিন মালিকের সাথে নিজের বর্ম পরিবর্তন করে নিয়েছিলেন। ফলে তাকে চেনাও মুশকিল হয়ে পড়েছিল। তারপরও মুশরিক উতবা বিন আবু ওয়াক্কাস এদিকে এসে অনেকগুলো পাথর নবীজির উপর নিক্ষেপ করে। ফলে তার দাঁত মোবারক আহত হয়।

এ সময়ই ইবনে শিহাব এবং ইবনে কামিআ মুশরিকদের একটি ছোট দল নিয়ে হামলা করে। উপস্থিত সাহাবিরা নবীজির সামনে প্রাচীর হয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন। তা সত্ত্বেও ইবনে শিহাবের আঘাতে নবীজির কপাল কেটে যায়। আর ইবনে কামিআর তরবারির আঘাত লাগে নবীজির শিরস্ত্রাণে। মাথা মোবারক রক্ষা পেলেও শিরস্ত্রাণের কয়েকটি কড়া মাথার খুলিতে গেঁথে যায়।[৪৭৩]

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতিরক্ষায় নিয়োজিত সাহাবিদের মধ্যে উম্মে উমারা (নুসাইবা বিনতে কাব) রাদিয়াল্লাহু আনহুও ছিলেন। তিনি

৪৭২. আলকামিল ফিত তারিখ : ২/৪৪, ৪৫
৪৭৩. আলকামিল ফিত তারিখ : ২/৪৪, ৪৫; সিরাতে ইবনে হিশাম : ২/৮০-৮২

তার ডানে-বামে তরবারি ও তির নিক্ষেপ করছিলেন। তার সঙ্গে স্বামী যায়েদ বিন আসিম এবং দুই পুত্র হাবিব এবং আবদুল্লাহও সিংহের মতো লড়াই করে যাচ্ছিলেন।

উম্মে উমারা ইবনে কামিআর সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হন। ইবনে কামিআ এমনভাবে তরবারির আঘাত হানে যে, উম্মে উমারা রাদিয়াল্লাহু আনহার কাঁধের গোশতের টুকরো কেটে যায়। উম্মে উমারা নিজের জখমের পরোয়া না করে তার উপর পালটা তরবারির আঘাত হানেন। কিন্তু ওই কুলাঙ্গার দুটি বর্ম পরিধান করে রাখায় এ যাত্রায় বেঁচে যায়। উম্মে উমারাকে একাধিক জখম করার পরও কাফেররা তাকে আপন জায়গা থেকে বিন্দুমাত্র সরাতে পারেনি।[৪৭৪]

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দেখতে পান, উম্মে উমারার নিকট ঢাল নেই। তিনি এক সাহাবিকে তার ঢালটি উম্মে উমারাকে দিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দেন। ঢাল পেয়ে নুসাইবা রা. বিপুল উদ্দীপনার সঙ্গে লড়াই করতে থাকেন।

উম্মে উমারা রাদিয়াল্লাহু আনহা সেদিনকার ঘটনার স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে বলেন, 'কাফের অশ্বারোহীরা সেদিন আমাদের বেশি ক্ষতি করেছিল। ওরা যদি আমাদের মতো পায়দল হতো, আমরা তাদের মজা দেখিয়ে দিতাম।'

একবার এক অশ্বারোহী হামলা করলে উম্মে উমারা রা. ঢালের সাহায্যে অত্যন্ত দক্ষতার সাথে আত্মরক্ষা করেন। একপর্যায়ে যখন অশ্বারোহীর তরবারির জোর কমে গেল এবং সে ফিরে যেতে উদ্যত হলো, উম্মে উমারা রা. তখন লোকটার ঘোড়ার পায়ে আঘাত করলে সে মাটিতে পড়ে যায়। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মে উমারার ছেলেদের উদ্দেশ্যে বলেন, 'উমারার ছেলেরা কোথায়, তোমাদের মাকে সাহায্য কর।' ফলে তারা মা-ছেলে মিলে দুশমনের দুনিয়ার স্বাদ মিটিয়ে দেন।

এ সময়েই এক আক্রমণে উম্মে উমারার ছেলে আবদুল্লাহ বিন যায়েদের হাত কঠিনভাবে আঘাতপ্রাপ্ত হয়। মা তখন দৌড়ে এসে নিজের থলি থেকে মলম, পট্টি বেঁধে দিয়ে বলেন, 'আমার বেটা, যাও শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর।'

নবীজি এই দৃশ্য দেখে বললেন, 'উম্মে উমারা, কার আছে তোমার সাহসিকতার সাথে লড়াই করার হিম্মত!'

এসময় এক কাফের আক্রমণোদ্যত হয়। তখন নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'উম্মে উমারা, এই লোকটা তোমার সন্তানকে আঘাত করেছে।'

---

৪৭৪. সিরাতে ইবনে হিশাম : ২/৮২

উম্মে উমারা অগ্রসর হয়ে তার পায়ের নলাতে এমন আঘাত করেন যে, সে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। ফলে মা-পুত্র মিলে তার কাজ সমাধা করেন।

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন রসিকতা করে বলেন, 'তোমরা তোমাদের প্রতিশোধ নিয়ে নিলে। আল্লাহর শোকর যে, তিনি তোমাদের চোখ শীতল করে দিয়েছেন।'[৪৭৫]

মুশরিকরা তাদের অভিযান ব্যর্থ হতে দেখে তির বর্ষণ করতে শুরু করে। তখন আবু দুজানা রাদিয়াল্লাহু আনহু অত্যন্ত দ্রুততার সাথে নবীজির উপর ঝুঁকে পড়েন। ফলে মুশরিকদের তিরের আঘাতে আবু দুজানার পিঠ ঝাঁঝরা হয়ে যায়।[৪৭৬]

বিক্ষিপ্ত মুসলমানদের হিম্মত এবং জান্নাতের আগ্রহ

বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা মুসলমানরা তখন নবীজির অবস্থা জানত না। ফলে কিছু বিলম্ব হলেও তারা নিজেদের নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হয়। তারা পরস্পরকে সাহস দিতে থাকে। সাবিত বিন দাহদা রাদিয়াল্লাহু আনহু উচ্চৈঃস্বরে বলে ওঠেন, 'হে আনসাররা, আমার কাছে এস। আমি সাবিত বিন দাহদা। যদি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শহিদ হয়ে গিয়ে থাকেন, তো কী হয়েছে, আল্লাহ তায়ালা তো আছেন! তোমরা তোমাদের দীন রক্ষার জন্য লড়াই কর।'

কিছু আনসারি সাহাবি তার পাশে জমায়েত হয়। তিনি এই মুষ্টিমেয় সাথিকে নিয়ে কুরাইশ অশ্বারোহীদের মুখোমুখি হন। তাদের মধ্যে খালিদ বিন ওয়ালিদ, ইকরিমা বিন আবু জাহল এবং আমর বিন আসের মতো বাহাদুররাও ছিলেন। প্রচণ্ড যুদ্ধের পর সাবিত বিন দাহদা রাদিয়াল্লাহু আনহু তার সাথিদের নিয়ে শাহাদাত বরণ করেন।[৪৭৭]

আনাস বিন নজর রাদিয়াল্লাহু আনহু কিছু মুসলমানকে পলায়ন করতে দেখে বললেন, 'ভাইয়েরা, নবীজির ইনতেকালের পর তোমাদের বেঁচে থেকে কী লাভ? আগে বাড়, যে উদ্দেশ্যে আমাদের নবীজি প্রাণ দিয়েছেন, আমরাও তার জন্য জান দিয়ে দেব।' এই বলে তিনি কাফেরদের ভিড়ে ঢুকে পড়েন এবং শেষনিঃশ্বাস পর্যন্ত তরবারি চালিয়ে যান।[৪৭৮]

কাব বিন মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু আহত হয়ে পড়েছিলেন। তিনি বলেন, 'আমি বর্মপরিহিত অস্ত্রধারী হৃষ্টপুষ্ট এক কাফেরকে দেখলাম সে মুসলমানদের উপর উপর্যুপরি আক্রমণ করছে আর চিৎকার করে বলছে, 'ওদের একটা

৪৭৫. তাবাকাতে ইবনে সা'দ : ৮/৩১৪
৪৭৬. আলবিদায়া ওয়ান নিহায়া : ৫/৪১০
৪৭৭. আলইসতিয়াব : ১/২০৩
৪৭৮. সিরাতে ইবনে হিশাম : ২/৮৩

একটা করে ধরে ধরে মারো।'

ইত্যবসরে তার সামনে মুখোশধারী এক মুসলমানের উদ্ভব হয়। উভয়েই লড়াই করতে থাকে। মুসলিম সৈন্যটি হঠাৎ এত জোরে তরবারির আঘাত করে যে, কাফেরের কাঁধে লেগে বর্মসহ উরু পর্যন্ত দু'ভাগ হয়ে যায়। মুসলিম সৈন্যটি আমার কাছে এসে চেহারার মুখোশ ছড়িয়ে বলে, কাব, দেখো, আমি আবু দুজানা।'[৪৭৯]

হজরত আলি রাদিয়াল্লাহু আনহু মুসলমানদের লাশ পরখ করছিলেন। তিনি তাদের মধ্যে নবীজির লাশ না দেখে ভাবলেন এটা তো সম্ভব নয় যে, তিনি ময়দান ছেড়ে চলে যাবেন; কিন্তু শহিদদের মধ্যেও তো দেখা যাচ্ছে না তাকে। তার অর্থ হলো আল্লাহ তায়ালা আমাদের কর্মকাণ্ডে নাখোশ হয়ে তাকে আসমানে উঠিয়ে নিয়েছেন। এখন কর্তব্য হলো লড়াই করতে করতে নিজের জান বিলিয়ে দেওয়া। এটা ভাবতে ভাবতেই তিনি তরবারি কোষমুক্ত করে মুশরিকদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েন। তার এই আক্রমণ এত তীব্র ছিল যে, কাফেররা অনেক দূরে ছিঁটকে পড়ে। আর তখনই তিনি দেখতে পান নবীজি কাফেরদের ঘেরাওয়ের মধ্যে রয়েছেন।[৪৮০]

ইতোমধ্যে কাফেরদের একটি দল আক্রমণ করে বসে। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন ডাক দিয়ে বলেন, আলি, এদের প্রতিরোধ কর।'

আলি রাদিয়াল্লাহু আনহু শত্রুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তীব্রগতিতে তরবারি চালিয়ে তাদের পিছু হটিয়ে দেন। এরই মধ্যে কাফেরদের আরেকটা দল হামলা করে। এবারও রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলি রাদিয়াল্লাহু আনহুকে হুকুম করলে, তখনও তিনি তাদের পিছু হটিয়ে দেন।[৪৮১]

নবীজির সন্ধানলাভ এবং সাহাবিদের অবর্ণনীয় আনন্দ

নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই যুদ্ধে এমন শিরস্ত্রাণ পরে ছিলেন, যার মধ্য দিয়ে কেবল চোখ দেখা যেত। এই চোখের চমক ও ঝলক সাহাবায়ে কেরাম ঠিকই চিনতেন। কিন্তু মুশরিকরা তার সন্ধান পায়নি।[৪৮২]

ওদিকে কাব বিন মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহুও পৌঁছে যান। তার গায়ে ছিল নবীজির বর্ম। নিজের বর্ম তো তিনি চিনতেন। পাশাপাশি নবীজির চোখের চমক দেখে তিনি আনমনে বলে উঠলেন, 'হে মুসলিমরা, আমাদের নবী জীবিত

---

৪৭৯. আলবিদায়া ওয়ান নিহায়া : ৫/৩৫৯

৪৮০. আলজিহাদ, ইবনে আবি আসেম : হাদির্স নং ২৭০

৪৮১. তারিখে দিমাশক : ৪২/৭৬

৪৮২. আলবিদায়া ওয়ান নিহায়া : ৫/৪১১

ও নিরাপদ আছেন।' রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন তাকে চুপ থাকার ইশারা করেন।[৪৮৩] কারণ, মুশরিকরা তখনও কেবল অনুমানের ভিত্তিতে এদিকে আক্রমণ করছিল। সুনির্দিষ্টভাবে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তারা চিহ্নিত করতে পারছিল না।

পর্বত-চূড়ায় আরোহণ ও সাহাবিদের সীমাহীন আত্মত্যাগ

সাহাবায়ে কেরাম নবীজিকে তাদের বেষ্টনীতে নিয়ে উহুদ পাহাড়ের দিকে অগ্রসর হয়। মুশরিকরা পিছপা হয়ে যাওয়ার পর পুনরায় তীব্র আক্রমণ চালায়। তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, 'আছে কোনো নওজোয়ান, যে তাদের পিছু হটিয়ে দেবে, সে জান্নাতে আমার সঙ্গে থাকবে?' হজরত তালহা রাদিয়াল্লাহু আনহু আরজ করলেন, 'আমি হাজির'। তিনি বললেন, 'না, তুমি নও।'

তখন এক আনসারি সাহাবি অগ্রসর হয়ে মুশরিকদের সঙ্গে লড়তে শুরু করেন এবং একপর্যায়ে তিনি শহিদ হয়ে যান। এরপর তারা পুনরায় নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পশ্চাদ্ধাবন করতে থাকে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বার বার জান্নাতের সুসংবাদ দিতে থাকেন, আর একেকজন আনসারি সাহাবি মুশরিকদের প্রতিরোধ করতে গিয়ে শহিদ হয়ে যাচ্ছিলেন। সর্বশেষে তালহা রাদিয়াল্লাহু আনহু বাকি রইলেন। মুশরিকদের সাথে লড়াই করতে করতে তার দুই হাত রক্তে রঞ্জিত হয়ে যায়। এক হাতের আঙুলও কেটে যায়।[৪৮৪]

উবাই বিন খালাফের জাহান্নামের টিকিটপ্রাপ্তি

নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার জানবাজদের বেষ্টনীতে পাহাড়ের ঘাঁটির দিকে যাচ্ছিলেন। এমন সময় উবাই বিন খালাফ দ্রুতগামী ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে নবীজির কাছে চলে আসে। এই ব্যক্তি হিজরতের পূর্বে মক্কায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অনেক কষ্ট দিয়েছে। এমনকি তাকে হত্যার হুমকিও দিয়েছে। তখন নবীজি তাকে বলেছিলেন, 'ইনশা আল্লাহ আমি-ই তোমাকে হত্যা করব।'

উবাই বিন খালাফ কাছাকাছি পৌঁছে বলতে থাকে, 'মুহাম্মদ কোথায়? মুহাম্মদ কোথায়? মনে রেখ, সে যদি আজ বেঁচে যায় তা হলে আমিও বাঁচবো না।'

সাহাবায়ে কেরাম তার গতিরোধ করতে চাইলেন। কিন্তু নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'ওকে আসতে দাও।' তিনি হারিস বিন সিম্মাহর

---

৪৮৩. সিরাতে ইবনে হিশাম : ২/৮৩

৪৮৪. আলমুজামুল আওসাত, তাবারানি : হাদিস নং ৮৭০৪

হাত থেকে বর্শা নিয়ে নিজেই তার মোকাবেলা করার জন্য প্রস্তুত হয়ে যান। উবাইয়ের শিরস্ত্রাণ ও বর্মের মাঝামাঝিতে এত জোরে বর্শা ছুঁড়ে মারেন যে, বর্শার চোট খেয়েই সে ঘোড়া থেকে ভূমিতে ছিটকে পড়ে ভয়ানক স্বরে চিৎকার করতে করতে ভেগে যায়। সতীর্থ মুশরিকরা তাকে অভয় দেয় যে, এটা মামুলি জখম। কিন্তু সে ব্যথায় অস্থির হয়ে বলতে থাকে, 'মুহাম্মদ বলেছিল আমি উবাইকে হত্যা করব। খোদার কসম, আমার কষ্ট যদি সমগ্র হিজাজবাসীকে ভাগ করে দেওয়া হয়, তা হলে এরা সবাই এমনিতেই মরে যেত।'

অবশেষে উবাই বিন খালাফ এই আঘাতেই জাহান্নামের ঠিকানায় পাড়ি জমায়।[৪৮৫]

উহুদ পাহাড়ের ঘাঁটিতে

মুশরিকদের পদাতিক ও অশ্বারোহীরা তখনও নবীজির খোঁজে পাহাড়ের দিকে অগ্রসর হচ্ছিল; কিন্তু তিনি তখন নিরাপদ দূরত্বে চলে যেতে সক্ষম হয়েছিলেন। তিনি তুলনামূলক উঁচু স্থানে অবস্থান করছিলেন। সাহাবায়ে কেরামও তার চারপাশে জমায়েত হয়ে গিয়েছিলেন। তাদের মধ্যে আহত, সুস্থ সবধরনের মুজাহিদই ছিলেন।

তাদের মধ্যে আবু তালহা রাদিয়াল্লাহু আনহুর মতো দক্ষ তিরন্দাজও ছিলেন। তিনি তার ঢাল দাঁড় করিয়ে তার পেছনে নবীজিকে লুকিয়ে শত্রুর উপর মুহুর্মুহু তির ছুড়তে থাকেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বার বার মাথা উঠিয়ে তার তিরন্দাজি দেখছিলেন তার তির লক্ষ্য ভেদ করেছে কিনা। তখন আবু তালহা রাদিয়াল্লাহু আনহু অস্থির হয়ে বলেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ, আপনার উপর আমার মা-বাবা উৎসর্গ হোক। আপনি মাথা উঠাবেন না। আপনার জন্য আমার বুক সমর্পিত।'[৪৮৬]

সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস রাদিয়াল্লাহু আনহুও অত্যন্ত দক্ষতার সাথে তির নিক্ষেপ করেন। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে উৎসাহ দিয়ে বলেন, 'সাদ, তির ছুড়ো- আমার মা-বাবা তোমার জন্য উৎসর্গিত হোক।'[৪৮৭]

মুশরিকদের ধাবমানতা যখন কিছুটা স্তিমিত হয়, তখন নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার জানবাজ সাথিদের সঙ্গে নিয়ে উহুদ পাহাড়ের চূড়ায় উঠতে থাকেন। তাদের মধ্যে হজরত আবু বকর, উমর, আলি, সা'দ বিন আবি

---

৪৮৫. আলমুসতাদরাকে হাকিম : হাদিস নং ৩২৬৩; আলজিহাদ, ইবনে আবু আসেম : হাদিস নং ২৫৩; মুসান্নাফে আবদুর রাজ্জাক : হাদিস নং ৯৭৩

৪৮৬. সহিহ বুখারি : হাদিস নং ৩৮১১ (কিতাবুল মানাকিব, মানাকিবু আবি তালহা রা.)

৪৮৭. সহিহ বুখারি : হাদিস নং ৪০৫৯ (কিতাবুল মাগাজি, গাজওয়াতু উহুদ, বাবু ইয হাম্মাত তা ইফাতানি মিনকুম)

ওয়াক্কাস, আবু দুজানা, তালহা বিন উবাইদুল্লাহ, যুবাইর বিন আওয়াম, হারিস বিন সিম্মাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহুম) উল্লেখযোগ্য। মুশরিকদের পশ্চাদ্ধাবন তখনও অব্যাহত ছিল।[৪৮৮]

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন বললেন, 'লক্ষ রাখবে, এরা যেন পাহাড়ের চূড়ায় উঠতে না পারে।'

এ কথা শুনে হজরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু কয়েকজন মুহাজির সাহাবিকে সাথে নিয়ে কাফেরদের মেরে ভাগিয়ে দেন।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন পাহাড়ের দুর্গম পথ পাড়ি দিচ্ছিলেন। একে তো জখমি ছিলেন, অপরদিকে তার গায়ে ছিল দুটি বর্ম। বর্মের ভারের কারণে নিজে নিজে কোনো বড় পাথরের উপর উঠতে পারছিলেন না। তালহা বিন উবাইদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু তৎক্ষণাৎ ভূমিতে বসে পড়েন, আর নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার পিঠে পা দিয়ে পাথরের উপর ওঠেন। নবীজি বললেন, 'তালহা তো নিজের জান্নাত ওয়াজিব করে নিয়েছে।'[৪৮৯]

আহতদের শুশ্রূষা, প্রশান্তি অবতরণ

পর্বতচূড়া কুরাইশের আক্রমণের আশঙ্কামুক্ত ছিল। তবে এখানে জমায়েত হওয়া সকল মুসলমানই ক্লান্ত-পরিশ্রান্ত এবং পিপাসার্ত ছিলেন। এমন পরিস্থিতির জন্য পূর্ব থেকেই ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল।

আহতদের সেবা-শুশ্রূষার জন্য মুসলিম নারীরা উপস্থিত ছিলেন। আবু তালহার স্ত্রী উম্মে সুলাইম, উম্মুল মুমিনিন হজরত আয়েশা পানির মশক ভরে ভরে মুজাহিদদের পান করান। তারা পানির মশক কোমরে বয়ে নিয়ে যেতেন। বাচ্চাদের মধ্যে কেবল তের বছর বয়সি হজরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একান্ত খাদেম হওয়ায় তিনি সেখানে উপস্থিত ছিলেন।[৪৯০] হজরত ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহাও সেখানে ছিলেন।

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেহারা থেকে অনবরত রক্ত ঝরছিল। আলি রাদিয়াল্লাহু আনহু ঢালের ভেতরে পানি নিয়ে ক্ষতস্থানগুলো পরিষ্কার করে দিচ্ছিলেন; কিন্তু রক্তক্ষরণ বন্ধ হচ্ছিল না। তা দেখে ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহা এক খণ্ড চাটাই পুড়িয়ে তার ছাই নবীজির ক্ষতস্থানে লাগিয়ে দিলে সাথে সাথেই রক্ত ঝরা বন্ধ হয়ে যায়।[৪৯১]

---

৪৮৮. আলবিদায়া ওয়ান নিহায়া : ৫/৪১১

৪৮৯. আলবিদায়া ওয়ান নিহায়া : ৫/৪১৪

৪৯০. সহিহ বুখারি : হাদিস নং ৩৮১১ (কিতাবুল মানাকিব, মানাকিবু আবি তালহা রা.)

৪৯১. সহিহ বুখারি : হাদিস নং ৪৭৭৫ (কিতাবুল মাগাজি, বাবু মা আসাবান নাবিয়্যা মিনাল জিরাহ)

এই সময় বিধ্বস্ত মুজাহিদদের উপর এক বিস্ময়কর তন্দ্রা আচ্ছন্ন করে ফেলে। এমন কঠিন মুহূর্তে এটা আসার কোনো সম্ভাবনাই ছিল না। অবস্থা এমন হয় যে, সাহাবিদের সর্বাত্মক চেষ্টা সত্ত্বেও সজাগ থাকতে পারছিলেন না কেউ। আবু তালহা রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাত থেকে বার বার তরবারি পড়ে যাচ্ছিল।[৪৯২]

কিছু সময় পর তাদের এই তন্দ্রা কেটে গেলে মুসলমানরা তাজাদম হয়ে যান এবং নিজেদের মধ্যে নতুন শক্তি ও উদ্যম অনুভব করতে থাকেন।[৪৯৩]

আবু সুফিয়ানের সঙ্গে কথোপকথন

যুদ্ধের হাঙ্গামা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। কুরাইশরাও নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসন্ধান করতে করতে হতাশ হয়ে গিয়েছিল। তদুপরি কুরাইশ সেনাপতি আবু সুফিয়ান পাহাড়ের নিকটে এসে বিজয়ধ্বনি দিয়ে বলতে থাকে, 'যুদ্ধের পাল্লা উপর-নিচ হয়। আজ বদরের প্রতিশোধের দিন। জয় হুবল।'

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু দাঁড়িয়ে উত্তর দেন, 'আল্লাহ তায়ালাই সবচেয়ে মর্যাদাবান, তিনিই মহা মহিমান্বিত।

আবু সুফিয়ান বলে, 'আমাদের উজ্জা আছে, তোমাদের উজ্জা নেই।'

উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু নবীজির শেখানোমতে উত্তর দেন, 'আল্লাহ আমাদের সহায়তাকারী বন্ধু, তোমাদের কোনো বন্ধু নেই।'[৪৯৪]

আবু সুফিয়ান বলে, 'কসম দিয়ে জিজ্ঞেস করছি, সত্যি করে বল তো দেখি, আমরা মুহাম্মদকে হত্যা করেছি কি না?'

হজরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু কঠোর জবাব দিলেন, 'না, আল্লাহর কসম, তিনি তো এখন তোমার সব কথা শুনতে পাচ্ছেন।'

আবু সুফিয়ান প্রস্থান করার পূর্বে বলে, 'আগামী বছর পুনরায় বদরে যুদ্ধ হবে।'

উত্তর আসে, 'ঠিক আছে। আগামী বছর ওখানে মোকাবেলার প্রতিশ্রুতি গৃহীত হলো।'[৪৯৫]

, কিতাবুল জিহাদ, বাবুল মিহান, হাদিস নং ২০৩৯
চাটাইয়ের ছাই দিয়ে ক্ষতস্থান থেকে রক্ত পড়া বন্ধ করা আরবদের একটি দ্রুত ক্রিয়াশীল চিকিৎসাপদ্ধতি ছিল। এই রেওয়ায়েত থেকে বুঝা যায়, মদিনাতে মেয়েদের ঘরে এই প্রাথমিক চিকিৎসার দীক্ষা দেওয়া হতো। এ থেকে ইসলামে ভেষজচিকিৎসার গুরুত্ব প্রতিভাত হয়।

৪৯২. সহিহ বুখারি : হাদিস নং ৩৮১১ (কিতাবুল মানাকিব, মানাকিবু আবি তালহা রা.)

৪৯৩. তাফসিরে ইবনে কাসির, সুরা আলে ইমরান, আয়াত ৫৪

৪৯৪. সহিহ বুখারি : হাদিস নং ৩০৩৯ (কিতাবুল জিহাদ, বাবু মা যুকরাহু মিনাত তানাযু)

৪৯৫. সিরাতে ইবনে ইসহাক, পৃষ্ঠা ৩৩৩, ৩৩৪

গোয়েন্দাবৃত্তির জন্য হজরত আলির যাত্রা

কাফেরবাহিনী যখন ফিরে যায়, তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলি রাদিয়াল্লাহু আনহুকে তাদের পিছু নিয়ে তাদের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করার দায়িত্ব দেন। তাকে বলে দেন, 'তারা যদি ঘোড়া ছেড়ে কেবল উটের উপর সওয়ার হয়ে যাত্রা করে, তা হলে তারা সোজা মক্কায় চলে যাবে, আর যদি তাদের ঘোড়ার উপর সওয়ার হতে দেখ, তা হলে বুঝবে তারা মদিনায় চড়াও হতে চায়। আল্লাহর শপথ, তারা যদি এমন ইচ্ছা পোষণ করে তা হলে আমি নিজে তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করব।'

আলি রাদিয়াল্লাহু আনহু কুরাইশের পিছু পিছু গিয়ে তাদের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করে ফিরে এসে বললেন, 'তারা উটের উপর সওয়ার হয়ে মক্কার দিকে যাচ্ছে। আর ঘোড়া সওয়ারশূন্য করে সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছে।'

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পূর্ণ আশ্বস্ত হওয়ার পর শহিদদের কাফন-দাফনের প্রতি মনোনিবেশ করেন।[৪৯৬]

উহুদের শহিদগণ

উহুদযুদ্ধের শহিদদের লাশ ময়দানে বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে ছিল। তাদের মধ্যে হজরত আনাস বিন নজর রাদিয়াল্লাহু আনহুর দেহে প্রায় আশিটি আঘাত ছিল। অনেকের লাশ চিহ্নিত করা দুষ্কর হয়ে পড়েছিল। তার বোন আঙুলের উপরিভাগ দেখে চিনতে পেরেছিলেন।[৪৯৭]

নোট : ইবনে সা'দের রেওয়ায়েত দ্বারা স্পষ্ট হয় যে, আবু সুফিয়ান পরবর্তী বছর 'বদরুস সাফরাতে' মোকাবেলার চ্যালেঞ্জ দিয়েছিল। 'বদরুস সাফরা' একটি বাৎসরিক মেলা ছিল। নিরেট চান্দ্রপঞ্জিকা অনুসারে ১ যিলকদ থেকে ৮ তারিখ পর্যন্ত বদর উপত্যকায় তা সংঘটিত হতো। [তাবাকাতে ইবনে সা'দ : ২/৬০]

এই মেলাটি নিরেট চান্দ্রপঞ্জিকার যিলকদ মাসে হওয়ার দলিল হলো, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতিশ্রুতি মোতাবেক যখন বদরে পৌঁছেন, তখন কিছু বর্ণনাকারীর মতে সে মাসটি ছিল শাবান মাস। [আলমুহাব্বা, পৃষ্ঠা ১১৩]

কারো কারো নিকট সেটি যিলকদ মাস ছিল। [তাবাকাতে ইবনে সা'দ : ২/৫৯]

আর যদি ক্যালেন্ডারের হিসাব দেখা হয়, তা হলে তো কোনো সংশয়ই থাকবে না। কেননা, মক্কি ক্যালেন্ডার অনুযায়ী তা ছিল শাবান, আর চান্দ্রপঞ্জিকা অনুযায়ী তা হলো যিলকদ মাস। এ থেকে এও বুঝা যায় যে, কেউ কেউ গাজওয়ায়ে উহুদ মক্কিপঞ্জিকা মোতাবেক শাওয়াল, মাদানি ৪ হিজরির মহররম মাসে হওয়ার যে মত প্রকাশ করে থাকেন, তা সঠিক নয়। কারণ, গাজওয়ায়ে উহুদে আবু সুফিয়ান পূর্ণ এক বছর পর লড়াইয়ের চ্যালেঞ্জ ছুড়েছিল। [الموعد بيننا وبينكم بدرُ الصفراء، رأس الحول طبقات ابن سعد : ২/৫৯] গাজওয়ায়ে উহুদ যদি মহররম মাসে হয়ে থাকে, তা হলে তো যিলকদ মাসে এক বছর পূর্ণ হয় না- এটা স্পষ্টই বুঝা যাচ্ছে।

৪৯৬. আলবিদায়া ওয়ান নিহায়া : ৫/৪২১

৪৯৭. আলবিদায়া ওয়ান নিহায়া : ৫/৪০২

শাহাদাতের সৌভাগ্য অর্জনকারীদের মধ্যে উসাইরিম রাদিয়াল্লাহু আনহুও ছিলেন। তিনি সেদিনই ইসলাম গ্রহণ করে সোজা রণাঙ্গনে পৌঁছে যান এবং যুদ্ধে অনেক বীরত্ব প্রদর্শন করেন। এক সময় তিনি কঠিন আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে লুটিয়ে পড়েন। যুদ্ধের পর মুসলমানরা যখন শহিদদের লাশ কাফন পরাতে থাকেন, তখন শহিদদের মাঝে তাকে রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখেন। কারো ধারণাই ছিল না যে, তিনি মুসলমান হয়ে গেছেন। ফলে জিজ্ঞেস করা হলো, 'তুমি এখানে কেন? গোত্রীয় টানে, নাকি ইসলামের খাতিরে?'

উসাইরিম বললেন, 'ইসলামের খাতিরে। হ্যাঁ, আমি আল্লাহ ও তার রাসুলের প্রতি ঈমান এনেছি।' এটুকু বলার পরই তার প্রাণবায়ু উড়ে যায়।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, 'এ জান্নাতি। 'এই লোক এমন জান্নাতি, যার এক ওয়াক্ত নামাজও পড়ার সুযোগ হয়নি।'[৪৯৮]

আমর বিন জামুহ রাদিয়াল্লাহু আনহু

শহিদদের মধ্যে আমর বিন জামুহ রাদিয়াল্লাহু আনহুও ছিলেন। তার এক পা খোঁড়া ছিল। তার চার নওজোয়ান পুত্র এই যুদ্ধে শরিক হওয়ার জন্য যেতে উদ্যত হলে তিনিও যাওয়ার আর্জি পেশ করেন। কিন্তু ছেলেরা তার বয়স এবং অক্ষমতার দরুন তাকে যেতে বারণ করলে তিনি নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে এসে আরজ করলেন, 'আমার ছেলেরা আমাকে আপনার সঙ্গে জিহাদে যেতে বারণ করে। আল্লাহর কসম, আমি আমার এই খোঁড়া পা নিয়ে জান্নাতে চলাফেরা করতে চাই।'

তার এই জিহাদি স্পৃহা দেখে নবীজি তাকে যুদ্ধে অংশগ্রহণের অনুমতি প্রদান করেন। পরবর্তীতে রণাঙ্গণেই তার লাশ পাওয়া যায়।[৪৯৯]

হানযালা : ফেরেশতারা যার গোসল দিয়েছেন

উহুদের শহিদদের মধ্যে হানযালা রাদিয়াল্লাহু আনহুও ছিলেন। তার পিতা ছিল আবু আমের রাহেব। মুশরিকদের পক্ষে সেও যুদ্ধে অংশ নিয়েছিল। কট্টর মুনাফিক আবদুল্লাহ বিন উবাইয়ের কন্যা জামিলা ছিলেন পাক্কা ঈমানদার। হজরত হানযালার বিবাহ তার সঙ্গেই সম্পন্ন হয়। বিগত রাতেই তাদের বিবাহ হয়। বাসর রাতের গোসলও করেননি, এমন মুহূর্তে মুসলমানদের যুদ্ধের সংবাদ শুনে সোজা রণাঙ্গনে চলে আসেন এবং জানবাজি রেখে শাহাদাত লাভ করেন। তাকে কাফন পরানোর সময় মুসলমানরা তার দেহ থেকে পানি টপকে

---

৪৯৮. আলবিদায়া ওয়ান নিহায়া : ৫/৪১৮

৪৯৯. আলবিদায়া ওয়ান নিহায়া : ৫/৪১৮

পড়তে দেখেন। যখন তার স্ত্রী বলে যে, তিনি ঘর থেকে গোসল ছাড়াই বের হয়েছিলেন, তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'এজন্যই তাকে ফেরেশতারা গোসল দিয়েছে।'[৫০০]

মুসআব বিন উমাইরের অর্ধেক কাফন

শহিদদের মধ্যে মুসআব বিন উমাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুও ছিলেন। তিনি মক্কায় থাকাকালে অত্যন্ত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে জীবন যাপন করতেন। সুন্দর সুন্দর পোশাক পরিধান করতেন। কিন্তু আজ তাকে দাফনের সময় দেহ ঢাকার জন্য কেবল একটি ছোট চাদর পাওয়া যায়, যা দিয়ে তার মাথা ঢাকলে পা খুলে যাচ্ছিল, পা ঢাকলে মাথা উন্মুক্ত হয়ে যাচ্ছিল।[৫০১]

এক শহিদের সর্বশেষ কথা

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঐসব ব্যক্তিকে নিয়ে বিশেষ চিন্তামগ্ন ছিলেন, যাদের লাশ খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। আবার জীবিতদের মাঝেও তারা ছিল না। তিনি সা'দ বিন রাবি আনসারি রাদিয়াল্লাহু আনহুর সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। জীবিত আছে নাকি শহিদ হয়ে গেছে? মুহাম্মদ বিন মাসলামা রাদিয়াল্লাহু আনহু তাকে খুঁজতে খুঁজতে একসময় পেয়ে যান। সা'দ বিন রাবি আনসারি শহিদদের মাঝেই পড়ে থেকে আখেরি নিঃশ্বাস নিচ্ছিলেন। এই অবস্থাতেও তিনি নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিরাপত্তার জন্য পেরেশান ছিলেন। তার সর্বশেষ কথা ছিল, 'রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমার সালাম দেবে আর বলবে, আল্লাহ তায়ালা আপনাকে এমন উত্তম প্রতিদান দিন, যা কোনো উম্মতের পক্ষ থেকে তাদের নবীকে দেওয়া হয়েছে। আর মুসলমানদেরকেও আমার সালাম দিয়ে এই বার্তা শুনিয়ে দেবে যে, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যদি তোমাদের জীবিতাবস্থায় কোনোরূপ কষ্ট পান, তা হলে আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করবেন না।' এটুকু বলেই তিনি মহান প্রভুর দরবারে চলে যান।[৫০২]

হামজা রাদিয়াল্লাহু আনহুর লাশ

কুরাইশের কিছু লোক শহিদদের লাশের অনেক অপমান করে। নাক, কানসহ অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কেটে ফেলে। হজরত হামজা রাদিয়াল্লাহু আনহুর বুক চিড়ে ফেলা হয়েছিল। চেহারা বিকৃত করে দেওয়া হয়েছিল।[৫০৩]

৫০০. আলবিদায়া ওয়ান নিহায়া : ৫/৩৭০
৫০১. সহিহ বুখারি : হাদিস নং ৪০৪৫ (কিতাবুল মাগাজি, বাবু গাজওয়াতি উহুদ)
৫০২. আলবিদায়া ওয়ান নিহায়া : ৫/৪২৩
৫০৩. আলবিদায়া ওয়ান নিহায়া : ৫/৪২৪, ৪২৫

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার চাচা হামজা রাদিয়াল্লাহু আনহুকে সীমাহীন মহব্বত করতেন। তিনি তার দুধভাই এবং অন্তরঙ্গ বন্ধুও ছিলেন। তার লাশের এমন করুণ অবস্থা দেখে তিনি অনেক ব্যথিত হন।[৫০৪] রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'ইতোপূর্বে এমন আঘাত কখনো পাইনি।'

ইতোমধ্যে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ফুফু সাফিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহা এই সংবাদ শুনে দৌড়ে আসেন। তাকে আসতে দেখে তিনি তার ছেলে যুবাইরকে বাধা দিতে বললেন। যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু আগে বেড়ে বললেন, 'আপনি লাশ দেখবেন, এটা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চাচ্ছেন না।'

---

৫০৪. হামজা রা. এর লাশের অপমান করা হয়েছে ঠিকই; কিন্তু কোনো সহিহ রেওয়ায়েতে এ কথা বর্ণিত হয়নি যে, হিন্দ রা. হজরত হামজা রা. এর কলিজা চিবিয়েছেন। যদিও উক্ত রেওয়ায়েত মানতে শরিয়তের কোনো বাঁধা নেই। কারণ, এটি কুফরি অবস্থার ঘটনা। এ সময় চরম দুশমনির কারণে এমন কদর্য কর্মকাণ্ড সংঘটিত হওয়া কোনো অসম্ভব ব্যাপার নয়। তবে এটিও মনে রাখতে হবে যে, উক্ত বর্ণনাটি কেবল ইবনে ইসহাক এনেছেন সালিহ বিন কায়সান থেকে। সালিহ একজন নির্ভরযোগ্য রাবি। তবে তার জন্ম ৭০ হিজরিতে। তিনি স্বচক্ষে দেখে ঘটনার বিবরণ দেননি। এই দৃষ্টিকোণ থেকে উক্ত বর্ণনাটি সুনিশ্চিতভাবেই মুনকাতি।

এই যৌক্তিক কথার উপর গভীর দৃষ্টি দিয়ে ভাবুন তো, যেখানে বিশুদ্ধ রেওয়ায়েত মোতাবেক নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার চাচার হত্যাকারী ওয়াহশি রা. কে ইসলামগ্রহণের পরেও তাকে চোখের সামনে না পড়ার নির্দেশ দেন। [সহিহ ইবনে হিব্বান : হাদিস নং ৭০১৭] যদি বাস্তবেই হিন্দ রা. এমন অমানবিক গর্হিত কাজ করতেন, তা হলে তো ইসলামগ্রহণের পর তার এত সম্মান লাভ করার সুযোগ ছিল না। অথচ নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কাবিজয়ের সময় ঘোষণা দিয়েছিলেন যে, 'তার যে ব্যক্তি হিন্দের ঘরে প্রবেশ করবে, সে নিরাপত্তা পাবে।'

ইসলামগ্রহণের পর হিন্দ রা. আরজ করেন, ইতোপূর্বে আপনার সঙ্গীদের অপমান করা আমার পছন্দ ছিল আর এখন আপনার দলের চেয়ে সম্মান ও ইজ্জতওয়ালা কেউ নেই।

তার উত্তরে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন, 'ঐ সত্তার কসম, যার কুদরতি হাতে আমার প্রাণ! আমার অবস্থাও অনুরূপ। [সহিহ বুখারি : হাদিস নং ৩৮২৫, কিতাবুল মানাকিব, যিকরু হিন্দ]

তার অন্তর আকৃষ্ট করার মতো কথাও বলেছেন। তাকে স্বামীর সম্পদ থেকে তার অনুমতি ছাড়াই প্রয়োজনীয় খরচাদি করার অনুমোদন দিয়েছেন। [সহিহ বুখারি : হাদিস নং ২৪৬০, কিতাবুল মাযালিম, বাবু কিসাসিল মাযলুম]

ইসলামগ্রহণের পর তার স্বামী আবু সুফিয়ান এবং ছেলে মুয়াবিয়া রা. নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আস্থা অর্জন করেন। তবে এটি অসম্ভব নয় যে, উক্ত বর্ণনাটি ইসলামের ব্যাপারে সুফিয়ানি কর্মকাণ্ডের কারণে প্রসিদ্ধি লাভ করে। [والله أعلم بالصواب]

তিনি তখন বললেন, ভাইয়ের কাফনের জন্য দুটি কাপড় নিয়ে এসেছি। এই নাও।'

মুসলমানরা ওই দুই কাপড়ে হামজা রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাফন পরানোর সময় আরেক আনসারির বিক্ষত লাশ দৃষ্টিগোচর হয়। তার জন্য কাফনের কাপড় রাখার কথা সাহাবায়ে কেরামের মনে ছিল না। ফলে হামজা রাদিয়াল্লাহু আনহুকে এক কাপড়ে এবং আনসারিকে আরেক কাপড়ে কাফন দেওয়া হয়।[৫০৫]

কে জিতলো আর কে হারলো?

এই যুদ্ধে মুসলমানদের প্রাণহানি হয়েছে অধিক পরিমাণে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে কুরাইশ বিজয়ী হয়েছে। কিন্তু এই বিজয় অর্ধেক ছিল। কারণ, মুসলমানদের হুকুমত এবং নেতৃত্ব সবই আপন অবস্থায় বহাল ছিল। মুসলমানরা শেষমুহূর্ত পর্যন্ত রণাঙ্গনেই অবস্থান করেছিলেন। তাদের কেউ-ই বন্দি হননি, আত্মসমর্পণও করেননি। সবচেয়ে বড় কথা হলো, মুসলমানরা তাদের জানবাজি রেখে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হেফাজত করেন। কুরাইশরা সর্বাত্মক চেষ্টা করেও তার পর্যন্ত পৌঁছাতে সক্ষম হয়নি। অথচ নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দুর্বলদিকগুলো সম্পর্কে মক্কার মুশরিকরা পূর্ণ ওয়াকিফহাল ছিল।

***

৫০৫. আলবিদায়া ওয়ান নিহায়া : ৫/৪২৬

গাজওয়ায়ে হামরাউল আসাদ

নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুশমনের হীনম্মন্যতা আরো বাড়িয়ে তুলতে এবং মুসলমানদের মনোবল চাঙ্গা করতে পরদিনই কুরাইশ বাহিনীর পশ্চাদ্ধাবন করার সিদ্ধান্ত নেন। আল্লাহ তায়ালার নির্দেশও এটিই ছিল। এর মধ্যে হেকমত ছিল যে, কুরাইশদের মনে সামনে অগ্রসর হয়ে যদিও মদিনা আক্রমণের কোনো বাসনা জাগ্রত হয়, তারপরও মুসলমানদের এই দুঃসাহস দেখে তারা ইচ্ছা পরিত্যাগ করতে বাধ্য হবে।

বাস্তবে এমনটিই ঘটল। যথেষ্ট পরিমাণ অগ্রসর হওয়ার পর কুরাইশের বিজয়ী সরদারদের তাদের অভিযানের অপূর্ণতার অনুভূতি জাগ্রত হলে, তারা মদিনায় অতর্কিত আক্রমণ করে লুটপাট করার দুরভিসন্ধি আঁটে। এই অবস্থায় অকস্মাৎ তাদের কাছে সংবাদ পৌঁছে যে, তাদের পশ্চাদ্ধাবনের জন্য নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাহিনী প্রস্তুত করছেন। এ কথা শুনে তারা মক্কা অভিমুখী হয়। তারপরও নবীজি হামরাউল আসাদ পর্যন্ত তাদের ধাওয়া করেন। এবং সেখানে তিনদিন অবস্থান করেন। যখন কুরাইশের মক্কা পৌঁছার ব্যাপারে আশ্বস্ত হন, তখন নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনায় ফিরে আসেন।

এই পশ্চাদ্ধাবনকেই গাজওয়ায়ে হামরাউল আসাদ বলে অভিহিত করা হয়। এই অভিযানে জাবির বিন আবদুল্লাহ রা. ছাড়া সকলেই উহুদযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী ছিলেন। তাদের অধিকাংশই ছিলেন আহত এবং ক্লান্ত-পরিশ্রান্ত। তারপরও এই নতুন অভিযান ছিল আত্মসমর্পণ, আত্মত্যাগ, আনুগত্য ও কুরবানির এক অবিস্মরণীয় উপমা।[৫০৬]

উম্মে উমারার স্পৃহা

উম্মে উমারা রাদিয়াল্লাহু আনহা যুদ্ধে ১২টি আঘাতপ্রাপ্ত হন।[৫০৭] তিনি শয্যাশায়ী ছিলেন। ইবনে কামিয়া তার কাঁধে যে আঘাত করেছিল, তার ক্ষত অনেক গভীর ছিল। ইতোমধ্যে মদিনার অলিগলিতে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘোষক আহ্বান করতে থাকে 'হামরাউল আসাদের দিকে চলো'।

উম্মে উমারা রাদিয়াল্লাহু আনহা এই ডাক শুনে সেই অবস্থাতেই যুদ্ধে যাওয়ার

---

৫০৬. তারিখে খলিফা বিন খাইয়াত, পৃষ্ঠা ৪৩, ৭৪, দারু তায়বা, রিয়াদ

৫০৭. তাবাকাতে ইবনে সা'দ : ৮/৪১৩

জন্য অস্থির হয়ে পড়েন। তিনি নিজেই কাপড় পরে উঠতে উদ্যত হন। কিন্তু ক্ষত কাঁচা থাকায় রক্ত ঝরতে শুরু করে। রাতভর তার ক্ষতস্থানে মলম, পট্টি লাগিয়ে রাখতে হতো।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হামরাউল আসাদ চলে যান। মদিনা ফিরে আসার পর তিনি আবদুল্লাহ বিন কাব নামক এক সাহাবিকে উম্মে উমারার খোঁজ-খবর নেওয়ার জন্য প্রেরণ করেন। যখন জানতে পারেন তিনি সুস্থ হচ্ছেন, নবীজি খুবই খুশি হন। উম্মে উমারা রাদিয়াল্লাহু আনহার কাঁধের জখম শুকাতে এক বছর লেগে যায়।[৫০৮]

***

৫০৮. তাবাকাতে ইবনে সা'দ : ৮/৪১৩

কয়েকটি গভীর ক্ষত

গাজওয়ায়ে উহুদে বিজয়ের পরও কুরাইশদের ইপ্সিত লক্ষ্য পূর্ণ হয়নি। মক্কা ফিরে যাওয়ার পর তাদের মধ্যে বিজয়ের কোনো প্রতিক্রিয়া দেখা যায়নি। এমনকি তারা শাম গমনকারী কাফেলার হেফাজতের জন্য কোনো কার্যকর ব্যবস্থাও গ্রহণ করতে পারেনি। দুই বছর পর্যন্ত তারা মদিনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার হিম্মত দেখায়নি। তবে তারা ইসলামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র আঁটতে পিছপা থাকেনি। কুরাইশের মিত্র কিংবা অধীনস্থ কবিলাগুলো মুসলমানদের উপর কয়েকটি গভীর আঘাত হানে।

রাজি ট্রাজেডি

৪ হিজরিতে মরুকবিলা আয্‌ল ও কারা'র কিছু লোক নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে এসে ইসলামের তালিম ও তাবলিগের (শিক্ষা ও প্রচার) জন্য কয়েকজন শিক্ষক পাঠাবার আবদার পেশ করে।[৫০৯]

---

৫০৯. সিরাতে ইবনে হিশাম : ২/১৬৯, ১৭০

ফায়দা : এখানে ওয়াকিদির এক রেওয়ায়েত দেখা দরকার। উক্ত রেওয়ায়েতে আছে, ঐ লোকদের বনু লাহয়ানের সরদাররা (যাদের কিছু আত্মীয়স্বজন বদরযুদ্ধে নিহত হয়েছিল) পাঠিয়েছে, যেন সাহাবায়ে কেরামকে নির্যাতন করে হত্যা করতে পারে, কিংবা কুরাইশের হাতে সোপর্দ করতে পারে। আর এভাবে তারা তাদের প্রতিশোধের আগুন প্রশমিত করতে সক্ষম হবে। [আলমাগাজি, ওয়াকিদি : ১/৩৫৪]

ফায়দা : সিরাতে ইবনে হিশামে [২/১৬৯] ঘটনাটি এভাবে এসেছে যে, আযল ও কারা'র কিছু বিশিষ্ট লোক নবীজির দরবারে এসে তাদের দীন শেখানোর জন্য শিক্ষক চায়। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের সাথে ছ'জন সাহাবিকে পাঠিয়ে দেন। তাঁদেরকেই তারা ধোঁকা দেয়। কিন্তু সহিহ বুখারিতে [হাদিস নং ৪০৮৬ بعث النبي سرية عينا] আছে তারা দশজন ছিলেন এবং নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁদেরকে গোয়েন্দাদল হিসেবে প্রেরণ করেছিলেন।

সাহাবিদের সংখ্যার ক্ষেত্রে বুখারির রেওয়ায়েতটিই বিশুদ্ধ। কিন্তু তারা কি শিক্ষক নাকি গোয়েন্দা হিসেবে প্রেরিত হয়েছিলেন? এক্ষেত্রে সিরাতগবেষকদের বর্ণনাও একেবারে প্রত্যাখ্যান করার মতো নয়।

অসম্ভব নয় যে, সেইসব সাহাবিকে তালিম-তাবলিগের পাশাপাশি পর্যবেক্ষণের দায়িত্বও অর্পণ করা হয়। তারা ঐ অঞ্চলে থেকে তৎপার্শ্ববর্তী কুরাইশের মিত্রকবিলাগুলোর খবরাখবরও মদিনায় পাঠাতে থাকেন।

হাফেজ ইবনে কাসির রহ. বুখারি ও ইবনে ইসহাকের রেওয়ায়েতের মাঝে ভিন্নতার দিকে ইঙ্গিত করার সাথে সাথে ইবনে ইসহাকের বর্ণনার মূল্যও তুলে ধরেছেন এভাবে :

আসিম বিন সাবিত রাদিয়াল্লাহু আনহুকে আমির নির্ধারণ করে দশজনের একটি দল ওই এলাকার উদ্দেশে পাঠিয়ে দেন। একে রাজির ঘটনা বলা হয়। সাহাবিদের এই কাফেলা যখন ওই অঞ্চলের রাজি নামক ঝর্নার নিকট পৌঁছে, তখন বনু লাহয়ান আযল ও কারার প্রায় একশ' তিরন্দাজকে নিয়ে তাদের ঘিরে ফেলে এবং বলে, 'তোমরা আমাদের কাছে আত্মসমর্পণ করো, আমরা ওয়াদা করছি যে, তোমাদের হত্যা করব না।'

আসিম বিন সাবিত রাদিয়াল্লাহু আনহু তাদের কথা শুনে সাথিদের বলেন, 'ভাইয়েরা আমার, আমি কোনো কাফেরের প্রতিশ্রুতি বিশ্বাস করি না। হে আল্লাহ, আমাদের অবস্থা আপনার নবীর নিকট পৌঁছে দিন।' এটুকু বলেই তিনি তার সাত সঙ্গীকে নিয়ে লড়াই করতে করতে শহিদ হয়ে যান।

কাফেররা লাশের সাথে বেআদবি করার ইচ্ছা করে। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা এক ঝাঁক ভীমরুল পাঠিয়ে দেন। ভীমরুল লাশগুলো ঘিরে ফেলে কাফেররা যেন শহিদদের লাশ স্পর্শ করতে না পারে।[৫১০]

কাফেররা ভোর হওয়ার অপেক্ষা করতে থাকে। কিন্তু রাতেই মুষলধারে বৃষ্টি হয়; অথচ তখন বৃষ্টির মৌসুম ছিল না। বৃষ্টির ঢলে লাশ ভেসে যায়। শহিদরা প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, মুশরিকদেরকে তাদের দেহ স্পর্শ করতে দেবেন না। আল্লাহ তায়ালা আপন কুদরত দ্বারা তাদের সেই প্রতিজ্ঞার লাজ রক্ষা করেছেন।[৫১১]

বাকি থাকে কেবল তিনজন- খুবাইব, আবদুল্লাহ বিন তারিক এবং যায়েদ বিন দাসিনা (রাদিয়াল্লাহু আনহুম)। কাফেররা তাদের জান রক্ষার ওয়াদা করে। ফলে তারা আত্মসমর্পণ করে। কিন্তু কাফেররা প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে তাদেরকে বন্দি করে মক্কায় পাঠিয়ে দেয়। কুরাইশ সরদাররা তাদের খরিদ করে নেয়। তারা বদরযুদ্ধে নিহত আত্মীয়স্বজনের খুনের বদলা নিতে পারবে এই সাহাবিদের থেকে।[৫১২]

على أن ابن إسحاق إمام في هذا الشأن وغير مدافع، كما قال الشافعي رحمه الله : من أراد المغازي فهو عيال على محمد بن إسحاق

[আলবিদায়া ওয়ান নিহায়া : ৫/৫০১]

৫১০. সহিহ বুখারি, বাবু গাজওয়াতির রাজি, তারিখু খলিফা বিন খাইয়াত, পৃষ্ঠা ৭৪, সিরাতে ইবনে হিশাম : ২/১৬৯

৫১১. আলমাগাজি, ওয়াকিদি : ১/৩৫৬

৫১২. সহিহ বুখারি, কিতাবুল মাগাজি, বাবু গাজওয়াতির রাজি, হাদিস নং ৪০৮৬, কিতাবুল জিহাদ, হাদিস নং ৩০৪৫

ইসলামের মহোত্তম চরিত্রের একটি উপমা

কুরাইশ সরদাররা সাহাবায়ে কেরামকে হত্যা করার জন্য হারাম মাসসমূহ অতিক্রান্ত হওয়ার অপেক্ষা করে।[৫১৩] খুবাইব রাদিয়াল্লাহু আনহু বদরযুদ্ধে হারিস বিন আমেরকে হত্যা করেছিলেন। নিহতের সন্তানরা তাকে ক্রয় করে পায়ে শেকল বেঁধে এক জায়গায় বন্দি করে রাখে। এই সময় তাকে মাঝেমধ্যে তাজা আঙুর খেতে দেখা যেত। অথচ তখন সে সময় মক্কাতে কোনো ফলফলাদিই ছিল না। এটি ছিল আল্লাহ তায়ালার গায়েবি নুসরত এবং সাহাবির কারামত। মহররম মাস শেষ হওয়ার পর তাকে হত্যা করার জন্য প্রস্তুত করা হয়।

খুবাইব রাদিয়াল্লাহু আনহু শাহাদাতের পূর্বে অবাঞ্ছিত লোম পরিষ্কার করার জন্য ক্ষুর চাইলে, তাকে দেওয়া হয়। ইত্যবসরে এক শিশু তার নিকট চলে যায়। তিনি বাচ্চাকে কোলে বসান। পরিবারের লোকেরা চিন্তিত হয়ে পড়ে যে, কয়েদির হাতে ক্ষুর, বাচ্চা তার কোলে; সে তার কোনো ক্ষতি করে ফেলে কিনা। খুবাইব রাদিয়াল্লাহু আনহু তাদের পেরেশানি দেখে বললেন, তোমরা কি আশঙ্কা করছ যে, আমি তাকে মেরে ফেলব? এটা কখনোই সম্ভব নয়।'

খুবাইব রাদিয়াল্লাহু আনহুর প্রাণ বাঁচানোর এটি সর্বশেষ মওকা ছিল। বাচ্চাটিকে জিম্মি করে তিনি পালিয়ে যেতে পারতেন। প্রাণ বাঁচানোর জন্য একটি বাচ্চাকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করা তার কাছে খুব নীচ কাজ মনে হলো। তিনি ইসলামের উন্নত আখলাক ও নৈতিকতাকে ভূলুণ্ঠিত হতে দিয়ে চাননি।

কাফেররা তাকে ধরে নিয়ে হারামের সীমানার বাইরে চলে যায়। তিনি শাহাদাতের পূর্বে দুই রাকাত নফল নামাজ আদায় করার ইচ্ছা ব্যক্ত করেন।

---

৫১৩. [قال ابن هشام : أقام خبيب في أيديهم حتى انقضت الأشهر الحرم ثم قتلوه]
সিরাতে ইবনে হিশাম : ২/১৭৪
দ্রষ্টব্য : অধিকাংশ সিরাত-লেখক লিখেছেন, এই মর্মান্তিক ঘটনা ৩ হিজরির সফর মাসের। কিন্তু এর উপর শক্তিশালী আপত্তি হয় যে, সফর মাস থেকে নিয়ে কয়েক মাস পর্যন্ত কোনো হারাম মাস নেই, যার ফলে কয়েদিদের হত্যার জন্য কুরাইশদের বিলম্ব করতে হবে। এর সমাধান হলো, উক্ত সফর মাসটি মাদানিপঞ্জিকা মোতাবেক, যা মক্কিপঞ্জিকা মোতাবেক যিলকদ মাস হয়। যেমন ওয়াকিদির বর্ণনায় 'হারাম মাস যিলকদে' এই শব্দ এসেছে। [আলমাগাজি, ওয়াকিদি : ১/৩৫৪]
আর যিলকদ দেখেই তাকে ৩ হিজরি হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। অথচ মাদানিপঞ্জিকা মোতাবেক তখন ৪র্থ হিজরির ২য় মাস চলছিল। এই ঘটনা ৩ হিজরির সফর মাসে কীভাবে হয়? অথচ এই ঘটনা গাজওয়া উহুদের পরে সংঘটিত হওয়ার ব্যাপারে সকলেই একমত। সহিহ বুখারিতে আছে, 'এটি উহুদের পর (হয়েছে)।' [সহিহ বুখারি, বাবু গাজওয়াতির রাজি] আর গাজওয়া উহুদ ৩ হিজরির শাওয়ালে হয়েছে। উক্ত ঘটনা ৩রা হিজরির যিলকদ মাসে সংঘটিত হয়েছে। মক্কাবাসী সাহাবায়ে কেরামকে যিলকদ, যিলহজ এবং মহররম মাস আটকে রেখে সফর (মক্কিপঞ্জিকা মোতাবেক, যা মাদানি ৪ হিজরি জুমাদাল উলা) মাসে শহীদ করে দেয়।

তিনি সংক্ষিপ্তভাবে দুই রাকাত নামাজ আদায় করে বললেন, 'তোমরা যদি ধারণা না করতে যে, আমি মৃত্যুর ভয়ে ভীত হয়ে পড়েছি, তবে আমি নামাজ দীর্ঘ করতাম।'

নিহত হওয়ার পূর্বে এই ঐতিহাসিক পঙ্‌ক্তিমালা আবৃত্তি করেন-

ولست أُبالي حين أُقتل مسلما * على أيِّ شِقٍّ كان لله مَصْرَعِي

وذاك في ذات الإله وإن يشأ * يُبارِك على أوصال شِلْوٍ مُمَزَّعِ

যখন আমি মুসলিম হিসেবে শহিদ হচ্ছি, তখন আমি কোনোরূপ ভয় করি না। আল্লাহর উদ্দেশ্যে আমাকে যেখানেই মাটিতে লুটিয়ে ফেলা হোক না কেন।

আমার এ মৃত্যু আল্লাহ তায়ালার জন্যই হচ্ছে। তিনি যদি ইচ্ছা করেন, তবে আমার দেহের প্রতিটি খণ্ডিত জোড়ায় বরকত দেবেন।[৫১৪]

রাসুলুল্লাহর প্রতি সাহাবিদের মহব্বতের বিস্ময়কর ঘটনা

যায়েদ বিন দাসিনা রাদিয়াল্লাহু আনহুকে হত্যা করার পূর্বে আবু সুফিয়ান তাকে পরীক্ষা করার জন্য বলে, যায়েদ, তোমার কি এটা পছন্দ যে, তোমার স্থানে মুহাম্মদকে কতল করা হোক?'

যায়েদ রাদিয়াল্লাহু আনহু উত্তর দেন, 'আল্লাহর কসম, আমি তো এটুকু বরদাশত করি না যে, তার পায়ে কাটা বিঁধবে, আর আমি ঘরে বসে আরাম করব।'

আবু সুফিয়ান বলে, 'আল্লাহর কসম, আমি এমন মহব্বত কাউকে করতে দেখিনি, মুহাম্মদকে তার সাথিরা যেমন মহব্বত করে।' এরপর যায়েদ রাদিয়াল্লাহু আনহুকে হত্যা করে দেওয়া হলো।

এটি ৪র্থ হিজরির জুমাদাল উলার (মক্কি সফর মোতাবেক) ঘটনা।[৫১৫]

বি'রে মাউনার মর্মান্তিক ঘটনা

ঐ সময়ই নজদের জনৈক অমুসলিম সরদার আবু বারা (আমির বিন মালিক) রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট কিছু সাহায্যকারী চায়, যাদের সহায়তায় তার প্রতিপক্ষ কবিলাগুলোকে পদানত করে, মদিনার বার্তা শুনিয়ে তাদেরকেও মিত্র বানাতে পারে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নজদবাসীর প্রতারণার আশঙ্কা ব্যক্ত করেন। কিন্তু আবু বারা নবীজিকে সবদিক থেকে আশ্বস্ত করে এবং তাদের হেফাজতের পূর্ণ জিম্মাদারি নেয়।

---

৫১৪. সহিহ বুখারি : হাদিস নং ৩০৪৫, ৪০৮৬, ৭৪০২, আলমুজামুল কাবির, তাবারানি : ২০/৩৫৬
৫১৫. সিরাতে ইবনে হিশাম : ২/১৭২

৪ হিজরির জুমাদাল উলাতে[৫১৬] রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সত্তরজন হাফেজ ও কারী সাহাবির একটি দল পাঠান, যারা ইবাদত ও মুজাহাদাতে উৎকর্ষ অর্জন করেছিলেন। তাদের মধ্যে মুনযির বিন আমর, হারাম বিন মিলহান, হারিস বিন সিম্মাহ এবং আমির বিন ফুহাইরাও শামিল ছিলেন। রাদিয়াল্লাহু আনহুম।

দলটি যখন বি'রে মাউনার কাছাকাছি পৌঁছে, তখন আমির বিন তুফাইল তাদের পথ রোধ করে। হারাম বিন মিলহান রাদিয়াল্লাহু আনহু আমিরকে বলেন, 'তোমাদের সঙ্গে তো আমাদের কোনো কাজ নেই। আমরা তো নবীজির একটি কাজে যাচ্ছি। বিশ্বাস না হলে আমাদের সঙ্গে তার লিখিত পত্র রয়েছে (তা দেখাবো)।' এ বলে হারাম বিন মিলহান রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের লিখিত পত্র পেশ করে। বদবখত পত্রের দিকে ভ্রুক্ষেপও করল না। কথাবার্তার মাঝেই এক ব্যক্তি পেছন থেকে তার ইশারায় হারাম বিন মিলহান রাদিয়াল্লাহু আনহুর পিঠে বর্শা গেঁথে দেয়। আর হারাম রাদিয়াল্লাহু আনহু অকপটে বলেন,

فُزْتُ وربِّ الكعبة!

কাবার রবের কসম, আমি সফল হয়ে গিয়েছি।

সঙ্গে সঙ্গে হারাম বিন মিলহান রাদিয়াল্লাহু আনহু বয়ে যাওয়া রক্ত হাতে নিয়ে তার চেহারা এবং মাথায় মেখে নেন।

আমির বিন তুফাইল তাকে শহিদ করার পর উসাইয়া, রি'ল, যাকওয়ান-সহ বিভিন্ন কবিলা থেকে সাহায্যকারীদের জমায়েত করে বাকি সাহাবিদেরও ঘিরে ফেলে। সাহাবিরা তরবারি হাতে বীরদর্পে লড়াই করে সকলেই শহিদ হয়ে যান।[৫১৭]

জাব্বার বিন সালামা হজরত আমির বিন ফুহাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহুর বুকে বর্শা নিক্ষেপ করে এফোঁড়-ওফোঁড় করে দেয়। তখন আমির রাদিয়াল্লাহু আনহু নিঃশ্বাস ফুরিয়ে যাওয়ার পূর্বে বললেন, 'আল্লাহর শপথ, আমি সফল হয়ে গেছি।'[৫১৮] এরপর তার লাশ আসমানের দিকে উড়তে উড়তে দৃষ্টির আড়াল হয়ে যায়। তারপর পুনরায় আপন জায়গায় ফিরে আসে।[৫১৯]

---

৫১৬. বিরে মাউনার ট্রাজেডি ঐ মাসেই হয়েছে, যখন কুরাইশ রাজি'র কয়েদিদের হত্যা করে। অর্থাৎ মাদানি ৪ হিজরি জুমাদাল উলা মোতাবেক মক্কি সফর ৪ হিজরি।

৫১৭. সহিহ বুখারি (কিতাবুল জিহাদ ওয়াস সিয়ার, বাবুল আওনি বিলমাদাদ, কিতাবুল মাগাজি, বাবু গাজওয়াতির রাজি ওয়া রি'ল ওয়া যাকওয়ান ও বি'রে মাউনা), সিরাতে ইবনে হিশাম : ২/১৮৪, ১৮৫

৫১৮. সিরাতে ইবনে হিশাম : ২/১৮৭

৫১৯. সিরাতে ইবনে হিশাম : ২/১৮৬

জাব্বার বিন সালামা বলেন, আমি অনুসন্ধান করতে লাগলাম কীসের উপর ভিত্তি করে সে বলেছে আমি সফল হয়ে গেছি এবং এর জন্য সে নিজেকে হাসিমুখে বিলীন করে দিয়েছে? অবশেষে মুসলমানদের থেকে জানতে পারলাম এটা হলো শাহাদাতের সফলতা। তখনই আমি মুসলমান হয়ে যাই।[৫২০]

বি'রে মাউনায় যখন সাহাবিদের গণহত্যা চলছে, তখন দুই সাহাবি আমর বিন উমাইয়া এবং মুনযির বিন মুহাম্মদ (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) উট চড়াতে বের হয়েছিলেন। তারা দূরাকাশে মরদেহ ভক্ষণকারী পাখি উড়তে দেখে বিপদ অনুভব করে সেদিকে দৌড়ে যান। নিকটবর্তী হওয়ার পর দেখতে পেলেন সাথিদের লাশ বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে রয়েছে, আর অশ্বারোহীরা তাদের ঘিরে আছে। আমর বিন উমাইয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, 'আমরা কি রাসুলুল্লাহকে এই সংবাদ অবহিত করব না?'

মুনযির বিন মুহাম্মদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, 'যেখানে এই মানুষগুলো শহিদ হয়েছেন, সেখান থেকে আমি এক চুলও নড়ব না।'

অবশেষে দুজনই দুশমনের উপর আক্রমণ করেন। মুনযির রাদিয়াল্লাহু আনহু শহিদ হয়ে যান। কিন্তু আমর বিন উমাইয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু জীবিত গ্রেফতার হন। আমির বিন তুফাইল জানতে পারে আমর বিন উমাইয়া মুযার গোত্রের। তখন সে বলে, 'আমার মায়ের উপর একটি গোলাম আজাদ করা কর্তব্য ছিল, তাই আমি একে আজাদ করে দিলাম।'[৫২১]

এই দুর্ঘটনায় আমর বিন উমাইয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু ছাড়াও দুই ব্যক্তি বেঁচে গিয়েছিলেন। প্রথমজন কাব বিন যায়েদ রাদিয়াল্লাহু আনহু। তিনি মারাত্মক আহত হয়েছিলেন। কাফেররা তাকে মৃত মনে করে লাশের মধ্যে ফেলে চলে যায়। এরপর তিনি সেখান থেকে বের হয়ে যান এবং পরবর্তী বছর তিনি গাজওয়ায়ে খন্দকে শহিদ হন।[৫২২]

দ্বিতীয়জন ছিলেন এক ল্যাংড়া সাহাবি। তিনি লড়াইয়ের শুরুতেই নিকটবর্তী পাহাড়ের চূড়ায় আশ্রয় নিয়েছিলেন। কাফেররা তার পর্যন্ত পৌঁছতে পারেনি।[৫২৩] এই ঘটনা বি'রে মাউনা ট্রাজেডি নামে প্রসিদ্ধি পায়।

বি'রে মাউনার শহিদরা শেষনিঃশ্বাস ত্যাগের পূর্বে দোয়া করেন,

---

৫২০. সিরাতে ইবনে হিশাম : ২/১৮৭

৫২১. সিরাতে ইবনে হিশাম : ২/১৮৫

৫২২. প্রাগুক্ত

৫২৩. সহিহ বুখারি : হাদিস নং ৩০৬৪ (কিতাবুল জিহাদ ওয়াস সিয়ার, বাবুল আওনি বিলমাদাদ, কিতাবুল মাগাজি, বাবু গাজওয়াতির রাজি ওয়া রি'ল ওয়া যাকওয়ান ও বি'রে মাউনা)

ألا بلِّغوا عنا قومَنا بأنَّا لَقِينا ربَّنا، فرضِي عنا وأرضانا

আমাদের পক্ষ থেকে আমাদের কওমকে জানিয়ে দিন যে, আমরা আমাদের রবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছি। তিনি আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে গেছেন এবং আমাদের সন্তুষ্ট করেছেন।

হজরত জিবরাইল আলাইহিস সালাম তাদের এই দোয়া রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট পৌঁছে দেন।

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনার সংবাদে ভীষণ মর্মাহত হন। একমাস পর্যন্ত ওই জালেমদের জন্য বদদোয়া করে কুনুতে নাজিলা পড়তে থাকেন। কারণ, তারা প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে অত্যন্ত নির্দয়ভাবে সাহাবায়ে কেরামকে শহিদ করে দিয়েছিল।[৫২৪] পাশাপাশি নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমর বিন উমাইয়া যামরি রাদিয়াল্লাহু আনহুকে একজন সঙ্গী দিয়ে আবু সুফিয়ানকে হত্যা করার জন্য গোপনে মক্কায় পাঠান। কিন্তু আবু সুফিয়ানের ভাগ্যে ইসলাম লেখা ছিল। মক্কাবাসী টের পেয়ে যায়। ফলে আমর বিন উমাইয়া এবং তার সাথি খুব কষ্টে প্রাণ নিয়ে ফিরে আসেন।[৫২৫]

***

৫২৪. সহিহ বুখারি : হাদিস নং ৩০৬৪ (কিতাবুল জিহাদ ওয়াস সিয়ার, বাবুল আওনি বিলমাদাদ, কিতাবুল মাগাজি, বাবু গাজওয়াতির রাজি ওয়া রি'ল ওয়া যাকওয়ান ও বি'রে মাউনা)

৫২৫. সিরাতে ইবনে হিশাম : ২/৬৩৩, দালাইলুন নুবুওয়াহ, বাইহাকি : ৩/৩৩৩

পূর্বাঞ্চলের অভিযান : জিহাদের বিস্তৃত পরিধি

ধোঁকা ও প্রতারণার মাধ্যমে সংঘটিত পরপর দুটি ঘটনায় সাহাবায়ে কেরামের শাহাদাত বরণ করার কারণে মুসলমানরা যদিও বাহ্যিকভাবে অত্যন্ত মর্মাহত হয়, কিন্তু বাস্তবে কাফেররা এর দ্বারা তাদের চরম বোকামির পরিচয় দেয়। এসব কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে তারা নিজেরাই মুসলমানদেরকে দূরদূরান্ত পর্যন্ত জিহাদি কার্যক্রমের পথ সুগম করে দিচ্ছিল।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জালেমদের উপর কুনুতে নাজেলা পড়েই ক্ষান্ত হননি, বরং অবাধ্য গোষ্ঠীগুলোর লাগাম টেনে ধরার জন্য তৎক্ষণাৎ দ্রুতগামী বাহিনী প্রেরণ করেন। তাদের উদ্দেশ্য ছিল বনু লাহয়ান এবং তাদের মিত্রগোষ্ঠী আযল ও কারা ছাড়াও মক্কার ঐসব সরদারকে সন্ত্রস্ত করা, যারা তিন সাহাবিকে হত্যা করার জন্য আযল ও কারা থেকে তাদের ক্রয় করে নিয়েছিল।

গাজওয়ায়ে বনু লাহয়ান

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বয়ং দুইশ মুজাহিদ (তন্মধ্যে ত্রিশজন অশ্বারোহী) নিয়ে অত্যন্ত দ্রুতগতিতে পূর্বদিকে যাত্রা করেন এবং নজদের 'সুখাইরাতুস সুমাম' এলাকায় পৌঁছান। আসিম বিন সাবিত রাদিয়াল্লাহু আনহু ও তার সঙ্গীদের হত্যাকারী বনু লাহয়ান এই বাহিনীর আগমনের সংবাদ শুনে অত্যন্ত বিচলিত হয় এবং বস্তি থেকে পালিয়ে পাহাড়ে আত্মগোপন করে।[৫২৬] নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উসফান পর্যন্ত যান, যা মক্কা থেকে কেবল ৩৬ মাইল (৫৮ কিলোমিটার) দূরে অবস্থিত।[৫২৭] এই অভিযানকে গাজওয়ায়ে বনু লাহয়ান বলা হয়। এটি এত দ্রুতগতির সফর ছিল যে, চৌদ্দ দিনের মধ্যে অভিযান সম্পন্ন হয়ে যায়।

---

৫২৬. আলমাগাজি, ওয়াকিদি : ২/৫৩৬, তারিখে খলিফা বিন খাইয়াত, পৃষ্ঠা ৭৭ টীকাসহ
ওয়াকিদি এই অভিযানের তারিখ ৬ হিজরির রবিউল আওয়াল বলেছেন। কিন্তু খলিফা বিন খাইয়াতের বক্তব্য অগ্রগণ্য। তিনি এই ঘটনাটি ৪ হিজরির জুমাদাল উলা মাসের অধীনে নকল করেছেন। সাহাবায়ে কেরামকে ধোঁকা দিয়ে হত্যা করার ঘটনা ৪ হিজরিতে হয়। এসব ঘটনার হোতাদের তাৎক্ষণিক শাস্তি দেওয়া আবশ্যক ছিল। একে দুই বছর পর্যন্ত বিলম্ব করা কোনোভাবেই উচিত হবে না।

৫২৭. তারিখে খলিফা বিন খাইয়াত, পৃষ্ঠা ৭৭ টীকাসহ

হজরত আবু বকরের মক্কার পার্শ্ববর্তী এলাকায় অভিযান পরিচালনা

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু দশজন সওয়ার নিয়ে মক্কার পার্শ্ববর্তী উপত্যকা 'গামিম' পর্যন্ত পৌঁছেন। মক্কাবাসী এই সংবাদ পেয়ে ভয় পেয়ে যায় যে, মুসলমানরা তাদের এলাকায়ও আক্রমণ করতে সক্ষম হয়ে গেছে।[৫২৮]

নজদ ও বাতনে উরানায় অতর্কিত আক্রমণ

কিছু মরুকবিলা মনে করতে থাকে মুসলমানরা উহুদযুদ্ধে পরাজিত হয়ে দুর্বল হয়ে পড়েছে। তাই বনু আসাদ নজদে এবং বনু হুযাইল মক্কার নিকটবর্তী বাতনে উরানাতে জোট বাঁধতে আরম্ভ করে। তারা পরিপূর্ণ জোটবদ্ধ হওয়ার আগেই নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের বিরুদ্ধে একসঙ্গে কয়েকটি সারিয়া প্রেরণ করেন। বনু আসাদ সন্ত্রস্ত হয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। অন্যদিকে বনু হুযাইল সরদার খালিদ বিন সুফিয়ান হজরত আবদুল্লাহ বিন উনাইসের সঙ্গে লড়াই করে নিহত হয়।[৫২৯]

অভিযানগুলোর প্রতিক্রিয়া

এই অভিযানগুলো থেকে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, গাজওয়ায়ে উহুদের পর মুসলমানরা নিস্তেজ হওয়ার পরিবর্তে ক্রমশ শক্তিশালী হয়ে উঠছে। ইতোপূর্বে ইসলামের পতাকা কেবল হিজাজ এলাকায় সীমিত ছিল। কিন্তু রাজি ও বি'রে মাউনা ট্রাজেডির পর পূর্বাঞ্চলীয় এলাকাগুলোতে আক্রমণের পথ উন্মুক্ত হয়ে যায়। যার পরপরই রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ৪ ও ৫ হিজরিতে একাধিক সারিয়া প্রেরণ করেন, আর কিছু অভিযানে নিজে নেতৃত্ব দেন। এই অভিযানগুলোর কারণে বিভিন্ন বিদ্রোহী কবিলা নিয়ে মক্কাবাসীরাও ভীষণ আতঙ্কিত হয়। যার ফলে তারা আর মুসলমানদের সাথে সামনা-সামনি মোকাবেলা করার দুঃসাহস করেনি।

---

৫২৮. আলমাগাজি, ওয়াকিদি : ২/৫৩৬

ওয়াকিদির অভিমত অনুযায়ী রওনা হওয়া থেকে মদিনায় প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত বনু লাহয়ানের অভিযান সম্পন্ন হতে পূর্ণ চৌদ্দ দিন অতিবাহিত হয়। ঐ অভিযানের তারিখ জুমাদাল উলা ৪ হিজরি মাদানি, যা মক্কি ৪ হিজরি মোতাবেক সফর মাস। আনুমানিক এই অভিযান মক্কি সফরের শেষের দিকে শুরু হয়ে মক্কি রবিউল আওয়ালের শুরুতে শেষ হয়।

৫২৯. তাবাকাতে ইবনে সা'দ : ২/৫০, ৫১

এই অভিযানের তারিখও বলা হয় যে, ৪ হিজরির সফর মাসে হয়েছে। আর তা নিশ্চিত মক্কি সফর এবং ৪ হিজরি জুমাদাল উলা মোতাবেক। অর্থাৎ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন বনু লাহয়ানের উদ্দেশ্যে বের হন, তখন তারই নির্দেশে সাহাবিদের একটি দল অন্য প্রান্তে হানা দেয়।

জিহাদের মাঝেই ইসলামের দাওয়াত

জিহাদের এই সফর দাওয়াতের জন্য অত্যন্ত উপকারী সাব্যস্ত হয়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সর্বোত্তম চরিত্র এবং দয়া-মায়ার প্রভাব সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। নজদ থেকে ফেরার পথে তীব্র তাপদাহের কারণে দ্বিপ্রহরের সময় কাফেলা এমন এক উপত্যকায় বিরতি নেয়, যেখানে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ছিল কাটাযুক্ত ঝোঁপঝাড়। ফলে সাহাবায়ে কেরাম ছায়া তালাশে এদিক-ওদিক ছড়িয়ে পড়েন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার তরবারিখানা একটি কাঁটাদার গাছের ডালে ঝুলিয়ে রেখে সেই গাছের ছায়ায়ই শুয়ে পড়েন। আচমকা এক গ্রাম্য লোক অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে সেখানে পৌঁছে নবীজির তরবারি কোষমুক্ত করে। তরবারির আওয়াজে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চোখ খুলে যায়। তিনি তাকিয়ে দেখেন একজন গ্রাম্য লোক খোলা তলোয়ার নিয়ে মাথার কাছে দাঁড়িয়ে আছে।

সে তখন বলতে লাগল, 'এবার আমার হাত থেকে তোমাকে কে বাঁচাবে?'

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিশ্চিন্ত মনে উত্তর দেন, 'আল্লাহ!'

গ্রাম্য লোকটি একাধিকবার এই প্রশ্ন করে, নবীজিও তার একই উত্তর দেন। তখন লোকটির উপর এত ভয়-আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে যে, তার হাত থেকে তরবারি পড়ে যায়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তরবারি উঠিয়ে বললেন, 'এবার তোমাকে আমার হাত থেকে কে বাঁচাবে?'

সে অনুতপ্ত হয়ে বলে, 'আপনি উত্তম শাস্তিদাতা হয়ে যান।'

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'তুমি কি সাক্ষ্য দাও যে, আল্লাহ তায়ালা ছাড়া কোনো উপাস্য নেই?'

সে বলল, না, তবে আমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি আমি আপনার বিরুদ্ধে লড়াই করব না, এবং আপনার বিরুদ্ধে যারা যুদ্ধ করে, তাদের সঙ্গও দিব না।' এই পর্যায়ে সাহাবায়ে কেরাম ঘুম থেকে উঠে ঘটনাস্থলে পৌঁছে যান। তারা দেখলেন, এক অপরিচিত গ্রাম্য লোক তার পাশে উপবিষ্ট। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকে পুরো ঘটনা শোনান। তিনি সক্ষমতা সত্ত্বেও লোকটিকে শাস্তি না দিয়ে ক্ষমা করে দেন। সে তার কওমের কাছে গিয়ে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উত্তম আখলাকের কথা আলোচনা করে বলে, 'আমি একজন উত্তম মানুষের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে এসেছি।'[৫৩০]

***

৫৩০. মুসনাদে আহমদ : হাদিস নং ১৪৯২৯, সহিহ বুখারি : হাদিস নং ২৯১০ (কিতাবুল জিহাদ : হাদিস নং ১৪৩৬), সহিহ মুসলিম : হাদিস নং ৬০৯০

ইহুদিদের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় অভিযান গাজওয়ায়ে বনু নাজির

নজদ অভিযান থেকে ফেরার পর বহিঃআক্রমণের ঝুঁকি কমে গিয়েছিল। এবার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অভ্যন্তরীণ শক্তি দমন করতে মনোযোগী হন। মদিনার দক্ষিণে বসবাসকারী ইহুদি গোত্র বনু নাজিরকে দেশান্তর করা আবশ্যক হয়ে পড়েছিল। কারণ, মদিনাসনদ অনুযায়ী উহুদযুদ্ধে ইহুদিদের মুসলমানদের সঙ্গে থাকার কথা ছিল। কিন্তু তারা নিরপেক্ষতা অবলম্বন করে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেছে।

নবীজির দৃষ্টিভঙ্গি ছিল ইহুদি কবিলাগুলোকে একসঙ্গে নয়; বরং একটি একটি করে সুযোগমতো তাদের অপরাধ ও ষড়যন্ত্র হাতে-নাতে ধরে ধরে শাস্তি দিয়ে দেশান্তর করা। প্রথমে বনু কাইনুকা এক মুসলিম নারীর শ্লীলতাহানি করে। ফলে তাদের শাস্তি দেওয়া হয়।

বনু নাজিরের সরদার সাল্লাম বিন মিশকামের ছিল মক্কার কুরাইশের সঙ্গে খুব দহরম-মহরম সম্পর্ক। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ধৈর্য ধরেন। কিন্তু একপর্যায়ে সে অমার্জনীয় দুঃসাহস দেখায়। এক উপলক্ষ্যে তার এলাকায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দাওয়াত দেয় এবং আলোচনার ফাঁকে তাকে হত্যার ষড়যন্ত্র আঁটে। তার চক্রান্ত ফাঁস হয়ে যাওয়ার পর নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তৎক্ষণাৎ মুজাহিদ তলব করেন এবং ৪ হিজরি ১২ রবিউল আওয়াল বনু নাজিরের দুর্গ অবরোধ করেন। তেইশ দিন পর বনু নাজির অস্ত্রসমর্পণ করে। তাদেরকে দেশান্তর করা হয়।

তাদের কেউ কেউ মদিনার উত্তরপূর্ব ৯০ মাইল (১৪৪ কিলোমিটার) দূরে অবস্থিত 'খাইবার' অভিমুখী হয়, আর কিছু ইহুদি শামের সীমান্তে চলে যায়।[৫৩১]

গাজওয়ায়ে বদরুল মাওইদ (যুলকাদা ৪ হিজরি)

গাজওয়ায়ে বনু লাহয়ান এবং গাজওয়ায়ে বনু নাজিরের ফলে কুরাইশের মধ্যে এত ভয়-ভীতি ছড়িয়ে পড়ে যে, তারা মুসলমানদের এক বড় পরাশক্তি ভাবতে থাকে। উহুদযুদ্ধ সমাপ্ত হওয়ার পর কুরাইশের দেওয়া চ্যালেঞ্জ অনুযায়ী নবী

৫৩১. সিরাতে ইবনে হিশাম : ২/১৯০-১৯২, তাবাকাতে ইবনে সা'দ : ২/৫৭, আলমুহাব্বার, পৃষ্ঠা ১১৩। এটি মাদানি জুমাদাল আখিরা মোতাবেক মক্কি রবিউল আওয়াল ছিল।

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ৪ হিজরির যিলকদ মাসে দেড় হাজার সাহাবি নিয়ে বদরপ্রান্তরে এসে পৌঁছেন। কুরাইশরা তখন ময়দান পর্যন্ত আসার সাহস করেনি। কুরাইশ বাহিনী মাররুয যাহরান পর্যন্ত এসে ফিরে যায়। মুসলমানরা আটদিন পর্যন্ত সেখানে অবস্থান করেন। কিন্তু কুরাইশরা তাদের মোকাবেলায় আসেনি। মুসলমানরা তাদের সঙ্গে ব্যবসায়ী পণ্যও নিয়ে এসেছিলেন। ফলে বদরের বাজারে খুব মুনাফা উপার্জন করে তারা ফিরে যায়।[৫৩২]

ইহুদি আবু রাফের হত্যা (যিলহজ ৪ হিজরি)

খাইবারের ইহুদি সরদার আবু রাফে সাল্লাম বিন আবুল হুকাইক নতুন করে তার দুর্গকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে চক্রান্তের কেন্দ্রে পরিণত করে। এই সংবাদ মদিনায় পৌঁছে। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হুকুমে আবদুল্লাহ বিন আতিক রাদিয়াল্লাহু আনহু কয়েকজন সাথি নিয়ে তাকে হত্যা করার জন্য যান।

সন্ধ্যাবেলা তার দুর্গের বাইরে এমনভাবে বসেন যে, দেখে মনে হচ্ছিল যেন তিনি প্রাকৃতিক প্রয়োজন পূরণের জন্য বাইরে এসেছেন। ফটকরক্ষী দরজা বন্ধ করার পূর্বে তাকে দুর্গের অধিবাসী মনে করে হাঁক ছেড়ে বলে, 'এই, ভেতরে এসে পড়।' তিনি ভেতরে গিয়ে কোনো এক জায়গায় লুকিয়ে থাকেন। রাতে সুযোগ পেয়ে আবু রাফের বিশ্রামের কামরায় ঢুকে তাকে হত্যা করে বের হওয়ার সময় সিঁড়িতে পিছলে গিয়ে তার পায়ের গোড়ালি ভেঙে যায়। সাথিরা তাকে মদিনায় নিয়ে আসে। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার ক্ষতস্থানে থুথু লাগিয়ে দিলে ক্ষত সম্পূর্ণ ভালো হয়ে যায়।[৫৩৩]

---

৫৩২. সিরাতে ইবনে হিশাম : ২/২০৯, তাবাকাতে ইবনে সা'দ : ২/৫৯, ৬০। এই ঘটনা মাদানি যিলকদ মোতাবেক মক্কি শাবান ছিল। [আলমুহাব্বার, পৃষ্ঠা ১১৩]

৫৩৩. সহিহ বুখারি : হাদিস নং ৪০৩৯ (বাবু কাতলি আবি রাফি)। এই অভিযান ওয়াকিদির মত অনুযায়ী ৪ থেকে ১৪ যিলহজে সংঘটিত হয়েছে। [আলমাগাজি : ১/৩৯১]
ইবনে সা'দের মত অনুযায়ী তা ৬ হিজরির রমজানে হয়েছে। [তাবাকাতে ইবনে সা'দ : ২/৯১]==
==তবে ৬ষ্ঠ হিজরির বক্তব্য সম্পূর্ণ ভুল। বাকি ভিন্নতাগুলো মক্কি-মাদানি পঞ্জিকা অনুযায়ী। সেই বছর মাদানি যিলহজ এবং মক্কি রমজান ছিল।

উত্তরাঞ্চলের অভিযান

[৫ম হিজরি]

৫ম হিজরিতে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তরদিকেও অভিযান পরিচালনা শুরু করেন। তারই ধারাবাহিকতায় হজরত যায়েদ বিন হারিসা রাদিয়াল্লাহু আনহুর নেতৃত্বে শামে যাওয়ার প্রধান রাস্তায় অবস্থিত ওয়াদিল কুরার দিকে বাহিনী পাঠান। এখানকার সরদার হুনাইদ বিন আরিয রাহাজানি করে রাস্তা অনিরাপদ করে তুলেছিল।

যায়েদ বিন হারিসা রাদিয়াল্লাহু আনহু পাঁচশ অশ্বারোহী নিয়ে তার বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করেন। মুসলমানদের আক্রমণে হুনাইদ মারা যায় এবং তার সকল সম্পদ মুসলমানরা গনিমত হিসাবে অর্জন করে।[৫৩৪]

গাজওয়ায়ে দুমাতুল জানদাল

৫ম হিজরির ২৫ রবিউল আওয়াল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেই দীর্ঘ সফরে বের হন এবং উত্তরদিকে দুমাতুল জানদালের এলাকাগুলোতে হানা দেন। এ স্থানটি ছিল দামেশক থেকে মাত্র পাঁচ মঞ্জিল দূরে; এবং এটা ইরাক, শাম ও আরবের বাণিজ্য কাফেলাগুলোর সদর রাস্তা হিসেবে ব্যবহৃত হতো। এই এলাকার স্থানীয় বাসিন্দাদের 'নাবাতি' বলা হতো। তারা শাম থেকে ছাতু, যায়তুন তেলসহ বিভিন্ন খাদ্যদ্রব্য হিজাজ নিয়ে আসত।

কিছুদিন যাবৎ রোমানরা শামের সীমান্তে সেনাবাহিনী নিযুক্ত করে নাবাতিদের বাণিজ্যপথে বাধা সৃষ্টি করছিল। এতে করে মদিনার জীবিকার উপর নেতিবাচক প্রভাব পড়তে থাকে। শোনা যাচ্ছিল রোমানরা মদিনার দিকেও অগ্রসর হওয়ার ইচ্ছা করছে। এজন্য প্রয়োজন ছিল অগ্রসর হয়ে জাজিরাতুল আরবের সীমান্তেই রোমানদের পদচারণা রুখে দেওয়া।

নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ১ হাজার মুজাহিদ নিয়ে এই অভিযানে বের হন। অগ্রযাত্রা গোপন রাখার উদ্দেশ্যে তিনি কেবল অপ্রসিদ্ধ রাস্তাই বেছে নেননি; বরং সফর করতেন রাত্রিবেলা। বনু উযরার এক পথ প্রদর্শক মুসলমানদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যায়।

---

৫৩৪. তারিখে খলিফা বিন খাইয়াত, পৃষ্ঠা ৭৭, তাবাকাতে ইবনে সা'দ : ২/৮৮। ইবনে সা'দের তারিখ ৬ হিজরির জুমাদাল আখিরা বলে উল্লেখ করেছেন।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুশমনের মাথার উপর গিয়ে উপস্থিত হন এবং তাদের গবাদিপশু ও ফসলাদির উপর হানা দেন। রোমানরা এই হামলার সংবাদ শুনেই উর্ধ্বশ্বাসে পালায়। নবীজি আশপাশের বস্তিগুলোতে ছোট ছোট দল প্রেরণ করে তাদের আনুগত্য আদায় করেন এবং সেখানে কয়েকদিন অবস্থান করার পর মদিনায় ফিরে আসেন। কেননা, হুকুমতের দেখাশোনা করা ছিল এর চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। ২০ রবিউল আখির এই কাফেলা মদিনায় প্রত্যাবর্তন করেন।

এটি ছিল নবী-জীবনের সবচেয়ে দীর্ঘ ও দ্রুততম সফর। এই গাজওয়া কেবল জাজিরাতুল আরবের এলাকাসমূহেই ইসলামের শান-শওকত বৃদ্ধি করেনি; বরং পারস্যের শাসক, শামে রাজত্বকারী রোমান বাইজেন্টাইন সম্রাটদের মনেও এই অনুভূতি জাগ্রত করতে সক্ষম হয় যে, শীঘ্রই আরবে মুসলমানদের চাকা সচল হতে যাচ্ছে।[৫৩৫]

***

৫৩৫. আলমাগাজি, ওয়াকিদি : ১/৪০২, ৪০৩; আলবিদায়া ওয়ান নিহায়া : ৬/১০৬

গাজওয়ায়ে বনু মুসতালিক এবং ইফকের ঘটনা

[শাবান ৫ম হিজরি]

৫ম হিজরির জুমাদাল আখেরাতে চন্দ্রগ্রহণ হয়।[৫৩৬] এ বছরেরই শাবান মাসে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দক্ষিণদিকে 'মুরাইসি' নামক ঝর্নার দিকে রওনা হন। সেখানে বনু মুসতালিক সরদার হারিস বিন আবু জিরার খুযাঈ মুসলমানদের বিরুদ্ধে একটা সশস্ত্র দল জমায়েত করছিল।[৫৩৭] নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শত্রুদের তৈরি হওয়ার পূর্বেই পৌঁছে যান। মুসলমানদের প্রচণ্ড আক্রমণের মুখে বনু মুসতালিক হাতিয়ার ফেলে দেয়।

ঘটনাস্থলেই বনু মুসতালিক-সরদার হারিস বিন জিরারের কন্যা জুওয়াইরিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহা ইসলাম গ্রহণ করেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার সম্মানে তাকে বিয়ে করেন। মুসলমানরা এই মহান সম্পর্কের কারণে বনু মুসতালিকের সকল কয়েদিকে মুক্ত করে দেয়, গনিমতের মালও ফেরত দেয়।

---

৫৩৬. সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ : ১২/৬৭। এটি মাদানি পঞ্জিকা অনুযায়ী যা ৯ নভেম্বর ৬২৬ খ্রিষ্টাব্দ।

৫৩৭. গাজওয়া বনু মুসতালিককে গাজওয়া মুরাইসিও বলা হয়। তার তারিখ নির্ধারণে দু'টি বক্তব্য রয়েছে। এক ইবনে ইসহাক বলেন, ৬ষ্ঠ হিজরিতে হয়েছে। [সিরাতে ইবনে হিশাম : ২/২৮৯]

ওয়াকিদি ৫ হিজরির শাবান মাসে হয়েছে বলে উল্লেখ করেন [তাবাকাতে ইবনে সা'দ : ২/৬৩]। একাধিক ঐতিহাসিক ইবনে ইসহাকের মতটি প্রাধান্য দিয়ে এই গাজওয়াকে ৬ হিজরির অধীনে উল্লেখ করেছেন; তবে এটি সঠিক মনে হচ্ছে না। কারণ, উক্ত গাজওয়া থেকে ফেরার পরই হজরত আয়েশা রা. এর উপর অপবাদের ঘটনা ঘটে, যেসময় প্রসিদ্ধ আনসারি সাহাবি সাদ বিন মুআজ রা. জীবিত ছিলেন [সহিহ বুখারি; কিতাবুত তাফসির, বাবুন ইন্নাল্লাযিনা য়ুহিব্বুনা আন তাশিআল ফাহিশাতু...]। তিনি ৫ হিজরির যিলকদ মাসে বনু কুরাইজার ইহুদিদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত দেওয়ার পর মারা যান। [সহিহ বুখারি, কিতাবুল মাগাজি, বাবু মারজিয়িন নাবিয়্যি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিনাল আহযাব]

তাই ইবনে ইসহাকের মত অনুযায়ী যদি গাজওয়া বনু মুসতালিক এবং ইফকের ঘটনা ৬ হিজরিতে ধরা হয়, তা হলে সহিহ বুখারির কিতাবুত তাফসিরের ঐ রেওয়ায়েতের ব্যাপারে কী বলা হবে, যেখানে সাদ বিন মুআজ রা. ইফকে জড়িত ব্যক্তিদের গরদান উড়িয়ে দেওয়ার অনুমতি চেয়েছিলেন? এই বর্ণনাই প্রমাণ করে যে, ইফকের ঘটনা এবং গাজওয়া মুরাইসি সাদ রা. এর জীবদ্দশায় (গাজওয়া খন্দকের পূর্বে) সংঘটিত হয়েছিল। আর এ কারণেই ইমাম জাহাবি রহ. 'তারিখুল ইসলাম' গ্রন্থে ৫ হিজরির ঘটনাবলির শুরুতেই গাজওয়া মুরাইসি এবং ইফকের ঘটনা, তারপর গাজওয়া খন্দকের আলোচনা করেন।

হারিস বিন জিরারও তার কবিলার সবাইকে নিয়ে মুসলমান হয়ে যান এবং নিজেদের পরিপূর্ণ মুসলমান প্রমাণ করেন।[৫৩৮]

মুনাফিকদের ভ্রষ্টাচার

যেহেতু এই গাজওয়াতে লড়াইয়ের ঝুঁকি কম ছিল এবং গনিমতের মাল পাওয়ারও সম্ভাবনা ছিল, তাই আবদুল্লাহ বিন উবাই মুনাফিকদের বড় একটি দল নিয়ে মুসলিম-বাহিনীতে শরিক হয়। তারা বুঝতে পেরেছিল যে, কোনো বহিঃশক্তি মুসলমানদের অবদমিত করতে পারবে না। ভেতর থেকেই তাদের ধীরে ধীরে ক্ষয় করে ফেলতে হবে। তাই সে এই গাজওয়াতে শামিল হয়ে মুসলমানদের পরস্পরের মধ্যে বিদ্বেষ সৃষ্টি করার সুযোগ খুঁজতে থাকে।

মুসলমানরা বনু মুসতালিককে পরাজিত করে মুরাইসি ঝর্নার কিনারে এসে যাত্রাবিরতি নিয়েছে। একদিন ঝর্না থেকে পানি নেওয়ার সময় এক মুহাজির ও আনসারের মাঝে একটা কথা নিয়ে ঝগড়া হয়। তখন একজন সাহায্যের জন্য তার সাথিদের ডাকতে থাকে 'কোথায় মুহাজিররা!' অপরজন ডাকতে থাকে 'কোথায় আনসারিরা!' নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এই সংবাদ পৌঁছে যায়। ফলে তিনি দ্রুত সেখানে উপস্থিত হয়ে বলেন, 'এ ধরনের স্লোগান পরিত্যাগ কর। এটা দুর্গন্ধময়।'[৫৩৯]

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নসিহত শুনে মুসলমানরা শান্ত হয়ে যায়। কিন্তু আবদুল্লাহ বিন উবাই এই ঘটনা উসকে দিতে চাইল। সে মুহাজিরদের বিরুদ্ধে আনসারদের ক্ষেপিয়ে তুলতে থাকে।

সে বলে, 'তোমরাই নিজেদের উপর বিপদ টেনে এনেছ। তাদেরকে তোমরা নিজেদের শহরে স্থান দিয়েছ, নিজের সম্পদে ভাগ দিয়েছ। তাদের সাথে তোমাদের আচরণ তো ওই প্রবাদের সঙ্গে মিলে যায় যে, তোমার বাড়ির কুকুরকে খাইয়ে মোটাতাজা করলে, আর সে কুকুরই তোমাকে কামড় দিল। তোমরা যদি তাদের ব্যয়ভার বহন করা ছেড়ে দাও, তা হলে এরা নিজেরাই পালিয়ে যাবে। খোদার কসম, মদিনা পৌঁছে সম্মানিত ব্যক্তিরা ইতর শ্রেণির লোকদের বহিষ্কার করবে।'

একজন কমবয়সি সাহাবি যায়েদ বিন আরকাম রাদিয়াল্লাহু আনহু তাদের এই কথাবার্তা শুনে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অবগত করেন।

---

৫৩৮. আলবিদায়া ওয়ান নিহায়া : ৬/১৮১। এই সফরটি ২৯দিনব্যাপী ছিল। ২শাবান (মাদানি) রওনা এবং ১লা রমজানে প্রত্যাবর্তন। [আলমাগাজি, ওয়াকিদি : ১/৪০৪]

৫৩৯. সহিহ বুখারি : হাদিস নং ৪০৯৫, ৪৯০৭ (কিতাবুত তাফসির, সুরা মুনাফিকুন), সহিহ মুসলিম : হাদিস নং ৬৭৪৮ (আলবিরর ওয়াস সিলাহ, বাবু নাসরিল আখ)

উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তখন ক্রুদ্ধ হয়ে আবদুল্লাহ বিন উবাইয়ের মাথা উড়িয়ে দেওয়ার অনুমতি চান। কিন্তু নবীজি এ বলে তাকে বাধা দেন যে, 'লোকেরা বলাবলি করবে, মুহাম্মদ তার লোকদেরই হত্যা করেছে।'

ওদিকে আবদুল্লাহ বিন উবাই চাতুর্যের আশ্রয় নিয়ে শপথ করে নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করে এবং বলে, 'সম্ভবত ওই বালকের মধ্যে কোনো ভুল ধারণা সৃষ্টি হয়েছে।'

যেহেতু পরপর দুটি অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনার কারণে বাহিনীর মধ্যে একরকম অস্থিরতা বিরাজ করছিল; তাই নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অভ্যাস পরিপন্থি বাহিনীকে তৎক্ষণাৎ মদিনা ফিরে যাওয়ার নির্দেশ দেন।

সময়টা ছিল দ্বিপ্রহর। বাহিনীর সবাই সফর করে ভোরবেলা অনেক ক্লান্ত হয়ে পড়ে। কিন্তু নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাহিনীকে থামার অনুমতি দেননি। যখন দিনের আলো পূর্ণ উদ্ভাসিত হয়, সূর্যের তাপ বৃদ্ধি পায়, তখন বিরতি দেওয়ার আদেশ করেন। এই দ্রুতগামিতার কারণে মুসলমানরা এতই পরিশ্রান্ত হয়ে পড়ে যে, কাফেলা বিরতি নিতেই সকলে গা এলিয়ে দেয়। গতকালের ঘটনা সম্পর্কে পর্যালোচনা করার কোনো ফুরসতই তারা পায়নি। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামেরও এটিই উদ্দেশ্য ছিল। কারণ, এর দ্বারা একে অপরের প্রতি মন্দ ধারণা সৃষ্টি হবে ও গিবতের পরিবেশ তৈরি হবে।[৫৪০]

মুসলিম-বাহিনী মদিনায় পৌঁছার পূর্বে আরো দুটি ঘটনা ঘটে। একরাতে কোনো এক জায়গায় বিরতির সময় আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা প্রাকৃতিক প্রয়োজন সারার জন্য কাফেলা থেকে দূরে চলে যান। সেখানে তার গলার হার হারিয়ে যায়। তিনি হারটি তালাশ করছিলেন। এদিকে কাফেলার রওনা হওয়ার সময় হলে লোকেরা হাওদা উঠিয়ে উটের উপর রেখে দেয়। যেহেতু তিনি হালকা গড়নের ছিলেন; তাই কেউ বুঝতে পারেনি যে, হাওদায় আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা নেই। এই অবস্থায়ই কাফেলা রওনা হয়ে যায়।

আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা যখন বিরতির জায়গায় পৌঁছেন, তখন কাফেলা খুঁজে পাননি। ফলে তিনি সেখানেই বসে পড়েন। ভাগ্য ভালো ছিল যে, সাফওয়ান বিন মুআত্তাল নামক এক সাহাবি পেছনে পেছনে আসছিলেন। তিনি আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহাকে নিজের উটের উপর বসিয়ে নিজে পায়দল চলতে চলতে কাফেলার সঙ্গে যুক্ত হন।[৫৪১]

---

৫৪০. সিরাতে ইবনে হিশাম : ২/২৯০, ২৯১

৫৪১. সহিহ বুখারি : হাদিস নং ২৬৬১ (কিতাবুশ শাহাদাত, বাবু তা'দিলিন নিসা)

দ্বিতীয় ঘটনাটি ছিল সুরা মুনাফিকুন অবতীর্ণ হওয়া। এ সুরায় আবদুল্লাহ বিন উবাই এবং মুনাফিকদের মুখোশ উন্মোচন করে দেওয়া হয়। কুরআন কারিমে আবদুল্লাহ বিন উবাইয়ের অবমাননাকর বাক্যটিও উল্লেখ করা হয়েছে, যা যায়েদ বিন আরকাম রাদিয়াল্লাহু আনহু নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অবগত করেছিলেন।

ইবনে উবাইয়ের ছেলে আবদুল্লাহ খাঁটি মুসলমান ছিলেন। পিতার এহেন জঘন্য অপরাধের কথা জানতে পেরে নবীজির নিকট তার মাথা কেটে আনার অনুমতি প্রার্থনা করলে তিনি নিষেধ করেন। তা সত্ত্বেও তিনি ক্রোধ ও অনুতাপে জ্বলতে জ্বলতে তরবারি কোষমুক্ত করে মদিনার রাস্তায় দাঁড়িয়ে যান। যখন তার পিতার সওয়ারি নিকটে আসে, তার গতিরোধ করে বলেন, 'আমি আপনাকে ততক্ষণ পর্যন্ত যেতে দেব না, যতক্ষণ না আপনি আপনার মুখ দিয়ে বলবেন যে, আপনি ইতর এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্মানিত।'

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা দেখে আবার তাকে নম্রতা প্রদর্শনের নির্দেশ দেন।[৫৪২]

ইফকের ঘটনা

মদিনায় পৌঁছার পর মুসলমানরা তাদের স্বাভাবিক জীবনযাপন করতে থাকে। নামাজ, তালিম, দীনের মজলিস এবং ইসলামের দাওয়াতি কার্যক্রম সবকিছুই পূর্বের মতো চলছিল। আবদুল্লাহ বিন উবাই চরম অপমানিত হয়েছিল। ফলে সে আহত সাপের মতো অস্থির সময় পার করছিল। একদিন তার মনে শয়তানি কুমন্ত্রণা আসে যে, আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) তো একরাতে বাহিনী থেকে পেছনে পড়ে যাওয়ার দরুন সাফওয়ান বিন মুআত্তাল রা. এর সঙ্গে এসেছে। এটাকে নবী-পরিবারকে কলঙ্কিত করার ক্ষেত্রে কাজে লাগানো যায়। ইবনে উবাই এই শয়তানি কুমন্ত্রণাকে বাস্তবে রূপ দেয়। সে ওই রাতের ঘটনা নিয়ে আয়েশা ও সাফওয়ানের ব্যাপারে কুৎসা রটাতে থাকে। এই কথা মদিনাবাসীর কাছে খড়ে আগুন লাগার মতো ছড়িয়ে পড়ে।

অধিকাংশ সাহাবি এই ঘটনা অবিশ্বাস করে একে জঘন্য ও মিথ্যা অপবাদ বলে ব্যক্ত করেন। তবে সরলপ্রকৃতির কিছু মুসলমান মেনে নেয় এবং তা প্রচারও করে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুনাফিকদের লাগানো এই আগুনে দগ্ধ হন। দুশ্চিন্তায় বিমর্ষ হয়ে পড়েন। তিনি কল্পনাও করেননি যে, মুনাফিকরা তার নম্রতা ও অনুগ্রহের প্রতিদান এভাবে দেবে।

---

৫৪২. সিরাতে ইবনে হিশাম : ২/২৯১, ২৯২

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার দুশ্চিন্তা ভাগাভাগি করার জন্য সাহাবায়ে কেরামকে মসজিদে জমায়েত করে ঘোষণা দেন যে, আমার স্ত্রী এবং আমার সাহাবি সাফওয়ান বিন মুআত্তাল উভয়ের প্রতি আমার পূর্ণ আস্থা রয়েছে। সাহাবিগণও উম্মুল মুমিনিনের পবিত্রতা ও আভিজাত্যের ব্যাপারে পূর্ণ আস্থার বহিঃপ্রকাশ করেন। আউস গোত্রের সরদার সা'দ বিন মুআজ রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, 'এসব কথা রটনাকারীদের কেউ যদি আউস গোত্রের হয়, তা হলে তার মাথা উড়িয়ে দেওয়া হবে। আর খাযরাজের কেউ হলে আপনি হুকুম করুন, আমরা নির্দেশ পালন করব।'

খাযরাজের সরদার সা'দ বিন উবাদাহ রাদিয়াল্লাহু আনহুও অন্যান্য সাহাবায়ে কেরামের মতো আবেগে উদ্বেলিত হয়ে নিজের কবিলার ব্যাপারে অত্যন্ত কঠিন কথা উচ্চারণ করেন। উভয় কবিলা মারমুখী অবস্থানে উপনীত হওয়ার উপক্রম হয়। মুনাফিকদের মনোবাসনা এটাই ছিল। কিন্তু রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এনে সবাইকে ঠান্ডা করে মুসলমানদের ঐক্য বহাল রাখেন।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পদস্খলিত লোকদের হত্যার অনুমতি না দেওয়ার কারণ ছিল, তিনি এই জঘন্য অপবাদের নির্দোষিতার ব্যাপারে ওহী নাজিলের অপেক্ষায় ছিলেন, যা তখনও অবতীর্ণ হচ্ছিল না।

আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বহুদিন পর শুনতে পান যে, তাকে নিয়ে কিছু খারাপ ধারণা করা হচ্ছে। তিনি নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করার সাহস পাচ্ছিলেন না। কারণ, তিনি এই দুঃখ-বেদনায় এতই ভেঙ্গে পড়েছিলেন যে, পরিবারের লোকদের সঙ্গে হাসি দিয়ে কথা বলা প্রায় ছেড়েই দিয়েছিলেন। অবশেষে আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা অনুমতি নিয়ে বাবারবাড়ি চলে যান।

বাবারবাড়ি গিয়ে মায়ের কাছে জানতে পারেন তার বিরুদ্ধে কী যে তুফান বইছে! ঘটনা সহ্য করতে না পেরে তিনি শয্যাশায়ী হয়ে পড়েন এবং কাঁদতে কাঁদতে তার অবস্থা শোচনীয় হয়ে পড়ে। অবশেষে এক মাস পর ওহী নাজিল হয়।[৫৪৩] আল্লাহ তায়ালা সুরা নুরের ষোলোটি আয়াত (১১-২৬) নাজিল করে আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা এবং সাফওয়ান রাদিয়াল্লাহু আনহুর পবিত্রতা বর্ণনা করেন। সবশেষে তাদের সম্পর্কে বলেন,

---

৫৪৩. সহিহ বুখারি : হাদিস নং ২৬৬১ (কিতাবুশ শাহাদাত, বাবু তা'দিলিন নিসা), সিরাতে ইবনে হিশাম : ২/২৯৭-৩০৭
সহিহ বুখারিতে এখানে [قد مكث شهرًا] শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এর থেকে বুঝা যাচ্ছে যে, এই ঘটনার মাঝে একমাস অতিক্রান্ত হয়। যদিও চল্লিশ দিনের মত প্রসিদ্ধ; তবে তা প্রামাণিক নয়।

أولئك مُبَرَّءُون مما يقولون

তারা ওই অপবাদ থেকে পবিত্র, (তাদের প্রতি মুনাফিকরা) যা বলে বেড়াচ্ছে।

এভাবেই মুনাফিকদের ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হয়ে যায়। আসমান থেকে ফয়সালা এসে নবী-পরিবারের উপর থেকে সকল অপবাদ অপনোদন করে এবং আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহার মর্যাদা বুলন্দ করে। আলেমগণ এ ব্যাপারে একমত যে, কুরআন মজিদ আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহার নিষ্কলুষতা ও নির্দোষিতার কথা নাজিল হবার পর যারা তার উপর অপবাদ দেবে, তারা ইসলাম থেকে বের হয়ে যাবে। কেননা তারা কুরআনের আয়াত অস্বীকার করছে।[৫৪৪]

উক্ত আয়াতগুলোতে সতী-সাধ্বি নারী-পুরুষের প্রতি অপবাদ আরোপ করলে আশিটি বেত্রাঘাত করার বিধান অনুমোদন করা হয়। তাই যারা এই অপবাদ আরোপ করেছিল, তাদেরকে আশিটি করে বেত্রাঘাত করা হয়।[৫৪৫]

শরিয়তে এই বিধানকে 'হদ্দে কজফ' বলা হয়। যারা মুসলমানদের চরিত্র এবং পবিত্রতার উপর কলঙ্কের দাগ লাগানোর চেষ্টা করবে, ইসলামি শরিয়ত তাদের কঠোর সাজা দেওয়ার ব্যবস্থা অনুমোদন করে মুসলমানদের ইজ্জত-সম্মান হেফাজতের নিশ্চয়তা দিয়েছে। পৃথিবীর কোনো সভ্যতা ও সমাজব্যবস্থা কিংবা কোনো আইনে এর উপমা খুঁজে পাওয়া যায় না।[৫৪৬]

ইফকের ঘটনায় নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মানবিকতার পূর্ণ বিকাশ ঘটেছে। এটি নবুওয়াতে মুহাম্মাদির সত্যতাও সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহাকে অত্যধিক ভালোবাসার পরেও তিনি এই পরিস্থিতিতে নিজের মর্জিতে ওহী নিয়ে আসতে পারেননি। তিনি যদি সবকিছুর ক্ষেত্রে স্বয়ংসম্পূর্ণ ইচ্ছার অধিকারী হতেন, তা হলে খুব দ্রুতই ওহী নিয়ে আসতে পারতেন। তিনি যদি আল্লাহ তায়ালার মতো 'আলিমুল গায়ব', 'হাজির-নাজির' তথা সর্বত্র বিরাজমান হতেন এবং তার ব্যাপারে সাহাবায়ে কেরামেরও এই বিশ্বাস থাকত, তা হলে এত পেরেশানি, উদ্বেগ সৃষ্টি হওয়ার প্রশ্নই উঠত না। মদিনাতে এতদিন পর্যন্ত এমন কঠিন পরিস্থিতি বিরাজ করত না।

৫৪৪.

قد أجمع العلماء قاطبة على أن من سبها بعد هذا ورماها بما رماها بعد الذي ذكر في هذه الآية، فإنه كافر، لأنه معاند للقرآن [تفسير ابن كثير : 6/31، 32، سورة النور]

৫৪৫. মাজমাউয যাওয়াইদ : হাদিস নং ১৫৩০০

৫৪৬. তাফসিরে ইবনে কাসির, সুরা নুর, আয়াত ৪-৬

অমুসলিমরাও অবাক-বিস্ময়ে ভাবতে থাকে যে, যদি (তাদের ধারণা মোতাবেক) তিনি নিজের থেকে ওহী নিয়ে আসতে পারেন (নাউজুবিল্লাহ), তা হলে এখন কেন এত বিলম্ব হচ্ছে? এমন হলে তো তিনি তৎক্ষণাৎ নিজের থেকে তৈরি করে লোকদের শুনিয়ে দিতেন, তখন তো সমস্যা এমনিতেই সমাধান হয়ে যেত। কিন্তু এখানে এমন কিছুই তো হয়নি। কেননা, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সত্যনবী ছিলেন। তিনি তখনই ওহী শোনাতেন, যখন আসমান থেকে তা অবতীর্ণ হতো।

***

গাজওয়ায়ে খন্দক

[শাওয়াল ৫ম হিজরি/ফেব্রুয়ারি ৬২৭ খ্রিষ্টাব্দ]

তখন পর্যন্ত মুসলমানদের সাথে মক্কার মুশরিক, ইহুদিসহ অন্যান্য আরব কবিলার পৃথক পৃথক যুদ্ধ হয়েছে। কাফেররা বুঝে গিয়েছিল কোনো একক শক্তি ইসলামের পতিরোধ করতে সক্ষম হবে না। তাই ইসলামের শত্রুরা সকলে জোটবদ্ধ হয়ে পরবর্তী পদক্ষেপের ব্যাপারে ফিকির করতে থাকে। এর মূল উদ্যোক্তা ছিল বনু নাজিরের ঐসব ইহুদি সরদার, যাদের কিছুদিন পূর্বে মদিনা থেকে বিতাড়িত করা হয়েছে। তাদের মধ্যে অগ্রণী ভূমিকা রাখে হুয়াই বিন আখতাব।

এই সরদাররা প্রথমে মক্কায় গিয়ে কুরাইশ নেতৃবৃন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাদের মদিনার হুকুমতের বিপরীতে জোটবদ্ধ হতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করে। এরপর তারা মদিনার দক্ষিণ-পূর্বে নজদের সীমান্তে বসবাসকারী গাতফানি জঙ্গি কবিলাগুলোর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাদেরও নিজেদের মিত্র বানাতে সক্ষম হয়।[৫৪৭]

৫ম হিজরির শাওয়াল মাসের শেষদিকে মিত্রজোট মদিনার উদ্দেশে যাত্রা করে। কুরাইশ নিজেদের গোত্র, মিত্র কবিলা এবং পার্শ্ববর্তী অন্যান্য কবিলা থেকে ৪ হাজার তরুণ সংগ্রহ করে। এদের মধ্যে ৩০০ ছিল অশ্বারোহী। বনু গাতফান উয়ায়না বিন হিসনের নেতৃত্বে ৭০০ যোদ্ধা প্রদান করে। বনু মুররা হারিস বিন আউফের নেতৃত্বে ৪০০ সৈন্য প্রেরণ করে। মিসআর বিন রুহাইলা বনু আশজার ৪০০ তিরন্দাজ নিয়ে শরিক হয়। পথিমধ্যে বনু আসাদ এবং বনু সুলাইমও তাদের সৈন্যদের নিয়ে যোগ দেয়। এভাবে মিত্রবাহিনীর সৈন্যসংখ্যা ১০ হাজার পৌঁছে যায়।[৫৪৮] কুরাইশের সালার আবু সুফিয়ানই ছিলেন প্রধান সেনাপতি।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিত্রবাহিনীর রওনা হওয়ার সংবাদ পাওয়ামাত্র নগরীর প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থার খোঁজ নেন। দক্ষিণে বাগ-বাগিচার প্রাচীর, পূর্ব-পশ্চিমে 'হাররার' পাথুরে এবং দুর্গম টিলাগুলো হামলাকারীদের অগ্রযাত্রা রোধ করতে সক্ষম। তাই উত্তরদিকটাই ছিল ঝুঁকিপূর্ণ ও অরক্ষিত। সাধারণ অবস্থায় এখানে কেবল মোর্চা বানিয়ে প্রতিরোধ করলেই হতো। আর

---

৫৪৭. আলকামিল ফিত তারিখ : ২/৬৫

৫৪৮. তারিখুল ইসলাম, জাহাবি : ১/২৮৩, ২৮৪

যদি দুশমন শহরে প্রবেশ করত, তা হলে অলিগলিতে আনসারদের দুর্গসদৃশ হাবেলিগুলো থেকে তাদের উপর পাথরবৃষ্টি এবং তির নিক্ষেপ করে নাস্তানাবুদ করে দেওয়া যেত। যেমন: গাজওয়ায়ে উহুদে যাওয়ার পূর্বে প্রাথমিক পরিকল্পনা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমনই গ্রহণ করেছিলেন।[৫৪৯]

কিন্তু এবার দুশমনের সৈন্যসংখ্যা এত অধিক যে, তাদের মামুলি প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থার মাধ্যমে ঠেকানো সম্ভব নয়। উন্মুক্ত ময়দানে লড়াই করার ক্ষয়ক্ষতি বিবেচনা করলে উহুদের দৃষ্টান্ত সামনে আসে। তাই নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিশেষভাবে নগরীর প্রতিরক্ষার ব্যাপারে পরামর্শ আহ্বান করেন। সেই মজলিসে কেবল প্রবীণ এবং বড় বড় সাহাবায়ে কেরামই নয়; সাধারণ সাহাবিদেরও মত প্রকাশের পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া হয়।

পারস্য থেকে আগত সালমান ফারেসি রাদিয়াল্লাহু আনহুর পরিকল্পনা সবার থেকে আলাদা ছিল। তিনি বলেন, পারস্যে এমন পরিস্থিতিতে পরিখা খনন করে হামলাকারীদের অগ্রযাত্রা রুখে দেওয়া হয়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার পরামর্শ খুব মনোযোগ দিয়ে শ্রবণ করেন এবং কালবিলম্ব না করে তার পরিকল্পনা বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত দেন। এটি ছিল সে-কালের উন্নত রণকৌশল। আরবজাতি এই পদ্ধতি সম্পর্কে বেখবর ছিল।[৫৫০]

পরিখার নকশা এবং খননকার্য

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে কয়েকজন মুহাজির ও আনসার সাহাবিকে সাথে নিয়ে বের হন এবং মদিনার আশপাশে ঘুরে প্রতিরক্ষার জন্য জুতসই নকশা তৈরি করেন। তিনি মুজাহিদদের হুকুম দেন যে, সালআ পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থান করবে এবং মদিনার পূর্বদিকের টিলা 'হাররায়ে ওয়াকিম' থেকে নিয়ে পশ্চিম দিকের টিলা 'হাররায়ে ওয়াবারাহ' পর্যন্ত ধনুক আকৃতিতে একটি দীর্ঘ পরিখা খনন করতে হবে। মুজাহিদের সংখ্যা ছিল তিন হাজার।[৫৫১]

পরিখা খননের পূর্বে পুরো এলাকা মাপা হয়। তাতে প্রায় সাড়ে তিন মাইল (সাড়ে পাঁচ কিলোমিটার) জায়গা ছিল। এই দীর্ঘ জায়গায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খননের জন্য চিহ্ন এবং সীমানা দিয়ে দেন। তিনি

---

৫৪৯. আলবিদায়া ওয়ান নিহায়া : ৫/৩৪৬

৫৫০. আলবিদায়া ওয়ান নিহায়া : ৬/১৩, ১৪

৫৫১.আসসিরাতুল হালাবিয়্যাহ : ২/৪১৮, মারবিয়্যাতু গাজওয়াতি খানদাক, ডক্টর ইবরাহিম আলমাদখালি : ১/১৯৬ (ইমাদাতুল বাহছিল ইলমি সংস্করণ)

সাহাবিদের দশজন দশজন করে জামাতবন্দি করে দেন এবং প্রত্যেক জামাতকে বিশ মিটার জায়গা খনন করার দায়িত্ব দেন।[৫৫২]

মুহাজির ও আনসারদের প্রত্যেক দলই শক্তিশালী বিদেশি সাহাবি সালমান ফারেসি রাদিয়াল্লাহু আনহুকে নিজেদের দলে নিতে চাচ্ছিল। সবার মতানৈক্য বড় আকার ধারণ করলে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফয়সালা দেন, 'সালমান আমাদের আহলে বাইতের সদস্য।'[৫৫৩]

পরিখার গভীরতা পনেরো ফিট এবং প্রস্থ ছিল প্রায় ত্রিশ ফিট, ঘোড়া যেন সহজেই লাফ দিয়ে পার না হতে পারে।[৫৫৪]

সময় যেহেতু স্বল্প ছিল; তাই খুব দ্রুত কাজ চলতে থাকে। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অবস্থার গুরুত্ব অনুধাবন করে সবাইকে কাজে লাগিয়ে দেন। পরিস্থিতি এতই চরমে পৌঁছে গিয়েছিল যে, ছোট-বড় কেউ-ই পিছিয়ে থাকেনি।[৫৫৫]

---

৫৫২. خط الخندق بين كل عشرة أربعين ذراعًا [আলবিদায়া ওয়ান নিহায়া : ৬/২৬] আল্লামা শিবলি নুমানি লেখেন, প্রতি দশজনকে দশ গজ করে খোদাই করার জন্য ভাগ করে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু أربعين ذراعًا দশ গজ নয়, বিশ মিটার। কারণ, এক ذراع হলো দেড় ফিট, আর চল্লিশ ذراع হয় ষাট ফিট তথা বিশ মিটার।

৫৫৩. আলমুজামুল কাবির, তাবারানি, ৬/২১২

৫৫৪. আহদে নববি কি ময়দানে জঙ্গ, ডক্টর হামিদুল্লাহ রহ., পৃষ্ঠা ৬৮ (ইদারাহ ইসলামিয়্যাত, লাহোর সংস্করণ), সিরাতুন নবী সা., আল্লামা শিবলি নুমানি : ১/২৪১

৫৫৫. (وكانوا بأجمعهم من بلغ ومن لم يبلغ يعملون فيه (السيرة الحلبية : ٢/٤٢٢

গাজওয়া খন্দক ৫ম হিজরিতে হয়েছে, কিন্তু কোন মাসে হয়েছে, তা নিয়ে মতানৈক্য। কারো নিকট ৭ বা ৮ যিলকদ; তবে এটি সঠিক নয়।

হাফেজ ইবনে কাসির ইমাম যুহরি ও ইমাম মালেক রহ. এর সূত্রে বর্ণনা করেন, খন্দক ৫ম হিজরির শাওয়াল মাসে হয়েছে। [আলবিদায়া ওয়ান নিহায়া : ৬/১০] ইবনে হাবিব যুদ্ধের সময়কাল ১১ শাওয়াল বৃহস্পতিবার থেকে শুরু হয়ে ১লা যিলকদ পর্যন্ত উল্লেখ করেছেন। [আলমুহাব্বার, পৃষ্ঠা ১১৩] পঞ্জিকার হিসেবেও এটি সঠিক [তাকউয়িমে আহদে নববি, পৃষ্ঠা ৯৭]। তা ছাড়া মৌসুমি আলামতও তাকে সমর্থন করে। সহিহ বুখারিতে আছে, মুহাজির ও আনসাররা পরিখা খনন করছিলেন শীতের সকালে। [হাদিস ২৮৩৪, কিতাবুল জিহাদ, বাবুত তাহরিয আলাল কিতাল]

যুদ্ধপূর্ব খননকার্যে কারো কারো নিকট এক মাস লাগে। ইমাম নববির মত অনুযায়ী পনেরদিন লাগে [আসসিরাতুল হালাবিয়্যাহ : ২/৪৩২]। ইমাম নববির মতটিই অগ্রগণ্য মনে হয়। সেই হিসেবমতে খননকার্য শুরু হয়েছিল ২৫ রমজান। সৌরবর্ষ হিসেবে তখন ১লা শাওয়াল (মাদানি) ২ ফেব্রুয়ারি মাস ছিল। অর্থাৎ পরিখা খনন ১৮ ফেব্রুয়ারি থেকে ৪ঠা মার্চ পর্যন্ত অব্যাহত থাকে।

অবরোধের পূর্ণ সময়কাল যদি তিন সপ্তাহ ধরা হয়, যেমনটি অধিকাংশ রেওয়ায়েতে এসেছে, তা হলে অবরোধ ৫ মার্চ থেকে ২৫ মার্চ পর্যন্ত চলে।

তবে যুদ্ধের সূচনা শাওয়াল মাসে হওয়ার মতটিই অগ্রগণ্য। আর খননকার্য শীতকালে হওয়া

অল্প সময়ের জন্যও কারো কোথাও যেতে হলে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুমতি নিয়ে যেতে হতো।[৫৫৬]

যেসব তরুণ সবল ও সুঠাম ছিল, তারা কোদাল দিয়ে জমিন খনন করছিল আর অন্যরা মাটি উঠিয়ে পারে জমা করছিল। ফলে খন্দকের ভেতরের পাড় ছয় ফিট উঁচু করে বানানো হচ্ছিল।[৫৫৭]

মাটি উঠানোর মধ্যে হজরত আবু বকর ও উমর (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) এর মতো সম্মানিত ব্যক্তিরা শামিল ছিলেন। মাটি নেওয়ার জন্য খুব সহজেই টুকরি পাওয়া যেত না। তাই আবু বকর ও উমর (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) তাদের কাপড় দিয়েই মাটি ভরে নিয়ে যেতেন।[৫৫৮]

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাজের তদারকি এবং সাহাবিদের উৎসাহ দেওয়ার জন্য নিজেই খন্দকের পার্শ্ববর্তী একটি পাহাড়ে তাঁবু খাটিয়ে সেখানে অবস্থান করতে থাকেন। খন্দকের যেখানে যেখানে পাহাড়ের অংশ মিলে গিয়েছিল, সেই পাহাড়ের উপরই মুজাহিদরা চৌকি বানিয়ে প্রহরা দিচ্ছিলেন। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমনই একটি চৌকিতে অবস্থান করছিলেন।

পরবর্তীতে স্মারক হিসাবে এ জায়গায় একটি মসজিদ নির্মাণ করা হয়। এই মসজিদটি 'মসজিদে যুবাব' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। সেই চৌকিগুলোর সম্মুখ দিয়ে প্রয়োজনের সময় পরিখা পার হওয়ার ব্যবস্থাও রাখা হয়েছিল, যেন মুসলমানদের কাউকে যদি গুপ্তচরবৃত্তির জন্য শত্রুদের মাঝে যেতে হয়, সে যেন সহজেই গমন করতে পারে। এই রাস্তা বা সাঁকোর নাম দেওয়া হয়েছিল 'বাব' (দরজা)। মসজিদে যুবাব মূলত 'যু-বাব' তথা দরজাওয়ালা। অর্থাৎ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তাঁবু -যেখানে মসজিদে যু-বাব অবস্থিত- এমন জায়গায় ছিল, যার সামনে খন্দকের সাঁকো বা অন্যকোনো আকৃতির মতো দরজা লাগানো ছিল। এজন্য এই স্থানটিকে যু-বাব বলা হয়।[৫৫৯]

নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দশজনের এক জামাতে শামিল হয়ে ছিলেন। তিনি মাঝেমধ্যে কেবল খনন কাজেই নয়; বরং মাটি বহনেও অংশ

সহিহ হাদিস এবং সৌরপঞ্জিকারও অনুকূলে। যুদ্ধের শেষদিনগুলো নিশ্চিত স্বাভাবিক মৌসুমে ছিল। কিন্তু যুদ্ধের মাঝামাঝি সময়ে অনাকাঙ্ক্ষিত যে অন্ধকার এবং শৈত্যপ্রবাহ বয়ে যায়, তা অভ্যাস পরিপন্থি। প্রকৃতপক্ষে তা ছিল আল্লাহ তায়ালার গায়েবি নুসরত ও সাহায্য।

৫৫৬. সুরা আহযাব, আয়াত ১২, ১৩

৫৫৭. আহদে নববি কি ময়দানে জঙ্গ, ডক্টর হামিদুল্লাহ রহ., পৃষ্ঠা ৬৮

৫৫৮. আলমাগাজি, ওয়াকিদি : ২/৪৪৯, আসসিরাতুল হালাবিয়্যাহ : ২/৪২০

৫৫৯. আহদে নববি কি ময়দানে জঙ্গ, ডক্টর হামিদুল্লাহ রহ., পৃষ্ঠা ৬৬

নিতেন। মৌসুমটি অত্যন্ত ঠান্ডা ছিল। শহরে আহারের বন্দোবস্তও কম ছিল। তাই সাহাবায়ে কেরাম পেটভরে খাবারও খেতে পারতেন না। তদুপরি তারা পরিখা খননকার্যে পূর্ণ উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে মশগুল থাকতেন। খননকার্য প্রত্যহ ভোর থেকে শুরু হয়ে অন্ধকার হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত চলতে থাকত।[৫৬০]

নৈশ-আক্রমণ প্রতিরোধের ব্যবস্থাপনা

ইতোমধ্যে মুশরিকদের অগ্রসরতার সংবাদ প্রতিনিয়ত আসছিল। খননকার্য সম্পন্ন হওয়ার কয়েকদিন পূর্বেই মনে হচ্ছিল, মুশরিকদের অগ্রবর্তী বাহিনীর কোনো দল যেকোনো রাতে অতর্কিত হামলা করতে পারে। সম্ভাব্য নৈশ-আক্রমণ থেকে বাঁচতে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'তোমরা যদি নৈশ-আক্রমণের শিকার হও, তা হলে (নিজেদের পরিচয়ের জন্য) পরিচিতি কোড হিসেবে এই বাক্য ব্যবহার করবে حٰمٓ لَا يُنْصَرُونَ।'[৫৬১]

সাহাবায়ে কেরামের রণোদ্দীপক ও প্রশংসামূলক কবিতা আবৃত্তি

আক্রমণের পূর্বেই খননকার্য পূর্ণ করার লক্ষ্যে মুসলমানরা তাদের সর্বশক্তি দিয়ে কাজ করে যাচ্ছিলেন। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবিদের এই মেহনত ও পরিশ্রম দেখে তাদের উৎসাহ বৃদ্ধির জন্য বলতেন,

اللهم لا عيشَ إلا عيشُ الآخرة، فاغفِرِ الأنصارَ والمهاجِرة

> হে আল্লাহ, প্রকৃত জিন্দেগি তো আখেরাতের জিন্দেগিই, অতএব আপনি আনসার ও মুহাজিরদের ক্ষমা করে দিন।

সাহাবায়ে কেরাম রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই দোয়া শুনে আনন্দের আতিশয্যে বলতে থাকেন,

نحنُ الذين بايَعُوا محمدًا * على الجهاد ما بَقِينا أبدًا

> আমরা সেই ব্যক্তি, যারা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতে জিহাদের বাইয়াত নিয়েছি। যতদিন আমরা বেঁচে থাকব, ততদিন আমরা এর উপর অটল থাকব।'[৫৬২]

মাটি নিতে নিতে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার সাহাবি আবদুল্লাহ বিন রাওয়াহা আনসারি রাদিয়াল্লাহু আনহুর এই পঙ্‌ক্তিমালা আবৃত্তি করেন,

---

৫৬০. আলবিদায়া ওয়ান নিহায়া : ৬/১০-১৫

৫৬১. মুসান্নাফ, ইবনে আবি শাইবাহ : হাদিস নং ৩৬৭৯৯

৫৬২. সহিহ বুখারি : হাদিস নং ২৮৩৪ (কিতাবুল জিহাদ, বাবুত তাহরিয আলাল কিতাল, হাদিস নং ৪০৯৯ (কিতাবুল মাগাজি, বাবু গাজওয়াতি খান্দাক)

والله لو الله ما اهتدينا * ولا تصدَّقنا ولا صلَّينا

فأنْزِلَنْ سَكِينَةً علينا * وثبِّت الأقدام إنْ لاَقَيْنَا

إنَّ الأُلى قد بغَوْا علينا * إذا أرادوا فتنة أبَيْنَا

আল্লাহর কসম, আল্লাহ হেদায়েত না করলে আমরা হেদায়েত পেতাম না। দানসদকা করতাম না এবং নামাজও আদায় করতাম না।

সুতরাং (হে আল্লাহ,) আমাদের প্রতি রহমত অবতীর্ণ করুন এবং আমাদের শত্রুর সাথে মোকাবেলা করার সময় দৃঢ়পদ রাখুন। নিশ্চয় ওরা আমাদের উপর চড়াও হয়েছে। যখনই তারা ফেতনার প্রয়াস পেয়েছে, তখন আমরা হার মানিনি।

সাহাবায়ে কেরামও রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে তাল মিলিয়ে বলেন, 'আমরা হার মানিনি।'[৫৬৩]

পূর্ব-প্রাচ্য বিজয়ের ভবিষ্যদ্বাণী

খননকালে এক স্থানে একটি শক্ত কঠিন পাথর সাহাবায়ে কেরাম ভাঙতে পারছিলেন না। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সংবাদ দেওয়া হলো। তিনি এসে কোদাল দিয়ে তিনবার আঘাত করতেই পাথরটি চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যায়।[৫৬৪] পাথরের উপর আঘাত করার সময় প্রত্যেকবারই কিছু আলো বিচ্ছুরিত হয়।

হজরত সালমান ফারেসি রাদিয়াল্লাহু আনহু তখন জিজ্ঞেস করেন, 'এটি কীসের ঝলক?' নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'আল্লাহ তায়ালা আমাকে প্রথম আঘাত করার সময় ইয়ামান, দ্বিতীয়বার শাম ও প্রাচ্য আর তৃতীয়বার পূর্ব বিজয়ের সুসংবাদ প্রদান করেছেন।' সাহাবিরা এ কথা শুনে আনন্দে তাকবিরধ্বনি দেন।[৫৬৫]

সময়টা তখন এত শোচনীয় ছিল যে, সাহাবায়ে কেরাম তিনদিন ধরে অনাহারে ভুগছিলেন।[৫৬৬] মুনাফিকরা তাদের মান বাঁচাবার জন্য অনিচ্ছা সত্ত্বেও খননকাজে অংশ নেয়। তারা প্রচার করতে থাকে যে, এদিকে আমাদের প্রাণ ওষ্ঠাগত আর তিনি আমাদেরকে প্রাচ্য-প্রতীচ্যের বিজয়ের ভবিষ্যদ্বাণী শোনাচ্ছেন।[৫৬৭]

---

৫৬৩. সহিহ বুখারি : হাদিস নং ৪১০৪ (কিতাবুল মাগাজি, বাবু গাজওয়াতি খান্দাক)

৫৬৪. সহিহ বুখারি : হাদিস নং ৪১০১ (কিতাবুল মাগাজি, বাবু গাজওয়াতি খান্দাক)

৫৬৫. আলবিদায়া ওয়ান নিহায়া : ৬/২৬

৫৬৬. মুসান্নাফ ইবনে আবি শাইবাহ, হাদিস নং ৩৬৮১১ (মাকতাবাতুর রুশদ)

৫৬৭. আসসুনানুল কুবরা, বাইহাকি : হাদিস নং ১৭৮৬৩, তারিখুত তাবারি : ২/৫৭০

এক সাহাবির ঘরে দাওয়াত ও নবীজির মুজেযা

মূলত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও সে সময় ক্ষুধার্ত ছিলেন। কিন্তু আল্লাহর প্রতিশ্রুতির উপর তার ও সাহাবায়ে কেরামের পূর্ণ একিন ছিল।

হজরত জাবির বিন আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু একদিন নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেহারা মুবারকে ক্ষুধার চিহ্ন দেখে অত্যন্ত মর্মাহত হন। তিনি দৌড়ে ঘরে যান, যেন কিছু রান্না করে তার জন্য নিয়ে আসতে পারেন। কিন্তু তার ঘরেও কিছু যব এবং ছোট একটি বকরির বাচ্চা ছাড়া কিছুই ছিল না। ফলে তার স্ত্রী ঐগুলোই পিষে আটার খামিরা করলেন, আর বকরির বাচ্চাটি জবাই করে রান্নার আয়োজন করলেন। ওদিকে জাবির রাদিয়াল্লাহু আনহু নবীজির খেদমতে এসে আরজ করলেন, কিছু খাবার রান্না করেছি, আপনি এক দুজন সাথি নিয়ে আগমন করুন।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, 'কী পরিমাণ খাবার?' পরিমাণ বলার পর তিনি বললেন, 'খুব উত্তম খাবার।'

তারপর নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপস্থিত সকল মুহাজির ও আনসার সাহাবিকে সঙ্গে নিয়ে জাবির রাদিয়াল্লাহু আনহুর ঘরে উপস্থিত হলেন। তিনি রুটিগুলো ছোট ছোট টুকরো করেন এবং নিজেই রুটি ও তরকারি সবাইকে পরিবেশন করতে থাকেন। মেহমান ছিলেন প্রায় আটশ। প্রত্যেকেই পেটপুরে আহার করেন। তারপরও জাবির রাদিয়াল্লাহু আনহুর পাতিলে আগের মতোই তরকারি ভরপুর থাকে। রুটিও কমেনি।[৫৬৮]

একনাগাড়ে পনেরো দিন সীমাহীন পরিশ্রমের পর পরিখা খনন সম্পন্ন হয়।[৫৬৯]

জোটবাহিনীর আগমন এবং মদিনা অবরোধ

ওদিকে কুরাইশ বাহিনীও আবির্ভূত হয়েছে। উহুদ পাহাড়কে পেছনে রেখে মদিনার উত্তরদিকে তারা ছড়িয়ে পড়েছে। তাদের সাথে আছে আহাবিশ, বনু গাতফান, বনু কিনানা, আহলে নজদ এবং তিহামার মুশরিকরা। তাদের সম্মুখে একটি গভীর ও প্রশস্ত পরিখা দেখে বড় বিস্মিত হয় এবং বলতে থাকে, হায় খোদা! এমন যুদ্ধকৌশল তো আরবজাতি ইতোপূর্বে কখনোই দেখেনি।'[৫৭০]

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তৎক্ষণাৎ পনেরো বছরের কম বয়সি যেসব বালক খনন কাজে অংশগ্রহণ করেছিল, তাদেরকে নারীদের সাথে

৫৬৮. সহিহ বুখারি : হাদিস নং ৪১০২ (কিতাবুল মাগাজি, বাবু গাজওয়াতি খান্দাক)
৫৬৯. আসসিরাতুল হালাবিয়্যাহ : ২/৪২২
৫৭০. সিরাতে ইবনে হিশাম : ২/২২৪

আনসার সাহাবিদের দুর্গসদৃশ হাবেলিতে পাঠিয়ে দেন। বহুসংখ্যক নারী ও শিশুকে 'উতুমে হাসসানে' রাখা হয়।[৫৭১] এটি মদিনার সবচেয়ে প্রশস্ত বাড়ি ছিল। এটি ছিল হাসসান বিন সাবিত রা. এর সম্পত্তি।[৫৭২]

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাফেরদের তির থেকে বাঁচার জন্য মুসলিম-বাহিনীকে খন্দক থেকে পিছিয়ে সিলা পাহাড়ের সাথে গিয়ে তাঁবু খাটান। নিজের তাঁবুটি পাহাড়ের উপরে স্থাপন করেন। এখানেই তিনি নামাজ আদায় করতেন। পরবর্তীতে স্মৃতিস্বরূপ এই জায়গায় মসজিদে ফাতহ নির্মাণ করা হয়, যা আজও বিদ্যমান আছে।[৫৭৩]

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুহাজির-আনসারকে দুটি পৃথক বাহিনীতে বিন্যস্ত করেন। যায়েদ বিন হারিসা রাদিয়াল্লাহু আনহুকে মুহাজিরদের এবং সা'দ বিন উবাদা রাদিয়াল্লাহু আনহুকে আনসারদের আমির নিযুক্ত করে তাদের হাতে ঝান্ডা তুলে দেন এবং পরিখার ধারে মোর্চা তৈরি করেন। সাথে সাথে মাসলামা বিন আসলাম রাদিয়াল্লাহু আনহুকে দুইশ লোক দিয়ে মদিনা প্রহরা দেওয়ার দায়িত্ব দেন, যেন পেছন থেকে কেউ শহরে আক্রমণ করতে না পারে। বিশেষ করে বনু কুরাইজা যেন কোনোরূপ অনর্থ সৃষ্টি করতে না পারে।[৫৭৪]

বনু কুরাইজার চক্রান্ত

মদিনাতে তখন একমাত্র ইহুদি কবিলা বনু কুরাইজা ছিল। তারাই ভেতর থেকে মুসলমানদের পিঠে কুঠারাঘাত করতে পারত। ওদিকে বনু কুরাইজাকে বিদ্রোহের জন্য উসকানি দিতে কুরাইশ গোপনে বনু কুরাইজার সরদার হুয়াই বিন আখতাবকে পাঠায়। হুয়াই বনু কুরাইজাকে যুদ্ধের জন্য প্ররোচিত করে। তারা প্রথমে অস্বীকৃতি জানালেও হুয়াই বিন আখতাব তাদেরকে আশ্বস্ত করে যে, কুরাইশ ও তাদের মিত্রজোট এবার মুসলমানদের নির্মূল না করে ক্ষান্ত হবে না; তখন বনু কুরাইজা জোটের সাথে যুক্ত হতে সম্মত হয়।[৫৭৫]

জোটের সাথে বনু কুরাইজার একাত্মতার সংবাদ নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটও পৌঁছে। মুসলমানদের সবচেয়ে বড় আশঙ্কা ছিল বনু কুরাইজার বিদ্রোহ। মদিনার ৩ হাজার মুজাহিদকে নিয়ন্ত্রণ করতে হচ্ছিল দুশমনের ১০ হাজার সশস্ত্র সৈন্যের ছয় কিলোমিটারব্যাপী বেষ্টনী। এখান

৫৭১. সহিহ মুসলিম : হাদিস নং ৬৩৯৮ (ফাযায়িলুস সাহাবা, ফাযায়িলু তালহা ওয়ায যুবাইর)
৫৭২. ওয়াফাউল ওয়াফা, আলি বিন আবদুল্লাহ আসসামহুদি (মৃ ৯১১ হিজরি) : ১/১৬৭
৫৭৩. আলবিদায়া ওয়ান নিহায়া : ৬/৩৪, আহদে নববি কি ময়দানে জঙ্গ, ডক্টর হামিদুল্লাহ রহ., পৃষ্ঠা ৭২
৫৭৪. আসসিরাতুল হালাবিয়্যাহ : ২/৪২২
৫৭৫. তারিখুত তাবারি : ২/৫৬৫

থেকে একটি অংশও বনু কুরাইজার মোকাবেলায় ব্যবহার করা সম্ভব ছিল না। অপরদিকে তাদের ছিল সাতশরও অধিক যোদ্ধা। তারা যদি শহরে হামলা করে বসে, তা হলে সর্বত্র রক্তনদী বয়ে যাবে। মুসলমানদের স্ত্রী-সন্তানরা বন্দি হবে। তাই রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আনসারদের দুই সম্মানিত সরদার সা'দ বিন মুআজ এবং সা'দ বিন উবাদাকে (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) বনু কুরাইজায় আলোচনা করার জন্য প্রেরণ করেন; কিন্তু ইহুদিরা বড় বেআদবিমূলক আচরণ করে এবং বলে, 'আমরা মুহাম্মদকে জানি-ই না। তার সঙ্গে আমাদের কোনো প্রতিশ্রুতি নেই।'

এই শব্দগুলো প্রকাশ্য বিদ্রোহমূলক ছিল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার দূতদের প্রেরণের সময় নির্দেশনা দিয়েছিলেন যে, তোমরা যদি ইহুদিদের ওফাদারির উপর অবিচল দেখ, তা হলে ফিরে আসার পর স্পষ্ট শব্দে তা ব্যক্ত করবে (যেন সকলেই শুনে উৎসাহিত হয়)। কিন্তু নেতিবাচক আচরণ প্রকাশ পেলে ইঙ্গিতে অবস্থার বর্ণনা দেবে।

দুই সরদার ফিরে এসে ইঙ্গিতে বলেন, 'আযল ও কারা'।[৫৭৬]

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এটা শুনে কিছুক্ষণ নীরব রইলেন। কিন্তু মন্দ ধারণা থেকে বাঁচাতে বললেন, 'মুসলমানগণ, তোমাদের জন্য বিজয় ও নুসরতের সুসংবাদ।'[৫৭৭]

অনেক কঠিন পরীক্ষা শুরু হয়ে গিয়েছিল। মুনাফিকরা অনুমতি নিয়ে তাদের ঘরে চলে যাচ্ছিল। অজুহাত দেখায় যে, তাদের ঘর অরক্ষিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দেখেও না দেখার ভান করে বলতেন, তাদেরকে যেতে দাও।[৫৭৮]

বনু কুরাইজার পক্ষ থেকে ইতিবাচক উত্তর পেয়েই মিত্রবাহিনী খন্দকের আশপাশে অবরোধ সঙ্কীর্ণ করে ফেলে। তিরন্দাজি এবং পাথরবৃষ্টির মাধ্যমে তারা মুসলমানদের খন্দক থেকে দূরে সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা শুরু করে। মুসলমানরা শহর-প্রতিরক্ষায় অবিচল থাকে এবং তাদেরকে জবাবি তির ছুড়ে খন্দকের কাছে ঘেঁষতে বাধা দেয়। একদিন সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত দুই

---

৫৭৬. অর্থাৎ ইহুদিরাও তাদের মতো গাদ্দারি করেছে। এই দুই কবিলা ৩রা হিজরিতে তাবলিগ ও তালিমের জন্য প্রেরিত কিছু সাহাবিকে শহীদ করে দেয়। [ফাতহুল বারি : ৭/৩৮০ ইবনে ইসহাকের বরাতে]

এই ঘটনাটি আমরা পেছনে সহিহ বুখারির বরাতে সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণনা করে এসেছি। সিরাতে ইবনে ইসহাকে তা বিস্তারিত উল্লেখ হয়েছে।

৫৭৭. আলবিদায়া ওয়ান নিহায়া : ৬/৩৫-৩৮

৫৭৮. তাফসিরে ইবনে কাসির, সুরা আহযাব, আয়াত ১৩

বাহিনী এত ধাওয়া-পালটা করে যে, নবীজি এবং সাহাবায়ে কেরামের তিন ওয়াক্ত নামাজ কাযা হয়ে যায়।[৫৭৯]

ওদিকে পেছন থেকে বনু কুরাইজার হামলার আশঙ্কা তখনও ছিল। হজরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর মতো এত মজবুত দিলের ব্যক্তিরই এমন অবস্থা সৃষ্টি হয়েছিল যে, তিনি বারবার সালআ পাহাড়ের চূড়ায় উঠে মদিনা পর্যবেক্ষণ করতেন যে, সেখানে কোনো অস্থিরতা পরিলক্ষিত হয় কিনা। যখন স্থিতিশীলতা অনুভব করতেন, তখন আল্লাহর শোকর আদায় করতেন যে, এখনও বনু কুরাইজা আক্রমণ করেনি।[৫৮০]

হজরত সাফিয়া এবং যুবাইর বিন আওয়ামের সাহসিকতা

বস্তুত বনু কুরাইজা শুধু মদিনার উপর অতর্কিত আক্রমণ করার পাঁয়তারা করেনি; বরং তারা নারী ও শিশুরা যে হাবেলিগুলোতে আশ্রয় নিয়েছিল, সেগুলোর খোঁজ নেওয়ার জন্য কয়েকজন সশস্ত্র লোক পাঠায়; হাবেলির প্রতিরক্ষায় কোনো রক্ষী নিযুক্ত আছে কি না, আর থাকলে কতজন আছে?

তন্মধ্যে এক ইহুদি হজরত হাসসান রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাবেলির আশপাশে ঘোরাঘুরি করতে থাকে। এখানে কেবল নারী ও শিশুরা অবস্থান করছিল। পুরুষের মধ্যে হজরত হাসসান রাদিয়াল্লাহু আনহু ছাড়া কেউ ছিল না।

নবীজির ফুফু সাফিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহা হাবেলির ছাদে দাঁড়িয়ে অবস্থা পর্যবেক্ষণ করছিলেন। ইত্যবসরে ওই ইহুদিকে দেখে খুব অস্থির হয়ে পড়েন। প্রথমে তিনি হাসসান রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বলেন, 'আপনি গিয়ে তাকে মেরে ফেলুন। অন্যথায় সে গিয়ে অন্য ইহুদিদের অবগত করবে যে, এই হাবেলি প্রতিরক্ষার কোনো ব্যবস্থা নেই।' কিন্তু তিনি বার্ধক্য এবং দুর্বলতার কারণে সাহস করেননি। অবশেষে সাফিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহা নিজেই একটি বাঁশ নিয়ে ধীরে ধীরে গিয়ে হাবেলির দরজা খুলে বের হন এবং পেছন দিক থেকে ইহুদিকে এমনভাবে আঘাত করতে থাকেন যে, ঘটনাস্থলেই সে মারা যায়।[৫৮১]

ওদিকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বনু কুরাইজার গতিবিধি পর্যবেক্ষণের জন্য হজরত যুবাইর বিন আওয়াম রাদিয়াল্লাহু আনহুকে দায়িত্ব দেন। তিনি জীবনের ঝুঁকি নিয়ে একাকী ঘোড়া ছুটিয়ে মদিনার সীমানা পেরিয়ে বনু কুরাইজার দুর্গ পর্যন্ত যান। সেখানকার অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে সোজা খন্দকে ফিরে এসে নবীজিকে অবগত করেন। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি

৫৭৯. সুনানে নাসায়ি : হাদিস নং ৬৬২ (কিতাবুল আজান)
৫৮০. আলমাগাজি, ওয়াকিদি, পৃষ্ঠা ৪৬০
৫৮১. মুসতাদরাকে হাকিম : হাদিস নং ৬৮৬৬, ৬৮৬৭

ওয়াসাল্লাম তার এই বাহাদুরি দেখে অকপটে বলেন, 'তোমার জন্য আমার মা-বাবা উৎসর্গ হোক।'[৫৮২]

নাওফাল বিন আবদুল্লাহর মৃত্যু

খন্দক অভিমুখে মুশরিকদের ধাওয়া-পালটা ধাওয়া অব্যাহত ছিল। আবু সুফিয়ান, আমর বিন আস, খালিদ বিন ওয়ালিদ, ইকরিমা বিন আবু জাহল এবং কুরাইশের প্রখ্যাত সরদাররা ঘোরসওয়ারদের নিয়ে বার বার আক্রমণ করছিল। একদিন তাদের একজন নামকরা সরদার নাওফাল বিন আবদুল্লাহ খন্দক পাড়ি দেওয়ার চেষ্টা করতে গিয়ে ঘোড়াসহ খন্দকে পড়ে যায়। মুসলমানরা তার উপর পাথর নিক্ষেপ করতে থাকে। তখন সে বলতে থাকে, 'হে আরবরা, এর থেকে তরবারি দিয়ে কতল করা উত্তম।'

এই কথা শুনতেই হজরত আলি রাদিয়াল্লাহু আনহু তরবারি কোষমুক্ত করে খন্দকে নেমে যান এবং এমন প্রচণ্ড আঘাত করেন যে, নাওফালের দেহ দু'টুকরো হয়ে যায়।

মুশরিকরা তার মৃত্যুতে অনেক প্রভাবিত হয়। তারা নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট নাওফালের লাশ ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য পয়গাম পাঠায়। তার লাশের বিনিময়ে তারা ১০ হাজার দিরহাম দেওয়ার জন্য প্রতিশ্রুতি দেয়।

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের থেকে বিনিময় নিতে অস্বীকার করে সাহাবিদের বলেন, 'লাশ তাদের কাছে সোপর্দ করে দাও। সেও নাপাক, তাদের বিনিময়ও নাপাক।'[৫৮৩]

কুরাইশের সামনে অবনত হতে আনসারদের অস্বীকৃতি

এত কঠোর অবরোধের ফলে মদিনাবাসীর চরম ভোগান্তি ও কষ্ট দেখে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বেচাইনি ও পেরেশানি বৃদ্ধি পেতে থাকে। নবীজির আশঙ্কা হয় আনসাররা আবার হিম্মতহারা হয়ে যায় কিনা। তাই তিনি শত্রুদের দুর্বল করার লক্ষ্যে তাদের দুই গাতফানি সরদার উয়াইনা বিন হিস্‌ন ও হারিস বিন আওফের সাথে গোপনে পত্র-যোগাযোগ করেন এবং তাদের প্রস্তাব দেন, তারা যদি তাদের সৈন্যদের নিয়ে কুরাইশের সঙ্গ ত্যাগ করে চলে যায়, তা হলে তাদেরকে মদিনার উৎপাদিত ফসলের এক-তৃতীয়াংশ দেওয়া হবে।

ঐ দুই সরদার তখন কুরাইশের অগোচরে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাক্ষাতের জন্য আসে এবং সন্ধির ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ

৫৮২. সহিহ মুসলিম : হাদিস নং ৬৩৯৮ (ফাযায়িলুস সাহাবা, ফাযায়িলু তালহা ওয়ায যুবাইর)
৫৮৩. আসসিরাতুল হালাবিয়্যাহ : ২/৪২৩, মুসান্নাফ ইবনে আবি শাইবাহ : হাদিস নং ৩৬৮২৪ (তিনি সংক্ষিপ্তভাবে এনেছেন)

করে। কিন্তু তার পাশাপাশি অর্ধেক উৎপাদিত ফসল দেওয়ার জন্য পীড়াপীড়ি করে। রাসুলুল্লাহ তাদেরকে এক-তৃতীয়াংশের অধিক দিতে অস্বীকৃতি জানান। অবশেষে দুই গাতফানি সরদার এর উপর রাজি হয়ে যায়।

চুক্তিপত্র লেখা হলো; কিন্তু স্বাক্ষর দেওয়ার পূর্বে নবীজি আওস-খাযরাজের সরদার সা'দ বিন মুআজ ও সা'দ বিন উবাদার সম্মতি নেওয়াও জরুরি মনে করে তাদের ডেকে এনে সব কথা খুলে বলেন। তারা বললেন, 'ইয়া রাসুলাল্লাহ, এটা যদি আল্লাহর হুকুম হয়ে থাকে, তা হলে ঠিক আছে।'

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'আল্লাহর হুকুম হলে তোমাদের সঙ্গে পরামর্শ করতাম না। কিন্তু আমি যখন দেখলাম সকল আরবগোত্র তোমাদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়েছে, তখন ভাবলাম তাদেরকে কীভাবে দুর্বল করা যায়।'

সাদ বিন মুআজ রাদিয়াল্লাহু আনহু তখন বললেন, 'ইয়া রাসুলাল্লাহ, যদি এটিই হয়ে থাকে, তা হলে শুনে রাখুন, আমরা যখন মুশরিক ছিলাম, তখন এরা আমাদের ফসল ভোগ করার সুযোগ পায়নি। আর এখন আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে ইসলামের নেয়ামত দান করেছেন, আপনার মাধ্যমে তিনি আমাদের সম্মানিত করেছেন, এখন কীভাবে তারা আমাদের উৎপন্ন ফসলের অংশীদার হতে পারে? আল্লাহর কসম, ওদের জন্য আমাদের কাছে তরবারি ছাড়া কিছুই নেই।'

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার এই জজবা ও স্পৃহা দেখে অনেক প্রীত হন এবং চুক্তিপত্র ছিঁড়ে ফেলে গাতফানি সরদারদের ডেকে বললেন, 'যাও, তোমাদের সাথে তরবারি দিয়েই বোঝাপড়া হবে।'[৫৮৪]

সাদ বিন মুআজের জখম

খন্দকের পারে রীতিমতো অবরোধ যুদ্ধ চলছিল। উভয়পক্ষ তির ও পাথরের পালটাপালটি আঘাত করছিল। আওস গোত্রের সরদার সা'দ বিন মুআজ রাদিয়াল্লাহু আনহু লম্বা গড়নের ছিলেন। সে তুলনায় তার বর্ম ছিল খাটো। ফলে তার দুই হাত বের হয়ে থাকত।[৫৮৫]

একদিন কুরাইশের একজন দক্ষ তিরন্দাজ হিব্বান বিন আরিকা তাকে লক্ষ করে তির ছোড়ে, যার দরুন তার বাহুর রগ কেটে যায়।[৫৮৬] রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

৫৮৪. সিরাতে ইবনে হিশাম : ২/২২৩। এই ঘটনা সংক্ষিপ্তভাবে কিছু হাদিসের কিতাবে বর্ণিত হয়েছে। দেখুন : মুসান্নাফ ইবনে আবি শাইবাহ : হাদিস নং ৩৬৮১৬

৫৮৫. মুসনাদে আহমদ : হাদিস নং ২৫০৯৭

৫৮৬. সহিহ বুখারি : হাদিস নং ৪১২২ (কিতাবুল মাগাজি, বাবু মারজিয়িন নাবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিনাল আহযাব)

আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে মসজিদের ভেতরেই একটি তাঁবু গেড়ে অবস্থান করতে দেন, যেন তিনি তাকে কাছে রেখে ভালোভাবে শুশ্রূষা করতে পারেন।[৫৮৭] তার রক্ত বন্ধ হওয়ার কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছিল না। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি সলাকা গরম করে ক্ষতস্থানে সেক দেন। তারপরও আশানুরূপ ফল দেখা গেল না। হাত ফুলে যায়।[৫৮৮] এরপর তার ক্ষত ফেঁটে পুনরায় রক্ত বের হতে থাকে। নবীজি দ্বিতীয়বার সেক দেন। এই সময় সা'দ বিন মুআজ রাদিয়াল্লাহু আনহু দোয়া করেন, হে আল্লাহ, আমাকে সে পর্যন্ত মৃত্যু দিয়ো না, যতক্ষণ বনু কুরাইজার শাস্তি দেখে আমার চোখ শীতল না হয়।'

এই দোয়া কবুল হয়। সঙ্গে সঙ্গে তার রক্ত পড়া বন্ধ হয়ে যায়। তবে ঝুঁকি থেকেই যায়। কারণ আঘাত ছিল শাহরগে।[৫৮৯]

আমর বিন আবদে ওয়াদ্দের হত্যা

একদিন একটি অস্বাভাবিক ঘটনা ঘটে। শত্রু বাহিনীর কিছু বিখ্যাত অশ্বারোহী ক্ষিপ্রগতিতে ঘোড়া চালিয়ে খন্দকের কিনারে চলে আসে। তাদের মধ্যে আরবের সর্বস্বীকৃত বীর আমর বিন ওয়াদ্দও ছিল। সে হাঁক ছেড়ে বলে, 'আমার মোকাবেলা করার মতো কেউ আছে?' আলি রাদিয়াল্লাহু আনহু নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আরজ করলেন, 'আমি তার সঙ্গে লড়ব।' তিনি আলিকে বাধা দিয়ে বললেন, 'আলি, সে কিন্তু আমর বিন ওয়াদ্দ!'

আমর দ্বিতীয়বার একই হাঁক ছেড়ে কোনো উত্তর না পেয়ে বলতে থাকে, 'কোথায় তোমাদের সেই জান্নাত, যেখানে মৃত্যুর পর তোমরা যাওয়ার একিন রাখ?'

আলি রাদিয়াল্লাহু আনহু অস্থির হয়ে উঠতে উদ্যত হলে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবার বললেন, আলি বসে যাও। এ কিন্তু আমর বিন ওয়াদ্দ!'

তখন আলি রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, 'হোক না সে-ই।'

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে অনুমতি প্রদান করলে তিনি

৫৮৭. সহিহ বুখারি : হাদিস নং ৪৬৩ (কিতাবুস সালাত, বাবুল খায়মা ফিল মাসজিদ)হাদিসের ব্যাখ্যাকারগণ সুস্পষ্টভাবে বলেননি যে, এটি কোন মসজিদ ছিল। তবে যুক্তির নিরিখে বলা যায়, এটি যুদ্ধক্ষেত্র খন্দকের নিকটবর্তী মসজিদ ছিল। আর সেখানেই নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অবস্থান করছিলেন।

মসজিদে নববি উদ্দেশ্য নেওয়া এজন্য সম্ভব নয়, কারণ মসজিদে নববি যুদ্ধক্ষেত্র থেকে অনেক দূরে ছিল। আর সেখানে রাখলে কাছে থেকে শুশ্রুষা করার উদ্দেশ্য ব্যহত হবে।

৫৮৮. সহিহ মুসলিম : হাদিস নং ৫৮৭৮ (আততিব্ব, বাবুন লিকুল্লি দাইন দাওয়া)

৫৮৯. সুনানে তিরমিজি : হাদিস নং ১৫৮২ (আবওয়াবুত তাফসির, বাবু মা-জা-আ ফিন নুযুল আলাল হুক্‌ম)

তরবারি কোষমুক্ত করে পায়ে পায়ে হেঁটে যান। আমর বিন ওয়াদ্দ তাকে দেখে ঘোড়া থেকে নেমে স্ফুলিঙ্গের মতো চমকাতে-থাকা তরবারি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে। আলি রাদিয়াল্লাহু আনহু ঢাল দিয়ে তার আঘাত ঠেকান। কিন্তু আমর বিন ওয়াদ্দের হাতে এত শক্তি ছিল যে, তার তরবারি ঢাল কেটে আলি রাদিয়াল্লাহু আনহুর কপাল পর্যন্ত পৌঁছে যায়, তবে জখম করতে পারেনি।

আলি রাদিয়াল্লাহু আনহু দ্রুত নিজেকে সামলে নিয়ে তার কাঁধ ও গর্দান বরাবর এমন প্রচণ্ড আঘাত করেন যে, রক্তের ফোয়ারা বইতে থাকে। আমর বিন ওয়াদ্দ নেতিয়ে পড়ে। মুসলমানরা তখন আনন্দে তাকবিরধ্বনি দেন।[৫৯০]

যেসব অশ্বারোহী খন্দকের পারে এসেছিল, তারা আমর বিন ওয়াদ্দের পরিণতি দেখে পালিয়ে যায়।[৫৯১]

জোটে ভাঙ্গন

এরই মাঝে মিত্রজোটে ফাটল সৃষ্টির উপসর্গ দেখা দেয়। তার বড় কারণ ছিল, কিছু ইহুদির মনে সংশয় জাগে যে, যদি এ যুদ্ধে পরাজয় ঘটে, তা হলে তো জোট আমাদেরকে মুসলমানদের সম্মুখে ফেলে নিজ নিজ এলাকায় পালিয়ে যাবে।' তাই যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগেই এরা হুয়াই বিন আখতাবের কাছে গিয়ে বলে, তোমাদের জোটের উপর আমাদের আস্থা নেই। তাদের নিকট গিয়ে তাদের কিছু সম্মানিত ব্যক্তিকে আমাদের কাছে জামানত রাখতে বল।'

হুয়াই বিন আখতাব কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের কাছে গিয়ে চূড়ান্ত করে যে, সত্তরজন সম্মানিত ব্যক্তিকে বনু কুরাইজার কাছে জামানত রাখা হবে।[৫৯২]

যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর জোট সেই ওয়াদা পূরণের নামও মুখে নেয়নি। তখন ইহুদিদের সন্দেহ জোরাল হয় যে, জোট তাদের ধোঁকা দিয়ে ভেগে যাবে। ফলে তারা গোপনে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এই শর্ত মোতাবেক সন্ধির পয়গাম পাঠায় যে, তাদের গোত্র বনু নাজির, যাদের বিতাড়িত করে খাইবার পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে, তাদেরকে পুনরায় আবাদ হওয়ার অনুমতি দিতে হবে।[৫৯৩]

এই সময়ই বনু গাতফানের এক সরদার নুয়াইম বিন মাসউদ আশজায়ি ইসলাম গ্রহণ করেন; কিন্তু তার ইসলামগ্রহণ সম্পর্কে কেউ জানত না। সে এখানে-

---

৫৯০. সুনানে কুবরা, বাইহাকি : হাদিস নং ১৮৩৫০

৫৯১. সিরাতে ইবনে হিশাম : ২/২২৫

৫৯২. দালাইলুন নুবুওয়াহ, বাইহাকি : ৩/৪০১ মুসা বিন উকবা থেকে বর্ণিত।

৫৯৩. দালাইলুন নুবুওয়াহ, বাইহাকি : ৩/৪০৫ মুসা বিন উকবা থেকে বর্ণিত।

ওখানে কথা লাগানোর ক্ষেত্রে প্রসিদ্ধ ছিল। সম্ভবত সেজন্যই ইহুদিসহ বিভিন্ন কবিলা ও শ্রেণির সঙ্গে তার বিশেষ ওঠাবসা ছিল।

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে ডেকে এনে বললেন, 'তোমাকে একটি গোপন কথা বলছি। ইহুদিরা আমার নিকট সন্ধির পয়গাম পাঠিয়েছে এই শর্তে যে, বনু নাজিরকে পুনরায় মদিনাতে আবাদ হওয়ার অনুমতি দিতে হবে।'[৫৯৪] নুয়াইম বিন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু এই কথা শুনে উঠতে উঠতে বললেন, 'আমাকে অনুমতি দিন, ওদের সাথে আমার যা মনে চায় তা যেন বলতে পারি।'

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'তুমি একা মানুষ। যদি পার তা হলে জোটবাহিনীকে আমাদের থেকে হটিয়ে দাও। কারণ, যুদ্ধ হলো কৌশলের নাম।'[৫৯৫]

নুয়াইম রাদিয়াল্লাহু আনহু প্রস্থান করার পর নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'যুদ্ধ হলো কৌশলের নাম। আল্লাহ চাইলে এর দ্বারা আমাদের জন্য কোনো উপায় বের করে দিতে পারেন।'[৫৯৬]

নুয়াইম বিন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু প্রথমে বনু কুরাইজার নিকট গিয়ে তাদের বলেন, 'তোমাদের সাথে আমার বন্ধুত্ব ও কল্যাণকামিতার সম্পর্ক। এই কুরাইশ ও গাতফান তোমাদের পড়শি নয়। এটা তোমাদের এলাকা। এখানে তোমাদের স্ত্রী-সন্তানরা বসবাস করে। তোমরা এখন থেকে কোথাও যেতে পারবে না। তোমরা কুরাইশ-গাতফানিদের সঙ্গ দিচ্ছ; অথচ তাদের যদি পরাজয় হয়, তখন তারা তোমাদের ছেড়ে নিজ এলাকায় পালিয়ে যাবে।'[৫৯৭]

ইহুদিরা শুরু থেকেই জোটের প্রতি নাখোশ ছিল। তার কথায় তাদের সন্দেহ আরো বৃদ্ধি পায়। এবার নুয়াইম রাদিয়াল্লাহু আনহু কুরাইশের কাছে গিয়ে তাদের প্রতি দরদ দেখিয়ে বলে দেন যে, বনু কুরাইজা মুসলমানদের সাথে সন্ধি স্থাপনের চেষ্টা চালাচ্ছে। এই নতুন সংবাদ পেতেই জোটবাহিনীতে হইচই পড়ে যায়। অধিকাংশ লোক বলতে থাকে, 'আমাদের মত হলো, এখন ফিরে যাওয়া উচিত।'

কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ ইহুদিদের কাছে জামানত রাখার জন্য কিছু ব্যক্তির নামও নির্ধারণ করে দেয়, কিন্তু ওই ব্যক্তিরা এই সংবাদ শোনামাত্র শোরগোল করতে

---

৫৯৪. প্রাগুক্ত

৫৯৫. সিরাতে ইবনে হিশাম : ২/২২৯ ইবনে ইসহাক থেকে বর্ণিত। এই ঘটনাটি কিছু মুহাদ্দিসও সংক্ষিপ্তভাবে নকল করেছেন। দেখুন : মুসান্নাফ ইবনে আবি শাইবাহ : হাদিস নং ৩৬৮১০

৫৯৬. দালাইলুন নুবুওয়াহ, বাইহাকি : ৩/৪০৫ মুসা বিন উকবা থেকে বর্ণিত।

৫৯৭. সিরাতে ইবনে হিশাম : ২/২২৯ ইবনে ইসহাক থেকে বর্ণিত

থাকে যে, আমরা তো কখনোই ইহুদিদের দুর্গে যাব না। সেখানে আমাদের প্রাণনাশের আশঙ্কা আছে।'

আবু সুফিয়ান অনেক কষ্ট করে ইকরিমা বিন আবু জাহলকে বনু কুরাইজার কাছে এই বার্তা দিয়ে প্রেরণ করেন যে, 'আগামীকাল শনিবার আমরা চূড়ান্ত হামলা করব। তাই তোমরাও দুর্গ থেকে বের হয়ে আমাদের সাথে যুদ্ধে শরিক হবে।'

উত্তর আসে, আমাদের ধর্মে শনিবারে যুদ্ধ করা বৈধ নয়। তোমরা তোমাদের জামানত পাঠিয়ে দাও। আমরা রবিবারে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করব।'

ইকরিমা বিন আবু জাহল ফিরে এসে তাদের বক্তব্য শোনান। আবু সুফিয়ান অন্যান্য সরদারকেও তা অবহিত করেন। তখন তারা ইহুদিদের প্রতারণার ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে যায়।[৫৯৮]

---

৫৯৮. দালাইলুন নুবুওয়াহ, বাইহাকি : ৩/৪০৫ মুসা বিন উকবা থেকে বর্ণিত।

আমরা এখানে দালাইলুন নুবুওয়াহ গ্রন্থে উল্লিখিত মুসা বিন উকবা থেকে বর্ণিত এবং সিরাতে ইবনে হিশামে ইবনে ইসহাকের রেওয়ায়েত এমনভাবে সমন্বিত করার প্রয়াস চালিয়েছি, যাতে করে উভয় রেওয়ায়েতের বৈপরীত্যগুলো দূর হয়ে যায়। দুই রেওয়ায়েতের মাঝে মৌলিক বৈপরীত্য হল-

মুসা বিন উকবার রেওয়ায়েত অনুযায়ী নুয়াইম বিন মাসউদ রা. একজন বোকা এবং সঙ্কীর্ণমনা ছিলেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইচ্ছে করেই তার সামনে বনু কুরাইজার সাথে তার পত্রযোগাযোগের কথা আলোচনা করেছেন। তিনি অভ্যাসমত কুরাইশের কানে দিয়ে দেন। ফলে তারা ঘাবড়ে যায়।

ইবনে ইসহাকের রেওয়ায়েত অনুযায়ী নুয়াইম বিন মাসউদ রা. একজন সচেতন মানুষ ছিলেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শত্রুদের মাঝে ফাটল সৃষ্টির চেষ্টা করার জন্য দায়িত্ব দিয়েছিলেন তাকে।

অধিকাংশ ঐতিহাসিক ইবনে ইসহাকের রেওয়ায়েতটি গ্রহণ করেছেন। তার বর্ণনায় ঘটনার অধিক বিবরণ রয়েছে। হাফেজ ইবনে কাসির রহ. এর মতো একজন সমালোচক ইমামও এটি অধিক পছন্দ করেছেন। তবে আল্লামা শিবলি নুমানি রহ. কেবল মুসা বিন উকবার রেওয়ায়েতের উপর সীমাবদ্ধ থেকেছেন, ইবনে ইসহাকের রেওয়ায়েত গ্রহণযোগ্য মনে করেন না। যদি তার কারণ, এটি হয় যে ইবনে ইসহাকের তুলনায় মুসা বিন উকবা অধিক নির্ভরযোগ্য এবং রেওয়ায়েতের ক্ষেত্রে অধিক সতর্ক, তা হলে মূলনীতি অনুযায়ী তা ঠিক আছে। আর এজন্য আমরাও মুসা বিন উকবার রেওয়ায়েতকে অধিক গুরুত্বপূর্ণ মনে করি। কিন্তু কোন প্রাচ্যবিদের এই আপত্তি থেকে বাঁচার জন্য ইবনে ইসহাকের রেওয়ায়েতকে প্রত্যাখ্যান করা হয় যে, 'ঐ কর্মকাণ্ডটি ধোঁকা ও প্রতারণার উপর নির্ভর ছিল, যা নববিচরিত্রের সম্পূর্ণ পরিপন্থি'- তা হলে মুসা বিন উকবার রেওয়ায়েতের ক্ষেত্রেও তা প্রযোজ্য হয়। হজরত হুযাইফা রা. এর গোয়েন্দাবৃত্তির মধ্যেও তা বিদ্যমান।

মূলত প্রাচ্যবিদদের এই আপত্তি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। আর তাদের আপত্তির জবাব স্বয়ং নবীজিই সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদিসে দিয়েছেন : 'যুদ্ধ হলো কৌশল'।

প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করা যুদ্ধেও জায়েজ নেই। কেবল রাসুলুল্লাহ সা.-ই নয়; বরং কোনো সাহাবিও

ঝড়ের মৌসুম এবং জোটবাহিনীর ব্যর্থ প্রত্যাবর্তন

অবরোধের তিন সপ্তাহ অতিক্রান্ত হয়ে গিয়েছিল। শীতকাল তীব্রতর হচ্ছিল। অবরুদ্ধ এবং হানাদার- উভয়ের অবস্থাই মন্দ ছিল। পাশাপাশি ঝড়োহাওয়া প্রবাহিত হওয়া শুরু হয়ে গিয়েছিল। এটি ছিল আল্লাহ তায়ালার গায়েবি মদদ। ফলে জোটবাহিনীর মন একেবারে বিধ্বস্ত হয়ে পড়ে।

ঝড়ের মাঝে অন্ধকার রাতে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হুযাইফা রাদিয়াল্লাহু আনহুকে শত্রুশিবিরে গোয়েন্দাবৃত্তির জন্য প্রেরণ করেন। তিনি সেখানে গিয়ে দেখেন ঝড়োহাওয়া জোটবাহিনীর তাঁবু উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে, পশুপাল ধ্বংস করে দিচ্ছে, হাড়ি-পাতিল উলট-পালট করে দিচ্ছে। মুশরিক সরদাররা তখন অত্যন্ত অস্থির হয়ে ফিরে যাওয়ার পথ খুঁজছিল। পরিশেষে জোট সেনাপতি আবু সুফিয়ান ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত দিয়ে দেন।

হুযাইফা রাদিয়াল্লাহু আনহু ফিরে এসে এই সুসংবাদ শোনান। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনেক হাসেন। হুযাইফা রাদিয়াল্লাহু আনহু নিকষ অন্ধকারের মধ্যেই দাঁত মোবারকের পরিষ্কার ঝলক দেখতে পান। পরদিন জোটবাহিনী তাদের তাঁবু, ছাউনি সব নিয়ে প্রস্থান করে। তিন সপ্তাহ যাবৎ যুদ্ধের ডংকা বাজার পর মদিনার দিগন্ত পুনরায় পরিচ্ছন্ন হয়।[৫৯৯]

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জোটবাহিনীর প্রত্যাবর্তনের উপর মন্তব্য করতে গিয়ে বলেন, 'এখন থেকে আক্রমণ আমাদের পক্ষ থেকে হবে। তারা আমাদের উপর আর চড়াও হতে পারবে না।'[৬০০] এটি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বাস্তবায়িত হয়েছিল। এরপর আর কোনোদিন মক্কাবাসী নবীজির মদিনায় অভিযান পরিচালনা করতে পারেনি।

***

এই অপরাধ করেননি। হ্যাঁ, কূটনৈতিক লড়াই পৃথিবীর সব জাতিই করে থাকে। গুপ্তচরবৃত্তি এবং গোপন কার্যক্রম শত্রুদেরকে সর্বদা তটস্থ ও অস্থির করে রাখে। ইসলামি শরিয়ত এটাকে অনুমোদন করেছে। নবীজির হুকুমে সাহাবিগণের কাব বিন আশরাফকে ধোঁকা দিয়ে হত্যা করাও ঐ ধরনের একটি ঘটনা। এ প্রসঙ্গে সহিহ বুখারিতে কিতাবুল জিহাদে একটি অধ্যায় আনা হয়েছে الكذب في الحرب (যুদ্ধে মিথ্যা বলা) শিরোনামে। তা হলে কি এই রেওয়ায়েতও অস্বীকার করা হবে? যদি এর সুযোগ না রাখা হয়, তা হলে তো কোনো রাষ্ট্রেরই প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থা স্বাভাবিক রাখা এবং পালটা আক্রমণ ও প্রতিরোধ কার্যক্রম পরিচালনা করা সম্ভব হবে না।

৫৯৯. দালাইলুন নুবুওয়াহ, বাইহাকি : ৩/৪৪৯-৪৫৫, কানযুল উম্মাল : হাদিস নং ৩০০৮৪ ইবনে আসাকির থেকে বর্ণিত, সিরাতে ইবনে হিশাম : ২/২৩২

৬০০. সহিহ বুখারি : হাদিস নং ৪১১০ (কিতাবুল মাগাজি, বাবু গাজওয়াতি খান্দাক)

গাজওয়ায়ে বনু কুরাইজা

[যিলকদ ৫ম হিজরি]

মুসলমানরা যুদ্ধক্ষেত্র থেকে যার যার ঘরে ফিরে গিয়েছিলেন। হজরত সা'দ বিন মুআজ রাদিয়াল্লাহু আনহু আহত হওয়ায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে নববির আঙিনায় একটি তাঁবু টানিয়ে সেখানেই তাকে স্থানান্তর করেন। উদ্দেশ্য ছিল তার চিকিৎসার পূর্ণ তদারকি করা। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাতিয়ার রেখে কেবল গোসল করেছেন, এমন সময় জিবরাইল আলাইহিস সালাম ধূলিধূসরিত অবস্থায় আগমন করেন এবং বলেন, 'আপনি হাতিয়ার রেখে দিয়েছেন; অথচ আমরা এখনও হাতিয়ার রেখে দিইনি। আপনি আক্রমণ করুন।' জিজ্ঞেস করলেন, 'কোথায়?' জিবরাইল আলাইহিস সালাম বনু কুরাইজার দিকে ইশারা করলেন।[৬০১]

জিবরাইল আলাইহিস সালামের এভাবে নাজিল হওয়ার পেছনে কারণ ছিল, আল্লাহ তায়ালার হুকুম যেন সবার নিকট সুস্পষ্ট হয়ে যায় এবং এই অভিযান সঠিক ও জরুরি হওয়ার ব্যাপারে কারো সংশয় না থাকে। জিবরাইল আলাইহিস সালাম আগমন না করলেও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং সাহাবায়ে কেরাম বনু কুরাইজার দুষ্কৃতি এবং বিশ্বাসঘাতকতার কথা ভুলে যাননি। তারাই তো যুদ্ধের এমন নাজুক মুহূর্তে মুসলমানদের পিঠে খঞ্জরাঘাত করেছিল। সর্বোপরি নবীজি এত বড় মিশনের পর সাহাবিদেরকে কিছুটা বিশ্রামের সুযোগ দিতে চাচ্ছিলেন।

যা হোক, আসমান থেকে হুকুম আসার পর আর বিলম্ব করার সুযোগ নেই। তাই খন্দক থেকে ফেরত আসার দিনই ক্লান্ত-পরিশ্রান্ত সাহাবিদের বনু কুরাইজা অভিমুখে প্রেরণ করে নির্দেশ দেন যে, 'তোমাদের কেউ যেন বনু কুরাইজায় পৌঁছার পূর্বে আসরের নামাজ আদায় না করে।'

সাহাবায়ে কেরাম খুব দ্রুতগতিতে রওনা হয়ে যান। কিন্তু রাস্তাতেই আসরের সময় হয়ে যায়। তখন কিছু সাহাবি ভাবেন যে, আল্লাহর নবীর উদ্দেশ্য ছিল দ্রুত সফর করা, নামাজ বিলম্ব করা তার কথার উদ্দেশ্য ছিল না।

---

৬০১. সহিহ বুখারি : হাদিস নং ২৮১৩ (কিতাবুল জিহাদ, বাবু গাসলিন বা'দাল হারবি ওয়াল গুবার), হাদিস নং ৪১১৭ (কিতাবুল মাগাজি, বাবু মারজিয়িন নাবিয়্যি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিনাল আহযাব)

কিছু সাহাবি নবীজির নির্দেশ হুবহু পালন করে বনু কুরাইজার দুর্গের সামনে গিয়ে বিলম্ব করে আসরের নামাজ আদায় করেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কারো আমল ভুল সাব্যস্ত করেননি।[৬০২] এই ধরনের ঘটনা থেকে ইজতিহাদের শরিয়তসিদ্ধতা প্রমাণিত হয়।

১ যিলকদ সন্ধ্যার ভেতরে বনু কুরাইজার সবকটি দুর্গ অবরোধ সম্পন্ন হয়। পরিশেষে বনু কুরাইজা ২৫ দিন পর হিম্মত হারিয়ে ফেলে এবং হাতিয়ার সমর্পণ করে।[৬০৩] চূড়ান্ত হয়- তাদের ভবিষ্যতের সিদ্ধান্ত দেবেন সা'দ বিন মুআজ রাদিয়াল্লাহু আনহু।

তিনি ইসলাম গ্রহণের পূর্বে বনু কুরাইজার ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। এজন্য কেবল বনু কুরাইজাই নয়; বরং আনসারদেরও আশা ছিল অতীত সম্পর্কের কারণে তিনি হয়তো তাদের ব্যাপারে কঠোর সিদ্ধান্ত দেবেন না। সর্বোচ্চ বনু কাইনুকা এবং বনু নাজিরের মতো দেশান্তর করার শাস্তি দেবেন। তবে অবশ্যই তাদের প্রাণভিক্ষা দেবেন। কিন্তু সেদিন সা'দ বিন মুআজ রাদিয়াল্লাহু আনহুর দৃষ্টি কেবল ইসলামের উপকার ছাড়া কোনো দিকে নিবদ্ধ ছিল না। তিনি সব আত্মীয়তা সম্পর্কের কথা ভুলে যান। তাকে যখন তুলে এনে বিচার মজলিসে হাজির করা হলো, তখন তিনি বলেন, 'আমি আজ আল্লাহ ও তার রাসুলের খাতিরে কারো তিরস্কারের পরোয়া করব না।'

উভয়পক্ষের সম্মতিতেই তাকে ফয়সালাকারী নির্বাচন করা হয়েছিল। তিনি ঘোষণা দিলেন, 'বনু কুরাইজার যুদ্ধ করতে সক্ষম পুরুষদের হত্যা করা হবে, নারীদের বাঁদি এবং শিশুদের গোলাম বানানো হবে।'

এই ফয়সালা শুনে সকলেই স্তব্ধ হয়ে যায়। তবে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'সাদ আল্লাহর ফয়সালা মোতাবেক সিদ্ধান্ত দিয়েছে।'[৬০৪]

সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কাজ করা হয়। বনু কুরাইজার ৪০০ পুরুষ যোদ্ধাকে হত্যা করা হলো। সাদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বনু কুরাইজার পরিণতি দেখার জন্যই এতদিন বেঁচে ছিলেন। এরপরই তার ক্ষতস্থান থেকে রক্ত ঝরতে থাকে এবং তারপর তিনি আল্লাহর সান্নিধ্যে চলে যান।[৬০৫]

---

৬০২. সহিহ বুখারি : হাদিস নং ৪১১৯ (কিতাবুল মাগাজি, বাবু মারজিয়িন নাবিয়্যি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিনাল আহযাব)

৬০৩. আল মুহাব্বার, পৃষ্ঠা ১১৩।

ثم غزوة بني قريظة، خرج إليها في اليوم الذي انقضى أمر الخندق، فحاصرهم خمسة وعشرين يومًا

৬০৪. সহিহ মুসলিম : হাদিস নং ৪৬৯৫ (কিতাবুল জিহাদ, বাবু জাওয়াযি কিতালি মান নাকাযাল আহদা)

৬০৫. সুনানে তিরমিজি : হাদিস নং ১৫৮২ (আবওয়াবু সিয়ার, বাবু মা-জা-আ ফিন নুযুলি আলাল হুকমি), মুসনাদে আহমদ : হাদিস নং ১৪৭৭৩ (উভয়টির সনদ সহিহ)

বনু কুরাইজার সাথে এই আচরণ নিশ্চিত নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অভ্যাস পরিপন্থি ছিল। তাদেরকে প্রাণভিক্ষা দিতে পারতেন। কিন্তু তাদের শাস্তি দেওয়াকেই প্রাধান্য দেন। তার প্রধান কারণ ছিল আল্লাহর হুকুম। আল্লাহ তায়ালা যেভাবে জিবরাইল আলাইহিস সালামকে পাঠিয়ে বনু কুরাইজার উপর হামলা একদিন মুলতবি করার সুযোগ রাখেননি। তেমনিভাবে এ ধরনের অপরাধীদের অনুরূপ শাস্তিই আসমানে নির্ধারিত হয়েছিল, যা সা'দ বিন মুআজ রাদিয়াল্লাহু আনহুর জবানে উচ্চারিত হয়েছে। পৃথিবীর পূর্ববর্তী এবং বর্তমান আইন অনুযায়ীও রাষ্ট্রদ্রোহীদের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। এমনকি ইহুদিদের ধর্মীয় গ্রন্থ তাওরাতেও এ ধরনের অপরাধের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড বলা হয়েছে। তদ্রূপ ওল্ড টেস্টামেন্টে আছে যে, 'আল্লাহ যদি কোনো শহরকে আপনার কর্তৃত্বে অর্পণ করেন, তা হলে সেখানকার সকল পুরুষকে তরবারি দিয়ে কতল করবেন।'[৬০৬]

এখন প্রশ্ন ওঠে আসমানি হুকুম ছাড়া তাদের ব্যাপারে উক্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার যৌক্তিক বিশেষ কোনো কারণ ছিল কি না? উত্তর হ্যাঁ ছিল। তারা কেবল ইহুদি ছিল বলেই এমন আচরণ করেছেন; এমনটি নয়। বনু কাইনুকা, বনু নাজিরও তো ইহুদি গোত্র; তাদের সঙ্গে তো এত কঠোর আচরণ করেননি। বনু কুরাইজা প্রকৃতিগতভাবেই দুষ্কৃতিকারী এবং অনিষ্টকারী হওয়ার কারণে তাদেরকে এমন

বনু কুরাইজার যোদ্ধা সংখ্যা কত ছিল, যাদেরকে হত্যা করা হয়েছে? ইবনে হিশাম ৬০০, ৭০০, ৮০০, ৯০৪টির মত উল্লেখ করেছেন। প্রসিদ্ধ রেওয়ায়েত মোতাবেক হুয়াই বিন আখতাব কুরাইশের সঙ্গে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হওয়ার সময় ৭০০ লোক দেওয়ার অঙ্গীকার করেছিল। [আলমাগাজি, ওয়াকিদি : ২/৪৫৪] তবে তিরমিজি এবং মুসনাদে আহমদের সহিহ রেওয়ায়েতে ৪০০ লোক হত্যার কথা উল্লেখ হয়েছে।

উভয় রেওয়ায়েতের মাঝে সামঞ্জস্য এভাবে হতে পারে যে, ইহুদিদের দাবি কিংবা তাদের গণনা অনুযায়ী যোদ্ধা অনেক ছিল। তারা সাধারণত বয়োঃসন্ধিতে উপনীত বালকদেরও তরবিয়ত দিয়ে যোদ্ধাদের মধ্যে গণ্য করত। কিন্তু মুসলমানরা অনেকের ব্যাপারে সন্দেহ হলে ছেড়ে দেন। যেমন কয়েদিদের মধ্যে একজন আতিয়্যা আলকুরাজির নিজের বক্তব্য ছিল যে, আমি ডাক্তারি পরিক্ষায় বালক প্রমাণিত না হওয়ায় আমাকে ছেড়ে দেওয়া হয়। [মুসতাদরাকে হাকিম : হাদিস নং ৮১৭৩]

এও হতে পারে যে, কয়েদিদের মধ্যে কেউ কেউ মুসলমান হয়ে গেছেন যেমন আতিয়্যা আলকুরাজি রা.এর একটি দৃষ্টান্ত হাদিসের কিতাবাদিতে রয়েছে।

সর্বোপরি মনে রাখতে হবে, নারী এবং নাবালেগ বাচ্চাদেরকে হত্যা করা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। কেবল একজন মহিলা এমন ছিল যে, যুদ্ধে অংশ নিয়েছিল এবং খাল্লাদ বিন সুওয়াইদ রা. কে ভারি পাথর নিক্ষেপ করে শহীদ করে দিয়েছিল। [সিরাতে ইবনে হিশাম : ২/২৪২] সে এই অপরাধ গর্বভরে স্বীকারও করে। ফলে তাকে এই অপরাধের কারণে হত্যা করা হয়। [সুনানে আবু দাউদ : হাদিস নং ২৬৭১, কিতাবুল জিহাদ, বাবুন ফি কাতলিন নিসা]

৬০৬. বাইবেল, ইসতিসনা, অধ্যায় : ২০, আয়াত ১০-১৪

শাস্তি দেওয়া হয়নি। কেননা, অন্যান্য ইহুদিগোষ্ঠীও তো ফেতনাবাজ ও অনিষ্ট সৃষ্টিকারী ছিল, তাদেরকে কেন দেশ থেকে বিতাড়িত করা হয়েছিল। তদুপরি বনু কুরাইজার মতো শাস্তি তাদেরকে পেতে হয়নি; তার কারণ কী?

গভীরভাবে ফিকির করলে বুঝতে পারবেন যে, বনু কাইনুকা এবং বনু নাজিরের দুষ্কৃতি ও দুষ্টামি সাধারণ অবস্থায় হয়েছিল, অন্যদিকে ইসলামি হুকুমত যখন বহিঃশত্রুর আক্রমণের মুখোমুখি, ঠিক তখনই বনু কুরাইজা প্রকাশ্যভাবে বিদ্রোহ করে। এর ফলে তাদের অপরাধের মাত্রাও বৃদ্ধি পেয়েছিল। তাই তাদের অপরাধের মাত্রা বিবেচনায় শাস্তিও তেমন কঠোর হওয়াই উচিত ছিল।

তবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যদি তার সহজাত দয়া-মায়ার বদৌলতে তাদেরকে ক্ষমা করে দিতেন, তা হলে কি শাস্তি কোনো অংশ কমে যেত? উত্তর হলো, জি হ্যাঁ, নিশ্চয় কমে যেত। কারণ এ কথা পরিষ্কার যে, বনু কুরাইজাকে ক্ষমা করে দিলেও তাদেরকে নিজেদের জায়গায় বহাল রাখার সুযোগ তারা ঠিকই নিত। আর তখন এর অর্থ হতো আস্তিনের নিচে সাপ পোষা। যদি তাদেরকে দেশান্তর করা হতো তখন তার ফল কী দাঁড়াত?

ইতোপূর্বে বনু কাইনুকা এবং বনু নাজিরের বহুলোক বিতাড়িত হয়ে খাইবারদুর্গে গিয়ে আস্তানা গেড়েছে, সেখানে তাদের একটি বড় সমাজ গড়ে উঠেছে, যা মদিনার নিরাপত্তার জন্য ঝুঁকিপূর্ণ। এখন যদি বনু কুরাইজার লোকেরা গিয়ে ওঠে, তা হলে তারা বড় শক্তিতে পরিণত হবে। এই কারণে বনু কুরাইজাকে মাফ করে দিলে সেটা নিজের পায়ে কুঠারাঘাত হতো।

এখানে একটি সহজাত মানবিক দাবি এবং সামাজিক দর্শনের দিকেও দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে, তা হলো, কোনো ক্ষমতাবান ব্যক্তি, যার মাফ করা, শাস্তি দেওয়া- দুটোরই সক্ষমতা রয়েছে, তাকে তখনোই ক্ষমতাবান বলা হবে যখন তিনি মাঝেমধ্যে ক্ষমা করবেন, মাঝেমধ্যে শাস্তি দেবেন। কিন্তু যদি কখনো শাস্তি না দিয়ে সর্বদা ক্ষমাই করে যান, তা হলে সাধারণ মানুষ বুঝবে যে, তার কোনো নিজস্ব ক্ষমতা নেই, শাস্তি দেওয়ার ক্ষমতা তাকে দেওয়াই হয়নি। এই ধারণার আবশ্যক ফল হলো, অত্যাচারী, অপরাধী, চরিত্রহীন ও চোরদের দৌরাত্ম্য বাড়িয়ে তোলা। তারা তখন নির্ভয়ে তাদের কর্মকাণ্ড চালিয়ে যাবে। আর সমাজ থেকে আইনের প্রতি শ্রদ্ধাবোধও উঠে যাবে।

শাস্তির ভয়ই অপরাধীদেরকে তাদের অপরাধকর্ম থেকে নিবৃত রাখতে পারে। আর তাদের এই ডর-ভয় তখনই অবশিষ্ট থাকবে, যখন শাস্তি সঠিকভাবে কার্যকর হবে। সৃষ্টিজীবের সর্বোচ্চ বিচারক আল্লাহ তায়ালাও অধিকাংশ সময় ক্ষমা করে দেন, তবে মাঝেমধ্যে আদ-সামুদের মতো উপযুক্ত শাস্তি দিয়ে

অন্যদের সতর্ক করেন। তদ্রূপ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অধিকাংশ স্থানেই দয়া-মায়া ও ক্ষমার বহিঃপ্রকাশ ঘটে, তবে কখনো এর ব্যতিক্রমও হয়। তিনি শাস্তি দেন। অপরাধীদের উপর হদ-কিসাস (দণ্ড) কার্যকর করার একাধিক দৃষ্টান্ত নববি সুন্নাতে খুঁজে পাওয়া যায়। কিন্তু নবীজির সিরাতে কোনো গোত্রের সামষ্টিক অপরাধের কারণে সামাজিকভাবে শাস্তি দেওয়ার কেবল এটিই একমাত্র উদাহরণ। এ ছাড়া সুনির্দিষ্ট অপরাধী ব্যতীত অধিকাংশের ব্যাপারে তার ক্ষমা ও দয়ার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। নবীজির এমন কঠিন আচরণও রহমতস্বরূপ ছিল। কারণ, এমনটি না করলে তৎকালীন ইসলামি হুকুমতের বিরুদ্ধে চক্রান্ত ও বিদ্রোহের শাস্তি প্রয়োগ করা কঠিন নয়; বরং অসম্ভব হয়ে পড়ত। জঘন্য থেকে জঘন্যতর বিদ্রোহী ও ষড়যন্ত্রকারীরাও পার পেয়ে যেত। 'নবীয়ে রহমত' গ্রন্থের লেখকের পর্যালোচনা পড়ে দেখার মতো। তিনি লেখেন, 'রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বনু কুরাইজার সাথে যে আচরণ করেছেন, তা যুদ্ধনীতি এবং আরবের ইহুদি কবিলাগুলোর স্বভাব-প্রকৃতি মোতাবেকই ছিল। এ ধরনের কঠিন ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদানের প্রয়োজন ছিল। এর ফলে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গকারী ও ধোঁকাবাজদের জন্য আজীবন শিক্ষা হয়ে যাবে এবং তাদের বংশধররাও এ ধরনের কাজের দুঃসাহস দেখাবে না।'[৬০৭]

***

৬০৭. নবীয়ে রহমত, মাওলানা আবুল হাসান আলি নদবি রহ., পৃষ্ঠা ৩৪৫

খন্দক পরবর্তী কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা

গাজওয়ায়ে খন্দকের পর ৫ম হিজরির শেষে এবং ৬ষ্ঠ হিজরির মাঝামাঝিতে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা সংঘটিত হয়। তন্মধ্যে কিছু ছিল নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ব্যক্তিজীবন সংশ্লিষ্ট আর কিছু ঘটনা ছিল মদিনার হুকুমত ঘনিষ্ঠ। নিম্নে সংক্ষিপ্তভাবে সেসব তুলে ধরছি :

১. নবীজি সা. এর সঙ্গে যায়নাব বিনতে জাহশের বিবাহ [যুলকাদা ৫হিজরি]

যায়েদ বিন হারিসা রাদিয়াল্লাহু আনহু তখনও নবীজির পালকপুত্র ছিলেন। লোকেরা তাকে যায়েদ বিন মুহাম্মদ বলে ডাকত। তিনি পূর্ণ যুবক বয়সে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বলার পর উম্মে আইমান রাদিয়াল্লাহু আনহাকে বিয়ে করেছিলেন, যিনি তার থেকে দ্বিগুণ বড় ছিলেন। এখন যায়েদ রাদিয়াল্লাহু আনহুর বয়স প্রায় চল্লিশ, আর উম্মে আইমান রাদিয়াল্লাহু আনহা অতিশয় বৃদ্ধ। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেয়াল হয়, তার একজন যুবতী স্ত্রী দরকার। তাই রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরাইশবংশের এক নারী যায়নাব বিনতে জাহশকে নির্বাচন করেন।

যায়নাব রাদিয়াল্লাহু আনহা অত্যন্ত উঁচুবংশীয়, ইবাদতগুজার ও দানশীল নারী ছিলেন। যায়েদ রাদিয়াল্লাহু আনহুর সঙ্গে বিয়ের ব্যাপারে তার মোটেই আগ্রহ ছিল না। কিন্তু নবীজির মতো ব্যক্তিত্ব যায়েদের অভিভাবক হয়ে যখন বিয়ের পয়গাম পাঠান, তখন তিনি কেবল এটুকু বলে নিজের অভিমত পেশ করেন যে, 'তাকে আমার পছন্দ নয়'। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন তাকে বললেন, 'তবে আমি তাকে তোমার জন্য পছন্দ করছি।'

যায়নাব রাদিয়াল্লাহু আনহা নবীজির কথার সামনে চুপ হয়ে যান। বিয়ে অনুষ্ঠিত হয়। কিছুদিন সংসার ভালোই চলে। কিন্তু ধীরে ধীরে প্রকাশ পেতে শুরু করে তাদের মধ্যে মনোমালিন্য। তাদের মাঝে বনিবনা হচ্ছিল না। যায়েদ রাদিয়াল্লাহু আনহু নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট গিয়ে তাদের মধ্যকার সমস্যা তুলে ধরে তাকে তালাক দেওয়ার ইচ্ছা ব্যক্ত করেন। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'যায়েদ, তার সঙ্গে সংসার করো।' কিন্তু যায়েদ রাদিয়াল্লাহু আনহু একপর্যায়ে তাকে তালাক দিয়েই দেন।

যায়নাব রাদিয়াল্লাহু আনহা ইদ্দত পালন করছিলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনুধাবন করতে পারছিলেন যে, এই মহিলা দিলে যে চোট পেয়েছে, আমি যদি তাকে বিয়ে করে নিই তা হলেই কেবল তা দূর হবে। কিন্তু আরবে পালকপুত্রকে ঔরসজাত পুত্রের মতোই মনে করা হতো এবং তার স্ত্রীকে আপন পুত্রবধূর মতো ভাবা হতো। তাই নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খুব সংশয় জাগে যে, এই বিবাহ অনুষ্ঠিত হলে সমাজে অত্যন্ত অবাক ব্যাপার সাব্যস্ত হবে। বিধর্মীরা আপত্তি তুলবে। আপনজনদের মনেও কুমন্ত্রণা সৃষ্টি হবে। ফলে এটি তাদের দীন ও ঈমানের ত্রুটির কারণ হবে।

তখনই আল্লাহ তায়ালা সুরা আহযাবের প্রথম আয়াতগুলো নাজিল করে উপর্যুক্ত সব আপত্তির অবসান ঘটান। ইরশাদ হয়েছে-

وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ * ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ

এবং তোমাদের পোষ্যপুত্রদেরকে তোমাদের পুত্র করেননি। এগুলো তোমাদের মুখের কথা মাত্র। আল্লাহ ন্যায় কথা বলেন এবং পথপ্রদর্শন করেন। তোমরা তাদেরকে তাদের পিতৃপরিচয়ে ডাক। এটাই আল্লাহর কাছে ন্যায়সঙ্গত।[৬০৮]

লোকেরা তখন ইবনে মুহাম্মদ বলা থেকে বিরত হয়। তাকে যায়েদ বিন হারিসা বলা শুরু হয়।[৬০৯] এদিকে যায়নাব বিনতে জাহশের ইদ্দত শেষ হয়ে গেলে

৬০৮. সুরা আহযাব, আয়াত ৪, ৫

৬০৯. তাফসিরে ইবনে কাসির, সুরা আহযাব; উসদুল গাবা : যায়েদ বিন হারিসা এবং যায়নাব বিনতে জাহশের রা. জীবনী।

গুরুত্বপূর্ণ দ্রষ্টব্য : নবীজির (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সাথে যায়নাব বিনতে জাহশ রা. বিবাহপ্রসঙ্গে তাবাকাতে ইবনে সা'দ, তারিখুত তাবারি : জালালাইনসহ কিছু তাফসিরগ্রন্থে এমন কিছু রেওয়ায়েত এসেছে, যেগুলোর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে,

যায়নাব রা. এর উপর নবীজির হঠাৎ দৃষ্টি পড়লে তাকে পছন্দ হয়ে যায়, আর তারপরই যায়েদ রা. তাকে তালাক দিয়ে দেন।

প্রাচ্যবিদরা এসব রেওয়ায়েতকে ইসলামের অকাট্য ও দ্ব্যর্থহীন মনে করে রাসুলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইসমতের (নিষ্কলুষতা) উপর আপত্তি তুলে। অথচ এসব রেওয়ায়েতের সনদ দুর্বল এবং যৌক্তিকভাবেও তা সম্পূর্ণ মূল্যহীন।

মুহাক্কিক ওলামায়ে কেরাম যেমন ইমাম আবু বকর বাকিল্লানি, ইবনে হাযম, কাযি ইয়ায, কুরতুবি, ইবনে কাসির, ইবনে কাইয়েম এবং ইবনে হাজার আসকালানি রহ. একাধিক কারণে ঐ রেওয়ায়েতগুলো প্রত্যাখ্যান করেন। উদাহরণত : ঐ রেওয়ায়েতগুলোর রাবি আবদুর রহমান বিন যায়েদ বিন আসলাম মুহাদ্দিসদের কাছে দুর্বল। তিনি সাহাবি নয়, তাবেয়ী। তার আগে নিশ্চয় একাধিক রাবি রয়েছে, যাদের কাছ থেকে এই ঘটনাটি রেওয়ায়েত করেছেন। যেহেতু মাঝের রাবিদের কথা জানা যায় নি, তো সনদের দৃষ্টিকোণ থেকে তা এমনিতেই মুনকাতি ও অনির্ভরযোগ্য। তা ছাড়া এ রেওয়ায়েতগুলোর কিছু

আল্লাহ তায়ালা নিজেই ওহীর মাধ্যমে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে তার বিয়ে দিয়ে দেন।[৬১০] ইরশাদ হয়েছে-

فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا

অতঃপর যায়েদ যখন যায়নাবের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করল, তখন আমি তাকে আপনার সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ করলাম, যাতে মুমিনদের পোষ্যপুত্ররা তাদের স্ত্রীর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করলে সেসব স্ত্রীকে বিবাহ করার ব্যাপারে মুমিনদের কোনো অসুবিধা না থাকে। আল্লাহর নির্দেশ কার্যে পরিণত হয়েই থাকে।[৬১১]

এই আয়াতে কেয়ামত পর্যন্ত আগত আপনপুত্র এবং পালকপুত্রের অধিকার ও দায়িত্বের মাঝে ব্যবধান সম্পর্কে সুস্পষ্টভাবে বলে দেওয়া হয়েছে।

২. নবীজি সা. এর সঙ্গে উম্মে হাবিবার বিবাহ

৬ষ্ঠ হিজরিতে হাবশার শাসক নাজাশি আসহামা রহ. হাবশায় বসবাসরত মুহাজির উম্মে হাবিবা বিনতে আবু সুফিয়ানের সঙ্গে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিয়ে পড়িয়ে দেন। নিজের পক্ষ থেকে ৪০০ দিনার মোহর পরিশোধ করেন। নাজাশি তাকে শুরাহবিল বিন হাসানার হেফাজতে মদিনায় পৌঁছে দেন। তখন উম্মে হাবিবার বয়স ছিল ৩৩ বছর থেকে কিছু বেশি।[৬১২]

৩. সারিয়া আবু উবাইদা রাদিয়াল্লাহু আনহু (সাইফুল বাহর)

গাজওয়ায়ে খন্দকে চরম লজ্জাজনক পরাজয়ের শিকার হয়ে আরবের মুশরিকরা দগ্ধ হচ্ছিল। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই সুযোগ

ওয়াকিদি থেকেও বর্ণিত হয়েছে, আর ওয়াকিদিও জয়িফ রাবি। এমন রেওয়ায়েত আকিদা ও হুকুম-আহকামের হালাল -হারামের ক্ষেত্রে দলিল হতে পারে না।

এটাও গভীরভাবে চিন্তা করা উচিত যে, নিজের অন্তরের কথা তো কেবল স্বয়ং নবীজি কিংবা আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করে দিতেন। এমন কোন সুস্পষ্ট বক্তব্য না নবীজির মুখে, না আল্লাহর কালামে পাকে কোথাও বর্ণিত হয়েছে, যার মাধ্যমে প্রাচ্যবিদদের দাবী প্রমাণিত হবে। নিশ্চয়ই এই কথাটি সনদের কোন অজ্ঞাত রাবি মনগড়াভাবে প্রবিষ্ট করে করে দিয়েছে, যা কোনভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। ডক্টর আবদুল কারিম তার الوعد المنجز في نقد النص المؤسس গ্রন্থে এই বিষয়টি অত্যন্ত তাত্ত্বিকভাবে আলোচনা করেছেন, তা দেখা যেতে পারে।

৬১০. বিবাহ ৫ম হিজরির যিলকদ মাসে হয়েছিল। যায়নাব রা. এর বয়স তখন ৩৫ বছর ছিল। [সিয়ারু আলামিন নুবালা : ২/২২০, ২২১]

৬১১. সুরা আহযাব : ৩৭

৬১২. সিয়ারু আলামিন নুবালা : ২/২২০, ২২১

কাজে লাগান। কুরাইশের অর্থনীতিতে আরো ধস নামানোর ইচ্ছা পোষণ করেন। তিনি আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহ রাদিয়াল্লাহু আনহুর নেতৃত্বে ৩০০ সৈন্য দিয়ে সমুদ্র উপকূলবর্তী 'সাইফুল বাহর' নামক স্থানে মোতায়েন করেন, কুরাইশের বাণিজ্যকাফেলা যেন রাস্তা পরিবর্তন করেও শাম যেতে না পারে।

প্রচণ্ড গরমের মৌসুম এবং নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী ও রসদের অপর্যাপ্ততা সত্ত্বেও এই বাহিনী রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হুকুম অনুযায়ী তাদের দায়িত্ব পরিপূর্ণরূপে আঞ্জাম দিয়ে যান। তীব্র গরমে ক্ষুধার জ্বালায় তারা খাবাত তথা বাবলা বৃক্ষের পাতা খান। তাই ওই বাহিনীকে 'জাইশুল খাবাত' বলা হয়ে থাকে।

এরপর আল্লাহ তায়ালা তাদের মদদ করেন। উপকূলের তীরে এক বিরাট মাছ আছড়ে পড়ে। মুসলমানরা প্রথমে সঙ্কোচবোধ করে যে, এটা মৃত প্রাণী নয় তো? কিন্তু আবু উবাইদা রাদিয়াল্লাহু আনহু নিজের ফিকহ ও ইজতিহাদের যোগ্যতা কাজে লাগিয়ে বলেন, 'আমরা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রেরিত আল্লাহর পথের মুসাফির। তোমরা এটি খাও।'

৩০০ লোকের এই বাহিনী আঠারো দিন পর্যন্ত আল্লাহ তায়ালার এই মেহমানদারি উপভোগ করেন এবং ফেরার সময় পর্যাপ্ত পরিমাণ গোশত সঙ্গেও নিয়ে আসেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই গোশত গ্রহণ করেন এবং একে আল্লাহ তায়ালার নুসরত ও পুরস্কার বলে অভিহিত করেন।[৬১৩]

৪. মক্কার তিনজন নিপীড়িত মুসলমানের মুক্তি

মক্কাতে কিছু মুসলমান মানবেতর জীবনযাপন করছিলেন। তন্মধ্যে একজন ছিলেন আইয়াশ বিন আবু রবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু। তিনি আবু জাহলের বৈমাত্রেয় ভাই ছিলেন। হাবশার দ্বিতীয় হিজরতে তিনি শামিল ছিলেন। তারপর আবার মক্কা চলে আসেন।

হজরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর সফরসঙ্গী হয়ে মদিনায় এসে কুবাতে বসবাস শুরু করলে সেখানে আবু জাহল উপস্থিত হয়, এবং এই বলে তাকে ফিরিয়ে

৬১৩. সহিহ বুখারি : হাদিস নং ৪৩৬০ (কিতাবুল মাগাজি, গাজওয়া সাইফুল বাহর), সহিহ মুসলিম : হাদিস নং ৫১০৯ (কিতাবুস সায়দ ওয়ায যাবাইহ, বাবু ইবাহাতি মায়তাতিল বাহর)

অধিকাংশ ঐতিহাসিক ওয়াকিদির রেওয়ায়েত মোতাবেক একে ৮ হিজরিতে মক্কা বিজয়ের পূর্বে সংঘটিত ঘটনা বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু এটি সঠিক না হওয়ার কারণ হলো, সময়টা তখন কুরাইশের সাথে সন্ধির সময় ছিল। এ সময় কাফেলা আটকানো বৈধ ছিল না। আল্লামা সালেহ আশশামী এর উপর গবেষণামূলক আলোচনা করে ৬ষ্ঠ হিজরি কিংবা তার আগের ঘটনা বলে উল্লেখ করেছেন। [সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ : ৬/১৭৮, ১৭৯]

নিয়ে যায় যে, তোমার মায়ের অবস্থা খুব খারাপ হয়ে গেছে। তিনি কসম খেয়েছেন যে, তোমাকে যদি না দেখতে পান তা হলে তার ছায়াতেও আমাকে বসতে দেবেন না।' হজরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর বারণ সত্ত্বেও মাকে দেখার জন্য তিনি মক্কায় রওনা হয়ে যান। কিন্তু কাফেররা তাকে গ্রেফতার করে জিঞ্জিরে বেঁধে ফেলে।[৬১৪]

সালামা বিন হিশাম রাদিয়াল্লাহু আনহুও হাবশার দ্বিতীয় হিজরতে শামিল ছিলেন এবং পুনরায় মক্কায় ফিরে এসেছিলেন। তাকে হিজরত থেকে বাধা প্রদানের জন্য বন্দি করে রাখা হয়। আবু জাহল তাকে মারধর করত এবং ক্ষুধার্ত রাখত।[৬১৫]

ওয়ালিদ বিন ওয়ালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু মশহুর কাফের সরদার ওয়ালিদ বিন মুগিরার ছেলে। গাজওয়ায়ে বদরে তিনি মুশরিকদের দলেই ছিলেন। পরাজিত হওয়ার পর মুসলমানদের হাতে বন্দি হন। আর তখনই তার দিলে ইসলামের সত্যতা গভীরভাবে প্রকাশ পায়। কিন্তু মুখে তা প্রকাশ করেননি। কিছুদিন পর তার আত্মীয়স্বজন এসে ফিদিয়া (মুক্তিপণ) দিয়ে মুক্ত করে যখন মক্কায় নেওয়ার ইচ্ছা করে, তিনি রাস্তা থেকে পালিয়ে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে এসে ইসলাম গ্রহণ করেন। আত্মীয়রা পেছন পেছন এসে তার প্রতি দোষারোপ করে বলে যে, ইসলাম যেহেতু কবুল করলেই, তো আগেই করতে? আমাদের সম্পদ কেন নষ্ট করলে?

ওয়ালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু উত্তর দেন, 'কেউ যেন এমন না ভাবে যে, আমি কয়েদ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য মুসলমান হয়েছি।'

এরপর তিনি তার আত্মীয়স্বজনের সাথে মক্কায় ফিরে যান। সেখানে তাকে বন্দি করে রাখা হয়।[৬১৬]

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজর নামাজে মক্কার সকল অসহায় ও নির্যাতিত মুসলমানের জন্য ব্যাপকভাবে এবং বিশেষভাবে নাম নিয়ে এই তিন সাহাবির মুক্তির জন্য কুনুতে নাজেলা পড়তে থাকেন। সাথে সাথে এই দোয়াও করতেন যে, 'হে আল্লাহ, কাফেরদের উপর ইউসুফ আলাইহিস সালামের সময়ের দুর্ভিক্ষের মতো দুর্ভিক্ষ নাজিল করুন।'[৬১৭]

---

৬১৪. তারিখুল মদিনাহ, ইবনে শাব্বাহ : ২/৬৬৩, তাবাকাতে ইবনে সা'দ : ৪/১২৯

৬১৫. তাবাকাতে ইবনে সা'দ : ৪/১৩০

৬১৬. তাবাকাতে ইবনে সা'দ : ৪/১৩২

৬১৭. সহিহ বুখারি : হাদিস নং ২৯৩২ (কিতাবুল জিহাদ, বাবুদ দুআ আলাল মুশরিকিন)

প্রথম দোয়া এভাবে কবুল হয় যে, গাজওয়ায়ে খন্দকের কিছুদিন পরই ওয়ালিদ বিন ওয়ালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু যেকোনো উপায়ে জিঞ্জিরসহ মদিনায় পৌঁছে যান। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার কাছে আইয়াশ বিন আবু রবিয়া এবং সালামা বিন হিশামের অবস্থা জানতে চান। তিনি বলেন, তাদের দুজনের পা একই জিঞ্জিরে বাঁধা।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই মজলুম সাহাবিদের নিয়ে খুব চিন্তিত ছিলেন। অবশেষে তার ব্যবস্থা হয়ে যায়। মক্কার এক কামার গোপনে মুসলমান হয়ে যায়। সে জিঞ্জির কাটতে পারত। নবীজি সা. ওয়ালিদ বিন ওয়ালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহুকে নির্দেশনা দেন যে, মক্কায় সেই কামারের ঘরে আত্মগোপন করে থাকবে এবং সুযোগ বুঝে তাদের দুজনকে জিঞ্জিরমুক্ত করে মদিনায় নিয়ে আসবে। ওয়ালিদ বিন ওয়ালিদ এই বিপজ্জনক অভিযান সফল করে তাদের দুজনকে মুক্ত করে মদিনায় ফিরে আসেন।[৬১৮]

আর দ্বিতীয় দোয়া এভাবে কবুল হয় যে, সেসময়েই মক্কা ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকায় ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। মক্কায় এমন খাদ্যসংকট দেখা দেয় যে, লোকেরা হাড্ডি খেতে শুরু করে।[৬১৯]

৫. সারিয়া উকাশা বিন মিহসান ও সারিয়া মুহাম্মদ বিন মাসলামা রা.

রবিউল আওয়াল মাসে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উকাশা বিন মিহসান রাদিয়াল্লাহু আনহুকে ৪০জন লোক দিয়ে বনু আসাদে আক্রমণ করার জন্য 'গামর মারযুক' ঝর্না অভিমুখে পাঠান। শত্রুরা পালিয়ে যায়। মুসলমানরা গনিমতস্বরূপ ২০০ উট নিয়ে মদিনায় ফিরে আসে।

৬ষ্ঠ হিজরি রবিউল আখির মাসে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুহাম্মদ বিন মাসলামা রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বনু সালাবার সংবাদ আহরণ করার জন্য 'যুলকাসাবা' প্রেরণ করেন। তিনি দশজন সঙ্গী নিয়ে যান। কিন্তু সেখানে ১০০ তিরন্দাজের মোকাবেলা করতে হয়। তিরের আঘাতে কিছু মুসলমান আহত হয়। এরপর দুশমন তরবারির সাহায্যে আক্রমণ করার ফলে প্রায় সকল মুসলমান শহিদ হয়ে যায়। মুহাম্মদ বিন মাসলামা রাদিয়াল্লাহু আনহুর গোড়ালি ভেঙে গিয়েছিল। কোনো মুসলমান হয়তো পরবর্তীতে তাকে উঠিয়ে নিয়ে আসে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু উবাইদা বিন জাররা

---

৬১৮. তাবাকাতে ইবনে সা'দ : ৪/১৩২। এই ঘটনা গাজওয়া খন্দকের কিছুদিন পর ঘটে। [তাবাকাতে ইবনে সা'দ : ৪/১৩০]

৬১৯. সহিহ মুসলিম : হাদিস নং ৭২৪৫ (কিতাবু সিফাতি য়াউমিল কিয়ামাহ, বাবুদ দুখান)

রাদিয়াল্লাহু আনহুকে দুশমনকে ধাওয়া করার জন্য পাঠান; কিন্তু ততক্ষণে তারা নিরাপদ দূরত্বে চলে গিয়েছিল।[৬২০]

৬. সারিয়া যায়েদ বিন হারিসা রা. এবং আবুল আস বিন রাবির ইসলাম গ্রহণ

মক্কার কুরাইশ কাফেলাগুলো তখনও আত্মরক্ষা করে শাম আসা-যাওয়া অব্যাহত রেখেছিল আর মুসলমানরাও তাদেরকে বাধা দেওয়ার সর্বাত্মক চেষ্টা করে যাচ্ছিল। ৬ষ্ঠ হিজরির জুমাদাল উলা মাসে যায়েদ বিন হারিসা রাদিয়াল্লাহু আনহু শাম ফেরত এক কাফেলার উপর আক্রমণ করেন। সেই কাফেলায় নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মেয়ের জামাতা আবুল আসও ছিলেন। মদিনায় পৌঁছে তার স্ত্রী যায়নাব রাদিয়াল্লাহু আনহার দরজায় এসে তার আশ্রয় গ্রহণ করেন। যায়নাব রাদিয়াল্লাহু আনহা ফজর নামাজের পর তার দরজায় দাঁড়িয়ে উচ্চ আওয়াজে বলেন, 'লোকসকল, শোনো! আমি আবুল আসকে নিরাপত্তা দিয়েছি।'

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ ব্যাপারে জানা ছিল না। এই আওয়াজ শুনে তিনি পেরেশান হয়ে যান। তিনি হাজির হয়ে নিশ্চিত হওয়ার জন্য জিজ্ঞেস করেন, 'আচ্ছা, আমি যা শুনলাম, তোমরাও কি তা শুনেছো?' সবাই বলল, 'জি হ্যাঁ।'

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'ঐ সত্তার কসম, যার হাতে আমার প্রাণ! এই ঘটনা সম্পর্কে আমার বিন্দুমাত্র জানা ছিল না। যাক গে, তোমরাও এই ঘোষণা শুনলে, আমিও শুনলাম। ঈমানদাররা একে অপরের জন্য এক হস্তস্বরূপ। তাদের কোনো সাধারণ ব্যক্তিও যদি কাউকে নিরাপত্তা প্রদান করে, তো আমরাও তাকে নিরাপত্তা দেব, যেমন নিরাপত্তা দিয়েছে যায়নাব।' এ কথা বলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘরে চলে যান।

যায়নাব রাদিয়াল্লাহু আনহা নবীজির সামনে এসে তাকে অনুরোধ করেন, আবুল আসের যে সামানাগুলো ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে, তা যেন ফিরিয়ে দেওয়া হয়। তিনি তার সব সামানা ফেরত দেন। এরপর বলেন, যতক্ষণ সে মুশরিক থাকবে, ততক্ষণ যায়নাব তার জন্য হালাল হবে না। তাই তাকে স্বামী থেকে দূরে থাকার নির্দেশ দেন।

আবুল আস অত্যন্ত অভিজাত মানুষ ছিলেন। ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব তার সামনে পরিষ্কার ছিল। তিনি মুসলমান হতে চাচ্ছিলেন; কিন্তু তার কাছে মক্কা ফিরে

৬২০. তাবাকাতে ইবনে সা'দ : ২/৮৫, ৮৬

যাওয়া ভালো মনে হলো, যেন কেউ মনে করতে না পারে যে, তিনি কারো ভয়ে কিংবা কিছু পাওয়ার আশায় ইসলাম গ্রহণ করেছেন।

তিনি মক্কা ফিরে যান। সেখানে সবার আমানত ফিরিয়ে দেন। যার যতটুকু প্রাপ্য ছিল, পূর্ণ আদায় করেন। তারপর তিনি ৭ম হিজরির মহররম মাসে মদিনায় এসে ইসলাম গ্রহণ করার ঘোষণা দেন। তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যায়নাবকে তার সঙ্গে থাকার অনুমতি দেন।[৬২১]

সিরাতগ্রন্থগুলো পড়লে জানা যায় যে, এই অভিযান, যার মধ্যে আবুল আস বিন রাবি গ্রেফতার হয়েছিলেন, কুরাইশের অর্থনীতিকে বাধাগ্রস্ত করার জন্য রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রেরিত সর্বশেষ অভিযান। এরপর এই ধারা বন্ধ করে দেওয়া হয়। এর কিছুদিন পরই হুদাইবিয়াসন্ধি মোতাবেক উভয়পক্ষের জন্য জাজিরাতুল আরবের সকল রাস্তা উন্মুক্ত হয়ে যায়। কিন্তু ততদিনে কুরাইশের অর্থনৈতিক অবস্থা এতটাই বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল যে, দ্বিতীয়বার মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার আর্থিক ব্যয়ভার বহন করার সামর্থ্য তাদের ছিল না।

৭. সারিয়া যায়েদ বিন হারিসা রা. এবং উম্মে কিরফার হত্যা

বনু ফাযারার জঙ্গিরা মাঝেমধ্যেই মদিনার পার্শ্ববর্তী এলাকাসমূহে ঝটিকা হামলা করে আসছিল। অবশেষে তাদেরকে উচিতশিক্ষা দেওয়ার জন্য যায়েদ বিন হারিসা রাদিয়াল্লাহু আনহু একদল সৈন্য নিয়ে সেখানে যান। ফাযারিরা মুসলমানদের কঠোর মোকাবেলা করে তাদেরকে পরাজিত করে। যায়েদ বিন হারিসা রাদিয়াল্লাহু আনহু প্রচণ্ডভাবে আহত হন এবং অত্যন্ত কষ্ট করে সাথিদের সঙ্গে মদিনায় পৌঁছেন। যায়েদ বিন হারিসা রাদিয়াল্লাহু আনহু কসম করে বলেন যে, যতক্ষণ না বনু ফাযারা মাথানত করবে, ততক্ষণ তিনি গোসল ওয়াজিব হতে দেবেন না। তার জখম শুকিয়ে যেতেই তিনি আরেকবার বনু ফাযারার বিরুদ্ধে চূড়ান্ত হামলা চালানোর জন্য বের হয়ে পড়েন।[৬২২]

বনু ফাযারার প্রধান ছিল উম্মে কিরফা (ফাতিমা বিনতে রবিয়া) নাম্নী এক জঙ্গি নারী। মদিনা থেকে সাতদিনের দূরত্বে অবস্থিত ওয়াদিল কুরার সন্নিকটে ছিল তার বাড়ি। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সে গালিগালাজ করত। সে তার ত্রিশ ছেলে ও তাদের সন্তানদের প্রস্তুত করেছিল নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হত্যা করার জন্য (নাউজুবিল্লাহ)। যায়েদ বিন হারিসা

৬২১. সহিহ বুখারি (কিতাবুল মাগাজি, বাবু কিসসাতি উকল ও উরাইনাহ), সুনানে আবু দাউদ : হাদিস নং ৪৩৬৪ (কিতাবুল হুদুদ)

৬২২. সিরাতে ইবনে হিশাম : ২/৬১৭

রাদিয়াল্লাহু আনহু রমজান মাসে তার বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে তার ছেলে এবং নাতিকে হত্যা করেন। উম্মে কিরফা তার এক মেয়েসহ গ্রেফতার হয়। তাকে হত্যা করা হয়। তবে তার মেয়েকে মুক্তি দেওয়া হয়।[৬২৩]

৮. মুরতাদদের শাস্তি (৬ষ্ঠ হিজরি)

ঐ বছরেই উকল ও উরাইনা কবিলার কিছুলোক মদিনায় এসে ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা দেয়। মদিনার আবহাওয়া তাদের অনুকূলে না হওয়ায় তারা অসুস্থ হয়ে পড়ে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে মদিনার উপকণ্ঠে বসবাসের অনুমতি দেন। সাথে সাথে দুধপান করার জন্য কয়েকটি উট এবং রাখালও সাথে দিয়ে দেন। কিন্তু তারা 'হাররা' পৌছার পর ধর্মত্যাগ করে। রাখালদের হত্যা করে উটগুলো হাঁকিয়ে নিয়ে যেতে থাকে।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকে তাদের পিছু ধাওয়া করার নির্দেশ দেন। তাদেরকে গ্রেফতার করে নিয়ে আসা হলো। ধর্মান্তর এবং ডাকাতি করার দরুন তাদের চোখ উপড়ে ফেলা হলো। হাত-পা কেটে হত্যা করা হলো। তবে এরপর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুছলা (তথা চোখ উপড়ানো, হাত-পা কাটা) করে হত্যা করতে নিষেধ করে দেন।[৬২৪]

***

৬২৩. সিরাতে ইবনে হিশাম : ২/৬১৭, শারাফুল মুসতফা : ৩/৫২

৬২৪. তাবাকাতে কুবরা, ইবনে সা'দ : ৮/৩৩। সিবতু ইবনুল জাওযি পূর্ণ ঘটনাটি ৬ষ্ঠ হিজরির অধীনে উল্লেখ করেছেন। [মিরআতুয যামান : ৩/৩৭১]

হুদাইবিয়াসন্ধি

(যিলকদ ৬ হিজরি)

মুসলমানরা মক্কা ছাড়ার পর ছয় বছর অতিক্রান্ত হয়েছিল। মসজিদে হারাম এবং বাইতুল্লাহ জিয়ারতের জন্য তারা উদগ্রীব হয়ে আছে। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও আল্লাহর ঘর তাওয়াফ করা এবং হজ আদায় করার জন্য সীমাহীন উৎসুক হয়ে ছিলেন। এ সময়ে তিনি স্বপ্নে দেখেন সাহাবিদের নিয়ে মসজিদে হারামে প্রবেশ করে হজ সম্পন্ন করছেন। এটা ছিল মূলত তার দিলের তামান্না পূর্ণ হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনুভব করতে পারছিলেন, কুরাইশ অনবরত যুদ্ধের কারণে দুর্বল হয়ে পড়েছে। আশা ছিল, তারা তাকে উমরা করার অনুমতি দেবে। তাই তিনি ষষ্ঠ হিজরি ১ যিলকদ মাসে চৌদ্দশ সাহাবিকে নিয়ে ইহরাম বেঁধে মক্কার উদ্দেশে রওনা হন। কুরবানির পশুও সঙ্গে নেন। কোনো কাফেলা কুরবানির পশু নিয়ে গেলে আরবের লোকেরা তাদের উপর আক্রমণ করে না।

মাসটি মাদানিপঞ্জিকা অনুযায়ী যিলকদ এবং মক্কিপঞ্জিকা মোতাবেক রজব ছিল। কুরাইশসহ সমগ্র আরবের নিকটই এ সময় যুদ্ধবিগ্রহ নিষিদ্ধ ছিল। এজন্য নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিশ্চিন্ত ছিলেন যে, এখন যুদ্ধ হওয়ার কোনো আশঙ্কা নেই। কিন্তু কুরাইশরা এ সংবাদ পেয়ে ভড়কে যায়। তারা নবীজিকে প্রতিরোধ করার জন্য রীতিমতো যুদ্ধের প্রস্তুতি নেওয়া শুরু করে দেয় এবং রাস্তায় রাস্তায় সশস্ত্র টহলদার বাহিনী নিয়োগ দেয়। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এটা জানতে পেরে বললেন, 'কুরাইশের জন্য আফসোস! ওরা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে গেছে। তাদের কী ক্ষতি হয়ে যেত যদি আমাকে আপন অবস্থায় ছেড়ে দিত এবং অন্যান্য আরবকেও তাদের অবস্থায় ছেড়ে দিত!'[৬২৫]

কুরাইশের সঙ্গে আলোচনা

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাজপথ ছেড়ে অন্য পথে অগ্রসর হন এবং মক্কার উপকণ্ঠে 'হুদাইবিয়া' পৌঁছে ডেরা ফেলেন। এখানকার একজন

---

৬২৫. সিরাতে ইবনে হিশাম : ২/৩০৮, ৩০৯

স্থানীয় লোক বুদাইল বিন ওয়ারাকাকে এই বার্তা দিয়ে কুরাইশের কাছে পাঠান যে, 'আমরা কারো সঙ্গে যুদ্ধ করতে আসিনি। আমরা শুধু উমরা করতে চাই।'

কুরাইশ এই বার্তার প্রতি সামান্য ভ্রুক্ষেপ করেনি। তাদের একজন ঝাঁনু ও অভিজ্ঞ ব্যক্তি উরওয়া বিন মাসউদকে দূত হিসেবে প্রেরণ করে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ডর-ভয় দেখিয়ে ফেরত পাঠিয়ে দেওয়ার লক্ষ্যে। প্রায় ছয় বছর পর কুরাইশ প্রথমবারের মতো তরবারির পরিবর্তে দূতালির মাধ্যমে আলোচনার পথ বেছে নিয়েছে। পরোক্ষভাবে এটি ছিল ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব মেনে নেওয়ার ঘোষণা।

উরওয়া বিন মাসউদ রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে এসে কুরাইশের ইচ্ছামাফিক কিছু জ্বালাময়ী বক্তব্য দেয়। কিন্তু নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যৌক্তিক কথা শুনে, তার ইচ্ছা ও অবিচলতা অনুভব করে, তার প্রতি সাহাবিদের সীমাহীন ভক্তি ও শ্রদ্ধা অবলোকন করে তার বিশ্বাস হয়ে গিয়েছিল যে, মুসলমানদের কাবু করা সম্ভব নয়। তাই সে ফিরে এসে বলল, 'আমি কায়সার-কিসরার মতো বাদশাহদেরও এমন ইজ্জত-সম্মান করতে দেখিনি, যেমন মুহাম্মদকে তার সাথিদের করতে দেখেছি।'[৬২৬]

কুরাইশ তাদের মিত্র 'আহাবিশ' সরদার হুলাইসকেও মুসলমানদেরকে ডর-ভয় দেখানোর জন্য পাঠায়। কিন্তু কাফেলার সাথে কুরবানির পশু দেখেই সে ফিরে যায়। তাদেরকে বলে, কুরবানির পশু নিয়ে-আসা-লোকদের হারামে প্রবেশে বাধা প্রদান করা আমাদের দীন পরিপন্থি। তোমরা তাকে প্রবেশ করতে দাও বা না দাও, আমরা আহাবিশরা তোমাদের সঙ্গ ত্যাগ করলাম।'

কুরাইশ তো পূর্বেই দুর্বল হয়ে পড়েছিল। এবার আহাবিশের সম্পর্ক ছিন্ন হওয়ার ধকল সহ্য করার মতো অবস্থা তাদের ছিল না। ফলে তারা হতবিহ্বল হয়ে পড়ে।[৬২৭]

বাইয়াতে রিদওয়ান

এ সময় নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবিদের সঙ্গে পরামর্শ করে হজরত উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুকে দূত বানিয়ে কুরাইশদের কাছে পাঠান। হজরত উসমান নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগমনের উদ্দেশ্য তাদের সরদারদের সামনে দ্বিতীয়বার সুস্পষ্টরূপে তুলে ধরেন। ফিরে আসার সময় কুরাইশ তাকে তাওয়াফ করে যাওয়ার প্রস্তাব দেয়। তিনি বলেন,

---

৬২৬. সহিহ বুখারি : হাদিস নং ২৭৩০ (কিতাবুশ শুরুত, বাবুশ শুরুত ফিল জিহাদ)
৬২৭. সিরাতে ইবনে হিশাম : ২/৩১২

'যতক্ষণ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাওয়াফের অনুমতি না পাবেন, ততক্ষণ আমিও তাওয়াফ করব না।' এতে কুরাইশ সরদাররা ক্ষিপ্ত হয় এবং তাকে নজরবন্দি করে রাখে। ওদিকে হজরত উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুর ফিরতে বিলম্ব দেখে মুসলমানদের মুখে মুখে প্রচারিত হয় যে, তিনি শহিদ হয়ে গেছেন।

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একথা শুনে বিমর্ষ হয়ে পড়েন। তখন পর্যন্ত তিনি সমঝোতার পন্থা খুঁজছিলেন। কিন্তু হজরত উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুর রক্ত তার নিকট এত মূল্যবান ছিল যে, তার কোনো রক্তপণ হবে না। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি বাবলা গাছের নিচে বসে সাহাবিদের থেকে হজরত উসমানের খুনের বদলা নেওয়ার জন্য শাহাদাতের বাইয়াত গ্রহণ করেন। সকলেই জানপ্রাণের বিনিময়ে উসমান-হত্যার প্রতিশোধ নেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন। শেষনিঃশ্বাস পর্যন্ত লড়াই করার প্রতিজ্ঞা করেন।[৬২৮]

আত্মত্যাগ এবং দুঃসাহসিকতার এই বহিঃপ্রকাশ আল্লাহ তায়ালার এত পছন্দ হয় যে, কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াত নাজিল করে যারা ওই বাইয়াতে শরিক হয়েছিল, তাদের সকলের প্রতি আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টির সংবাদ প্রদান করেন। ইরশাদ হয়েছে,

لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا

> আল্লাহ তায়ালা মুমিনদের প্রতি সন্তুষ্ট হলেন, যখন তারা বৃক্ষের নিচে আপনার কাছে শপথ করল। আল্লাহ অবগত ছিলেন যা তাদের অন্তরে ছিল। অতঃপর তিনি তাদের প্রতি প্রশান্তি নাজিল করলেন এবং তাদেরকে আসন্ন বিজয় পুরস্কার দিলেন।[৬২৯]

---

৬২৮. সিরাতে ইবনে হিশাম : ২/৩১৫, ৩১৬

৬২৯. সুরা ফাতাহ, আয়াত ১৮

নোট : ১। হুদাইবিয়া সন্ধিতে চৌদ্দশ' সাহাবি অংশগ্রহণ করেছিলেন। তাদের মধ্যে হজরত আবু বকর, উমর ছাড়াও অনেক বড় বড় সম্মানিত সাহাবি উপস্থিত ছিলেন, যাদেরকে রাফেজিরা মুনাফিক বলে থাকে (নাউজুবিল্লাহ)।

উপরোক্ত আয়াত সুস্পষ্টভাবে তাদের উপর আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টির ঘোষণা দিয়ে রাফেজিদের এই ভ্রান্ত ধারণা অপনোদন করছে যে, হজরত আবু বকর, উমরসহ অন্যান্য সাহাবি অন্তরে মুনাফিকি পোষণ করতেন।

আল্লাহ তায়ালা আয়াতে বলেছেন, তাদের দিলের অবস্থা তিনিই ভালো করেই জানেন এবং তাদের অবস্থা দেখেই তিনি রাজি হয়ে গেছেন। তাদের দিলে যদি (নাউজুবিল্লাহ) মুনাফিকি থাকতো, তা হলে আল্লাহ তায়ালা কি তাদের এই মুনাফিকির উপরই সন্তুষ্ট হতেন? কোনো মুমিন কি এই ধারণা পোষণ করতে পারে?

এই কারণে ওই বাইয়াতকে 'বাইয়াতে রিদওয়ান' বলা হয়ে থাকে।

কুরাইশের সন্ধির আকাঙ্ক্ষা

মুসলমানদের এমন জোশ ও উদ্দীপনা দেখে কুরাইশ এতই প্রভাবিত হয় যে, তারা রীতিমতো ভয় পেয়ে যায়। তারা হজরত উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুকে ছেড়ে দেয়। তারা বুঝতে পারে যে, মুসলমানরা এখন এক অপ্রতিরোধ্য শক্তিতে পরিণত হয়েছে। তাদের সঙ্গে লড়াই করার অর্থ হলো মাথা দিয়ে দেয়াল ফুটো করার ব্যর্থ চেষ্টা করা। অর্থনৈতিক দীনতার অনুভূতিও তাদের ছিল। কারণ, শাম-ইরাকের বাণিজ্যিক পথে মুসলমানরা টহল দিচ্ছিল। বিগত প্রতিটি যুদ্ধে তাদের অত্যধিক প্রাণহানির কারণে সৈন্যবাহিনীতে লোক-স্বল্পতাকেও তারা গুরুত্ব না দিয়ে পারছিল না। অগত্যা তারা মুসলমানদের সঙ্গে আলোচনা ও সন্ধির মাধ্যমে নিজেদের সেনাবাহিনীর ব্যবহার স্থগিত রেখে শক্তি সঞ্চয় এবং বাহিনীকে আরো উন্নত ও সুসংহত করার সিদ্ধান্ত নেয়। এই উদ্যোগ গ্রহণের মধ্যদিয়ে প্রথমবারের মতো তারা 'মদিনার হুকুমত'কে একটি পরাশক্তি হিসেবে মেনে নিচ্ছিল। তবে এই পদক্ষেপ নেওয়া ছাড়া তাদের কোনো উপায়ও ছিল না। অনেক ভেবেচিন্তে তারা কিছু ধারা ঠিক করে সুহাইল বিন আমরকে দূত বানিয়ে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট পাঠায়।[৬৩০]

সন্ধির শর্তাবলি ও তার বিশ্লেষণ

সন্ধির অধিকাংশ ধারাই বাহ্যিকভাবে কুরাইশের পক্ষে ছিল এবং মুসলমানদের জন্য অবমাননাকরও ছিল। কিন্তু রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরাইশদের প্রস্তাবিত শর্তাবলিতে গভীর দৃষ্টি দিয়ে দূরদর্শিতার মাধ্যমে অনুধাবন করতে পারেন যে, তাদের শর্তাবলি অনুযায়ী সন্ধি করার মধ্যেই অনেক উপকার নিহিত রয়েছে। বাস্তবে কুরাইশের জন্য এসব শর্ত তেমন ফায়দাজনক হবে না। আর যেই শর্তগুলো বাহ্যিকভাবে মুসলমানদের জন্য মেনে নেওয়া অসহনীয় ছিল, প্রকৃতপক্ষে তা ইসলাম ও মদিনার হুকুমতের কোনোরূপ ক্ষতি করতে পারবে না। হ্যাঁ, কিছু মুসলমানকে এর জন্য পরীক্ষা ও কষ্ট স্বীকার করতে হবে। কিন্তু নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পূর্ণ আশাবাদী ছিলেন যে, মুসলমানরা (ইসলামের খাতিরে) এই সাময়িক কষ্ট-ক্লেশ

নোট : ২। হুদাইবিয়াসন্ধির ঘটনা হালকা গরম মৌসুমে (তথা মার্চের মাঝামাঝি থেকে এপ্রিলের মাঝামাঝি পর্যন্ত) সংঘটিত হয়েছে। হুদাইবিয়ায় ডেরা গাড়ার পরপরই সাহাবিগণ পানির স্বল্পতার কারণে পেরেশান হয়ে যান। তখন নবীজির (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মুজিযাস্বরূপ অল্প পানিই তাদের সবার জন্য যথেষ্ট হয়ে যায়। [সহিহ বুখারি : হাদিস নং ২৭৩১, কিতাবুল জিহাদ, বাবুশ শুরুত; মুসনাদে আহমদ : হাদিস নং ১৪৮০৬]

৬৩০. সহিহ বুখারি : হাদিস নং ২৭৩১ (কিতাবুশ শুরুত, বাবুশ শুরুত ফিল জিহাদ)

বরণ করে নিবে। তাই তিনি বললেন, 'কুরাইশরা আমার কাছে এমন জিনিস দাবি করেছে, যার মধ্যে আল্লাহ তায়ালার ইজ্জত-সম্মান ও বড়ত্বের প্রতি লক্ষ রেখেছে, তাই আমি তাদের শর্ত মেনে নিচ্ছি।'[৬৩১]

উভয়পক্ষের মধ্যে আলোচনা-পর্যালোচনার পর ছয়টি ধারার ব্যাপারে ঐকমত্য হলো:

ধারা : ১। দশ বছর পর্যন্ত যুদ্ধ বন্ধ থাকবে। এর দ্বারা কুরাইশরা মক্কার উপর মুসলমানদের সম্ভাব্য আক্রমণের আশঙ্কা দূর করেছে। তারা ভালো করেই জানত যে, আক্রমণ করলে মুসলমানরাই বিজয়ী হবে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা মেনে নেন। কারণ, আরবভূমিতে শান্তি ও নিরাপত্তা বিরাজ করলে, ইসলামের দাওয়াত-তাবলিগের পথও খুলে যাবে এবং লোকেরা মদিনার ইসলামি সমাজব্যবস্থা নিকট থেকে দেখার সুযোগ পাবে।[৬৩২]

ধারা : ২। মুসলমানরা এ বছর ফিরে যাবে এবং আগামী বছর উমরা করতে আসবে। এর ফলে কুরাইশরা প্রমাণ করতে চাচ্ছিল যে, এখনো তারাই বিজয়ী, তারাই সমুন্নত আর মুসলমানরা পরাজিত।[৬৩৩]

এই ধারাটি মুসলমানদের জন্য বড় কষ্টকর ছিল। কারণ, তারা বাইতুল্লাহর জিয়ারতের জন্য সীমাহীন উদগ্রীব ছিলেন। আর কুরাইশের সঙ্গে এ নিয়েই দর-কষাকষি চলছিল। এই শর্ত মেনে নেওয়া ছিল পরাজয় মেনে নেওয়ার নামান্তর। কিন্তু রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের এত বড় ভ্রান্ত শর্তটিও সাময়িকের জন্য মেনে নেন। তিনি জানতেন, এর দ্বারা পৃথিবীর বাস্তবতা কখনো পালটে যাবে না, আর কুরাইশও কোনোরূপ শক্তি-ক্ষমতা অর্জন করতে পারবে না। এজন্য নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ বছর ফিরে গিয়ে পরবর্তী বছর উমরা করার শর্ত মেনে নিলেন।

কিন্তু কুরাইশের শঙ্কা ছিল, আগামী বছর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কায় এলে দীর্ঘদিন অবস্থান করা এবং অস্ত্রের জোরে শহর দখল করে নেওয়ার সম্ভাবনা আছে। এই আশঙ্কা থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য মুসলমানদের মক্কায় অবস্থান না করা এবং মদিনায় ফিরিয়ে দেওয়ার ব্যাপারে চেষ্টা করতে হবে। তাই তারা দ্বিতীয় ধারার সঙ্গে নিম্নযুক্ত দফাগুলোও যোগ করে :

ক. আগামী বছর উমরা করতে আসার পর মক্কায় মুসলমানরা কেবল তিন দিন অবস্থান করতে পারবে।

---

৬৩১. প্রাগুক্ত

৬৩২. সিরাতে ইবনে হিশাম : ২/৩১৭

৬৩৩. সহিহ বুখারি : হাদিস নং ২৭৩১ (কিতাবুশ শুরুত, বাবুশ শুরুত ফিল জিহাদ)

খ. মুসলমানরা কোমরে কোষবদ্ধ তরবারি ছাড়া কোনো অস্ত্র সঙ্গে রাখতে পারবে না।

গ. মুসলমানরা মক্কার কোনো বাসিন্দাকে নিয়ে যেতে পারবে না।

ঘ. কোনো মুসলমান যদি মক্কায় থেকে যেতে চায়, তাকে বাধা দেওয়া হবে না।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এগুলো কবুল করেন।[৬৩৪]

ধারা : ৩। মক্কার কেউ যদি মুসলমান হয়ে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট চলে যায়, তখন তাকে ফেরত দিতে হবে।[৬৩৫] কুরাইশরা এর দ্বারা তাদের তরুণদের ইসলাম গ্রহণ রোধ করতে চাচ্ছিল, যাতে করে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহযোগী বৃদ্ধি না হয়।

এই ধারাটিও মুসলমানদের জন্য মেনে নেওয়া কষ্টকর ছিল। কারণ, কোনো মুসলমান হিজরত করে মদিনায় আসার পর তাকে পুনরায় কুরাইশদের থাবায় ফিরিয়ে দেওয়া কোনোভাবেই সম্ভব ছিল না। স্বাভাবিকভাবেই এতে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মনে ভীষণ চোট লেগেছিল। তারপরও তিনি তা মেনে নেন। সাহাবায়ে কেরামকে এজন্য দুশ্চিন্তাগ্রস্ত দেখে তাদের সান্ত্বনা দিয়ে বলেন, এমন ব্যক্তিদের জন্য আল্লাহ তায়ালা শীঘ্রই নতুন পথ খুলে দেবেন। তিনি জানতেন, এই শর্ত মানলে ইসলাম ও মদিনার হুকুমতের কিছুই এসে-যাবে না। যদিও এর কারণে কুরাইশের কিছু লোক ইসলামগ্রহণে বাধাপ্রাপ্ত হবে; কিন্তু সর্বত্র শান্তি ও নিরাপত্তা বিস্তারের কারণে অসংখ্য কবিলায় ইসলামের আলো ছড়িয়ে দেওয়ার সুযোগ মিলবে।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দৃষ্টি এর উপরও নিবদ্ধ ছিল যে, আকিদা এমন কোনো বিষয় নয় যে, তা কঠোরতা ও জোরজবরদস্তি করে পরিবর্তন করা যায়; এটা তো আত্মার বিষয়। তাই যেসব লোক অন্তর দিয়ে ঈমান আনবে, কুরাইশের ধরপাকড়, হুমকি-ধমকিতে তাদের ঈমান বদলে যাবে না। হ্যাঁ, তাদের উপর শারীরিক-মানসিক নির্যাতন হবে; কিন্তু নবীজি

---

৬৩৪. সহিহ বুখারি : হাদিস নং ৪২৫১ (কিতাবুল মাগাজি, বাবু উমরাতিল কাযা), হাদিস নং ২৬৯৯ (কিতাবুস সুলহ), হাদিস নং ৪২৫১

এই দফাগুলোর মধ্যে (গ নং) দফাটি সম্ভবত কুরাইশ এই ধারণায় বৃদ্ধি করেছে যে, মুসলমানরা দীর্ঘদিন যাবৎ নির্বাসন জীবনে থেকে হয়তো অতিষ্ঠ হয়ে গেছে, তাই এতদিন পর ঘরে ফিরে এসে থেকে যেতে চাইবে।

আর মক্কায় মুসলমানরা থেকে গেলে তাদের শক্তি বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়বে। তবে নবীজির (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সঙ্গে আসা কোনো সাহাবিই এরকম ছিলেন না, যিনি তাকে ছাড়া মক্কাতে থাকতে চাইবেন। পরবর্তীতেও কেউ এমন ইচ্ছা প্রকাশ করেননি।

৬৩৫. সহিহ বুখারি : হাদিস নং ২৭৩১ (কিতাবুশ শুরুত, বাবুশ শুরুত ফিল জিহাদ)

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পূর্ণ আশাবাদী ছিলেন যে, তারা এসব পরীক্ষায় পরিপূর্ণ উত্তীর্ণ হবে।

ধারা : ৪। কোনো ব্যক্তি যদি নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গ ত্যাগ করে মক্কায় ফিরে আসে, তা হলে তাকে ফেরত দেওয়া হবে না।

কুরাইশরা এই শর্তের মাধ্যমে তাদের সহযোগী বৃদ্ধির পথ খোলার স্বপ্ন দেখছিল। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ কথা ভেবে তা অনুমোদন করেন যে, যদি কোনো দুর্ভাগা নিজেই ইসলাম ত্যাগ করতে চায়, তা হলে তার জন্য ওখানে চলে যাওয়াই উত্তম হবে।[৬৩৬]

ধারা : ৫। উভয়পক্ষ একে অপরের বিরুদ্ধে কোনোরূপ গোপন কর্মকাণ্ড ও বিশ্বাসঘাতকতা করা থেকে বিরত থাকবে।

ধারা : ৬। অন্যান্য কবিলার মধ্যে যারা চায় কুরাইশের সাথে মিত্রতা করবে, যাদের ইচ্ছা মুসলমানদের সঙ্গে মৈত্রীচুক্তি করবে।[৬৩৭]

এটি ছিল মুসলমানদের জন্য একটি ইনসাফপূর্ণ এবং উপকারী শর্ত। কারণ, এর মাধ্যমে তারা নতুন নতুন চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়ার সুযোগ পায় এবং সমগ্র আরবে নিরাপত্তা ও শান্তিময় পরিবেশ কায়েম হয়। এই ধারার আলোকে সেখানেই বনু খুজাআ নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে এবং বনু বকর কুরাইশের সাথে মৈত্রীচুক্তিতে আবদ্ধ হয়।[৬৩৮]

সবশেষে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই অংশটি যুক্ত করেন যে, 'তোমাদের দাবি আমাদের জিম্মাদারিতে এবং আমাদের দাবি তোমাদের জিম্মাদারিতে সংরক্ষিত রইলো।'[৬৩৯]

মুশরিকরাও এমন যুক্তিসঙ্গত বক্তব্যের উপর আপত্তি তুলতে পারেনি। উপর্যুক্ত বক্তব্যের শেষাংশের মাধ্যমে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের থেকে মুসলমানদের সমমর্যাদার স্বীকৃতি নিয়ে নেন।

চুক্তি লিপিবদ্ধ করতে কুরাইশের আপত্তি এবং নবীজির অন্তহীন উদারতা

সন্ধিচুক্তি স্বাক্ষরের মজলিসে কুরাইশের মধ্যে রূঢ়তা, অস্থিরতা এবং বেচাইনি বিরাজ করছিল। অন্যদিকে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অত্যন্ত

---

৬৩৬. সিরাতে ইবনে হিশাম : ২/৩১৭

৬৩৭. প্রাগুক্ত

৬৩৮. প্রাগুক্ত : ২/৩১৮

৬৩৯. তাবাকাতে ইবনে সা'দ : ২/১০১

বিনম্রতা, উন্নত আখলাক এবং দূরদর্শিতার সঙ্গে সন্ধিচুক্তি সম্পন্ন করার ব্যাপারে সচেষ্ট ছিলেন।

সন্ধির শর্তগুলো লেখার জন্য নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরফ থেকে হজরত আলি রাদিয়াল্লাহু আনহুকে নিযুক্ত করেন।[৬৪০] তিনি ইসলামি আদব অনুযায়ী 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' দিয়ে লেখা শুরু করেন। এর উপর কাফেররা আপত্তি করে যে, 'আমরা আল্লাহকে চিনি, রাহমান-রহীম চিনি না। এ জায়গায় 'বিসমিকা আল্লাহুম্মা' লেখ।' রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এটা মেনে নিয়ে তা-ই লিখিয়ে নেন।[৬৪১]

এরপর হজরত আলি রাদিয়াল্লাহু আনহু লেখেন, 'এটি ওই নথিপত্র, যাতে মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ চুক্তি করেছেন।'

এই বাক্য দেখেই কুরাইশ সরদাররা হইচই শুরু করে দেয় যে, 'আমরা যদি তোমাকে আল্লাহর রাসুল মেনেই নিতাম, তা হলে অযথা কেন তোমাদের বাধা দিচ্ছি! তিনি তো (আমাদের নিকট কেবল) মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ। তাই মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ লিখুন।'

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন বললেন, 'আমি মুহাম্মদ রাসুলুল্লাহও এবং মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহও; যদিও তোমরা আমাকে মিথ্যারোপ করো।'[৬৪২] এটুকু বলে তিনি দ্বন্দ্ব নিরসনের জন্য আলি রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বললেন, 'ঠিক আছে, তুমি তা মুছে ফেল।'

হজরত আলি রাদিয়াল্লাহু আনহুর জন্য তা মুছে দেওয়ার চেয়ে নিজেকে বিলিয়ে দেওয়া সহজ ছিল। তিনি আরজ করলেন, 'না, আল্লাহর কসম করে বলছি! আপনার মোবারক নাম আমি কখনোই মুছবো না।' অগত্যা নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেই কলম নেন এবং আলি রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বললেন, 'আমাকে ওই স্থানটি দেখিয়ে দাও (যেখানে 'রাসুলুল্লাহ' লেখা আছে)।' তিনি স্থানটি দেখিয়ে দিলে নবীজি নিজেই তা মুছে দেন। যদিও তিনি লেখাপড়া জানতেন না, তারপরও স্বহস্তেই উক্ত স্থানে 'বিন আবদুল্লাহ' লিখে দেন।'[৬৪৩]

---

৬৪০. সহিহ মুসলিম : হাদিস নং ৪৭৩১ (কিতাবুল জিহাদ, বাবু সুলহিল হুদাইবিয়্যাহ)

৬৪১. তাবাকাতে ইবনে সা'দ : ২/১০১

৬৪২. সহিহ মুসলিম : হাদিস নং ৪৭৩১ (কিতাবুল জিহাদ, বাবু সুলহিল হুদাইবিয়্যাহ), সহিহ বুখারি : হাদিস নং ৪২৫১ (কিতাবুল মাগাজি, বাবু উমরাতিল কাযা)

৬৪৩. প্রাগুক্ত

সহনশীলতা এবং আনুগত্যের কঠিন পরীক্ষা

তখনও চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়নি। ইতোমধ্যে একটি হৃদয়বিদারক ঘটনা ঘটে যায়। মুসলমানদের হিম্মত ও সহনশীলতা এবং রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনুগত্যের জন্য এটা ছিল কঠিন পরীক্ষা।

ঘটনাটি হলো- কুরাইশ-দূত সুহাইল বিন আমরের নওজোয়ান ছেলে আবু জানদাল মক্কায় ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তারা তাকে পায়ে শেকল দিয়ে বেঁধে রেখেছিল। কিন্তু তিনি মক্কার কাছাকাছি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অবস্থানের কথা শুনে পায়ে শেকল নিয়েই কোনোরকমে পালিয়ে আসেন এবং এই অবস্থাতেই নবীজির দরবারে হাজির হন। সুহাইল বিন আমর তা দেখে বলে যে, চুক্তি মোতাবেক তাকে ফেরত পাঠাতে হবে। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'এখনো তো চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়নি।' কিন্তু সুহাইল ছেলেকে ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য পীড়াপীড়ি করতে থাকে।

অবশেষে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে ফিরে যাওয়ার নির্দেশ দেন। হজরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তা দেখে খুবই বিচলিত হয়ে বলেন, 'ইয়া রাসুলাল্লাহ, আমরা কি সত্যের উপর আছি? আমাদের শত্রুরা কি ভ্রান্তির উপর নেই? তা হলে কেন আমরা দীনের জন্য আমাদের মাথা অবনত করব?'

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'উমর, আল্লাহ তায়ালাই আমাদের সাহায্যকারী।'

তিনি বললেন, 'আপনি কি বলেননি যে, আমরা বাইতুল্লাহ তাওয়াফ করব?'

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'হ্যাঁ! কিন্তু আমি এটা কখন বলেছি যে, এ বছরই করব?'[৬৪৪]

এরপর নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হজরত আবু জানদাল রাদিয়াল্লাহু আনহুকে সান্ত্বনা দিয়ে ফেরত পাঠিয়ে দেন। তারপর চুক্তিনামায় স্বাক্ষর করেন। তারপর সাহাবায়ে কেরামকে নির্দেশ দেন কুরবানির পশুগুলো জবাই করার জন্য এবং মাথা মুণ্ডন করে ইহরাম খুলে ফেলার জন্য।[৬৪৫] ২৯ যিলহজ তিনি মদিনায় পৌঁছে যান।[৬৪৬]

---

৬৪৪. সহিহ বুখারি : হাদিস নং ২৭৩১ (কিতাবুশ শুরুত, বাবুশ শুরুত ফিল জিহাদ), সিরাতে ইবনে হিশাম : ২/৩১৮, ৩১৯

৬৪৫. সিরাতে ইবনে হিশাম : ২/ ৩১৯

৬৪৬. ثم غزوة الحديبية، خرج صلى الله عليه وسلم يوم الخميس غرة ذي القعدة.. ورجع سلخ ذي الحجة
[আলমুহাব্বার, পৃষ্ঠা ১১৫]

এখানে এটা মনে রাখা আবশ্যক যে, যিলকদ মাসটি মাদানি ছিল মক্কি নয়। যদি মক্কি হত,

আবু বাসিরের কর্মযজ্ঞ

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনায় প্রত্যাবর্তনের দু'দিনও পার হয়নি, ইতোমধ্যে মক্কা থেকে আবু বাসির (রাদিয়াল্লাহু আনহু) নামের এক মুসলমান কাফেরদের বন্দিশালা থেকে পালিয়ে নবীজির দরবারে আশ্রয় নেন। কুরাইশ দুজন দূত প্রেরণ করে চুক্তি মোতাবেক তাকে ফেরত নেওয়ার জন্য। তিনি তাদের দাবি অনুযায়ী আবু বাসির রাদিয়াল্লাহু আনহুকে ফেরতে পাঠিয়ে দেন।

সাহাবি আবু বাসিরও নবীজির নির্দেশ মোতাবেক কুরাইশ-দূতদের সঙ্গে চলতে থাকেন। পথিমধ্যে তাদের একজনকে হত্যা করে পুনরায় নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট পালিয়ে আসেন। আরজ করলেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ, আপনি তাদের সাথে আমাকে পাঠিয়ে দিয়ে আপনার চুক্তির জিম্মাদারি পালন করেছেন। এরপর আল্লাহ তায়ালা আমাকে তাদের হাত থেকে রক্ষা করেছেন।' কিন্তু রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট তার অবস্থান করা তখনও চুক্তি-পরিপন্থি ছিল। তাই তিনি বললেন, 'তার সঙ্গে যদি আরও লোক থাকত, তা হলে তো সে যুদ্ধ বাঁধিয়ে দিত।'

তা হলে এটি হজ মৌসুম হতো। এই সময় উমরা করা মুশরিকরা নিষিদ্ধ মনে করত বরং তাদের কাছে এটি সবচেয়ে বড় গুনাহ মনে করত।

হজরত ইবনে আব্বাস রা. বলেন, 'তারা (মুশরিকরা) হজের কোনো মাসে উমরা করা অনেক বড় অপরাধ মনে করত।' [সহিহ বুখারি : হাদিস নং ১৫৬৪, বাবুত তামাত্তুয়ি ওয়াল কিরান]

আরবের এই প্রাচীন রীতি মুসলমানরাও এত মানতেন যে, বিদায় হজে যখন রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সাহাবিদের উমরার ইহরাম বাঁধার নির্দেশ দেন, তখন এটি তাদের নিকট কষ্টকর ঠেকে। রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁদেরকে তাগিদ দিয়ে বললেন, এখন এটি হালাল।

(فأمرهم أن يجعلوها عمرة، فتعاظموا ذلك عندهم، فقالوا: يا رسول الله! أي الحل؟ قال: حل كله
صحيح البخاري: ١٥٦٤ - باب التمتع والقران)

রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর ঐ মাসে উমরা করার জন্য পীড়াপীড়ি করা মুশরিকদের বিরক্ত করার, বরং যুদ্ধ বেঁধে যাওয়ার কারণ হতো। অথচ তিনি নিরাপদে ও শান্তিপূর্ণভাবেই উমরা করতে গিয়েছিলেন। এই দৃষ্টিকোণ থেকে মক্কি নয়, মাদানিপঞ্জিকা মোতাবেক যিলকদ মাস ছিল।

তা হলে মুশরিকরা কেন এই মাসটিকে হারাম মনে করে? তার কারণ হলো, এই মাদানিপঞ্জিকা অনুযায়ী যিলকদ মাস মক্কি ক্যালেন্ডারের রজব মাসের অনুরূপ ছিল, যা হারাম মাস ছিল। বরং এ সময় উমরায় আগমনকারীর সংখ্যাও অনেক হতো। আর এজন্য উমরাকে তারা 'হজ্জে আসগার' বলে অভিহিত করত। [আলমুফাসসাল ফি তারিখিল আরব কাবলাল ইসলাম : ১১/৩৯১]

(والعمرة هي بمثابة «الحج الأصغر» في الإسلام، وكان أهل الجاهلية يقومون بأدائها في شهر رجب)

আবু বাসির বুঝতে পারেন যে, তার এখানে থাকা ঠিক হবে না। তাকে গ্রেফতার করে নেওয়ার জন্য যদি কুরাইশ দ্বিতীয় প্রতিনিধিদল প্রেরণ করে, তা হলে তাকে মক্কায় পাঠিয়ে দেওয়া হবে। ফলে তিনি তৎক্ষণাৎ মদিনা থেকে বের হয়ে সমুদ্রের তীরবর্তী অঞ্চল 'সাইফুল বাহরে' চলে যান। কুরাইশ-কাফেলার গমনপথ ছেড়ে পৃথক জায়গায় দিনাতিপাত করতে থাকেন।

কিছুদিন পর আবু জানদাল রাদিয়াল্লাহু আনহুও মক্কা থেকে পালিয়ে তার কাছে চলে আসেন। ধীরে ধীরে কুরাইশের নিপীড়ন থেকে পালিয়ে আসতে আসতে বহু নওজোয়ান সমবেত হয়ে যায়। তাদের সংখ্যা ৭০জনে পৌঁছে যায়। তারা তখন একটি সম্পূর্ণ স্বাধীন শক্তিতে পরিণত হন। কুরাইশের প্রতিটি ফিরতি বাণিজ্য-কাফেলায় তারা আক্রমণ করতে থাকেন। পূর্ব থেকেই শামে কুরাইশের বাণিজ্য ঢিমেতালে চলছিল, তাদের এই আক্রমণের ফলে এখন তা প্রায় বন্ধ হয়ে গেল।

অবশেষে তারা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আবেদন করে, সন্ধিনামা থেকে ওই ধারাটি বিলুপ্ত করে দেওয়া হোক, যাতে বলা হয়েছে, মক্কা থেকে কেউ চলে এলে ফেরত পাঠানো আবশ্যক। এখন থেকে যারাই আপনার নিকট আসবে, সে নিরাপদ হিসেবে গণ্য হবে। এর ফলে আবু জানদাল রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং তার সঙ্গী-সাথিদের সমুদ্র-তিরের মোর্চা থেকে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে ফিরে আসার সুযোগ হয়। তবে আবু বাসির রাদিয়াল্লাহু আনহুর ততদিনে ইনতেকাল হয়ে গিয়েছিল।[৬৪৭]

আবু বাসির-এর কর্মযজ্ঞ প্রসঙ্গে ড. আকরাম যিয়ার পর্যালোচনা

আবু বাসির রাদিয়াল্লাহু আনহুর এই অভিযান ইসলামি ইতিহাসের এক অনন্য অভিজ্ঞতা ছিল। তৎকালীন পরিস্থিতির উপর তার গভীর প্রভাব পড়ে। বর্তমান বিশ্বের প্রখ্যাত গবেষক ড. আকরাম যিয়া আলউমারি এই ঘটনার তাত্ত্বিক পর্যালোচনা করতে গিয়ে লেখেন, 'হজরত আবু জানদাল এবং আবু বাসির রা. ঈমানের খাতিরে সীমাহীন নির্যাতন-নিপীড়ন সহ্য করেছেন। কিন্তু তাদের অবিচলতা, নিষ্ঠা ও সংকল্প ততক্ষণ পর্যন্ত প্রকাশ করেন, নিজেদের প্রচেষ্টা ততক্ষণ পর্যন্ত জারি রাখেন, যতক্ষণ না মুশরিকরা মাথা অবনত করে। তাদের কারণেই মুশরিকরা হুদাইবিয়ার সন্ধিতে মুসলমানদের বিরুদ্ধে আরোপিত ওই শর্ত থেকে পিছপা হতে বাধ্য হয়। এই ঘটনা ঈমানের সঙ্গে গভীর সম্পর্ক এবং তার জন্য ত্যাগ ও পরিশ্রম করার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ছিল। ঘটনাটি থেকে আমরা

---

৬৪৭. সহিহ বুখারি : হাদিস নং ২৭৩১ (কিতাবুশ শুরুত, বাবুশ শুরুত ফিল জিহাদ), উসদুল গাবাহ (আবু বাসির ও আবু জানদাল রা. এর জীবনী দ্রষ্টব্য), আলকামিল ফিত তারিখ : ২/৮৬

এই শিক্ষা পাই যে, কখনো এক ব্যক্তির মাধ্যমে এমন কর্মযজ্ঞও সংঘটিত হয় যে, পুরো সমাজ মিলে যা করতে সক্ষম হয় না।

আবু বাসির রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং তার সাথিরা মুশরিকদের এমন সময়ে ব্যতিব্যস্ত করে তোলেন, যখন ইসলামি সরকার তা করতে অক্ষম ছিল। কারণ, মুসলমানরা মুশরিকদের সঙ্গে সন্ধি ও নিরাপত্তা-চুক্তিতে আবদ্ধ ছিল। হজরত আবু বাসির রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং তার সঙ্গীরা স্বেচ্ছায় এবং মদিনার হুকুমতের সীমানার বাইরে গিয়ে এই কাজ আঞ্জাম দেন। সর্বোপরি আবু বাসির রা. এবং তার সঙ্গী মুসলমানদের এসব কর্মকাণ্ড নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অসন্তুষ্টিতে কেবল নিজেদের ইজতিহাদের ভিত্তিতেই করেছেন; এমনটি নয়। কারণ, এমন হলে শুরুতেই তিনি আবু বাসিরকে কুরাইশ কাফেলায় আক্রমণ করতে বারণ করতেন এবং তাকে মক্কায় ফিরে যাওয়ার নির্দেশ দিতেন। কিন্তু নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনোটাই করেননি। এর থেকেই বুঝা যায় এতে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মতি ছিল।

হজরত আবু বাসির রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং তার সঙ্গীরা যা করেছেন, তা নিশ্চিত যৌক্তিক কাজ ছিল। তারা মক্কায় যতই নির্যাতন-নিপীড়ন সহ্য করুক না কেন, এদেরকে এমন দুর্বল করতে পারেনি যে, তারা দীন-বিচ্যুত হয়ে যাবে। তারা এমন পরিকল্পনা গ্রহণ করেন, যার ফলে কেবল তারাই মক্কাবাসীর জুলুম-অত্যাচার থেকে রেহাই পাননি, বরং মদিনার হুকুমতও সহযোগিতাপ্রাপ্ত হয়। কারণ, তাদের ওই কর্মযজ্ঞের দরুন কুরাইশের জীবনযাত্রা বিঘ্নিত হয়, জীবিকা উপার্জন বাধাগ্রস্ত হয়। তাদের কর্মের একটি উপকারিতা এটিও সামনে আসে যে, সন্ধির সময়ে কুরাইশের রক্ষণশীলতায়ও সন্দেহ ছিল। এভাবেও বলা যায় যে, আবু বাসিরের কার্যক্রমের প্রতি নবীজিরও পরোক্ষ অনুপ্রেরণা ছিল। কারণ, তিনি তো বলেছিলেন যে, 'তার সঙ্গে যদি আরও লোক থাকত, তা হলে তো সে যুদ্ধ বাঁধিয়ে দিত।'[৬৪৮]

---

৬৪৮. আসসিরাতুন নববিয়্যাতুস সাহীহাহ : ২/৪৫১, ৪৫২

ফায়েদা : রেওয়ায়েতের মধ্যে রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'ويل لأمه مُسَعِّرُ حربٍ لو كان له أحد)' এখানে 'ويل' অর্থ বদদোয়া নয়; বরং প্রশংসা করা। আল্লামা ইবনে আবদুল বার রহ. লেখেন,

«وهو كما يقال للشاعر إذا أجاد قاتله الله.. ومنه قوله : «ويل لأمه مسعر حرب» وهو يريد مدحه

[আততামহিদ : ৮/৩৪০]

ইমাম ইবনে হাজার রহ. ইমাম খাত্তাবির সূত্রে লেখেন,

كأنه يصفه بالإقدام في الحرب، والتسعير لنارها

এরপর ইবনে হাজার আসকালানি রহ. উক্ত হাদিসের কিছু শিক্ষা উল্লেখ করতে গিয়ে লেখেন,

সন্ধির প্রভাব

হুদাইবিয়াসন্ধি থেকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাসনা পূরণ হয়ে যায়, যার বহিঃপ্রকাশ তিনি হুদাইবিয়ায় অবস্থানকালেই করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, 'কুরাইশের জন্য আফসোস, ওরা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে গেছে। তাদের কী ক্ষতি হতো যদি আমাকে আপন অবস্থায় ছেড়ে দিত, অন্যান্য আরবকেও তাদের অবস্থায় ছেড়ে দিত! এরপর যদি অন্যান্য আরব কবিলা আমার উপর বিজয়ী হতো, তা হলে তো কুরাইশের উদ্দেশ্য এমনিতেই পূরণ হয়ে যেত। আর যদি আমাকে আল্লাহ তায়ালা বিজয়ী করতেন, তা হলে তো কুরাইশরাই দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করত।'[৬৪৯]

খালিদ বিন ওয়ালিদ ও আমর বিন আস-এর ইসলামগ্রহণ

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আকাঙ্ক্ষা খুব দ্রুতই পূর্ণ হতে শুরু করে। স্বয়ং কুরাইশের বড় বড় সম্ভ্রান্ত এবং যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তির অন্তরে ইসলাম প্রবেশ করে। কুরাইশরা যখন সন্ধিপত্র হতে মক্কা থেকে মদিনায় আগমনকারী নওমুসলিমদের ফেরত পাঠানোর ধারাটি বিলুপ্ত করে দেওয়ার অনুরোধ করে, তার কিছুদিন পরই কুরাইশের তিনজন সম্মানিত এবং যোগ্য নওজোয়ান নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে উপস্থিত হন।

তাদের মধ্যে ছিলেন খালিদ বিন ওয়ালিদ, যার মতো অশ্বারোহী এবং বীরযোদ্ধা দ্বিতীয়জন ছিল না। অপরজন ছিলেন আমর বিন আস, যিনি মেধা ও বিচক্ষণতায় ছিলেন অনন্য ব্যক্তিত্ব। তৃতীয়জন হলেন উসমান বিন তালহা, যার বংশ কাবা শরিফের চাবি-রক্ষক ছিল। এই তিনজন যখন নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে আগমন করেন, তখন তিনি ইরশাদ করেন,

رمَتْكم مكّةُ بأفلاذ كَبِدها

মক্কা তোমাদের নিকট তার কলিজার টুকরোগুলো সোপর্দ করেছে।[৬৫০]

***

وفيه إشارة إليه بالفرار، لئلا يرده إلى المشركين، ورمزه إلى من بلغه ذلك من المسلمين أن يلحقوا به ا قال جمهور العلماء من الشافعية وغيرهم : يجوز التعريض بذلك لا التصريح
[ফাতহুল বারি : ৫/৩৫০]

৬৪৯. মুসনাদে আহমদ : হাদিস নং ১৮৯১০, আলকামিল ফিত তারিখ : ২/৮২

৬৫০. উসদুল গাবাহ : খালিদ বিন ওয়ালিদ, উসমান বিন তালহা রা. এর জীবনী দ্রষ্টব্য, জামিউল উসুল ফি আহাদিসির রাসুল, ইবনুল আসির জাজারি : ১২/৫৯৭

অগ্রগামী যুদ্ধের সূচনা

হুদাইবিয়া সন্ধির পরপরই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিহাদ এবং ইসলামি রাজনীতির এক মহান অধ্যায়ের শুভসূচনা করেন। প্রথমবারের মতো তিনি মদিনার বাইরে গিয়ে একটি সুবিন্যস্ত বাহিনী নিয়ে অভিযান পরিচালনা করেন। এখন পর্যন্ত পরিচালিত যুদ্ধগুলোর অধিকাংশ ছিল প্রতিরক্ষামূলক, (যেমন- গাজওয়ায়ে উহুদ এবং খন্দক) কিংবা কোনো শত্রুর এলাকা, কোনো কাফেলার গতিরোধ এবং পর্যবেক্ষণ করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। তখনও মুসলমানরা মদিনার বাইরে গিয়ে রীতিমতো কোনো শহর বা এলাকা দখল করেনি। বনু নাজির, বনু কাইনুকা এবং বনু কুরাইজার যুদ্ধসমূহে যদিও দুর্গ দখলে এসেছে; কিন্তু সবকটিই ছিল মদিনার সীমানার অভ্যন্তরে। নিয়মতান্ত্রিক বাহিনী পরিচালনা করে যুদ্ধ করা প্রথম সংঘটিত হয়েছিল গাজওয়ায়ে খাইবারে। এটি হুদাইবিয়াসন্ধির দু'মাস পর ৭ম হিজরির দ্বিতীয় মাসের ঘটনা। একে 'ইকদামি বা অগ্রগামী জিহাদ' বলা হয়। 'প্রতিরক্ষামূলক জিহাদের' মতো এটিও জিহাদের একটি প্রকার।

খাইবার : ইহুদি-ষড়যন্ত্রের আখড়া

খাইবার কোনো দুর্গের নাম নয়; বরং মদিনার নব্বই মাইল (১৪৪ কিলোমিটার) উত্তরে অবস্থিত ইহুদিদের ঘনবসতি। সেটি ছোট-বড় সব মিলিয়ে দশটি দুর্গ এবং অনেক বাগ-বাগিচার সুপ্রশস্ত এলাকা। সেখানকার সাতটি দুর্গ ছিল পাশাপাশি আর তিনটি ছিল পৃথক পৃথক। ইহুদিরা চাষাবাদ এবং সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে জীবনযাবন করত। তারা যুদ্ধ-বিগ্রহে পারদর্শী ছিল। মদিনার হুকুমতের বিরুদ্ধে তারা সর্বদা নিত্য-নতুন ষড়যন্ত্র আঁটত। মদিনা থেকে বিতাড়িত বনু নাজির ও বনু কাইনুকার বহু দুষ্টলোক এখানে এসে তাদের সাথে চক্রান্তে যোগ দেয়। এভাবে খাইবার জাজিরাতুল আরবের মধ্যে ইহুদিদের সবচেয়ে বড় ও শক্তিশালী কেন্দ্রে পরিণত হয়। তাদের দুর্গে ছিল ২০ হাজার সশস্ত্র যোদ্ধা।

গাজওয়ায়ে খন্দকে আরবের সম্মিলিত মিত্রশক্তিকে মদিনা আক্রমণের উসকানি এই ইহুদিরাই দিয়েছিল। বনু নাজিরের সরদার হুয়াই বিন আখতাব নিহত হওয়ার পর সাল্লাম বিন আবুল হুকাইক (আবু রাফে আবদুল্লাহ) ইহুদিদের শাসক নিয়োজিত হয়। সে-ই খাইবারকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের কেন্দ্রে পরিণত করে। সে-ই ইসলামের বিরুদ্ধে চক্রান্ত বুনত এবং বিভিন্ন গোত্রকে

মুসলমানদের বিরুদ্ধে প্ররোচিত করত। ফলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবদুল্লাহ বিন আতিক আনসারিকে দিয়ে এক গোপন অভিযানের মাধ্যমে সেই ফেতনাবাজ সরদার আবু রাফেকে হত্যা করেন।[৬৫১]

গাজওয়ায়ে খাইবারের পূর্বপ্রস্তুতি : ইয়াসির বিন রিযামের হত্যা

এরপর সরদার হয় ইয়াসির বিন রিযাম। সেও সাল্লাম বিন আবুল হুকাইকের মতো গাতফানিদের মদদে মদিনায় আক্রমণের পাঁয়তারা করে। ৬ষ্ঠ হিজরির শাওয়াল মাসে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবদুল্লাহ বিন উনাইস এবং আবদুল্লাহ বিন রাওয়াহাকে (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) খাইবার পাঠিয়ে ইয়াসির বিন রিজামকে মদিনায় এসে সন্ধির ব্যাপারে আলোচনা করে নিজের ক্ষমতার স্বীকৃতি নেওয়ার পরামর্শ দেয়।[৬৫২]

ইয়াসির বিন রিযাম নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতিনিধির আলোচনা পছন্দ হলে সে কয়েকজন সঙ্গী-সাথি নিয়ে তাদের সঙ্গেই মদিনায় আসে। কিন্তু উভয়পক্ষই পরস্পরকে সন্দেহ করছিল। এজন্যই ইয়াসির বিন রিজাম পথিমধ্যে আবদুল্লাহ বিন উনাইস রাদিয়াল্লাহু আনহুকে নিরস্ত্র করার চেষ্টা করে। এতে করে উভয়ের মাঝে বাগ্‌বিতণ্ডার একপর্যায়ে অস্ত্র ঠোকাঠুকি শুরু হলে ইয়াসির বিন রিজাম মারা যায়।[৬৫৩] এই ঘটনার পর মদিনা এবং খাইবারের মাঝে সম্পর্কের অনেক অবনতি হয়।

গাজওয়ায়ে যি-কারাদ এবং এক কমবয়সি সাহাবির দুঃসাহসিক ঘটনা

এই সময়েই বনু কারা মদিনার চারণভূমি যি-কারাদে অতর্কিত আক্রমণ করে গবাদি পশু লুট করে নিয়ে যায় এবং তার রাখালদের হত্যা করে। এই ঘটনা তারা রাতের শেষভাগে করে। একজন কমবয়সি সাহাবি সালামা বিন আকওয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু সেদিন ফজরের পূর্বে তির-ধনুক নিয়ে ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে বনের দিকে যাচ্ছিলেন। তাকে কেউ উট লুট হওয়ার সংবাদ দেয়। ফলে তিনি তৎক্ষণাৎ একটি পাহাড়ে চড়ে উচ্চৈঃস্বরে ডাকতে থাকেন, 'ডাকাত! ডাকাত!' এই আওয়াজ দিয়েই তিনি একা লুটেরাদের পেছনে ছোটেন। তিনি অসাধারণ দৌড়বিদ এবং দক্ষ তিরন্দাজ ছিলেন।[৬৫৪] তিনি খুব দ্রুত শত্রুর

---

৬৫১. তারিখুত তাবারি : ৩/৪৯০-৪৯৪

৬৫২. সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ : ৬/১১১

৬৫৩. আলবিদায়া ওয়ান নিহায়া : ৬/২৫৯; তারিখে খলিফা বিন খাইয়াত, পৃষ্ঠা ৭৭

৬৫৪. তার ছেলে ইয়াস রহ. বলেন, 'আমার পিতা দৌড়ে ঘোড়ার আগে চলে যেতেন।' [মুসনাদে আহমদ : হাদিস নং ১৬৫৩১। সনদ সহিহ]।

নিকট পৌঁছে গিয়ে তাদের উপর তির নিক্ষেপ করতে থাকেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি মুখে আবৃত্তি করেন,

أنا ابن الأكوع * اليومَ يومَ الرُّضَّع

আমি ইবনুল আকওয়া। আজ তোমাদের শৈশবের কথা মনে পড়বে।

হজরত সালামা বিন আকওয়ার রাদিয়াল্লাহু আনহুর তির লক্ষ্যভেদী ছিল। যার উপরই লাগত, তাকেই হয়তো আহত কিংবা এফোঁড়-ওফোঁড় করে দিত। ডাকাতরা প্রথমে ভেবেছিল তাদের পশ্চাদ্ধাবনকারী একাধিক হবে। ফলে তারা ঊর্ধ্বশ্বাসে পালাচ্ছিল। কিন্তু পরবর্তীতে তাদের মনে হলো এক ব্যক্তিই তাদেরকে পেরেশান করে তুলেছে। এবার ডাকুরা পালটা আক্রমণ করে তাকে ধরতে চেষ্টা করে। তাকে ধরার জন্য যখনই তাদের কোনো অশ্বারোহী রাস্তার বাঁকে আসত, তিনি গাছ বা পাথরের পেছনে লুকিয়ে অব্যর্থ তির ছুঁড়ে তার ঘোড়া আহত করেই আত্মরক্ষার জন্য দৌড় দিতেন।

হজরত সালামা রাদিয়াল্লাহু আনহুর পশ্চাদ্ধাবনে ডাকাতদল এত পেরেশান হয়ে পড়ে যে, তারা তাদের লুটের উট ছাড়া সব সামানা এবং অতিরিক্ত হাতিয়ার ফেলেই ভেগে যায়। সালামা রাদিয়াল্লাহু আনহু তাদের ফেলে যাওয়া জিনিসপত্রের উপর কোনো চিহ্ন এঁকে সামনে অগ্রসর হন, যেন পেছনে আসা মুসলমানরা এগুলো গনিমতের মাল হিসেবে নিজেদের আয়ত্তে নিয়ে নেয়।

সামনে যাওয়ার পর খোলাপ্রান্তর শেষ হয়ে পাহাড়ি ঘাঁটি আরম্ভ হয়ে যায়। লুটেরারা সঙ্কীর্ণ রাস্তায় চলছিল। তখন সালামা রাদিয়াল্লাহু আনহু উঁচুতে উঠে তাদের উপর বড় বড় পাথর নিক্ষেপ করতে থাকেন। কিছুক্ষণ পর লুটেরাদের আরেকটি দলের সাহায্য এসে যায়। এবার তাদের হালে পানি আসে। তারা সম্মিলিতভাবে একজন মুজাহিদকে ধরার জন্য চেষ্টা করে। তখন সালামা রাদিয়াল্লাহু আনহু এক পাহাড়ের উপর উঠে উচ্চৈঃস্বরে বললেন, 'আমি ইবনে আকওয়া। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রভুর কসম করে বলছি, তোমরা আমাকে কোনোভাবেই ধরতে পারবে না। কিন্তু আমি তোমাদের যাকে চাই পাকড়াও করতে পারবো।'

এই কথা শুনে ডাকাতদল ঘাবড়ে যায়। হজরত সালামা রাদিয়াল্লাহু আনহু তাদেরকে গল্পে মজিয়ে রাখছিলেন, যেন এই সুযোগে মদিনা থেকে মদদ আসতে পারে। কিছুক্ষণ পর দূর থেকে ছয় সদস্যের একটি অশ্বারোহী দল আসতে দেখা গেল। তারা ময়দানে আসার পরপরই লড়াই শুরু হয়ে যায়। লুটেরাদের নেতা মারা যায়। পলায়নপর লুটেরারা একটি স্বচ্ছ পানির পুকুরের কাছে গিয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু যখন তাদের পেছনে সালামা রাদিয়াল্লাহু আনহুকে

আসতে দেখে পানি পান করা ছাড়াই ভাগতে থাকে। তাদের মধ্যে একজন একটু পেছনে পড়ে গিয়েছিল।

হজরত সালামা রাদিয়াল্লাহু আনহু তখন একটি পাহাড়ে চড়ে তির ছুড়তে ছুড়তে বলেন, 'আমি ইবনে আকওয়া। আজ এই নিকৃষ্ট লোকদের ধ্বংসের দিন।' তির গিয়ে লোকটির কাঁধে লাগলে সে চিল্লাতে চিল্লাতে বলে, 'আরে তুই-ই কি সেই ভোরের ইবনু আকওয়া?'

সালামা উত্তর দেন, হ্যাঁ, আমার প্রাণের শত্রু! আমিই ভোরের সেই ইবনু আকওয়া!'

তখন সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছিল। হজরত সালামা রাদিয়াল্লাহু আনহু ডাকাতদলের দুটি ঘোড়া কব্জা করে মদিনায় ফেরার উদ্দেশে রওনা দেন। পথিমধ্যে দেখতে পান নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনেক সাহাবিকে নিয়ে এসেছেন। কাফেররা যেসব উট, চাদর এবং বর্শা ফেলে গিয়েছিল, সাহাবায়ে কেরাম তা কুড়িয়ে নিয়েছিলেন। হজরত বিলাল রাদিয়াল্লাহু আনহু নবীজির জন্য একটি উট জবাই করে তার কলিজা ও কুঁজের গোশত ভুনা করে রেখেছিলেন।

হজরত সালামা রাদিয়াল্লাহু আনহু নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট গিয়ে আরজ করলেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ, আমার সঙ্গে যদি একশ' লোক দেন, তা হলে আমি শত্রুদের পশ্চাদ্ধাবন করে খতম করে দিতে পারি।'

নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন কমবয়সি যুবকের দুঃসাহস ও হিম্মত দেখে খুব খুশি হন এবং হেসে দেন। তারপর বললেন, 'এখন এর চেয়ে অধিক পশ্চাদ্ধাবন করা উচিত হবে না। কারণ, ওরা তাদের কবিলায় পৌঁছে গেছে।' রাতভর বিশ্রাম নেওয়ার পর ভোরে যখন মদিনার দিকে রওনা হন, তখন নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালামা বিন আকওয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুকে তার উটের পেছনে উঠিয়ে নেন। এটি অনেক বড় সম্মাননা ছিল তার জন্য।[৬৫৫]

---

৬৫৫. সহিহ মুসলিম : হাদিস নং ৪৭৭৯ (বাবু গাজওয়াতি যি-কারাদ)

দ্রষ্টব্য : সালামা বিন আকওয়া রা. এর অফাত ৭৪ হিজরিতে হয়। হাফেজ ইবনে আবদুল বার এবং ইবনুল আসির জাজারি রহ. ইনতেকালের সময় তার বয়স ৮০ বছর হয়েছিল বলে উল্লেখ করেন। [আলইসাবাহ, উসদুল গাবাহ : সালামা বিন আকওয়া রা. এর জীবনী দ্রষ্টব্য] এই হিসেবে হজরত সালামার বয়স গাজওয়াতি যি-কারাদের সময় ১৩ বছর হয়। কিন্তু তার কিছুদিন পূর্বে সংঘটিত হুদায়বিয়াসন্ধিতেও তার অংশগ্রহণ প্রমাণিত আছে। [সহিহ মুসলিম : হাদিস নং ৪৭৭৯]

এটাও প্রমাণিত যে, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো নাবালেগকে নিয়ে যাননি। এজন্য হুদায়বিয়াসন্ধির (৭ হিজরিতে) সময় নিশ্চিতভাবে তিনি বালেগ ছিলেন। অর্থাৎ তিনি পরিপূর্ণ তরুণ না, বরং তারুণ্যের প্রারম্ভে ছিলেন। কারণ, সহিহ বুখারিতে

সহিহ বুখারির বর্ণনা অনুযায়ী এই যুদ্ধ তথা গাজওয়ায়ে যি কারাদ খাইবার আক্রমণের তিনদিন পূর্বে সংঘটিত হয়।[৬৫৬]

***

নবীজির সকল গাজওয়া উল্লেখ করা হয়েছে। বদর, উহুদ ও খন্দক; কোনো গাজওয়াতে সালামার নাম নেই! তবে হুদায়বিয়া, খাইবার, হুনাইনে উল্লেখ হয়েছে। [সহিহ বুখারিঃ৫ হাদিস নং ৪২৭৩] এর থেকে পরিষ্কার বুঝা যায়, হুদায়বিয়া ছিল তার প্রথম সফর অর্থাৎ তিনি বালেগ হওয়ার নিকটবর্তী কমপক্ষে বার বছর বয়সে।

যদি বালেগ হওয়ার মধ্যবর্তী বয়সে ধরে নেওয়া হয়, তো হুদায়বিয়া সন্ধির সময় তার বয়স পনের বছর হয়ে গিয়েছিল। গাজওয়া যি-কারাদ হুদায়বিয়া সন্ধির কিছুদিন পর সংঘটিত হয়েছিল। এ কারণে তার বয়স পনের হয়ে যায়।

যা হোক, তার বয়স আশি থেকে নব্বুইয়ের মাঝামাঝি হবে। সম্ভবত এজন্যই ইমাম জাহাবি রহ. তাকে নব্বই বছর বয়সিদের কাতারে গণ্য করেছেন। [সিয়ারু আলামিন নুবালা : ৩/১৩১; মুআসসাতুর রিসালাহ সংস্করণ] আল্লাহ তায়ালাই সর্বাধিক জ্ঞাত।

৬৫৬. সহিহ বুখারি (কিতাবুল মাগাজি, বাবু গাজওয়াতি যি-কারাদ)

গাজওয়ায়ে খাইবার

(মহররম ৭ হিজরি)

যুদ্ধবাজ কবিলা বনু কারা পালিয়ে বনু গাতফানে আশ্রয় নিয়েছিল। তাদেরকে ইহুদিরা মদিনার বিরুদ্ধে সর্বদা উসকানি দিয়ে যাচ্ছিল। এগুলোই প্রমাণ দিচ্ছিল যে, খাইবারবাসী কত অপরাধপ্রবণ। ফলে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য ৭ হিজরির শেষে মহররম মাসে চৌদ্দশ' সাহাবি নিয়ে খাইবারের উদ্দেশে যাত্রা করেন। উক্ত গাজওয়াতে হুদাইবিয়ায় অংশগ্রহণকারী সেই চৌদ্দশ' সাহাবিকে নিয়েই তিনি অভিযান পরিচালনা করেন।[৬৫৭]

ইহুদিরা যদিও জাতিগতভাবেই হুঁশিয়ার ও সতর্ক ছিল; কিন্তু নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কেবল রাতেরবেলা এত নীরবতার সঙ্গে সফর করেন যে, তিনি পৌঁছার পূর্বে তারা বিন্দুমাত্র টের পায়নি। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যুষে খাইবারের দুর্গগুলোর সম্মুখে গিয়ে অবস্থান নেন।[৬৫৮] বেখবর ইহুদিরা তাদের অভ্যাসমতো ভোরবেলা বাগ-বাগিচা দেখাশোনার জন্য বের হচ্ছিল; কিন্তু বাইরে গিয়ে বাহিনী দেখে তারা থতমত খেয়ে যায়।

---

৬৫৭. আসসিরাতুল হালাবিয়্যাহ : ৩/৪৫। কিছু লোক এই বাহিনীর সঙ্গে যুক্ত হয়। তাদেরকে শুরুতেই বলে দেন যে, তারা গনিমতের কোনো অংশ পাবে না। [আসসিরাতুল হালাবিয়্যাহ : ৩/৪৫]

৬৫৮. ওয়াকিদি গাজওয়ায়ে খাইবারের সময় উল্লেখ করতে গিয়ে এক জায়গায় ৭ হিজরি সফর কিংবা রবিউল আওয়াল মাসের বক্তব্য নকল করেছেন। [আলমাগাজি : ২/৬৩৪]

ইবনে সা'দ ৭ হিজরির জুমাদাল উলা মাসের মত নকল করেছেন। [তাবাকাত : ২/১০৬]

মাওলানা ইসহাক আলাবি রহ. এর অভিমত হলো, গাজওয়ায়ে খাইবার হুদায়বিয়া থেকে ফিরে আসার ৫ মাস পর জুমাদাল উলা মাসে (মাদানিপঞ্জিকা) মক্কিপঞ্জিকা অনুসারে মহররমে হয়েছে।

তবে আমার (লেখকের) কাছে তাদের দলিলগুলো তেমন ওজনদার মনে হয়নি।

ইবনে ইসহাক, খলিফা বিন খাইয়াত, ইমাম তাবারি, ইবনে হাবিবসহ অধিকাংশ ঐতিহাসিকের ঐকমত্য হলো যে, গাজওয়ায়ে খাইবার হুদায়বিয়া থেকে ফিরে আসার প্রায় ১ মাস পর ৭ম হিজরির মহররম মাসে হয়েছে।

[সিরাতে ইবনে হিশাম : ২/৩২৮, তারিখুত তাবারি : ৩/৯] এবং পারিপার্শ্বিক অন্যান্য দলিলের আলোকে এটা সুস্পষ্ট যে, সময়টা মাদানিপঞ্জিকা অনুযায়ীই ছিল। ইবনে হাবিব তো আরো তথ্য যোগ করেন যে, খাইবার থেকে মদিনা প্রত্যাবর্তন করেন ১লা রবিউল আখের মাসে। [আলমুহাব্বার, পৃষ্ঠা ১১৫]

পরিস্থিতি বুঝতে পেরে তারা উলটো পায়ে ত্বরিত গতিতে দুর্গে ঢুকে পড়ে। বসতিতে তখন হুলস্থূল পড়ে যায়, 'মুহাম্মদ বাহিনী নিয়ে আমাদের দোরগোড়ায় এসে পড়েছে।'

নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে প্রস্তুত হওয়ার সুযোগ না দিয়ে দুর্গ অবরোধ শুরু করে দেন। দুর্গ বিজয় করার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছিলেন- হজরত আবু বকর, হজরত উমর, হজরত মুহাম্মদ বিন মাসলামা, হজরত সা'দ বিন উবাদাহ এবং হুবাব বিন মুনযির (রাদিয়াল্লাহু আনহুম)।[৬৫৯]

কামুস দুর্গ বিজয় এবং মারহাবের হত্যা

একনাগাড়ে দু'দিন লড়াই করার পরও 'কামুস' দুর্গটি পদানত হচ্ছিল না। ফলে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতে বলেন, 'আগামীকাল আমি এমন ব্যক্তির হাতে ঝান্ডা তুলে দিব, যে আল্লাহ ও তার রাসুলের প্রিয়ভাজন।'[৬৬০]

পরদিন সকালে ওই সৌভাগ্যবান ব্যক্তিকে দেখার জন্য সবাই অপেক্ষমাণ। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হজরত আলি রাদিয়াল্লাহু আনহুকে ডাকলেন। তার চোখ উঠেছিল। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চোখে লালা মোবারক লাগিয়ে দিলে তা সম্পূর্ণ সেরে যায়। এরপর তিনি ঝান্ডা তার হাতে দিয়ে বিশেষ কিছু নির্দেশনা প্রদান করে আক্রমণের নির্দেশ দেন।

---

৬৫৯. আলবিদায়া ওয়ান নিহায়া : ৬/২৬০-২৬৫

৬৬০. রেওয়ায়েতে 'রায়াতুন' শব্দ এসেছে, যা ছোট ঝান্ডার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। এই ঝান্ডা মূল আক্রমণ পরিচালনাকারী বাহিনীর সালারের হাতে থাকে। আর 'আলামুন' সাধারণত বর্শার উপর বাঁধা থাকে। [العلم هو الراية، وقيل: هو الذي يعقد على الرمح ইযাহু শাওয়াহিদিল ইযাহ : ১/৩০৮]

তবে কখনো প্রয়োজনে প্রধান সেনাপতি নিজেই ঝান্ডা নিয়ে প্রথম সারিতে দাঁড়িয়ে আক্রমণ পরিচালনা করে থাকেন। যেমন, মুতাযুদ্ধে তিন সেনাপতি লড়তে লড়তে শাহাদাত বরণ করেন। বড় পতাকা, যা সেনাপতির নিকট থাকে, তাকে 'লিওয়া' বলে, এটা সুপ্রিম কমান্ডের প্রমাণ বহন করে। যে অফিসার তা উত্তোলন করে রাখেন এবং প্রধান সেনাপতির পাশেই দণ্ডায়মান থাকেন, তাকে 'সহযোগী সেনাপতি' বা হামিলুল লিওয়া' বলা হয়ে থাকে। [আলমুযহির ফি উলুমিল লুগাহ ওয়া আনওয়া উহা : ২/৪০৯] এই কারণেই ঝান্ডা পতপত করে উড়া কিংবা ভূলুণ্ঠিত হওয়া, সেনাপতির মৃত্যু কিংবা পশ্চাদপসরণ ঝান্ডার উপরই তা নির্ভর করে।

গাজওয়াতে 'লিওয়া' নবীজির (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নিকটেই থাকত। পতাকাবাহী সাহাবি তার সঙ্গে সঙ্গেই থাকতেন। যেমন : গাজওয়া উহুদে মুসআব বিন উমাইর রা. 'ঝান্ডাবাহী' ছিলেন। লিওয়া এবং রায়াতুন- এ দু'টি শব্দের পার্থক্য না বুঝার কারণে অনেক সময় যুদ্ধের দৃশ্যপট বুঝতেও ভুল হয়। গাজওয়ায়ে খাইবারেও 'লিওয়া' নবীজির নিকটেই ছিল। কিন্তু ঝান্ডা একাধিক সাহাবির কাছে ছিল। 'লিওয়া' এবং 'রায়াতুন' শব্দদু'টির উপর চমৎকার আলোচনা করেছেন আল্লামা আইনি রহ.। [উমদাতুল কারি : ১৪/২৩২]

সেদিন প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়। কামুস দুর্গের প্রখ্যাত বীর, ইহুদি পাহলোয়ান 'মারহাব'কে কেউই ধরাশায়ী করতে পারছিল না। হজরত আমের বিন আকওয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু তার মোকাবেলার জন্য অগ্রসর হলেন। উভয়েই দু'বার তরবারি ঠোকাঠুকি করে। মারহাব তরবারি দিয়ে প্রচণ্ড আঘাত করে, হজরত আমের ঢাল দিয়ে ফেরাতে গেলে তা ফেঁড়ে ভেতরে ঢুকে যায়। তখন আমের রাদিয়াল্লাহু আনহু তরবারি দিয়ে তার নলা কেটে দেওয়ার চেষ্টা করলেন, কিন্তু সে সরে গিয়ে আত্মরক্ষা করতে সক্ষম হয়। তবে সে ঘুরেই প্রচণ্ডভাবে পালটা আক্রমণ করে হজরত আমেরের ঘাড়ের রগ কেটে ফেলে। ফলে তিনি তখনই শাহাদাত বরণ করেন।[৬৬১]

হজরত আলির হাতে মারহাবের মৃত্যু

মারহাব মুসলমানদের উচ্চৈঃস্বরে মল্লযুদ্ধের জন্য আহ্বান করেই যাচ্ছিল। তখন হজরত আলি রাদিয়াল্লাহু আনহু তার মোকাবেলা করার জন্য মুখোমুখি হলেন। মারহাব এই কবিতা আবৃত্তি করতে করতে তার দিকে অগ্রসর হয়:

قد علمت خيبر أني مَرْحَبُ * شاكِي السلاح بَطَلٌ مجرَّب

খাইবার জানে আমি মারহাব, সশস্ত্র এবং ঝানু যোদ্ধা।

হজরত আলি রাদিয়াল্লাহু আনহু তার উত্তরে বলেন,

أنا الذي سمَّتني أمي حَيدرة * كليث الغابات كَرِيه الْمَنْظَرة

আমি হলাম সেই ব্যক্তি, যাকে আমার মা নাম রেখেছেন হায়দার (সিংহ) বলে, আমি বনের সিংহের মতোই দুর্দান্ত প্রতাপশালী ও নির্দয়।

দুজনের তরবারি ঠোকাঠুকির একপর্যায়ে আলি রাদিয়াল্লাহু আনহু তার মাথায় এমন আঘাত করেন, মারহাবের মাথা দু'ভাগ হয়ে যায়।[৬৬২]

যুবাইর বিন আওয়ামের হাতে ইহুদি ইয়াসিরের হত্যা

মারহাবের মৃত্যুর পর তার ভাই নিম্নের পঙ্ক্তি আবৃত্তি করতে করতে ময়দানে অবতীর্ণ হয়:

قد علمتْ خيبرُ أني ياسِرُ * شاكِي السلاح بطلٌ مُغاور

---

৬৬১. সহিহ মুসলিম : হাদিস নং ৪৭৭৯ (কিতাবুল জিহাদ, বাবু গাজওয়াতি যি-কারাদ)

৬৬২. প্রাগুক্ত।

কিছু রেওয়ায়েতে এসেছে মারহাবকে মুহাম্মদ বিন মাসলামা রা. কতল করেছেন। [তারিখে খলিফা বিন খাইয়াত, পৃষ্ঠা ৮২] কিন্তু সনদের দৃষ্টিকোণ থেকে সহিহ মুসলিমের রেওয়ায়েত অধিক অগ্রগণ্য। উক্ত রেওয়ায়েতে হজরত আলি রা. এর কর্মযজ্ঞ বর্ণনা করা হচ্ছে। আর অধিকাংশ আলেমের মতও এটি।

قد علمتْ خيبرُ أني زَبَّار * قَرْمٌ لقومٍ غير نِكسٍ ولا فرَّار

ابن حَمَاةِ المجد وابنُ الأَخيار * ياسِرُ! لا يَغرُرك جمع الكُفَّار

جَمعهم مثلَ سَراب الجرَّار

খাইবার জানে আমি ইয়াসির, সশস্ত্র এবং দুঃসাহসী বীর।
খাইবার জানে আমি যুবাইর কওমের সরদার,
সে না পলায়নকারী, না নিষ্কর্মা।
আমি সম্ভ্রান্ত এবং উৎকৃষ্ট ব্যক্তিদের সন্তান।
ইয়াসির! কাফেরবাহিনী তোমাকে যেন প্রবঞ্চিত না করে।
তাদের বাহিনী তো মরীচিকার মতো লীন হয়ে যাবে।

ইয়াসির অনেক শক্তিশালী যোদ্ধা ছিল। তা দেখে যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুর মা সাফিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহা অস্থির হয়ে বলতে লাগলেন, 'ইয়া রাসুলাল্লাহ, আজ আমার ছেলে শহিদ হয়ে যাবে।' নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'না, ইনশাআল্লাহ তার হাতেই ইয়াসির নিহত হবে।'

এমনটিই ঘটে। হজরত যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাতে সে মারা যায়।[৬৬৩]

খাইবারের অন্যান্য দুর্গ বিজয়

ইহুদিদের প্রখ্যাত সরদাররা নিহত হওয়ার কারণে তারা হিম্মত হারা হয়ে যায়। কামুস দুর্গ বিজিত হয় এবং তার সাথে সাথে নায়িম, সা'ব, সুমওয়ান, নাযারের মতো দুর্গগুলোও পর্যায়ক্রমে পদানত হয়। ইহুদিরা সবদিক থেকে বেষ্টিত হয়ে 'ওয়াতিহ' ও 'সুলালিম' দুর্গে বন্দি হয়ে পড়ে। চৌদ্দ দিন অবরোধের পর তারা প্রাণভিক্ষা চায় এবং খাইবার ছেড়ে যাওয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের আবেদন এই শর্তে মঞ্জুর করেন যে, 'খাইবার ত্যাগ করার সময় সোনা-রুপা, অস্ত্র কিছুই সঙ্গে নিতে পারবে না; কাউকে এমন করতে দেখা গেলে তার নিরাপত্তা নেই।'

ইহুদি সরদার কিনানা আবুল হুকাইক চুক্তিপরিপন্থি সোনা-রুপা এবং অস্ত্রশস্ত্র মুসলমানদের নিকট হস্তান্তর করার পরিবর্তে মাটির নিচে পুঁতে ফেলে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে জিজ্ঞেস করলে সে প্রতারণার আশ্রয় নেয়। কিন্তু নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তখন মুজিজা প্রকাশ পায়। তিনি সাহাবায়ে কেরামকে তৎক্ষণাৎ বলে দেন যে, অমুক অমুক জায়গায় সে তার সোনা-রুপা এবং অস্ত্রপাতি পুঁতে রেখেছে। চুক্তিভঙ্গ করার দরুন ইহুদিরা যুদ্ধবন্দিতে পরিণত হয়।

---

৬৬৩. তারিখুত তাবারি : ৩/১১

কিনানা বিন আবুল হুকাইক প্রতারণা করা ছাড়াও সে ছিল একজন মুসলিমের হত্যাকারী। এজন্য তার মুণ্ডুপাত করা হয়। ইহুদি নারীদেরকে বাঁদি হিসেবে মুসলমানদের মধ্যে বণ্টন করে দেওয়া হয়। পুরো খাইবারের সবুজ-শ্যামল ক্ষেত ও বাগিচাগুলোও মুসলমানদের দখলে চলে আসে।[৬৬৪]

***

৬৬৪. আলবিদায়া ওয়ান নিহায়া : ৬/২৯৬-২৯৮, তাবাকাতে ইবনে সা'দ : ২/১১০

নোট : কিছু রেওয়ায়েতে খাইবার বিজয়ের জন্য পর্যায়ক্রমে হজরত আবু বকর, হজরত উমরকে পাঠানো এবং তাদের বিফল হয়ে ফিরে আসা, তাদের এবং অন্যান্য মুজাহিদের প্রতি কাপুরুষতার অভিযোগ তুলে হজরত আলির অভিযান পরিচালনার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। বড় বড় সাহাবিদের পিছপা হওয়া অসম্ভব কিছু নয়; তবে তা প্রমাণিত নয়; এজন্য তাদের উপর আপত্তি পেশ করারও কোনো সুযোগ নেই।

উপরন্তু ঐ রেওয়ায়েতগুলো সনদের দিক থেকে দুর্বল। ইবনে কাসির রহ. এদিকে ইশারা করতে লেখেন, 'এর সনদে শিয়া মতাবলম্বনে অভিযুক্ত কোনো ব্যক্তি রয়েছে।' [আলবিদায়া ওয়ান নিহায়া : ৬/২৬৭]

মনে রাখা আবশ্যক যে, হজরত আলি রা. এর হাতেই সমগ্র খাইবার বিজিত হয়নি। কেবল কামুস নামের একটি গুরুত্বপূর্ণ দুর্গ তার নেতৃত্বে পদানত হয়েছে। বাকি দুর্গগুলো অন্য সাহাবিরা জয় করেন। হজরত আলি রা. এর মর্যাদা যথাস্থানে ঠিক আছে। তাই বলে অন্যান্য সাহাবির অবদান অস্বীকার করার সুযোগ নেই।

সাফিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহার বিয়ে

বন্দিদের মধ্যে হজরত হারুন আলাইহিস সালামের বংশধর, ইহুদি সরদার হুয়াই বিন আখতাবের কন্যা এবং কিনানা বিন আবুল হুকাইকের বিধবা স্ত্রী সাফিয়াও ছিলেন।[৬৬৫] তিনি হজরত দিহয়া কালবি রাদিয়াল্লাহু আনহুর ভাগে পড়েছিলেন। কিন্তু সাহাবায়ে কেরামের অভিমত ছিল, তার মতো এত উচ্চবংশীয় এবং সুন্দরী নারী কেবল রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘরেই শোভা পেতে পারে। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের এই প্রস্তাব কবুল করেন এবং দিহয়া কালবির সন্তুষ্টিক্রমে সাফিয়াকে নিজের ভাগে নিয়ে আসেন।[৬৬৬]

সাফিয়ার চেহারায় কষ্ট-বেদনার সুস্পষ্ট ছাপ ছিল। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, কিছুদিন পূর্বে তিনি স্বপ্নে দেখেন যে চাঁদের একটি টুকরো আমার কোলে এসে পড়েছে। আমি স্বামী কিনানাকে এই স্বপ্ন বললে সে আমার গালে জোরে থাপ্পড় মারে এবং বলে, 'তুই আরবের সরদার মুহাম্মদকে স্বপ্ন দেখছিস?'

কিনানা তার সাজা পেয়ে গিয়েছিল। তার স্ত্রী সাফিয়া ইসলাম গ্রহণ করেন। তার স্বপ্ন সত্য হয়েছিল। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে মুক্ত করে দেন এবং ইদ্দতের পর তাঁকে বিয়ে করেন।[৬৬৭]

ফাদাক এবং ওয়াদিল কুরা বিজয়

খাইবারের দক্ষিণপূর্বে মদিনা থেকে দু-তিন মঞ্জিল দূরে অবস্থিত 'ফাদাক'। এটি ছিল সবুজ-শ্যামল এবং উর্বর অঞ্চল। এখানকার ইহুদিরা লড়াইয়ের পূর্বেই প্রাণভিক্ষা চেয়ে হাতিয়ার সমর্পণ করে এবং নির্বাসনের সিদ্ধান্ত মেনে নেয়। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তরদিকে আরো অগ্রসর হন এবং ইহুদিদের আরেক বসতি ওয়াদিল কুরা পৌঁছে যান। তারাই ছিল আরব-সীমান্তের সর্বশেষ বাসিন্দা। তাদের বসতির পরই শামের সীমানা শুরু হয়েছে।

---

৬৬৫. সিয়ারু আলামিন নুবালা : ২/২৩১

৬৬৬. সহিহ মুসলিম, হাদিস নং ৩৫৭১ (কিতাবুন নিকাহ, বাবু ফাযিলাতি ইতাকি আমাতিহি সুম্মা য়াতাযাওয়াজুহা); সহিহ বুখারি : হাদিস নং ৪২০০, ২২৩৫, ২৮৯৩, মুসনাদে আহমদ : হাদিস নং ১৩০২৩-সহিহ সনদ।

৬৬৭. আলবিদায়া ওয়ান নিহায়া : ৬/২৯০

এখানকার ইহুদিরাও পরাজিত হয়। ফলে সমগ্র অঞ্চল মুসলমানদের অধিকারে চলে আসে।[৬৬৮]

ইহুদিদের আরেকটি ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র

খাইবারদুর্গের পতনের পর ফেতনাবাজ ইহুদিরা সম্মুখ-সমরে একেবারে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল। কিন্তু সর্বশেষ প্রচেষ্টাস্বরূপ তারা একটি ঘৃণ্য খেলা খেলে। তাদের সরদার সাল্লাম বিন মিশকামের স্ত্রী যায়নাব বিনতে হারিস (মারহাবের বোন) রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আপ্যায়ন করে। সে বিষমিশ্রিত ভুনা ছাগল পরিবেশন করে নবীজির সামনে। প্রথম লোকমা মুখের সামনে নিতেই আল্লাহ তায়ালা তাকে এ ব্যাপারে অবহিত করেন। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তৎক্ষণাৎ লোকমাটা ফেলে দেন। ততক্ষণে দাওয়াতে অংশগ্রহণকারী এক সাহাবি বিশ্‌র বিন বারা রাদিয়াল্লাহু আনহুর গলার ভেতরে চলে গিয়েছিল একটি লোকমা।

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যায়নাবকে এই ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রের বিষয়ে জিজ্ঞেস করলে সে বলে, 'আমি আমার কওমের প্রতিশোধ নিতে চাচ্ছিলাম, যাদের আপনি এমন শোচনীয় অবস্থা করেছেন। আমি ভেবেছিলাম, আপনি যদি সত্যি সত্যি নবী হয়ে থাকেন, তা হলে আপনি বেঁচে যাবেন, আর যদি সাধারণ বিজেতাদের মতো হন তা হলে আমরা আপনার থেকে মুক্তি পেয়ে যাব।'

মহিলাটি খুব প্রত্যুৎপন্নমতি এবং চতুর ছিল। কিন্তু তারপরও নিজের অপরাধ ঢাকার জন্য কোনো ছলচাতুরীর আশ্রয় নেয়নি। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ব্যক্তিস্বার্থের প্রতিশোধ নিতে পছন্দ করতেন না। উপরন্তু সে একজন নারী। তাই তিনি তাকে ক্ষমা করে দেন।[৬৬৯] জানের শত্রুকে ক্ষমা করে দেওয়ার প্রকৃষ্ট উদাহরণ ছিল এই ঘটনা।

কিন্তু কিছুদিন পর হজরত বিশর বিন বারা রাদিয়াল্লাহু আনহু বিষক্রিয়ায় মারা গেলে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ন্যায়-ইনসাফের দাবি অনুযায়ী মহিলাকে নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারদের হাতে সোপর্দ করেন। তারাই তাকে হত্যা করে ফেলে। এটা আইনপ্রয়োগের সর্বোত্তম দৃষ্টান্ত ছিল।[৬৭০]

---

৬৬৮. আলবিদায়া ওয়ান নিহায়া : ৬/৩৩৪-৩৩৫

৬৬৯. সহিহ বুখারি, হাদিস নং ৩১৬৯ (কিতাবুল জিযয়া, বাবুন ইযা গাদারাল মুশরিকুনা), সিরাতে ইবনে হিশাম : ২/৩৩৭, ৩৩৮

৬৭০. তাবাকাতে ইবনে সা'দ : ২/২০১

ইহুদিদের সঙ্গে চাষাবাদ-চুক্তি

খাইবারের ইহুদিরা চাষাবাদ এবং বাগান পরিচর্যায় খুব দক্ষ ছিল। যদিও তাদেরকে বিতাড়িত করা হয়েছিল; কিন্তু তারা প্রস্তাব দেয় যে, তাদেরকে কেবল ক্ষেতে কাজ করার অনুমতি দেওয়া হোক। আর উৎপাদিত ফসলের অর্ধেক তাদের আর অর্ধেক মুসলমানদের। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গভীরভাবে ফিকির করার পর তা কল্যাণকর মনে করেন। কারণ, মুসলমানদের সংখ্যা তখনও এ পরিমাণ হয়নি যে, তারা জিহাদ-চাষাবাদ একইসঙ্গে চালিয়ে যেতে পারবে। মুসলমানদেরকে জিহাদের জন্য প্রস্তুত রাখার উদ্দেশ্যে ইহুদিদের অনুরোধ গ্রহণ করেন। পাশাপাশি এ কথা স্পষ্ট বলে দেন যে, এই চুক্তি যখন ইচ্ছা তখনই ভেঙে দিতে পারেন।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খাইবারের উৎপাদিত ফসলের হিস্যা উসুলের দায়িত্ব দেন আবদুল্লাহ বিন রাওয়াহা রাদিয়াল্লাহু আনহুকে। তিনি খাইবার এসে যখন অত্যন্ত ইনসাফ ও পরহেজগারির সাথে উৎপাদিত ফসল ভাগ করেন, তখন ইহুদিরা বলতে থাকে, 'আসমান-জমিন এ ধরনের ইনসাফের কারণেই টিকে আছে।'[৬৭১]

হজরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর খেলাফতকাল পর্যন্ত তারা এখানেই বসবাস করে। যেহেতু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশ ছিল 'জাজিরাতুল আরবে যেন দুটি ধর্ম একইসঙ্গে না থাকে এবং ইহুদি-নাসারাদের যেন বিতাড়িত করে দেওয়া হয়; তাই হজরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তার শাসনামলে খাইবার ও তার আশপাশের সকল ইহুদিকে দেশান্তর করে শামে পাঠিয়ে দেন। ফলে তারা বিভিন্ন ভূমিতে যাযাবরের মতো ঘুরে ঘুরে দিনাতিপাত করে।[৬৭২]

হাবশার মুহাজিরদের প্রত্যাবর্তন

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাত্রই খাইবার বিজয় থেকে অবসর হয়েছেন। ইতোমধ্যে তের-চৌদ্দ বছর পরদেশে অবস্থানকারী মুহাজিররা হজরত জাফর বিন আবু তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহুর নেতৃত্বে মদিনায় এসে পৌঁছান। নাজাশি দুটি বড় জাহাজের মাধ্যমে তাদেরকে যত্নের সাথে গন্তব্যে পৌঁছে দেওয়ার নির্দেশ দেন। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের আগমনে এত খুশি হন যে, আনন্দের সাথে তিনি বলে ওঠেন, 'আমি জানি না, খাইবার বিজয়ে অধিক আনন্দ লাগছে, নাকি জাফরের আগমনে।'[৬৭৩]

---

৬৭১. আলইসাবাহ, উসদুল গাবাহ : আবদুল্লাহ বিন রাওয়াহা রা. এর জীবনী দ্রষ্টব্য

৬৭২. আত-তারিখুল ইসলামি আলআম, পৃষ্ঠা ২০০

৬৭৩. আলমুজামুল কাবির, তাবারানি : ২/১০৮ (মাকতাবা ইবনে তাইমিয়া সংস্করণ)।

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলমানদের উৎসাহ দেন যে, খাইবার থেকে প্রাপ্ত কৃষিপণ্যে যেন নতুন মেহমানদেরও শামিল করে নেওয়া হয়। এই মুহাজিররা যেন সচ্ছল জীবনযাপন করতে পারে এবং তাদের প্রতিষ্ঠিত হওয়া সহজ হয়। স্থানীয় মুসলমানরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে তা মেনে নেয়।[৬৭৪]

হাবশার মুহাজিরদের সাথে ইয়ামানের ৫৩জন মুসলমানও নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হয়। তাদের মধ্যে আবু মুসা আশআরি রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং তার দুই ভাই আবু বুরদাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং আবু রুহম রাদিয়াল্লাহু আনহুও ছিলেন। এরা নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মদিনায় হিজরতের কথা শুনে ইয়ামান থেকে নৌপথে আসার জন্য নৌকায় আরোহণ করে; কিন্তু পথিমধ্যে ঝড়ের কবলে পড়ে তারা হাবশা-উপকূলে গিয়ে ভিড়ে। সেখানে জাফর বিন আবু তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহুসহ অন্যান্য মুহাজিরের সঙ্গে তাদের সাক্ষাৎ হয়। ফলে তারাও মুহাজিরদের সঙ্গে বসবাস করতে থাকেন। এবার তারা সকলে একসঙ্গে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে পৌঁছয়। তিনি তাদেরকেও খাইবারের গনিমতের অংশ প্রদান করেন।[৬৭৫]

আশআরি গোত্রের এই লোকগুলো মসজিদে নববিতে খুবই আগ্রহের সঙ্গে কুরআন করীমের শিক্ষাগ্রহণ করত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হুজরা থেকেই তাদের মর্মস্পর্শী তেলাওয়াত শুনে বলতেন, 'আমি আমার আশআরি বন্ধুদের তেলাওয়াত শুনেই চিনে ফেলি।'[৬৭৬]

হজরত আবু হুরাইরার আগমন

খাইবার বিজয়ের সময়ই হজরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু আগমন করেন।[৬৭৭] তিনি ইয়ামানের দাউস গোত্রের ছিলেন। মুসলমান হয়ে তিনি কবিলার ৮০টি পরিবারের সাথে ইয়ামান থেকে বের হন। পথিমধ্যে আপনমনে বলতে থাকেন,

يا ليلةٌ من طُولها وعَنائها * على أنها من دار الكفر نَجَّت

মনে রাখা আবশ্যক যে, আসহামা (নাজাশি) রহ. তার আগেই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। [তাবাকাতে ইবনে সা'দ : ১/২০৭]

৬৭৪. আলমুখতাসার ফি আখবারিল বাশার : ১/১৪০, ১৪১

৬৭৫. সহিহ মুসলিম : হাদিস নং ৬৫৬৬ (ফাযায়িলুস সাহাবা, বাবু ফাযায়িলি জাফর রা.), উসদুল গাবাহ (বাবুল কুনা : আবু মুসা আশআরি রা. এর জীবনী দ্রষ্টব্য)

৬৭৬. সহিহ বুখারি : হাদিস নং ৪২৩২ (কিতাবুল মাগাজি, বাবু গাজওয়াতি খাইবার)

৬৭৭. আলবিদায়া ওয়ান নিহায়া : ১১/৩৬৪

হায়! এই রাত কত দীর্ঘ এবং কত কষ্টদায়ক।
কিন্তু যাই হোক, কুফরি সরকার থেকে মুক্তি মিলল।[৬৭৮]

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন খাইবার অভিযানে ব্যস্ত, তখন এই নবীপ্রেমিক মদিনায় পৌঁছান। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খাইবার আছেন শুনে তিনিও সেখানে চলে যান এবং নবীজির দরবারে হাজির হন। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করেন, তুমি কোন গোত্রের? আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, 'দাউস গোত্রের।'

নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুশি ও বিস্ময়ে কপালে হাত দেন।[৬৭৯]

এরপর নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে লেপটে থাকেন। সারাজীবন তিনি হাদিস শোনা, মুখস্থ রাখা এবং আওড়ানোর মধ্যেই কাটিয়ে দেন। সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে তাকেই সবচেয়ে বড় হাফেজে হাদিস হিসেবে গণ্য করা হয়।

ইয়ামান থেকে আগত মুসলমানদের মধ্যে দাউস গোত্রের সরদার তুফাইল বিন আমর রাদিয়াল্লাহু আনহুও ছিলেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে এবং দাউস গোত্রের সকল মুসলমানকে খাইবারের সম্পদ থেকে ভাগ দেন।[৬৮০]

হুদাইবিয়ার সন্ধি এবং খাইবারযুদ্ধের পর মদিনার হুকুমতের অবস্থান

হুদাইবিয়ার সন্ধি এবং গাজওয়ায়ে খাইবারের পর শত শত বছর ধরে চলতে থাকা আরবদের বিকেন্দ্রিকতা প্রায় খতম হয়ে গিয়েছিল। মুসলমানরা তখন আরবে এক বড় শক্তিতে রূপ নিয়েছিল। কুরাইশ তখন একেবারেই পর্যুদস্ত ছিল। আর মুসলমানদেরকে তারা কখনো পরাজিত করতে পারবে এমন সম্ভাবনাও তাদের ছিল না। দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিমে মক্কা এবং কুরাইশের মিত্র কবিলাগুলোর এলাকাসমূহে ইসলামি টহলদার বাহিনীর প্রহরার কার্যক্রম প্রায় শেষ হয়ে গিয়েছিল। কারণ, হুদাইবিয়া-সন্ধির শর্তাবলির বদৌলতে সেসব অঞ্চল মাহফুজ ও সংরক্ষিত ছিল।

লক্ষ করলে দেখবেন, মদিনার হুকুমত প্রথম অবস্থাতেই তার সীমান্ত পেরিয়ে এক ক্রমবর্ধমান পরাশক্তি হিসেবে গণ্য হতো। নিঃসন্দেহে এটা মুসলমানদের দীর্ঘ বিশ বছরের কঠিন পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের মোবারক ফসল ছিল। মদিনার হুকুমত যখন কুরাইশ থেকে কিছুটা নিঃশঙ্ক হয়, তখনই তার শিরা-উপশিরায় বহমান শক্তি-ক্ষমতা প্রয়োগের জন্য নতুন ক্ষেত্রের সন্ধানে উদগ্রিব হয়ে পড়ে

৬৭৮. সহিহ বুখারি : হাদিস নং ৪২৯৩ (কিতাবুল মাগাজি, বাবু কিসসাতি দাউস)
৬৭৯. আলবিদায়া ওয়ান নিহায়া : ১১/৩৬৪
৬৮০. সিরাতে ইবনে হিশাম : ১/৩৮৫

এবং তাদের সামরিক কার্যক্রম উত্তরদিকে ধাবিত হয়। খাইবার, ফাদাক এবং ওয়াদিল কুরা বিজয় তাদের সেই মহান বিপ্লবের প্রথম ধাপ ছিল। দ্বিতীয় ধাপ ছিল মুতার যুদ্ধ এবং গাজওয়ায়ে তাবুক। এখান থেকেই মূলত ক্ষমতাধর রোমান সাম্রাজ্যের পতনের সূচনা হয়।

আরবভূমিতে তখনও ছোট ছোট সরকার-ব্যবস্থা বিদ্যমান ছিল। এসব সরকার যেকোনো বড় সাম্রাজ্য সৃষ্টির পথে বাধা ছিল। কিন্তু মুসলমানদের মধ্যে এই যোগ্যতা ছিল যে, তাদেরকে নিজেদের সঙ্গে একীভূত করে নেবে এবং বিরোধীপক্ষকে সম্পূর্ণরূপে নির্মূল করে দেবে। যেহেতু ঐসব বেদুইন কবিলা কোনো চুক্তিনামার অনুসরণ করত না এবং মুসলমানদের সাথে তাদের কঠিন বিরোধিতা ছিল; তাই মদিনার হুকুমত তাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক অভিযান পরিচালনা করতে বাধ্য হয়।

গাজওয়ায়ে যাতুর রিকা

তারই ধারাবাহিকতায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অভিযান ছিল গাজওয়ায়ে যাতুর রিকা। এই অভিযানে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শত্রুদের পশ্চাদ্ধাবন করে বনু গাতফান পর্যন্ত গমন করেন।[৬৮১]

এই সফরে মুজাহিদদের নিকট সওয়ারির সংখ্যা খুব কম ছিল। একেক উটের উপর পালাক্রমে ছ'জন আরোহণ করতেন। সাহাবায়ে কেরামকে সাধারণত পায়ে হেঁটেই চলতে হচ্ছিল।[৬৮২] এজন্য অনেকেরই জুতা ফেঁটে খুব খারাপ অবস্থা হয়ে গিয়েছিল। অভিযানে অংশগ্রহণকারী এক সাহাবি হজরত আবু মুসা আশআরি রাদিয়াল্লাহু আনহু। তিনি বলেন, আমাদের পাগুলো বিক্ষত হয়ে গিয়েছিল। তাই আমরা কাপড় ছিঁড়ে পায়ে পট্টি লাগাতে বাধ্য হই (আরবরা এটাকে 'রিকা' বলেন)। এজন্য এই অভিযানকে গাজওয়ায়ে যাতুর রিকা বলা হয়।[৬৮৩]

---

৬৮১. সহিহ বুখারি : হাদিস নং ৪১২৫, ৪১২৬, ৪১২৭ (কিতাবুল মাগাজি, বাবু গাজওয়াতি যাতুর রিকা)

৬৮২. সহিহ বুখারি : হাদিস নং ৪১২৮ (কিতাবুল মাগাজি, বাবু গাজওয়াতি যাতুর রিকা)

৬৮৩. সহিহ বুখারি : হাদিস নং ৪১২৮

'যাতুর রিকা'র নামকরণের ক্ষেত্রে আরো মত রয়েছে :

ওয়াকিদির মত অনুযায়ী এই অভিযানটি পরিচালিত হয়েছে পাহাড়ি এলাকায়। সেখানকার ভূমি ছিল পাথুরে এবং সাদা-কালো। [আলমাগাজি, ওয়াকিদি : ১/৩৯৫] উক্ত ভূমিতে তালিযুক্ত ব্যক্তিদের পদচারণার কারণে 'যাতুর রিকা' নামকরণ করা হয়েছে।

বলা হয় যে, 'যাতুর রিকা' ঐ এলাকার একটি বৃক্ষের নাম, যার পেছনে অভিযানের সময় আত্মগোপন করা হয়েছিল।

সালাতুল খাওফ

গাজওয়ায়ে যাতুর রিকাতে যুদ্ধের সুযোগ হয়নি। তবে 'নাখ্‌ল' নামক স্থানে যুদ্ধের আশঙ্কা তৈরি হয়। এজন্য রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেখানে জামাতের সাথে সালাতুল খাওফের পদ্ধতিতে ফরজ নামাজ আদায় করেন।[৬৮৪]

আসহামা নাজাশির মৃত্যু

এ বছরই হাবশার মুসলিম বাদশাহ আসহামা নাজাশি ইনতেকাল করেন। আল্লাহ তায়ালা নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তার মৃত্যুসংবাদ

কেউ বলেন, বাহিনীর পতাকা ফেঁটে গিয়েছিল, তার মধ্যে তালি লাগানো হয়েছিল। তবে পায়ে পট্টি লাগানোর মতোই অধিক বিশুদ্ধ। কারণ, অভিযানে অংশগ্রহণকারী আবু মুসা আশআরি রা. নিজেই তার বর্ণনা দিচ্ছেন।

ইবনে ইসহাক গাজওয়াতি যাতুর রিকা গাজওয়া বনু নজিরের পর ৪র্থ হিজরিতে হওয়ার কথা বলেছেন। [তারিখুত তাবারি : ২/৫৫৫]

ওয়াকিদি তার তারিখ ১১ মহররম শনিবার থেকে ২৫ মহররম ৫ম হিজরি উল্লেখ করেছেন। [আলমাগাজি, ওয়াকিদি : ১/৩৯৫]

সহিহ কথা হলো এই অভিযান গাজওয়ায়ে খাইবারের পর হয়েছে। কারণ, এতে হজরত আবু মুসা আশআরি এবং আবু হুরাইরা রা. উভয়েই অংশগ্রহণ করেছিলেন। [সহিহ বুখারি : হাদিস নং ৪১২৮, ৪১৩৬] আর এই দুই সাহাবি গাজওয়ায়ে খাইবারের যুদ্ধের পর নবীজির সোহবতে আগমন করেছেন।

ইমাম বুখারি রহ. বলেন [সহিহ বুখারি : হাদিস নং ৪১২৮],

وهي غزوة محارب خصفة من بني ثعلبة من غطفان، فنزل نخلا، وهي بعد خيبر، لأن أبا موسى جاء بعد خيبر

এজন্য যৌক্তিক হলো, এই অভিযান গাজওয়ায়ে খাইবার-পরবর্তী ১লা মহররম মাসে তথা মক্কি মহররম ৭ হিজরি মোতাবেক সেপ্টেম্বর ৬২৮ খ্রিষ্টাব্দে সংঘটিত হয়েছে (জুমাদাল উলা মাদানি ৭ম হিজরি)। ওয়াকিদি অভিযান সূচনার তারিখ বলেছেন শনিবার। ১১ মহররম মক্কি ৭ম হিজরিও শনিবার ছিল।

একটি সম্ভাবনা এও আছে যে, গাজওয়ায়ে যাতুর রিকা নামে দু'টি পৃথক যুদ্ধ সংঘটিত হয়। একটি ৪ কিংবা ৫ম হিজরিতে, আরেকটি ৭ম হিজরিতে। [ফাতহুল বারি : ৭/৪১৭]

৬৮৪. যে স্থানে সালাতুল খাওফ আদায় করা হয়, সেই স্থানটিকে 'নাখ্‌ল' কিংবা 'নাখলা' বলা হয়। আরবে এ নামে একাধিক স্থান রয়েছে। তন্মধ্যে দু'টি অধিক প্রসিদ্ধ। এক. মদিনার উপকণ্ঠে অবস্থিত একটি উপত্যকা, যেখান থেকে বসরা যাওয়ার রাস্তায় ওঠা যায় [মুজামুল বুলদান : ১/৪৪৯]। দুই. তায়েফ থেকে মক্কা যাওয়ার পথে একরাত পরিমাণ রাস্তার দূরত্বে অবস্থিত 'বাতনে নাখলাহ' উপত্যকা। এখানেই জিনদের সঙ্গে নবীজির সাক্ষাৎ হয়। [উমদাতুল কারি : ৬/৩৭]

যুক্তির আলোকে বলা যায় যে, এখানে দ্বিতীয় স্থানটি উদ্দেশ্য। যদিও কেউ কেউ এই অভিযান মদিনার পার্শ্ববর্তী ওয়াদি নাখলার কথা বলেছেন। কিন্তু এটি সঠিক নয়; কারণ মদিনার এত নিকটে জুতা ফেঁটে যাওয়া এবং পা বিক্ষত হওয়ার প্রশ্নই উঠে না। নিশ্চয় এটি অনেক দূরের সফর ছিল।

জানান। তখন তিনি গায়েবানা জানাজা আদায় করেন। কারণ, হাবশাতে এমন কোনো মুসলমান ছিল না, যারা তার জানাজা পড়বে।[৬৮৫]

মুহাদ্দিসগণ বর্ণনা করেন, দীর্ঘ সময় পর্যন্ত তার কবর থেকে জ্যোতি বিচ্ছুরিত হতে থাকে।[৬৮৬]

সুমামার গ্রেফতারি এবং মক্কার খাদ্য রফতানিপথ বয়কট

৭ হিজরিতে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুহাম্মদ বিন মাসলামা রাদিয়াল্লাহু আনহুকে নজদের দিকে একটি ঝটিকা অভিযানে প্রেরণ করেন।[৬৮৭] মুজাহিদদের অভিযান পরিচালনার মাঝে বনু হানিফার এক সরদার সুমামা

---

৬৮৫. সহিহ বুখারি : হাদিস নং ৩৮৭৮ (কিতাবুল মানাকিব, বাবু মাওতিন নাজাশি)

ফায়দা : ১। হানাফিদের নিকট এই গায়েবানা জানাজা নাজাশি রহ. এর সম্মান জানানোর জন্য কেবল নবীজির (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) জন্য তা অনুমোদন করা হয়েছিল। যদি এটা ব্যাপক কোনো বিধান হতো, তা হলে দূরদূরান্তে মৃত্যুবরণকারী সাহাবিদের জানাজাও তিনি পড়তেন। অথচ এমন কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না। [আলমাবসুত, সারাখসি : ২/৬৭]

ফায়দা : ২। নাজাশি আসহামা রহ. এর ইনতেকালের তারিখ সম্ভবত ৭ হিজরির শুরুর দিকে হবে। তার দলিল হলো : উক্ত জানাজায় হজরত আবু হুরাইরাও শরিক ছিলেন [সহিহ বুখারি : হাদিস নং ১৩২৭, বাবুস সালাত আলাল জানায়িয বিল মুসাল্লা ওয়াল মাসজিদ]। তিনি নবীজির সান্নিধ্যে এসেছেন ৭ম হিজরির মহররম মাসে [আলবিদায়া ওয়ান নিহায়া : ১১/৩৬৪]। এজন্য উক্ত ঘটনা ৭ম হিজরির মহররম মাসের পর হয়েছে। তা ছাড়া দ্বিতীয় নাজাশি ক্ষমতাসীন হওয়ার পর তাকে ৭ম হিজরির রবিউল আওয়াল মাসে ইসলামের দাওয়াত দিয়ে পত্র পাঠিয়েছিলেন [তাবাকাতে ইবনে সা'দ : ১/২০৭]। ফলে নাজাশি আসহামার ইনতেকাল ৭ম হিজরির মহররম ও রবিউল আওয়ালের মাঝামাঝিতে হয়েছে, তা নিশ্চিতভাবেই বলা যায়।

৬৮৬. সুনানে আবু দাউদ : হাদিস নং ২৫২৩ (বাবুন নুর য়ুরা ইনদা কাবরিশ শাহীদ)

৬৮৭. দালাইলুন নুবুওয়াহ, বাইহাকি : ৪/৭৮

বাইহাকির রেওয়ায়েতে এই অভিযানের সময় ৬ হিজরির মহররম মাস উল্লেখ হয়েছে। কিন্তু এই তারিখের ব্যাপারে আপত্তি হলো, সুমামা বিন আসাল রা. এর ইসলাম গ্রহণের ঘটনা সম্পর্কে আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি স্বচক্ষে তা দেখেছেন। [তারিখুল মাদিনা, ইবনে শাব্বাহ : ২/৪৩৭]

আর হজরত আবু হুরাইরা রা. মদিনায় ৭ম হিজরিতে এসেছেন, এ ব্যাপারে সকলেই একমত। তাই উক্ত ঘটনা ৭ম হিজরির পূর্বে হতে পারে না।

এই দৃষ্টিভঙ্গি সামনে রাখলে এটিই অগ্রগণ্য মনে হয় যে, সুমামা রা. এর গ্রেফতারির অভিযান গাজওয়ায়ে যাতুর রিকার পরিশিষ্ট ছিল। ঐ অভিযানটি পূর্বদিকে ছিল এবং এটিও। পার্থক্য শুধু এটুকু যে, সেটি গাজওয়া আর এটি সারিয়া।

যাতুর রিকার সবচেয়ে নিকটবর্তী সময় মাদানিপঞ্জিকার ৭ম হিজরির জুমাদাল উলা মাসে। এ হিসেবে সুমামা বিন আসাল রা. এর ইসলাম গ্রহণও এই সময়েই হয়েছে।

বিন আসালকে গ্রেফতার করে ফেলেন। তাকে এনে মসজিদে নববির একটা খুঁটিতে বেঁধে রাখেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার কাছে গিয়ে বললেন, সুমামা, তোমার কেমন মনে হচ্ছে? সে বলল, আমার কাছে তাই মনে হচ্ছে, যা আমি আপনাকে বলেছিলাম; আপনি যদি অনুগ্রহ করেন, তা হলে একজন কৃতজ্ঞ ব্যক্তির উপর অনুগ্রহ করবেন।'

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এভাবে দ্বিতীয় তৃতীয়দিন জিজ্ঞেস করলেন। প্রত্যেকবার তার একই উত্তর ছিল। এ সময় কয়েদি মসজিদে নববির দিনরাত, এরচেয়ে বড় নবীজির অপূর্ব সৌন্দর্য দেখে তার দিল সাক্ষ্য দিচ্ছিল যে, তিনি সত্যনবী। শেষমেশ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বেকসুর খালাস করে দেন।

বন্দিমুক্ত হয়ে নিকটবর্তী একটি বাগানে প্রবেশ করেন। সেখানে গোসল করে মসজিদে প্রবেশ করে কালিমায়ে শাহাদাত পড়ে মুসলমান হয়ে যান। তারপর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আরজ করেন, 'গতকাল পর্যন্ত আমার কাছে জমিনের উপর আপনার চেহারার চেয়ে অধিক অপছন্দের কোনো চেহারা ছিল না। কিন্তু এখন আপনার চেহারাই আমার কাছে সকল চেহারা অপেক্ষা অধিক প্রিয়। আল্লাহর কসম, আমার কাছে আপনার দীন অপেক্ষা ঘৃণিত কোনো দীন ছিল না। এখন আপনার দীনই আমার কাছে সকল দীনের চেয়ে প্রিয়। আল্লাহর কসম, আমার মনে আপনার শহরের চেয়ে অধিক খারাপ শহর অন্য কোনটি ছিল না। কিন্তু এখন আপনার শহরটিই আমার কাছে সকল শহরের চেয়ে অধিক প্রিয়।

এরপর বললেন, 'ইয়া রাসুলাল্লাহ, আমি উমরা আদায়ের জন্য যাচ্ছিলাম। এ সময় আপনার অশ্বারোহীরা আমাকে ধরে নিয়ে এসেছে। এখন আপনি আমাকে কীসের হুকুম করেন? তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে উমরা করার নির্দেশ দেন।

সুমামা রাদিয়াল্লাহু আনহু মক্কায় এলেন। ততদিনে সেখানকার লোকদের কাছে তার ইসলামগ্রহণের সংবাদ পৌঁছে গিয়েছিল। তারা বলতে থাকে, বেদীন হয়ে গেছ? তিনি উত্তর দেন, না, বরং আমি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি ঈমান এনেছি। আল্লাহর কসম, নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুমতি ব্যতীত তোমাদের কাছে ইয়ামামা থেকে একটি গমের দানাও আসবে না।[৬৮৮]

---

৬৮৮. সহিহ বুখারি : হাদিস নং ৪৩৭২ (কিতাবুল মাগাজি , বাবু ওয়াফদি বনি হানিফা)

পরবর্তীতে এমনটাই ঘটেছিল। কারণ, ইয়ামামায় বাণিজ্যপথ তাদের আয়ত্তেই ছিল। ফলে তারা কুরাইশের খাদ্যরফতানির পথ বন্ধ করে দেয়।

শত্রুতা সত্ত্বেও মক্কাবাসীর উপর নবীজির অনুকম্পা

মক্কাবাসী দুর্ভিক্ষের শুরুতেই ধরাশায়ী হয়ে পড়েছিল। বাইরের খাদ্যরসদ আমদানিই তাদের শেষসম্বল ছিল। ইয়ামামা থেকেই তাদের অধিকাংশ খাদ্যশস্য আসত। এ পথও সুমামা রাদিয়াল্লাহু আনহুর মাধ্যমে বন্ধ হয়ে গেল। ফলে নিরুপায় হয়ে কুরাইশ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আত্মীয়তার দোহাই দিয়ে আবেদন করে, তিনি যেন সুমামাকে খাদ্যশস্য সরবরাহের পথরোধ করা থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দেন।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইচ্ছা করলে কুরাইশকে পায়ের কাছে এনে ফেলতে পারতেন। কিন্তু তিনি তার নববি আখলাক দেখিয়ে ঘোরতর শত্রুর আবেদনও কবুল করলেন। সুমামাকে মক্কাবাসীর খাদ্য-আমদানির পথ খুলে দেওয়ার নির্দেশ দেন।[৬৮৯]

মানুষের অনুরোধে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরাইশের দুর্ভিক্ষ উঠিয়ে নেওয়ার জন্য আল্লাহর নিকট দোয়া করলেন। যার ফলে মক্কা ও তৎপার্শ্ববর্তী এলাকায় বৃষ্টি বর্ষিত হয়। মক্কাবাসীর অবস্থা পুনরায় চাঙ্গা হয়; কিন্তু তাদের কুফরি ও বিরোধিতার মানসিকতা আপন অবস্থাতে বহাল থাকে।[৬৯০]

***

৬৮৯. দালাইলুন নুবুওয়াহ, বাইহাকি : ৪/৮০

৬৯০. সহিহ মুসলিম : হাদিস নং ৭২৪৫ (কিতাবু সিফাতিল কিয়ামাহ, বাবুদ দুখান)

রাষ্ট্রপ্রধানদের ইসলামের দাওয়াত

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কেবল জাজিরাতুল আরবের সংস্কার নয়; বরং সমগ্র দুনিয়াতে কীভাবে দাওয়াতের পরিধি বিস্তার করা যায়, সে ব্যাপারে সচেষ্ট ছিলেন। কেননা তিনি ছিলেন সর্বশেষ ও বিশ্বনবী। তাই তিনি কুরাইশ থেকে চিন্তামুক্ত হয়েই অন্যান্য ময়দানের দিকে মনোযোগ দেন। হুদাইবিয়াসন্ধির বদৌলতে যখন তার কর্মক্ষেত্র বিস্তৃত হয়, তখন পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ ও কার্যক্রম শুরু করতে একটুও বিলম্ব করেননি।

হুদাইবিয়াসন্ধি কেবল আরবেই দাওয়াতে ইসলামের চাকা সচল করার সুযোগ করে দেয়নি; বরং তখন বিশ্বব্যাপী বড় বড় রাজদরবারেও দাওয়াতের পরিচিতি তুলে ধরার মওকা করে দেয়। সন্ধির ফলে জাজিরাতুল আরবের সকল রাস্তা নিরাপদ হয়ে গিয়েছিল এবং তখন ইসলামের দাওয়াত সর্বত্র পৌঁছানো সম্ভব হচ্ছিল।

বাদশাহদের নিকট পত্র প্রেরণের তত্ত্ব

পৃথিবীতে তখন বহু রাজা-বাদশাহর হুকুমত চলছিল। তাদের কাছে ইসলামের সঞ্জীবনীবার্তা পৌঁছানো জরুরি ছিল। কিন্তু প্রজ্ঞা ও পরিস্থিতির দাবি ছিল প্রাথমিক পর্যায়ে যেসব রাজদরবার জাজিরাতুল আরবের নিকটবর্তী এবং তাদের সঙ্গে ইসলামের মূলকেন্দ্র থেকে সম্পর্ক স্থাপন করা সম্ভব, তাদের নিকট ইসলামের দাওয়াত প্রেরণ করা আবশ্যক, যাতে সম্ভাব্য সন্দেহ-সংশয় দূর করে ইসলাম তার আপন গতিতে নির্বিঘ্নে চলতে পারে। তখন অন্যান্য রাজ্যেও দাওয়াতের প্রচার-প্রসার ফলপ্রসূ ও বেগবান হবে।

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এজন্য জাজিরাতুল আরবের বাইরে চারটি বড় সাম্রাজ্য : রোম, পারস্য, মিসর এবং হাবশার ক্ষমতাসীন রাজাদের নিকট প্রথম পত্র প্রেরণের ইচ্ছা করেন। এ ছাড়া আরবের কয়েকজন বড় শাসক-বরাবরও চিঠি পাঠান। এটা আবশ্যক ছিল না যে, শাসকরা ওই মুহূর্তেই ঈমান গ্রহণ করবে। প্রাথমিকভাবে ইসলাম সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত ধারণা এবং জাজিরাতুল আরবে ক্রমবর্ধমান ইসলামি আন্দোলন সম্পর্কে কোনো ভুল ধারণার শিকার হওয়া থেকে বেঁচে থাকাই যথেষ্ট ছিল।

পত্রের ব্যাপারে শাসকদের প্রতিক্রিয়ার দ্বারাই মুসলমানরা অনুমান করে নেন যে, মদিনার হুকুমত শীঘ্রই একটি পরাশক্তিতে পরিণত হতে যাচ্ছে। এজন্য প্রতিবেশী রাজ্যসমূহের যেকোনো বাধা ও প্রতিরোধ মোকাবেলার জন্য তাদেরকে প্রজ্ঞাপূর্ণ পথ বেছে নেওয়া আবশ্যক।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একই বার্তা একাধিক কপি করা থেকে বিরত থাকেন। বরং শাসকদের মতাদর্শ এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রতি লক্ষ রেখে প্রত্যেকের জন্য পৃথক পৃথক পত্র লেখান। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চিঠিসমূহ সুসংক্ষিপ্ত এবং হৃদয়স্পর্শী ছিল। তাতে বিনয় ও নম্রতা ছিল, অহমিকা-আত্মম্ভরিতার লেশমাত্র ছিল না। তাদের সম্বোধনের শব্দমালায় কল্যাণকামিতা ও সহমর্মিতা টপকে পড়ত। বুঝাই যাচ্ছিল পত্রপ্রেরক তার দাওয়াতের ব্যাপারে অনড়-অবিচল। ওই বড় বড় সাম্রাজ্যগুলোর প্রভাব-প্রতিপত্তি, সামরিক ও অর্থনৈতিক উৎকর্ষের তার নিকট এতটুকু মূল্য ছিল না। তিনি মনমানসিকতার দিক থেকে এর থেকে অতি উচ্চ স্থানে অবস্থান করছিলেন। যারা তাকে চেনে এবং তার সঙ্গে থাকে, তারা এই মহান ব্যক্তিত্বের এসব ব্যাপার ভালো করেই জানে।

সঠিক মত অনুযায়ী রাজা-বাদশাহদের নামে দাওয়াতিপত্র খাইবার বিজয়ের পর ৭ম হিজরির শুরুর দিকে প্রেরণ করা হয়।[৬৯১]

---

৬৯১. এই পত্রগুলো লেখা শুরু হয় হুদায়বিয়া সন্ধির পর ৬ হিজরির যিলহজের পর। কিছু সাহাবির পরামর্শে চিঠিগুলো নির্ভরযোগ্য করার জন্য সিলমোহরও তৈরি করা হয়। তাতে অঙ্কিত ছিল 'মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ'। পত্রবাহকদের প্রেরণ ৭ হিজরির মহররম থেকে আরম্ভ হয়ে রবিউল আওয়াল মাসের মাঝামাঝি পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। [তাবাকাতে ইবনে সা'দ : ১/২০৭, ২৫৮]

সম্ভবত গাজওয়ায়ে খাইবারের কারণে দূতদের রওনা হতে কিছুটা বিলম্ব হয়েছিল। এজন্য কেউ কেউ এই ভুলের শিকার হয়েছেন যে, রাজাদের নিকট পত্র প্রেরণ ৬ষ্ঠ হিজরিতে হয়। তবে এ ব্যাপারে সকলের ঐকমত্য হলো যে, এটা ভুল। হাফেজ ইবনে কাসির রহ. বলেন [আলবিদায়া ওয়ান নিহায়া : ৬/৪৬৮] :

ولا خلاف بينهم أن بدء ذلك كان قبل فتح مكة وبعد الحديبية لقول أبي سفيان لهرقل حين سأله : هل يغدر؟ فقال : لا ولكن نحن منه في مدة لا ندري ما هو صانع فيها، وفي لفظ للبخاري : في المدة الذي مادّ فيها أبو سفيان رسول الله صلى الله عليه وسلم

অনেকে সহিহ বুখারিতে পত্রপ্রেরণের ঘটনা তাবুকযুদ্ধের পর উল্লেখ দেখে এই ধারণা করে যে, এটি ৯ম হিজরিতে হয়েছে। অথচ ইমাম বুখারি রহ. সময়ানুক্রম ঠিক রাখার প্রতি খুব বেশি গুরুত্বারোপ করেননি। এজন্যই ডক্টর আকরাম যিয়া উমারি লিখেছেন :

وقد ذكر البخاري رسالة كسرى في أعقاب غزوة تبوك في العام التاسع الهجري، لكن من الواضح أن البخاري لم يراع عنصر الزمن في سرد محتويات صحيحه [السيرة النبوية الصحيحة : ২/২৫৪و ২৫৫]

হিরাকলকে ইসলামের দাওয়াত

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথম পত্র প্রেরণ করেন হিরাকলের (হেরাক্লিয়াস) কাছে। সে পারসিকদের কাছে পরাজিত দুর্ভাগা রোমান রাজা ফুকাসকে গদিচ্যুত করে ৬১০ খ্রিষ্টাব্দে বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের মসনদে বসে। তৎকালীন সময়ে ইউরোপ থেকে এশিয়া-আফ্রিকার সুবিশাল ভূমি পারস্যের বিজয়ী সৈনিকদের দাপটের সামনে মাথানত করে থাকত। হিরাকল ক্ষমতাসীন হওয়ার ছ'বছর পর সিদ্ধান্ত নেয় পারসিকদের সাথে লড়াই করে বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের যশখ্যাতি ফিরিয়ে আনবে।

এই সময়েই কুরআন কারিমে পারস্যের বিরুদ্ধে রোমকদের বিজয়ের সংবাদ দেওয়া হচ্ছিল। অথচ রোমানদের প্রাণ তখন ওষ্ঠাগত। এমন অবস্থায়ও যখন হিরাকল পারস্যে আক্রমণ করে, তখন সে কদমে কদমে বিজয় অর্জন করতে থাকে। একের পর এক পারসিকদের পরাজয় বরণের ফলে একেবারে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে তারা। সাত-আট বছর যুদ্ধের পর রোম সাম্রাজ্য তাদের সেই ক্ষমতা ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হয়। ৬২৫ খ্রিষ্টাব্দ নাগাদ তারা এক পরাক্রমশালী দিগ্বিজয়ী রোমান সাম্রাজ্যে পরিণত হয়। সমগ্র ইউরোপ তাদের প্রধানকেন্দ্র কনস্টান্টিনোপলের অধীনে চলে আসে।

কিসরা পারভেজের সঙ্গে আলোচনা তখনও চলছিল। রোমানদের সঙ্গে পেরে না ওঠায় বাধ্য হয়ে তাদের দাবিদাওয়া মেনে নেয়। অনেক বছর আগেই পারসিকরা বাইতুল মাকদাস থেকে খ্রিষ্টানদের 'পবিত্র ক্রুশ' উঠিয়ে নিয়ে গিয়েছিল, তা রোমানদের ফিরিয়ে দেয়। ওই ক্রুশ দ্বিতীয়বার বাইতুল মাকদাসে স্থাপন করার জন্য স্বয়ং হিরাকল কনস্টান্টিনোপল থেকে শাম আসে।[৬৯২]

সম্ভবত এটি ওই সময়ের কথা যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গাজওয়ায়ে খাইবার থেকে অবসর হয়ে রাজা-বাদশাহদের প্রতি পত্রপ্রেরণ করছিলেন।

হিরাকল ও আবু সুফিয়ানের কথোপকথন

হিরাকল প্রথমে তার অধীনস্থ হিমসে আসে এবং সেখান থেকে বাহিনীসহ তীর্থভূমি 'ইলিয়া' (বাইতুল মাকদাস) রওনা হয়। সতীর্থ এবং সালতানাতের কর্ণধারদের একটি দলও তার সঙ্গে ছিল। বাইতুল মাকদাসে রাত্রিযাপনের সময় একটি বিস্ময়কর স্বপ্ন দেখে; খাতনাকারী কওমের এক সরদার শীঘ্রই সবার উপর বিজয়ী হবে।

---

৬৯২. নবীয়ে রহমত, পৃষ্ঠা ৩৮১-৩৮৩

খাতনা করার প্রথা ইহুদি কিংবা আরবদের মধ্যে ছিল। হিরাকল জাগ্রত হওয়ার পরই জানতে চাইল বর্তমান সময়ে কোনো কওমের মধ্যে কোনো ধরনের বিপ্লব ঘটেছে কিনা। রাজদরবারের লোকেরা দ্রুত অনুসন্ধান করে জানতে পারে যে, আরবের মধ্যে একজন নবীর আবির্ভাব হয়েছে।

হিরাকল তখনই কোনো আরবকে হাজির করার হুকুম দেন। সেই আরবকে তিনি কিছু প্রশ্ন করতে চান। ভাগ্য সুপ্রসন্ন ছিল যে, সেসময় কুরাইশের একটি বাণিজ্য কাফেলা শাম এসেছিল। কিছুদিন মক্কা-মদিনার পথ টহলদার মুসলিম বাহিনীর হাতে অবরুদ্ধ থাকার পর হুদাইবিয়াসন্ধির মাধ্যমে সর্বত্র নিরাপত্তা ছড়িয়ে পড়ে। ফলে কুরাইশের প্রত্যেকেই কিছু কিছু পুঁজি আবু সুফিয়ান বিন হারবকে দিয়ে তার নেতৃত্বে একটি বাণিজ্য কাফেলা পাঠায়। তারা তখন গাজা এলাকায় অবস্থান করছিল। হিরাকলের সান্ত্রীরা একেবারে তাদের মাথার উপর গিয়ে দাঁড়ায়। তাদেরকে প্রহরা দিয়ে হিরাকলের দরবারে নিয়ে যায়।[৬৯৩]

হিরাকল দোভাষীর মাধ্যমে তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন, যিনি নিজেকে নবী দাবি করেন, তোমাদের মধ্যে কে তার নিকটাত্মীয়?

আবু সুফিয়ান বললেন, 'আমি'।

হিরাকল তখন সিপাহিদের ইশারা করলে আবু সুফিয়ানকে সবার আগে বসিয়ে অন্যদের পেছনে বসিয়ে দেয়। হিরাকল দোভাষীর মাধ্যমে আবু সুফিয়ানের সঙ্গে আলোচনা শুরু করার পূর্বে অন্য আরবদের সম্বোধন করে বললেন, 'আমি তার নিকট সেই ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে চাই, যিনি নবী বলে দাবি

৬৯৩. আনুমানিক ৭ম হিজরির গ্রীষ্মকালে এই ঘটনা ঘটে। কারণ, কুরাইশরা শামদেশে গ্রীষ্মকালেই ব্যবসা-বাণিজ্যের সফরে যেত। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাজাদের নামে পত্র দিয়ে ৭ম হিজরির শুরুর দিকে গাজওয়ায়ে খাইবার যাত্রাকালীন কিংবা বিজিত হওয়ার পরপরই দূতদের রওনা করিয়ে দেন। তখন মে, জুন ৬২৭ খ্রিষ্টাব্দ ছিল।
নবীজির দূত দিহয়া কালবি রা. এর কায়সারের দরবারে পৌঁছতে এক মাস লেগেছিল। অর্থাৎ আনুমানিক জুন-জুলাই মাসের দিকে কায়সার পত্র পাঠ করে। এর কিছুদিন আগে কুরাইশ-ব্যবসায়ীদের সাথে তার আলাপ হয়। তারা মে কিংবা জুনে অভ্যাসমতো শামে পৌঁছেছিল। এর থেকে এটা নিশ্চিত হওয়া যায় যে, গাজওয়ায়ে খাইবার মাদানিপঞ্জিকা মোতাবেক মহররম মাসে হয়েছিল, মক্কি মহররমে নয় (যা মাদানি জুমাদাল উলা হয়)।
আর যদি এই গাজওয়া মাদানি জুমাদাল উলাতে হতো, যা ৬২৭ খ্রিষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাস হয়, তা হলে দিহয়া কালবি রা. এর কায়সারের দরবার গমন শীতকালে হয়েছিল। তখনও তো এই সময়ে কুরাইশের উপস্থিতি দুষ্কর। কারণ, শীতকালে তারা শামে যেত না।
যদি বলা হয় যে, কুরাইশ সেই শীতকালের ছয়-সাতমাস পূর্ববর্তী গরমকালে শামে পৌঁছেছিল কিংবা এমন বলা যে, তারা তিন-চার মাস পূর্বেই শাম ঘুরে এসেছে; এ দু'টি সম্ভাবনাই অসম্ভব। কেননা রেওয়ায়েত থেকে সুস্পষ্ট হয় যে, কুরাইশ প্রতিনিধি এবং দিহয়া কালবির আগমন সময়কাল প্রায় একই ছিল।

করেন। যদি সে মিথ্যা বলে, তবে তোমরা তার প্রতিবাদ করবে।

এরপর হিরাকল আবু সুফিয়ানকে জিজ্ঞেস করেন, তোমাদের নবীর বংশমর্যাদা কীরূপ?

আবু সুফিয়ান তখনও মুসলমান হননি। কিন্তু সত্যবাদী ছিলেন। তিনি উত্তরে বললেন, 'আমাদের মধ্যে তিনি উচ্চবংশীয়।'

: তার বংশের কেউ কি ইতোপূর্বে এমন কিছুর দাবি করেছে?

: না।

: তার এ নবুওয়াতের আগে কোনো সময় কি তাকে মিথ্যা অভিযোগে তোমরা অভিযুক্ত করেছ?

: না।

: তার পূর্বপুরুষদের কেউ কি বাদশাহ ছিল?

: না।

: সবলরা তার অনুসারী হচ্ছে না দুর্বল (শ্রেণির) লোকেরা?

: দুর্বলরা।

: এদের সংখ্যা কি বৃদ্ধি পাচ্ছে না হ্রাস পাচ্ছে?

: বৃদ্ধি পাচ্ছে।

: তার দীনে প্রবেশ করার পর কেউ কি সে দীন অপছন্দ করে তা পরিত্যাগ করেছে?

: না।

: তিনি কি কখনো চুক্তি ভঙ্গ করেছেন?

: না। তবে আমরা বর্তমানে তার সঙ্গে একটি চুক্তির মেয়াদে আছি এবং আশঙ্কা করছি, তিনি তা ভঙ্গ করতে পারেন। আবু সুফিয়ান (রাদিয়াল্লাহু আনহু) পরবর্তীতে বলেন, আমার বক্তব্যে এই কথা ব্যতীত এমন কোনো কথা লুকানো সম্ভব হয়নি, যাতে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে খাটো করা হয় আর আমার প্রতি অপপ্রচারের আশঙ্কা না হয়।

কায়সার জিজ্ঞেস করেন, তোমাদের সঙ্গে তার যুদ্ধ হয়েছে?

: হ্যাঁ।

: তোমাদের ও তার মধ্যে যুদ্ধের ফল কী?

: কখনো আমরা বিজয়ী, কখনো তিনি।

: তিনি কোন বিষয়ের প্রতি আদেশ করেন?

: তিনি বলেন, একমাত্র আল্লাহর ইবাদত কর, তার সঙ্গে কোনো কিছু শরিক করবে না। পিতৃপুরুষের অনুসরণ পরিত্যাগ কর। তিনি নামাজের আদেশ দেন। জাকাত দিতে বলেন। আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখতে বলেন। পবিত্র থাকতে এবং সত্য বলতে নির্দেশ দেন।

আবু সুফিয়ান যেসব গুণ বর্ণনা করেছেন, সবই পূর্ববর্তী আসমানি কিতাবে বর্ণিত আছে। এজন্য হিরাকল সব কথা শুনে বললেন, আমি তোমাদের মধ্যে তার বংশমর্যাদা সম্পর্কে জানতে চাইলে তুমি বলেছ যে, তিনি উচ্চবংশীয়। সে-রূপই রাসুলগণ তাদের কওমের উচ্চবংশেই প্রেরিত হন। আমি তোমাদের নিকট জানতে চেয়েছিলাম তোমাদের কেউ কি এর আগে এ ধরনের দাবি করেছে কিনা? তুমি বললে, না। তোমাদের মধ্যে ইতোপূর্বে যদি কেউ এরূপ কথা বলে থাকত, তা হলে আমি বলতাম, লোকটি পূর্ব কথিত একটি কথার অনুসরণ করছে।

আমি জানতে চেয়েছি, তার এ (নবুওয়াত) দাবির পূর্বে কি তোমরা তাকে মিথ্যা বলার অভিযোগে অভিযুক্ত করেছিলে? তুমি বলেছ, না। এতে আমি বুঝতে পেরেছি যে ব্যক্তি মানুষের ব্যাপারে মিথ্যা বলেননি, তিনি আল্লাহর ব্যাপারে মিথ্যা বলবেন, এমন হতে পারে না।

আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করেছি, তার পূর্বপুরুষদের কেউ কি বাদশাহ ছিলেন? তুমি বলেছ, না। আমি বলছি, যদি তার পিতৃপুরুষদের কেউ বাদশাহ থাকত, তা হলে আমি বলতাম, সে পিতৃপুরুষদের রাজত্ব উদ্ধার করতে চাচ্ছে।

আমি তোমার নিকট জানতে চেয়েছি, প্রভাবশালী লোকেরা তার অনুসরণ করছে, নাকি দুর্বল (শ্রেণির) লোকেরা? তুমি বলেছ, দুর্বলরা তার অনুসরণ করছে। প্রকৃতপক্ষে এ ধরনের (দুর্বল) লোকেরাই রাসুলগণের অনুসারী হয়ে থাকে।

আমি তোমার নিকট জানতে চেয়েছি, তাদের সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে না কমছে? তুমি বলেছ, বাড়ছে। ঈমান এরূপই হয়ে থাকে, যখন তা হৃদয়ের গভীরে পৌঁছয়, তখন কেউ তার প্রতি অসন্তুষ্ট হয় না।

আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করেছি, তিনি কি চুক্তি ভঙ্গ করেন? তুমি বলেছ, না। ঠিকই, রাসুলগণ কখনো চুক্তি ভঙ্গ করেন না।

আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করেছি, তোমরা কি কখনো তার সঙ্গে যুদ্ধ করেছ? তুমি বলেছ, হ্যাঁ। কখনো তোমরা তার উপর জয়ী হয়েছ, আবার কখনো তিনি তোমাদের উপর বিজয়ী হয়েছেন। এভাবেই রাসুলগণ পরীক্ষিত হন এবং পরিণাম তাদেরই অনুকূল হয়।

আমি আরো জিজ্ঞেস করেছি, তিনি তোমাদের কী কী বিষয়ে আদেশ করে থাকেন? তুমি বলেছ এক আল্লাহর ইবাদত করা, তার সঙ্গে কোনো কিছু শরিক না করা, পিতৃপুরুষের অনুসরণ ত্যাগ করা, নামাজ পড়া, জাকাত প্রদান করা, আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা, পবিত্র থাকা, ওয়াদা রক্ষা করা, আমানত রক্ষা করা, সত্য বলার ব্যাপারে আদেশ করেন। এগুলো নবীদের গুণ। আমি জানতাম, তার আগমন ঘটবে। কিন্তু তিনি তোমাদের মধ্যে আসবেন, সে ধারণা আমার ছিল না। তুমি যা যা বললে, তা যদি সত্য হয়, তবে অচিরেই তিনি আমার এই পায়ের নিচের জায়গার মালিক হয়ে যাবেন।[৬৯৪]

আবু সুফিয়ান বলেন, তারপর থেকে আমি অপমানবোধ করতে লাগলাম। আমার দৃঢ় বিশ্বাস হয়ে যায় যে, মুহাম্মদের দাওয়াত অচিরেই জয়লাভ করবে। অবশেষে আল্লাহ তায়ালা আমার অন্তরে ইসলাম প্রবেশ করিয়ে দিলেন, যদিও আমি তা অপছন্দ করছিলাম।[৬৯৫]

হিরাকলের কাছে নবীজির পত্র এবং তার সম্প্রদায়ের সঙ্গে আলাপ

ইতোমধ্যে দিহয়া কালবি রাদিয়াল্লাহু আনহু নবীজির পত্র নিয়ে শামের সীমান্ত শহর বুসরাতে পৌঁছে যান। বুসরার শাসক তাকে হিরাকলের নিকট বাইতুল মাকদাসে পাঠিয়ে দেয়। পত্র পাঠ করে হিরাকল হতভম্ব হয়ে যায়। পত্রে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লিখেছিলেন,

> বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম। আল্লাহ ও তার রাসুল মুহাম্মদের পক্ষ থেকে রোমের সম্রাট হিরাকলের প্রতি। হেদায়েতের অনুসারীর প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক। এরপর আমি আপনাকে ইসলামের দাওয়াত দিচ্ছি, ইসলাম গ্রহণ করুন, মুক্তি পাবেন। ইসলাম গ্রহণ করুন, আল্লাহ আপনাকে দ্বিগুণ প্রতিদান দেবেন। আর যদি মুখ ফিরিয়ে থাকেন, তা হলে রোমের সকল প্রজার পাপরাশি আপনার উপর নিপতিত হবে।
>
> হে কিতাবিগণ, এসো সে কথায়, যা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে একই যে, আমরা আল্লাহ ব্যতীত কারো ইবাদত করব না, কোনো কিছুতেই তাকে শরিক করব না। আর আল্লাহ ব্যতীত আমরা একে

৬৯৪. সহিহ মুসলিম : হাদিস নং ৪৭০৭ (কিতাবুল জিহাদ ওয়াস সিয়ার, বাবু কিতাবিন নাবিয়্যি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইলা হিরাকল), সহিহুল বুখারি : হাদিস নং ৭ (বাদউল ওহী), হাদিস নং ৪৫৫৩ (কিতাবুত তাফসির, বাবু কাওলিহি ...) আলবিদায়া ওয়ান নিহায়া : ৬/৪৬৮-৪৭০

৬৯৫. সহিহুল বুখারি : হাদিস নং ২৯৪১ (কিতাবুল জিহাদ, বাবু দুআইন নাবিয়্যি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আননাসা)

অন্যকে রব হিসাবে গ্রহণ করব না। যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় তবে বল, তোমরা সাক্ষী থাক, আমরা মুসলিম।'[৬৯৬]

হিরাকল পূর্ববর্তী আসমানি কিতাব এবং শেষনবীর গুণাবলি সম্পর্কে ভালো করেই জানতেন, নবীর লেখা প্রতিটি কথা সত্য এবং তা গ্রহণ করতে বিলম্ব করা উচিত নয়; তাও তার জানা ছিল। কিন্তু আপন কওম, বিশেষ করে পাদরিদের সঙ্গত্যাগের ভয়ে এবং হত্যার আশঙ্কায় ইসলাম কবুল করা থেকে বিরত থাকেন।

পত্র পাঠ করার পরপরই চতুর্দিকে উচ্চ রব উঠল এবং গুঞ্জনধ্বনি বৃদ্ধি পেল। হিরাকল বাইতুল মাকদাস থেকে ফিরে হিমসে এসে দ্বিতীয়বার দরবার বসানোর নির্দেশ দেন। সকল পাদরি ও নেতৃবৃন্দ একত্রিত হলে, দরজা বন্ধ করে দেন। এরপর সবাইকে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণের উপদেশ দিয়ে বলেন : 'হে রোমবাসী, তোমরা কি সারা জীবনের জন্য সৎপথ ও সফলতা প্রত্যাশা করো? তোমরা কি চাও তোমাদের রাজত্ব অটুট থাকুক?' এ কথা শুনেই বন্যগর্দভের মতো সভাসদবৃন্দ প্রাণপণে পালাতে উদ্যত হলো। কিন্তু দরজা বন্ধ দেখে পুনরায় ফিরে আসে। তারা ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়ে পড়ে। হিরাকলকে পদচ্যুত করা এবং হত্যা করার সিদ্ধান্ত নেয়। তখন হিরাকল একটি রাজনৈতিক মন্ত্র আওড়ালেন যে, 'আমি আসলে ধর্মের উপর তোমাদের দৃঢ়তা পরীক্ষা করছিলাম।'[৬৯৭]

হিরাকলের জবাবিপত্র এবং উপহারসামগ্রী

হিরাকল রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সত্যনবী বলে বিশ্বাস করে। কিন্তু কওমের পক্ষপাতিত্ব এবং ক্ষমতার লোভ তাকে ইসলাম গ্রহণ থেকে বিরত রাখে। তারপরও নেহায়েত ইজ্জত-সম্মানের সাথে নবীজির পত্রটি সংরক্ষণ করে রাখেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামে জবাবিপত্র লিখে হজরত দিহয়া কালবি রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাতে তুলে দেন। পত্রে প্রকাশ করেন যে, তিনি নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নবী হিসেবে মানেন। কিন্তু কওমের সামনে তা প্রকাশ করতে অপারগ। তারপর কিছু উপহারও পাঠান। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা সাহাবায়ে কেরামের মাঝে বণ্টন করে দেন।[৬৯৮]

---

৬৯৬. সুরা আলে ইমরান, আয়াত ৬৪

৬৯৭. সহিহুল বুখারি : হাদিস নং ৭ (বাদউল ওহী); ২৯৪১ (কিতাবুল জিহাদ, বাবু দুআইন নাবিয়্যি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আননাসা) হাদিস নং ৪৫৫৩ (কিতাবুত তাফসির, বাবু কাওলিহি)

৬৯৮. আসসিরাতুল হালাবিয়্যাহ : ৩/৩৪৩, ৩৪৫

হিরাকল জানতেন, তার রাজত্ব মুসলমানদের কব্জায় চলে যাওয়া কিছু সময়ের ব্যবধান মাত্র। তাই অনেক বুঝিয়ে আমিরদের রাজি করাতে চাচ্ছিলেন যে, শুধু শাম অঞ্চল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রদান করে সালতানাতের অন্যান্য অঞ্চল সুরক্ষিত করা প্রয়োজন। কিন্তু তার নেতৃবৃন্দ এই প্রস্তাব কঠিনভাবে প্রত্যাখ্যান করে। ফলে হিরাকল ঘোষণা ছাড়াই শামের কর্তৃত্ব ছেড়ে দিয়ে ইউরোপ যাওয়ার প্রস্তুতি নেন।[৬৯৯]

রোমানদের কাছে নবীজির পত্র সংরক্ষণ

হিরাকল তারপর সর্বোচ্চ বারো-তেরো বছর (৬৪১ খ্রিষ্টাব্দ) পর্যন্ত শাসনকার্য পরিচালনা করেন। হজরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর খেলাফতকালে কনস্টান্টিনোপলে তার মৃত্যু হয় এবং সেখানেই তাকে দাফন করা হয়। ততদিনে এশিয়া পর্যন্ত ইসলামের ঝান্ডা উত্তোলিত হয়ে গেছে। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পত্রটি হিরাকল সারাজীবন সংরক্ষণ করে ব্যক্তিগত ভাণ্ডারে রাখে। তার উত্তরাধিকাররাও কিছু সময় পর্যন্ত তা সংরক্ষণ করে। তাদের বিশ্বাস ছিল, যতদিন এই পত্র তাদের সংরক্ষণে থাকবে, ততদিন তাদের রাজত্ব নিরাপদ থাকবে।[৭০০]

হারিস বিন আবু শিমরের নিকট নবীজির পত্র

দ্বিতীয় পত্র প্রেরণ করেন শামের সীমান্তবর্তী এলাকার আরব শাসক হারিস বিন আবু শিমর গাসসানির নিকট। শুজা বিন ওয়াহব রাদিয়াল্লাহু আনহু পত্র নিয়ে যান। হারিস বিন আবু শিমর খুব তাচ্ছিল্য প্রকাশ করে এবং জবাবিপত্রে মদিনায় আক্রমণের হুমকিও দেয়। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার উত্তর শুনে বলেন, 'তার ক্ষমতা ধ্বংস হয়ে যাবে।'[৭০১]

মিশর অধিপতি মুকাওকিসের নামে পত্র

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তৃতীয় পত্র প্রেরণ করেন মিসর-অধিপতি জুরাইজ বিন মিনার বরাবর। আরবরা তাকে 'মুকাওকিস' উপাধি দেয়। তিনি কিবতি বংশোদ্ভূত ছিলেন। মিসর কায়সারের আয়ত্তাধীন রাজ্য হওয়া ছাড়াও তাদের সবচেয়ে বড় ধর্মপ্রচারক পাদরিও সেখানে অবস্থান করত। কিন্তু বুঝা যাচ্ছে যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন পত্র প্রেরণ করে, তখন মুকাওকিস স্থানীয় কিবতিদের সহায়তায় মিসরের স্বাধীন শাসকে পরিণত

---

৬৯৯. আলবিদায়া ওয়ান নিহায়া : ৬/৪৮১, ৪৮২
৭০০. আররাওযুল উনুফ : ৭/৪০০, ইরশাদুস সারি শারহুল বুখারি, কাসতাল্লানি : ১/৮১
৭০১. তারিখুত তাবারি : ২/৬৫২

হয়েছিলেন। আর এজন্যই তিনি তাকে এভাবে সম্বোধন করেন, 'আযিমুল কিবত' তথা মহান কিবতি-নেতা। পত্রে লেখেন,

> বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম। আল্লাহর রাসুল মুহাম্মদের পক্ষ থেকে মহান কিবতি-নেতা মুকাওকিস বরাবর। হেদায়েতের অনুসারীর প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক। এরপর আমি আপনাকে ইসলামের দাওয়াত দিচ্ছি, ইসলাম গ্রহণ করুন, মুক্তি পাবেন। ইসলাম গ্রহণ করুন, আল্লাহ আপনাকে দ্বিগুণ প্রতিদান দেবেন। আর যদি মুখ ফিরিয়ে থাকেন, তা হলে সকল প্রজার পাপরাশি আপনার উপর নিপতিত হবে।[৭০২]

হজরত হাতিব বিন আবু বালতাআ পত্র নিয়ে যান। মুকাওকিস খ্রিষ্টধর্মের গ্রন্থাবলি সম্পর্কে গভীর জ্ঞান রাখার সুবাদে শেষনবীর গুণাবলি ভালো করেই জানতেন। তাই তিনি পত্রবাহককে যাচাই করে নিতে চাইলেন। জিজ্ঞেস করেন, তোমরা কি তোমাদের নবীকে সত্যিই নবী মানো?

হাতিব রাদিয়াল্লাহু আনহু উত্তর দেন, হ্যাঁ, অবশ্যই।

: তিনি যদি নবী হয়ে থাকেন, তা হলে কওম তাকে দেশ থেকে বের করে দিল কেন? তিনি তাদের বিরুদ্ধে বদদোয়া করেননি কেন?

: আচ্ছা, আপনারা হজরত ঈসা আলাইহিস সালামকে রাসুল হিসেবে বিশ্বাস করেন না?

: অবশ্যই করি।

: তা হলে আপনাদের ধারণা মোতাবেক তাকে যখন শূলে চড়ানো হয়, তখন তিনি তার কওমের জন্য বদদোয়া করেননি কেন?

মুকাওকিস তখন লাজবাব হয়ে বলেন, 'তোমরা সত্যিই বুদ্ধিমান মানুষ এবং বুদ্ধিমান ব্যক্তিত্বের অনুসারী।'

তিনি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামে চুমু দেন এবং হজরত হাতিব রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাতে নবীজির জন্য একটি মূল্যবান পোশাক, একটি উন্নতজাতের খচ্চর এবং দুটি বাঁদি উপহার প্রদান করেন।[৭০৩]

---

৭০২. আলইকতিফা বিমা তাযাম্মানাহু মিন মাগাজি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওয়াস সালাসাতুল খুলাফা, ইবনে রাবি আলহিময়ারি (মৃত্যু ৬৩৪ হিজরি) : ২/১৪

৭০৩. আলআমওয়াল, ইবনে যানজুয়াহ : হাদিস নং ৯৬৯ (মারকাযুল মালিক ফায়সাল সংস্করণ), আলবিদায়া ওয়ান নিহায়া : ৬/৪৯২

কিসরা পারভেজের নামে পত্র

চতুর্থ পত্র নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরানের বাদশাহ কিসরা পারভেজ বরাবর প্রেরণ করেন। অত্যন্ত প্রতাপশালী, শান-শওকতের অধিকারী এবং বিশাল সাম্রাজ্যের একচ্ছত্র শাসক ছিল সে। তার শাসনক্ষমতার বয়স তখন আটত্রিশ বছর। ইতোমধ্যে সে সাসানিবংশের ক্ষমতা, দাপটও খর্ব করতে সক্ষম হয়েছে। হিরাকল যদি তার থেকে রোমান এলাকাগুলো উদ্ধার করতে না পারত, তা হলে পৃথিবীর একক পরাশক্তিতে পরিণত হতো। হিরাকলের কাছে পরাজিত হওয়ার পরও কিসরা সাম্রাজ্য চীন সীমান্ত থেকে নিয়ে জাজিরাতুল আরবের পূর্ব ও দক্ষিণাঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ওদিকে ইয়ামানে প্রায় অর্ধশতাব্দীকাল যাবৎ পারসিক স্বৈরশাসন চলছে। এজন্য পারসিক শাসকরা আরবদেরকে তাদের প্রজা মনে করে।

কিসরার নামে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পত্রটি হজরত আবদুল্লাহ বিন হুজাফা রা. নিয়ে যান। সেখানে লেখা ছিল:

> বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম। আল্লাহর রাসুল মুহাম্মদের পক্ষ থেকে পারস্য-অধিপতি কিসরার প্রতি। হেদায়েতের অনুসারীর প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক। আল্লাহ ও তার রাসুলের প্রতি ঈমান গ্রহণ করুন এবং সাক্ষ্য দিন যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই এবং আরো সাক্ষ্য দিন যে, আমি সমগ্র জাহানের রাসুল। আল্লাহ আমাকে জীবিত প্রতিটি মানুষকে সতর্ক করার জন্য প্রেরণ করেছেন। ইসলাম গ্রহণ করুন, শান্তির সঙ্গে থাকবেন। আর যদি মুখ ফিরিয়ে থাকেন, তা হলে সকল অগ্নিপূজারি-প্রজার পাপরাশি আপনার উপর নিপতিত হবে।[৭০৪]

কিসরা পত্র পাঠ করার পর তেলে-বেগুনে জ্বলে ওঠে এবং তা ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলে। সাথে সাথে ইয়ামানে নিযুক্ত তার গভর্নর বাজানকে কঠিন নির্দেশ দেয়, সে যেন অনতিবিলম্বে এই নবুওয়াতের দাবিদারকে গ্রেফতার করে তার কাছে নিয়ে যায়।

বাজান ভালো করেই জানত নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনপর্যায়ের সেনাপ্রধান ছিলেন। কিন্তু তার ধারণা ছিল, কিসরার হুকুম পালন না করার দুঃসাহস পৃথিবীর কোনো শাসকের ছিল না। তাই বাজান তৎক্ষণাৎ দুজন প্রতিনিধির সাথে পঁচিশজন সৈন্য প্রেরণ করে। তাদের সাথে নবীজি-বরাবর একটি চিঠি দেয়। তাতে লেখা ছিল : 'আপনি যদি স্বেচ্ছায় কিসরার

---

৭০৪. তারিখুত তাবারি : ৩/৯০

দরবারে চলে যান, তা হলে আমি প্রতিনিধির কাছে পত্র লিখে দেব, যা আপনার উপকারে আসবে। আর যদি আপনি অস্বীকৃতি জানান, তা হলে আপনি ও আপনার কওমের ধ্বংস অনিবার্য।'

এই বাহিনী খুব দ্রুত সফর করে মদিনায় পৌঁছে যায় এবং নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে হাজির হয়ে তাদের আগমনের উদ্দেশ্য শোনায়। তখন তিনি উত্তর দেন, 'আমি যদি নিজের পক্ষ থেকে নবুওয়াতের দাবি করতাম, তা হলে আমি ফিরে আসতাম। কিন্তু আমাকে তো এ কাজের জন্য আল্লাহ তায়ালা নিয়োজিত করেছেন।'

ইরানি দূতদের লম্বা লম্বা গোফ এবং শ্মশ্রুহীন গাল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এত অপছন্দ লাগছিল যে, তিনি তাদের দিকে তাকিয়ে কথা বলতে পারছিলেন না। অবশেষে তিনি এ কথা বলে নিজের অপছন্দের কথা প্রকাশ করেন যে- 'তোমাদেরকে এমন আকৃতি অবলম্বন করতে কে বলেছে?'

তারা উত্তর দেয়, 'আমাদের রব কিসরা।'

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন গুরুগম্ভীর স্বরে বলেন, 'কিন্তু আমার রব আমাকে গোঁফ ছাটতে এবং দাড়ি লম্বা করতে নির্দেশ দিয়েছেন।'

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতিনিধিদলকে একদিন মেহমানদারি করলেন। বিদায়ের সময় বললেন, 'যাও! তোমাদের গভর্নর বাজানকে সংবাদ দাও যে, গতরাতে তোমাদের রব কিসরাকে আমার রব ধ্বংস করে দিয়েছেন।'

ইরানিরা সে-দিনকার তারিখ লিখে নিল এবং রাজ্যের বিস্ময় নিয়ে তারা প্রস্থান করল। দেশে পৌঁছার পর তাদের বুঝে আসে যে, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দেওয়া তথ্য সম্পূর্ণ সঠিক। সেই তারিখেই কিসরা পারভেজকে তার পুত্র শেরওয়া হত্যা করে মাদায়েনের মসনদে আরোহণ করে। এর ফলে সাসানি বংশের বিশাল সাম্রাজ্য তখন হাঁফ ছেড়ে বাঁচে।[৭০৫]

---

৭০৫. আলবিদায়া ওয়ান নিহায়া : ৬/৪৮৩-৪৯০

কিছু উপকারী তথ্য :

১. ওয়াকিদি কিসরার মৃত্যু তারিখ ৭ হিজরির ১০ জুমাদাল উলা উল্লেখ করেছেন। উক্ত তারিখ মক্কিপঞ্জিকা অনুযায়ী, কিন্তু মাদানিপঞ্জিকা মোতাবেক ১০ শাওয়াল হয়।

ওয়াকিদি এটাও স্পষ্ট করেছেন যে, সেরাতের ছয় ঘণ্টা অতিক্রান্ত হয়েছিল। খ্রিষ্টাব্দ অনুযায়ী ১০ ফেব্রুয়ারি ৬২৯ খ্রিষ্টাব্দ হয়। ফেব্রুয়ারিতে এশিয়ার অধিকাংশ রাজ্যে ছ'টা বাজতেই সূর্যাস্ত হয়ে যায়। সেই হিসেবে পারভেজ রাত প্রায় বারোটার দিকে নিহত হয়।

২. এখানে তারিখুত তাবারির [২/১৮৫, ১৮৬] একটি রেওয়ায়েতের ভুল সংশোধন হওয়া জরুরি। সেখানে এসেছে যে, কিসরা নিহত হওয়ার সংবাদ নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হুদায়বিয়ার সময় পেয়েছেন; এটি সঠিক নয়। ৬ষ্ঠ হিজরিতে হুদায়বিয়ার সন্ধির

নাজাশির নামে পত্র

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পঞ্চম পত্র প্রেরণ করেন হাবশার নতুন বাদশাহ নাজাশির নামে, যা ৭ম হিজরির রবিউল আওয়াল মাসে হজরত আমর বিন উমাইয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর মাধ্যমে প্রেরণ করা হয়। পত্র পাঠ করে তিনি বিনাবাক্যব্যয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন এবং বলেন, 'যদি সম্ভব হতো, তা হলে আমি নিজে গিয়ে রাসুলুল্লাহর দরবারে হাজির হতাম।'[৭০৬]

সময় রাজাদের কাছে পত্র প্রেরণ শুরুই হয়নি।

৩। শেরওয়া ক্ষমতায় আরোহণ করার পর ইয়ামানের শাসক বাজানকে নির্দেশ দেয়, ঐ লোকটির ব্যাপারে সতর্ক দৃষ্টি রাখবে, যার সম্পর্কে কিসরা তোমার কাছে ফরমান পাঠিয়েছিলেন। বাজান শেরওয়ার হুকুম তামিল করল না। বরং ইয়ামানে উপস্থিত একাধিক পারসিক আমিরকে নিয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই সংবাদ পেয়ে খুশি হয়ে একটি বেল্ট পাঠান। হিময়ারি ভাষায় কোমরবন্ধকে 'মি'জাযাহ' বলে। তাই বাজানকে ইয়ামানে 'যুল মি'জাযা' এবং তার বংশধরকে 'বনু যুল মি'জাযা' বলা হয়। [তারিখুত তাবারি : ২/১৩৪]

৪। ইমাম ইবনুল জাওযি রহ. বর্ণনা করেছেন, কিসরা পারভেজ মারা যাওয়ার পূর্বে শেরওয়ার হত্যার বন্দোবস্তও করে গিয়েছিল। পারভেজ তার ভাণ্ডারে সুরক্ষিত সিন্দুকে একটা বিষের বোতল রেখে দিয়েছিল এবং তার উপর লেখা ছিল, এটি যৌনশক্তির মহৌষধ। শেরওয়া পিতার ভাণ্ডার তালাশ করতে গিয়ে এই সংরক্ষিত সিন্দুকের সন্ধান পায়। বোতলের গায়ের লেখা পড়ে সে কিছু ঔষধ খেয়ে নেয় এবং বিষক্রিয়ায় মারা যায়। [সায়দুল খাতির, পৃষ্ঠা ১৬৭]

৭০৬. তাবাকাতে ইবনে সা'দ : ১/২০৭

ফায়দা : সহিহ মুসলিমে হজরত আনাস রা. থেকে বর্ণিত আছে, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিসরা, কায়সার, নাজাশিসহ প্রত্যেক প্রতাপশালীর নিকটই পত্র লিখে তাদেরকে আল্লাহর দিকে দাওয়াত দিয়েছেন। এই নাজাশি তিনি নন, যার গায়েবানা জানাজা নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পড়েছেন। [সহিহ মুসলিম, হাদিস নং ৪৭০৯, কিতাবুল জিহাদ ওয়াস সিয়ার, বাবু কুতুবিন নাবিয়্যি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইলা মুলুকিল কুফফার] অর্থাৎ বাদশাহদের নিকট পত্রপ্রেরণের সময় যে নাজাশির কাছে বার্তা পাঠিয়েছিলেন, তার নাম নাজাশি আসহামা ছিল না। কিছুদিন পূর্বেই তার মৃত্যু হয়ে গিয়েছিল।

জাবির রা. এর এক রেওয়ায়েতে আরও স্পষ্টভাবে এসেছে যে, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যার গায়েবানা জানাজা পড়েছিলেন, তার নাম আসহামা ছিল। [সহিহ বুখারি : হাদিস নং ৩৮৭৭, কিতাবুল মানাকিব, বাবু মাওতিন নাজাশি]

হজরত আবু হুরাইরা রা. (নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সোহবতে যিনি ৭ হিজরির মহররম মাসে গাজওয়ায়ে খাইবারের সময় এসেছিলেন) আসহামার জানাজায় শরিক ছিলেন। [সহিহ বুখারি : হাদিস নং ১৩২৭, বাবুস সালাতি আলাল জানায়িযি বিল মুসাল্লা]

৭ হিজরির মহররম কিংবা সফর মাসে নাজাশির ইনতেকাল হলে হাবশাতে ত্বরিত নতুন নাজাশি নির্বাচিত হয়। আর তাকেই উক্ত চিঠি ৭ হিজরির রবিউল আওয়াল মাসে প্রেরণ করা হয়।

আরবের বিভিন্ন শাসকের নামে পত্র

বিভিন্ন রাজা-বাদশাহ ছাড়াও রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জাজিরাতুল আরবের স্বাধীন শাসকদের কাছেও চিঠি পাঠান। তাদের মধ্যে বাহরাইনের শাসক মুনযির বিন সাওয়া, ইয়ামামার শাসক হাওযা বিন আলি, ওমানের শাসক ইয়ায বিন জুলুনদা এবং জায়ফার বিন জুলুনদা উল্লেখযোগ্য। তন্মধ্যে মুনযির বিন সাওয়া এবং উমানের দুই শাসক ভাই ইসলাম গ্রহণ করেন।[৭০৭]

***

৭০৭. আলকামিল ফিত তারিখ : ২/৯৫ [৭ হিজরির ঘটনাবলি]

উমরাতুল কাযা

৭ হিজরির যিলকদ মাসে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরাইশের সঙ্গে কৃত চুক্তি মোতাবেক বিগত বছরের উমরা পালনের উদ্দেশ্যে মক্কায় গমন করেন। গত বছর বাইয়াতে রিজওয়ানে অংশগ্রহণকারী চৌদ্দশ সাহাবিকে নিয়ে ১ যিলকদে রওনা হন।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেকোনো বিপদের আশঙ্কায় যুদ্ধোপকরণ, যেমন : শিরস্ত্রাণ, লৌহবর্ম, বর্শা ইত্যাদি সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন। কিন্তু মক্কা প্রবেশ করার পূর্বে চুক্তি মোতাবেক অস্ত্রশস্ত্র একশ' মুজাহিদের প্রহরায় 'ওয়াদিয়ে ইয়াজুজে' রেখে যান।[৭০৮]

কুরাইশ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মক্কাপ্রবেশে কোনোরূপ বাধা সৃষ্টি করেনি। তবে সাহাবায়ে কেরাম মক্কায় প্রবেশের পরই নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নিজেদের বেষ্টনীতে নিয়ে নেয়, কোনো কাফের যাতে কোনোভাবে কষ্ট দেওয়ার বোকামি না করে।[৭০৯]

সেদিন আবদুল্লাহ বিন রাওয়াহা রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সওয়ারির আগে আগে হেঁটে যাচ্ছিলেন আর এই কবিতা আবৃত্তি করছিলেন,

خلُّوا بين الكفار عن سبيله* اليومَ نضربكم على تنزيله

ضربًا يُزيل الهامَ عن مَقِيله * ويُذْهِل الخليلَ عن خليله

'রে কাফেরের বাচ্চারা, ছেড়ে দে তার চলার পথ।

আজ মারবো তোদের কুরআনের ভাষায় মারার মতো।

কল্লা উড়ে যাবে তোদের গর্দান হতে,

বন্ধু হতে বন্ধু হবে পৃথক তাতে।

উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাকে এই কবিতা আবৃত্তি করতে শুনে বললেন, তুমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মুখে আল্লাহ তায়ালার হেরেমে কবিতা বলছ?

---

৭০৮. তাবাকাতে ইবনে সা'দ : ২/১২০, ১২১। বাইয়াতে রিদওয়ানে সেসব সাহাবি উপস্থিত ছিলেন না, যারা তার (উমরাতুল কাযার) পূর্বে ইনতেকাল করেছেন কিংবা শহীদ হয়ে গেছেন।

৭০৯. সহিহ বুখারি : হাদিস নং ৪২৫৫, বাবু উমরাতিল কাযা, কিতাবুল মাগাজি

তখন নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হে উমর, তাকে বলতে দাও। কেননা, এই কবিতা মুশরিকদের অন্তরের ভেতরে তিরের চাইতে অধিক প্রভাব বিস্তারকারী।[৭১০]

কুরাইশরা তখন তাদের ঘর ছেড়ে 'কুহে কুয়াইকিয়ানে' চলে গিয়েছিল। সেখান থেকে তারা মুসলমানদেরকে মসজিদে হারামে কাবা শরিফ তাওয়াফ করতে দেখতে থাকে। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবিদের সুস্থতা এবং শক্তির বহিঃপ্রকাশ করার জন্য তাওয়াফের প্রথম তিন চক্করের রমল তথা একটু দ্রুতগতিতে চলার নির্দেশ দেন।

কুরাইশদের ধারণা ছিল, মদিনায় গিয়ে মুসলমানরা অসুস্থ হয়ে পড়েছে। কিন্তু তাদের এমনভাবে তাওয়াফ করতে দেখে বলতে থাকে এরা তো দেখা যাচ্ছে আগের তুলনায় অনেক সুস্থ ও সতেজ হয়ে উঠেছে।[৭১১]

তৃতীয়দিন কাফেররা হজরত আলি রাদিয়াল্লাহু আনহুকে জিজ্ঞেস করে 'তুমি তাকে এখান থেকে চলে যাওয়ার জন্য বল। কারণ আজই এখানে অবস্থানের সময়সীমা শেষ হয়ে যাবে।'[৭১২]

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতিশ্রুতি মোতাবেক মক্কা থেকে বের হয়ে যাওয়ার প্রস্তুতি নেন। মক্কায় কিছু মুসলমান মানবেতর জীবনযাপন করছিল। তাদের মধ্যে হজরত হামজা রাদিয়াল্লাহু আনহুর স্ত্রী উম্মে উমারা (সালমা বিনতে উমাইস রাদিয়াল্লাহু আনহা) এবং ছেলে উমারাও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মক্কা থেকে বের হয়ে যাচ্ছিলেন, তখন উমারা রাদিয়াল্লাহু আনহু 'চাচাজান, চাচাজান' বলে তার পেছনে দৌড়ে যান। তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে ও তার মাকে সঙ্গে নিয়ে নেন। এই এতিমের দায়িত্ব নেওয়ার জন্য হজরত আলি, জাফর

৭১০. সুনানে তিরমিজি : হাদিস নং ২৮৪৭ (আবওয়াবুল আদব, বাবুন ফি ইনশাদিশ শি'র)

৭১১. সহিহ বুখারি : হাদিস নং ৪২৫৬, বাবু উমরাতিল কাযা, কিতাবুল মাগাজি

ফায়দা : আবদুল্লাহ বিন উমর রা. সেই উমরার সময় নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সফরসঙ্গী ছিলেন। তিনি নবীজির চার উমরার একটি উমরাকে রজব মাসে হয়েছে বলে উল্লেখ করেন। [সহিহ বুখারি : হাদিস নং ১৭৭৫, বাবু কাম ই'তামান নাবিয়্যু সা.] অন্যদিকে আয়েশা রা. বলেন, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রজব মাসে কোনো উমরা করেননি। [সহিহ বুখারি : হাদিস নং ১৭৭৬, বাবু কাম ই'তামান নাবিয়্যু সা.]

উক্ত মতানৈক্যের সম্ভাব্য কারণ হলো, ঐ উমরার তারিখ যিলকদ (মাদানিপঞ্জিকা অনুযায়ী) সংরক্ষিত আছে, যা মক্কি ক্যালেন্ডার মোতাবেক রজব ছিল। আয়েশা রা. এর সেই উমরার তারিখ মাদানিপঞ্জিকা এবং আবদুল্লাহ বিন উমর রা. এর মক্কিপঞ্জিকা মোতাবেক স্মরণ ছিল।

৭১২. সহিহ বুখারি : হাদিস নং ৪২৫১, সহিহ মুসলিম : হাদিস নং ৩১১৮, কিতাবুল হজ, বাবু ইসতিহবাবির রামলি)

এবং যায়েদ বিন হারিসা রাদিয়াল্লাহু আনহু পরস্পরে ঝগড়ায় লিপ্ত হন। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন বলেন, 'খালা মায়ের মতো।' এটুকু বলে জাফর রাদিয়াল্লাহু আনহুর তত্ত্বাবধানে তাকে দিয়ে দেন। কারণ, তার স্ত্রী ছিলেন উমারার খালা আসমা বিনতে উমাইস রাদিয়াল্লাহু আনহা।[৭১৩]

যেহেতু সন্ধির কিছু ধারা বিলুপ্ত করে দেওয়া হয়েছিল, যার মধ্যে 'মুসলমানদেরকে মক্কা থেকে মদিনায় যেতে দেওয়া যাবে না' এই ধারাটিও ছিল। ফলে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে যেতে কোনো অসুবিধা হলো না।

মাইমুনা বিনতে হারিস রা. এর সঙ্গে বিবাহ

মক্কায় হজরত আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুর পরিবার-পরিজন এবং কিছু আত্মীয়স্বজন কঠিন নিপীড়নের মধ্যে দিনাতিপাত করছিলেন।[৭১৪] উম্মুল ফযলের (হজরত আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুর স্ত্রী) ছোট বোন মাইমুনা বিনতে হারিস রাদিয়াল্লাহু আনহাও তখন মক্কার নিরীহ মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তার স্বামী আবু রুহমের ইনতেকাল হয়ে গিয়েছিল। তিনি মদিনা যেতে চাচ্ছিলেন, সেখানে তার কোনো দেখভালকারী ছিল না।

এ সময় নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন নিরীহ মুসলমানদের খোঁজ নিচ্ছিলেন, তখন ভাবলেন, মাইমুনা রাদিয়াল্লাহু আনহাকে বিয়ে করে নেওয়া যায়। আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুর পরিবারেরও ইচ্ছা ছিল নবীজির সঙ্গে আত্মীয়তা আরো গভীর হোক। ফলে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উমরায় রওনা হওয়ার আগেই আবু রাফে এবং আউস বিন খাওলি রাদিয়াল্লাহু আনহুমাকে বিবাহের উকিল বানিয়ে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুর নিকট পাঠিয়ে দেন। মাইমুনা আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুকে অভিভাবক হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ থেকে বিয়ের প্রস্তাব গেলে মাইমুনা রাদিয়াল্লাহু আনহা রাজি হয়ে যান। হজরত আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু আবু রাফে এবং আউস বিন খাওলির উপস্থিতিতে বিয়ে পড়ান।

উমরা থেকে ফেরার পথে মক্কার বাইরে সারিফ নামক স্থানে যাত্রাবিরতি দেন এবং আবু রাফে রাদিয়াল্লাহু আনহু মাইমুনা রাদিয়াল্লাহু আনহাকে সেখানে নিয়ে আসেন। নবীজির কাছে সোপর্দ করার পর তাকে নিয়ে মদিনা উপস্থিত হন।[৭১৫]

---

৭১৩. সহিহ বুখারি : হাদিস নং ২৬৯৯ (বাবু কাইফা য়ুকতাবু হাযা মা সালাহা আলাইহি ফুলান, কিতাবুস সুলহ), তাবাকাতে ইবনে সা'দ : ২/১২২

৭১৪. সহিহ বুখারি : হাদিস নং ১৩৫৭, (বাবুন ইযা আসলামাস সাবিয়্যু ফা মাতা)

৭১৫. তাবাকাতে ইবনে সা'দ : ২/১২২, সিয়ারু আলামিন নুবালা : ২/২৩৮-২৪০

যায়নাব রা. এর ইনতেকাল

উমরা থেকে প্রত্যাবর্তনের পর ৮ হিজরির শুরুতে একটি বেদনাদায়ক ঘটনা ঘটে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বড় কন্যা যায়নাব রাদিয়াল্লাহু আনহা ইনতেকাল করেন। তার স্বামী আবুল আস বিগত বছর ইসলাম গ্রহণ করে মদিনায় বসবাস করা আরম্ভ করেছিলেন। কিন্তু উভয়েই একই বছরে ইনতেকাল করেন। যায়নাব রাদিয়াল্লাহু আনহা অসুস্থ হয়ে মারা যান।

নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সংবাদ পেয়ে তার কাফন-দাফনের জন্য আবুল আসের ঘরে যান। উম্মে আইমান, সাওদা এবং উম্মে সালামা তাকে গোসল করান।[৭১৬]

কন্যার কবর থেকে ওঠার সময় নবীজিকে অত্যন্ত বিমর্ষ দেখাচ্ছিল। কিছুক্ষণ পর তার চেহারায় প্রশান্তির উদ্ভাস দেখা যায়। সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, 'আমার কন্যার অক্ষমতা ও একাকিত্বের চিত্র আমার সামনে ভেসে ওঠে। আমি আল্লাহর নিকট দোয়া করেছি, তিনি যেন তাকে কবরের কষ্ট ও সঙ্কীর্ণতা থেকে রক্ষা করেন। আমার দোয়া কবুল হয়েছে। তার সঙ্গে সহজ আচরণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।[৭১৭]

***

মাইমুনা রা. এর বিবাহের সময় রাসুলুল্লাহ মুহরিম ছিলেন?

এ বিষয়ে দু'টি মত রয়েছে। এক মতে তা প্রমাণ করে, অন্য মত তার ভিন্ন। এ মাসআলাটি অত্যন্ত বিরোধপূর্ণ। এই মাসআলাতে হাদিসের ব্যাখ্যাকার এবং ফকিহগণ দীর্ঘ আলোচনা করেছেন।

লেখক তার সারকথা এটা বুঝেছেন যে, যারা ইহরাম অবস্থায় বিয়ের কথা অস্বীকার করেছেন, তারা লক্ষ করেছেন মদিনা থেকে বিয়ের বার্তা প্রেরণের সময়টি, তখন নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইহরাম বাঁধেননি।

আর যারা ইহরাম অবস্থায় বিবাহ হয়েছে বলেন, তাদের দৃষ্টিভঙ্গি হলো উকিলদের বিবাহের বার্তা দিয়ে পাঠিয়ে তিনি উমরার জন্য রওনা হয়ে যান, আর তিনি মক্কা পৌঁছার পূর্বেই হজরত আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বিয়ে পড়িয়েছিলেন। নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বিবহের সময় মুহরিম ছিলেন।

মোদ্দাকথা, এটি কেবল দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য। হানাফি ফিকহে এটি বৈধতা এবং শাফেয়িদের নিকট সতর্কতার উপর ভিত্তি।

৭১৬. তাবাকাতে ইবনে সা'দ, যায়নাব বিনতে মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর জীবনী দ্রষ্টব্য।

৭১৭. উসদুল গাবাহ : যায়নাব বিনতে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনী দ্রষ্টব্য।

মুতাযুদ্ধ

বাইজেন্টাইন রোমানদের সঙ্গে প্রথম সংঘর্ষ

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ থেকে চিঠির মাধ্যমে শাসকদের মাঝে ইসলামের দাওয়াতি কার্যক্রম চলমান ছিল। এরই ধারাবাহিকতায় তিনি হারিস বিন উমাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে শামের সীমান্তবর্তী শহর বুসরার শাসক শুরাহবিল বিন আমর গাসসানির নিকট প্রেরণ করেন। শুরাহবিল দূতালি এবং নৈতিক সকল নিয়মের প্রতি বুড়ো আঙুল প্রদর্শন করে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দূতকে শহিদ করে দেয়। এই ন্যাক্কারজনক ঘটনা কোনোভাবেই বরদাশত করার মতো না। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই সংবাদ পেয়ে ভীষণ মর্মাহত হন।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শামে অভিযান পরিচালনা করা থেকে বিরত ছিলেন। সমগ্র আরব নিয়ন্ত্রণে আসার পূর্বে সম্ভবত তিনি বাইরের বড় বড় রাজ্যের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হতে চাচ্ছিলেন না। কিন্তু যখন মদিনার সরকারের সঙ্গেই এ ধরনের আচরণ করা হলো, এটাকে যদি মামুলি ব্যাপার হিসেবে ধরে নেওয়া হয়, তা হলে খুব শিগগিরই তারা মদিনার দিকে পা বাড়ানোর দুঃসাহস করবে। তাই ধর্মীয় জজবা ও উদ্দীপনা এবং প্রজ্ঞার দাবি হলো এখনই আগে বেড়ে তাদের উপর আঘাত করা। ফলে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ৮ হিজরির জুমাদাল উলাতে ৩ হাজার মুহাজির ও আনসারের একটি বাহিনী প্রস্তুত করে শামের সীমান্তের দিকে রওনা করিয়ে দেন।[৭১৮]

যায়েদ বিন হারিসা রাদিয়াল্লাহু আনহুকে সেনাপতি নিযুক্ত করেন। তিনি ছিলেন নবীজির মুক্ত গোলাম এবং তার পরিবারের একজন সদস্য। তার বয়স তখন প্রায় ৪৫ বছর। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নির্দেশনা দেন, যদি যায়েদ শহিদ হয়ে যায়, তা হলে জাফর বিন আবু তালিব নেতৃত্ব হাতে নিবে। সেও শহিদ হয়ে গেলে আবদুল্লাহ বিন রাওয়াহা আমির নিযুক্ত হবে। সেও শহিদ হয়ে গেলে তোমরা সকলে একজনকে আমির নিয়োগ করবে।

অনেকদূর পথ ঘুরে এই বাহিনী গন্তব্যের দিকে অগ্রসর হচ্ছিল। মূলকেন্দ্রের সঙ্গে সম্পর্ক রাখা, তথ্য আদান-প্রদান করা এবং খাদ্য ও রসদসামগ্রীর জন্য

---

৭১৮. এই তারিখটি মাদানি ক্যালেন্ডার অনুযায়ী। আর মক্কি ক্যালেন্ডার মোতাবেক ৭ হিজরির যিলহজ মাস ছিল (আগস্ট-সেপ্টেম্বর ৬২৯ খ্রিষ্টাব্দ)।

যোগাযোগ করা ছিল বড় দুষ্কর। উপরন্তু যুদ্ধ করতে হবে লক্ষাধিক সৈন্যের সঙ্গে। এজন্য পরাজিত হওয়া, পশ্চাদপসরণ করা এবং ধ্বংস হওয়ার আশঙ্কা ছিল বহুলাংশে।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাহিনীকে দোয়ার মাধ্যমে বিদায় জানান। মুজাহিদরা প্রায় এগারোশ কিলোমিটার দূরত্বে এক কষ্টকর সফর করে রোমান সীমান্তে প্রবেশ করেন। সেখানে গিয়ে সংবাদ পান, এক লক্ষ রোমান সৈন্য তাদের মোকাবেলার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে। লাখ্‌ম, জুযামসহ আরবের খ্রিষ্টান গোত্রগুলো তাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে।

মুসলমানরা 'মাআন' নামক জায়গায় দু'দিন যাবৎ পরামর্শ করেন তাদের কী করণীয় নির্ধারণের জন্য। কারণ, রওনা হওয়ার সময় কারো কল্পনাতেও ছিল না যে এত বড় বাহিনীর মুখোমুখি হতে হবে তাদের। বড় বড় সাহাবিগণ এখানে অবস্থান করে নবীজিকে পত্রমারফত অবহিত করার পরামর্শ দেন। হয়তো তিনি সাহায্য পাঠাবেন কিংবা বর্তমান অবস্থাতেই আক্রমণের নির্দেশ দেবেন। তখন আমরা সংখ্যার কোনো পরোয়া না করে ঝাঁপিয়ে পড়ব।

এই সময়ে আবদুল্লাহ বিন রাওয়াহা রাদিয়াল্লাহু আনহু মুসলমানদের ঈমানজাগানিয়া বক্তব্য দেন। তিনি বলেন, 'হে মুসলমানরা, তোমাদের কী হলো? তোমরা আজ এমন জিনিসকে ভয় পাচ্ছো, যার আগ্রহে তোমরা ঘর ছেড়েছ। তোমরা তো শাহাদাতের খোঁজে বেরিয়েছ। আমরা কখনো সংখ্যাধিক্য এবং শক্তির উপর নির্ভর করে লড়াই করি না। আমরা তো ওই দীনের বল ও শক্তি নিয়ে লড়াই করি, যার বদৌলতে আল্লাহ আমাদেরকে ইজ্জত-সম্মান দিয়েছেন। এখন আমাদের সামনে দুটি পথই খোলা রয়েছে; হয়তো বিজয়, নয়তো শাহাদাত।'

এই উদ্দীপক বক্তৃতা শুনে সকলেই উজ্জীবিত হয়ে বলতে থাকে, 'আল্লাহর কসম, আবদুল্লাহ সত্য বলেছে।'

মুসলমানরা তখন লড়াইয়ের উদ্দেশে রওনা হয়। যুদ্ধের জন্য উপযুক্ত স্থান খুঁজতে খুঁজতে তারা 'মুতা'র কাছাকাছি পৌঁছে সুবিন্যস্ত হয়ে দাঁড়িয়ে যায়। এখানেই উভয় বাহিনীর মাঝে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ হয়। মুসলিম সেনাপতি যায়েদ বিন হারিসা রাদিয়াল্লাহু আনহু ঝান্ডা নিয়ে বাহিনীর মধ্যখানে অবস্থান করে নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন। রোমানদের আক্রমণ ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছিল। তাদের বহু সৈন্য হজরত যায়েদের নিকটে পৌঁছে গিয়েছিল। তিনি শেষনিঃশ্বাস পর্যন্ত লড়তে লড়তে বর্শার আঘাতে শহিদ হয়ে যান।

যায়েদ রাদিয়াল্লাহু আনহুর শাহাদাতের পর জাফর রাদিয়াল্লাহু আনহু ঝান্ডা গ্রহণ করেন এবং মুসলমানদের জোশ ও স্পৃহা বৃদ্ধির জন্য নতুন উদ্যমে আক্রমণ শুরু করেন। একসময় রোমানরা তাকেও ঘিরে ফেলে। তিনি পলায়ন থেকে বাঁচার জন্য তার লাল ঘোড়া থেকে নেমে পড়েন। পাশাপাশি ঘোড়ার সামনের দু'পাও কেটে ফেলেন, যেন রোমানরা তাকে ব্যবহার করতে না পারে। তিনি ডান হাতে ঝান্ডা নিয়ে বাম হাতে লড়াই করছিলেন। ডান হাত কেটে গেলে বাম হাতে ঝান্ডা নিয়ে লড়তে থাকলেন। এরপর বাম হাত কেটে গেলে কর্তিত বাহু দিয়েই ঝান্ডা বুকে আঁকড়ে ধরেন। শত্রুরা তার উপর উপর্যুপরি আক্রমণ করতে থাকে। অবশেষে তিনি তরবারি ও বর্শার ৯০টি আঘাত নিয়ে জমিনে লুটিয়ে পড়েন। সবকটি আঘাত ছিল তার সিনা এবং বাহুতে। একটিও পিঠে পড়েনি।

হজরত জাফর রাদিয়াল্লাহু আনহুর শাহাদাতের পরপরই আবদুল্লাহ বিন রাওয়াহা রাদিয়াল্লাহু আনহু বাহিনীর হাল ধরেন। যেহেতু মুসলমানরা মূলকেন্দ্র থেকে বহুদূরে ছিল; তাই খাবারদাবারের সঙ্কটও প্রকট ছিল। এজন্য আবদুল্লাহ বিন রাওয়াহা কয়েকদিন যাবৎ ক্ষুধার্ত ছিলেন। তার করুণ অবস্থা দেখে চাচাত ভাই একটি গোশতের টুকরো এগিয়ে দিয়ে বলে, 'কিছু মুখে দিয়ে নাও, তা হলে দেহে কিছুটা বল পাবে।' কেবল এক লোকমা মুখে দিয়েছিলেন, তখনই এক দিক থেকে রোমানদের অগ্রসরতার এবং মুসলমানদের পালটা হামলার শোরগোল তার কানে এলো। তিনি গোশতের টুকরো ফেলে দিলেন এবং নিজেকে লক্ষ করে বলেন, 'তুই এখনো দুনিয়া নিয়ে পড়ে আছিস, ওদিকে মানুষ জানবাজি রেখে যুদ্ধ করছে।' এই বলে তিনি তরবারি হাতে নিয়ে ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে যুদ্ধ করতে থাকেন।

শত্রুদের আক্রমণ যখন প্রচণ্ড আকার ধারণ করে, তখন তিনি পায়দল লড়াই করার জন্য নিচে নামার প্রয়োজনবোধ করলেন। কিন্তু মন তখন পালিয়ে যাওয়ার মন্ত্রণা দিল। তিনি নিজেকে সম্বোধন করে নিম্নোক্ত পঙ্‌ক্তিগুলো আবৃত্তি করলেন,

أقسمتُ يا نفسُ لتَنْزِلَنَّه * لتنزِلَنَّ أو لتُكْرَهِنَّهْ

إن أجلبَ الناسُ وشدُّوا الرَّنَّه * ما لي أراكِ تكرهِين الجنَّه

قد طالما كنتِ مطمئنةً * هل أنتِ إلا نطفةٍ في شَنَّه

হে দিল, কসম করে বলছি! তোকে অবশ্যই নামতে হবে, স্বেচ্ছায় নামবি, অন্যথায় জোরপূর্বক নামতে হবে।

কাফের যখন জমায়েত হয়ে শোরগোল করছে, তখন তুই কেন জান্নাতের প্রতি উদগ্রীব হচ্ছিস না।

প্রশান্তির জিন্দেগি তোর সমাপ্ত, তোর তো মশকে রাখা এক ফোঁটা
পানি পরিমাণ জীবনের মুহূর্ত অবশিষ্ট রয়েছে।

পাশাপাশি তিনি এও বলেন যে, 'এখনো কীসের প্রতি আগ্রহ বাকি রয়ে গেছে? যদি স্ত্রীর হয়ে থাকে, তা হলে সে তালাক; গোলামের হয়ে থাকলে, সে আজাদ; বাগবাগিচা এবং জমিজমার হয়ে থাকলে, তা আল্লাহর রাস্তায় সদকা।' এ কথা বলতে বলতে তিনি ঘোড়া থেকে নেমে প্রথম কাতারে গিয়ে দুশমনের উপর বেপরোয়া আক্রমণ করেন। অবশেষে দুশমনের ধারালো নেযার আঘাত তার বুক এফোঁড় ওফোঁড় করে দেয়। তখন তিনি মুসলমান ও রোমান সৈন্যদের সারির মাঝে লুটিয়ে পড়ার মুহূর্তে বলেন, 'হে মুসলমানরা, তোমাদের ভাইয়ের লাশ উদ্ধার করো।'

মুসলমানরা তৎক্ষণাৎ রোমানদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তার লাশ উঠিয়ে নিয়ে আসে। তার লুটিয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই সাবিত বিন আরকাম রাদিয়াল্লাহু আনহু ঝান্ডা উঠিয়ে নেন। মুসলমানরা তার নেতৃত্বেই লড়তে চাচ্ছিলেন। কিন্তু পরিস্থিতির দাবি ছিল এমন একজন অসাধারণ সেনাপতির, যিনি তার সাহসিকতা, নেতৃত্ব, প্রজ্ঞা ও কৌশল দিয়ে বাহিনীকে শত্রুর কাছে পুরোপুরি ধ্বংস হওয়া থেকে বাঁচাতে পারবেন। তখনই সাবিত বিন আরকাম রাদিয়াল্লাহু আনহু হজরত খালিদ বিন ওয়ালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহুকে ঝান্ডা দিয়ে বলেন, 'যুদ্ধের অভিজ্ঞতা আপনারই সবচেয়ে বেশি।' সবাই তা সমর্থন করলে মক্কার এই অনন্য প্রতিভাধর সেনানায়ক প্রথমবারের মতো মদিনার ফওজের নেতৃত্ব দেওয়া শুরু করেন।[৭১৯]

হজরত খালেদ বিন ওয়ালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহুর সমর-অভিজ্ঞতা এবং নেতৃত্বসুলভ দূরদর্শিতার সামনে একটি বড় পরীক্ষা ছিল, যেকোনো মূল্যে মুসলমানদেরকে রোমানদের নরক থেকে বাঁচাতে হবে। কিন্তু পিছপা হওয়ার কৌশল অবলম্বন করলে কয়েকশ' মাইল পর্যন্ত রোমানদের পশ্চাদ্ধাবনের মুখে পড়তে হবে। তাই এই আশঙ্কা দূর করার জন্য প্রথমে রোমানদের পিছু হটানো প্রয়োজন ছিল।

আল্লাহ তায়ালা খালেদ রাদিয়াল্লাহু আনহুকে এই পরীক্ষা থেকে উত্তরণের ব্যবস্থা করে দেন। তিনি মুসলমানদের প্রথম সারিগুলোকে পেছনে নিয়ে পেছনের সারিগুলোকে সামনে নিয়ে আসেন। ডানবাহুকে বাম দিকে এবং বাম বাহুকে ডান দিকে নিয়ে যান। এই রদবদলের দরুন একদিকে যেমন কঠিন স্থানগুলোতে

৭১৯. আসসিরাতুল হালাবিয়্যা : ৩/৯৬, ৯৭; আলবিদায়া ওয়ান নিহায়া : ৬/৪১২-৪২৮; উসদুল গাবাহ (আবদুল্লাহ বিন রাওয়াহা রা. এর জীবনী দ্রষ্টব্য)।

উদ্যমী সৈন্যদের যাওয়ার সুযোগ মেলে, তেমনি এমন অস্বাভাবিক নড়াচড়ার কারণে রোমানদের মনেও আতঙ্ক সৃষ্টি হয়।

এবার তুমুল যুদ্ধ শুরু হয়। মুসলমানরা বেপরোয়াভাবে লড়তে থাকেন। দুশমনের চরম ক্ষতি সাধন করতে থাকেন। হজরত খালেদ বিন ওয়ালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু নিজেও অত্যন্ত বীরবিক্রমে লড়াই করতে লাগলেন। একে একে নয়টি তরবারি তার ভেঙে যায়। অবশেষে তিনি উঁচু ফলাধারী ইয়ামানি তরবারি হাতে নেন, যা অকেজো হয়নি। রাতের অন্ধকার নেমে এলে উভয়পক্ষ যুদ্ধবিরতি দেয়।

হজরত খালেদ বিন ওয়ালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু এ সময় মুসলমানদের কিছু মুজাহিদকে ছোট ছোট দলে বিভক্ত করে দূরে পাঠিয়ে দেন এবং ভোর হলে খুব জোরে তাকবিরধ্বনি দিতে দিতে এসে শামিল হওয়ার নির্দেশ করেন। রোমানরা ভাবে মুসলমানদের নতুন সেনা-সাহায্য এসে পৌঁছেছে। ফলে তারা যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া নিজেদের উপর ধ্বংস টেনে আনার নামান্তর মনে করে। তখন তারা এমনিতেই পিছু হটে। হজরত খালিদ বিন ওয়ালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু এই সময়টিরই অপেক্ষায় ছিলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ মদিনার দিকে রওনা হয়ে যান। রোমানরা প্রতারিত হয়। তারা ভাবে, এটা মুসলমানদের কোনো যুদ্ধকৌশল। এই কারণে তাদের পশ্চাদ্ধাবন করলে নির্জন ধূ-ধূ মরুভূমিতে দিগ্‌ভ্রান্ত হয়ে তৃষ্ণায় হয়তো তারা মরে যাবে। তাই তারা মুসলমানদের পিছু নেয়নি।

আল্লাহ তায়ালার তরফ থেকে যুদ্ধের সম্পূর্ণ চিত্র নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে তুলে ধরা হয়েছিল। তিনি যেন দেখে দেখে সাহাবায়ে কেরামকে হজরত যায়েদ, হজরত জাফর এবং হজরত আবদুল্লাহ বিন রাওয়াহার (রাদিয়াল্লাহু আনহুম) শাহাদাতের বর্ণনা দিচ্ছিলেন। এরপর বললেন, 'এখন ঝান্ডা হাতে নিয়েছে আল্লাহর এক তরবারি, যার হাতে আল্লাহ বিজয় লিখে রেখেছেন।'

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উদ্দেশ্য ছিলেন খালেদ বিন ওয়ালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু। তাই খালেদ রাদিয়াল্লাহু আনহুকে সাইফুল্লাহ বা আল্লাহর তরবারি বলা হতো। যদিও এই যুদ্ধে কারো পরাজয় নিশ্চিত হয়নি। বরং মুসলমানরা বিশেষ কারণে পিছপা হন। কিন্তু রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একে বিজয় বলে অভিহিত করার কারণ হলো, ষাট-সত্তরগুণ বেশি সৈন্যের সঙ্গে মুষ্টিমেয় মুজাহিদের এত অবিচলতার সঙ্গে লড়াই করা, আবার শত্রুদেরকে নিরাপদ দূরত্বে রেখে তাদের পশ্চাদ্ধাবন থেকে বিরত রেখে সৈন্যদের ব্যারাকে ফিরিয়ে আনা মামুলি সফলতা নয়।

যদিও মুসলমানদের অনেক প্রাণহানি হয়েছিল। তবে এর দ্বারা বিশাল বাহিনীর সঙ্গে লড়াই করার অভিজ্ঞতা এবং রোমানদের যুদ্ধনীতি সম্পর্কেও অভিজ্ঞতা

অর্জন করার সুযোগ হয়। আর এই কারণেই মুতাযুদ্ধ থেকে ফেরত মুজাহিদরা যখন মদিনায় প্রবেশ করেন, তখন কিছু মুসলমান তাদেরকে 'রণাঙ্গন থেকে পলায়নকারী' বলে তিরস্কার করে। তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুদ্ধফেরত মুজাহিদদের উৎসাহ দেওয়া এবং তাদের হিম্মত বৃদ্ধি করার জন্য বলেন, 'তোমরা যুদ্ধের ময়দান থেকে পলায়নকারী নও; বরং পালটা আক্রমণকারী।'[৭২০]

যাতুস সালাসিল যুদ্ধ

মুতাযুদ্ধের পর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমর বিন আস রাদিয়াল্লাহু আনহুর নেতৃত্বে ৩০০ মুজাহিদের একটি দল দিয়ে উত্তর দিকে কুযাআ গোত্রকে শায়েস্তা করার জন্য প্রেরণ করেন। কারণ, মুতাযুদ্ধ থেকে মুসলমানদের পিছিয়ে আসার পর এরা রোমানদের দিকে ঝুঁকতে শুরু করে। আমর বিন আস রাদিয়াল্লাহু আনহুর দায়িত্ব ছিল মুসলমানদের প্রতিরক্ষা এবং শামবাসীদের বিপক্ষে অবস্থান নেওয়ার বিষয়টি তাদের থেকে নিশ্চিত হওয়া। হজরত আমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর দাদির বংশধরেরা এই কবিলায় বসবাস করছিল। এজন্য তিনিই এই কাজটি ভালোভাবে আঞ্জাম দিতে পারবেন। তিনি 'সালাসিল' নামে একটি ঝর্নার কাছে গিয়ে শত্রুর শক্তির অনুমান করে আরো সৈন্য তলব করলেন। তখন নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু উবাইদা রাদিয়াল্লাহু আনহুর নেতৃত্বে সাহায্যকারী বাহিনী প্রেরণ করেন। এই অভিযানের ফলে মুসলমানদের প্রভাব-প্রতিপত্তি আবারও প্রতিষ্ঠিত হয়।[৭২১]

---

৭২০. সহিহ বুখারি : কিতাবুল মাগাজি, বাবু গাজওয়াতি মুতা; আসসিরাতুল হালাবিয়্যাহ : ৩/৯৭, ৯৮; আলবিদায়া ওয়ান নিহায়া : ৬/৪২৮-৪৩০

৭২১. মুসনাদে আহমদ : হাদিস নং ১৬৯৭; তারিখুত তাবারি : ৩/৩১, ৩২; আলবিদায়া ওয়ান নিহায়া : ৮/১৬

'যাতুস সালাসিল' মদিনা থেকে প্রায় ৪০০ কিলোমিটার উত্তর-পশ্চিমে সমুদ্র উপকূলের নিকটে। সিরাত-লেখকরা এই অভিযানের সময় লেখেন ৮ হিজরির জুমাদাল আখিরা। যেহেতু মুতাযুদ্ধ সংঘটিত হয় ৮ হিজরির জুমাদাল উলা (মাদানি) মাসে, আর যাতুস সালাসিল ছিল তারই সম্পূরক; তাই মাদানি জুমাদাল আখিরা মাসে (খ্রিষ্টাব্দ সেপ্টেম্বর, অক্টোবর ৬২৯ সাল) হয়। তার অর্থ দাঁড়ায়, মুতাযুদ্ধের কেবল এক মাস পর তা সংঘটিত হয়।

অথচ সহিহ হাদিসে এসেছে, এই অভিযানে হজরত আমর বিন আস রা. এর উপর এক রাতে গোসল ফরজ হয়েছিল। তিনি তীব্র শীতের কারণে গোসল না করে তায়াম্মুম করে নামাজ আদায় করেন [সুনানে আবু দাউদ : হাদিস নং ৩৩৪, কিতাবুত তাহারাহ, বাবু ইযা খাফাল জুনুবু আল বারাদ]।

এ কথা পরিষ্কার যে, সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর মাসে তেমন শীত পড়ে না। বুঝা গেল, জুমাদাল আখিরাটা ছিল মক্কি এবং ফেব্রুয়ারি ৬৩০ খ্রিষ্টাব্দ (যিলকদ মাদানি ৮ হিজরি)

কুরাইশের সঙ্গে চুক্তিভঙ্গ হওয়া

কুরাইশের সেই শক্তি-সামর্থ্য অবশিষ্ট নেই। খাইবার বিজয়ের পর তাদের মিত্র ইহুদিদের সাহায্য চিরদিনের জন্য বন্ধ হয়ে যায়। মুনাফিকরাও দমে গিয়েছিল। কুরাইশরা তাদেরকে কোনো সহযোগিতা দিতে পারছিল না। শুধু হুদাইবিয়াসন্ধি মুসলমানদের মক্কা-অভিযান পরিচালনায় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু কিছুদিন পর কুরাইশের এক ভুলের কারণে সন্ধিচুক্তি নড়বড়ে হয়ে যায়।

হুদাইবিয়াসন্ধিতে অন্তর্ভুক্ত কুরাইশের জোটবদ্ধ বনু বকর গোত্র মদিনার জোটবদ্ধ কবিলা বনু খুজাআর উপর হামলা করে। অথচ চুক্তিপত্রে দশ বছর পর্যন্ত যুদ্ধ বন্ধ রাখার শর্তারোপ করা হয়। এজন্য এ ধরনের কর্মকাণ্ডের কোনো সুযোগ ছিল না। এর চেয়ে জটিল ব্যাপার ছিল যে, কুরাইশ বনু বকরকে অস্ত্র সরবরাহ করেই ক্ষান্ত থাকেনি; বরং একাধিক কুরাইশ সরদার দলবলসহ ওই হামলায় অংশগ্রহণ করে। বনু খুজাআতে গণহত্যা চালায়। তারা যখন হারামে আশ্রয় নেয়, তখন তারা সেখানে গিয়েও হত্যাযজ্ঞ চালায়। বনু খুজাআর এক মজলুম সালিম বিন আমর নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে এই জুলুমের বিবরণ শোনায়। তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'অবশ্যই তোমাদের সাহায্য করব।'

কুরাইশের দম্ভ-অহংকার চূর্ণ করে বিজয়ীবেশে মক্কায় প্রবেশ করার এটাই মোক্ষম সুযোগ। কাবা শরিফকে শিরক থেকে পবিত্র করে তাওহিদের প্রধানকেন্দ্র হিসেবে ঘোষণা দেওয়ার এখনই সময়।

তদুপরি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চূড়ান্ত অভিযান পরিচালনার পূর্বে কুরাইশের নিকট দূত প্রেরণ করে তাদেরকে বনু খুজাআর রক্তপণ আদায় করার কিংবা তাদের উপর হামলাকারীদের সঙ্গে নিজেদের সম্পর্কহীনতা ঘোষণা দেওয়ার দাবি জানান। এর কোনোটাই যদি না করে, তা হলে যেন হুদাইবিয়াসন্ধির সমাপ্তির ঘোষণা দেয়। কুরাইশ আত্মগর্ব এবং অহংকারের দরুন নবীজির দূতকে জবাব দেয়, আমরা হুদাইবিয়াসন্ধির সমাপ্তি ঘোষণা করছি।' দূত এই উত্তর নিয়ে ফিরে এলে, কুরাইশ তাদের ভুল বুঝতে পারে। তারা সঙ্গে সঙ্গে আবু সুফিয়ানকে চুক্তি নবায়ন করার জন্য মদিনায় প্রেরণ করে।

মদিনা পৌঁছে আবু সুফিয়ান প্রথমে তার কন্যা উম্মুল মুমিনিন উম্মে হাবিবার ঘরে যান। নবীজি তখন ঘরে ছিলেন না। তিনি নবীজির বিছানায় বসতে উদ্যত হলে উম্মে হাবিবা তাকে বাধা দেন। তিনি পেরেশান হয়ে বলেন, 'আমি কি এই বিছানার উপযুক্ত নই, নাকি এই বিছানা আমার জন্য উপযুক্ত নয়?'

মোতাবেক। অর্থাৎ মুতাযুদ্ধ এবং যাতুস সালাসিলের মাঝে ছ'মাসের ব্যবধান ছিল।

মেয়ে বললেন, 'এটি নবীজির বিছানা। আপনি মুশরিক হওয়ার কারণে নাপাক, তাই আমি চাচ্ছি না আপনি এতে বসেন।' আবু সুফিয়ান তখন এই বলে বের হয়ে যান যে, 'বেটি, আমাদের থেকে দূরে সরে গিয়ে তুমি একেবারে বদলে গেছ।'

এই অস্থির অবস্থাতেই তিনি নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে গিয়ে সন্ধি বহাল রাখার অনুরোধ করেন। তখন নবীজি কোনো উত্তর দেননি। নিরাশ হয়ে তিনি হজরত আবু বকর ও হজরত উমরের দ্বারস্থ হন। কিন্তু কোথাও সদুত্তর পাননি। ফলে তিনি ব্যর্থ মনোরথে মক্কা ফিরে যান।[৭২২]

---

৭২২. সিরাতে ইবনে হিশাম : ২/৩৯৬, ৩৯৭

মক্কা বিজয়

(রমজান ৮ হিজরি)

হুদাইবিয়ার সন্ধি সমাপ্তির পর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুব দ্রুত যুদ্ধের প্রস্তুতি শুরু করেন এবং পূর্ণ গোপনীয়তা রক্ষা করার চেষ্টা করেন। উদ্দেশ্য ছিল কুরাইশের কাছে যেন এই প্রস্তুতির সংবাদ না পৌঁছে। তিনি হজরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহাকে সফরের প্রস্তুতি নিতে বলেন। কিন্তু গন্তব্যের কথা তার নিকট উল্লেখ করেননি।[৭২৩]

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইচ্ছা ছিল, অতর্কিতভাবে মক্কাবাসীর মাথার উপর গিয়ে দাঁড়াতে, যাতে করে তারা কোনোরূপ মোকাবেলা করার সুযোগ না পায়, কোনো রক্তপাত ছাড়াই পুণ্যভূমি তার প্রকৃত উত্তরাধিকারের নিকট ফিরে যায়। তিনি এই অভিযান সফল হওয়ার জন্য বিশেষভাবে দোয়া করেন, 'হে আল্লাহ, কুরাইশ যেন বিন্দুমাত্র টের না পায়। আমরা আচানক তাদের কাছে পৌঁছে যেতে চাই।'

সফরের প্রস্তুতি সম্পন্ন হলে সাহাবায়ে কেরামকে গন্তব্যের কথা বললেন।[৭২৪]

এই অবস্থায় একজন নিষ্ঠাবান মুসলমান হাতিব বিন আবি বালতাআ রাদিয়াল্লাহু আনহু এক মহিলার মাধ্যমে নবীজির যুদ্ধপ্রস্তুতির কথা কুরাইশকে অবগত করতে একটি চিরকুট লিখে পাঠান। এটি ছিল জঘন্য অপরাধ। যদি এটা তিনি ছাড়া অন্য কেউ করত, তা হলে মুনাফিক বলে সন্দেহ করা হতো। কিন্তু হাতিব রাদিয়াল্লাহু আনহু একজন নিষ্ঠাবান মুসলমান এবং প্রথমসারির সাহাবি ছিলেন। তার এই অস্বস্তিকর কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হওয়ার কারণ ছিল তার পরিবার-পরিজনের মক্কায় থাকা। তারা একেবারে নিঃস্ব অবস্থায় দিনাতিপাত করছিল। আত্মীয়স্বজনরাও তাদেরকে কোনো সহায়তা করছিল না। কুরাইশরা মুসলমানদের আক্রমণ করতে দেখে তার স্ত্রী-পুত্রের উপর চড়াও হয় কিনা তিনি এই আশঙ্কা করছিলেন। এজন্য কুরাইশদের এই তথ্য দিয়ে তাদের রোষানল থেকে বাঁচার চেষ্টা করেন। আল্লাহ তায়ালা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই তথ্য জানিয়ে দেন।

---

৭২৩. আলবিদায়া ওয়ান নিহায়া : ৬/৫১৯

৭২৪. আলবিদায়া ওয়ান নিহায়া : ৬/৫৬০

তখন হজরত আলি, হজরত যুবাইর, হজরত মিকদাদ বিন আসওয়াদ (রাদিয়াল্লাহু আনহুম)-কে সেই মহিলার পেছনে পাঠান। তারা ঘোড়া ছুটিয়ে মদিনার পার্শ্ববর্তী এলাকা 'রাওযাতু খাখ'-এ[৭২৫] সেই মহিলাকে পেয়ে যান। তার কাছে হাতিব রাদিয়াল্লাহু আনহুর চিরকুটও পাওয়া যায়। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করেন। তখন তিনি মক্কায় তার পরিবারের বন্দিজীবনের অনুযোগ করেন এবং ওজর পেশ করে বলেন, 'মক্কায় আমার কোনো আত্মীয়স্বজন নেই। আমি মক্কাবাসীদের উপর কোনো অনুগ্রহ করে আমার পরিবারের প্রতি তাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে চেয়েছিলাম।'

উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তার ওজর সন্তোষজনক মনে করেননি। ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়ে তিনি বলেন, 'ইয়া রাসুলাল্লাহ, অনুমতি দিন আমি এই মুনাফিকের গর্দান উড়িয়ে দিই।' কিন্তু নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাতিব রাদিয়াল্লাহু আনহুর পূর্ববর্তী অবদান বিশেষ করে গাজওয়ায়ে বদরে অংশগ্রহণের কারণে তাকে ক্ষমা করে দেন। হজরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বলেন, উমর, তোমার কি জানা আছে, আল্লাহ তায়ালা বদরযুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের উদ্দেশ করে বলেছিলেন, তোমাদের যা মন চায়, করো। আমি তোমাদের গুনাহ মাফ করে দিয়েছি?[৭২৬]

মক্কায় অতর্কিত আক্রমণ

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ১০ হাজার জানবাজ যোদ্ধার এক বিশাল বাহিনী নিয়ে ৮ হিজরির ১০ রমজান মদিনা থেকে রওনা হন।[৭২৭] এই সফর প্রচণ্ড গরমের মৌসুমে ছিল। রমজানের রোজাও রেখেছিলেন। সফরের গতিও দ্বিগুণ করা হয়েছিল। যেহেতু মুসাফিরদের রোজা না রাখার সুযোগ আছে, তাই নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকে রোজা না রাখতে বললেন। 'তোমরা শত্রুর মোকাবেলায় সবল থাকো।' কিন্তু রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে রোজা ত্যাগ করেননি।[৭২৮]

কিছু সাহাবি রোজা না রাখার নির্দেশ পাওয়ার পরেও রোজা রাখলেন। তাদের কাছে ভালো ঠেকছিল না যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন

---

৭২৫. রাওযাতু খাখ মদিনা থেকে এক মঞ্জিল দূরে যুলহুলাইফার নিকটবর্তী ওয়াদি আকিকের সীমানায় অবস্থিত। [ওয়াফাউল ওয়াফা : ৪/৬৬; আলমাআলিমুল আসিরা, পৃষ্ঠা ১০৭]

৭২৬. সহিহ বুখারি : হাদিস নং ৩০০৭ (কিতাবুল জিহাদ, বাবুল জাসুস), তাফসিরে ইবনে কাসির, সুরা মুমতাহিনা, আয়াত ১-৪

৭২৭. আলবিদায়া ওয়ান নিহায়া : ৬/৫২৭

৭২৮. সুনানে আবু দাউদ : হাদিস নং ২৩৬৫; কিতাবুস সাওম, সনদ সহিহ।

(أمر الناس في سفره عام الفتح بالفطر وقال: تقووا لعدوكم، وصام رسول الله صلى الله عليه وسلم.)

কষ্ট সহ্য করবেন আর তারা পানাহার করবে? আলআরাজ নামক স্থানে এসে যখন যাত্রাবিরতি দেওয়া হয়, তখন নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পিপাসা কিংবা তীব্র গরমের কারণে মাথায় পানি ঢালতে লাগলেন। নবীজির কষ্ট দেখে কিছু সাহাবি কামনা করছিলেন তিনি যেন রোজা ভেঙে ফেলেন। তারা আরজ করলেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ, আপনার রোজা রাখার কারণে কিছু কিছু সাহাবিও রোজা রেখেছেন।'

তদুপরি তিনি রোজা রাখতে থাকেন। যখন মক্কার ৯০ কিলোমিটার দূরত্বে পৌঁছে যান, তখন 'কাদিদের' খেজুর বাগানে ডেরা ফেলেন এবং এক বাটি পানি আনিয়ে সবার সামনে পান করেন। এটা দেখে সবাই রোজা রাখা ত্যাগ করেন।[৭২৯]

৭২৯.

(عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الناس في سفره عام الفتح بالفطر، وقال : تقووا لعدوكم، وصام رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر : قال الذي حدثني : لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعرج يصب على رأسه الماء من العطش أو من الحر، ثم قيل لرسول الله : إن طائفة من الناس قد صاموا حين صمت قال : فلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكديد، دعا بقدح، فشرب، فأفطر الناس) أخرجه مالك في الموطأ : باب ما جاء في الصيام في السفر)

مالك بن أنس عن سُمَيّ عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعرج يصب على رأسه من الماء من الحر وهو صائم [المستدرك للحاكم: رقم الحديث: ١٥٧٨]

আলআরাজ : মদিনা যাওয়ার প্রধান রাস্তা মক্কার তৃতীয় মঞ্জিল এবং আররাওহা এবং আবওয়ার মধ্যবর্তী স্থান। [আহসানুত তাকাসিম ফি মা'রিফাতিল আকালিম, পৃষ্ঠা ১০৬, মু'জামু মাসতা'জাম..., আবু উবাইদ আলবাকরি আলআন্দালুসি : ৩/৯৩০]

মদিনা থেকে তার দূরত্ব ১১৩ কিলোমিটার। [আলমাআলিমুল আসিরাহ, মুহাম্মদ বিন হাসান শুররাব, পৃষ্ঠা ১১৮]

কাদিদ : মক্কা থেকে তার দূরত্ব ৯০কিলোমিটার। [আলমাআলিমুল আসিরাহ, পৃষ্ঠা ২৩১]

মক্কা বিজয়ের সময়কাল

উল্লিখিত সহিহ হাদিসগুলো থেকে প্রমাণিত হয় যে, মক্কাবিজয় প্রচণ্ড গরমের মৌসুমে সংঘটিত হয়েছে। এটি মাদানি রমজানে হতে পারে না। কারণ, ৮ম হিজরির রমজান মাস হয় ২২ ডিসেম্বর ৬২৯ খ্রিষ্টাব্দ তথা তীব্র শীতের মৌসুমে। নিঃসন্দেহে এটি মক্কি রমজান ছিল, যা ২০ মে থেকে ১৭ জুন ৬৩০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত স্থায়ী হয়। মাদানিপঞ্জিকা অনুযায়ী এটি ৯ হিজরির সফর মাস ছিল।

আরো চিন্তাফিকিরের জন্য পেছনে দেখে আসতে পারেন, মুতাযুদ্ধ মাদানি জুমাদাল উলা মাসে হয়েছে (আগস্ট-সেপ্টেম্বরে ৬২৯ খ্রিষ্টাব্দ)। এরপর প্রচণ্ড শীতের মৌসুম তথা ফেব্রুয়ারি ৬৩০ খ্রিষ্টাব্দে যাতুস সালাসিল অভিযানে প্রেরণ করেন। এটাকে ঐতিহাসিকগণ ৮ম হিজরির জুমাদাল আখিরার অভিযান বলে উল্লেখ করেন। অবশ্যই তা মক্কি তারিখ ছিল।

অন্যদিকে মাদানি পঞ্জিকায় এটি ৮ হিজরির যিলকদ মাস ছিল অর্থাৎ ৮ হিজরির মাদানি রমজান যাতুস সালাসিলের পূর্বেই গত হয়ে গেছে। যা হোক, ঐতিহাসিকরা মক্কাবিজয়ের ঘটনা মক্কিপঞ্জিকা অনুসারে বর্ণনা করেন। এর থেকে বুঝা যায়, রমজানের রোজা মক্কিপঞ্জিকা মোতাবেকই রাখা হচ্ছিল। কারণ, সে অনুযায়ী প্রতিবছর রমজান গরম মৌসুমে (মে-জুন) পড়ছিল।

হজরত আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুর সঙ্গে সাক্ষাৎ

মুসলিম-বাহিনীর চলাফেরা ও গতিবিধি এত নীরবে ও দ্রুত হচ্ছিল যে, কুরাইশরা ঘুণাক্ষরেও টের পায়নি। মুসলমানরা দুই সপ্তাহের পথ এক সপ্তাহে অতিক্রম করে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচা আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুও তার অগ্রযাত্রার ব্যাপারে অনবহিত ছিলেন। ফলে তিনি তার পরিবার-পরিজন নিয়ে হিজরতের উদ্দেশ্যে ঘর থেকে বের হয়ে পড়েন। মক্কা থেকে ৮২ মাইল দূরে জুহফা নামক স্থানে মুসলমানদের বিশাল বাহিনী আসতে দেখে ভীষণ অবাক হন তিনি। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে দেখতে পেয়ে দারুণ খুশি হন এবং তাকে বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত করে নেন।[৭৩০]

আবু সুফিয়ান বিন হারিসের ইসলামগ্রহণ

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কার নিকটবর্তী 'মাররুয যাহরানে' এসে যখন ডেরা ফেলেন, তখন কুরাইশের হুঁশ হয় এবং তারা মক্কার দ্বারপ্রান্তে এত বড় বাহিনী দেখে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ে। এখানে একটি বিস্ময়কর ঘটনা ঘটে। কুরাইশের কট্টর নেতৃস্থানীয় দুই ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করে, দুজনের নামই ছিল আবু সুফিয়ান। একজন আবু সুফিয়ান বিন হারব, দ্বিতীয়জন আবু সুফিয়ান বিন হারিস।

আবু সুফিয়ান বিন হারিস ছিলেন বনু হাশিমের একজন নীতিনির্ধারক পর্যায়ের ব্যক্তি এবং নবীজির চাচাতো ভাই। শৈশব এবং যৌবনের বন্ধু। কবিতায় তার পাণ্ডিত্য ছিল। নবুওয়াতের ব্যাপারে খারাপ খারাপ কবিতা রচনা করে নবীজি ও মুসলমানদের খুব কষ্ট দিত। যা-ই হোক, তার দিলে ইসলামের সত্যতার বিশ্বাস পয়দা হয়। অতীতের কর্মের এত অনুশোচনা হয় যে, তার হৃদয় চৌচির হয়ে যাচ্ছিল। তিনি তার অল্পবয়সি এক সন্তানকে নিয়ে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তাঁবুতে গেলেন। তার আসার সংবাদ জানানো হলে তার দেওয়া আঘাতের কথা নবীজির মনে পড়ে যায়। তাই তিনি বলে দেন, 'আমি সাক্ষাৎ করতে চাই না।'

আবু সুফিয়ান এ কথা শুনে ব্যাকুল হয়ে বলতে থাকেন, 'আল্লাহর কসম করে বলছি! যদি নবীজি আমার সঙ্গে সাক্ষাতের অনুমতি না দেন, তা হলে আমি আমার ছোট বাচ্চাকে নিয়ে মরুভূমিতে চলে যাবো, সেখানেই ক্ষুধা-পিপাসায় মরে যাবো।'

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যখন এই কথা বলা হলো, তখন তিনি অস্থির হয়ে পড়েন এবং তাকে ভেতরে ডেকে নিয়ে কালিমা পাঠ করান। আবু

৭৩০. আলবিদায়া ওয়ান নিহায়া : ৬/৫২৭

সুফিয়ান বিন হারিস রাদিয়াল্লাহু আনহু তখন তার অতীত-অপরাধ মোচন করার জন্য অস্থির হয়ে ছিলেন।[৭৩১]

আবু সুফিয়ান বিন হারবের ইসলামগ্রহণ

ওদিকে আবু সুফিয়ান বিন হারব, যিনি ছিলেন কুরাইশের বিখ্যাত বীর এবং প্রখ্যাত সরদার। দুইজন সাথি নিয়ে ইসলামি বাহিনীর খোঁজ নেওয়ার জন্য বের হন। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশে সাহাবিরা তাঁবুর সামনে আলো জ্বালিয়ে রেখেছিলেন। মক্কাবাসীরা হাজার হাজার চেরাগের আলো দেখে সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছিল। আবু সুফিয়ানও এই দৃশ্য দেখে নিজের অজান্তেই সশব্দে বলে ফেলেন, 'এত বড় বাহিনী এবং এত আলো আমি কোনো দিন দেখিনি।' মুসলমানদের উচ্চ আওয়াজ রাতের নীরবতায় বহুদূর পৌঁছে যাচ্ছিল।

হজরত আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাহিনীতে শামিল হওয়ার পর খচ্চরের উপর সওয়ার হয়ে আশপাশে ঘোরাঘুরি করছিলেন। আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু আবু সুফিয়ানের কথা শুনে চিনে ফেলেন এবং উত্তর দেন, 'আরে আল্লাহর বান্দা, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ১০ হাজার মুসলমান নিয়ে এসেছেন। আজ তোমাদের তার মোকাবেলা করার কোনো সামর্থ্য নেই।' আবু সুফিয়ান বললেন, 'মুক্তির কোনো পথ আছে?'

আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু জানতেন কোনো মুসলমান যদি আবু সুফিয়ানকে দেখে ফেলে তা হলে তাকে বাঁচানো মুশকিল হয়ে যাবে। এজন্য তিনি তাকে আপন খচ্চরে বসিয়ে নেন এবং বহুদূর ঘুরে সোজা নবীজির দরবারে পৌঁছে যান। হজরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু আবু সুফিয়ানকে দেখে দৌড়ে আসেন এবং দুশমনদের সরদারের মাথা কেটে ফেলার অনুমতি চান।

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু সুফিয়ানের মতো সরদারকেও সফল মানুষ হিসেবে দেখতে চাচ্ছিলেন। তিনি তাকে ইসলামের দাওয়াত দিতে গিয়ে বললেন, 'আবু সুফিয়ান, এখনো কি তোমার এই সাক্ষ্য দেওয়ার সময় হয়নি যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই?'

আবু সুফিয়ান নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই আচরণ দেখে বিগলিত হয়ে যান। তিনি বলেন, 'আমার মাতা-পিতার আপনার জন্য উৎসর্গ হোক! আপনি কত মেহেরবান, দয়ার সাগর এবং কত মহানুভব! আল্লাহর কসম, আমি বুঝে ফেলেছি, আল্লাহ ছাড়া যদি কোনো ইলাহ থাকত, তা হলে আজ তা আমার নিশ্চিত কাজে আসত।' যেহেতু আবু সুফিয়ান একত্ববাদ চিনে

---

৭৩১. আলবিদায়া ওয়ান নিহায়া : ৬/৫৩২

গিয়েছেন, এজন্য নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চাইলেন তাকে দিয়ে কালিমায়ে শাহাদাত পড়িয়ে নেওয়া দরকার। তিনি বললেন, 'আমাকে আল্লাহর রাসুল হিসেবে মানার এখনও কি তোমার সময় হয়নি?'

আবু সুফিয়ান বলেন, 'নিঃসন্দেহে আপনি দরদি, মহানুভব ব্যক্তি, কিন্তু এ বিষয়ে এখনও আমার কিছু সংশয় রয়েছে।'

আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সব অবলোকন করছিলেন। তিনি বুঝতে পারছিলেন আবু সুফিয়ানের কাছে সত্য উদ্ভাসিত হয়ে গিয়েছে। কিন্তু স্রেফ তার নেতাসুলভ মানসিকতা আল্লাহর গোলামি এবং নবীর দরবারে আত্মসমর্পণ করতে বাধা দিচ্ছে। তাই তিনি তার শয়তানি কুমন্ত্রণা দূর করার জন্য বলেন, 'আল্লাহর বান্দা, তোমার গর্দান উড়িয়ে দেওয়ার পূর্বে ইসলাম তো গ্রহণ করো!' এ কথা অত্যন্ত কার্যকর ভূমিকা রাখে। ফলে আবু সুফিয়ানের মন থেকে সব কুমন্ত্রণা দূর হয়ে যায়। তৎক্ষণাৎ তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন।'[৭৩২]

সেই অবস্থানে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু আবু সুফিয়ানকে কোনো সম্মানে ভূষিত করার সুপারিশ করেন। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'অবশ্যই! যে ব্যক্তি আবু সুফিয়ানের ঘরে আশ্রয় নিবে, সে নিরাপদ থাকবে। যে ব্যক্তি হারামে আশ্রয় নিবে, সেও নিরাপত্তা পাবে এবং যে ব্যক্তি তার ঘরের দরজা বন্ধ করে রাখবে, সেও নিরাপদ থাকবে।'

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কথাটি এজন্য বললেন, যেন মক্কাবাসী প্রাণভয়ে বিচলিত না হয়ে পড়ে। কারণ, মানুষ অনেক সময় জান বাঁচানোর জন্যও যুদ্ধ করতে বাধ্য হয়। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সবার জীবনের নিরাপত্তার জন্য কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। মুসলমানরা যেন কোনো সংঘর্ষ ছাড়াই মক্কায় প্রবেশ করতে পারেন এবং এই পবিত্র ভূমি রক্তরঞ্জিত না হয়, সে ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।[৭৩৩]

মুসলিম-বাহিনীর দর্শনলাভ

৮ হিজরির ১৭ রমজান (৭ জানুয়ারি, ৬৩০ খ্রিষ্টাব্দ) যখন মুসলিম-বাহিনী মক্কায় প্রবেশের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করে, তখন নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশে হজরত আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু আবু সুফিয়ানকে (রাদিয়াল্লাহু আনহু) নিয়ে সৈন্যদের অতিক্রম করার পথে একটি পাহাড়ি চৌকিতে দাঁড়িয়ে যান, যাতে করে পুরো বাহিনীর দৃশ্য অবলোকন করা যায়।

---

৭৩২. সিরাতে ইবনে হিশাম : ৪/ ৪০২, ৪০৩

৭৩৩. সিরাতে ইবনে হিশাম : ৪/৪০৩

কিছুক্ষণ পরই মুসলিম-বাহিনীর বিভিন্ন প্লাটুন স্ব-স্ব কবিলার ঝান্ডা ধারণ করে তাদের সামনে দিয়ে অগ্রসর হতে থাকে। আবু সুফিয়ান প্রত্যেক দলকে দেখে জিজ্ঞেস করতে থাকেন, 'এটি কোন দল?' আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু প্রত্যেক কবিলার নাম বলতেই আবু সুফিয়ান জিজ্ঞেস করতেন, 'তাদের কী উদ্দেশ্য?' অবশেষে মুহাজির ও আনসারদের সঙ্গে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আগমন করেন। হজরত আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু তাদের সম্পর্কে বলার পর আবু সুফিয়ান রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, 'বলো তো, এদের সঙ্গে কে লড়াই করে পারবে? আব্বাস, তোমার ভাতিজা তো বাদশাহ হয়ে গেছে!'

হজরত আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, 'আল্লাহর বান্দা, এটা বাদশাহি নয়; নবুওয়াত।'

তারপর আবু সুফিয়ান খুব দ্রুত মক্কাবাসীদের মাঝে ঘোষণা করে দেন, 'যে ব্যক্তি আমার ঘরে প্রবেশ করবে, কিংবা নিজের ঘরের দরজা বন্ধ করে ভেতরে অবস্থান করবে কিংবা হারাম শরিফে আশ্রয় নিবে, সে নিরাপদ থাকবে।' মক্কাবাসী এই ঘোষণা শুনে আর বিলম্ব করেনি, প্রায় সকলেই নিরাপদ আশ্রয় গ্রহণ করে। তবে সাফওয়ান বিন উমাইয়াসহ কিছু লোক দুঃসাহস দেখিয়ে মক্কায় প্রবেশকারী যে প্লাটুন হজরত খালেদ বিন ওয়ালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহুর নেতৃত্বে অগ্রসর হচ্ছিল, তাকে আটকে দেওয়ার চেষ্টা করে। খালেদ রাদিয়াল্লাহু আনহু পালটা আক্রমণ করলে কিছু লোক নিহত হয়। বাকিরা ভেগে যায়। এই সামান্য যুদ্ধ ছাড়া নিরাপত্তা পরিপন্থি কোনো সংঘর্ষ হয়নি।

বিজয়ীবেশে মক্কায় প্রবেশ

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মক্কায় প্রবেশ করেন, তখন অতীতের বিভিন্ন চিত্র এক-এক করে ভেসে উঠছিল। এটা সেই ভূমি, যেখানে তিনি জন্মগ্রহণ করেছেন, বেড়ে উঠেছেন, ইজ্জত ও সম্মানের সঙ্গে যৌবন কাটিয়েছেন, এরপর নবুওয়াতপ্রাপ্ত হওয়ার পর তার দায়িত্ব পালন করতে পুরো শহরবাসীর রোষানলে পড়েছেন। কুরাইশের প্রতিটি জুলুমের কথা তার স্মরণ ছিল। তাদের নিপীড়নে জর্জরিত হয়ে সাথিদের নিয়ে দেশত্যাগে বাধ্য হন।

আজ তার সেই মাতৃভূমিতে পা রেখেছেন বিজয়ীর বেশে। এত বড় বিজয় অর্জন করা সত্ত্বেও পৃথিবীর অন্যান্য বিজয়ীর মতো তিনি গর্ব-অহংকারে ফুলে-ফেঁপে ওঠেননি। তিনি আল্লাহর কুদরতের সামনে অক্ষমতা এবং বিনয়াবনত হয়েছিলেন। শোকরগোজারি করার জন্য আল্লাহর কুদরতি পায়ে সেজদাবনত হয়েছিলেন।

দয়ার আধার রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সোজা হারাম শরিফে প্রবেশ করে সওয়ারির উপরে থেকেই তাওয়াফ করতে থাকেন। নবীজির হাতে একটি ছড়ি ছিল। তিনি তাওয়াফ-করা অবস্থায় কাবা-চত্বরে স্থাপিত মূর্তিগুলোর দিকে ছড়ি দিয়ে ইশারা করতেই তা মাটিতে পড়ে যাচ্ছিল। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন মুখে এই আয়াত তেলাওয়াত করছিলেন,

جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا

> সত্য এসে গেছে এবং মিথ্যা বিলুপ্ত হয়েছে, নিশ্চয় মিথ্যা বিলুপ্ত হওয়ার ছিল।[৭৩৪]

এরপর তিনি কাবার চাবি-রক্ষক উসমান বিন তালহা রাদিয়াল্লাহু আনহুর নিকট থেকে চাবি নিয়ে কাবার দরজা খুললেন। কাবা শরিফের অভ্যন্তরীণ দেয়ালে মুশরিকদের তৈরি হজরত ইবরাহিম আলাইহিস সালাম এবং ফেরেশতাদের প্রতিকৃতি দৃষ্টিগোচর হয়। তখন নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশে সাহাবায়ে কেরাম সেইসব ছবি মুছে ফেলেন। তিনি ভেতরে নামাজ আদায় করেন। কুরাইশের লোকেরা কাবা-চত্বরে জমায়েত হয়েছিল। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাবার দরজায় দাঁড়িয়ে সবাইকে সম্বোধন করে বলেন, 'আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। তিনি এক। তার কোনো শরিক নেই। তিনি তার প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন করে দেখিয়েছেন। তিনি তার বান্দাদের সাহায্য করেন এবং শত্রুবাহিনীকে তিনিই পরাস্ত করেন। আজ জাহিলিয়াতের গর্ব-অহংকার এবং রক্তপাত আমার পায়ের নিচে দলিত। কুরাইশের লোকেরা, আল্লাহ তোমাদের জাহিলিয়াতের সেই গর্ব-অহংকার ধূলিসাৎ করে দিয়েছেন। সবাই আদমসন্তান, আর আদমকে মাটি দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছে।'

সংক্ষিপ্ত খুতবা প্রদান করার পর কুরাইশ সরদারদের লক্ষ করে বললেন, 'বলুন তো, আপনাদের সঙ্গে আমি কী ব্যবহার করতে পারি?'

কুরাইশ সরদারদের সকল অপরাধ তাদের স্মরণে ছিল। কিন্তু নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দয়া ও মহানুভবতার প্রতি তাদের আস্থা ছিল। ফলে তারা কাতরস্বরে বলে, 'আমরা উত্তম আচরণ আশা করছি। আপনি একজন দয়াশীল এবং দয়াশীল ব্যক্তির বংশধর।'

নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন উদারচিত্তে ঘোষণা দেন, 'যাও, তোমরা সবাই মুক্ত!'[৭৩৫]

---

৭৩৪. সুরা ইসরা, আয়াত ৮১

৭৩৫. সিরাতে ইবনে হিশাম : ২/৪০৯-৪১২

হত্যা করতে এসে জানবাজে পরিণত

কুরাইশের অতি উৎসাহী তরুণদের মধ্যে তখনও কেউ কেউ ইসলাম গ্রহণ করার ব্যাপারে ইতস্তত করছিল। কিন্তু সত্য থেকে কতদিন চোখ বন্ধ করে রাখা যায়! তা ছাড়া রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অকৃত্রিম ও অমায়িক চরিত্র তাদের চোখের সামনেই ছিল। তাই বেশি সময় যেতে হলো না। কিছুদিনের মধ্যেই তারা সকলে ইসলাম গ্রহণ করে।

তাদের মধ্যে একজন ছিল ফাযালা বিন উমাইর। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হত্যার উদ্দেশ্যে সে ঘর থেকে বের হয়। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন কাবা শরিফ তাওয়াফ করছিলেন। সে খুব কাছাকাছি পৌঁছে যায়। নবীজি ফাযালাকে দেখে নাম ধরেই সম্বোধন করে বললেন, 'ফাযালা না?' সে অনিচ্ছাসত্ত্বেও উত্তর দেয়, 'হ্যাঁ'।

বললেন, 'মনে মনে কী ভাবছো?'

ফাযালা ঘাবড়ে গিয়ে বলে, 'না না, কিছু না।'

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হেসে বললেন, 'আল্লাহর কাছে মাফ চাও।' এটুকু বলে তিনি অত্যন্ত স্নেহপরবশ হয়ে তার বুকে হাত রাখলেন। এতে করে অন্তরের কম্পন স্থিতি লাভ করে। সাথে সাথে তার দিলের অবস্থা পালটে যায়। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি তার মহব্বত এত বৃদ্ধি পায় যে, তিনিই হয়ে যান তার সবচেয়ে প্রিয় ব্যক্তিত্ব।[৭৩৬]

তাদের মধ্যে আবু সুফিয়ান বিন হারবের স্ত্রী হিন্দ বিনতে উতবাও ছিল। সে তো শুরুতে তার স্বামীর ইসলামগ্রহণের কারণে প্রচণ্ড ঝগড়ায় লিপ্ত হয়। কিন্তু যখন রাতেরবেলা হারাম শরিফে ইবাদতকারী মুসলমানদের কান্নাকাটি শুনতে পায়, তখন তার দিল সাক্ষ্য দেয়, এই লোকগুলো সত্যিই প্রকৃত মাবুদের ইবাদত করছে। এরপরই হিন্দ মুসলমান হয়ে যান।

তাদের মধ্যে আরেকজন ছিল সাফওয়ান বিন উমাইয়া। মুসলমানরা মক্কায় প্রবেশের সময় সে সশস্ত্র প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল। সেই অভিযানে ব্যর্থ হয়ে সে ভীষণ মর্মাহত হয়। প্রচণ্ড ক্ষোভে জেদ্দা নৌবন্দরের দিকে রওনা হয়ে যায়। তার পুরোনো বন্ধু উমাইর বিন ওয়াহব রাদিয়াল্লাহু আনহু নবীজির থেকে তার জন্য বিশেষভাবে নিরাপত্তা হাসিল করেন এবং তার পশ্চাতে ছুটে যান। কিন্তু তার পৌঁছার পূর্বেই সাফওয়ান নৌকায় উঠে গিয়েছিল। তখন উমাইর বিন ওয়াহব রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, 'আমার প্রিয় বন্ধু, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ থেকে তোমার জন্য নিরাপত্তার সুসংবাদ নিয়ে এসেছি।

৭৩৬. আলবিদায়া ওয়ান নিহায়া : ৬/৫৮৪

তাই তুমি নিজেকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিও না।'

সাফওয়ান তখন আশঙ্কা প্রকাশ করে, 'আমি নিজেকে প্রাণে মেরে ফেলার ভয় করছি।'

উমাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, 'নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমার ধারণার চেয়েও সম্মানিত এবং অত্যন্ত মহানুভব ব্যক্তি।'

হজরত উমাইর বিন ওয়াহব সাফওয়ানকে ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হন। সাফওয়ান নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হয়ে ইসলামগ্রহণের জন্য ফিকির করতে দু'মাস সময় চায়। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে চার মাস সময় দেন। সাফওয়ান ভাবতে থাকে, অবশেষে গাজওয়ায়ে হুনাইনের পর তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন।[৭৩৭]

ইকরিমা বিন আবু জাহল ইয়ামানের দিকে পালিয়ে যায়। কিন্তু যখন নৌকা ঝড়ের কবলে পড়ে তখন সবার মুখ দিয়ে 'আল্লাহ আল্লাহ জপ আসতে লাগে।' অন্যান্য মাবুদ কোনো উপকারে আসেনি। ইকরিমা তখন প্রতিজ্ঞা করে, যদি বেঁচে যাই তা হলে ইসলাম গ্রহণ করব। পরিশেষে নৌকা ইয়ামান উপকূলে গিয়ে ভিড়ে। এদিকে ইকরিমার স্ত্রীর উম্মে হাকিম রাদিয়াল্লাহু আনহা (যিনি আগেই মুসলমান হয়েছিলেন) তার পিছু পিছু ইয়ামান পৌঁছে যান। স্বামীকে অভয় দিয়ে মক্কায় ফিরিয়ে আনেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে দাঁড়িয়ে স্বাগত জানান। ইকরিমা ইসলামগ্রহণের পর একজন জানবাজ মুজাহিদ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন।[৭৩৮]

জীবন-মরণ একসাথেই

আল্লাহর ঘর শিরকের সকল আলামত থেকে পবিত্র হয়ে গিয়েছিল। তাওহিদের প্রাণকেন্দ্রে পরিণত হওয়ার সব ব্যবস্থা সম্পন্ন হয়েছিল। কুরাইশের বড় বড় সরদার এবং ইসলামের ঘোর শত্রুরা একের পর এক মুসলমান হচ্ছিল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন মক্কাবাসীরও প্রধান নেতায় পরিণত হয়েছিলেন। অবস্থাপরিদৃষ্টে যদি কেউ ভাবে নবীজি হয়তো মক্কাকে স্থায়ী বাসস্থান এবং ইসলামি হুকুমতের প্রধানকেন্দ্র হিসেবে স্বীকৃতি দেবেন; তা হলে এতে বিস্মিত হওয়ার কিছু নেই। কিছু কিছু আনসারি সাহাবি পরস্পরে এই কথার আলোচনা করছিলেন। কারণ, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ধারাবাহিক পদক্ষেপগুলোও এদিকে ইঙ্গিত করছিল।

---

৭৩৭. আলবিদায়া ওয়ান নিহায়া : ৬/৫৮৭

৭৩৮. মুওয়াত্তা মালেক, কিতাবুন নিকাহ, বাবু নিকাহিল মুশরিক; মুসতাদরাকে হাকিম, হাদিস নং ৫০৫৬

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাফাপাহাড়ে দোয়ায় মশগুল ছিলেন। আর ওই আনসাররা তাদের ধারণায় অটল হয়ে এ ব্যাপারে তার সিদ্ধান্ত জানার অপেক্ষায় ছিল। নবীজি ওহীর মাধ্যমে তাদের এই সংশয়ের কথা জানলেন। তাই দোয়া শেষ করে তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন, 'তোমরা কী বলছিলে?' তারা বলল, 'কিছু নয় ইয়া রাসুলাল্লাহ।'

কিন্তু নবীজি বার বার জিজ্ঞাসার কারণে নিজেদের মনের সংশয়ের কথা বলে দেয়। তখন তিনি তার এই আত্মত্যাগী সাথিদের উৎসাহ বৃদ্ধির লক্ষ্যে আবেগের আতিশয্যে বলেই ফেলেন, 'নাউজুবিল্লাহ! এটা কখনোই হবে না। জীবন-মরণ তোমাদের সঙ্গেই হবে।'[৭৩৯]

মক্কা বিজয়ের পরপরই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পার্শ্ববর্তী এলাকাগুলো পদানত করা, শিরকের প্রাচীন কেন্দ্রগুলো গুঁড়িয়ে দেওয়ার প্রতি মনোনিবেশ করেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশে হজরত খালেদ বিন ওয়ালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু নাখলা নামক স্থানে উজ্জা প্রতিমাকে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিয়ে আসেন।[৭৪০]

***

৭৩৯. সহিহ মুসলিম : হাদিস নং ৪৭২২ (কিতাবুল জিহাদ, বাবু ফাতহি মাক্কাহ); সহিহ ইবনে হিব্বান : হাদিস নং ৪৭৬০, সিরাতে ইবনে হিশাম : ৬/৪১৬

৭৪০. আলবিদায়া ওয়ান নিহায়া : ৬/৬০৭; আলকামিল ফিত তারিখ : ২/১৩২ (৮ হিজরির ঘটনাবলির অধীনে)

গাজওয়ায়ে হুনাইন

মক্কা বিজয়ের খবর আরবের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। জাজিরাতুল আরবে তখন ইসলাম এক অপরাজেয় ও অপ্রতিরোধ্য শক্তিতে পরিণত হয়। কিন্তু কুফর ও শিরকের তূণীরে তখনও কয়েকটি তির অবশিষ্ট ছিল। তায়েফের নিকটবর্তী বসতি বনু হাওয়াজিনের লোকদের বীরত্ব এবং লড়াইয়ের খুব খ্যাতি ছিল। তারা মক্কার বিজয়ী বাহিনীর সঙ্গে লড়াই করার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিল। হাওয়াজিনের সরদার আওফ বিন মালিক তার কবিলার সাথে বনু সাকিফ, বনু সাদ, নাসর, জুশমের মতো যুদ্ধবাজ কবিলাগুলোকেও একীভূত করতে সক্ষম হয়। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কায় আঠারো দিন অবস্থান করেন। এ সময় নবীজির কাছে বনু হাওয়াজিন ও তার মিত্রদের যুদ্ধপ্রস্তুতির সংবাদ আসতে থাকে।

নবীজির নির্দেশে হজরত আবদুল্লাহ বিন হাদরাদ রাদিয়াল্লাহু আনহু সেখানে গুপ্তচর হিসেবে যান এবং তাদের সামরিক শক্তি ও সার্বিক প্রস্তুতি সম্পর্কে এমন প্রত্যক্ষ বর্ণনা দেন, যা সবার কল্পনাতীত ছিল। মদিনার বিজয়ী বাহিনী যদি ফিরে গিয়ে পূর্ণপ্রস্তুতি নিয়ে আসে, তখন পরিস্থিতি সম্পূর্ণ বেগতিক হয়ে পড়বে। তাই কালবিলম্ব না করে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেনাবাহিনী বিন্যস্ত করেন। সাফওয়ান বিন উমাইয়া থেকে এই বলে একশ লৌহবর্ম ধার নেন যে, তিনি নিজ দায়িত্বে তা ফিরিয়ে দেবেন।[৭৪১]

৮ হিজরির ৫ শাওয়াল ১২ হাজার সৈন্যের এক বিশাল বাহিনী নিয়ে মক্কার দক্ষিণ-পূর্ব দিকে রওনা হন।[৭৪২] তাদের মধ্যে ১০ হাজার মক্কা বিজয়ে অংশগ্রহণ করেছিলেন।[৭৪৩] আর ২ হাজার মক্কা বিজয়ের পর ইসলাম গ্রহণ করেন।[৭৪৪]

মুসলিম-বাহিনী অত্যন্ত খোশমেজাজ এবং নিশ্চিন্তে অগ্রসর হচ্ছিল। মুসলমানদের ধারণা ছিল দুশমন তাদের দেখে আতঙ্কে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করবে। আর যদিও তারা

---

৭৪১. আলবিদায়া ওয়ান নিহায়া : ৭/১০, ১১

৭৪২. আলবিদায়া ওয়ান নিহায়া : ৭/১৩

৭৪৩. সহিহ বুখারি : হাদিস নং ৪৩৩৭ (কিতাবুল মাগাজি, বাবু গাজওয়াতিত তায়িফ)

৭৪৪. জাওয়ামিউস সিরাতিন নাবাবিয়্যা, ইবনে হাযম, পৃষ্ঠা ১৮৯।
মক্কাবিজয়ের সময় ইসলাম গ্রহণকারীদের 'তুলাকা' বলে অভিহিত করা হয়।

সংঘর্ষে লিপ্ত হয়, তারপরও বিজয় অর্জন করতে বেশি বেগ পেতে হবে না। এই ধারণা অসঙ্গত ছিল না। কারণ, কয়েক বছর যাবৎ মুসলমানদের সংখ্যাস্বল্পতার পরেও তারা বড় বড় বাহিনীকে পরাস্ত করতে পেরেছে আর এখন তো তারা আরবের সবচেয়ে বড় সৈন্যবাহিনীতে পরিণত হয়েছেন।

দ্বিপ্রহরে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাত্রাবিরতি নেওয়ার নির্দেশ দিয়ে জোহর নামাজের প্রস্তুতি নিতে থাকেন। এ সময় গুপ্তচর-মারফত সংবাদ আসে, ওই পেশাদার জঙ্গি কবিলাগুলো তাদের গবাদি পশুপালসহ হুনাইনের পাহাড়ে গিয়ে মোর্চা তৈরি করছে। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রসিকতা করে বললেন, 'সবকটি মুসলমানদের গনিমতের মাল হবে।'

শত্রু বেশি দূরে ছিল না; তাই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতে ঘুমানোর পূর্বে বাহিনীর চারপাশে অশ্বারোহীদের দ্বারা কড়া প্রহরার ব্যবস্থা করেন, যেন হাওয়াজিনরা রাতে অতর্কিত হামলা করে রক্ত ঝরাতে না পারে।[৭৪৫] এটি ১৪ শাওয়ালের ঘটনা।[৭৪৬]

পরবর্তী দিন (১৪ শাওয়াল) দুশমনের মুখোমুখি হলো। হাওয়াজিনের অসংখ্য তিরন্দাজ সেই পাহাড়ের মোর্চা এবং গুহায় পজিশন নিয়ে বসে ছিল। মুসলমানরা যখনই তাদের আওতার মধ্যে এসে গেল, সঙ্গে সঙ্গে তারা তির বর্ষণ শুরু করে দেয়। মুসলমানরা এর জন্য প্রস্তুত ছিল না। তাদের মধ্যে ছুটোছুটি আরম্ভ হয়ে গেল। এরই মধ্যে হাওয়াজিনদের অশ্বারোহী বাহিনী তাদের উপর হামলা করে। মুসলিমরা তাদের আক্রমণের ধকল সইতে না পেরে অকাতরে মারা পড়তে থাকে। এই সময় হজরত আলি, হজরত আবু সুফিয়ান বিন হারিস, ফজল বিন আব্বাস, উসামা বিন যায়েদ আর তার ভাই আইমান (রাদিয়াল্লাহু আনহুম) নবীজিকে ঘিরে রেখেছিলেন।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলমানদের এই ছত্রভঙ্গ অবস্থা দেখে তাদেরকে বুলন্দ আওয়াজে একত্র করার চেষ্টা করছিলেন। তিনি বলছিলেন, 'হে লোকসকল, তোমরা কোথায় যাচ্ছো? এদিকে এসো! আমি আল্লাহর রাসুল।' এ কথা বলে নবীজি তার খচ্চরের উপর সওয়ার হয়ে সামনে অগ্রসর হচ্ছিলেন।

আবু সুফিয়ান বিন হারিস রাদিয়াল্লাহু আনহু তার খচ্চরের লাগাম ধরে সঙ্গে সঙ্গে দৌড়াচ্ছিলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন এই পঙ্ক্তি আবৃত্তি করছিলেন,

৭৪৫. আলবিদায়া ওয়ান নিহায়া : ৭/১৩, ১৪

৭৪৬. তাবাকাতে ইবনে সা'দ : ২/১৫১।
এটি ১৩ শাওয়াল (মক্কি) ৮ হিজরি মোতাবেক ৩০ জুন ৬৩০ খ্রিষ্টাব্দ ছিল।

أنا النبي لا كذب * أنا ابنُ عبدِ المطّلب

আমি মিথ্যা নবী নই, আমি আবদুল মুত্তালিবের বংশধর।[৭৪৭]

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশে হজরত আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু আনসারদের আহ্বান করতে থাকেন, 'হে আনসারগণ, হে বৃক্ষের নিচে বাইয়াত গ্রহণকারীরা!' তিনি উচ্চৈঃস্বরের অধিকারী ছিলেন। এই সময় তার আওয়াজ বহুদূর পর্যন্ত পৌঁছে যায়। আনসাররা তখন 'লাব্বাইক, লাব্বাইক' বলে ফিরে আসতে থাকে। যেসব আরোহীর সওয়ারি ফিরে আসতে চাচ্ছিল না, তারা নেমে পায়ে হেঁটে নবীজির নিকট দৌড়ে আসতে লাগল। এর ফলে তার আশপাশে দু'শোর মতো লোক জমায়েত হয়ে যায়। নবীজি তাদেরকে নিয়েই শত্রুর উপর পালটা আক্রমণ করেন।

মুসলমান ও কাফের তখন একাকার হয়ে যায়। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একে অপরের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ার দৃশ্য দেখে বললেন, 'হ্যাঁ, এবার যুদ্ধের ময়দান উত্তপ্ত হয়েছে।' বেশিক্ষণ অতিবাহিত হয়নি, ইতোমধ্যে বনু হাওয়াজিনের হিম্মত নেতিয়ে পড়ে। তাদের অনেকেই নিহত হয়। অন্যরা পালিয়ে যায়। তাদের নেতা আউফ বিন মালিকও পালাতে সক্ষম হয়। পরাজিত বাহিনীর উট-বকরির পাল মুসলমানরা গনিমত হিসেবে লাভ করেন।[৭৪৮]

তায়েফ অবরোধ

হাওয়াজিন এবং তাদের মিত্ররা মাঠে পরাজিত হলেও দ্বিতীয় স্তরটি তখনও বাকি ছিল। হাওয়াজিন-সরদার আউফ বিন মালিক অবশিষ্ট যোদ্ধাদের নিয়ে পিছু হটে তাদের প্রাচীর-বেষ্টিত নগরী তায়েফে মোর্চা বানিয়ে অবস্থান নেয়। তায়েফ ছিল সমগ্র আরবের সবচেয়ে সুরক্ষিত দুর্গ। এবং দুর্গটি পর্বতমালা-বেষ্টিত থাকার কারণে তায়েফ আক্রমণ করা বড়ই মুশকিল কাজ ছিল। কারণ, বহিঃআক্রমণকারীরা প্রাচীরের অপর পার্শ্বে থাকা তিরন্দাজদের তিরের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হতো। অপরদিকে এ পাশের তির ওপাশে গিয়ে পৌঁছত না।

এই সমস্যাগুলো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জানা ছিল। তিনি গাজওয়ায়ে হুনাইনের পূর্বেই হজরত উরওয়া বিন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহুসহ কিছু কিছু সাহাবিকে অবরোধের হালকা সরঞ্জাম যেমন মিনজানিক, তোপ-কামান সংগ্রহ করা এবং সেসব অস্ত্রশস্ত্র তৈরির কৌশল শিখে আসার জন্য

৭৪৭. সহিহ বুখারি : হাদিস নং ৪৩১৭ (কিতাবুল মাগাজি, বাবু কাউলিল্লাহি : ওয়াউমি হুনাইন ইয আ'জাবাতকুম)

৭৪৮. আলবিদায়া ওয়ান নিহায়া : ৭/২০-২৮; সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ : ৫/৩১৮

ইয়ামানের অস্ত্র-পল্লি জুরাশে পাঠান। তখনও সেই সাহাবিরা এই শিল্প আয়ত্ত করে ফিরে আসেননি।

সর্বোপরি শত্রুকে অধিক সুযোগ দেওয়াটা সমীচীন ছিল না। তাই তায়েফের দিকে সেনাবাহিনী রওনা হয়ে যায়। নগরীর নিকটে পৌঁছার পর তাঁবু স্থাপন করা হয় এবং প্রাচীরের চারপাশ ঘিরে ফেলা হয়।[৭৪৯]

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রক্তপাত এড়ানোর জন্য ঘোষণা দেন যে, নগরবাসীর যারাই বাইরে এসে পড়বে, তারা নিরাপদ থাকবে। যেসব গোলাম আমাদের নিকট পালিয়ে আসবে, সে আজাদ গণ্য হবে। এই ঘোষণার পর কিছু গোলাম পালিয়ে চলে আসে। তন্মধ্যে নুফাই বিন মাসরুক নামের এক গোলাম চরকার উপর রশি লাগিয়ে তাতে ঝুলে দেয়াল পার হতে সক্ষম হন। মুসলিম-বাহিনীতে এসে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। আরবিতে চরকাকে 'বাকরা' বলা হয়। তাই তিনি আবু বাকরা উপনামে প্রসিদ্ধ হয়ে যান। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার প্রতিশ্রুতি মোতাবেক তাকে আজাদ করে দেন।[৭৫০]

যুদ্ধ ভয়াবহ আকার ধারণ করে। তায়েফের অবরুদ্ধ তিরন্দাজরা মুসলমানদের অগ্রসর হতে দিচ্ছিল না। কিছু মুজাহিদ আহত ও শহিদ হয়ে যান। ফলে মুসলমানরা পিছু হটতে এবং তাঁবু সরিয়ে নিতে বাধ্য হন। তায়েফের অবরোধ প্রায় তিন সপ্তাহব্যাপী অব্যাহত থাকে।[৭৫১] ইতোমধ্যে উরওয়া বিন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু জুরাশ থেকে একটি মিনজানিক এবং দুটি তোপ নিয়ে আসেন। এবার শহরের উপর পাথর বর্ষণ শুরু হয়ে যায়। ইসলামি ইতিহাসে এটিই প্রথম দূরপাল্লার ভারি অস্ত্রব্যবহার।

তোপের আড়ালে মুজাহিদরাও প্রাচীরের ফোঁকড় পর্যন্ত পৌঁছার চেষ্টা করেন; কিন্তু তায়েফের যোদ্ধারা একটি তোপ অকেজো করে দেয়। ফলে মুজাহিদরা তিরের নিশানায় পরিণত হয়ে পুনরায় পিছপা হতে বাধ্য হন।[৭৫২]

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুশমনের প্রচণ্ড আক্রমণ দেখে সাহাবায়ে কেরামকে পিছিয়ে আসতে বলেন। যুদ্ধের শুরুভাগে নবীজি শহর পদানত না করে পিছপা হওয়ার পক্ষে ছিলেন না; কিন্তু যখন প্রাণহানি বৃদ্ধি পায় তখন নবীজি বললেন, 'আগামীকাল ইনশাআল্লাহ আমরা ফিরে যাবো।' সবাই

---

৭৪৯. জাওয়ামিউস সিরাতিন নবাবিয়্যা, ইবনে হাযম, পৃষ্ঠা ১৯৩

৭৫০. তাবাকাতে ইবনে সা'দ : ৭/১৫

৭৫১. এক মত অনুযায়ী অবরোধ চল্লিশ দিন অব্যাহত থাকে [তাবাকাতে ইবনে সা'দ : ২/১৫৮, ১৫৯]।

৭৫২. জাওয়ামিউস সিরাতিন নাবাবিয়্যা, ইবনে হাযম, পৃষ্ঠা ১৯৩

স্বতঃস্ফূর্তভাবে তা সমর্থন করল। কারণ, এই অবরোধের ফলে তাদের মধ্যে একঘেঁয়েমি এসে গিয়েছিল।'[৭৫৩]

দুধবোন শায়মা রাদিয়াল্লাহু আনহার সঙ্গে সাক্ষাৎ

এই অভিযানের ক্ষেত্র ওই এলাকায় ছিল, যেখানে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার দুধ-পানের দিনগুলো কাটিয়েছিলেন। দুধমা হালিমা রাদিয়াল্লাহু আনহার কবিলা বনু সাদও এই যুদ্ধে হাওয়াজিনের সঙ্গে জোটবদ্ধ হয়েছিল। ফলে তাদের দুজন বন্দিও হয়। তাদের মধ্যে হালিমা সাদিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহার কন্যা শায়মাও ছিলেন। তিনি যখন মুসলমানদের কাছে বলছিলেন আমি নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দুধবোন, কেউ তা বিশ্বাস করতে চাচ্ছিল না। অবশেষে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে তাকে নিয়ে যাওয়া হলো। তার বয়স তখন সত্তরের কাছাকাছি। তিনি নবীজিকে বার বার দেখছিলেন, যাকে তিনি কোলে নিয়ে দোল খাওয়াতেন। এর মাঝে প্রায় ষাট বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। হ্যাঁ, তিনি সেই শিশুটি। সবার থেকে তিনি বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। শায়মা নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে গিয়ে বললেন, 'ইয়া রাসুলাল্লাহ, আমি আপনার দুধবোন।' রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, 'তার আলামত কী?'

তিনি বললেন, এই নিদর্শন কি যথেষ্ট নয় যে, আপনাকে আমি কোলে উঠিয়ে নিয়েছিলাম আর আপনি পিঠ কেটে ফেলেছিলেন। তার চিহ্ন এখনো রয়েছে।'

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরল স্মৃতিশক্তির কারণে শৈশবের সেই ঘটনা মনে করতে বিলম্ব হয়নি। তখন তিনি তার সম্মানে নিজের চাদর বিছিয়ে দিয়ে বললেন, 'আপনি চাইলে আমার সঙ্গে থাকতে পারেন।' তিনি আপন গোত্রে ফিরে যাওয়া পছন্দ করলেন। নবীজি তাকে একটি গোলাম ও একটি বাঁদি দিয়ে অত্যন্ত সম্মানের সঙ্গে বিদায় জানান।[৭৫৪]

হালিমা রা. এর সঙ্গে সাক্ষাৎ এবং তার প্রতি সম্মানপ্রদর্শন

তায়েফ থেকে ফেরার পর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জি'রানাতে অবস্থান করছিলেন। এ সময় বনু হাওয়াজিনের একটি প্রতিনিধিদল তার দরবারে উপস্থিত হয়। তখন একজন অতিশয় বৃদ্ধ নারীকে আসতে দেখা গেল। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে দেখেই দাঁড়িয়ে স্বাগত জানান। নিজের চাদর মোবারক বিছিয়ে দেন এবং তার সঙ্গে অত্যন্ত আদবের সাথে কথা বলেন। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মান

৭৫৩. সহিহ মুসলিম, হাদিস নং ৪৭২০ (কিতাবুল জিহাদ, বাবু গাজওয়াতিত তায়িফ)
৭৫৪. সিরাতে ইবনে হিশাম : ২/৪৫৮; আররাওযুল উনুফ : ৭/৩০৪, ৩০৫

ও আদবপ্রদর্শন দেখে সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞেস করেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ, এই শ্রদ্ধেয় নারী আপনার কী হন?'

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'আমার দুধমা (হালিমা সাদিয়া)।'[৭৫৫]

বনু হাওয়াজিনের বন্দিদের মুক্তি

বনু হাওয়াজিনের প্রতিনিধিদল নবীজির দরবারে এসে ইসলামগ্রহণের ইচ্ছা ব্যক্ত করে। মুসলমানদের হাতে তাদের ৬ হাজার বন্দি ছিল। তাদের মধ্যে নারী ও শিশুও ছিল। প্রতিনিধিদলের একজন গুরুত্বপূর্ণ সদস্য আবু বুরকান রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দুধচাচা ছিলেন। তিনি কয়েদিদের মুক্তি দেওয়ার আবেদন জানান। নবীজি তাদের ইসলামগ্রহণ এবং দুধসম্পর্কের প্রতি সম্মান জানানোর জন্য সাহাবায়ে কেরামের সাথে পরামর্শ করে সকল কয়েদিকে মুক্ত করে দেন।[৭৫৬]

---

৭৫৫. আলইসাবাহ : ৮/৮৭, ৮৮, আলইসতিয়াব : ৩/১৮১৩

ঐ সময় হালিমা সাদিয়ার বয়স আনুমানিক ৮৫ বছর ছিল। তাকে হাদিসের বর্ণনাকারীদের মধ্যেও গণ্য করা হয়। তার বর্ণনাকৃত সবচেয়ে প্রসিদ্ধ রেওয়ায়েত হলো নবীজির জন্ম ও দুধপানের বর্ণনা। এই রেওয়ায়েতটি আবদুল্লাহ বিন জাফর থেকে বর্ণিত। রেওয়ায়েতটি হাদিস ও সিরাতগ্রন্থসমূহের অত্যন্ত মূল্যবান তথ্য হিসেবে সাব্যস্ত হয়। এটি আবু ইয়ালা তার মুসনাদে, ইবনে হিব্বান তার সহিহ গ্রন্থে এবং ইবনে ইসহাক তার সিরাতগ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।

এক বর্ণনা অনুযায়ী হজরত হালিমা রা. খাদিজা রা. এর বিয়ের পর মক্কায় এসে এলাকার দুর্ভিক্ষের অনুযোগ করেছিলেন। তখন নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) খাদিজাকে বলে একটি উট এবং চল্লিশটি বকরি দিয়েছিলেন। [ইবনুল জাওযির বরাতে সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ : ১/৩৮৩]

কিছু রেওয়ায়েত মোতাবেক হালিমা সাদিয়া রা. এর পরিবার মদিনায় হিজরত করে এসে শুরুর দিকেই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। অন্য রেওয়ায়েত অনুযায়ী হালিমা রা. এর স্বামী হারিস (যাকে আবু কাবশা এবং আবু যুআইবও বলা হয়) মক্কায় রাসুলুল্লাহর কাছে আসেন এবং তার কথা শুনে ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি বলতেন, 'আমার এই ছেলে আমার হাত ততক্ষণ পর্যন্ত ছাড়বে না, যতক্ষণ না আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করায়।' [আলইসাবাহ : ১/৭৬৭]

ইবনুল জাওযি রহ. এর বর্ণনা অনুযায়ী হজরত হারিসের সঙ্গে হালিমা রা. মক্কায় এসে উভয়ে একসঙ্গেই মুসলমান হন। [ইবনুল জাওযির বরাতে সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ : ১/৩৮৩]

সম্ভবত নবীজির অন্যান্য দুধভাইবোন মুসলমান হয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু কওমের ভয়ে ইসলাম গোপন রেখেছিলেন। শায়মার 'ইয়া রাসুলাল্লাহ' সম্বোধন থেকে এটিই স্পষ্ট হয় যে, তিনি আগেই মুসলমান হয়েছিলেন। এজন্যই তাকে এবং দুধমা হালিমাকে ইসলামের দাওয়াত দেওয়ার প্রয়োজন পড়েনি।

৭৫৬. সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ : ১/৩৯০-৩৯৩

গনিমতের মালে অনেক ভেড়া-বকরি পাওয়া যায়, সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে তা বণ্টন করে দেন। তবে গনিমতের একটি বড় অংশ ঐসব লোককে প্রদান করেন, যারা ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট; কিন্তু তখনও ইসলাম গ্রহণ করেনি। তাদেরকে বলা হয় 'মুআল্লাফাতুল কুলুব' তথা এমনসব লোক, যাদের দিল আকৃষ্ট করা হয়।[৭৫৭]

গাজওয়ায়ে হুনাইনের গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা

গাজওয়ায়ে হুনাইনের সবচেয়ে বড় শিক্ষাটি পবিত্র কুরআনে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। তা হলো, মুসলমানরা যুদ্ধের জন্য পূর্ণরূপে প্রস্তুতি নেওয়ার পরেও কখনো এবং কোনো অবস্থাতেই সেনাবাহিনী এবং অস্ত্রশস্ত্রের মাধ্যমে প্রবঞ্চিত হবে না। বরং তদের সম্পূর্ণ ভরসা থাকবে আল্লাহ তায়ালার উপর। সবসময় দোয়া এবং তাওয়াক্কুলের প্রতি যত্নবান থাকবে। কেননা, আল্লাহর যদি হুকুম না হয়, তা হলে বড় বড় সেনাবাহিনী এবং অসংখ্য ও অত্যাধুনিক অস্ত্রশস্ত্র নিয়েও বিজয় অর্জন করা যাবে না।

আবু মাহযুরার ইসলামগ্রহণ

হুনাইন থেকে ফেরার পথে ওয়াদি জি'রানাতে বিরতি নেওয়ার জন্য থামলেন। এ সময় আজান দেওয়া হলে, স্থানীয় এক দীর্ঘকেশী যুবক আবু মাহযুরা রসিকতা করে আজান নকল করে দিতে লাগল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কানে তার আওয়াজ পৌঁছলে তাকে ডেকে নেন। ধমক ও তিরস্কার না করে, স্নেহভরে তার সামনের লম্বা চুল ধরে টেনে আনেন এবং পুনরায় তাকে আজান শেখান।

আবু মাহযুরার উপর বিষয়টি অনেক প্রভাব ফেলে। তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে মসজিদে হারামের মুয়াজ্জিন নিযুক্ত করেন।[৭৫৮] এই চুলে যেহেতু নবীজির পবিত্র হাতের স্পর্শ লেগেছে; তাই জীবনভর এই লম্বা চুল কাটেননি।[৭৫৯]

মক্কা থেকে মদিনায় প্রত্যাবর্তন

মক্কা পৌঁছে উমরা আদায়ের পরপরই নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনা রওনা হয়ে যান। ২৩ যিলকদ মক্কা ও হুনাইনের বিজয়ী বাহিনী মদিনায় প্রবেশ করে। এই দীর্ঘ অভিযানে দুই মাস ষোলো দিন অতিক্রান্ত হয়। নবী

---

৭৫৭. জাওয়ামিউস সিরাতিন নাবাবিয়্যা, ইবনে হাযম, পৃষ্ঠা ১৭৯, ১৯৬, ১৯৭

৭৫৮. সুনানে নাসায়ি : হাদিস নং ৬৩২ (বাবু কাইফাল আজান), আলইসাবাহ : ৭/৩০২, ৩০৩

৭৫৯. মারিফাতুস সাহাবাহ, আবু নুয়াইম : ৩/১৪১১

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুপস্থিতিতে মদিনার ভারপ্রাপ্ত হিসেবে হজরত আবু রুহম কুলসুম বিন হুসাইন আনসারি রাদিয়াল্লাহু আনহু দায়িত্ব পালন করেন।[৭৬০]

আত্তাব বিন উসাইদের নেতৃত্বে হজ পালন

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কার এক কুরাইশ যুবক আত্তাব বিন উসাইদ রাদিয়াল্লাহু আনহুকে মক্কা এবং তার পার্শ্ববর্তী এলাকাগুলোর শাসক নিযুক্ত করেছিলেন। তখন তার বয়স ছিল মাত্র বিশ বছর। কিন্তু তিনি একজন আবেদ যাহেদ যুবক ছিলেন।

মক্কাবিজয়ের তিন মাস পর তার নেতৃত্বে হজ আদায় করা হয়।[৭৬১] আর সেসময় পূর্বের রীতি অনুযায়ী মক্কি যিলহজ ছিল। মুশরিকদের হজ পালনে কোনো প্রকার নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয় নি। কেননা, ইসলামের কৌশল ছিল ধীরে ধীরে ব্যক্তির মানসিকতার সংশোধন করা। তাই মুশরিকরা তাদের অন্যান্য শিরকি কাজকর্মের পাশাপাশি হজও যথারীতি আদায় করতে থাকে।[৭৬২]

---

৭৬০. জাওয়ামিউস সিরাতিন নাবাবিয়্যা, ইবনে হাযম, পৃষ্ঠা ১৭৯, ১৯৬, ১৯৭

৭৬১. তারিখে ইবনে খালদুন : ২/৪৬৬

৭৬২. সাইদ বিন মুসাইব রহ. এর একটি মুরসাল রেওয়ায়েত অনুযায়ী সেই বছর আবু বকর রা. কে হজের আমির বানানো হয়েছিল। [মুসান্নাফে আবদুর রাজ্জাক : হাদিস নং ৯৭৪১]
কিন্তু হাফেজ ইবনে কাসির রহ. এর আপত্তি তোলেন-

وهذا السياق فيه غرابة من جهة أن أمير الحج سنة عمرة الجعرانة إنما هو عتاب بن أسيد، فأما أبو بكر إنما كان أميرا سنة تسع

মুহাদ্দিস এবং সিরাত-লেখকগণের ঐকমত্য রয়েছে উক্ত বিষয়ে। তাদের কিছু ইবারত তুলে ধরছি :

فلما رجع في شوال اعتمر من الجعرانة، ثم حج عتاب بن أسيد، فأقام للناس الحج، واستعمله النبي صلى الله عليه وسلم على الحج، ثم حج أبو سنة تسع [التاريخ الأوسط للبخاري : ١/٣٣]

أقام الحج في سنة ثمان من الهجرة عتّاب بن أسيد.. وسائر الناس على شركهم [المحبر، ص ١١]

وحج الناس تلك السنة على ما ما كانت العرب تحج عليه، وحج تلك السنة المسلمين عتاب بن أسيد، وهي سنة ثمان [تاريخ الطبري : ٣/٩٥]

মুহাম্মদ বিন সাদ এবং ইবনে খালদুন এ কথাই লিখেছেন। [তাবাকাতে ইবনে সা'দ : ৫/৪৪৬, তারিখে ইবনে খালদুন : ২/৪৬৬]

নোট : আত্তাব বিন উসাইদ আমৃত্যু মক্কার শাসক ছিলেন। কিন্তু তিনি অল্প হায়াত পান। ১৩ হিজরির জুমাদাল উখরা মাসে টগবগে তরুণ বয়সে তিনি ইনতেকাল করেন। এটি হজরত আবু বকর সিদ্দিক রা. এর খেলাফতের শেষদিকের ঘটনা। [আলইসতিয়াব : ৩/১০২৩]

গাজওয়ায়ে তাবুক

(৯ হিজরি)

মক্কা বিজয়ের মাধ্যমে মক্কার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলোও অধীনস্থ হয়ে যায়। এর ফলে সমগ্র জাজিরাতুল আরব ইসলামের ছায়াতলে এসে গিয়েছিল। শত শত বছর যাবৎ মরুবাসী এবং উষ্ট্রীচালক কবিলাসমূহ উদ্ভ্রান্ত থাকার পর এক বড় উদ্দেশ্য নিয়ে আজ এক ঝান্ডাতলে সমবেত। পশ্চিমে পারস্য হুকুমত অভ্যন্তরীণ ভাঙ্গনের শিকার হওয়ার কারণে জাজিরাতুল আরবের দিকে মনোনিবেশ করার সুযোগ ছিল না। কিন্তু বাইজেন্টাইন রোমানরা মুতাযুদ্ধের পর থেকেই সতর্ক হয়ে গিয়েছিল এবং জাজিরাতুল আরব অভিমুখে অগ্রযাত্রার প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছিল।

শামের সীমান্তবর্তী আরব-খ্রিষ্টানরাও বার্তা পাঠিয়ে আরবদের মূলোৎপাটনের জন্য রোমানদের উসকানি দিত। রোমের কায়সার তাদের অধীনস্থ শামবাসী আরব খ্রিষ্টানদেরই এই অভিযান পরিচালনার দায়িত্ব অর্পণ করে। কারণ মরুভূমি এবং পাহাড়-পর্বতের রাস্তাঘাট তাদের নখদর্পণে। লাখম ও জুযাম গোত্রও তাদের সঙ্গে গিয়ে মিলিত হয়। ৯ হিজরির মাঝামাঝিতে তাদের প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়ে যায়। ৪০ হাজার রোমান সৈন্যের অগ্রবর্তী বাহিনী অগ্রসর হয়ে 'বালকা' পর্যন্ত পৌঁছে যায়।[৭৬৩]

নাবতিদের মাধ্যমে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই সংবাদ লাভ করেন। তারা শাম থেকে যায়তুন তৈল এনে হিজাজে বিক্রি করত।[৭৬৪] নবীজি এতে খুবই চিন্তিত হন। মদিনাবাসীরা পূর্ব থেকেই গাসসানিদের আক্রমণের আশঙ্কা করত। এখন এই খবর শুনে তারা আরও বিচলিত হয়ে পড়ে।[৭৬৫]

---

৭৬৩. শারহুয যুরকানি আলাল মাওয়াহিবুল লাদুন্নিয়্যাহ : ৪/৬৬-৬৮; আররাহিকুল মাখতুম, সফিউর রহমান মোবারকপুরি, পৃষ্ঠা ৫৮১, ৫৮২ (মাকতাবা সালাফিয়্যাহ সংস্করণ, লাহোর)

৭৬৪. আলমাগাজি, ওয়াকিদি : ৩/৯৯০

নোট : নাবতি। নাবিত বিন ইসমাইলের বংশধর ছিল। প্রথমে উত্তর হিজাযে তার আধিপত্য ছিল। তাদের ক্ষমতা বিলুপ্তির পর তারা ব্যবসা-বাণিজ্য এবং চাষাবাদে লিপ্ত হয়ে যায়। [আররাহিকুল মাখতুম, টীকা, পৃষ্ঠা ৫৮১]

৭৬৫. সহিহ মুসলিম : হাদিস নং ৩৭৬৪ (বাবুন ফিল ইলা)

সবার মনেই এই প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছিল যে, এত বড় শত্রুর মোকাবেলা কীভাবে করা হবে? শত্রুর আগমনের অপেক্ষা করা হলে তারা নিশ্চিত মদিনায় আক্রমণের পূর্বেই উত্তরাঞ্চলের সমস্ত এলাকা দখল করে নেবে। যদি খন্দকযুদ্ধের মতো মোর্চা বানিয়ে যুদ্ধের জন্য তৈরি হওয়া যায়, তবু তারা চারদিক থেকে হিজাজে প্রবেশ করার পর দূরদূরান্ত পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়তে সক্ষম হবে। ফলে সমগ্র জাজিরাতুল আরব থেকে মদিনা বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গভীর চিন্তাভাবনা এবং সাহাবায়ে কেরামের সাথে পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত ঘোষণা করলেন যে, মুসলমানরাই শাম-সীমান্তে গিয়ে যুদ্ধ করবে, যাতে শত্রুমনে আতঙ্ক সৃষ্টি হয় এবং মদিনা রণাঙ্গন হওয়া থেকে সংরক্ষিত থাকে। এই নির্দেশনায় স্বতঃস্ফূর্ত সাড়া দেওয়া মোটেই মামুলি ব্যাপার ছিল না। একে তো প্রচণ্ড গরম, দ্বিতীয়ত খেজুর পাকার মৌসুম ছিল তখন।[৭৬৬]

মদিনার অধিকাংশ সাহাবির জীবিকা বাগানের উপর নির্ভরশীল ছিল। এমন সময়ে বাগ-বাগিচা ছেড়ে যাওয়া ফসল নষ্ট করা এবং পুরো বছরের উপার্জন ধ্বংস করার নামান্তর ছিল। এরচেয়ে বড় বিষয় হলো, সে-সময়ে দুর্ভিক্ষ চলছিল। মদিনাবাসীর আর্থিক অবস্থাও শোচনীয় ছিল। তদুপরি যুদ্ধে যাওয়ার সিদ্ধান্ত বহাল ছিল। মক্কাসহ আরবের সকল কবিলার নিকট ফরমান পাঠানো হলো প্রত্যেক কবিলা থেকে ৩ জন করে লোক প্রেরণ করার জন্য।[৭৬৭]

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অধিকাংশ যুদ্ধে যাওয়ার পূর্বে তার গন্তব্য প্রকাশ করতেন না। কিন্তু এবার সফরের দীর্ঘতা এবং রাস্তার দুর্গমতা বর্ণনা করে বলে দেন, আমাদেরকে শামের দিকে মার্চ করতে হবে। এমন পরিষ্কারভাবে বলার মধ্যে সম্ভবত এই হেকমত ছিল যে, এর ফলে মদিনায় বিদ্যমান শত্রুর গোয়েন্দাদের মাধ্যমে শামবাসীর কাছে সংবাদ পৌঁছে গেলে তারা হয়তো সন্ত্রস্ত হবে।

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকে মসজিদে নববিতে জমায়েত করে জিহাদ-ফান্ডে দান-সদকা করার জন্য উদ্বুদ্ধ করেন। ইসলামের মশালধারী মুজাহিদরা বড় অঙ্কের চাঁদা দেন। আসেম বিন আদি রাদিয়াল্লাহু আনহু ৯০ অসাক খেজুর প্রদান করেন। উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু মাল-সামানাসহ ৩০০ উট এবং ১ হাজার স্বর্ণমুদ্রা দান করেন। আবদুর রহমান বিন আউফ রাদিয়াল্লাহু আনহু ১০০ উকিয়া রুপা, উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু ২০০ উকিয়া

---

৭৬৬. সহিহ বুখারি : হাদিস নং ৪৪১৮ (কিতাবুল মাগাজি, হাদিসু কা'ব বিন মালিক রা.)

৭৬৭. আলমাগাজি, ওয়াকিদি : ৩/৯৯০

রুপা ছাড়াও ঘরের অর্ধেক সামানা পেশ করেন।[৭৬৮] আর আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু তো সবাইকে ছাড়িয়ে যান। ঘরে যা কিছু ছিল, সবই আল্লাহর জন্য উৎসর্গ করেন।[৭৬৯]

অবাক-করা বিষয় হলো, একজন নিঃস্ব ব্যক্তিও দান-অনুদান করা থেকে পিছিয়ে থাকেননি। প্রত্যেকেই তার সামর্থ্য অনুযায়ী দান করেছেন।

এই সফরে সওয়ারি ছাড়া গমন করা ছিল ভীষণ রকম দুষ্কর কাজ। এজন্য সেনাবাহিনী প্রস্তুত করার সময় প্রত্যেকের সওয়ারির বন্দোবস্ত করারও চিন্তা করা হয়। যেহেতু বহুসংখ্যক সাহাবি যুদ্ধে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত ছিলেন, তাই সওয়ারির স্বল্পতা দেখা দেয়। এক এক উটে পালাক্রমে দুই তিনজন করে আরোহণ করার ফয়সালা করার পরও কিছু লোকের কোনোই ব্যবস্থা করা যায়নি। তখন তারা কাঁদতে কাঁদতে নবীজির দরবারে লুটিয়ে পড়েন।[৭৭০]

অপরদিকে মুনাফিকদের ছিল ভিন্ন রূপ। তারা নিজেরাও এই প্রচণ্ড গরমে বের হতে আগ্রহী ছিল না এবং অন্যদেরকেও নিরুৎসাহিত করছিল।[৭৭১]

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হজরত আলি রাদিয়াল্লাহু আনহুকে মদিনার ভারপ্রাপ্ত আমির নিযুক্ত করলে মুনাফিকরা বলতে থাকে যে, নবীজি তার প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে তাকে নিতে চাচ্ছেন না। তিনি এই কথা নবীজিকে অবগত করে[৭৭২] আরজ করলেন, 'আপনি কি আমাকে নারী-শিশুদের কাছে ছেড়ে যাচ্ছেন?'

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'তোমার কি এটা পছন্দ নয় যে, হারুন ও মুসার (আলাইহিমাস সালাম) মাঝে যে সম্পর্ক ছিল, তোমার ও আমার মধ্যে সে সম্পর্ক হোক?'

আলি রাদিয়াল্লাহু আনহু এ কথা শুনে আশ্বস্ত হয়ে গেলেন।[৭৭৩]

---

৭৬৮. তারিখুল ইসলাম, জাহাবি : ২/৬২৮, ৬২৯

৭৬৯. সুনানে আবু দাউদ : হাদিস নং ১৬৭৮ (কিতাবুয যাকাত)

৭৭০. সিরাতে ইবনে হিশাম : ২/৫১৭। কা'ব বিন মালেক রা. এর রেওয়ায়েত (ولا يجمعهم كتاب حافظ) শব্দ থেকেও বুঝা যায় যুদ্ধে যেতে আগ্রহীদের সংখ্যা অনেক ছিল। [সহিহ বুখারি : হাদিস নং ৪৪১৮]

৭৭১. তাফসিরে ইবনে কাসির, সুরা তাওবা : ৮১

৭৭২. আসসুন্নাহ, ইবনে আবু আসিম : ২/৬০০

৭৭৩. সহিহ বুখারি : হাদিস নং ৪৪১৬ (কিতাবুল মাগাজি, বাবু গাজওয়াতি তাবুক), মুসান্নাফ ইবনে আবি শাইবাহ : হাদিস নং ৩৭০০৮
ইবনে হিশামের বর্ণনা অনুযায়ী হজরত আলি রা. কে নবীজির পরিবারের দেখাশোনা, মুহাম্মদ বিন মাসলামা রা. কে নগরীর ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব দিয়ে গিয়েছিলেন [সিরাতে ইবনে হিশাম : ২/৫১৯]। কিন্তু এর সনদ জয়িফ। সহিহ বুখারির রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে,

মুসলিম-বাহিনীর তাবুকের পথে যাত্রা

৯ম হিজরি ৩রা রজব বৃহস্পতিবার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ৩০ হাজার মুজাহিদ নিয়ে মদিনা থেকে রওনা হন।[৭৭৪] মদিনা ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকাগুলো প্রায় পুরুষশূন্য হয়ে গিয়েছিল। কেবল নারী ও শিশুরা রয়ে গিয়েছিলো। এ ছাড়াও কিছু লোককে কঠিন ওজরের কারণে তাদের আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেতে বারণ করেছেন। তবে মুনাফিকরা এক্ষেত্রে সম্পূর্ণ নীরব ভূমিকা পালন করে তারা ঘরে লুকিয়ে থাকে।[৭৭৫]

আবু জর গিফারি রাদিয়াল্লাহু আনহু সওয়ারির ব্যবস্থা না হওয়ায় মদিনায় থেকে গিয়েছিলেন। কিন্তু পরবর্তীতে তার জিহাদের জজবা এত প্রবল হয় যে, জিহাদের উপকরণ কাঁধে নিয়ে পায়ে হেঁটে মুসলিম-বাহিনীর সঙ্গে মিলিত হন। হজরত আবু খাইসামা আনসারি রাদিয়াল্লাহু আনহু তার বাগিচা পরিচর্যায় মশগুল থাকায় পেছনে পড়ে গিয়েছিলেন। একদিন তিনি তার স্ত্রীর সঙ্গে বাগানে বসে ছিলেন। তখন তার মনে পড়ে গেল নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ

استخلف عليا শব্দ থেকে পরিষ্কার বুঝা যাচ্ছে যে, আলি রা. কে ভারপ্রাপ্ত আমির নিযুক্ত করে গিয়েছিলেন। ইবনে হিশামের রেওয়ায়েতের এই ব্যাখ্যাও হতে পারে যে, আলি রা. কে আমির নিযুক্ত করার পাশাপাশি তাকে পরিবার দেখাশোনার দায়িত্বও বিশেষভাবে দিয়ে যান, আর মুহাম্মদ বিন মাসলামাকে তার অধীনস্থ এলাকার ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব দিয়েছিলেন।

কিছু রেওয়ায়েতে সিবা বিন উরফুতাহ রা. এর ভারপ্রাপ্ত আমির নিযুক্ত হওয়ার কথা উল্লেখ আছে। এক্ষেত্রেও উপরোক্ত ব্যাখ্যা হতে পারে।

৭৭৪. রজব মাসে রওনা হওয়ার ব্যাপারে সিরাতবিদরা সকলেই একমত।

ইবনে হাবিব ১লা রজব সোমবার উল্লেখ করেছেন। [আলমুহাব্বার, পৃষ্ঠা ১১৬]

কিন্তু সহিহ বুখারিতে পরিষ্কার উল্লেখ আছে যে, বৃহস্পতিবার সফর শুরু হয়েছিল এবং নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বৃহস্পতিবার সফরে বের হতে পছন্দ করতেন। [সহিহ বুখারি : হাদিস নং ২৯৫০, কিতাবুত তাহাজ্জুদ]

তাই প্রবল ধারণা হয় যে, ৩রা রজব বৃহস্পতিবার রওনা হন। এই রজব মাসকে যদি মক্কিপঞ্জিকা অনুযায়ী ধরা হয়, তা হলে এটি ১১ এপ্রিল ৬৩১ খ্রিষ্টাব্দ হয়। আর তখন প্রচণ্ড গরমের মৌসুম থাকে। কুরআনে কারিমে 'তোমরা গরমে বের হয়ো না'- সুরা তাওবার ৮১নং আয়াত দ্বারাও গাজওয়ায়ে তাবুক গরমকালে সংঘটিত হয়েছে বলে প্রমাণিত হয়। হাদিসেও সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, সময়টি তখন ফল পাকা এবং ছায়া দীর্ঘ হওয়ার কাল ছিল। [সহিহ বুখারি : হাদিস নং ৪৪১৮, হাদিসে কা'ব বিন মালিক]

অন্যদিকে মাদানিপঞ্জিকা অনুযায়ী ধরা হলে রজব মাস অক্টোবরে পড়ে। এসব দৃষ্টিকোণ থেকে গাজওয়ায়ে তাবুক মক্কিপঞ্জিকা অনুযায়ীই প্রমাণিত হয়।

৭৭৫.

إني لا أرى إلا رجلا مغموصا عليه النفاق أو رجلا مما عذر الله من الضعفاء (صحيح البخاري : ٤٤١٨ حديث كعب بن مالك)

সময় কত দুর্গম ও কষ্টকর জিহাদি সফরে বের হয়েছেন আর আমরা এখানে বসে বসে আরামদায়ক শীতল ছায়ায় বসে আছি। তার ভেতরে এত নাড়া দেয় যে, তিনি তখনই রওনা হয়ে যান। উমাইর বিন ওয়াহব রাদিয়াল্লাহু আনহুও কয়েকদিন বিলম্বে বের হন। আবু খাইসামা রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং উমাইর দুজনে একসঙ্গে গিয়ে সেনাবাহিনীর সঙ্গে মিলিত হন।[৭৭৬]

কেবল দশ ব্যক্তি কোনো ওজর ছাড়াই মদিনায় রয়ে যায় এবং পরেও তারা রওনা হয়নি। আবু লুবাবা বিন মুনযির,[৭৭৭] মুরারা বিন রাবি, হিলাল বিন উমাইয়া, কাব বিন মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহুম তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য।[৭৭৮]

কওমে সামুদের ধ্বংসাবশেষ অতিক্রম করার সময় নবীজির ভয়

এই কঠিন সফরে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ওয়াদি হিজ্‌র অতিক্রম করতে হয়েছিল, যেখানে কওমে সামুদের ধ্বংসাবশেষ রয়েছে। হাজার বছর আগে এখানে হজরত সালেহ আলাইহিস সালাম তাওহিদের আওয়াজ বুলন্দ করেছিলেন। কিন্তু কওম তার দাওয়াতে সাড়া না দেওয়ায় আল্লাহ তায়ালার শাস্তির সম্মুখীন হয়। আল্লাহ তায়ালার নির্দেশে ভূমিকম্প এবং বজ্রধ্বনি তাদের নিশ্চিহ্ন করে দেয়। পাহাড় খোদাই করে তৈরী-করা তাদের বাড়িঘরের ধ্বংসাবশেষ সেই ভয়াবহ আজাবেরই উপাখ্যান শোনাচ্ছে।

মুসলমানরা এদের বিধ্বস্ত ভবনগুলো দেখে আনন্দ উপভোগে মশগুল হয়ে পড়লে তো আল্লাহর ক্রোধের সম্মুখীন হবে, তাদের উপর আল্লাহর আজাব অবধারিত হয়ে যাবেজ্জনবীজি এই আশংকা করে এই স্থান অতিক্রম করার সময় নিজেই কাপড় দিয়ে চেহারা ঢেকে ফেলেন, যেন ওই ধ্বংসাবশেষের দৃশ্য দৃষ্টিগোচর না হয়। সওয়ারির গতি বাড়িয়ে দিয়ে সাহাবায়ে কেরামকেও তাগিদ দেন এবং বলেন, 'ঐ অত্যাচারী কওমের বসতি অতিক্রম করার সময় ভয়ে তোমাদের কান্নাকাটি করা উচিত, তোমাদের উপর যেন আজাব নাজিল না হয়।'

কওমে সামুদের কুয়ার নিকট দিয়ে অতিক্রম করার সময় মুসলমানরা সেখান থেকে পানি তুলতে শুরু করেন। নবীজি তা জানতে পেরে বললেন, 'এই পানি পান করবে না। অজুও করবে না।'[৭৭৯]

হাজার বছর পূর্বে সংঘটিত হওয়া ভয়াবহ আজাবের স্থানের কথা শুনেও অনুভূতিপ্রবণ এবং কোমলপ্রাণ মানুষদের মধ্যে বিষণ্নতা ছড়িয়ে পড়তে পারে;

---

৭৭৬. সিরাতে ইবনে হিশাম : ২/৫২১

৭৭৭. দালাইলুন নুবুওয়াহ, বাইহাকি : ৫/২৭২

৭৭৮. সহিহ বুখারি : হাদিস নং ৪৪১৮, হাদিসে কাব বিন মালিক

৭৭৯. সিরাতে ইবনে হিশাম : ২/৫২১, ৫২২

এই আশঙ্কা নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে আর কার অধিক হতে পারে? তাই তিনি তাদেরকে পানি ব্যবহার করতে নিষেধ করেন। কারণ, আজাবের অমঙ্গল ও কুপ্রভাব তাদেরকেও স্পর্শ করতে পারে।

তাবুকে অবস্থান এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চল দখল

দীর্ঘ সফরের সমাপ্তি হলো। মুসলমানরা শামের সীমান্তে অবস্থিত 'তাবুক' নামক ঝর্নার কাছে পৌঁছে যায়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই ঝর্নার পানি ব্যবহার করার ব্যাপারে পূর্বেই নিষেধ করে দিয়েছিলেন। কিন্তু দুই ব্যক্তি সবার আগে পৌঁছে বেখেয়ালে তার নির্দেশ অমান্য করে। মুসলমানরা যখন সেখানে পৌঁছে তখন ঝর্না থেকে অল্প অল্প পানি বের হচ্ছিল। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন লোকজনকে একটি পাত্রে কিছু পানি আনার নির্দেশ দেন। তারা পানি আনলে নবীজি পাত্রে দু'হাত এবং মুখ ধুলেন, তারপর পাত্রের পানি ঝর্নায় ফেললেন। ফলে ঝর্নার পানি প্রবলধারায় প্রবাহিত হতে লাগল। তখন সকলেই প্রয়োজনমতো পানি পান করে।[৭৮০]

যদিও আশপাশের এলাকায় খ্রিষ্টান আরব কবিলাগুলোর বসবাস ছিল; কিন্তু পশ্চিমদিক সম্পূর্ণ মুক্ত ছিল। দূরদূরান্ত পর্যন্ত রোমান বাহিনীর কোনো উপস্থিতি ছিল না। অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছিল তারা স্বয়ং নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাহিনী পরিচালনার কারণে ভয় পেয়ে যায় এবং মদিনায় আক্রমণের ইরাদা পালটে ফেলে। তিনি তাবুকের সীমান্তে পুরো বিশদিন অবস্থান করেন। এই সময়ে কায়সার বাহিনীর কোনোরূপ সামরিক কার্যক্রম পরিলক্ষিত হয়নি।

মুসলমানদের ভয়ে আতঙ্কিত হয়ে রোমানরা হামলা পরিত্যাগ করার কারণে আরব খ্রিষ্টানদের মধ্যেও রোম সাম্রাজ্যের প্রতি অনাস্থা তৈরি হয়। এর আলামতও প্রকাশ পেতে শুরু করে। সর্বপ্রথম আয়লার শাসক ইউহান্না নবীজির দরবারে উপস্থিত হয়ে মদিনার আনুগত্য করার ঘোষণা দেয়। এরপর জারবা এবং আযরুহ-এর নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ এসে বশ্যতা স্বীকার করে। তারা সকলেই জিজিয়া বা কর দেওয়ার জন্য সম্মত হয়।

এখান থেকেই নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রখ্যাত বীর খালেদ বিন ওয়ালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহুকে দুমাতুল জানদালের শাসক উকায়দর বিন মালেককে শায়েস্তা করার জন্য প্রেরণ করেন। কারণ সে বহুদিন যাবৎ মুসলমানদের কাফেলা লুটপাট করত। খালেদ বিন ওয়ালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু

৭৮০. সহিহ মুসলিম : হাদিস নং ৬০৮৬ (বাবুন ফি মু'জিযাতিন নাবিয়্যি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)

অতর্কিত আক্রমণ করে উকায়দরকে শিকাররত অবস্থায় গ্রেফতার করে নিয়ে আসেন। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে এসে সে আনুগত্যের প্রতিশ্রুতি দেয়।[৭৮১]

শরিয়ত কর্তৃক জিজিয়ার অনুমোদন

এই ময়দানে থাকা অবস্থায় জিজিয়ার অনুমোদনে এই আয়াত নাজিল হয়।[৭৮২]

> قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّىٰ يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ
>
> যুদ্ধ করো ওইসব আহলে কিতাবের সাথে, যারা আল্লাহ ও রোজ হাশরের প্রতি ঈমান রাখে না, আল্লাহ ও তার রাসুল যা হারাম করেছেন, তা হারাম করে না এবং গ্রহণ করে না সত্যধর্ম, যতক্ষণ না করজোড়ে তারা জিজিয়া প্রদান করে।[৭৮৩]

উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর প্রত্যাবর্তনের পরামর্শ

তাবুকে যখন ঝুঁকিপূর্ণ দিনগুলো অতিক্রান্ত হয়ে যায়, তখন নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাবুক থেকে সামনে অগ্রসর হওয়ার ব্যাপারে সাহাবায়ে কেরামের পরামর্শ তলব করেন। হজরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু আরজ করেন, 'ইয়া রাসুলাল্লাহ, রোমানদের সৈন্যসংখ্যা অনেক বেশি। আমরা তাদের নিকট এসেই তাদেরকে ভীত-সন্ত্রস্ত করতে পেরেছি। এ বছর এটুকুই যথেষ্ট যে, আমরা তাদেরকে কেবল ভয় দেখিয়ে ফিরে গিয়েছি। আর আগামীতে কী হবে, তা পরেই দেখা যাবে। আল্লাহ তায়ালা আমাদের সামনে পথ খুলে

---

৭৮১. তারিখে ইবনে খালদুন : ২/৪৬৮

৭৮২. আলআমওয়াল, আবু উবাইদ কাসিম বিন সাল্লাম, পৃষ্ঠা ২৭

৭৮৩. সুরা তাওবা, আয়াত ২৯

জিজিয়া হলো- ইসলামি হুকুমত কর্তৃক অমুসলিমদের উপর তাদের বসবাসের সুযোগদানের জন্য বাৎসরিক একটি বিনিময় গ্রহণের নাম।

প্রতিটি জিহাদ-অভিযানে প্রতিপক্ষকে প্রথমে ইসলাম গ্রহণ করা কিংবা জিজিয়া দেওয়ার প্রস্তাব দেওয়া হবে। আর এই দু'টোই কেউ অস্বীকার করলে তার সাথে যুদ্ধ হবে।

নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) জিহাদ-অভিযানে সাহাবায়ে কেরামকে সেনাপতি বানিয়ে প্রেরণ করার পূর্বে নির্দেশ দিতেন যে, শত্রুরা যদি ইসলাম গ্রহণ করতে রাজি না হয়, তা হলে তাদের উপর জিজিয়া আরোপ করবে। [সুনানে তিরমিজি : হাদিস নং ১৬১৭]

সম্ভবত এই নির্দেশনা নবীজি ঐসব সারিয়ার আমিরদের দিয়েছিলেন, যাদেরকে জিজিয়ার আয়াত নাজিলের পর তাবুকে অবস্থানকালেই পার্শ্ববর্তী অঞ্চলসমূহে প্রেরণ করা হয়েছিল। হজরত উসামা রা. কেও এই নির্দেশ দিয়ে পাঠানো হয়েছিল।

দেবেন।' এই মতটি ছিল সুচিন্তিত এবং প্রজ্ঞাপূর্ণ। তাই নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হজরত উমরের মতটি পছন্দ করলেন।[৭৮৪]

কায়সারের দূতকে ইসলামের দাওয়াত

তাবুকে থাকা অবস্থাতেই তিনি হিরাকলের নিকট একটি পত্র প্রেরণ করেন। কিছুদিন পর হিরাকলের পক্ষ থেকে আরব-কবিলা তানুখের এক ব্যক্তি উত্তরপত্র নিয়ে নবীজির দরবারে উপস্থিত হয়। তিনি তার পত্র পাঠ করলেন। সেই পত্রটি আদব-শিষ্টাচার এবং মার্জিত কথায় পরিপূর্ণ। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দূতকে জিজ্ঞেস করেন, 'তুমি কোন গোত্রের?' সে বলল, 'বনু তানুখের'।

নবীজি তাকে ইসলামের দাওয়াত দিতে গিয়ে বলেন, 'তোমার কি ইবরাহিম আলাইহিস সালামের দীনের প্রতি আগ্রহ হয়?'

সে অপারগতা পেশ করে বলে, 'আমি একটি কওমের দূত এবং একটি ধর্মের অনুসারী। আমি নিজের দেশে না গিয়ে কোনো ফয়সালা দিতে পারবো না।'

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন হেসে এই আয়াত তেলাওয়াত করলেন,

إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء

> নিশ্চয় আপনি যাকে ইচ্ছা তাকে হেদায়েত দিতে পারবেন না। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা যাকে ইচ্ছা তাকে হেদায়েত দিতে পারেন।[৭৮৫]

এরপর বললেন, 'তুমি একজন দূত। দূতের পারিশ্রমিকও দিতে হয়। আমরা সফরে আছি। আমাদের কাছে যদি কিছু থাকত, তা হলে তোমাকে আমরা সম্মানিত করতাম।'

হজরত উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু শুনে তৎক্ষণাৎ তাকে একটি দামি পোশাক প্রদান করেন। দূত এই সম্মাননা নিয়ে নবীজির দরবার থেকে বিদায় নেয়।[৭৮৬]

গাজওয়ায়ে তাবুক থেকে প্রত্যাবর্তন এবং মসজিদে জিরার ধ্বংস করা

অবশেষে মুসলিম-বাহিনী শামের সীমান্তে তাদের পতাকা গেড়ে ফিরে আসে। যেহেতু অধিকাংশ মুনাফিকই উক্ত জিহাদে অন্তর্ভুক্ত ছিল না; তবে কিছু দুষ্টপ্রকৃতির মুনাফিক অবশ্য সঙ্গে গিয়েছিল। তাদের কোনো গনিমতও হস্তগত হলো

---

৭৮৪. আসসিরাতুল হালাবিয়্যাহ : ৩/২০০

৭৮৫. সুরা কাসাস, আয়াত ৫৬

৭৮৬. আলবিদায়া ওয়ান নিহায়া : ৭/১৭৫

না। এরপর সুরা তাওবার আয়াতগুলো তাদের মুনাফিকি কর্মকাণ্ডের কোনো অংশই বাদ দেয়নি। এই সুরার বিভিন্ন আয়াতে মুনাফিকদের প্রতারণা, চক্রান্ত এবং ভ্রষ্টাচার খুলে খুলে বর্ণনা করা হয়েছে। এই সময়েই তারা মদিনার উপকণ্ঠে একটি মসজিদ নির্মাণ করে, যা মূলত মুসলমানদের মাঝে বিভেদ সৃষ্টি করা এবং তাদের নির্মূল করার লক্ষ্যে মুনাফিকদের কুমন্ত্রণাকেন্দ্র ছিল।

মুনাফিকরা কেন্দ্রটির সরকারি অনুমোদনের জন্য নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট ওই মসজিদে নামাজ আদায় করার জন্য আবেদন করে। তিনি তাদেরকে ওয়াদা দেন, তাবুক থেকে ফেরার পর সেখানে নামাজ পড়তে যাবেন। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা তাকে মুনাফিকদের দুরভিসন্ধি এবং মসজিদের নাম জানিয়ে দেন। কুরআনের আয়াত নাজিল হলো,

> وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ * لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا
>
> আর যারা নির্মাণ করেছে মসজিদ জেদের বশে এবং কুফরির তাড়নায় মুমিনদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে এবং ওই লোকের জন্য ঘাঁটিস্বরূপ যে পূর্ব থেকে আল্লাহ ও তার রাসুলের সাথে যুদ্ধ করে আসছে, আর তারা অবশ্যই শপথ করবে যে, আমরা কেবল কল্যাণই চেয়েছি। পক্ষান্তরে আল্লাহ সাক্ষী যে, তারা সবাই মিথ্যুক। আপনি কখনো সেখানে (নামাজের জন্য) দাঁড়াবেন না...।[৭৮৭]

এই মসজিদকে আল্লাহ তায়ালা মসজিদ জিরার নাম দিয়ে তার আসল চেহারা উন্মোচন করে দিয়েছেন। তাই নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাবুক থেকে ফেরার পর সাহাবায়ে কেরামকে ওই নামসর্বস্ব মসজিদটা ভস্ম করে দেওয়ার জন্য প্রেরণ করেন।[৭৮৮]

মদিনায় আগমন এবং উম্মে কুলসুম রা. এর মৃত্যু

রমজান মাসে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাবুক থেকে মদিনায় ফিরে আসেন।[৭৮৯] তখন তার কন্যা উম্মে কুলসুম রাদিয়াল্লাহু আনহা ইনতেকাল

---

৭৮৭. সুরা তাওবা, আয়াত ১০৭

৭৮৮. আলবিদায়া ওয়ান নিহায়া : ৭/১৭৫

৭৮৯. ইবনে ইসহাকের মতে তাবুক থেকে প্রত্যাবর্তন রমজানে হয়েছে। [সিরাতে ইবনে ইসহাক : ২/৫৩৭] ইবনে হাবিবের নিকট শাওয়ালের শেষদিন হয়েছে। [আলমুহাব্বার, পৃষ্ঠা ১১৬] শাবান মাসে হওয়ার মতও রয়েছে, যা অনেক দূরবর্তী। তবে দলিলপ্রমাণের আলোকে ইবনে ইসহাকের মতটিই শক্তিশালী মনে হয়।

করেন। আসমা বিনতে উমাইস, উম্মে আতিয়া এবং নবীজির ফুফু সাফিয়া (রাদিয়াল্লাহু আনহুন্না) তাকে গোসল করান।

কবর খননের সময় নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে কবরের কিনারে গিয়ে পরিদর্শন করেন। তিনি তার জামাতার একাকিত্ব দেখে খুব মর্মাহত হন এবং বলেন, 'আমার যদি আরেকটি কন্যা থাকত, তা হলে তাকেও উসমানের কাছে বিয়ে দিতাম।'[৭৯০]

নিষ্ঠাবান তিন সাহাবির পরীক্ষা : হজরত আবু লুবাবার তাওবা

যেসব মুনাফিক গাজওয়ায়ে তাবুক যায়নি, তারা নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মুখে এসে মিথ্যা অজুহাত পেশ করে সাধু সাজার চেষ্টা করে। কিন্তু যেসব সাহাবি কোনো যুক্তিসঙ্গত ওজর ছাড়াই গাজওয়াতে যাননি, তারা মিথ্যা অজুহাত পেশ করেননি, বরং নিজেদের ভুল স্বীকার করেন। তারা ছিলেন দশজন। সাতজন নিজেদেরকে মসজিদে নববির ওই খুঁটির সাথে বেঁধে রাখে, যেদিক দিয়ে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মেহরাবে যান। হজরত আবু লুবাবা বিন আবদুল মুনযির আনসারি রাদিয়াল্লাহু আনহুও তাদের মধ্যে ছিলেন। তারা কসম করেন, 'যতক্ষণ আল্লাহ তায়ালার তরফ থেকে তাওবা কবুল না হবে, ততক্ষণ এভাবেই থাকবেন।'[৭৯১]

সপ্তম দিন আবু লুবাবা রাদিয়াল্লাহু আনহু বেহুঁশ হয়ে যান। এ সময়ই আল্লাহর তরফ থেকে ক্ষমার সুসংবাদ এসে যায়। যখন আবু লুবাবাকে (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এই সুসংবাদ শোনানো হয়, তখন তিনি বলতে থাকেন, 'যতক্ষণ না নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের রশি খুলবেন, ততক্ষণ আমরা এ অবস্থাতেই থাকব।' অবশেষে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ হাতে তাদের বাঁধন খুলে দেন। হজরত আবু লুবাবা রাদিয়াল্লাহু আনহু এই গুনাহর কাফফারা হিসাবে তার সব সম্পদ সদকা করার সঙ্কল্প করেন।[৭৯২] অপর ছয় সাথিও একই ইচ্ছা প্রকাশ করেন।[৭৯৩] তখন নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, 'এক-তৃতীয়াংশ যথেষ্ট।'[৭৯৪]

---

৭৯০. তাবাকাতে কুবরা, ইবনে সা'দ : ৮/৩৮

৭৯১. দালাইলুন নুবুওয়াহ, বাইহাকি : ৫/২৭২

৭৯২. মুসান্নাফে আবদুর রাজ্জাক : হাদিস নং ৯৭৪৫

৭৯৩. দালাইলুন নুবুওয়াহ, বাইহাকি : ৫/২৭২

৭৯৪. মুসান্নাফে আবদুর রাজ্জাক : হাদিস নং ৯৭৪৫

হজরত আবু লুবাবা রা. এর তাওবার সময়কাল

কিছু রেওয়ায়েত মোতাবেক এটি গাজওয়া বনু কুরাইজার ঘটনা। বনু কুরাইজার ইহুদিরা রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর সিদ্ধান্ত মেনে নিয়ে এ ব্যাপারে হজরত

কাব বিন মালিক এবং তার সঙ্গীদের তাওবা

গাজওয়ায়ে তাবুক থেকে পিছিয়ে থাকা বাকি তিন সাহাবি কাব বিন মালিক, মুরারা বিন রাবি এবং হিলাল বিন উমাইয়া (রাদিয়াল্লাহু আনহুম)। তাদের পরীক্ষার সময় অনেক দীর্ঘ ছিল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর নির্দেশে মুসলমানদেরকে তাদের সঙ্গে সালাম, কথাবার্তা বলা নিষেধ করে দেন। তাদের সাথে সামাজিক বিচ্ছিন্নতা পঞ্চাশদিন স্থায়ী হয়।

এই তিনজনের মধ্যে মুরারা বিন রাবি এবং হিলাল বিন উমাইয়া (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) তো তীব্র কষ্ট ও ব্যথা-বেদনায় নিজেদের ঘরবন্দি করে রাখেন। অন্যদিকে কাব রাদিয়াল্লাহু আনহু অত্যন্ত শক্ত মনের মানুষ ছিলেন। তিনি মসজিদে নববি এবং হাঁটবাজারে আসা-যাওয়া করতেন; কিন্তু কোনো মুসলমান তাকে সালাম দিত না, তার সাথে কথা বলত না। সে সময়েই বনু গাসসানের শাসক এক নিবতি বণিক-মারফত একটি পত্র প্রেরণ করে। তাতে লেখা ছিল 'আমি জানি তোমার নবী তোমার সঙ্গে কত মন্দ আচরণ করেছে। আল্লাহ তোমাকে লাঞ্ছনার স্থানে না রাখুক। তুমি আমাদের কাছে এসে পড়। আমরা তোমার যথাযোগ্য সম্মান দেব।'[৭৯৫]

আবু লুবাবা রা. এর পরামর্শ চায় (কারণ, তিনি ইহুদিদের মিত্র ছিলেন)। তিনি তার গলায় হাত বুলালেন। এরপর ইহুদিদের দিকে ইশারা করে দেখালেন যে, হত্যার সিদ্ধান্তই ভালো হবে। ইহুদিরা তখন সাদ বিন মুআজকে বিচারক হিসেবে মেনে নেওয়া উত্তম মনে করে। [মুসান্নাফে আবদুর রাজ্জাক : হাদিস নং ৯৭৪৬, মুসান্নাফ ইবনে আবি শাইবাহ : হাদিস নং ৩৬৭৯৬, মাজমাউয যাওয়াইদ : খণ্ড ১০, হাদিস নং ৫৫, হাইসামি বলেন, এই হাদিসের একজন রাবি মুহাম্মদ বিন আমর বিন আলকামা, তিনি হাসানুল হাদিস, আর বাকি রাবিরা সিকাহ বা নির্ভরযোগ্য]

কিন্তু উপরোক্ত রেওয়ায়েতগুলোতে কোথাও নেই যে, আবু লুবাবা রা. অনুশোচনার কারণে মসজিদের খুঁটিতে নিজেকে বেঁধে রেখেছিলেন। এটি ইবনে ইসহাকের রেওয়ায়েতে যুক্ত হয়েছে। [সিরাতে ইবনে হিশাম : ২/২৩৭] ইমাম বাইহাকিও মুসা বিন উকবা থেকে এটি উল্লেখ করেছেন। [দালাইলুন নুবুওয়াহ, বাইহাকি : ৪/১৩]

ইমাম হালাবির নিকট উক্ত রেওয়ায়েত গ্রহণযোগ্য হলে বুঝতে হবে, হজরত আবু লুবাবা রা. দু'বার নিজেকে বেঁধেছেন। (وعلى هذا فقد تكرر منه ربط نفسه)[আসসিরাতুল হালাবিয়্যাহ : ৩/২০৭]

ইবনে কাসির রহ. অত্যন্ত জোর দিয়ে বলেন যে, হজরত আবু লুবাবা রা. দু'বার নিজেকে বেঁধেছেন। [আলবিদায়া ওয়ান নিহায়া : ৭/২২০]

৭৯৫. হজরত কাব বিন মালিক রা. এর রেওয়ায়েত বুঝা যায় যে, গাসসানি শাসকের ঐ চিঠি সামাজিক বয়কটের চল্লিশদিনের মাথায় পৌঁছেছিল। তার অর্থ ছিল রোমানদের গুপ্তচর মদিনাতে বিদ্যমান ছিল এবং এখানকার সংবাদ নিয়মিত তাদের কাছে পৌঁছে দিত। অন্যথায় গাসসানিরা কীভাবে এখানকার সংবাদ জানতে পারবে! মদিনা থেকে গাসসানি এলাকা প্রায় ৯০০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। দ্বিতীয় সপ্তায় তারা এই সংবাদ পেয়ে যায় এবং চতুর্থ সপ্তাহে আকর্ষণীয় সেই আমন্ত্রণও মদিনায় পৌঁছে দেয়।

হজরত কাব বিন মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহুর মধ্যে ঈমানি জজবা জেগে ওঠে। তিনি এই কথা বলে চিঠিটা আগুনের চুলায় ফেলে দেন যে, 'এটাও একটা পরীক্ষা।'

উপর্যুক্ত তিন সাহাবিই তাওবা-ইসতিগফারে নিবিষ্ট থাকেন। তাদের এই অবস্থা দেখে অন্য সাহাবিরাও খুব চিন্তিত হয়ে পড়েন। স্বয়ং নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অত্যন্ত বিষণ্ন ছিলেন। পঞ্চাশদিন পূর্ণ হওয়ার পর ফজরের নামাজের পর নিম্নোক্ত আয়াত নাজিল হয়,

> وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّىٰ إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ
>
> এবং অপর তিনজনের উপরও (আল্লাহ তায়ালা রহমতের দৃষ্টি দিলেন), যাদেরকে পেছনে রাখা হয়েছিল, যখন পৃথিবী বিস্তৃত হওয়া সত্ত্বেও তাদের জন্য সঙ্কুচিত হয়ে গেল এবং তাদের জীবন দুর্বিসহ হয়ে উঠল আর তারা বুঝতে পারল আল্লাহ ব্যতীত কোনো আশ্রয়স্থল নেই- অতঃপর তিনি সদয় হলেন তাদের প্রতি যাতে তারা ফিরে আসে। নিঃসন্দেহে আল্লাহ দয়াময় করুণাশীল।'[৭৯৬]

উক্ত আয়াতে তিন সাহাবির তাওবা কবুল হওয়ার সুসংবাদ দেওয়া হয়। নবীজিসহ সকল সাহাবি সেদিন যারপরনাই খুশি হন। মসজিদে নববিতে আনন্দের এক ফল্গুধারা বয়ে যায়। সাহাবায়ে কেরাম তাদেরকে মোবারকবাদ জানানোর জন্য দৌড়ে যান। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেহারা আনন্দে তখন চাঁদের মতো জ্বলজ্বল করছিল।

হজরত কাব বিন মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পায়ের কাছে এসে বসে আরজ করলেন, 'ইয়া রাসুলাল্লাহ, তাওবা কবুলের ঘোষণা আপনার পক্ষ থেকে নাকি আল্লাহ তায়ালার তরফ থেকে?' নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'আল্লাহর তরফ থেকে'। তখন কাব বিন মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু অনুমতি চাইলেন, এই অপরাধের কাফফারা হিসাবে তিনি তার সমুদয় সম্পত্তি আল্লাহর রাস্তায় সদকা করে দিতে চান।' নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'কিছু সম্পদ রেখে দাও, তোমার জন্য উত্তম হবে।'

---

৭৯৬. সুরা তাওবা, আয়াত ১১৮

হজরত কাব রাদিয়াল্লাহু আনহু আরজ করলেন, আমার সত্য বলার কারণে আল্লাহ আমাকে মুক্তি দিয়েছেন। আমি আমার তাওবা কবুল হওয়ার শুকরিয়া আদায়স্বরূপ প্রতিজ্ঞা করছি, আর কখনোই মিথ্যা বলবো না।' এরপর জীবনভর তিনি তার প্রতিজ্ঞায় অবিচল ছিলেন।[৭৯৭]

***

৭৯৭. সহিহ বুখারি : হাদিস নং ৪৪১৮ (কিতাবুল মাগাজি, বাবু হাদিসি কাব বিন মালিক), তারিখে ইবনে খালদুন : ২/৪৬৯

বিভিন্ন প্রতিনিধিদলের আগমন

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাবুক থেকে প্রত্যাবর্তনের কিছুদিন পরই মদিনায় বিভিন্ন কবিলা থেকে একের পর এক প্রতিনিধিদলের আগমন শুরু হয়। এরা ছিল সেসব লোক, যারা মক্কা বিজয়ের সময় থেকে নিয়ে দীর্ঘ এক বছর পর্যন্ত ইসলাম সম্পর্কে খুব চিন্তাফিকির করে হৃদয়ের গভীর থেকে ইসলাম গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নেয়।

এইসব প্রতিনিধিদলের আগমনের ফলে খুব স্বল্পসময়ে ইসলামের দাওয়াত প্রচার-প্রসার লাভ করে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কবিলাগুলোকে যথাযথ সম্মান করেন। বিভিন্ন কবিলার উত্তম বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলি প্রকাশ করে করে তাদের হিম্মত বুলন্দ করেন। কারো নির্দিষ্ট কোনো ত্রুটি দেখলে তার ব্যাপারে সতর্ক করেন।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেইসব প্রতিনিধিদলকে অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে ইসলামের আকিদা, দীনের আরকান এবং শরিয়তের বিধান শিক্ষা দেন। যেহেতু ইলমপিপাসু সাহাবায়ে কেরাম অধিক পরিমাণে নবীজির দরবারে উপস্থিত থাকতেন; এজন্য ওই সময়ের রেওয়ায়েতগুলোও অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে সংরক্ষিত থাকে। পাশাপাশি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেহেতু সর্বশেষ নবী, তাই তার আনীত শরিয়ত পূর্ববর্তী শরিয়তের জন্য নাসিখ বা রহিতকারী বলে সাব্যস্ত হয়।[৭৯৮]

তায়েফের প্রতিনিধিদল

মক্কা বিজয় এবং গাজওয়ায়ে হুনাইনের পর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তায়েফ অবরোধ করেছিলেন। কিন্তু তায়েফ নগরীর তিরন্দাজদের তিরবৃষ্টিতে দিশেহারা হয়ে সাহাবায়ে কেরাম আরজ করলেন, 'ইয়া রাসুলাল্লাহ, বনু সাকিফের জন্য আপনি বদদোয়া করুন। তাদের তিরগুলো আমাদের শেষ করে দিচ্ছে।'

কিন্তু করুণার আধার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই দোয়া করেন, 'হে আল্লাহ, আপনি বনু সাকিফকে হেদায়েত দিন।'[৭৯৯] তার এই দোয়া কবুল হয়।

৭৯৮. সহিহ বুখারি (কিতাবুল মাগাজি, বাবু ওয়াফদি বনি তামিম, বাবু ওয়াফদি আবদিল কায়স, বাবু কুদুমিল আশআরিইয়ীন ওয়া আহলিল ইয়ামান, বাবু কিসসাতি ওয়াফদি তাই)

৭৯৯. সুনানে তিরমিজি : হাদিস নং ৩৯৪২ (আবওয়াবুল মানাকিব)

গাজওয়ায়ে তাবুকের পর সর্বপ্রথম তায়েফের প্রতিনিধিদল এসে ইসলাম গ্রহণ করে। হজরত উসমান বিন আবুল আস রাদিয়াল্লাহু আনহুকে তাদের প্রশাসক নিযুক্ত করেন। নওজোয়ান হওয়ার পাশাপাশি তার জ্ঞান ও বিচক্ষণতার খুব খ্যাতি ছিল।

তায়েফের প্রসিদ্ধ মূর্তি 'লাত'- সমগ্র আরবে তার অর্চনা হতো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু সুফিয়ান বিন হারব এবং মুগিরা বিন শুবাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা)-কে পাঠিয়ে তা চূর্ণবিচূর্ণ করে ফেলেন।[৮০০]

বনু তামিম প্রতিনিধিদল

বনু তামিমের লোকেরা এসে ইসলাম গ্রহণ করে। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের প্রশংসা করে বলেন, 'আমার উম্মতের মধ্যে এই লোকেরা দাজ্জালের সবচেয়ে কঠিন বিরোধী হবে।'

হজরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহার নিকট বনু তামিমের এক বাঁদি ছিল। নবীজি তাকে আজাদ করে দেওয়ার নির্দেশ দেন। সে হজরত ইসমাইল আলাইহিস সালামের বংশধর।

বনু তামিমের পক্ষ থেকে জাকাত প্রদান করা হলে তিনি বললেন, 'এটি আমার কওমের জাকাত।'[৮০১]

বনু তামিমের প্রতিনিধিদলে সা'সাআ বিন নাজিয়াও ছিলেন।[৮০২] তিনি দীনের আহকাম এবং কুরআন শেখার পর বললেন, 'ইয়া রাসুলাল্লাহ, ইসলাম গ্রহণের পূর্বে আমি যত ভালো কাজ করেছি, তার প্রতিদান কি আমি পাবো?'

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করেন, 'তুমি কী করেছ?'

সা'সাআ বিন নাজিয়া আরজ করলেন, 'জাহিলিযুগে একবার আমার দুই মাসের গর্ভবতী দুটি উটনী নিখোঁজ হয়ে গেল। আমি একটি উটে সওয়ার হয়ে সেগুলো খুঁজতে বের হই। এ সময় খোলা মরুপ্রান্তরের এক জায়গায় একজন বৃদ্ধকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখি। তাকে আমি আমার উটনী সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, 'উটনীদুটো আমার নিকট আছে। দুটোই বাচ্চা জন্ম দিয়েছে।' এ সময় ঘরের ভেতর থেকে নারীকণ্ঠ ভেসে আসে, 'ভূমিষ্ঠ হয়ে গেছে।'

বুড়ি সাথে সাথে বললেন, যদি ছেলে সন্তান জন্ম হয়, তা হলে এতে কওমের হিস্যা রয়েছে, আর যদি কন্যাসন্তান হয় তা হলে তাকে পুঁতে ফেলবে।

---

৮০০. আলকামিল ফিত তারিখ : ২/১৫১

৮০১. সহিহ বুখারি : হাদিস নং ৪৩৬৬ (কিতাবুল মাগাজি, বাবু ওয়াফদি বনি তামিম)

৮০২. তাবাকাতে ইবনে সা'দ : ৭/৩৮

আমি বুড়িকে বললাম, মেয়েটি কার?

বললেন, আমার।

বললাম, আমি তাকে খরিদ করতে চাই।

বৃদ্ধা বলল, কত মূল্য দেবে?

আমি বললাম, ওই দুটি উটনী ও তার বাচ্চা।

বৃদ্ধা বলল, তোমার সঙ্গের উটটিও দিয়ে দাও।

বললাম, ঠিক আছে, তাই হবে; কিন্তু তোমাদের একজনকে আমার সঙ্গে যেতে হবে। আমি ঘরে পৌঁছে এই উটনীটি তোমাদের হস্তান্তর করব।

বৃদ্ধা সম্মত হয়ে যায়। আমি ঘরে পৌঁছে তাকে আমার উটটি দিয়ে দিই। আমি সেই রাতে ভাবলাম এভাবে একটি শিশুকে বাঁচানোর মতো পুণ্যের কাজ আরবের কেউ ইতোপূর্বে করেনি। তারপর থেকে ইসলামের আবির্ভাব পর্যন্ত আমি ৩৬০ শিশুর প্রাণ বাঁচিয়েছি। প্রতিটি শিশুর বিনিময়ে আমি দশ মাসের গর্ভবতী দুটি উটনী এবং একটি উট প্রদান করেছি। এখন আমি কি ঐগুলোর বিনিময় পাবো?'

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এই ইসলাম হলো নেকির দরজা। এর মাধ্যমে তুমি সকল পুণ্যের প্রতিদান পাবে। কারণ, তোমাকে আল্লাহ তায়ালা ইসলামগ্রহণের তাওফিক দিয়েছেন।'[৮০৩]

আদি বিন হাতেম রাদিয়াল্লাহু আনহুর ইসলাম গ্রহণ

ওই বছরই হজরত আলি রাদিয়াল্লাহু আনহু আরবের প্রসিদ্ধ দাতা ও দানবীর সম্রাট হাতেম তায়ির তায় গোত্রের এলাকায় যুদ্ধাভিযানে গমন করেন। তারা

৮০৩. আলআহাদ ওয়াল মাসানি, ইবনে আবি আসিম : হাদিস নং ১১৯৯

ফায়দা : ১। সা'সাআ বিন নাজিয়া রা. প্রখ্যাত কবি ফারাযদাকের দাদা ছিলেন।

ফায়দা : ২। কোনো নওমুসলিম যদি কাফের অবস্থায় নেক কাজ করে, তার পুণ্য ও সওয়াব পাওয়ার ব্যাপারে ইমাম নববি রহ. এর মত হলো, সে তার পূর্ণ সওয়াব পাবে। যেমন: সা'সাআহ বিন নাজিয়া রা. এর হাদিস। তা ছাড়া হজরত হাকিম বিন হিযাম রা. থেকে সহিহ মুসলিম বর্ণিত [হাদিস নং ৩৩৮]

আরেকটি হাদিস থেকেও তার সমর্থন পাওয়া যায়। নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'তুমি তো পূর্বের নেক কাজের উপরই ইসলামগ্রহণ করেছো।'

কিছু কিছু আলেম বলেন, কুফরি অবস্থায় করা নেক আমলের সাথে আখিরাতের সম্পর্ক নেই। পার্থিব বিনিময় উদ্দেশ্য থাকে।

কেউ কেউ বলেন, এসব নেককাজের বরকতে তার ইসলামগ্রহণের তাওফিক হবে। [শরহে নববি আলা মুসলিম : ২/১৪০, নায়লুল আওতার, শাওকানি : ১/৩৭১]

'রকুসি' সম্প্রদায়ের খ্রিষ্টান। তাদের আকিদা ছিল 'সাবি'[৮০৪] সম্প্রদায়ের আকিদার সাথে সামঞ্জস্যশীল। তারা 'ফালাস' নামক এক মূর্তিকে পূজা করত। হজরত আলি রাদিয়াল্লাহু আনহু তা ভেঙে দিলেন এবং সেখানকার অনেক লোককে কয়েদি বানিয়ে মদিনায় নিয়ে আসেন। তাদের মধ্যে হাতেম তায়ির 'সাফ্ফানা' নাম্নী এক কন্যাও ছিল।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে পোশাক-পরিচ্ছদ ও বাহন-পরিবহনসহ অনেক হাদিয়া-তোহফা, রসদ ইত্যাদি দিয়ে সসম্মানে আজাদ করে দিলেন। আজাদ হওয়ার পর তারা আপন এলাকায় ফিরে যায়। সাফফানা প্রত্যাবর্তন করেই আপন ভাই আদি বিন হাতেমের সাথে সাক্ষাৎ করে, যিনি হজরত আলি রাদিয়াল্লাহু আনহুর আক্রমণের সময় পালিয়ে গিয়েছিলেন। তিনি যখন বোনের মুখে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মহান আখলাকের বিবরণ শুনতে পেলেন তখন সরাসরি মদিনায় চলে আসেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর তার প্রথম দৃষ্টি পড়ে তখন, যখন তিনি রাস্তার এক গলির মাথায় দাঁড়িয়ে এক বুড়িমার কথা শুনছিলেন। ওই বুড়িমা দীর্ঘক্ষণ সেখানে দাঁড়িয়ে নিজের দাবি-দাওয়া বলে যাচ্ছে আর তিনি তা ধৈর্য সহকারে শুনে যাচ্ছেন। আদি বিন হাতেম এই দৃশ্য দেখেই বলতে লাগলেন, 'এ লোক তো নিছক বাদশাহ নন।'[৮০৫]

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে যখন তিনি হাজির হলেন তখন শোরগোল শোনা গেল, 'আদি বিন হাতেম এসেছে'।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে দেখে বললেন, 'আদি, ইসলাম গ্রহণ করো, নিরাপদ থাকবে'।

আদি বললেন, 'নবী করিম, আমি তো পূর্ব হতেই একটি ধর্মের অনুসারী হয়ে আছি।'

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হ্যাঁ, আমি তোমাদের ধর্ম সম্পর্কে তোমাদের অপেক্ষা অনেক ভালো অবগত আছি।

তিনি অবাক হয়ে বললেন, 'সে আবার কীভাবে? '

তিনি জবাব দিলেন, তোমরা কি রকুসি সম্প্রদায়ের লোক নও?

বলল, জি হ্যাঁ।

---

৮০৪. সাবি সম্প্রদায়ের কথা ইতোপূর্বে 'আরববাসীদের ধর্মীয় অবস্থা' শীর্ষক আলোচনায় বর্ণিত হয়েছে।

৮০৫. আলকামিল ফিত তারিখ : ২/১৫১

তিনি বললেন, তোমরা কি আপন সম্প্রদায় হতে এক-চতুর্থাংশ সম্পদ গ্রহণ করে থাকো না?

বলল, জি হ্যাঁ।

তিনি বললেন, 'তবে এমন তো তোমাদের ধর্মে জায়েজ নেই?'

বলল, জি হ্যাঁ।

এরপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তা হলে হে আদি, তুমি সেদিন পলায়ন করেছিলে কেন? এজন্যই নয় কি, যাতে কোনো উপায়ে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলা হতে মুক্তি পাওয়া যায়? তা হলে বলো দেখি, আল্লাহ তায়ালা ছাড়া কোনো মাবুদ হতে পারে? তুমি কি এজন্য পলায়ন করোনি, যাতে মুখে 'আল্লাহু আকবার' বলতে না হয়? তা হলে বলো দেখি, আল্লাহ অপেক্ষা বড় ও মহান কে হতে পারে?

আরো বললেন, 'আদি, আমি খুব ভালো করেই জানি তুমি ইসলাম গ্রহণ হতে কেন এতো টালবাহানা করছো? আর তা এজন্য যে, ইসলামের অনুসারী তুমি শুধু গরিব লোকদেরই দেখতে পাচ্ছো? শোনো হে আদি, 'হিরা' নামক স্থান সম্পর্কে অবগত আছো?

বলল, কেবল নামই শুনেছি, কখনো দেখিনি।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'কসম ওই পবিত্র সত্তার, যার কুদরতি হাতে আমার জীবন, ইসলামের প্রভাবে এক সময় এমন হবে যে, হিরা হতে এক জন নারী একা একা সফর করতে করতে বাইতুল্লাহয় পৌঁছে যাবে; কিন্তু তার কোনো পাহারাদারের প্রয়োজন হবে না।'

একথা আদি বিন হাতেমের অন্তরে এত গভীরভাবে রেখাপাত করল যে, এর প্রতিক্রিয়াতেই তিনি ইসলাম গ্রহণ করলেন। আর তার দাওয়াতে তার গোত্রের প্রত্যেকেই ইসলামের ছায়ায় চলে আসে।[৮০৬]

আবদুল্লাহ বিন উবাইয়ের মৃত্যু

৯ম হিজরির যিলকদ মাসে ইসলামের ঘোরতর শত্রু, মুনাফিকদের সরদার আবদুল্লাহ বিন উবাই বিন সালুল টানা বিশদিন রোগাক্রান্ত থেকে মারা যায়। তার সর্বশেষ আকুতি ছিল, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেন তাকে আপন জামা পরিধান করিয়ে কাফনাবৃত করেন এবং তিনিই তার জানাজার নামাজ পড়ান। তার জন্য মাগফিরাতের দোয়াও করেন। তার পুত্র আবদুল্লাহরও এমন ইচ্ছা ছিল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পুত্র

৮০৬. আলবিদায়া ওয়ান নিহায়া : ৭/২৯৪-২৯৬; মুসনাদে আবু দাউদ তয়ালিসি : ১১৩৫

আবদুল্লাহর আশা পূরণকল্পে এমনটাই করলেন। কিন্তু যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার কাফন-দাফন সম্পন্ন করে মাগফিরাতের দোয়া করে অবসর হলেন, তখন সুরা তাওবার এই আয়াতগুলো নাজিল হয়, যেখানে মুনাফিকদের জানাজা পড়ানো এবং তাদের জন্য মাগফিরাতের দোয়া করতে বারণ করা হয়।[৮০৭]

ইসলামের দিকে দলে দলে মানুষের আগমন

ইসলাম গ্রহণ করতে আগ্রহী বিভিন্ন গোত্রের আগমনধারা বিরতিহীনভাবে চলে আসছিল। এমন কোনো দিন যেত না, যেদিন কোনো গোত্র ইসলাম গ্রহণের উদ্দেশ্যে মসজিদে নববিতে এসে হাজির হতো না। ইসলাম গ্রহণ করার পর তারা দীনের বিধানাবলি শিখত। তাই সে বছরকে 'আমুল উফুদ (বিভিন্ন সম্প্রদায়ের আগমনের বছর)' বলা হতো।

বনু আসাদ, বনু ফাযারা, বনু কিলাব, বনু বাক্কা, বনু কিনানা, বনু হিলাল বিন আমের ও বনু বকর বিন ওয়ায়েল, আজ্‌দসহ প্রসিদ্ধ গোত্রগুলোর লোকেরা ইসলাম গ্রহণ করল। ইয়েমেন, ওমান ও বাহরাইন থেকেও দলে দলে লোকজন আসতে থাকে। বিশেষ করে, ইয়ামানের হিময়ার রাজ্যের প্রতিনিধিদলগুলো সে বছরেই আসতে থাকে।

ওয়ায়েল বিন হুজর, জারির বিন আবদুল্লাহ, আশআস বিন কায়েস, তামিম দারি (রাদিয়াল্লাহু আনহুম)-এর মতো সম্ভ্রান্ত আরবরা এ বছরই ইসলাম গ্রহণ করেন। বনু সা'দ বিন বকরের সরদার জিমাম বিন

সা'লাবাও রাসুলের দরবারে এসে ইসলামধর্মে দীক্ষিত হন। এরপর তিনি স্বীয় গোত্রে গিয়ে অত্যন্ত জোশ ও বিপুল উদ্যম ও সাহসিকতার সাথে ইসলামের দাওয়াত দিতে থাকেন। ফলে একদিনের মধ্যেই গোটা গোত্র ইসলামধর্মে দীক্ষিত হয় এবং লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ পড়ে নেয়।[৮০৮]

---

৮০৭. আলবিদায়া ওয়ান নিহায়া : ৭/২১৮-২১৯

৮০৮. আলকামিল ফিত তারিখ : ২/১৫৫

হাফেজ ইবনে কাসির রহ. একশ পৃষ্ঠারও বেশি এসব প্রতিনিধি-আগমনের সবিস্তার আলোচনা করেছেন। [আলবিদায়া ওয়ান নিহায়া : ৭/২৩২-৩৬৪]

হজ ফরজ হওয়া এবং সর্বপ্রথম হজ

তখনও প্রতিনিধিদলের আগমনের ধারা অব্যাহত গতিতে চলছিল। এর মধ্যেই হজের মৌসুম চলে আসে। ইতোমধ্যে হজের বিধানও প্রবর্তিত হয়ে যায়। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নবম হিজরির যিলকদ মাসে হজরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে আমির নিযুক্ত করে তিনশ হাজির এক বিশাল কাফেলা মক্কার উদ্দেশে রওনা করান। সাহাবিগণের অধিকাংশই সে বছর হজে শরিক হননি। কারণ, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাচ্ছেন না। মূলত তখনও মুশরিকদের হজে অংশগ্রহণের বিষয়ে কোনো নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হয়নি। তাই সে বছরও যথানিয়মে তারা অনেক পরিমাণে হজে অংশগ্রহণ করে। তাদের বেহুদা রুসম-রেওয়াজ, বিশেষ করে উলঙ্গ তাওয়াফ করার মতো জঘন্য পাপাচার যেখানে হয়, সেখানে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপস্থিতি একটি অসম্ভব বিষয়ও ছিল।[৮০৯]

আর সেই সাথে আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হতে এ সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হয়েছিল যে, মুশরিকদের এই ভ্রান্ত রুসম-রেওয়াজ অচিরেই মিটিয়ে দেওয়া হবে। হজরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহুর হজের উদ্দেশে রওনা হওয়ার পরপরই সুরা তাওবার নিম্নযুক্ত আয়াতগুলো অবতীর্ণ হয়। যার শুরুটা ছিল এমন-

> بَرَاءَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ
>
> সম্পর্কচ্ছেদ করা হলো আল্লাহ ও তার রাসুলের পক্ষ থেকে সেই মুশরিকদের সাথে, যাদের সাথে তোমরা চুক্তিবদ্ধ হয়েছিলে। অতঃপর তোমরা পরিভ্রমণ করো এ দেশে চার মাস। আর জেনে রেখো, তোমরা আল্লাহকে পরাভূত করতে পারবে না। নিশ্চয়ই আল্লাহ কাফেরদেরকে লাঞ্ছিত করে থাকেন। আর মহান হজের দিনে আল্লাহ ও তার রাসুলের পক্ষ থেকে লোকদের প্রতি ঘোষণা করে দেওয়া হচ্ছে যে, আল্লাহ মুশরিকদের থেকে দায়িত্বমুক্ত এবং

---

৮০৯. তাফসিরে ইবনে কাসির : ৪/১০৩; সুরা তাওবা, আয়াত ৩

তার রাসুলও। অবশ্য যদি তোমরা তাওবা কর, তবে তা তোমাদের জন্যও কল্যাণকর, আর যদি মুখ ফেরাও, তবে জেনে রেখো, আল্লাহকে তোমরা পরাভূত করতে পারবে না। আর কাফেরদেরকে মর্মান্তিক শাস্তির সুসংবাদ দিয়ে দাও।[৮১০]

এ ধারায় সামনে এ নির্দেশও জারি হয়-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلاَ يَقْرَبُواْ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا

হে মুমিনগণ, মুশরিকরা তো অপবিত্র। সুতরাং এ বছরের পর তারা যেন মসজিদে হারামের নিকট না আসে।[৮১১]

সঙ্গে সঙ্গে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হজরত আলি রাদিয়াল্লাহু আনহুকে সুরা তাওবার উক্ত আয়াতগুলো শুনিয়ে দিয়ে সে মোতাবেক এই মর্মে প্রজ্ঞাপন জারি করে মক্কা-অভিমুখে প্রেরণ করেন যে, 'আজকের পর থেকে কোনো মুশরিকের জন্য হজ করার অনুমতি নেই। আর কখনো কেউ উলঙ্গ হয়ে বাইতুল্লাহ তাওয়াফ করতে পারবে না। যেসব গোত্রের সাথে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চুক্তি ছিল নির্ধারিত সময়সীমা পর্যন্ত সেসব চুক্তি আপন অবস্থায় বলবৎ থাকবে। এ ছাড়া অন্যদেরকে শুধু চার মাসের অবকাশ দেওয়া হবে। এরপর কারো সাথে কোনো চুক্তি থাকবে না।[৮১২]

---

৮১০. সুরা তাওবা, আয়াত ১, ২ ও ৩।
মাওলানা আবদুল মাজেদ দরিয়াবাদি রহ. এ আয়াতগুলোর তাফসিরে লেখেন, مِّنَ الْمُشْرِكِينَ এখানে মুশরিক দ্বারা ঐ সকল মুশরিকই উদ্দেশ্য, যারা প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের অপরাধে লিপ্ত ছিল। [তাফসিরে মাজেদি : সুরা তাওবা, আয়াত ১]

৮১১. সুরা তাওবা, আয়াত ২৭

৮১২ মুসনাদে আহমাদ : হাদিস নং -৭৯৭৭ (সনদ সহিহ); ইমাম বুখারি রহ. হাদিসটি সংক্ষিপ্তাকারে উল্লেখ করেছেন। [সহিহ বুখারি : ৩৬৯, হাদিস নং ১৭৭]।

হজরত সিদ্দিকে আকবার রা. এর হজবিষয়ক একটি পর্যালোচনা

সিরাতবিদগণ এ মর্মে একমত পোষণ করেছেন যে, এ হজ নবম হিজরির যিলহজ মাসে অনুষ্ঠিত হয়েছে। আর খ্রিষ্টাব্দ হিসেবে তার তারিখ ছিল সেপ্টেম্বর, ৬৩১ খ্রিষ্টাব্দ। হজরত ইসহাক আলাবি রহ. এর মত অনুসারে হজরত আবু বকর সিদ্দিক রা. এর এ হজ তাবুকযুদ্ধের পূর্বে অনুষ্ঠিত হয়েছে। [নুকুশ, রাসুল নম্বর : ২/১৯৪]

তার নিকট এর প্রধান দলিল হলো, সুরা তাওবাতে তাবুকযুদ্ধের বিস্তর আলোচনা উল্লেখ হয়েছে। সুতরাং তখন তাবুকযুদ্ধ নিশ্চিতভাবে সংঘটিত হয়ে গিয়েছিল। এ সুরার প্রথম আয়াতগুলো সিদ্দিকে আকবার রা. তার নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত হজে পড়ে শুনিয়েছিলেন, যা এর পূর্বে নাজিল হয়েছিল। কিন্তু তার এ দলিলটি তখনই গৃহীত হতে পারে যখন এ কথা স্বতঃসিদ্ধভাবে মেনে নেওয়া যাবে যে, কুরআন মাজিদ যে তারতিবে নাজিল হয়েছে সে তারতিবেই তা লেখা হয়েছে। অথবা এ কথা সুদৃঢ়ভাবে জানা যাবে যে, সুরা তাওবা ঐসকল সুরার অন্তর্ভুক্ত, যা

সম্পূর্ণ একসাথে নাজিল হয়েছে।

এ কথা চূড়ান্ত যে, বর্তমান কুরআনের তারতিব নাজিল হওয়ার তারতিবের ব্যতিক্রম। কিছু সুরা নাজিল হওয়ার দিক দিয়ে প্রথমে নাজিল হয়েছে; কিন্তু লেখার দিক দিয়ে পরে লেখা হয়েছে। অনুরূপভাবে কিছু আয়াত নাজিল হওয়ার দিক দিয়ে পরে নাজিল হয়েছে; কিন্তু লেখার দিক দিয়ে আগেই লেখা হয়েছে। আবার একই সুরার কোনো কোনো অংশ নাজিল হওয়ার দিকে মাঝখানে এক বছরেরও ব্যবধান হয়ে যেতো। এরইমাঝে এক বা একাধিক সুরাও নাজিল হয়ে যেতো। যেমন: সুরা মায়িদার ৬নং আয়াত, যার দ্বারা তায়াম্মুমের হুকুম প্রবর্তিত হয়েছে, তা মুরাইসি যুদ্ধাভিযানে নাজিল হয়েছে [সহিহ বুখারি : হাদিস নং ৪৬০৮]। অথচ এ সুরারই ৩নং আয়াত, যার মধ্যে দীনের পূর্ণতা সাধনের কথা উল্লেখ রয়েছে- তা কয়েক বছর পর বিদায় হজের সময় নাজিল হয়েছে। [সহিহ বুখারি : হাদিস নং ৪৫]

হজরত উসমান রা. হতে বর্ণিত,

كان إذا نزل عليه الشئ دعا بعض من كان يكتب فيقول : ضعوا هؤلاء الآيات في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا وإذا نزلت عليه الآية فيقول : ضعوا هذه الآية في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا

[সুনানে তিরমিজি : হাদিস নং ৩০৮৬, আবওয়াবু তাফসিরিল কুরআন, বাবু সুরাতিত তাওবা, সুনানু আবি দাউদ : হাদিস নং ৭৮৬, কিতাবুস সালাত, মুসনাদে আহমাদ : হাদিস নং ৩৯৯]

হাতেগোনা কয়েকটিই এমন বড় সুরা রয়েছে, যার ব্যাপারে একথা সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ রয়েছে যে, এ সুরা সম্পূর্ণ একসাথে নাজিল হয়েছে। নয়তো সাধারণত অধিকাংশ বড় সুরাই টুকরো টুকরো করে নাজিল হয়েছে। আবার এ কথাও স্মর্তব্য যে, এ টুকরোগুলোকে যে একটি পৃথক কিতাবে লিখে একত্র করা হতো, বিষয়টি এমন ছিল না; বরং প্রত্যেক টুকরোকে পৃথক পৃথক পার্চা বা টুকরো পাতায় লিখে রাখা হতো, যাতে পরিপূর্ণ কুরআন নাজিল হওয়ার পর এসব টুকরো পার্চা একটি ফোল্ডারের আকারে বিন্যস্ত করা যায়।

উল্লেখ্য যে, সুরা তাওবাও কিন্তু ঐ সকল সুরার অন্তর্ভুক্ত, যেগুলো টুকরো টুকরো অংশে নাজিল হয়েছে। এর প্রমাণ হলো, এ সুরা পৃথক পৃথক পার্চাতে লেখা হয়েছে। হজরত যায়েদ ইবনে সাবেত রা. কুরআন একত্রীকরণ মিশনে নিজের অবদানের কথা উল্লেখ করে বলেন, সুরা তাওবার শেষ দুই আয়াত (যা একসঙ্গে নাজিল হয়েছিল) আমি আবু খুযাইমার নিকট লিখিত অবস্থায় পেয়েছি। [সহিহ বুখারি : হাদিস নং ৪৯৮৬ বাবু জামইল কুরআন।]

তাই এও হতে পারে যে, তাবুকযুদ্ধের আয়াতগুলো মাসহাফে লেখার ক্ষেত্রে একেবারে প্রথম নাজিলকৃত আয়াতগুলোরও পূর্বে লেখা হয়েছে। এখন জানার বিষয় হলো, নাজিল হওয়ার সময় এ আয়াতগুলোকে কোন্ সুরার সংশ্লিষ্ট মনে করা হয়েছিল? হজরত উসমান রা. এর বর্ণনা দ্বারা বুঝা যায়, সুরা আনফাল এবং সুরা তাওবার মাঝে বাহ্যত কোনো ব্যবধান ছিল না। তখন উভয় সুরাকে এক সুরাই মনে করা হতো। সুতরাং এটাই যুক্তিযুক্ত যে, যখন তাবুকযুদ্ধের আয়াতগুলো নাজিল হলো তখন সেগুলোকে সুরা তাওবার সাথে মিলিত মনে করা হয়েছে। হজরত উসমান রা. বলেন,

"وكانت الأنفال من أوائل ما نزلت بالمدينة وكانت التوبه من آخر القرآن و كانت قصتها شبيهة بقصتها فظننت أنها منها"

[সুনানে তিরমিজি : হাদিস নং ৩০৮৬, আবওয়াবু তাফসিরিল কুরআন, বাবু সুরাতিত তাওবা, সুনানু আবি দাউদ : হাদিস নং ৭৮৬, কিতাবুস সালাত]

যাই হোক, যখন মাওলানা ইসহাক আলাবি রহ. এই মত ব্যক্ত করে ফেললেন যে, হজরত আবু বকর সিদ্দিক রা. এর হজ তাবুকযুদ্ধের পূর্বেই অনুষ্ঠিত হয়েছিল তখন তিনি একথাও

উল্লেখ্য যে, উক্ত প্রজ্ঞাপন যিলহজের ৯ তারিখে আরাফাতের ময়দানে গোটা আরববিশ্বের লোকদের শোনানো হয়। যেখানে মুসলিম-মুশরিক নির্বিশেষ সকলেই উপস্থিত ছিল। হজরত আলি, হজরত আবু হুরায়রা সহকারে কতিপয় সাহাবি হাজিদের মজমায় ও গ্রুপে গিয়ে গিয়ে এ প্রজ্ঞাপনটি শোনাতে থাকেন। হজরত আলি রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, 'আমি এত বেশি পরিমাণ ঘোষণা

মানতে বাধ্য হবেন যে, এ হজটি মাদানিপঞ্জিকা অনুযায়ী হয়েছিল, যাতে এ যুদ্ধ শীতকালে সংঘটিত হওয়ার সংশয় তৈরি না হয়। অথচ এ কথা প্রবীণ ইতিহাসবিদদের ভাষ্যের পরিপন্থি যে, হজরত আবু বকর রা. এর নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত হজটি মাদানিপঞ্জিকা অনুযায়ী হয়েছিল। ইবনে ইসহাক রহ. হতে বর্ণিত, তিনি ইবনে নাজিহ রহ. (সেকাহ রাবি) হতে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ ইরশাদ- إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السموات و الأرض এর বরাত দিয়ে জিজ্ঞেস করেন যে, তা হলে হজরত আবু বকর সিদ্দিক রা. এর হজ কোন্ মাসে হয়েছিল? তখন তিনি জবাব দিয়েছিলেন, على ما كان الناس يحجون عليه [সিরাতে ইবনে ইসহাক : পৃষ্ঠা ১০০]

সুতরাং জানা গেল যে, উক্ত হজটি জাহেলিযুগের পঞ্জিকা অনুযায়ী ছিল। তাই তাতে মুশরিকরাও শরিক ছিল। যদি এটা বিশুদ্ধ চান্দ্রপঞ্জিকা অনুযায়ী হতো তা হলে মুশরিকরা তাদের নিজস্ব পঞ্জিকার বিপরীতে তাতে শরিক হতো না। যেহেতু আমরা উক্ত হজটিকে মক্কিপঞ্জিকা অনুযায়ী মেনে আসছি; তাই তাবুকযুদ্ধ তারই পূর্বে মক্কি পঞ্জিকা অনুযায়ী গ্রীষ্মকালেই পড়ে থাকে। অর্থাৎ তাবুকযুদ্ধ ৬৩১ খ্রিষ্টাব্দের এপ্রিল থেকে জুন মাসের মধ্যেই অনুষ্ঠিত হয়েছে আর হজরত আবু বকর সিদ্দিক রা. এর হজের তিন মাস পর ৬৩১ খ্রিষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত হয়।

তখন আরাফাহ দিবস হয় ঐ সনের ১২ সেপ্টেম্বর। মাদানিপঞ্জিকা অনুযায়ী তখন ছিল দশম হিজরির জুমাদাল উখরা মাস। অর্থাৎ এটা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অফাতের নয় মাস পূর্বের ঘটনা। সুতরাং উক্ত হজকে তাবুকযুদ্ধের পূর্বে নিয়ে সিরাতবিদদের সুস্পষ্ট ভাষ্যের বিপক্ষে যাওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। তবে একটি রেওয়ায়েতে হজরত বারা ইবনে আযেব রা. এর বক্তব্য বর্ণিত হয়েছে যে, آخر سورة نزلت كاملة براءة [সহিহ বুখারি : হাদিস নং ৪৩৬৪] কিন্তু খোদ ইমাম বুখারি রহ. এই রেওয়ায়েতকে অন্যত্র كاملة শব্দ বাদ দিয়ে উল্লেখ করেছেন। এ ছাড়াও সহিহ বুখারি এবং সহিহ মুসলিমের রেওয়ায়েত একথার প্রমাণ বহন করে যে, সুরা তাওবা একসাথে পূর্ণাঙ্গরূপে নাজিল হয়নি। বরং তার অবতরণ ধীরে ধীরে পর্যায়ক্রমে টুকরো টুকরো আকারে হয়েছে।

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. হতে বর্ণিত-

التوبة هي الفاضحة ما زالت تنزل و منهم حتى ظنوا أنها لن تبقى أحدا منهم الا ذكر فيها

[সহিহ বুখারি : হাদিস নং ৪৮৮২, কিতাবুত তাফসির; সহিহ মুসলিম : হাদিস নং ৭৭৪৩]

তাই তো হজরত বারা বিন আযেব রা. হতে বর্ণিত كاملة শব্দটি হয়তো কোনো রাবির ধারণাপ্রসূত শব্দ হবে, নয়তো তা তাবিলকৃত হবে।

لفظ كاملة ليس بشئ لأن البراءة نزلت شيئا بعد شئ، قلت و لهذا لم يذكر لفظ كاملة في هذا الحديث في التفسير و لفظه هناك : آخر سورة نزلت براءة

[উমদাতুল কারি : ১৮/১৮]

করেছি যে, উচ্চৈঃস্বরে কথা বলার কারণে আমার গলা বসে গিয়েছিল'।[৮১৩]

এই প্রজ্ঞাপন ঘোষণার মাধ্যমে বাইতুল্লাহ ও হারাম শরিফে যুগ যুগ ধরে চলমান মুশরিকদের যাবতীয় শিরকি কর্মকাণ্ড ও ভ্রান্ত রুসম-রেওয়াজ চিরকালের জন্য বন্ধ হয়ে গেল।

কুরআন মাজিদ এই হজকে হজ্জে আকবার বলে নামকরণ করেছে। শত শত বছর পর হজের এ মহান ইবাদতে এ বছরই প্রথম এমন লোকেরা শামিল হতে সক্ষম হয়, যাদের আকিদা-বিশ্বাস কাবানির্মাতা হজরত ইবরাহিম আলাইহিস সালামের আকিদা-বিশ্বাসের সাথে মিল রয়েছে।

বহুকাল পর কাবা, হারাম ও হজে পালনীয় রীতি-নীতি তার নিজস্ব মূল ও পবিত্র আকৃতিতে ফিরে আসতে সক্ষম হয়।[৮১৪]

---

৮১৩. মুসনাদে আহমাদ : হাদিস নং ৭৯৭৭ (সহিহ সনদ)

৮১৪. এর দ্বারা এ কথা পরিষ্কার হয়ে গেল যে, হজ্জে আকবার দ্বারা বিশেষ কোনো হজ উদ্দেশ্য নয়, যেমনটা সাধারণ জনগণের মধ্যে প্রসিদ্ধ আছে। إنما قيل الحج الأكبر من أجل قول فكان حميد يقول : يوم النحر يوم [সহিহ বুখারি : হাদিস নং ৩১৭৭] الناس الحج الأصغر الحج الأكبر من أجل حديث أبي هريرة (সহিহ বুখারি : হাদিস নং ৪৬৫৭]

মাওলানা আবদুল মাজেদ দরিয়াবাদি রহ. লেখেন, হজ্জে আকবার হজকেই বলা হয়। এটা দ্বারা বিশেষ কোনো হজ উদ্দেশ্য নয়। এখানে 'আকবার' শব্দটি শুধু হজ্জে আসগার তথা উমরার বিপরীতে বুঝানোর জন্য ব্যবহার করা হয়।

هذا هو الحج الأكبر لأن العمرة تسمى الحج الأصغر (كبير) قال مجاهد : الحج الأكبر القران الحج الأصغر العمرة (ابن العربي) قال القاضي : إذا نظرنا في هذه الأقوال فالمنقح منها أن الحج كما قال مجاهد (ابن العربي)

ইমাম আবু হানিফা রহ. এবং ইমাম শাফেয়ি রহ. উভয়ে এ কথারই প্রবক্তা। [তাফসিরে মাজেদি, সুরা তাওবা : আয়াত-৩]

একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ও তার জবাব : এখানে এ প্রশ্ন থেকে যায় যে, তা হলে মুসলমানরা জাহেলিপঞ্জিকা হিসেবে কীভাবে হজ করে ফেলল? এর উত্তর হলো, তখন এটাই ছিল শরিয়তসিদ্ধ হজ। যেমন: মুসলমানরা একটা সময় পর্যন্ত বাইতুল মাকদিসকে কিবলা বানিয়ে নামাজ পড়েছে। তখনকার জন্য সেটাই ছিল শরিয়তসিদ্ধ। তাই তখন এভাবেই নামাজ আদায় হয়েছে।

তদ্রূপ বিদায় হজের বিষয়েও যতক্ষণ পর্যন্ত রাসুল সা. আল্লাহর হুকুমে ভ্রান্ত রুসুম-রেওয়াজবিশিষ্ট মক্কিপঞ্জিকা অনুযায়ী হজকে বাতিল বলে ঘোষণা করেননি, ততক্ষণ পর্যন্ত শুধু হজ কেন, রোজাও তো তাদের পঞ্জিকা অনুপাতে আদায় হয়ে এসেছে। হ্যাঁ, যখন তাদের পঞ্জিকা আল্লাহর পক্ষ হতে বাতিল বলে ঘোষিত হয়েছে, তখন এর পরবর্তী সকল বিষয় খাঁটি ইসলামি তথা চান্দ্র হিসাব অনুপাতে আঞ্জাম দেওয়া শুরু হয়েছে। আর বিদায় হজে এমনটিই হয়েছিল।

নাজরানের পাদরিদের সাথে বিতর্ক

১০ম হিজরিতে হজরত খালেদ বিন ওয়ালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশনা মোতাবেক সৈন্যদের নিয়ে নাজরান-অভিমুখে যাত্রা করেন। নাজরান ছিল খ্রিষ্টানদের আবাসভূমি। হজরত খালেদ রাদিয়াল্লাহু আনহু সর্বাগ্রে তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত প্রদান করেন। এর প্রতিকারে নাজরানের পাদরিদের একটি দল মদিনায় এসে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ধর্মীয় বিষয়ে বিতর্কে জড়িয়ে পড়ে। এ বিতর্কে পাদরিদের চরমভাবে পরাজয় বরণ করতে হয়। একসময় তারা মুবাহালার ডাক দেয়। অর্থাৎ উভয়পক্ষই একে অপরের জন্য এ বদদোয়া করবে যে, 'যে পক্ষ ভ্রান্ত ও মিথ্যাবাদী, তাদের উপর আল্লাহর অভিশাপ বর্ষিত হোক।'

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুবাহালার সিদ্ধান্ত মেনে নিলেন। আহলে বাইতের মধ্য হতে শুধু উম্মুল মুমিনিনগণই নন; বরং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার সন্তানদেরও মুবাহালায় ডেকে নিলেন। যেহেতু ততদিনে কন্যাদের মধ্য হতে হজরত যায়নাব, হজরত রুকাইয়া ও হজরত উম্মে কুলসুম ইনতেকাল করেছিলেন; তাই শুধু ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহা উক্ত মুবাহালায় শরিক হতে পেরেছিলেন। হজরত আলি রাদিয়াল্লাহু আনহু জামাই হওয়ার সুবাদে যেহেতু নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ছেলের মতোই ছিলেন, তাই তিনিও সপরিবারে তথা হাসান ও হুসাইনকে নিয়ে মুবাহালায় শরিক হন।[৮১৫]

তখনও মুবাহালা শুরু হয়নি। ততক্ষণে পাদরিরা সাহস হারিয়ে ফেলে। তাদের মন বারবারই এ কথার সাক্ষ্য দিচ্ছিল যে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বদদোয়া কবুল না হয়ে পারে না।

তাই তারা বলাবলি করতে থাকে যে, যদি এই ব্যক্তি আসলেই নবী হয়ে থাকেন, তা হলে তো আমাদের নিজেদেরও ভালো হবে না এবং এটা আমাদের পরবর্তীপ্রজন্মের জন্যও কল্যাণ বয়ে আনবে না।

সুতরাং তারা সকলে একমত হয়ে ইসলামের ছায়ায় জীবন সঁপে দেওয়ার ইচ্ছা পোষণ করল। ফলে তারা নিবেদন করল, ইয়া রাসুলাল্লাহ, আমাদের ধর্মীয় কর্মকাণ্ড আঞ্জাম দেওয়ার জন্য একজন দায়িত্বশীল লোককে আমাদের সাথে দিন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের সাথে আবু উবাইদাহ ইবনুল জাররাহ রাদিয়াল্লাহু আনহুকে প্রেরণ করলেন।[৮১৬]

---

৮১৫. আলকামিল ফিত তারিখ : ২/১৫৮, ১৫৯, (দশম হিজরি আলোচনাধীন)।

৮১৬. সহিহ বুখারি : হাদিস নং ৪৩৮০ (কিতাবুল মাগাজি, বাবু কিসসাতি আহলি নাজরান)

জাকাত উসুলকারী নিযুক্তীকরণ

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সে বছরেই বিভিন্ন অঞ্চলে জাকাত উসুলকারী নিযুক্ত করলেন। ফলে এ কাজ আঞ্জাম দেওয়ার উদ্দেশ্যে কিছু সাহাবিকে এদিক-ওদিক পাঠানো হয়। হজরত আবু মুসা আশআরি রাদিয়াল্লাহু আনহুকে মাআরিব অঞ্চলে, হজরত আমর বিন হাজম রাদিয়াল্লাহু আনহুকে নাজরানে, জিয়াদ বিন লাবিদ আনসারি রাদিয়াল্লাহু আনহুকে হাজারামাউতে এবং হজরত ইয়া'লা বিন উমাইয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুকে জুন্দ অঞ্চলে প্রেরণ করা হয়। হজরত মুআজ বিন জাবাল রাদিয়াল্লাহু আনহুকে ইয়ামানের লোকদের ধর্মীয় শিক্ষাদানের দায়িত্ব দেওয়া হয়। আর হজরত আলি রাদিয়াল্লাহু আনহুকে ইয়ামানের জাকাত ও দান-অনুদান সংগ্রহের দায়িত্ব দিয়ে প্রেরণ করা হয়।[৮১৭]

অন্যান্য প্রতিনিধিদলের আগমন

ইসলামগ্রহণকারীদের মধ্যে সে বছর বনু যাবিদের প্রতিনিধিও হাজির হয়। তাদের আমির ছিলেন হজরত আমর বিন মাদিকারাব। আশআস বিন কায়েসও বনু কিন্দার ষাটজন অশ্বারোহীর সাথে এসে ইসলাম গ্রহণ করেন। সেই সাথে মুহারিব, বনু আবাসসহ অন্যান্য প্রতিনিধিও আগমন করে এবং ইসলাম গ্রহণ করে জীবন ধন্য করে।[৮১৮]

কতিপয় দুর্ভাগা লোক

কতিপয় দুর্ভাগা তখনও ছিল মাহরুম ও বঞ্চিত। ইয়ামামা হতে মুসাইলামা বনু হানিফার প্রতিনিধিস্বরূপ আসে। তারা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সাক্ষাৎ করে। তার হৃদয় ছিল অহংকার ও অবাধ্যতায় ভরা। সে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে এসে চরম দুঃসাহস প্রকাশ করে। সে বলতে শুরু করে, 'ইয়া নাবিয়্যাল্লাহ, আমরা আপনার নবুওয়াতের বিরোধিতা করব না। তবে এর জন্য একটি শর্ত আছে। আপনার নবুওয়াতের পর নবুওয়াতি আমাদের নামে লিপিবদ্ধ করে দেবেন।'

এই সময় নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতে একটি লাঠি ছিল। তিনি রাগে ও ক্ষোভে লাল হয়ে উঠলেন। তার এই অবান্তর দাবির প্রতিবাদে তিনি বলে দিলেন, 'তুমি যদি আমার নিকট আমার হাতের এ লাঠিটিও কামনা করো, তা-ও দিতে আমি প্রস্তুত নই।'

অতঃপর দরবারে রিসালাতের অন্যতম খতিব ও ভাষ্যকার হজরত সাবিত বিন

---

৮১৭. আলকামিল ফিত তারিখ : ২/১৬৪, ১৬৫, (দশম হিজরি আলোচনাধীন)।

৮১৮. আলকামিল ফিত তারিখ : ২/১৬২, ১৬৪, (দশম হিজরি আলোচনাধীন)।

কায়েসকে আদেশ করা হলো, এ দুর্ভাগাকে যেন বিস্তারিত জবাব প্রদানপূর্বক লা-জবাব করে দেওয়া হয়।[৮১৯]

এরপর কিছু দিনের মধ্যেই রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বপ্নে দেখেন তার দুই হাতে দুটি সোনার চুড়ি, যা তার বিরক্তির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ফলে তিনি চুড়িগুলোতে ফুঁক মারতেই সেগুলো গায়েব হয়ে যায়।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই স্বপ্নের এভাবে ব্যাখ্যা করেন যে, আমার পরে দুজন মিথ্যানবী দাবিদার আত্মপ্রকাশ করবে। আর হয়েছেও তাই।[৮২০]

তাদের মধ্যকার একজন হলো আসওয়াদ আনাসি। সে ওই বছরই ইয়ামানে নবুওয়াতের দাবি করে। অনেক লোক তার গ্রাসের শিকার হয়ে যায়। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল মাজুসি তথা অগ্নিপূজারি। আর দ্বিতীয়জন ছিল মুসাইলামা কাজ্জাব। সে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জবাব শুনে লাজবাব হয়ে গিয়েছিল। কিছুদিন পর সে ইয়ামামা অঞ্চলে নবী দাবি করে হাজার হাজার লোককে গোমরাহ করে ফেলে। তাদের মধ্যে অধিকাংশ ছিল বনু হানিফার লোক।[৮২১]

আমের বিন তোফায়েল ছিল বনু আমেরের লোক। সে শুধু ইসলাম গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেছে তা-ই নয়, বরং রীতিমতো রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে গালমন্দ করতেও কুণ্ঠাবোধ করেনি। সে এ কথা বলে বিদায় নেয় যে, আমি অচিরেই অশ্বারোহী ও পাইক-পেয়াদা নিয়ে মদিনায় আক্রমণ করতে আসছি।

তৎক্ষণাৎ নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দোয়া করলেন, 'হে আল্লাহ, তুমি বনু আমেরকে হেদায়েত দাও। আর আমের বিন তোফায়েল থেকে মুসলিমদের মুক্তি দাও।'

আমের বিন তোফায়েল তাৎক্ষণিক এ বেআদবির সাজা পেয়ে যায়। মদিনা থেকে ফিরতিপথেই তাকে মহামারী গ্রাস করে। উটের শরীরে যেমন গুটিবসন্তজাতীয় রোগ দেখা দেয়, তেমনি তার দেহে গুটিবসন্ত ওঠে। বাধ্য

৮১৯. সহিহ বুখারি : হাদিস নং ৪৩৭৮ (কিতাবুল মাগাজি, বাবু কিসসাতিল আসওয়াদ আলআনাসি)

৮২০. সহিহ বুখারি : হাদিস নং ৪৩৭৯ (কিতাবুল মাগাজি, বাবু কিসসাতি আহলি নাজরান)

৮২১. আলকামিল ফিত তারিখ : ২/১৬৩, ১৬৪ (দশম হিজরি আলোচনাধীন)।

উল্লেখ্য যে, আসওয়াদে আনাসিকে ফিরোজ রা. নামক জনৈক ইয়ামানি সাহাবি নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনের শেষদিকে হত্যা করেন। আর মুসাইলামাকে হত্যা করা হয়েছে হজরত সিদ্দিকে আকবারের খেলাফত আমলে, যার বিস্তারিত 'খেলাফতে রাশেদার যুগ' শীর্ষক আলোচনায় স্থান পাবে।

হয়ে তাকে রাস্তাতেই বনু সালুলের এক মহিলার ঘরে আশ্রয় নিতে হয় এবং কয়েকদিন সেখানেই অবস্থান করতে হয়। গোটা আরবের বাদশাহির স্বপ্ন দেখছিল যেই 'বীরপুরুষ', সে-ই এখন আক্ষেপ ও যাতনায় শেয়ালের মতো চিৎকার করতে থাকে, 'হায়! উটের মতো গুটি, আর সালুলি নারীর ঘর'। পরিশেষে সে নিজ বাসস্থানে মৃত্যুবরণ করার ইচ্ছায় ঘোড়ায় আরোহণ করে। কিন্তু ঘোড়ার পিঠে থাকা অবস্থাতেই সে মারা যায়।[৮২২]

***

৮২২. মুসনাদে আহমাদ : হাদিস নং ১৩১৯৫, সহিহ বুখারি : কিতাবুল মাগাজি, (বাবু গাজওয়াতি রজিইন ও রা'লিন ও যাকওয়ানা), তারিখুল মাদিনা ইবনে শাব্বাহ : ২/১৫২০, আলকামিল ফিত তারিখ : ২/১৬৩, ১৬৪ (দশম হিজরি আলোচনায়)।
স্মর্তব্য যে, এই আমের ইবনে তুফায়েল আমেরি ছিল সেই দুর্ভাগা লোক, যে চতুর্থ হিজরিতে বি'রে মাউনার ঘটনায় ৭০জন কারি সাহাবিকে শহীদ করিয়েছিল। একই নামে তথা আমের ইবনে তুফায়েল ইবনে হারেস নামক আরেক ব্যক্তি সাহাবি ছিলেন, যিনি হজরত আবু বকর সিদ্দিক রা. এর শাসনামলে ইরতেদাদের ফেতনাকালে স্বীয় গোত্রের লোকদের ইসলামের ছায়াতলে অটল ও অবিচল রাখার জন্য ঈর্ষণীয় ভূমিকা পালন করেছিলেন। [আলইসতিয়াব : ২/৭৯২, দারুল জীল মুদ্রিত)

বিদায় হজ

(দশম হিজরি)

হিজরতের দশম বছর প্রায় শেষ। ইসলাম আরববিশ্বের আনাচ-কানাচ জয় করে এতোদিনে,রোম ও পারস্যের সীমান্ত পাড়ি দিতে সক্ষম হয়েছে। কুরআন কারিমের আয়াত ও নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মূল্যবান বাণী ইত্যাদির মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালার সর্বশেষ দীন পূর্ণতায় পৌঁছে গেছে। দীন-ইসলামের প্রতিটি বিষয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে শুধু স্বীয় বাণী দ্বারা পৌঁছে দিয়েছেন তা-ই নয়; বরং তিনি হাতে-কলমে আমলের মাধ্যমেও সুস্পষ্টভাবে তা দেখিয়ে দিয়েছেন। তা সত্ত্বেও তখন পর্যন্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ বিধান বাকি রয়ে গিয়েছিলো। আর তা ছিল হজ। হজ মুসলিমদের ঐক্যের অন্যতম প্রধান প্রকাশস্থল।

মক্কাবিজয়ের তিনমাস পর আত্তাব বিন উসাইদ রাদিয়াল্লাহু আনহুর নেতৃত্বে সর্বপ্রথম হজ পালিত হয়। আর এরই এক বছর পর হজরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহুর নেতৃত্বে দ্বিতীয়বারের মতো হজ আদায় করা হয়। এমনিতেই মক্কাবিজয়ের সোয়া এক বছর পর পর্যন্ত হজ পালনে মুসলমানদের সাথে মুশরিকরাও শরিক আছে বলে মনে করা হতো। তাই তারাও দস্তুরমতো হজ পালনে অংশ নিত। এ কারণে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখনও কোনো হজ আদায় করেননি। তাই ইসলামের অন্যতম প্রধান বিধানটির প্রশিক্ষণের কাজ তখনও বাকি ছিল।

দশম হিজরির শেষাংশে হেরেম শরিফের সীমানায় মুশরিকদের প্রবেশ নিষিদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। তাদেরকে যেসব সুযোগ-সুবিধা হেরেম শরিফে দিয়ে রাখা হয়েছিল, তা-ও খতম হয়ে গিয়েছিল। সুতরাং এই সর্বশেষ বিধানটি আদায় করার জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দশম হিজরির যিলকদ মাসে হজের প্রস্তুতি সম্পন্ন করলেন, যাতে তিনি হজ আদায়ের পাশাপাশি অন্যান্য লোকজনকে হজের বিধানসমূহের শিক্ষা দিতে পারেন, আল্লাহর শাসন প্রতিষ্ঠার ঘোষণা করতে পারেন, সর্বপ্রকার কুফুরি শক্তি ও জাহেলি রুসুম-রেওয়াজের অবসান ঘটাতে পারেন এবং গোলাম-বাঁদিসহ নারীসমাজ ও বঞ্চিত মানবতার অধিকার আদায়ের শিক্ষা ব্যাপক করতে পারেন।

মোটকথা, বহু শতাব্দীকাল অতিক্রান্ত হওয়ার পরই এটা ছিল সর্বপ্রথম হজ, যা সঠিক পদ্ধতিতে স্বাভাবিক রীতি-নীতিতে যথাসময়ে পালিত হতে যাচ্ছিল।[৮২৩]

প্রিয়নবী হজরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হজ আদায় করার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। এ কথা শোনামাত্র চতুর্দিকে হইচই পড়ে যায়। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে হজ করতে পারার সৌভাগ্য অর্জনে মুসলমান পঙ্গপালের মতো ভিড় জমালো। ২৪ যিলকদ শুক্রবার রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামের বিশাল সমাবেশে হজের সফর ও হজ পালনের বিধান সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করলেন। পরেরদিন মদিনার অদূরেই অবস্থিত যুলহুলাইফায় গিয়ে হজের ইহরাম বাঁধলেন। ২৬শে যিলকদ বিশাল কাফেলা নিয়ে তিনি 'লাব্বাইক, আল্লাহুম্মা লাব্বাইক' উচ্চারণ করতে করতে মক্কার দিকে যাত্রা করলেন। সঙ্গী-সাথির সংখ্যা ছিল ৪০ হাজার বা তার কাছাকাছি। উম্মুল মুমিনিনগণও সফরসঙ্গীদের তালিকায় রয়েছেন।

এই সফর যে একটি মহান ইবাদতের উদ্দেশ্যে ছিল, শুধু তা-ই নয়; বরং হজের বিধানসমূহ হাতে-কলমে শিক্ষাদানেরও একটি মাধ্যম ছিল সফরটি। এই সফরে অসংখ্য লোক রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাক্ষাৎলাভের সুযোগ পাচ্ছিল। তারা নিকট অতীতে ইসলাম গ্রহণ করেছে; কিন্তু স্বচক্ষে একবারও তার দর্শন লাভ করতে পারেনি। টানা আটদিন ভ্রমণ করে ৪ঠা যিলহজ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা পৌঁছেন। মক্কায় প্রবেশের পর বাইতুল্লাহর উপর নজর পড়তেই তিনি নিম্নযুক্ত দোয়া পড়লেন-

اللهُمَّ زِدْ هذا البيتَ تشريفًا وتعظيمًا وتكريمًا ومهابةً

হে আল্লাহ! তুমি এ গৃহের ইজ্জত-সম্মান, শ্রদ্ধা ও মহত্ত্ব এবং প্রভাব-প্রতাপ আরো বাড়িয়ে দাও।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাজরে আসওয়াদে চুমু খেয়ে তাওয়াফ শুরু করলেন। তাওয়াফ শেষে সাফা পাহাড়ে গেলেন এবং এ দোয়া করলেন-

لَا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، لَا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ، أَنْجَزَ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وهَزَمَ الأَحْزَابَ وَحْدَهُ

আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। তিনি এক ও একক। তার কোনো সমকক্ষ নেই। সকল রাজ-রাজত্ব একমাত্র তার। তার

৮২৩. হজরত আবু বকর সিদ্দিক রা. এর হজ অনুষ্ঠিত হয়েছিল ৬৩১ খ্রিষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে, যা চান্দ্র পঞ্জিকা হিসেবে হয় জুমাদাল উখরাতে। এর পাঁচ মাস পরেই বিদায় হজের প্রস্তুতি শুরু করা হয়।

জন্যই সকল প্রশংসা। তিনি সর্বময় ক্ষমতার আধার। এক আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। তিনি স্বীয় প্রতিশ্রুতি পূরণ করেছেন। স্বীয় বান্দার সাহায্য করেছেন। সকল সৈন্যদলকে তিনি একাই পরাভূত করে দিয়েছেন।

এরপর তিনি সাঈর আমল শেষ করে উমরা সমাপ্ত করেন।[৮২৪]

৯ যিলহজ। শুক্রবার। হজের এক মহান বিধান 'উকুফে আরাফাহ'। আরাফাহর ময়দানে সেদিন লক্ষাধিক সাহাবির সমাবেশ ঘটেছিল। এই সমাবেশে দাঁড়িয়ে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ঐতিহাসিক ভাষণ প্রদান করেন, যেখানে তিনি পরস্পর আচার-আচরণ, লেনদেন, বান্দার হকসহ ইসলামি রাজনীতি-কেন্দ্রিক গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ ও নির্দেশাবলি প্রদান করেন। এগুলো ছিল আল্লাহ তায়ালার সর্বশেষ পয়গামবর, জগতের সর্বাপেক্ষা মহান ব্যক্তিত্ব ও পথপ্রদর্শকের পক্ষ হতে একটি গুরুত্বপূর্ণ অসিয়তনামা, যার প্রতিটি বাক্যে ইহকালীন ও পরকালীন সফলতার মূলনীতি বর্ণনা করা হয়েছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, হে লোকসকল, মনোযোগ দিয়ে শুনবে। তোমরা হয়তো এরপর কখনোই এভাবে মিলিত হওয়ার সুযোগ পাবে না। বন্ধুগণ, তোমাদের প্রত্যেকের জীবন, প্রত্যেকের সম্পদ এবং প্রত্যেকের ইজ্জত-সম্মান অপরজনের নিকট ঠিক তেমনি সম্মানিত, যেমন এই দিনটি সম্মানিত এবং এই মাসটি সম্মানিত। অচিরেই তোমাদেরকে মহান রব্বুল আলামিনের সম্মুখে দাঁড়াতে হবে। তিনি প্রত্যেককে তার কৃতকর্ম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবেন।

বন্ধুগণ, শয়তান তো এ বিষয়ে নিরাশ হয়ে গেছে যে, তোমাদের এ ভূখণ্ডে আর কখনো তার গোলামি চলবে না। কিন্তু এ বিষয়ে সে এখনো নিশ্চিন্ত যে, ছোট ছোট বিষয়ে তোমরা তার দাসত্ব করে যাবে। সুতরাং দীন-ধর্মের বিষয়ে শয়তানের গোলামি হতে নিজেকে মুক্ত রাখবে। আমি তোমাদের নিকট দুটি বস্তু রেখে যাচ্ছি। যদি তা তোমরা শক্ত করে ধরে রাখো তা হলে কখনোই পথহারা হবে না। তার একটি হলো আল্লাহর কিতাব তথা কুরআনে পাক। অপরটি আমার সুন্নাত।

হে লোকসকল, তোমাদের উপর নারীদের অধিকার রয়েছে। তাদের সাথে উত্তম আচরণ করবে। নিশ্চয় তারা তোমাদের অধীনস্থ। আল্লাহ তায়ালার নামে তোমরা তাদেরকে নিজেদের জন্য বৈধ করেছো।

---

৮২৪. আসসিরাতুল হালাবিয়্যাহ : ৩/৩৬৫-৩৬৮ (মাকতাবাতুল ইলমিয়্যাহ মুদ্রিত)।

বন্ধুগণ, এক মুসলমান অন্য মুসলমানের ভাই। সকল মুসলমানই পরস্পর ভাই ভাই। কোনো মুসলমানের জন্য এটা বৈধ নয় যে, অন্যের সম্পদ তার অনুমতি ও সন্তুষ্টি ব্যতিরেকে নিয়ে নিবে।[৮২৫]

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলিম উম্মাহকে একতা, সাম্য ও আমিরের আনুগত্যের প্রতি তাগিদ প্রদান করতে গিয়ে বলেন, একজন কৃশকায় গোলামও যদি তোমাদের নেতা নিযুক্ত হয়, যতক্ষণ পর্যন্ত সে কিতাবুল্লাহ ও সুন্নাতে রাসুল মোতাবেক তোমাদের পরিচালিত করবে ততক্ষণ তার আনুগত্য করে যাবে।'[৮২৬]

তিনি আকিদা-বিশ্বাস বিশুদ্ধ রাখা এবং সর্বপ্রকার গুনাহ হতে নিজেকে বিরত রাখার বিষয়ে তাগিদ দিতে গিয়ে বলেন, আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক করবে না। মানবজাতিকে আল্লাহ তায়ালা সম্মানিত বানিয়েছেন, তাই কখনো কাউকে অন্যায়ভাবে হত্যা করবে না। হ্যাঁ, ইসলামি শরিয়ত যেখানে কারো প্রাণনাশের অধিকার দিয়ে থাকে সেটা ভিন্ন কথা। জিনা-ব্যভিচার করবেন না এবং চুরিও করবেন না।[৮২৭]

তিনি স্বীয় উম্মতকে বিশৃঙ্খলা ও গৃহযুদ্ধের সমূহ আশঙ্কা হতে সতর্ক করে বলেন, লক্ষ করো, আমার অবর্তমানে কেউ পথভ্রষ্ট হয়ে যাবে না যে, একে অপরকে হত্যা করা শুরু করে দিলে।[৮২৮]

ভাষণের শেষাংশে এসে তিনি উপস্থিত লোকদেরকে সম্বোধন করে বলেন, তোমরা যারা এখানে উপস্থিত আছো, তারা আমার এই নির্দেশনাগুলো অনুপস্থিত লোকদের নিকট পৌঁছে দেবে। অনেক শ্রোতা এমন আছে, যারা ওই ব্যক্তির চেয়ে অধিক সংরক্ষণকারী হয়ে থাকে, যে তার নিকট কথাটি পৌঁছে দিয়েছে।'[৮২৯]

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার ভাষণ শেষ করে উপস্থিত জনতাকে সম্বোধন করে জিজ্ঞেস করেন, তোমাদেরকে কেয়ামতের দিবসে আমার সম্পর্কে এ মর্মে জিজ্ঞাসা করা হবে যে, আমি তোমাদের নিকট আল্লাহপ্রদত্ত পয়গাম ঠিকঠাকভাবে পৌঁছে দিয়েছি কি না। তখন তোমরা কী জবাব দেবে?

---

৮২৫. তারিখে ইবনে খালদুন : ২/৬০৩-৬০৪

৮২৬. সহিহ মুসলিম : হাদিস নং ৩১৯৮, (কিতাবুল হজ, বাবু ইসতিহবাবি রময়ি জামরাতিল আকাবাহ), হাদিস নং ৪৮৬১, ৪৮৬২ ও কিতাবুল ইমারাহ : বাবু ওজূবি ত-আতিল উমারা

৮২৭. মুসনাদে আহমাদ : হাদিস নং ৮৯৯০ (সনদ সহিহ)

৮২৮. মুসনাদে আহমাদ : হাদিস নং ২০৩৬ (সনদ সহিহ)

৮২৯. সহিহ বুখারি : হাদিস নং ৬৭ (কিঁতাবুল ইলম, বাবু কওলিন নাবিয়্যি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রুব্বা মুবাল্লিগিন..)।

তখন গোটা সমাবেশের লোক সমস্বরে বলতে লাগলেন, আমরা এই সাক্ষ্য দিব যে, আপনি প্রতিপালকের পয়গাম ঠিকঠিকভাবে পৌঁছে দিয়েছেন। আপনি আপনার দায়িত্ব অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছেন। আমাদের কল্যাণকামিতার সম্পূর্ণ হক আপনি আদায় করেছেন।

তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তর্জনী আঙুল আসমানের দিকে উঁচিয়ে বললেন, হে আল্লাহ, আপনি সাক্ষী থাকুন।[৮৩০]

এরপর তিনি জোহর ও আসরের নামাজ একত্রে আদায় করলেন। নামাজ আদায় শেষে সূর্যাস্ত পর্যন্ত দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অত্যন্ত বিনয় ও কাতরতার সাথে দোয়া করতে থাকলেন। বিশেষ করে তখন তিনি এ দোয়াগুলো করছিলেন,[৮৩১] হে আল্লাহ, আমি এক বিপদগ্রস্ত অসহায় ও নিঃস্ব ফরিয়াদি। ভীতসন্ত্রস্ত ও আপাদমস্তক থরথর প্রকম্পিত। আপন অন্যায় ও অপরাধ স্বীকার করে যাচ্ছি আমি। আমি তোমার নিকট ভিক্ষা চাচ্ছি একজন ভিক্ষুক এবং একজন অপরাধী আসামির ন্যায়। আমি এমন একজন ভীতসন্ত্রস্ত অপরাধী গোলামের মতো আকুতি জানাচ্ছি, যার গর্দান তোমার সামনে অবনত হয়ে আছে, যার তপ্ত অশ্রু তোমার সামনে প্রবাহিত হচ্ছে, যার গোটা দেহ তোমার অধীনস্থ, যে তোমার পাক দরবারে নাক ঘসে যাচ্ছে। হে আল্লাহ, হে আমার প্রতিপালক, আমাকে তোমার দরবার হতে বঞ্চিত ফিরিয়ে দিয়ো না। আমার ব্যাপারে তুমি দয়াশীল ও করুণাময়ী হয়ে যাও। তুমিই উত্তম প্রত্যাশিত সত্তা এবং বড় দানবীর প্রভু।[৮৩২]

তখনই কুরআন মজিদের সর্বশেষ আয়াতগুলো নাজিল হলো। যার মধ্যে দীন ও শরিয়তের পূর্ণতাদানের সুসংবাদ বিদ্যমান ছিল। সেই সাথে কেয়ামতের দিবসে যে আল্লাহ তায়ালার নিকট ইসলামই একমাত্র পছন্দনীয় ধর্ম, একথাও সুদৃঢ় করে দেওয়া হলো। ঘোষণা হলো-

> اَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا
>
> অদ্য তোমাদের জন্য তোমাদের শরিয়ত পরিপূর্ণ করে দিলাম, আমার নেয়ামত তোমাদের উপর পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম এবং আমি তোমাদের জন্য ইসলামকেই আমার পছন্দনীয় ধর্ম হিসেবে বেছে নিলাম।[৮৩৩]

৮৩০. সহিহ মুসলিম : হাদিস নং ৩০০৯, কিতাবুল হজ, বাবু হাজ্জাতিন নাবিয়্যি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, (সিরাতু ইবনে হিব্বান : ১/৩৯৬)

৮৩১. সহিহ মুসলিম : হাদিস নং ৩০০৯, (সিরাতু ইবনে হিব্বান : ১/৩৯৬)

৮৩২. আস সিরাতুল হালাবিয়্যাহ : ৩/৩৭৪ (মাকতাবাতুল ইলমিয়্যাহ মুদ্রিত)।

৮৩৩. সুরা মায়িদা, আয়াত ৪, তাফসিরে ইবনে কাসির : সুরা মায়িদা, আয়াত ৪

যিলহজের ১২ তারিখ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিনাতে হজের অবশিষ্ট কাজ সম্পন্ন করছিলেন। এরই মধ্যে 'সুরা নাসর' অবতীর্ণ হলো, যা নাজিল হওয়ার দিক দিয়ে কুরআনের সর্বশেষ সুরা।

> إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا
>
> যখন আসবে আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় এবং আপনি মানুষকে দলে দলে আল্লাহর দীনে প্রবেশ করতে দেখবেন, তখন আপনি আপনার পালনকর্তার পবিত্রতা বর্ণনা করুন এবং তার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করুন। নিশ্চয় তিনি ক্ষমাশীল।[৮৩৪]

সুরাটি এ ইঙ্গিত দিচ্ছিল যে, আখেরিনবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে মহান দায়িত্ব পালনের নিমিত্তে দুনিয়াতে আগমন করেছিলেন, তা সফলভাবে পালিত হয়েছে। এখন তার পরকালে পাড়ি জমানোর কাল-ক্ষণ ঘনিয়ে এসেছে। আর এটাই ছিল বড় কারণ যে, সুরাটি নাজিল হওয়ার সাথে সাথে অন্যান্য সাহাবায়ে কেরাম যদিও আনন্দে বিহ্বল ছিলেন; কিন্তু রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অন্তরঙ্গ পরম বন্ধু হজরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহু কাঁদতে আরম্ভ করেন। কারণ, তিনি ভালোভাবেই বুঝে নিয়েছিলেন সুরাটিতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দুনিয়া হতে বিদায় গ্রহণের প্রস্তুতি সম্পন্ন করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।[৮৩৫]

গাদিরে খুম-এর ভাষণ

১৮ যিলহজ মক্কা হতে প্রত্যাবর্তনকালে মদিনার পথে 'খুম' নামক স্থানে একটি পুকুরের নিকট কাফেলা যাত্রাবিরতি করল। এখানে এসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সকল সাহাবিকে উদ্দেশ করে গুরুত্বপূর্ণ কিছু নসিহত করেন।[৮৩৬] তিনি ইরশাদ করেন, আমি তোমাদের নিকট দুটি গুরুত্বপূর্ণ বস্তু রেখে যাচ্ছি। যার একটি কিতাবুল্লাহ। এতে তোমাদের জীবনের পথচলার দিশা ও পাথেয় বিদ্যমান রয়েছে। সুতরাং তোমরা তাকে শক্ত করে আঁকড়ে ধরে রাখ।

এরপর বললেন, আমার আহলে বাইত সম্পর্কে আমি তোমাদেরকে আল্লাহর কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি।

সর্বশেষ কথাটি তিনি তিনবার পুনরাবৃত্তি করলেন।[৮৩৭]

---

৮৩৪. তাফসিরে ইবনে কাসির : সুরা নাসর, আয়াত ১-৩

৮৩৫. তাফসিরে ইবনে কাসির : সুরা নসর

৮৩৬. আলবিদায়া ওয়ান নিহায়া : ৭/৬৬৬

৮৩৭. সহিহ মুসলিম : হাদিস নং ৬৩৭০; (কিতাবু ফাযাইলিস সাহাবাহ, বাবু ফাযাইলি আলিয়্যিন রা.)

এ ভাষণেই তিনি হজরত আলি রাদিয়াল্লাহু আনহু সম্পর্কে বললেন,

من كنتُ مولاهُ فعَلِيٌّ مولاهُ

আমি যার বন্ধু আলিও তার বন্ধু।[৮৩৮]

---

৮৩৮. মুসতাদরাকে হাকিম : হাদিস নং ৬২৭২ (বাবু মানাকিবি আলিয়্যি রা.)

'মাওলা' শব্দের অনুবাদ যদি 'আ-কা (মনিব)' করা হয় তবু সঠিক। আর এতে সন্দেহই-বা কী যে, হজরত আলি রা. সকল ঈমানদারের মনিব হবেন? প্রত্যেক মুসলমানই তো তাকে নিজের সরদার, অভিভাবক মনে করে থাকে। যেমনিভাবে অন্যান্য সকল খলিফাকেও তারা মুরুব্বি ও সরদার হিসেবে মনে করে থাকে।

কিন্তু এই অনুবাদ গ্রহণ করে যেন কেউ এ প্রশ্ন করে না বসে যে, তিনি যেহেতু সকল মুসলমানেরই মনিব; তাই অন্য তিন খলিফারও তিনি মনিব হবেন। কারণ, এ অর্থ খোদ হজরত আলি রা.-ও গ্রহণ করেননি। তিনি কখনোই নিজেকে হজরত আবু বকর, হজরত উমর এবং হজরত উসমান থেকে অধিক শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করেননি। আর না তিনি কখনো নিজ খেলাফত আমলে এ কথা দাবি করেছেন যে, খেলাফত আমার অধিকার ছিল। বরং তিনি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ বাণীর ঐ অর্থই গ্রহণ করেছেন, যা প্রকৃতপক্ষে তার স্বাভাবিক অর্থ। তিনি নিজেকে সবসময় অন্যান্য খলিফার অধীনস্থই মনে করতেন। তিনি তাদের খেলাফত সাদরে বরণ করে নিয়েছেন। জানপ্রাণ দিয়ে তাদের আমলে দীন-ইসলামের কাজও আঞ্জাম দিয়েছেন। তাই আমরাও হজরত আলির অনুসরণে 'মাওলা' শব্দের ঐ অর্থই গ্রহণ করে থাকি।

শিয়া মতাদর্শের লোকেরা এক্ষেত্রে হজরত আলি রা.-এর অনুসরণ বাদ দিয়ে 'মাওলা' শব্দের অর্থ করেছে ইমাম, খলিফা ইত্যাদি। তারা মনে করে থাকে যে, এ কথা দ্বারা রাসুলপাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পর হজরত আলির স্থলাভিষিক্ততা এবং ইমামতের পদাধিকার প্রমাণিত হয়।

উপরন্তু তারা আরো আগে বেড়ে এ কথাও প্রমাণ করতে চায় যে, হজরত আলি রা.-র উপস্থিতিতে অন্য কোনো সাহাবির খলিফা হওয়া নাজায়েজ ও অন্যায় ছিল। কিন্তু এ প্রমাণকার্যটি মোটেই সঠিক নয়; বরং ভুল ও ভ্রান্তিপূর্ণ। কারণ, 'মাওলা' শব্দের কাছাকাছি ত্রিশটি অর্থ রয়েছে।

১. দোস্ত বা বন্ধু। ২. মাহবুব বা প্রিয়। ৩. স্বাধীনকৃত গোলাম বা বাঁদি। ৪. মালিক বা প্রভু। ৫. সরদার বা নেতা। ৬. আকা বা মনিব ইত্যাদি।

এক বিশাল সমাবেশে সাহাবায়ে কেরাম রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উক্ত বাণীটি শুনেছেন। কিন্তু কেউ এর এই অর্থ গ্রহণ করেননি যে, হজরত আলিকে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্থলাভিষিক্ত বা খলিফা নিযুক্ত করে দেওয়া হয়েছে। বরং সকলেই এ কথার অর্থ এটা বুঝেছেন যে, এ কথার মাধ্যমে রাসুলপাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হজরত আলির প্রতি নিজের সবিশেষ মহব্বত ও ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছেন। আর এ অর্থ হজরত আলি রা. নিজেও গ্রহণ করেছিলেন। তাই তিনি বলেন-

يا أيها الناس إن رسول الله صلى الله عليه و سلم لم يعهد إلينا في هذه الإمارة شيئا

হে লোকসকল, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হুকুমত ও শাসন ক্ষমতার বিষয়ে আমাদেরকে কোনো ধরনের অসিয়ত করে যাননি। [দালাইলুন নুবুওয়াহ, বাইহাকি : ৭/২২৩]

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উক্ত বাণী দ্বারা এ উদ্দেশ্য ছিল যে, কেয়ামত পর্যন্ত আগত মুসলমানরা যেন হজরত আলি রাদিয়াল্লাহু আনহুকে প্রিয় বন্ধু, পথপ্রদর্শক ও অভিভাবক মনে করে। তার মর্যাদার প্রতি খেয়াল রাখে। তার প্রতি শ্রদ্ধা ও ভক্তি প্রদর্শন করে এবং কোনোরূপ বেআদবি তার সাথে না করে।

মূলত হজরত আলি রাদিয়াল্লাহু আনহু সম্পর্কে এ ইরশাদটি ছিল ওই সকল লোককে সতর্ক করার উদ্দেশ্যে, যারা পরবর্তীতে 'নাসেবি' হয়ে গিয়েছিল। এ সম্প্রদায়টি হজরত আলি রাদিয়াল্লাহু আনহু, হজরত ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহা এবং হাসান-হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুমাকে লাগামহীনভাবে দোষারোপ ও গালমন্দ করত। কোনো মুসলমানের জন্য এমন করা মোটেই সমীচীন নয়। ভয় হচ্ছে, হজরত আলি রাদিয়াল্লাহু আনহু অথবা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বংশধরদের সাথে এমন বেআদবি করা ও এহেন চিন্তাধারার বহিঃপ্রকাশ ঘটানো হাশরের ময়দানে লাঞ্ছনা অবমাননা ও মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শাফাআত বা সুপারিশপ্রাপ্তি হতে বঞ্চিত হওয়াসহ যাবতীয় অশুভ পরিণতির কারণ হয়ে যায় কিনা।

আখেরাতের সফর

আখেরি নবী হজরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নশ্বর দুনিয়া হতে বিদায় নেওয়ার দিন-ক্ষণ ঘনিয়ে আসে। ক্ষণস্থায়ী দুনিয়া হতে আখেরাতের চিরস্থায়ী জীবনের উদ্দেশে যাত্রা করতে যাচ্ছেন তিনি। বিদায়ের এই ঘণ্টা তখনই বাজল, যখন তিনি তার সকল দায়িত্ব পূর্ণরূপে আদায় করে অবসর হন, যখন তিনি আল্লাহ তায়ালার পয়গাম পরিষ্কারভাবে দুনিয়াবাসীর নিকট পৌঁছে দিয়েছিলেন। আর এ দায়িত্বপালনে তিনি পূর্ণ চেষ্টা, পরিশ্রম, ধৈর্য, আত্মোৎসর্গসহ যাবতীয় ত্যাগ-তিতিক্ষার পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছেন। ততক্ষণে গোটা ইসলামি শরিয়ত পূর্ণতা লাভ করেছে। ওহী-আগমনের ধারাও শেষ হয়ে গেছে। সর্বত্র দীনে হকের বিজয়-পতাকা পতপত করে উড্ডীন হচ্ছে। আর এ পতাকার সংরক্ষণ ও প্রচারের জন্য এমন বিশাল উম্মত তৈরি করে গিয়েছেন, যারা 'খাইরে উম্মত (সর্বশ্রেষ্ঠ উম্মত)' উপাধিতে ভূষিত হয়েছে। এই উম্মতের কাঁধে কেয়ামত পর্যন্ত আগত মানবজাতির নেতৃত্বপ্রদান ও পথপ্রদর্শনের দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে।

২৩ বছরের এই ক্ষুদ্র সময়ে অক্লান্ত পরিশ্রম, অবিরাম মুজাহাদা ও কুরবানির ফলে প্রিয়নবী হজরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গোটা মানবজাতির জন্য এমন এক নতুন জগতের ভিত্তি রেখে গিয়েছেন, যার ছায়াতলে কেয়ামত পর্যন্ত প্রশান্তির শ্বাস নিতে সক্ষম হবে। অথচ তখনও ইসলামি শাসন-ব্যবস্থা আরব ভূখণ্ডের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু গোটা পৃথিবীর বড় বড় পরাশক্তির কানে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছে গিয়েছিল। পৃথিবীর সকল সম্প্রদায় ও গোষ্ঠীর লোকেরাই এ বিপ্লব অবাক দৃষ্টিতে দেখে যাচ্ছিল, যা গোটা আরব অঞ্চলে এক নতুন চমক সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিল।

হজ থেকে প্রত্যাবর্তনের পর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অন্তরে আল্লাহ তায়ালার দরবারে হাজিরা দেওয়ার আগ্রহ দিন দিন বৃদ্ধি পেতে থাকে। ফলে তিনি সাধারণ সময়ের চেয়ে অনেক বেশি পরিমাণে তাওবা-ইসতিগফার এবং হামদ ও তাসবিহ জপতে থাকেন। যেন তিনি পরকাল যাত্রার পূর্ণপ্রস্তুতি গ্রহণ করছেন। তার বাণী ও কথাবার্তাও বিদায়ের ইঙ্গিত বহন করছিল। একপর্যায়ে তিনি উহুদযুদ্ধের শহিদদের জন্য এমনভাবে দোয়া করছিলেন, মনে

হচ্ছিল তিনি এখনি সকলকে বিদায় জানাচ্ছেন। এরপর তিনি মসজিদে গমন করলেন এবং মিম্বরে উঠে নিম্নযুক্ত ভাষণ প্রদান করেন :

> আমি তোমাদের আগেই আমার পরবর্তী গন্তব্যের দিকে চলে যাচ্ছি। আমি তোমাদের জন্য সাক্ষ্য প্রদান করব। তোমাদের সাথে আমার হাউজে কাউসারে সাক্ষাৎ হবে। আমার এই ভয় নেই যে, তোমরা আমার অবর্তমানে শিরক করবে। তবে আমার ভয় হচ্ছে, তোমরা দুনিয়াদারির প্রতিযোগিতায় একে অন্যের উপর আগে বাড়ার চেষ্টা করতে থাকবে। যেমনটি করেছিল পূর্ববর্তী সম্প্রদায়গুলো। ফলে তারা ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। জানি না তোমরাও এ কারণে ধ্বংস হয়ে যাও কিনা।[৮৩৯]

রোমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধাভিযান ও তার প্রস্তুতি

খাইবার, ফাদাক ও ওয়াদিল কুরার উত্তরাঞ্চল জয় করার পর মুসলিম বাহিনীর অভিযান মদিনার সীমান্তবর্তী রোমান বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্য স্পর্শ করতে যাচ্ছিল। কিছুদিন পূর্বেও এই সাম্রাজ্যটি পারস্যের মতো ক্ষমতাশীল রাজ্যের ভিত নাড়িয়ে দিত এবং গোটা দুনিয়াতে নিজেদের দাপট প্রতিষ্ঠার প্রয়াস চালাত। এত দাপট, প্রভাব-প্রতিপত্তি এবং ঐশ্বর্য্য থাকা সত্ত্বেও রোমান সম্রাটরা আরবের স্বল্পদিনের এ বিপ্লব দেখে রীতিমতো ভয়ে কাঁপছিল। আর এ কারণেই তারা 'বালকা'গামী মুসলিম দূত হারেস বিন উমায়ের রাদিয়াল্লাহু আনহুকে হত্যা করেছিল। এর প্রতিশোধ নিতেই মুতাযুদ্ধ সংঘটিত হয়। রোমান সৈন্যবাহিনী মদিনার উপর আক্রমণ করার পূর্ণপ্রস্তুতি সম্পন্ন করে ফেলেছিল। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাবুক পর্যন্ত অভিযান চালিয়ে তাদের এই প্রস্তুতি নস্যাৎ করে দিয়েছিলেন।

তখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হজরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর পরামর্শে সামনের কর্মসূচিগুলো ক্ষণিকের জন্য স্থগিত ঘোষণা করে সেখান থেকে প্রত্যাবর্তন করেন। কিন্তু এর কিছুদিন পরই রোমানদের পরাজিত করার গুরুত্বপূর্ণ একটি কারণ দেখা দেয়। তা হলো, সিরিয়ার সীমান্তবর্তী এলাকা 'মাআন'। সেখানকার এক খ্রিষ্টান আরব গভর্নর 'ফারওয়া বিন আমর জুযামি' ইসলাম গ্রহণ করে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দলভুক্ত হয়ে এসেছিলেন। তিনি তার ইসলামগ্রহণের সংবাদ পত্রমাধ্যমে মদিনা পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।

---

৮৩৯. সহিহ বুখারি (কিতাবুস সালাত, বাবুস্ সালাতি আলাশ শহীদ), সহিহ মুসলিম : হাদিস নং ৬১১৭, ৬১১৩ (কিতাবুল ফাযাইল, বাবু ইসবাতিল হাউয)

রোমান সম্রাট এ খবর পেয়ে তেলে-বেগুনে জ্বলে ওঠে। ফলে তারা 'ফারওয়া বিন আমর'কে শূলে চড়িয়ে হত্যা করে।[৮৪০] এ কথা রাসুলে করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অবগত হওয়ার পর রোমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতে বিলম্ব করাকে তিনি সমীচীন মনে করলেন না। যদিও অপরদিকে দশম হিজরির বসন্তকালের সিংহভাগই কেটে গিয়েছিলো বিদায় হজের ব্যস্ততায়। এ ব্যস্ততার ঘাম শুকাতে না শুকাতেই রোমানদের এই ধৃষ্টতা। তাই ব্যস্ততা সত্ত্বেও মুসলমানরা মানসিকভাবে রোমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে শতভাগ প্রস্তুত ছিল। কারণ, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বার বারই পালক পুত্র যায়েদ বিন হারেসা রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং চাচাতো ভাই জাফর বিন আবি তালেব রাদিয়াল্লাহু আনহুর করুণ শাহাদাতের কথা অত্যন্ত ব্যথা ও যাতনার সাথে স্মরণ করে আসছিলেন, যারা রোমানদের সাথে মোকাবেলা করতে গিয়েই শাহাদাত বরণ করেছিলেন। তাই তিনি বিদায় হজ থেকে প্রত্যাবর্তন করে সফর মাসেই শক্তিশালী একটি সৈন্যবাহিনী প্রস্তুত করা শুরু করেন।[৮৪১]

হজরত উসামা বিন যায়েদ রাদিয়াল্লাহু আনহুর নেতৃত্ব

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বড় বড় সাহাবিদের বাদ দিয়ে এ বাহিনীর সেনাপতি নিযুক্ত করলেন হজরত উসামা বিন যায়েদ রাদিয়াল্লাহু আনহুকে। তার বয়স তখন ছিল মাত্র বিশ বছর বা তার কাছাকাছি। তাকে এই সম্মানের আসনে সমাসীন করার পেছনে মূল কারণ ছিল মুতার যুদ্ধে তার পিতা যায়েদ বিন হারেসা রাদিয়াল্লাহু আনহুর বীরত্বের সাথে লড়াই করা এবং একপর্যায়ে শাহাদাত বরণ করা। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিলের তামান্না ছিল পিতার এই অসমাপ্ত অভিযান যেন পুত্রের হাতেই সমাপ্ত হয় আর রোমানদের উপর যেন মুসলমানদের ধর্মীয় মর্যাদাবোধের প্রভাব পড়ে। তারা যেন হাড়ে হাড়ে টের পায়, মুসলমানরা কখনোই তাদের শহিদদের পবিত্র রক্তের কথা ভুলে যায় না।[৮৪২] তাই ২৯শে সফর সোমবার রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হজরত উসামা বিন যায়েদ রাদিয়াল্লাহু আনহুকে আমির নিযুক্ত করে ইরশাদ করলেন-

'আল্লাহর নাম নিয়ে সাহসিকতার সাথে ওই স্থানে গিয়ে পৌঁছবে, যেখানে তোমার বাবা শহিদ হয়েছিলেন। খুব দ্রুত সফর করবে। আল্লাহ তায়ালা যদি বিজয় দান করেন, তা হলে সংক্ষিপ্তকাল সেখানে অবস্থান করে ফিরে আসবে।

৮৪০. সিরাতে ইবনে হিশাম : ২/৫৯০, ৫৯১

৮৪১. তাবাকাতে ইবনে সা'দ : ২/১৮৯, ১৯০; সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ : ৬/২৪৮

৮৪২. দালাইলুন নুবুওয়াহ, বাইহাকি : ৭/২০০

জায়গায় জায়গায় রাহবারদের কাজে লাগাবে। গোয়েন্দা ও অগ্রগামী বাহিনীকে আগে আগে রাখবে।[৮৪৩]

মরণব্যাধির সূচনা

সফর মাসের আখেরি সপ্তাহ।[৮৪৪] একরাতে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'বাকি' গোরস্থানে গমন করলেন। কবরবাসীদের জন্য মাগফেরাতের দোয়া করলেন। তারপর সকাল হতে না হতেই তিনি মাথায় কঠিন ব্যথা অনুভব করলেন। অবাক কাণ্ড হলো, সেই একইদিন উম্মুল মুমিনিন হজরত আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু আনহারও মাথাব্যথা দেখা দেয়। তিনি বলতে লাগলেন, 'উহ্, মাথাব্যথা'!

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'আমার তো তোমার চেয়ে বেশি ব্যথা'।

এরপর তিনি রসিকতা করে বললেন, 'আয়েশা, তুমি আমার আগে মারা গেলে তো তোমার জন্যই ভালো। কারণ, তখন তোমার কাফন-দাফন আমার হাতেই হবে।'

হজরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বললেন, 'জি হ্যাঁ, আমি মারা গেলে তো আপনারই সুবিধা। ঘরে আরেকজন নতুন বউ নিয়ে আসবেন।'

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার উপস্থিতজবাবে মুগ্ধ হয়ে হেসে দিলেন।[৮৪৫]

উসামা-বাহিনীর যুদ্ধযাত্রা

এরপর পরবর্তী দুইদিনে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্বাস্থ্যের আরো অবনতি হয়। অসুখ বৃদ্ধি পেতে থাকে। অপরদিকে হজরত উসামা রাদিয়াল্লাহু আনহুর সৈন্যবাহিনী যাত্রার জন্য পূর্ণ প্রস্তুত। ২রা রবিউল আওয়াল, বৃহস্পতিবার। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পতাকা প্রস্তুত করে

---

৮৪৩. তাবাকাতে ইবনে সা'দ : ২/১৮৯, ১৯০; সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ : ৬/২৪৮

৮৪৪. রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অসুস্থতার সময়সীমা প্রণিধানযোগ্য উক্তি অনুযায়ী ছিল ১৩ দিন। [তাবাকাতে ইবনে সা'দ : ২/১৮৯, ১৯০; সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ : ১২/২৪৪] আর যেহেতু প্রসিদ্ধ উক্তি মোতাবেক ১২ রবিউল আওয়াল ছিল অফাতের তারিখ, তাই অসুস্থতার সূচনা ২৯ সফর নির্ধারিত হয়। আর এটা ঐ দিন ছিল, যেদিন হজরত উসামা রা.কে আমির নিযুক্ত করা হয়েছিল।

৮৪৫. মুসনাদে আহমাদ : হাদিস নং ২৫৯০৮; আসসুনানুল কুবরা, নাসায়ি : হাদিস নং ৭০৪২; সিরাতে ইবনে হিশাম : ২/৬৪৩

উসামা বিন যায়েদ রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাতে অর্পণ করেন। দোয়া ও উপদেশ দিয়ে তাকে বিদায় জানালেন।[৮৪৬]

উসামা রাদিয়াল্লাহু আনহু বিদায় নেওয়ার পূর্বে আরজ করলেন, 'ইয়া রাসুলাল্লাহ, আশা করছি আল্লাহ তায়ালা আপনাকে সুস্থ করে দেবেন। আপনি আমাকে আর কয়েকটা দিন আপনার পাশে থাকার অনুমতি দিন। যদি আমি এই অবস্থাতেই রওনা হয়ে যাই, তা হলে মনে খটকা থেকে যাবে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চুপ থাকলেন। কোনো জবাব দিলেন না। উসামা বিন যায়েদ রাদিয়াল্লাহু আনহু সেনাবাহিনী নিয়ে যাত্রা করলেন। মদিনার তিন মাইল দূরে অবস্থিত 'জুরুফ' নামক স্থানে গিয়ে তারা অবস্থান করলেন। এই অভিযানের ব্যাপারে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এমন অস্বাভাবিক আগ্রহ দেখে সাহাবায়ে কেরাম দলে দলে সেখানে গিয়ে পৌঁছতে থাকেন।[৮৪৭]

হজরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহু, হজরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু, হজরত সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস রাদিয়াল্লাহু আনহু, হজরত আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু, হজরত সাঈদ বিন যায়েদ রাদিয়াল্লাহু আনহুর মতো স্বনামধন্য প্রসিদ্ধ সাহাবিগণও এ কাফেলায় শামিল ছিলেন।[৮৪৮]

হজরত আয়েশার কামরায় আখেরি অবস্থান

ওদিকে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাথাব্যথা ক্রমশ বেড়ে চলছে। তা সত্ত্বেও তিনি প্রতিদিন পালাক্রমে স্ত্রীদের ঘরে যাচ্ছিলেন। কিন্তু যখন পীড়া মাত্রাতিরিক্ত বেড়ে গেল তখন তিনি অন্যান্য স্ত্রীর নিকট অনুমতি চাইলেন অসুস্থতার দিনগুলোতে হজরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহার গৃহে অবস্থান করার, যাতে ঘর পরিবর্তনের কষ্ট সহ্য করতে না হয়। সকলে সন্তুষ্টচিত্তে অনুমতি দেন। তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হজরত আলি রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং হজরত ফজল বিন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাঁধে ভর করে হজরত আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু আনহার হুজরাতে চলে যান। তখন নবীজির মাথায় পট্টি বাঁধা ছিল এবং পদযুগল মোবারক মাটিতে হেঁচড়াচ্ছিল।[৮৪৯]

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হজরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহার গৃহে অবস্থান করছেন। রোগের তীব্রতা তিনি ক্ষণে ক্ষণেই অনুভব করতে

---

৮৪৬. তাবাকাতে ইবনে সা'দ : ২/১৯০; সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ : ৬/২৪৮

৮৪৭. দালাইলুন নুবুওয়াহ; বাইহাকি : ৭/২০০

৮৪৮. তাবাকাতে ইবনে সা'দ : ২/১৯০; সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ : ৬/২৪৮

৮৪৯. সহিহ বুখারি : হাদিস নং ৪৪৪২, (কিতাবুল মাগাজি, বাবু মারাদিন নাবিয়্যি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওয়া ওফাতিহী)।

পারছিলেন। খাইবার-প্রান্তরে যায়নাব বিনতে সাল্লামের আতিথেয়তায় যে বিষ-মেশানো লোকমা মুখে তুলেছিলেন, তার ক্রিয়াও ধীরে ধীরে প্রকাশ পাচ্ছে। তখন তিনি বললেন, আমার মনে হচ্ছে ওই বিষের ক্রিয়াতে আমার ঘাড়ের রগ ফেটে যাচ্ছে।[৮৫০]

নবীজির কষ্ট দেখে উম্মুল মুমিনিনগণও বেহাল হয়ে পড়েন। উম্মুল মুমিনিন হজরত সাফিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহা বলতে লাগলেন, 'ইয়া রাসুলাল্লাহ, ইয়া নাবিয়্যাল্লাহ, আমি চাই আপনার এ কষ্ট যেন আমার উপর চলে আসে।'[৮৫১]

উম্মতের উপর গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব অর্পণ

এত কঠিন পীড়া ও যন্ত্রণাকর অসুখের মধ্যেও তিনি তার উম্মতের কল্যাণকামিতা ও রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বগুলোর ব্যাপারে অচেতন ছিলেন না। বরং তখনও তিনি মুসলিম উম্মাহকে এই উপদেশ দিয়ে যাচ্ছিলেন যে, এই জাজিরাতুল আরব তথা গোটা আরবভূখণ্ডে যেন দুটি ধর্ম না থাকে।[৮৫২] তিনি জোর তাগিদ দিয়ে বলেন, দ্রুতই ইহুদি-খ্রিষ্টান ও মুশরিকদের বহিষ্কার করে দেওয়া হোক।[৮৫৩]

কারণ, এই আরব-ভূখণ্ড মুসলিমবিশ্বের হেডকোয়ার্টারের মর্যাদা রাখে। আর হেডকোয়ার্টারে শত্রুপক্ষের অবস্থান নানা ফেতনা-ফ্যাসাদের জন্ম দিতে পারে।[৮৫৪]

সর্বশেষ ইমামতি

নবীজির অসুখ আরো বেড়ে গেল। একপর্যায়ে মাগরিবের নামাজে তিনি ইমামত করেন। সুরা মুরসালাত দিয়ে নামাজ সম্পন্ন করেন। এটাই ছিল রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পেছনে ইকতেদা-করা উম্মতের শেষনামাজ।[৮৫৫]

---

৮৫০. সহিহ বুখারি : হাদিস নং ৪৪২৮, (কিতাবুল মাগাজি, বাবু মারাদিন নাবিয়্যি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওয়া ওফাতিহী)।

৮৫১. তাবাকাতে ইবনে সা'দ : ৮/১২৮

৮৫২. لا يجتمع دينان في جزيرة العرب [শরহু মুশকিলিল আসার, তহাবি : হাদিস নং ২৭৬৩; মুআসসাতুর রিসালাহ মুদ্রিত]

৮৫৩. أخرجوا اليهود و النصارى من جزيرة العرب (আলআহাদ ওয়াল মাসানি : হাদিস নং ২৩৪, আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহ রা. থেকে বর্ণিত)

৮৫৪. ইমাম আবু উবায়েদ কাসেম বিন সাল্লাম এ নির্দেশের কারণ হিসেবে বর্ণনা করেন, তারা প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেছিল। অথবা তাদের অন্য কোনো প্লান-প্রোগ্রামের কারণে মুসলমানদের ক্ষতির আশঙ্কা বিরাজ করছিল।

إنما نراه قال ذلك صلى الله عليه وسلم لنكث كان منهم أو لأمر أحدثوه بعد الصلح، و ذلك بين في كتاب كتبه عمر إليهم قبل إجلائه إياهم عنها (الأموال للقاسم بن سلام : ١٢٩ دار الفكر

৮৫৫. সহিহ বুখারি : হাদিস নং ৪৪২৯, (কিতাবুল মাগাজি, বাবু মারাদিন নাবিয়্যি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওয়া ওফাতিহী)।

হজরত আবু বকরকে ইমামতির নির্দেশ ও নায়েব বানানোর ইঙ্গিত

এরপর জ্বরের তীব্রতা আরো বেড়ে যায়। ফলে তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়েন। ইশার নামাজের সময় চেতনা ফিরতেই তিনি জিজ্ঞেস করেন, লোকেরা কি নামাজ পড়ে ফেলেছে? হজরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা আরজ করলেন, না ইয়া রাসুলাল্লাহ, তারা আপনার জন্য অপেক্ষা করছেন।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অজু করে মসজিদে যাওয়ার ইচ্ছা করলেন। কিন্তু দুর্বলতা ও অবচেতন হওয়ার কারণে মসজিদে যাওয়া সম্ভব হলো না। তখন কিছুটা সতেজ হওয়ার লক্ষে সাত মশক পানি আনালেন। এরপর একটি বড় পাত্রে বসলেন ও উম্মুল মুমিনিনগণ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শরীরে পানি ঢালতে লাগলেন। তাপমাত্রা কিছুটা স্বাভাবিক হলে তিনি ইশারায় পানি ঢালতে বারণ করলেন। নামাজের উদ্দেশ্যে আরেকবার দাঁড়ানোর ব্যর্থচেষ্টা চালালেন। কিন্তু তখনও জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন। দীর্ঘক্ষণ পর চেতনা ফিরে পেলে জিজ্ঞেস করেন, লোকজন কি নামাজ পড়ে ফেলেছে? বলা হলো, 'না, ইয়া রাসুলাল্লাহ, তারা এখনো আপনার জন্য অপেক্ষা করছে।'

এরপর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবার গোসল করলেন। আবারো মসজিদে যাওয়ার জন্য চেষ্টা চালালেন। এবারও বেহুঁশ হয়ে গেলেন। এ নিয়ে মোট তিনবার বেহুঁশ হলেন। অতঃপর হুঁশ ফিরলে তিনি বললেন, 'আবু বকরকে বলো, তিনি যেন নামাজ পড়িয়ে দেন।' উম্মুল মুমিনিনগণ কানাকানি করতে লাগলেন। হজরত আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু আনহা আরজ করলেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ, আব্বাজান খুব নরম দিলের মানুষ। তিনি আপনার জায়গায় দাঁড়িয়ে ইমামতি করার ভার সইতে পারবেন না। এরপর নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটু শক্ত হয়ে সকলের কথা উপেক্ষা করে বললেন, 'আবু বকরকে আদেশ করো, যাতে তিনি নামাজের ইমামতি করেন।'[৮৫৬]

এটাই ছিল রাসুলের পক্ষ হতে এ উম্মতের জন্য প্রতিনিধি ও নায়েব বানানোর সূক্ষ্ম ইঙ্গিত। হজরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এখন আখেরাতের মুসাফির। রেখে যাচ্ছেন অতি আদর-যত্নে গড়া প্রিয় উম্মত। তখনও তার মাথায় এ উম্মতের ঐক্য ও সংহতির চিন্তা ছিল। এই উম্মতের ভবিষ্যৎ কীভাবে কাটবে এই কল্পনা তার অনুভূতিতে সদাজাগ্রত ছিল। কিন্তু এ দায়িত্ব অর্পণের ক্ষেত্রে দুনিয়ার অন্যান্য রাজা-বাদশাহর নীতি পালন করাকে তিনি পছন্দ

---

৮৫৬. সহিহ বুখারি : হাদিস নং ৬৬৪, (কিতাবুল আজান)

باب حد المريض أن يشهد الصلوة عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها، باب أهل العلم و الفضل أحق بالإمامة : ح٦٧٨ عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه : ح٦٧٩ عن عروة بن الزبير عن عائشة رضى الله عنهما : ح ٦٨٢ عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما

করতেন না। দুনিয়ার রাজা-বাদশাহরা তো বংশানুক্রমিকভাবে রাজত্ব অর্পণ করে থাকে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই ধারার অবসান ঘটিয়ে তাদের এ রীতি-নীতির বিরুদ্ধে অবস্থান নিলেন, যাতে ভবিষ্যতে নেতৃত্ব ও রাজত্ব কোনো বিশেষ বংশের কবলে কুক্ষিগত না হয়ে যায়।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সব সময়ই এ বিষয়ে উদারচিত্ত ও প্রশস্ত দৃষ্টিভঙ্গি প্রদর্শন করতে চাইতেন। তাই মুসলমানদের পারস্পরিক শলাপরামর্শ, জাতীয় ভ্রাতৃত্ববন্ধন, কল্যাণকামিতা, রাজনৈতিক চিন্তাধারা, আত্মোৎসর্গ মনোভাব, মতাদর্শগত একতা, গভীর চিন্তাভাবনা এবং পারস্পরিক বোঝাপড়া ও অপরকে বুঝদানের পক্ষে ছিলেন তিনি। আর এটা তখনই সম্ভব, যখন ক্ষমতা হস্তান্তরের বিষয়ে কাউকে নির্দিষ্ট কোনো নিয়মের গণ্ডিতে আবদ্ধ করা না হয়। বরং জনগণকে সুযোগ দেওয়া, যাতে তারা কুরআন ও হাদিসের প্রদত্ত দীক্ষার আলোকে প্রয়োজন অনুপাতে উত্তম হতে উত্তমতর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে।

এরপরও রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাথায় তার নায়েব যিনি হবেন, তার নাম পরিষ্কারভাবে বদ্ধমূল ছিল। আর সেটা আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হতেও চূড়ান্ত ছিল। মুসলমানদের সুতীক্ষ্ণ ও উদার মানসিকতা এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থার ব্যাপারে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শতভাগ আস্থাশীল ছিল যে, তারাও এ মহান ব্যক্তিকেই খলিফা মনোনীত করবে। সেই ব্যক্তিত্ব ছিঁলেন হজরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহু। তিনি ছিলেন হজরত রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সর্বাধিক নিকটতম বন্ধু ও সহযোগী, সর্বাপেক্ষা সম্মানিত ও বুজুর্গ। তিনিই ছিলেন তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ নেতৃত্ব ও ইমামতের দায়িত্ব সামাল দেওয়ার মতো যোগ্য ও দক্ষ ব্যক্তি।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হজরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহুকে নামাজের ইমামতি করার নির্দেশ দিলেন। কিন্তু তিনি রাসুলের অসুস্থতার দুশ্চিন্তায় এতটাই ভেঙে পড়েছিলেন যে, তৎক্ষণাৎ রাসুলের এ হুকুম তামিল করতে পারেননি। তাই হজরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু সামনে বেড়ে নামাজ পড়াতে লাগলেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন হজরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর কণ্ঠে তেলাওয়াতের আওয়াজ শুনলেন, তৎক্ষণাৎ জোরে আওয়াজ দিয়ে বললেন, 'না, না, না। আবু বকরই নামাজ পড়াবেন'।[৮৫৭]

তিনি আরো বললেন, 'আবু বকরকে ছাড়া কাউকে ইমাম আল্লাহ তায়ালাও

---

৮৫৭. সুনানে আবু দাউদ : হাদিস নং ৪৬৬১, কিতাবুস সুন্নাহ, বাবুন ফী ইসতিখলাফি আবি বকরিন রাদিয়াল্লাহু আনহু।

বানাতে দেবেন না এবং অন্য মুসলমানরাও দেবে না'।[৮৫৮]

ফলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অফাত পর্যন্ত সকল নামাজ হজরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর ইমামতিতেই সম্পাদিত হতে থাকল।

মসজিদে নববির ইমামের জায়নামাজটি এমন, যেখানে রাসুলের উপস্থিতিতে অন্য কেউ পা রাখতেও সাহস পেতো না, সেখানে তারই জীবদ্দশায় আপন জায়নামাজে কাউকে নির্দিষ্টভাবে নিযুক্ত করে দেওয়া এ কথার পরিষ্কার প্রমাণ যে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার অবর্তমানে কাকে তার নায়েব হিসেবে দেখতে চান। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চাইতেন মুসলমানরা যেন তাদের রাসুলের উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে নিজের বুঝ ও রাজনৈতিক প্রজ্ঞার বহিঃপ্রকাশ ঘটায়। পরবর্তীতে এমনটাই হয়েছিল। সবসময়ের মতো এক্ষেত্রেও সকল সাহাবি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আশা-আকাঙ্ক্ষার সাথে একাত্মতা পোষণ করেছেন।

যদিও রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার নায়েব ও প্রতিনিধির নাম উল্লেখ করা অনুচিত মনে করতেন এবং বিষয়টি মুসলমানদের শূরা (কমিটি)-এর পরামর্শের উপর ছেড়ে দেওয়া পছন্দ করতেন; কিন্তু একদিন হঠাৎ মনে করলেন এমন যেন না হয় যে, মুসলমানরা এ বিষয়ে পরস্পর দ্বন্দ্ব-কলহে লিপ্ত হয়ে পড়ে। এজন্য রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আবু বকর ও তার ছেলেকে ডেকে আনো। আমি কিছু লিখে দিই। এমন না হয় যে, আবু বকরের উপস্থিতিতে কোনো ক্ষমতালোভী এসে মধ্যখানে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়।[৮৫৯]

রাসুলুল্লাহ কী অসিয়ত লিখতে চেয়েছিলেন?

বৃহস্পতিবার অসুস্থতা আরো বেড়ে গেল। অবস্থার অবনতি ঘটলো। তাই রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সে অবস্থাতেই কিছু লেখার জন্য কাগজ-কলম চাইলেন।[৮৬০] তখন হজরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু, হজরত আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু-সহ কতিপয় সাহাবি সেখানে উপস্থিত ছিলেন।

---

৮৫৮ সুনানে আবু দাউদ : হাদিস নং ৪৬৬১, কিতাবুস সুন্নাহ, বাবুন ফী ইসতিখলাফি আবি বকরিন রাদিয়াল্লাহু আনহু; আলবিদায়া ওয়ান নিহায়া : ৮/৪৬

৮৫৯ (সহিহ মুসলিম, কিতাবু ফাযাইলিস সাহাবাহ, বাবু ফাযাইলি আবি বাকরিনিস সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহু); মুসনাদে আহমাদ : হাদিস নং ২৫১১৩; মুসনাদে আবু দাউদ তয়ালিসি : হাদিস নং ১৬১১; সুনানে কুবরা লিন নাসায়ি : হাদিস নং ৭০৪৪।

ادعى لي أبا بكر أباك و أخاك، حتى أكتب كتابا فإني أخاف أن يقول قائل أو يتمنى متمن و يقول : أنا أولى، و يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر

৮৬০. হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. একে বৃহস্পতিবারের ঘটনা বলে উল্লেখ করেছেন। [সহিহ বুখারি : হাদিস নং ৩১৬৮] সুতরাং এটা অফাত দিবসের পাঁচদিন পূর্বের ঘটনা।

কয়েকজন এ হুকুম তামিল করতে চাইলেও আর কয়েকজন মনে করলেন নবীজির অবস্থা আশঙ্কাজনক, বার বারই বেহুঁশ হয়ে যাচ্ছেন, তাই হজরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু-সহ কিছু সাহাবি নবীজির কষ্টের দিকে তাকিয়ে কোনো কিছু লেখানোতে বাধা দিয়ে বললেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এখন খুব কষ্ট হচ্ছে। আমাদের নিকট তো কুরআন আছেই, সেটাই আমাদের জন্য যথেষ্ট।

এ ধরনের কথাবার্তায় মজলিসের আওয়াজ কিছুটা উঁচু হওয়ার উপক্রম হলো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সব শুনে যাচ্ছিলেন। উঁচু আওয়াজের কারণে বিরক্তিও অনুভব করছিলেন। কিন্তু সেই সাথে এ বিষয়ে প্রশান্তিও অনুভব করছিলেন যে, পরিপূর্ণ দীন সম্পর্কে তরবিয়ত ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত এ বিশাল জামাত বাস্তবিকই নির্ভরযোগ্য। এদের মধ্যে প্রত্যেক নবাগত সমস্যার সমাধান কুরআন ও হাদিসের আলোকে বের করার যোগ্যতা বিদ্যমান রয়েছে। তাই রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিছু লেখানোর প্রতি আর জোর দিলেন না। বরং সেখানেই মজলিসের সমাপ্তি ঘোষণা করলেন ও বললেন, এখন তোমরা চলে যাও। আমি তোমাদেরকে মৌখিকভাবেই কয়েকটি অসিয়ত করে দিই। তা হলো-

'মুশরিকদেরকে জাজিরাতুল আরব হতে বের করে দেবে। উসামা বাহিনীকে ঠিক তেমন গুরুত্ব দিয়েই প্রেরণ করবে, যেমন আমি গুরুত্ব দিয়ে বিভিন্ন বাহিনী প্রেরণ করে থাকি। আর আগত প্রতিনিধির ইজ্জত-সম্মান এমনভাবে করবে যেমনটা আমি করে থাকতাম।'[৮৬১]

৮৬১. সহিহ বুখারি : হাদিস নং ৩০৫৩, (কিতাবুল জিহাদ : হাদিস নং ৩০৫৩ কিতাবুল জিযয়াহ : বাবু ইখরাজিল ইয়াহূদি ওয়ান নাসারা) : হাদিস নং ৪৪৩১
(কিতাবুল মাগাজি বাবু মারাদিন নাবিয়্যি ওয়া ওয়াফাতিহী); সহিহ মুসলিম : হাদিস নং ৪৩১৯ (কিতাবুল ওয়াসিয়্যাহ : বাবু তারকিল ওয়াসিয়্যাহ)
নোট : হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. একদিন কাঁদতে কাঁদতে বললেন, হায়! বৃহস্পতিবার, হায়! বৃহস্পতিবার! এরপর তিনি পুরা ঘটনা বর্ণনা করলেন [সহিহ বুখারি : হাদিস নং ৩১৬৮ বাবু ইখরাজিল ইয়াহূদি মিন জাযিরাতিল আরব]। পরিশেষে তিনি বললেন, একটি বড় ধরনের ক্ষতি হয়ে গেল যে, সাহাবিদের মতানৈক্য ও তাদের চেঁচামেচিতে কথাটি লেখা হলো না [সহিহ বুখারি : হাদিস নং ৭৩৬৬, কিতাবুল ই'তিসামি বিল কিতাবি ওয়াস সুন্নাহ, বাবু কারাহিয়াতিল খিলাফ]।→
এ কথার অর্থ আবার কেউ এমন বুঝে না বসে যে, রাসুল সা. তখন বিশেষ কোনো আকিদার কথা অথবা ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ কোনো রুকনের কথা লেখাতে চাচ্ছিলেন, যা লেখা হলো না, তাই হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. দীন অপূর্ণ থেকে যাওয়ার কারণেই কাঁদছিলেন।
মূলত : এ ঘটনার সময় হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. এর বয়স ছিল প্রায় চৌদ্দ বছর। আর তিনি হাদিস জমা করার ব্যাপারে খুব আগ্রহী ছিলেন। মূলত, তার মধ্যে এ

তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হজরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহুর খেলাফতনামা লিখে দেওয়ার চিন্তাও বাদ দিলেন এবং বললেন, 'আল্লাহ এবং মুসলমান কেউ আবু বকরকে বাদ দিয়ে কাউকে খলিফা হতে দেবে না।'[৮৬২]

হজরত আলিকে সম্বোধন করে অসিয়ত

একবার রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হজরত আলি রাদিয়াল্লাহু আনহুকে কাগজ কলম আনতে নির্দেশ করলেন। তখন তিনি কিছু অসিয়ত লেখাতে চাইলেন। যাতে লোকজন পথভ্রষ্ট না হয়। অন্যান্য সাহাবির মতো তিনিও কাগজ কলম নিয়ে রাসুলের সামনে যাওয়া অনুচিত মনে করলেন। তাই তিনি বললেন, 'ইয়া রাসুলাল্লাহ, আপনি মুখে মুখে বলে দিন। আমি মুখস্থ করে নিতে পারবো'। তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, 'আমি অসিয়ত করছি নামাজ, জাকাত এবং অধীনস্থদের প্রতি খুব লক্ষ রাখার বিষয়ে'।[৮৬৩]

আক্ষেপ কাজ করছিল যে, রাসুলপাক সা. ঐ মজলিশে যা লেখাতে চেয়েছিলেন, তা লেখা হয়ে যেতো।

প্রবল সম্ভাবনা যে, তার তখন এ ধারণা ছিল যে, হয়তো তখন জঙ্গে জামাল ও সিফফিনের মতো ঘটনা হতে বাঁচানোর জন্য খেলাফতের দাবিদারদের বিবরণ অথবা শরিয়তের কোনো বিধান বা খোলাফায়ে রাশেদিনের নাম একের পর এক লেখাতে চেয়েছিলেন। যেমনটা আল্লামা আইনি রহ. উল্লেখ করেছেন যে-

أراد أن ينص على الإمامة فترفع تلك الفتن العظيمة كحرب الجمل و الصفين-- و أراد أن يبين كتابا فيه مهمات الأحكام ,أراد أن ينص على أسامي الخلفاء بعده (عمدة القاري : ٢ : ١٧١)

মোটকথা, এ ধারণা একেবারেই ভুল যে, রাসুলপাক সা. তখন হজরত আলি রা. এর ইমামত বা খেলাফত সংক্রান্ত কোনো ফরমান লেখাতে চেয়েছিলেন। এরপরেও তো রাসুলপাক সা. কয়েক দিন জীবিত ছিলেন। যদি তিনি হজরত আলি রা. এর ইমামতের বিষয়টি পরিষ্কার করতে চাইতেনই (যেমনটা শিয়াদের আকিদা-বিশ্বাস) তা হলে তিনি এরপর কেন করলেন না? মূলত তখন উপস্থিত কোনো সাহাবির মাথাতে এ ধারণাই উদয় হয়নি যে, আর কোনো রুকন লেখানো হবে।

নয়তো কমপক্ষে হজরত আলি রা. রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পরবর্তীতে জিজ্ঞেসই করে নিতে পারতেন যে, আপনি তখন কী যেন বলতে চেয়েছিলেন? হ্যাঁ, পরে যখন উম্মতের মাঝে দলাদলি হতে থাকলো এবং গৃহযুদ্ধ লেগে গেল তখন কখনো আক্ষেপবশত হজরত আব্বাস রা. এর কান্নাকাটি করা ও মুখ দিয়ে এ কথা বের হয়ে যাওয়া একটি স্বাভাবিক বিষয় ছিল যে, হায়! যদি তখনই এ বিষয়ের কিছু সংরক্ষিত থাকতো কতই-না ভালো হতো! (অর্থাৎ খলিফাদের নাম ধারাবাহিকভাবে চলে আসতো তা হলে আজ এত বড় বিপদ আসতো না)।

৮৬২. সহিহ বুখারি : হাদিস নং ৭২১৭, কিতাবুল আহকাম, বাবুল ইসতিখলাফ; মুসনাদে আহমাদ : হাদিস নং ২৪৭৫১; মুসনাদে আবু দাউদ তয়ালিসি : হাদিস নং ১৬১১

৮৬৩. মুসনাদে আহমাদ : হাদিস নং ২৬৭২৭। সনদ সহিহ লিগাইরিহী।

মসজিদে নববিতে শেষবারের মতো গমন

হজরত উসামা রাদিয়াল্লাহু আনহুর সৈন্যবাহিনী রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অসুস্থতায় পেরেশান হয়ে 'জুরুফ' নামক স্থানে থেমে ছিল। ১০ রবিউল আওয়াল সেনাপতি উসামা বিন যায়েদ রাদিয়াল্লাহু আনহু আরো কিছু সাহাবির সঙ্গে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শুশ্রূষায় মদিনা চলে আসেন।[৮৬৪]

সেদিনই জোহরের সময় নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জ্ঞান ফেরে। ফলে তিনি হজরত আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং হজরত আলি রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাঁধে ভর করে মসজিদে নববিতে গমন করেন। তখনও নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাথায় পট্টি বাঁধা ছিল। শরীরে কম্বল জড়ানো ছিল। ততক্ষণে জামাতও দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। হজরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহু নামাজ পড়াচ্ছিলেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হুজরার দরজা ছিল মসজিদের প্রথম কাতারের বাঁ দিকে। যার পাল্লা মসজিদের ভেতর দিকে খুলতো। তাই হজরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগমন টের পেয়ে যান। তিনি ইমামের স্থান হতে পেছনে সরে আসতে চাইলে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বারণ করলেন।[৮৬৫]

হজরত আলি রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বললেন, আমাকে আবু বকরের বাম পাশে নিয়ে বসাও।[৮৬৬]

তখন হজরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইকতেদায় নামাজ পড়ছিলেন, আর অন্যান্য লোকজন আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর তাকবিরধ্বনি অনুসরণ করে নামাজ আদায় করছিলেন।[৮৬৭] এটা ছিল নিজের বর্তমানে নিজ স্থলাভিষিক্তের তাবেদারি করানোর এক হৃদয়কাড়া দৃশ্য। যার মধ্যে প্রমাণ পাওয়া যায়, হজরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহুর অনুসরণ মূলত নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণেরই নামান্তর।

---

৮৬৪. তাবাকাতে ইবনে সা'দ : ২/১৯০

৮৬৫. সহিহ বুখারি : হাদিস নং ৯২৭ কিতাবুল জুমুআহ, বাবু মান কালা ফিল খুতবাতি বা'দাস সানা-ই আম্মা বাআদ : হাদিস নং ৬৮৩, কিতাবুল আজান, বাবু মান কামা ইলা জামবিল ইমাম লিইল্লাতিন : হাদিস নং ৭১২, ৭১৩, কিতাবুল আজান : বাবু মান আসমাআন নাসা বিতাকবীরিল ইমামি।

৮৬৬. সিরাতে ইবনে হিব্বান : ১/৩৯৯

৮৬৭. সহিহ মুসলিম : হাদিস নং ৯৬৮ কিতাবুস সালাতি, বাবু ইসতিখলাফিল ইমামি ইযা আরযা লাহু উযরুন

উম্মতের প্রতি সর্বশেষ ভাষণ

নামাজের পর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হজরত উসামা রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাঁধে ভর করে দাঁড়ালেন। যিনি 'জুরুফ' নামক স্থানে আপন সৈন্যবাহিনী রেখে নবীজির শুশ্রূষায় চলে এসেছিলেন। অতঃপর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিম্বরে উঠে বসলেন ও বললেন- 'আল্লাহ তায়ালা তার বান্দাকে স্বাধীনতা দিয়ে রেখেছেন; কেউ ইচ্ছা করলে পার্থিব নেয়ামতেই সন্তুষ্ট থাকবে, আর কেউ ইচ্ছা করলে আল্লাহ তায়ালার নিকট বিদ্যমান নেয়ামতরাজি গ্রহণ করবে। সুতরাং এই বান্দা আল্লাহর নিকট বিদ্যমান নেয়ামতকেই পছন্দ করেছে'।

একথা শোনামাত্র হজরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহু বলে উঠলেন, 'আপনার উপর আমার পিতা-মাতা উৎসর্গ হোক। আমাদের জান ও মাল আপনার উপর উৎসর্গ হোক।'[৮৬৮]

এ কথা বলতে বলতে তিনি জারজার করে কাঁদতে থাকেন। কারণ, ওই মজলিসের একমাত্র তিনিই বুঝতে সক্ষম হয়েছিলেন, এ কথাতে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিদায়ের ধ্বনি শোনা যাচ্ছে। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হজরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহুর কান্না বরদাশত করতে পারলেন না। তাই তিনি বললেন, 'আবু বকর, কান্নাকাটি করো না'।[৮৬৯]

হজরত আবু বকর সিদ্দিকের অনুগ্রহ

এরপর নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবিদের সম্বোধন করে বলতে লাগলেন, 'আমার উপর সর্বাধিক ইহসান ও অনুগ্রহ ছিল আবু বকরের। আমি যদি কোনো মানুষকে বন্ধু বানাতাম তা হলে আবু বকরকেই বানাতাম। কিন্তু তার সাথে আমার সম্পর্ক হলো ধর্মীয় ভ্রাতৃত্বের। আচ্ছা! মসজিদের সবকটি দরজা বন্ধ করে দাও। শুধু আবু বকরের দরজাটা খোলা রাখ।'[৮৭০]

উসামা বিন যায়েদের আমির হওয়াই চূড়ান্ত

হজরত উসামা বিন যায়েদ রাদিয়াল্লাহু আনহুর বয়স যেহেতু কম ছিল, তাই কোনো কোনো সাহাবি তার আমির হওয়ার উপর শতভাগ আস্থা রাখতে

---

৮৬৮. সহিহ বুখারি : হাদিস নং ৩৯০৪ কিতাবুল মানাকিবি, বাবু হিজরাতিন নাবিয়্যি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওয়া আসহাবিহী ইলাল মাদিনা।

৮৬৯. সহিহ বুখারি : হাদিস নং ৩৯০৪ কিতাবুল মানাকিবি, বাবু হিজরাতিন নাবিয়্যি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওয়া আসহাবিহী ইলাল মাদিনা।

৮৭০. সহিহ বুখারি : হাদিস নং ৪৬৬, কিতাবুস সালাতি, বাবুল খাওখাতি ওয়াল মামাররি ফিল মাসজিদি।

পারছিলেন না। ইতোপূর্বে মুতার যুদ্ধে যখন তার বাবাকে আমির নিযুক্ত করা হয়েছিল তখনও এমন কানাঘুষা হয়েছিল। এসব কারণে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খুব কষ্ট হচ্ছিল। সেহেতু তিনি অভিযোগকারীদেরকে চুপ করানোর জন্য তাদেরকে উদ্দেশ্যে বললেন, 'আজ যারা এখন উসামার নেতৃত্বে আপত্তি করছো, তোমরাই ইতোপূর্বে তার পিতা যায়েদের নেতৃত্বে আপত্তি করেছিলে। আল্লাহর কসম, যায়েদ এ পদের অত্যন্ত যোগ্য ব্যক্তি ছিল। আল্লাহর কসম, সে আমার নিকট তোমাদের অপেক্ষা অধিক প্রিয় ছিল। আল্লাহর কসম, এই উসামাও এ পদের উপযুক্ত।'

এভাবে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হজরত উসামা রাদিয়াল্লাহু আনহুর উপর পূর্ণ আস্থা প্রকাশ করে তার আমির হওয়াই চূড়ান্ত বলে ঘোষণা করেন।[৮৭১]

কবরকে সেজদাস্থল বানানোর নিষেধাজ্ঞা

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আশঙ্কা করছিলেন তার প্রতি ভক্তি প্রদর্শন এবং ভালোবাসায় অতিরঞ্জন করতে গিয়ে অন্যান্য নবী-রাসুল ও ওলিদের মতো মুসলমানরা শিরকি কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হয়ে যায় কি না। তাই তিনি কেয়ামত পর্যন্ত আগত মুসলমানদের সতর্ক করে ইরশাদ করেন- 'পূর্ববর্তী উম্মতগণ তাদের নবী ও বুজুর্গ ব্যক্তিদের কবরকে সেজদাস্থল বানিয়ে নিয়েছিল। সাবধান! তোমরা এটা কখনোই করতে যাবে না। আমি তোমাদেরকে এ থেকে কঠিনভাবে বারণ করছি।'[৮৭২]

আনসারি সাহাবিদের সাথে উত্তম আচরণ প্রদর্শনের তাগিদ

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আনসারি সাহাবিদের সীমাহীন ইহসান-অনুগ্রহ এবং মূল্যবান সেবা-যত্নের কথা স্মরণ করে মুহাজির সাহাবিদেরকে তাদের সাথে উত্তম চরিত্র প্রদর্শনের অসিয়ত করে বলেন- 'বন্ধুগণ, আনসারদের ব্যাপারে আমি তোমাদেরকে উত্তম আচরণ প্রদর্শনের তাগিদ দিয়ে যাচ্ছি। ব্যাপকভাবে সকল মুসলমানের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পেতে

---

৮৭১. সহিহ মুসলিমে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অসন্তুষ্টির এ শব্দগুলো বর্ণিত হয়েছে

إن تطعنوا في إمارته يعنى أسامة بن زيد فقد طعنتم في إمارة أبيه من قبله، و أيم الله أن كان لخليفا لها، إن كان لأحب الناس إلي ، و أيم الله إن هذا لها لخليق، يريد أسامة بن زيد

[সহিহ মুসলিম : হাদিস নং ৬৪১৮ ফাযাইলুস সাহাবাহ, বাবু ফাযাইলি যাইদিবনি হারিসিন রা.]। সিরাত লিপিকাররাও কথাটি সংরক্ষণ করে রেখেছেন। [সিরাতে ইবনে হিশাম : ২/৬৫০]

৮৭২. সহিহ মুসলিম : হাদিস নং ১২১২ (কিতাবুল মাসাজিদি ওয়া মাওয়াদিইস সালাতি, বাবুন নাহয়ি আন বিনা-ইল মাসাজিদি আলাল কুবূরি)

থাকবে। কিন্তু আনসারদের সংখ্যা হ্রাস পেতে পেতে খাদ্যে লবণের পরিমাণে চলে আসবে। তারা তাদের দায়িত্ব পালন করে দিয়েছে। এখন তোমাদের দায়িত্ব তোমাদের পালন করতে হবে। তোমাদের নেতৃস্থানীয় লোকদের উচিত আনসার সাহাবিদের খুব কদর করা। তাদের থেকে কোনো ভুলভ্রান্তি প্রকাশ পেয়ে গেলে ক্ষমাসুন্দরদৃষ্টিতে দেখা।'[৮৭৩]

তিনি আরো বলেন, 'তোমাদের প্রত্যেকের কারো মৃত্যুর সময় তার ব্যাপারে ভালো ধারণা পোষণ করা উচিত।'[৮৭৪]

এটা ছিল হজরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনের সর্বশেষ ভাষণ।[৮৭৫] এরপর তিনি ঘরে চলে গেলেন।[৮৭৬]

হজরত উসামা বিন যায়েদের জন্য নীরব দোয়া

পরেরদিন রোববার। হজরত উসামা বিন যায়েদ রাদিয়াল্লাহু আনহু আবার নবীজির খেদমতে হাজির হন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন তাকে দেখতে পান, তখন নবীজির চোখের কোণে অশ্রু ঝিলমিল করতে দেখা যায়। হজরত উসামা রাদিয়াল্লাহু আনহু কাছে গিয়ে ঝুঁকে চুমু খেতে থাকেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসমানের দিকে হাত উঁচিয়ে উসামা রাদিয়াল্লাহু আনহুর জন্য দোয়া করতে থাকলেন।[৮৭৭]

দুনিয়ার উপকরণ থেকে সম্পর্কহীনতা

জীবনের শেষমুহূর্তগুলো যতই ঘনিয়ে আসছিল, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ততই এ নশ্বর জগতের উপকরণ ও সরঞ্জামাদির প্রতি অনীহা প্রদর্শন করছিলেন। নিজ মালিকানায় তখনও কিছু আশরাফি মজুদ ছিল। হজরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহাকে সেগুলো দ্রুত সদকা করে দেওয়ার জন্য তাগিদ দিলেন।[৮৭৮]

কিছুক্ষণ পর জিজ্ঞেস করলেন, আশরাফিগুলো কি সদকা করে দিয়েছো?

---

৮৭৩. এ কথায় এই ইঙ্গিত সুপ্ত ছিল যে, খলিফা মুহাজিরদের মধ্য হতে হবে; আনসারদের থেকে নয়। যার উপর পরবর্তীতে সাহাবিগণ একমত পোষণ করেছেন।

৮৭৪. সহিহ মুসলিম : হাদিস নং ৭৪১২ কিতাবুল জান্নাতি ওয়া সিফাতি নায়িমিহা, বাবুল আমরি বিহুসনিয যন্নি বিল্লাহ।

৮৭৫. সহিহ বুখারি : হাদিস নং ৩৭৯৯, কিতাবুল মানাকিব, বাবু মানাকিবিল আনসার

৮৭৬. তাবাকাতে ইবনে সা'দ : ২/১৯০

৮৭৭. তাবাকাতে ইবনে সা'দ : ২/১৯০

৮৭৮. মুসনাদে আহমাদ : হাদিস নং ২৪৫৬০; সনদ সহিহ।

বলা হলো, না, এখনো সদকা করা হয়নি। তিনি তা আনতে বললেন। অতঃপর তিনি আশরাফিগুলো হাতে নিয়ে গুনে দেখলেন ছয়টি আশরাফি আছে। এরপর তিনি বললেন, 'মুহাম্মদ স্বীয় প্রতিপালকের নিকট কোন্ মুখে হাজির হবে যদি তার ঘরে এসব আশরাফি বিদ্যমান থাকে।' একথা বলে সঙ্গে সঙ্গে তিনি আশরাফিগুলো সদকা করে দিলেন।[৮৭৯]

দেহে একটি কম্বল জড়ানো ছিল। কম্বলটি জ্বরের তীব্রতার কারণে তিনি কখনো চেহারায় রাখতেন, আবার কখনো সরিয়ে রাখতেন। এরই মধ্যে তিনি বলে উঠলেন, ইহুদি-খ্রিষ্টানদের উপর আল্লাহর অভিশাপ বর্ষিত হোক। তারা তাদের নবী-রাসুলদের কবরগুলো সেজদাস্থল বানিয়ে নিয়েছে।[৮৮০]

হজরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামেরও এ ধরনের আশঙ্কা ছিল যে, হয়তো তার কবরকেও সেজদাস্থল বানিয়ে ফেলা হবে। আর এই আশঙ্কা থেকেই তিনি এমন সতর্কবাণী উচ্চারণ করে গিয়েছেন। যদি এমন আশঙ্কা না হতো, তা হলে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কবরও প্রকাশ্যে রাখা হতো। কিন্তু মুসলমানদেরকে শিরকের আশঙ্কা হতে মুক্ত রাখার জন্য তাকে ঘরের ভেতরেই দাফন করা হয়েছে, যাতে কবরের নিকটেও গমন করা সম্ভব না হয়।[৮৮১]

***

---

৮৭৯. তাবাকাতে ইবনে সা'দ : ২/২৩৭

৮৮০. সহিহ বুখারি : হাদিস নং ৪৩৫, কিতাবুস সালাতি, বাবুস সালাতি ফিস সাআতি।

৮৮১. সহিহ বুখারি : হাদিস নং ৪৪৪১, কিতাবুল মাগাজি, বাবু মারাদিন নাবিয়্যি ওয়া ওয়াফাতিহী।

জীবনের শেষদিন- অফাতকাল

দিনটি ছিল সোমবার।[৮৮২] রবিউল আওয়ালের ১২ তারিখ। বরকতময় জীবনের সর্বশেষদিবস।[৮৮৩]

---

৮৮২. সহিহ বুখারি : হাদিস নং ১৩৮৭, কিতাবুল জানা-ইযি, বাবু মাউতি ইয়াউমিল ইসনাইনি।

৮৮৩. রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অফাতের বিষয়ে প্রসিদ্ধ উক্তি হলো ১২ই রবিউল আওয়াল।

হাফেজ ইবনে কাসির রা. [আলবিদায়া ওয়ান নিহায়া : ৩/৩৭৫] হজরত জাবের রা. এবং হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. হতে বর্ণনা করেন,

ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفيل يوم الإثنين، الثاني عشر من ربيع الأول وفيه بعث و فيه خرج به الى السماء وفيه هاجر ومات.

যদিও ইবনে কাসির রহ. উক্ত সনদটি মুনকাতি বলে আখ্যা দিয়েছেন। তবে এতে وفيه هاجر ومات দেখে জমহুর সিরাতপ্রণেতাগণ ১২ রবিউল আওয়ালকেই অফাতের দিন মেনে নিয়েছেন।

তবে এ উক্তির উপর প্রসিদ্ধ একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হয়। আর তা হলো, বিশুদ্ধ রেওয়ায়েতের ভিত্তিতে অফাতদিবস হলো সোমবার। আর এর পূর্বে আরাফার দিন তথা ৯ যিলহজ বিশুদ্ধ রেওয়ায়েত মোতাবেক শুক্রবার অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সুতরাং কোনো পঞ্জিকা হিসেবেই ১২ রবিউল আওয়াল হতে পারে না। যদি যিলহজ ও মহররম মাসকে ত্রিশ দিন করে ধরে নেওয়া হয় তা হলে রবিউল আওয়াল মাসের প্রথম সোমবার হয় ৬ তারিখ। আর দ্বিতীয় সোমবার হয় ১৩ তারিখ। আর যদি তিন মাসকে ২৯ দিন করে হিসাব করা হয় তা হলে রবিউল আওয়ালের প্রথম সোমবার হয় ২ তারিখে, এবং দ্বিতীয় সোমবার হয় ৯ তারিখে, তৃতীয় সোমবার হয় ১৬ তারিখে।

যদি দুই মাস ৩০ দিনে আর এক মাস ২৯ দিনে ধরে নেওয়া হয় তা হলে রবিউল আওয়াল মাসের প্রথম সোমবার হয় ৭ তারিখে, এবং দ্বিতীয় সোমবার ১৪ তারিখে। যদি দুই মাস ২৯ দিনে আর এক মাস ৩০ দিনে ধরা হয়, তা হলে প্রথম সোমবার হয় ১ তারিখে এবং দ্বিতীয় সোমবার হয় ৮ তারিখে, তৃতীয় সোমবার হয় ১৫ তারিখে। মোটকথা কোনোভাবেই ১২ তারিখ হয় না। এ কারণেই কেউ কেউ রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অফাত ২রা রবিউল আওয়ালকে ধার্য করে থাকেন।

কাজি সুলায়মান মনসুরপুরি রহ. ১৩ রবিউল আওয়ালকে অফাতদিবস বলে মনে করেন। আবার কেউ কেউ রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্ম ৯ রবিউল আওয়াল ধরে অফাতের তারিখও ৯ রবিউল আওয়াল বলে থাকেন। তবে ১৩ বা ৯ তারিখ হওয়ার সম্ভাবনা তখনই থাকবে যখন যিলহজ, মহররম ও সফর মাস ৩০ কিংবা ২৯ দিনে হবে। আর এমনটা খুব কমই হয়ে থাকে। তাই কোনো কোনো গবেষক ৮ রবিউল আওয়ালকে গ্রহণ করে থাকেন।

মোটকথা, এগুলো হলো সব কাল্পনিক কথা। জমহুর ওলামায়ে কেরামের উক্তি যেহেতু ১২

ফজরের আজানের সময় শরীরটা কিছু ভালো লাগছিল। যখন ফজরের জামাত শুরু হলো তখন তিনি পর্দার কাপড় সরিয়ে অপলক নেত্রে মুসল্লিদের দেখে যাচ্ছিলেন। জীবনভর মেহনত-মুজাহাদার ফসল চোখের সামনে জ্বলজ্বল করে ভাসছিল। সাহাবিগণ সারিবদ্ধভাবে আল্লাহ তায়ালার দরবারে অত্যন্ত আদবের সাথে দণ্ডায়মান। হজরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহু নামাজ পড়াচ্ছিলেন। দৃশ্যপটটি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য এতটাই প্রাঞ্জল, হৃদয়কাড়া ও মনোরম ছিল যে, চেহারায় যেন আনন্দের তারকাপুঞ্জ মিটমিট করে জ্বলছে। তিনি এমন এক অবস্থাতে দুনিয়া হতে বিদায় নিতে যাচ্ছেন বলে অতীব আনন্দিত যে, ইসলামের সত্যিকার অর্থের উত্তরাধিকারী এক উম্মত প্রস্তুত হয়ে গেছে, যারা কেয়ামত পর্যন্ত আগত প্রজন্ম পর্যন্ত দীনের আলো পৌঁছে দেবে এবং বান্দাকে বন্দেগির প্রকৃত শিক্ষা প্রদান করতে প্রস্তুত থাকবে।

বাস্তবিকই রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন এক জামাআত পৃথিবীর মানচিত্রে রেখে যাচ্ছিলেন, যারা সর্বাবস্থাতেই ইসলামের দাওয়াত এবং আল্লাহর রাহে জিহাদ করার জন্য কোমর বেঁধে প্রস্তুত ছিলেন।

রবিউল আওয়াল; তাই এর বিপরীতে এ কল্পনাপ্রসূত সম্ভাবনা তখনই গ্রহণযোগ্য হবে, যখন উল্লিখিত প্রশ্নের কোনো জবাব খুঁজে পাওয়া না যাবে। অথচ এ প্রশ্নের শক্তিশালী একটি জবাব বিদ্যমান রয়েছে, যা হাফেজ ইবনে কাসির রহ. উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন-

وقد حصل له جواب صحيح في غاية الصحة ولله الحمد، افربه مع غيره من الأجوبة و هو أن هذا إنما وقع بحسب اختلاف رؤية هلال ذي الحجة في مكة و المدينة فرآه أهل مكة قبل أولئك بيوم و على هذا يتم القول المشهور.

আলহামদু লিল্লাহ! এর বিশুদ্ধ একটি জবাব রয়েছে। আর এটা অতীব বিশুদ্ধ। যা অন্যান্য সকল জবাবের মাঝে একটি স্বতন্ত্র জবাবও। তা হলো, এ মাসআলাটি মক্কা ও মদিনায় যিলহজের চাঁদ দেখা নিয়ে যে ইখতিলাফ হয়েছিল সে ভিত্তিতে এ ঝামেলাটি তৈরি হয়েছে। সে বছর মক্কাবাসিরা মদিনাবাসিদের একদিন পূর্বেই চাঁদ দেখে নিয়েছিল। এ ভিত্তিতে জমহুর ওলামায়ে কেরামের প্রসিদ্ধ উক্তিটিই দৃঢ়ভাবে প্রমাণিত হয়। [আলফুসুল ফিস সিরাহ : পৃষ্ঠা ২২০]

হাফেজ ইবনে কাসির রহ. এর উক্ত বিবরণের উপর কারো কোনো প্রশ্ন থাকতে পারে না। তাই অফাতদিবস ১২ রবিউল আওয়ালই চূড়ান্ত মনে হয়, যা মাদানি চাঁদ মোতাবেক হয়েছে। বেশি থেকে বেশি কেউ এ কথা বলতে পারে যে, এভাবে তো মদিনাতে চার মাস লাগাতার ৩০ দিনে হয়েছে। আর এটা অসম্ভবও নয়।

পাকিস্তান চাঁদ-দেখা কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক ১৪০৮ হিজরির যিলকদ ও যিলহজ মাস এবং ১২০৯ হিজরির মহররম ও সফর মাস এ চার মাস লাগাতার ৩০ দিনে কেটেছে। এর সাত বছর পর ১৪১৫ হিজরির যিলহজ ও ১৪১৬ হিজরির মহররম, সফর ও রবিউল আওয়াল এ চার মাস লাগাতার ত্রিশ দিনে অতিবাহিত হয়েছে। সুতরাং লাগাতার চার মাস ত্রিশ দিনে হওয়া বিরল তো বটে; কিন্তু অসম্ভব কিছু নয়।

একপর্যায়ে সাহাবিগণ অনুভব করতে পারলেন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের দিকে তাকিয়ে আছেন। দু'দিন যাবৎ তিনি মসজিদে নববিতে উপস্থিত হতে পারেননি। কতিপয় বড় বড় সাহাবি ছাড়া রাসুলের জন্য উৎসর্গপ্রাণ অনেকেই দু'দিন যাবৎ রাসুলের সাক্ষাৎ হতে বঞ্চিত। নামাজের ভেতরে রাসুলের অবলোকন অনুভব করতে পারায় প্রত্যেকের শিরা-উপশিরায় আনন্দের তরঙ্গ বয়ে যাচ্ছিল। সকলেই চোখ ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে রাসুলের সাক্ষাৎ কামনায় অস্থিরতা ও ব্যাকুলতা প্রকাশ করছিলেন। কিন্তু রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাতের ইশরারায় তাদেরকে ধীর-সুস্থে নামাজ শেষ করার নির্দেশ দেন। এরপর কিছুক্ষণ বিদায়ী দৃষ্টিতে তাকিয়ে আবার হুজরা শরিফের পর্দা ফেলে দেন।[৮৮৪]

ফজরের পর আকাশ ফর্সা হতে না হতেই হজরত আলি রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হন। নবীজির দৈহিক অবস্থা পূর্বাপেক্ষা ভালো দেখে সকলে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলছিলেন। সেখান থেকে বাইরে এসে দেখতে পেলেন, সাহাবায়ে কেরাম রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভালো-মন্দ সম্পর্কে জানার জন্য অস্থির হয়ে আছেন।

সাহাবিদের প্রশ্নের জবাবে তিনি বললেন, আলহামদুলিল্লাহ, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অবস্থা পূর্বাপেক্ষা ভালো।

এই উত্তর শুনে সাহাবায়ে কেরাম প্রশান্তচিত্তে নিজ নিজ কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েন।[৮৮৫]

হজরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহু কিছুক্ষণের জন্য নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট অনুমতি চেয়ে মদিনার অদূরেই অবস্থিত 'সুন্হ' নামক গ্রামে দ্বিতীয় স্ত্রীর নিকট চলে গেলেন।[৮৮৬] ইতোমধ্যে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্বাস্থ্যের আশঙ্কাজনক অবনতি দেখা দেয়। ক্ষণে ক্ষণেই তিনি জ্ঞান হারিয়ে ফেলছিলেন। দ্বিপ্রহরে মদিনার অলিগলি থমকে গেল। দয়ার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বেহুঁশ হয়ে পড়ে আছেন। হজরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা নবীজির মাথা মোবারক নিজ কোলে নিয়ে বসে আছেন। আশপাশে বেষ্টন করে আছেন ঘরের সকল সদস্য। তখন শেষনবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জবানে নিম্নযুক্ত আয়াতটি উচ্চারিত হলো-

৮৮৪. সহিহ বুখারি : হাদিস নং ৪৪৪৮ কিতাবুল মাগাজি, বাবু মারাদিন নাবিয়্যি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওয়া ওয়াফাতিহী

৮৮৫. সহিহ বুখারি : হাদিস নং ৪৪৪৭; আসসিরাতুল হালাবিয়্যাহ : ৩/৪৮৫

৮৮৬. আসসিরাতুল হালাবিয়্যাহ : ৩/৪৯৫; সহিহ বুখারি : হাদিস নং ৪৪৫২

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ

হজরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা যখন একথা শুনতে পেলেন তখন তিনি আপন প্রজ্ঞার ভিত্তিতে বুঝতে পারলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দুনিয়াতে অবস্থান করা এবং আখেরাতের সফর করা- এ দু'য়ের কোনো একটি বেছে নেওয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে। এক্ষেত্রে তিনি আখেরাতের সফরই পছন্দ করেছেন।[৮৮৭]

আখেরি অসিয়ত : নামাজের প্রতি গুরুত্বারোপ এবং দুর্বলদের উপর সদয়তা

প্রিয়নবী, আকায়ে নামদার, হজরত মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রাণ ওষ্ঠাগত। জীবনের সর্বশেষ প্রহরগুলো গুনছিলেন তিনি। এই সময় তিনি ক্ষীণ শব্দে বলে যাচ্ছিলেন-

الصلوة و ما ملكت أيمانكم

নামাজের প্রতি গুরুত্ব দাও। অধীনস্থ ও দুর্বলদের প্রতি যত্নবান হও।

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কথাটি বার বারই পুনরাবৃত্তি করে যাচ্ছিলেন। এরই মধ্যে ধীরে ধীরে তার আওয়াজ নিচু হয়ে আসছিল। দেখা যাচ্ছিল শুধু ঠোঁট-দুটো নড়ছে।[৮৮৮] হজরত আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু আনহা সুরা ফালাক ও সুরা নাস পড়ে ফুঁক দিচ্ছিলেন। হঠাৎ তিনি আসমানের দিকে তাকিয়ে বললেন-

فِي الرفيق الأعلى، فِي الرفيق الأعلى

সুমহান বন্ধু (আল্লাহ)-র সান্নিধ্যে। সুমহান বন্ধুর সান্নিধ্যে।

ইতোমধ্যে হজরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহার ভাই আবদুর রহমান রাদিয়াল্লাহু আনহু পিলু গাছের একটি তাজা ডাল নিয়ে ঘরে প্রবেশ করলেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দৃষ্টি পড়ল ডালটির প্রতি। হজরত আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু আনহা এই দৃষ্টিপাতের অর্থ বুঝে ফেললেন। ভাইয়ের হাত থেকে ডালটি নিয়ে পরিষ্কার করে নরম বানিয়ে নবীজির হাতে দিলেন। নবীজি তা দ্বারা অভ্যাসমতো খুব ভালো করে মিসওয়াক করলেন। মিসওয়াক করে ফেরত দেওয়ার সময় হাত থেকে মিসওয়াকটি পড়ে গেল।[৮৮৯]

---

৮৮৭. সহিহ বুখারি : হাদিস নং ৪৫৮৬ (কিতাবুত তাফসির); সহিহ মুসলিম : হাদিস নং ৬৪৪৮
৮৮৮. আসসিরাতুন নববিয়্যাহ, ইবনে কাসির : ৪/৪৭৩; দালাইলুন নুবুওয়াহ : ৭/২০৫
৮৮৯. আসসিরাতুন নববিয়্যাহ; ইবনে কাসির : ৪/৪৭৪-৪৭৫

তখনও রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হজরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহার দেহে ভর দিয়ে অর্ধশয়নে ছিলেন। সামনে ছিল পানির পেয়ালা। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুয়ে শুয়েই তাতে বার বার হাত ডোবাচ্ছিলেন, ভেজা হাত চেহারায় বুলিয়ে যাচ্ছিলেন আর বলছিলেন-

لا إله إلا الله، إن للموت سكرات، اللهم أعني على سكرات الموت

আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। নিশ্চয় মৃত্যুর যন্ত্রণা সত্য। হে আল্লাহ, মৃত্যুর যন্ত্রণায় তুমি আমায় সাহায্য করো।[৮৯০]

আব্বাজানের এমন কষ্ট দেখে হজরত ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহা হেচকি দিয়ে কেঁদে ফেললেন এবং বলতে লাগলেন-

وا كرب أباه

হায়! আমার আব্বাজানের কত কষ্ট!

রহমতে আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আদরের কন্যা ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহাকে বললেন- 'ফাতেমা, আজকের পর তোমার আব্বাজানের কোনো কষ্ট হবে না।'[৮৯১]

এই অবস্থাতেই কিছুক্ষণের জন্য তিনি আবার বেহুঁশ হয়ে যান। হাত মোবারক পানির পেয়ালার এক প্রান্তে গিয়ে পড়ল। ইতোমধ্যে তিনি ঘরের ছাদের দিকে চোখ উঠিয়ে হাতে ইশারা করে বলতে লাগলেন-

اللهم الرفيق الأعلى

এরপর আবার তিনি হাত দিয়ে উপর দিকে ইশারা করলেন ও বললেন-

في الرفيق الأعلى، في الرفيق الأعلى

এ কথা বলতে বলতে হাত আরেকদিকে ঢলে পড়ল। এরই মধ্যে মোবারক প্রাণবায়ুও উর্ধ্বজগতে উড়ে গেল।[৮৯২]

إنا لله و إنا إليه راجعون

প্রসিদ্ধ উক্তির ভিত্তিতে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বয়স ছিল ৬৩ বছর।[৮৯৩] তবে হজরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে ৬৫

৮৯০. সুনানে তিরমিজি : হাদিস নং ৯৭৮
৮৯১. সহিহ বুখারি : হাদিস নং ৪৪৬২, কিতাবুল মাগাজি, বাবু মারাদিন নাবিয়্যি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওয়া ওয়াফাতিহী।
৮৯২. সহিহ বুখারি : হাদিস নং ৪৪৪৯
৮৯৩. সহিহ মুসলিম : হাদিস নং ৬২৩৭ (কিতাবুল ফাযাইল)।

বছরের কথাও বর্ণিত আছে।[৮৯৪]

রাসুলুল্লাহর বিয়োগব্যথায় সাহাবায়ে কেরামের অস্থিরতা

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুমূর্ষুকালীন অবস্থা দেখে হজরত ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহা হজরত আলি রাদিয়াল্লাহু আনহুকে এবং সাইয়েদা হাফসা রাদিয়াল্লাহু আনহা আপন পিতা হজরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে ডেকে আনতে পূর্বেই লোক পাঠিয়েছিলেন; কিন্তু তারা পৌঁছার আগেই নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহজগৎ ত্যাগ করেন।[৮৯৫]

হজরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অফাতের সংবাদ সাহাবায়ে কেরামের নিকট পৌঁছতেই মনে হলো তাদের সবাইকে বিদ্যুৎ স্পর্শ করল। সংবাদটি কারো বিশ্বাস হচ্ছিল না। সাহাবায়ে কেরাম রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যেমনটা ভালোবাসা দিয়ে বরণ করে নিয়েছিলেন, পৃথিবীর সৃষ্টিলগ্ন হতে এ যাবৎ কেউ কাউকে এতোটা ভালোবাসা দিতে পারেনি। তারা এ বিদায়-বিয়োগ কীভাবে সহ্য করবেন! তখন যদিও দুপুর ছিল, তবু মনে হচ্ছিল মদিনার উপর কেমন এক অন্ধকার ছেয়ে গেছে। লোকজনের চোখেও নেমে এসেছিল রাজ্যের অন্ধকার।[৮৯৬]

হজরত ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহা অনায়াসেই বলে উঠলেন-

> يا أبتاه! أجاب ربا دعاه، يا أبتاه! من الجنة الفردوس مأواه، يا أبتاه! إلى جبريل ننعاه
>
> হায় আব্বাজান! আপনি আপনার পরম বন্ধু আল্লাহর ডাকে সাড়া দিয়ে চলে গেলেন। ও- আমার প্রাণপ্রিয় আব্বা! আপনার ঠিকানা তো জান্নাতুল ফিরদাউস। আব্বাজান! আমরা জিবরাইলকে আপনার অফাতের শোকগ্লানি শোনাচ্ছি।[৮৯৭]

হজরত উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুর অবস্থা এমন হয়ে গিয়েছিলো, যেন বলা ও শোনার শক্তি একেবারেই হারিয়ে বসেছিলেন তিনি। হজরত আলি

এটা মক্কিপঞ্জিকা মোতাবেক। জন্ম ৮ রবিউল আওয়াল এবং অফাত ১২ রবিউল আওয়াল মানা হলে তার বয়স ৬৩ বছর চারদিন হবে।

৮৯৪. সহিহ মুসলিম : হাদিস নং ৬২৪৮ কিতাবুল ফাযাইল।
খালেস চান্দ্রপঞ্জিকা হিসেবে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বয়স হয় ৬৫ বছর।

৮৯৫. আসসিরাতুল হালাবিয়্যাহ : ৩/৪৯৯; মাকতাবাতুল ইলমিয়্যাহ মুদ্রিত। সেদিন খ্রিষ্টীয় তারিখ ছিল ৯ জুন ৬৩২ খ্রিষ্টাব্দ।

৮৯৬. মুসনাদে আহমাদ : হাদিস নং ১২২৩৪

৮৯৭. সহিহ বুখারি : হাদিস নং ৪৪৬২, কিতাবুল মাগাজি, বাবু মারাদিন নাবিয়্যি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওয়া ওয়াফাতিহী।

রাদিয়াল্লাহু আনহু এক কোণে নির্বাক ও নিঃশব্দে গভীর চিন্তামগ্ন হয়ে বসে রইলেন। আর হজরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর উপর এমন প্রলয় নেমে এসেছে যে, কাণ্ডজ্ঞান একেবারেই হারিয়ে ফেলেছেন। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অফাতের কথা তিনি বিশ্বাসই করতে পারছিলেন না। অপরদিকে মুনাফিকরা যেমন রাসুলুল্লাহর বিয়োগে উল্লাস প্রকাশ করছিল, ঠিক তেমনি সাহাবিগণের এমন অপূর্ব ভালোবাসার চিত্র দেখে তারা রীতিমতো ক্রোধের আগুনে দগ্ধ হচ্ছিল।[৮৯৮]

এমন কঠিন পরিস্থিতি, যখন কেউ আপন কাণ্ডজ্ঞান নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারছিলেন না, তখন হজরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহুই এমন মহান ব্যক্তিত্বের পরিচয় দিয়েছেন যে, তিনি নিজেকে শক্তভাবে নিয়ন্ত্রণ করে ফেলেন। নবীজির অফাতের খবর পেয়েই তিনি ঘোড়া ছুটিয়ে 'সুন্‌হ' হতে মদিনায় চলে এলেন। হুজরায় প্রবেশ করলেন। ততক্ষণে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দেহ চাদরাবৃত করে রাখা হয়েছে। তিনি চাদর উঁচিয়ে কপাল মোবারকে চুমু খেলেন। কাঁদতে কাঁদতে বললেন- 'আমার পিতা-মাতা আপনার উপর উৎসর্গ হোন। আপনার জীবনও ছিল উত্তম এবং অফাতও উত্তম।'[৮৯৯]

হজরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহু মসজিদে গমন করলেন। গিয়ে দেখেন হজরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু অত্যন্ত জোরালোভাবে বলে যাচ্ছেন- 'কিছু মুনাফিক এই প্রোপাগান্ডা ছড়াচ্ছে যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অফাত হয়ে গেছে। আল্লাহর কসম, তিনি জীবিত আছেন। তিনি তার প্রতিপালকের সাক্ষাতে গিয়েছেন, যেমন হজরত মুসা আলাইহিস সালাম গিয়েছিলেন। তিনি অচিরেই ফিরে আসবেন। আর যারা এসব গুজব ছড়াচ্ছে, তিনি তাদের হাত-পা কেটে দেবেন।'[৯০০]

আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর ঐতিহাসিক ভাষণ

হজরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু মসজিদে গিয়ে হজরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে চুপ করালেন। এরপর সাহাবিদের সম্বোধন করে বললেন- 'বন্ধুগণ, যারা হজরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইবাদত করে থাকেন,

---

৮৯৮. তাবাকাতে ইবনে সা'দ : ২/৩১২; আস সিরাতুল হালাবিয়্যাহ : ৩/৫০০, মাকতাবাতুল ইলমিয়্যাহ মুদ্রিত।

৮৯৯. সহিহ বুখারি : হাদিস নং ৪৪৫২, কিতাবুল মাগাজি, বাবু মারাদিন নাবিয়্যি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওয়া ওয়াফাতিহী; মুসান্নাফ ইবনে আবি শাইবাহ : হাদিস নং ৩৭০২১ (সনদ সহিহ)

৯০০. সহিহ বুখারি : হাদিস নং ৩৬৬৭, ৩৬৬৮, কিতাবুল মানাকিব, বাবু লাও কুন্তু মুত্তাখিযান খলিলা...

তারা যেন জেনে নেয় যে, তিনি মারা গেছেন। আর যারা এক আল্লাহর ইবাদত করে এসেছেন, তারা স্থির থাকুন। কারণ আল্লাহ তায়ালা জীবিত আছেন এবং চিরকাল থাকবেন। এরপর তিনি নিম্নের আয়াত তেলাওয়াত করলেন-

> وَمَا مُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىَ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللّهُ الشَّاكِرِينَ
>
> আর মুহাম্মদ একজন রাসুল বৈ তো নয়! তার পূর্বেও বহু রাসুল অতিবাহিত হয়ে গেছেন। তা হলে কি তিনি যদি মৃত্যুবরণ করেন অথবা নিহত হন, তবে তোমরা পশ্চাদপসরণ করবে? বস্তুত কেউ যদি পশ্চাদপসরণ করে, তবে তাতে আল্লাহর কিছুই ক্ষতি-বৃদ্ধি হবে না। আর যারা কৃতজ্ঞ, আল্লাহ তাদের সওয়াব দান করবেন।

এই আয়াত ওহুদযুদ্ধে যখন নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শাহাদাত বরণের গুজব রটে গিয়েছিলো, তখন সাহাবিদের সান্ত্বনা দেওয়ার লক্ষ্যে নাজিল হয়েছিল। আজ আবার যখন সাহাবায়ে কেরাম হজরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহুর জবানে আয়াতটি শুনতে পেলেন তখন সকলেই বুঝতে পারলেন; এই আয়াত তেলাওয়াত করার উপযুক্ত সময় আজকের পর কখনোই আসবে না। মনে হচ্ছিল, আয়াতটি মাত্রই নাজিল হয়েছে।

ওদিকে হজরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু যতই হজরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর বাস্তবমুখী ভাষণ শুনে যাচ্ছিলেন ততই তার অবস্থা, শোক-বেদনা ও অস্থিরতায় পরিবর্তন দেখা দিতে থাকল। তিনি যখন বিশ্বাস করতে পারলেন নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুনিয়াতে নেই তখন তিনি হাত-পায়ের শক্তি হারিয়ে ফেললেন ও জমিনের উপর পড়ে গেলেন।[৯০১]

***

৯০১. সহিহ বুখারি : হাদিস নং ৪৪৫৪

মুসলিম উম্মাহর নেতৃত্ব দেওয়ার প্রশ্ন

মুসলিম জাহানের প্রতিটি সদস্যই তখন সীমাহীন বেদনাকাতর। প্রত্যেকেই গভীর চিন্তামগ্ন যে, এখন কী হবে? মুসলিম উম্মাহর নেতৃত্বের রশি এখন কে হাতে তুলে নেবে? প্রশ্নটি কুদরতিভাবেই প্রত্যেককে অস্থির করে তুলল যে, উম্মতে মুসলিমা নামের এ কিশতির মাঝি কে হবে? আগত সমস্যাবলির সমাধান কাকে জিজ্ঞেস করে বের করা হবে? বিভিন্ন জটিলতা নিরসনের দায়িত্ব কে গ্রহণ করবে? দীনি ও শরয়ি বিষয়াদির ক্ষেত্রে মুসলমান এখন কার নির্দেশিকা অনুসরণ করে চলবে? যদিও সাহাবায়ে কেরাম পদ, গদি ইত্যাদির প্রত্যাশী ছিলেন না; কিন্তু রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নায়েব ও প্রতিনিধি কে হবেন?

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনের শেষমুহূর্ত পর্যন্ত হজরত আলি এবং হজরত আব্বাস রা. বংশগত নৈকট্যের কারণে ভেবেছিলেন যে, তাদের জন্যই শাসনক্ষমতা প্রদানের অসিয়ত করে যাবেন তিনি। তাদের ধারণা ছিল নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বংশীয় নৈকট্যের বিষয়টি এখানে গুরুত্ব পাবে। তারা উভয়েই বিশুদ্ধ মনে একথা স্মরণ রেখেছিলেন যে, যদি আহলে বাইতের মধ্য হতেই কাউকে খলিফা নিযুক্ত করা হয় তবেই মুসলমানদের একতা ও সংহতি দৃঢ় ও স্থায়ী হবে।

হজরত আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অফাতের কিছুদিন পূর্বে হজরত আলি রাদিয়াল্লাহু আনহুকে এ পরামর্শ দিয়েছিলেন, তিনি যেন নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করে রাখেন, তার অবর্তমানে খেলাফতের সিদ্ধান্ত কার জন্য। আহলে বাইতের জন্য, নাকি অন্য কারো জন্য? যদি আমাদের জন্য হয় তা হলে আর কোনো কথা নেই। আর যদি তিনি আমাদের বংশের বাইরের কাউকে দিয়ে যেতে চান, তা হলে আমরা পরামর্শ দেব, তিনি যেন এ দায়িত্ব আমাদের হাতে সোপর্দ করেন।

আলি রাদিয়াল্লাহু আনহু এ ধরনের প্রশ্ন করতে অপারগতা প্রকাশ করে বললেন, 'আমরা যদি এখনই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করতে যাই, আর নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করে দেন, তা হলে কখনোই লোকেরা এ ক্ষমতা আমাদের হাতে আসতে দেবে না। তাই আল্লাহর কসম, এ মর্মে নবীজিকে আমি কিছুই জিজ্ঞেস করতে পারবো না।'[৯০২]

---

৯০২. সহিহ বুখারি : হাদিস নং ৪৪৪৭, কিতাবুল মাগাজি, বাবু মারাদিন নাবিয়্যি সাল্লাল্লাহু==

হজরত আলি রাদিয়াল্লাহু আনহুর চেয়ে অধিক কে জানে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপন পরিবার-পরিজনকে ত্যাগ ও আত্মত্যাগের ক্ষেত্রে সামনে রাখতেন আর পদ ও গদির দিক দিয়ে সর্বদা পেছনে রাখতে অভ্যস্ত ছিলেন! তাই তিনি শঙ্কিত ছিলেন, নেতৃত্ব চাওয়ার কারণে তিনি রেগে যান কিনা। এই আশঙ্কা হজরত আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুরও ছিল। নয়তো তিনি তো ছিলেন নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আপন চাচা। হজরত আলি রাদিয়াল্লাহু আনহুর মাধ্যম ছাড়াই তিনি নির্দ্বিধায় ভাতিজাকে এ কথা বলতে পারতেন।

মূলত আহলে বাইতের মাঝে ক্ষমতা থাকার বিষয়টি সহজাত আকর্ষণ এবং তাদের একটি সাময়িক মত ছিল। তারা মুসলমানদের উন্নতি ও সফলতার জন্য বিষয়টি অতীব গুরুত্বপূর্ণ মনে করছিলেন। কিন্তু যেহেতু রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ মর্মে কোনো অসিয়ত না করেই দুনিয়া হতে চলে যান, তাই রাসুলপ্রেমিক সম্প্রদায়ও তার অনুসরণপূর্বক মুসলিম উম্মাহর কল্যাণ এর মাঝেই দেখতে পেয়েছেন যে, মুসলমানদেরকে তাদের রাজনীতি বিষয়ক সিদ্ধান্ত স্বাধীনভাবেই নিতে দেওয়া হোক। আর এ কারণেই রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অফাতের পর খেলাফত দাবির ব্যাপারে তাদের কেউ একটি শব্দও উচ্চারণ করেননি।

হ্যাঁ, তবে আনসারি সাহাবিগণ এ বিষয়ে অগ্রণী ভূমিকা রেখে যাচ্ছিলেন। সাকিফায়ে বনু সায়িদায় এ বিষয়ে একটি ভুলও হয়ে যাচ্ছিল।

সোমবার বিকেল : সাকিফায়ে বনু সায়িদায় কী হয়েছিল?

তখন ইসলামের রাজনৈতিক ও ধর্মীয় মারকায ছিল মদিনা। সেখানে মুসলমানদের দুটি ভাগ ছিল : মুহাজির ও আনসার।

মুহাজিরদের সংখ্যা ছিল অপেক্ষাকৃত কম। আর আনসাররা ছিলেন সংখ্যায় বেশি। আবার আনসারদের মাঝেও ছিল দুটি গোত্র : আওস ও খাযরাজ। অপেক্ষাকৃতভাবে আওসের সদস্যসংখ্যা ছিল কম আর খাযরাজরা ছিল বেশি। খাযরাজের লোকেরা তাদের নিজস্ব কোনো কাজে সা'দ বিন উবাদা রাদিয়াল্লাহু আনহুর ঘরের পাশে অবস্থিত চত্বরে একত্র হয়েছিলেন। একেই সাকিফায়ে বনু সায়িদা বলা হতো। এখানে জমা হয়ে কথাবার্তা বলা এ গোত্রের একটি স্বভাবগত বিষয় ছিল। এখানে আলোচনার একপর্যায়ে যদি মুসলমানদের ভবিষ্যৎ-নেতা ও সরদারের কথা চলেই আসে, তা হলে এটা দোষের কিছু নয়; বরং এটা স্বাভাবিক বিষয়ও ছিল। কারণ, অতীতেও আরবদের মাঝে সংখ্যাগরিষ্ঠ শক্তির

==আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওয়া ওয়াফাতিহী

ভিত্তিতেই ক্ষমতার সীমা নির্ধারিত হতো। আর প্রকৃতপক্ষে তখন খাযরাজই ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ। তাই এ অনুমান তাদের মুখ দিয়েও উচ্চারিত হয়। কেউ কেউ বলতে থাকে, 'এখন খাযরাজের সরদার সা'দ বিন উবাদার-ই আমির হওয়া উচিত'।

কথা আগে বাড়াতে বাড়াতে জনৈক সাহাবি বলেই ফেলেন, যদি মুহাজিরগণ আমাদের এ কথায় মতানৈক্য করে, তা হলে আমরা তাদেরকে এই প্রস্তাব দিব যে, আমির দুজন হবে। একজন আমাদের আনসারদের মধ্য হতে, অপরজন তোমাদের মুহাজিরদের মধ্য হতে। উল্লেখ্য, এ মতটি এমন জঘন্য ছিল, যা মুসলিম উম্মাহর একতা ও সংহতিকে মুহূর্তেই দু'ভাগ করে দিতে পারত। তাই খাযরাজের সরদার হজরত সা'দ বিন উবাদা রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, 'এখান থেকেই ফাটল সৃষ্টি হবে। মুসলিম উম্মাহর এ অপরাজেয় শক্তিতে চিড় ধরবে।'[৯০৩]

সাকিফায়ে বনু সায়িদায় চলমান এ আলোচনা-পর্যালোচনা হজরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহুর কানে পৌঁছে যায়। তখনও তিনি মসজিদে নববিতে বসে ছিলেন। তিনি ভাবলেন, যদি মুসলমানদের এ ফাটল এখনই বন্ধ করা না হয়, তা হলে উম্মতের মাঝে বিভক্তি সৃষ্টি হতে বিলম্ব হবে না। অপরদিকে তার সামনে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওই সকল হাদিস ও বাণী বিদ্যমান ছিল, যার মধ্যে কুরাইশদের নেতৃত্বের ব্যাপারে সুস্পষ্ট বিবরণ উল্লেখ হয়েছে। তাই তিনি তীব্রভাবে প্রয়োজন উপলব্ধি করলেন, নেতৃত্ব-বিষয়ে লোকজনের সন্দেহ-সংশয় দূর করে এ বিষয়ে এখনোই তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করা উচিত যে, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গোত্র হতেই একজন উত্তম ব্যক্তিকে আমিরুল মুমিনিন নির্বাচন করা হোক।

এজন্য হজরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু হজরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু ও হজরত আবু উবাইদা রাদিয়াল্লাহু আনহুকে সাথে নিয়ে দ্রুত সাকিফায়ে বনু সায়িদায় গিয়ে উপস্থিত হন। দেখতে পেলেন এক আনসারি সাহাবি আনসারিদের প্রতিনিধিত্ব করে তাদের ভূমিকা ও অবদান এবং তাদের শ্রেষ্ঠত্বের বিবরণ দিচ্ছেন। এর উত্তরে হজরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুও লোকজনকে বুঝানোর উদ্দেশ্যে একটি বিবৃতি প্রস্তুত করে ফেলেন। হজরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাকে বিবৃতিটি উপস্থাপন করতে বারণ করলেন। তারপর তিনি নিজেই এক সুযোগে বিস্তর আলোচনা পেশ করলেন।[৯০৪]

---

৯০৩. সহিহ বুখারি : হাদিস নং ৪৪৫২, কিতাবুল মাগাজি, বাবু মারাদিন নাবিয়্যি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওয়া ওয়াফাতিহী।

৯০৪. তারিখুত তাবারি : ২/৪৫৫

উল্লেখ্য যে, উক্ত বৈঠকটি ছিল উন্মুক্ত পরামর্শসভা। সেখানে সাহাবায়ে কেরাম প্রত্যেকেই উদারভাবে একে অন্যের কথাবার্তা শুনে যাচ্ছিলেন। সকলেরই উদ্দেশ্য ছিল এক ও অভিন্ন। সবাই মনেপ্রাণে কামনা করছিলেন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অবর্তমানে যেন ইসলাম ও মুসলমানদের কেন্দ্র কলুষিত না হয়। মুসলমানদের একটি সুদৃঢ় ও শক্তিশালী রাজনৈতিক প্লাটফর্ম যেন প্রস্তুত হয়। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পর এটাই ছিল সর্ববৃহৎ পরামর্শসভা, যাকে মুসলমানদের শুরাভিত্তিক ব্যবস্থাপনার প্রধান ভিত্তি বলা যেতে পারে।

হজরত আবু বকর রা. রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী ও হাদিসের আলোকে কুরাইশদের নেতৃত্বই আবশ্যক মনে করছিলেন। আনসার সাহাবিদের কাউকে আমির বানানো নিয়ে স্বয়ং আনসারদের মাঝেই ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হচ্ছিল না। কারণ, আওস গোত্রের কাউকে আমির নিযুক্ত করলে খাযরাজের লোকেরা নারাজ। আর খাযরাজ গোত্রের কাউকে আমির নিযুক্ত করলে আওসের লোকেরা নারাজ।

এরপর আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহু ইসলামের সূচনাকালের ইতিহাস থেকে শুরু করে লম্বা আলোচনা আরম্ভ করে বললেন- 'আল্লাহ তায়ালা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হেদায়েত ও দীনে হক দিয়ে দুনিয়াতে প্রেরণ করেছেন। আর আল্লাহ নিজেই আমাদের দিল ও কপাল ধরে আমাদেরকে ইসলামের দাওয়াত কবুল করার সৌভাগ্য প্রদান করেছেন।'[৯০৫]

এরপর তিনি আনসারি সাহাবিদের দীনি কার্যক্রম, ত্যাগ-তিতিক্ষা ও অবদানের কথা উল্লেখ করে তাদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করলেন।

উল্লেখ্য যে, তিনি তাদের শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদার বিবরণ দিতে গিয়ে পূর্ণ হক আদায় করেছেন, যেভাবে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলে গিয়েছিলেন।[৯০৬]

তিনি তাদের শ্রেষ্ঠত্ব বয়ান করতে গিয়ে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ছোট ছোট হাদিসও বাদ দেননি। এমনকি তাদের প্রতি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হৃদয়ের যে কত টান ছিল তাও স্বীকার করে এই হাদিস উল্লেখ করলেন, 'লোকজন যদি একটি পথ দিয়ে চলে আর

---

৯০৫. সহিহ বুখারি : হাদিস নং ৩৬৬৮, কিতাবুল মানাকিব, বাবু কওলিন নাবিয়্যি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লাও কুন্ত মুত্তাখিযান খলিলা...

৯০৬. আসসুনানুল কুবরা লিলবাইহাকি : হাদিস নং ১১৯২৩ দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ মুদ্রিত।

আনসারি সাহাবিরা ভিন্ন পথ দিয়ে চলে, তা হলে আমি আনসারিদের পথ দিয়েই চলবো।'[৯০৭]

কিন্তু সেই সাথে তিনি উপস্থিত জনতাকে এ কথাও স্মরণ করিয়ে দিলেন যে, এ সময়ে কুরাইশদের হাতেই নেতৃত্ব অর্পণ করার মাঝে যাবতীয় কল্যাণ সুপ্ত। তিনি আরো বলেন, আমরা মুহাজির সাহাবিগণ সর্বাগ্রে ইসলাম গ্রহণ করেছি। আমরা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আত্মীয়স্বজন। আল্লাহর কসম, আমরা আপনাদের শ্রেষ্ঠত্ব, ইসলামের জন্য আপনাদের অবদান ও ভূমিকা এবং আমাদের উপর অর্পিত আপনাদের হকসমূহ কখনো অস্বীকার করতে পারবো না। কিন্তু আপনারা একথা খুব ভালো করেই জানেন যে, কুরাইশ বংশের লোকেরা গোটা আরব জাহানে এমন শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা নিয়ে বাস করে, যা অন্যকারো ভাগ্যে জুটবার নয়। আরব গোত্রগুলো কুরাইশদের নেতৃত্ব ছাড়া কারো নেতৃত্ব মেনে নিবে না। আপনারা আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করুন। ইসলামকে খণ্ডবিখণ্ড করা থেকে বিরত থাকুন। ইসলামের মধ্যে ফাটল সৃষ্টির ক্ষেত্রে নিজেদের নাম সর্বাগ্রে লেখানো থেকে বিরত থাকুন।[৯০৮]

এরপর হজরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহু সমস্যার সমাধান দিতে গিয়ে বলেন, 'নেতা হবে আমাদের মধ্য হতে, আর মন্ত্রী হবে তোমাদের মধ্য হতে।'[৯০৯]

এক আনসারি সরদার হুবাব বিন মুনযির রাদিয়াল্লাহু আনহু বলে উঠলেন, 'এমন করলে কেমন হয় যে, নেতা দুজন হবে। একজন আমাদের মধ্য হতে, আরেকজন আপনাদের মধ্য হতে।'

হজরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, 'না, বরং নেতৃত্ব আমাদের, মন্ত্রিত্ব তোমাদের। কারণ কুরাইশরা সর্বাপেক্ষা অধিক সম্মানিত ভূখণ্ডের সাথে সম্পর্ক রেখে থাকে। তাদের বংশমর্যাদাও সর্বোচ্চ।[৯১০]

প্রকৃতপক্ষে দুই নেতার প্রস্তাব আমলে নেওয়া ছিল ইসলামি রাজনীতি শুরু থেকেই লন্ডভন্ড করে দেওয়ার নামান্তর। কারণ এটি একটি চূড়ান্ত বিষয় যে, এক রাজ্যে দুইজনের রাজত্ব একত্রে চলতে পারে না। আর আরবের লোকেরাও বিষয়টি মেনে নিবে না যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গোত্র

৯০৭. মুসনাদে আহমাদ : হাদিস নং ৩৯১

৯০৮. মুসনাদে আহমাদ : হাদিস নং ১৮

৯০৯. আসসুনানুল কুবরা, বাইহাকি : হাদিস নং ১১৯২৩

৯১০. মুসান্নাফ ইবনে আবি শাইবাহ : হাদিস নং ৩৭০৪৩

ছাড়া অন্য কেউ তাদের উপর সরদারি করুক। হজরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুও তার এই মত খণ্ডন করে বললেন, 'এক খাপে দুই তরবারি থাকতে পারে না'।[৯১১]

এরই মধ্যে হজরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু নিজ মতের পক্ষে দলিল-প্রমাণ পেশ করে হজরত সা'দ বিন উবাদা রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বলতে লাগলেন-'হে সাদ, আপনি জানেন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপনার উপস্থিতিতেই বলেছিলেন, 'নেতৃত্বের দায়িত্ববান হলো কুরাইশ। ভালো লোকেরা তাদের ভালো লোকদের পেছনে চলতেই পছন্দ করে। আর মন্দ লোকেরা তাদের মন্দ লোকদের অনুসরণ করেই চলে।'

হজরত সা'দ বিন উবাদা রাদিয়াল্লাহু আনহুর মনে পড়ে যায় সে হাদিসের কথা। তাই তিনি নির্দ্বিধায় বললেন, 'আপনি ঠিকই বলেছেন। আমরা মন্ত্রী হবো আর নেতৃত্ব আপনাদেরই থাকবে'।[৯১২]

তখন আনসারদের মধ্য হতে বাশির বিন সাদ রাদিয়াল্লাহু আনহু দাঁড়িয়ে গেলেন। নিজ গোত্রের লোকদেরকে সম্বোধন করে খুব জোরালো উত্তেজনাপূর্ণ ভাষণ দিয়ে বললেন- 'হে আনসার সম্প্রদায়, নিঃসন্দেহে আমরা মুশরিকদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের ময়দানে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছি। যার পেছনে আমাদের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি অর্জন এবং রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনুগত্য প্রদর্শন। এটা আমাদের জন্য মোটেই শোভন হবে না যে, আমাদের এসব ধর্মীয় কর্মকাণ্ড ও খেদমতের বিনিময়ে দুনিয়ার এই তুচ্ছ পদ-পদবি ও ক্ষমতা অর্জনের চেষ্টা করব। নিঃসন্দেহে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরাইশ বংশের ছিলেন, তাই তার নায়েব-প্রতিনিধি তারই বংশের লোকদের মধ্য থেকে হবে।[৯১৩]

এরই মধ্যে আরেক আনসারি সাহাবি চিৎকার করে বলে উঠলেন, 'ভাইসব, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুহাজিরদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তাই তার নায়েবও হবে মুহাজিরদের মধ্য হতে। আমরা যেমন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহায্যকারী ছিলাম, ঠিক তেমনি তার নায়েবেরও সহায়তা করে যাবো।'[৯১৪]

গোটা আনসার সম্প্রদায় তার এই ভাষণে লাব্বাইক বলে সাড়া দেয়। যখন আনসার সাহাবিরা খুশি খুশিতেই নেতৃত্বের বিষয়টি মুহাজিরদের হাতে দিয়ে

---

৯১১. মুসান্নাফে আবদুর রাজ্জাক : হাদিস নং ৯৭৫৮ (আলমাজলিসুল ইলমী পাকিস্তান মুদ্রিত)

৯১২. মুসনাদে আহমাদ : হাদিস নং ১৮; সহিহ বুখারি : হাদিস নং ৩৬৬৮, কিতাবুল মানাকিব, বাবু কাওলিন নাবিয়্যি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, লাও কুন্তু মুত্তাখিযান খলিলা...

৯১৩. তারিখুত তাবারি : ৩/২২১

৯১৪. আলবিদায়া ওয়ান নিহায়া : ৮/৯০; তারিখে দিমাশক; ইবনে আসাকির : ৩০/২২১

দেন, তখন খলিফা নিযুক্তির বিষয়টি তেমন আর কঠিন থাকেনি। তবে উক্ত মজলিস থেকে দুটি বিষয় চূড়ান্ত হয় : ১. খলিফা একজনই হবেন। ২. কুরাইশদের মধ্য হতেই খলিফা নিযুক্ত হবেন।

হজরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু সমীচীন মনে করলেন- এখন এর পরবর্তী বিষয়টিও সমাধান হয়ে যাক। অর্থাৎ আমিরুল মুমিনিন কে হবেন, এ বিষয়টিও এই মজলিসেই চূড়ান্ত হয়ে যাক। তাই তিনি বলে ফেলেন, তা হলে তোমরা সকলে উমর অথবা আবু উবাইদার হাতে বাইয়াত হয়ে যাও।[৯১৫]

হজরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর ব্যক্তিত্ব ও মর্যাদার কথা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ হাদিস হতে প্রকাশ পায়- 'যদি আমার পর কেউ নবী হতো তা হলে উমরই হতো'।[৯১৬]

হজরত আবু উবাইদা রাদিয়াল্লাহু আনহুও আশারায়ে মুবাশশারার অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তার আমানতদারি এবং নেতৃত্বদানের যোগ্যতা ও দক্ষতা-হেতু তাকে 'আমিনুল উম্মাহ (এই উম্মতের আমানতদার)' খেতাব দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু এই দুজন অপেক্ষা হজরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহুর শ্রেষ্ঠত্ব ও যোগ্যতা ছিল বহুগুণ বেশি।

হজরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু নিজেই-বা এটা কীভাবে মেনে নিবেন যে, হজরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর মতো ব্যক্তিত্ব বিদ্যমান থাকতে তিনি বড় হওয়ার চেষ্টা করবেন। তাই তিনি লোকজনকে ডেকে বললেন, 'তোমরা তো খুব ভালো করেই জানো যে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হজরত আবু বকরকেই নামাজের ইমামতির জন্য তার জায়নামাজে আগে বাড়িয়ে দিয়েছেন? লোকেরা সমস্বরে বলে উঠল, হ্যাঁ। ঠিক বলেছেন।

হজরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, তা হলে তোমাদের মধ্য হতে এমন কে আছে, যে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর বর্তমানে তার চাইতেও বড় হতে চায়?

---

৯১৫. সহিহ বুখারি : হাদিস নং ৩৬৬৮।

মূলত তখন আশারায়ে মুবাশশারার মধ্য হতে হজরত আবু বকর রা. ছাড়া এ দুজনই বিদ্যমান ছিলেন। তাই তাদের নাম নেওয়া হয়েছে। তাই এ কথা বুঝা উচিত হবে না যে, হজরত আবু উবায়দা রা. কে হজরত উসমান রা. অথবা হজরত আলি রা. এর উপর প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। কারণ, হজরত উসমান রা. এবং হজরত আলি রা. অন্যান্য আশারায়ে মুবাশশারার উপর শ্রেষ্ঠ ছিলেন। যেমনটা বিভিন্ন হাদিস দ্বারা বুঝা যায়। যা হাদিসের কিতাবসমূহের মানাকিব ও ফাযাইল শীর্ষক অধ্যায়ে দেখা যেতে পারে।

৯১৬. সুনানে তিরমিজি : হাদিস নং ৩৬৮৬; মুসনাদে আহমাদ : হাদিস নং ১৭৪০৫

সকলে সমস্বরে জবাব দিল, 'আল্লাহ আমাদের ক্ষমা করুন। আমাদের কারো কাছেই এটা ভালো লাগবে না যে, তার বর্তমানে কেউ তার চাইতে বড় হয়ে যাক।'[৯১৭]

আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাতে বাইয়াত সম্পন্ন

হজরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু হজরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে সম্বোধন করে বললেন, আমরা সকলে এখন আপনার হাতেই বাইয়াত হবো। আপনি আমাদের মধ্যে সর্বজনশ্রদ্ধেয়, সম্মানিত ও সর্বোত্তম ব্যক্তি এবং রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সবচেয়ে প্রিয় বন্ধু।[৯১৮]

ওদিকে হজরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু হজরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহুর বাহু ধরে তাকে বাইয়াত গ্রহণের উদ্দেশ্যে হাত বাড়ানোর জন্য পীড়াপীড়ি করতে থাকলেন। অন্যদিকে হজরত বাশির বিন সাদ আনসারি রাদিয়াল্লাহু আনহু দৌড়ে এসে সর্বাগ্রে হজরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাতে হাত রেখে বাইয়াত হয়ে গেলেন। এরপরই সকলে বাইয়াতের জন্য তার উপর ভেঙে পড়ে। সাহাবায়ে কেরামের এই প্রতিনিধি-বৈঠক হজরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহুর খেলাফত বিষয়ে একমত পোষণ করল।[৯১৯]

আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু বাইয়াত নিলেন কেন?

হজরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহু খেলাফত-প্রত্যাশী ছিলেন না। কিন্তু তিনি তীব্রভাবে এই আশঙ্কা করছিলেন যে, যদি খেলাফতের দায়িত্ব এই মুহূর্তে তিনি সামলে না নেন, তা হলে মুসলিম উম্মাহর মাঝে বিশাল বিশৃঙ্খলা দেখা দেবে, যা তিনি নিচের এই শব্দের মাধ্যমে প্রকাশ করেন-

و تخوفت أن تكون فتنة بعدها ردة

আমার আশঙ্কা হয়, লোকজনের মাঝে ফেতনা বিরাজ করবে এবং লোকেরা পথভ্রষ্ট হয়ে যাবে।[৯২০]

---

৯১৭. আশশারিআহ, ইমাম আলআজুরি : ১১৮ (দারুল ওয়াতন মুদ্রিত); আসসুনানুল কুবরা, নাসায়ি : হাদিস নং ৮৫৫; মুসনাদে আহমাদ : হাদিস নং ১৩৩ (সনদ হাসান)

৯১৮. সহিহ বুখারি : হাদিস নং ৩৬৬৮, কিতাবুল মানাকিব, বাবু কওলিন নাবিয়্যি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম : লাও কুন্তু মুত্তাখিযান খলিলা...

৯১৯. মুসান্নাফ ইবনে আবি শাইবাহ : হাদিস নং ৩৭০৪৩ (আররুশদ প্রকাশিত); তারিখুত তাবারি : ৩/২২১

৯২০. মুসনাদে আহমাদ : হাদিস নং ৪২ (সনদ সহিহ)
স্মর্তব্য যে, পরামর্শ বৈঠক বলুন আর বাইয়াতের মজলিশ, যা মাগরিব ও ইশার মধ্যবর্তী সময়ে অনুষ্ঠিত হয়েছিল, সময়টি পৌনে এক ঘণ্টার বেশি ছিল না।==
==কিন্তু বিভিন্ন রাবি ঐ মজলিশের বরাত দিয়ে সাহাবায়ে কেরামের পারস্পরিক তিক্ত

নবীজির কাফন-দাফন

এরইমাঝে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাফন-দাফনের কাজ শুরু হয়ে যায়। প্রথম দিন তো বিরহ-বেদনা ও শোকের মাঝেই কেটে গেল। গোটা মদিনায় একধরনের নিস্তব্ধতা ছেয়ে গিয়েছিল। তাই সেদিন কারো মধ্যেই তার কাফন-দাফনের বিষয়ে অগ্রসর হওয়ার মতো মানসিকতা ও শক্তি-সাহস ছিল না। কার কলিজাতেই-বা এত বড় সাহস ছিল যে, হজরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দেহ মোবারক মাটির নিচে দাফন করতে যাবে? কে আছে এমন পাষাণ হৃদয়ের, যে নিজ হাতে এমন একজন মহান ব্যক্তিকে চোখের আড়াল হতে দেবে?

প্রত্যেকেরই তো শিরা-উপশিরায় অচলাবস্থা বিরাজ করছিল। মানসিক শক্তিও তো লোপ পেয়েছিল সকলের। তবে দীর্ঘ চব্বিশ ঘণ্টা পর সকলে স্বাভাবিক হতে সক্ষম হন। আপন অবস্থায় ফিরে আসেন। বিয়োগ-বেদনার তীব্র অস্থিরতা কাটতে কাটতে যখন সকলে স্বাভাবিক হয়ে যান, তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচা হজরত আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু, জামাতা হজরত আলি রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং ফুফাতো ভাই হজরত যুবাইর বিন আওয়াম রাদিয়াল্লাহু আনহু নবীজিকে গোসল দেওয়ার কাজে লিপ্ত হয়ে যান।[৯২১] এঁরা ছিলেন নবীজির একেবারে কাছের আত্মীয়। তাই তারাই নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সর্বশেষ এই খেদমতটুকু আঞ্জাম দেওয়ার অধিক যোগ্য ব্যক্তি।

কথাবার্তাসহ হজরত সাদ ইবনে উবাদা রা. এর বাইয়াত হতে বিমুখতা পোষণ বিষয়ে শত শত পৃষ্ঠা কালো করে ফেলেছে। অথচ এত সংক্ষিপ্ত সময়ে এত লম্বা চওড়া কোনো কিছু ঘটবার অবকাশই ছিল না।

আমরা এখানে ইতিহাসের কিতাবাদি বাদ দিয়ে হাদিসের কিতাব, বিশেষ করে বুখারি ও মুসনাদে আহমাদের রেওয়াতসমূহের ভিত্তিতে তথ্য জমা করেছি। আর সেই সাথে তারিখুত তাবারি এবং আলবিদায়া ওয়ান নিহায়া হতেও কিছু তথ্য সংগ্রহ করেছি। বুখারির রেওয়ায়েত নিঃসন্দেহে সহিহ। আর মুসনাদে আহমাদের রেওয়ায়েত সহিহ মুরসাল, যার দ্বারা এ কথা প্রমাণিত হয় যে, খেলাফতের পরামর্শ একটি উন্মুক্ত বৈঠকখানায় অনুষ্ঠিত হয়েছিল। আর সকলের সম্মতিক্রমেই উক্ত সিদ্ধান্তটিও নেওয়া হয়েছিল। হজরত সাদ ইবনে উবাদা রা. ঐ বৈঠকেই খেলাফতের হক যে কুরাইশদের, এ কথাও নিঃসঙ্কোচে স্বীকার করেছেন।

তাই আবু মুহান্নাফের মতো ঐতিহাসিকদের ইতিহাস বর্ণনা হাদিসের শক্তিশালী ও গ্রহণযোগ্য রেওয়ায়েতের মোকাবেলায় কোনো মূল্যই রাখে না। এমন লাগামহীন বর্ণনায় বিভ্রান্ত হয়ে সাহাবায়ে কেরামের উপর খারাপ ধারণা পোষণ করা নিজের ঈমান নষ্ট করার নামান্তর।

৯২১. সিরাতে ইবনে হিশাম : ২/৬৬২ (মুসতাফা আলবাবি হতে মুদ্রিত)

নায়েবে রাসুলের হাতে দস্তুরমতো বাইয়াত

সাকিফায়ে বনু সায়িদাতে হজরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাতে বাইয়াতের অনুষ্ঠানে ওই সকল সাহাবিই বিদ্যমান ছিলেন, যারা সেখানে বিষয়টি চূড়ান্ত হওয়ার পূর্বেই উপস্থিত ছিলেন। তাদের মাঝে অধিকাংশই ছিলেন খাযরাজ গোত্রীয় আনসারি সাহাবি। যেহেতু খলিফা নিযুক্তির বিষয়টি হঠাৎ একটি বৈঠকে যোগ্যতার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়, তাই সেখানে কাউকে আমন্ত্রণ করা না করার কোনো প্রশ্ন ছিল না। তাই সেখানে অনেক প্রসিদ্ধ সাহাবি, এমনকি হজরত আলি রাদিয়াল্লাহু আনহু, হজরত আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং হজরত যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুর মতো লোকেরাও সেখানে অনুপস্থিত ছিলেন। নিয়ম-নীতির অনুসরণপূর্বক আহলে শুরা (কমিটির সদস্যবৃন্দ)কে ডেকে সভা ডাকা হয়নি, যেমনটি ইসলামি রাজনীতির মূলনীতির দাবি ছিল।[৯২২]

---

৯২২. তাই তো হজরত উমর রা. অপারগতাবশত গৃহীত একটি সিদ্ধান্ত এবং শরিয়তের পূর্ণাঙ্গ একটি রাজনৈতিক মূলনীতির ব্যবধান সুস্পষ্ট করতে গিয়ে পরবর্তীতে বলতেন-'আমার নিকট এ কথা পৌঁছেছে যে, অমুকে এ কথা বলছে, যদি উমর মারা যায় তা হলে অমুকের নিকট বাইয়াত হবো। কেউ যেন এ কথা দ্বারা প্রতারিত না হয় যে, আবু বকর সিদ্দিক রা. এর বাইয়াত আকস্মিকতার উপর হওয়া সত্ত্বেও তা প্রয়োগ হয়ে গিয়েছে। নিঃসন্দেহে তা আকস্মিকভাবেই হয়েছিল। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা তা দ্বারা অনেক ফেতনা-ফাসাদ ও বিশৃঙ্খলা থেকে উম্মাহকে বাঁচিয়ে দিয়েছেন। বলো দেখি, তোমাদের মধ্যে কে আছো, যে আবু বকর সিদ্দিক রা. এর মতো সকলের দৃষ্টির কেন্দ্রবিন্দু হতে পারবে! রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইনতেকালের পর তিনিই ছিলেন আমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি [সহিহ ইবনে হিব্বান : হাদিস নং ৪১৩, ৪১৪]।

তিনি এ কথাও বলেন, যে ব্যক্তি মুসলমানের পরামর্শ ব্যতীতই বাইয়াত করবে, না তার অনুসরণ করা হবে আর না তার হাতে বাইয়াত নেওয়া হবে। বরং যারা এমন করবে, তাদেরকে হত্যা করে ফেলা হবে। [মুসান্নাফে আবদুর রাজ্জাক : হাদিস নং ৯৭৫৮]

মূলত হজরত সিদ্দিকে আকবার রা. এর প্রাথমিক বাইয়াত, যা সাকিফায়ে বনি সায়েদায় অনুষ্ঠিত হয়েছিল, তাতে হজরত উমর রা. এরই ভিত্তিগত অবদান ছিল। তিনি দূরদর্শিতার মাধ্যমে প্রথমেই আঁচ করতে পেরেছিলেন যে, যদিও এখানে আকাবির সাহাবায়ে কেরাম অনুপস্থিত তবু যদি এখনি এ সমস্যার সমাধান না হয়, তা হলে মুসলমান প্রথমদিনেই দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়বে। তাই তিনি তৎক্ষণাৎ এই ইজতিহাদি সিদ্ধান্তের দিকে অগ্রসর হয়েছেন যে, কয়েকজন গুরুত্বপূর্ণ প্রতিনিধি উপস্থিত থাকাই সকলের উপস্থিতির নামান্তর। ইনশাআল্লাহ, হজরত আবু বকর রা. এর ব্যাপারে বাকি সকলের ঐকমত্য পাওয়া যাবে। আলহামদু লিল্লাহ! পরবর্তীতে তা-ই হয়েছে।

এটা ছিল উম্মতের সৌভাগ্য এবং আল্লাহর বিশেষ ইচ্ছা ও অনুগ্রহ যে, হজরত আবু বকর ও উমর রা. সেখানে পৌঁছার পূর্বেই আনসাররা কাউকে সরদার বানিয়ে বাইয়াত করা আরম্ভ করেনি। যদি এমনটা তারা করে ফেলত, তা হলে সেই বাইয়াত ভাঙানো ভীষণ কঠিন বিষয় হয়ে পড়ত। কারণ, আরবদের জবানের মূল্য অনেক বেশি হয়ে থাকে। আর হজরত==

তাই পরের দিন মঙ্গলবার সাহাবায়ে কেরামের ব্যাপক উপস্থিতিতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নায়েব ও খলিফার হাতে বাইয়াত সম্পন্ন করার আয়োজন করা হলো।[৯২৩] তখন হজরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু দাঁড়িয়ে ভূমিকাস্বরূপ এই বক্তব্য প্রদান করলেন-'বন্ধুগণ, আমি আশা করেছিলাম নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের মাঝে আরো বেঁচে থাকবেন। আমাদের সকলের পরেই তিনি দুনিয়া হতে বিদায় নিবেন। কিন্তু তিনি তো আমাদেরকে রেখে চলে গিয়েছেন। তবে আল্লাহ তায়ালা আমাদের মাঝে তার ওই নুর ও আলোকবর্তিকা রেখে দিয়েছেন, যার থেকে আমরা হেদায়েত গ্রহণ করতে পারবো। এটা নবুওয়াতের সেই নুর, যা আল্লাহ তায়ালা স্বীয় নবীকে প্রদান করেছিলেন।

হজরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহু হলেন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একজন আস্থাভাজন সাহাবি। বলো তো দেখি إذ هما في الغار এ আয়াতে কোন্ দু'জনের কথা বলা হয়েছে? إذ يقول لصاحبه এই আয়াতে সাহিব দ্বারা কাকে বুঝানো হয়েছে? لا تحزن إن الله معنا আয়াতটি কার সাথে সম্পৃক্ত? হে লোকসকল, তিনিই হলেন ثاني اثنين দ্বারা উদ্দেশ্য। মুসলমানদের সকল কাজ আঞ্জাম দেওয়ার জন্য তিনিই হলেন প্রধান যোগ্য ব্যক্তি। সুতরাং আপনারা সকলে তার হাতে বাইয়াত হয়ে যান।[৯২৪]

এরপর তিনি হজরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে জোর করে মিম্বরে বসিয়ে দেন। লোকজন তার হাতে বাইয়াত হতে থাকে। আর বাইয়াতের পন্থা সেটাই ছিল, যা আরবদের মাঝে যুগ যুগ ধরে চলে আসছিল। অর্থাৎ হাতে হাত রেখে ওয়াফাদারির প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করা।

বাইয়াতের ক্ষেত্রে হজরত আলি ও হজরত যুবাইরের বিলম্ব ও তার কারণ

তিনজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি এই মজলিসেও উপস্থিত ছিলেন না।

হজরত আলি রাদিয়াল্লাহু আনহু।

==আবু বকর রা. এর বাইয়াত আকস্মিকতার উপর হওয়া সত্ত্বেও গোটা উম্মতের তার ব্যাপারে একমত হয়ে যাওয়া নিঃসন্দেহে তার সমষ্টিগত গ্রহণযোগ্যতা, আল্লাহর নিকট মাকবুলিয়ত, আল্লাহর ইচ্ছা ও গায়েবি সমর্থনের সুস্পষ্ট প্রমাণ বহন করে থাকে।

৯২৩ সহিহ বুখারি : হাদিস নং ৭২১৯ (কিতাবুল আহকাম, বাবুল ইসতিখলাফ); আলবিদায়া ওয়ান নিহায়া : ৯/৪১৬

৯২৪. সহিহ বুখারি : হাদিস নং ৭২১৯ (কিতাবুল আহকাম); আসসুনানুল কুবরা, নাসায়ি : হাদিস নং ১১১৫৫

হজরত যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু।

খাযরাজ গোত্রপ্রধান হজরত সা'দ বিন উবাদা রাদিয়াল্লাহু আনহু।

হজরত সাদ রাদিয়াল্লাহু আনহু যেহেতু গতকাল খেলাফত বিষয়ে কুরাইশদের পক্ষে মত ব্যক্ত করেছিলেন এবং আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর আমির হওয়ার বিষয়টি মেনে নিয়েছিলেন, উপরন্তু তিনি সেদিন অসুস্থও ছিলেন; তাই তাকে আবার ডেকে কষ্ট দেওয়াকে হজরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু সমীচীন মনে করেননি। বাকি থাকল অপর দুজন। হজরত আলি রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং হজরত যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু; তারা অনুপস্থিত ছিলেন। যেহেতু তাদের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি হতে পারে; তাই তিনি তাদের উভয়ের ব্যাপারে বিশেষভাবে জিজ্ঞেস করলেন, তারা অনুপস্থিত কেন? সেদিন তাদের অনুপস্থিতির মূল কারণ ছিল রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাফন-দাফনের কাজ আঞ্জাম দেওয়ার ব্যস্ততা।[৯২৫]

কিন্তু এরপরও মুনাফিকরা অপপ্রচার চালাতে পারে যে, আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহুর আমির হওয়ার বিষয়ে তারা একমত নন। এজন্য হজরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাদের উপস্থিতি শুধু আবশ্যক মনে করেছেন তা-ই নয়; বরং তিনি নিজের কোনো সন্দেহ-সংশয়ের কারণে নয়; বরং মুনাফিকদের গুজব থেকে বাঁচার ভয়ে সকলের সামনেই তাদের উভয়কে জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনারা কি মুসলমানদের এই ঐক্যে কোনোধরনের বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে চান?

উত্তরে দুজনই বললেন, হে খলিফায়ে রাসুল, এমন কোনো কথা নয়। এ কথা বলে তারা দুজনই তার হাতে বাইয়াত হয়ে যান।[৯২৬]

এরপর উভয়ই বললেন, আমাদের আপত্তি এতটুকুই ছিল যে, আমির নির্বাচনের পরামর্শসভায় আমাদেরকে উপস্থিত রাখা হয়নি। তবে আমরা খুব ভালো করেই জানি যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পর আপনিই সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠব্যক্তি।[৯২৭]

---

৯২৫. আলবিদায়া ওয়ান নিহায়া : ৯/৪১৬-৪১৭

৯২৬. আসসুন্নাহ, আবদুল্লাহ ইবনে আহমাদ : হাদিস নং ১২৯২, মুসতাদরাকে হাকিম : হাদিস নং ৪৪৫৭; আসসুনানুল কুবরা, বাইহাকি : হাদিস নং ১৬৫৩৮। হজরত আবু সাঈদ খুদরি রা. হতে বর্ণিত। এ রেওয়ায়েতটি ইমাম মুসলিম রা. কে দেখানো হলে তিনি হাদিসটি শক্তিশালী বলে সমর্থন করেন। [আসসুনানুল কুবরা লিল বাইহাকি : হাদিস নং ১৬৫৩৯]
বুঝা গেল হজরত আলি রা. বাইয়াত হওয়ার মধ্যে ছয় মাস বিলম্ব করেছেন এ রেওয়ায়েতটি ব্যাখ্যাযোগ্য।

৯২৭. আলবিদায়া ওয়ান নিহায়া : ৯/৪১৭ ==

==

عن موسى بن عقبة قال الحافظ ابن كثير إسناده جيد و لله الحمد

ছয় মাস নাগাদ বাইয়াত বিলম্ব করার পেছনে যদি কোনো প্রমাণ বিদ্যমান থাকে, তা হলো ইমাম যুহরি রহ. কর্তৃক বর্ণিত হজরত আয়েশা রা. এর দীর্ঘ হাদিস, যার সারসংক্ষেপ হলো- হজরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অফাতের ছ' মাস পর হজরত ফাতেমার ইনতেকাল হয়।

এরপর হজরত আলি রা. হজরত আবু বকর রা. এর হাতে বাইয়াত হওয়ার ইচ্ছা পোষণ করেন। তিনি হজরত আবু বকর রা. কে একাকী ডেকে বললেন, 'আপনার শ্রেষ্ঠত্ব এবং আল্লাহপ্রদত্ত সম্মান-মর্যাদা সম্পর্কে আমরা সকলেই অবগত। আমরা আপনার ঐ মর্যাদার লোভ করি না, যা আল্লাহ তায়ালা আপনাকে প্রদান করেছেন। কিন্তু আপনি আমাদের পরামর্শ ছাড়াই শাসক বনে গেলেন! অথচ আমাদের ধারণা ছিল যে, রাসুল সা.এর আত্মীয়তার সুবাদে মাশওয়ারায় আমাদেরও অংশগ্রহণ থাকবে।'

এ কথা শোনামাত্র হজরত আবু বকর রা.-এর চোখের পানি গড়িয়ে পড়লো। তিনি বললেন, কসম আল্লাহর, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আত্মীয়তা আমার নিকট সবকিছুর উর্ধ্বে।'

আরো কিছু কথাবার্তার পর হজরত আলি রা. বললেন, আমি আপনার সাথে আগামীকাল সাক্ষাৎ করবো। পরদিন হজরত আবু বকর রা. মিম্বরে দাঁড়িয়ে প্রথমে হামদ ও সানা পাঠ করলেন এবং তারপর হজরত আলি রা. এর বিস্তর অবস্থা এবং তার বাইয়াত গ্রহণে বিলম্ব হওয়ার কারণ ও অপারগতার কথা পেশ করলেন এবং তার জন্য আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করলেন।

এরপর হজরত আলি রা. খুতবা পেশ করলেন ও হজরত আবু বকর রা. এর শ্রেষ্ঠত্ব ও বুজুর্গির বিবরণ দিলেন। এরপর বললেন, হজরত আবু বকর রা. এর প্রতি আমার হিংসা আমাকে এমনটি করতে বাধ্য করেনি, আর না আমি তার আল্লাহপ্রদত্ত শ্রেষ্ঠত্ব ও আজমতের অস্বীকার করি। বরং আমাদের ধারণা ছিল যে, মাশওয়ারাতে আমাদেরও অংশগ্রহণ থাকবে। আর তিনি আমাদের মত-অভিমত ছাড়াই শাসক বনে গেলেন! তাই আমরা মনে মনে ক্ষুব্ধ ছিলাম। [সহিহ বুখারি : হাদিস নং ৪২৪০, বাবু গাজওয়াতি খাইবার, সহিহ মুসলিম : হাদিস নং ৪৬৭৯, কিতাবুল জিহাদ।]

এই রেওয়ায়েতটিই কোনো কোনো বর্ণনাকারী এতটুকু বাড়িয়ে বর্ণনা করেছেন যে, কেউ ইমাম যুহরি রহ. কে জিজ্ঞেস করেছেন, হজরত আলি রা. কি বাইয়াত গ্রহণ করতে ছয় মাস বিলম্ব করেননি? তিনি তার জবাবে বলেছেন, لا، لا أحد من بني هاشم حتى بايعه علي [মুসান্নাফে আবদুর রাজ্জাক : হাদিস নং ৯৭৭৪, আসসুনানুল কুবরা, বাইহাকি : হাদিস নং ১২৭৩২]

আলেমগণ এ রেওয়ায়েতটি আদ্যোপান্ত মেনে নিয়ে এই মত ব্যক্ত করেন যে, হজরত আলি রা. ছয় মাস পর বাইয়াত হয়েছিলেন; কিন্তু তারা এ কথাও বলেন যে, তদুপরি উক্ত রেওয়ায়েত দ্বারা না হজরত আলি রা. এর উপর কোনো অপবাদ আরোপ হয়, আর না হজরত আবু বকর রা. এর বাইয়াত গ্রহণের বিষয়টি প্রশ্নবিদ্ধ হয়।

ইমাম নববি রহ. লেখেন, হজরত আলি রা. এর বাইয়াতে বিলম্ব হওয়ার সাথে আলোচনা যতটুকু সম্পৃক্ত হজরত আলি রা. নিজেই তা উল্লিখিত রেওয়ায়েতে ব্যক্ত করে দিয়েছেন। আর হজরত আবু বকর রা. তার ওজর ও অপারগতা কবুল করে নিয়েছেন। আর তা সত্ত্বেও এ বিলম্ব না হজরত আবু বকরের বাইয়াতকে প্রশ্নবিদ্ধ করে আর না হজরত আলির==

এই বর্ণনা মতে এ কথাও জানা যায় যে, হজরত আলি রাদিয়াল্লাহু আনহুকে

==মর্যাদা ক্ষুণ্ন হয়। বাইয়াত সম্পর্কে সকল আলেমের ঐকমত্য রয়েছে যে, তার এ বাইয়াত বিশুদ্ধ হওয়ার জন্য সকল জনগণের অথবা নেতৃবর্গের ইজমা শর্ত নয়। বরং আলেম, আমির ও জনসাধারণ জনগণের মধ্যকার গুরুত্বপূর্ণ লোকদের মধ্য হতে যাদের থেকে সম্ভব হয় তাদের ইজমা শর্ত। হজরত আলির বাইয়াতে বিলম্ব করা তার মর্যাদা ক্ষুণ্ন করে না। কারণ, সকলের জন্য এটা আবশ্যক নয় যে, প্রত্যেকেই খলিফার কাছে যাবে এবং খলিফার হাতে হাত রেখে বাইয়াত করবে। বরং ওয়াজিব হলো সমাজের সিদ্ধান্ত প্রদানকারী গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিরা যদি কারো ইমামতের উপর একমত হয়ে যায় তা হলেই তার অনুসরণ করা আবশ্যক হয়ে যায়। তার সাথে দ্বিমত পোষণ করা উচিত নয় এবং একতার পরিবেশে বিঘ্ন সৃষ্টি না করা উচিত।

হজরত আলি রা. এর বাইয়াতের পূর্বে অবস্থা এমন ছিল যে, তিনি না হজরত আবু বকর রা. এর সাথে মতানৈক্য করেছেন আর না তিনি কোনো ধরনের ঐক্য বিনষ্ট করেছেন। হ্যাঁ, একটি অপারগতার কারণে বাইয়াত গ্রহণ করতে কিছুটা বিলম্ব করেছেন, যা উক্ত রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে। (হজরত আবু বকর রা. এর) বাইয়াত প্রতিষ্ঠিত হওয়া আর না হওয়া হজরত আলি রা. এর উপস্থিত হওয়া আর না হওয়ার উপর নির্ভরশীল নয়। সুতরাং যেহেতু একটি অন্যটির জন্য আবশ্যক নয়; তাই তিনি হাজিরও হননি, যেমনটি তিনি বর্ণনাও করেছেন, তা দ্বারা হজরত আবু বকর রা. এর বাইয়াতগ্রহণও প্রশ্নবিদ্ধ হয়নি এবং হজরত আলির পক্ষ হতেও কোনোধরনের মুখালাফাত ও বিরোধিতা প্রকাশ পায়নি। হ্যাঁ, তার অন্তরে অসন্তোষ ছিল, যা না কাটা পর্যন্ত তিনি বাইয়াত স্থগিত করেছিলেন। আর তার এ অসন্তোষের কারণ এই ছিলো যে, স্বীয় শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা এবং রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আত্মীয়তা ও নৈকট্যের কারণে তিনি ভেবেছিলেন, খেলাফতের এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তাদের মাশওয়ারা ও উপস্থিতিতেই সমাধা হবে, যা কোনো কারণে হয়নি।

অপরদিকে হজরত আবু বকর সিদ্দিক, হজরত উমরসহ অন্যান্য সকল সাহাবির ওজরটিও পরিষ্কার যে, তারা তাৎক্ষণিক বাইয়াতগ্রহণকে মুসলিম উম্মাহর জন্য সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় মনে করেছেন। এতে বিলম্ব করাকে তারা উম্মাহর মাঝে দ্বন্দ্ব-কলহ ও বিবাদ-বিসংবাদ সৃষ্টি হওয়ার প্রবল আশঙ্কা পোষণ করছিলেন। যার দ্বারা বড় ধরনের ফেতনা ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়ে যেতে পারত। [শরহে নববি : ১২/৭৮ দারু ইহয়াইত তুরাস মুদ্রিত]

অনুরূপভাবে আল্লামা আইনি রহ. উমদাতুল কারিতে উল্লেখ করেছেন। ১৭/২৫৮, দারু ইহয়াইত তুরাস মুদ্রিত।

এটা তো ঐ সকল আলেম মত, যারা ছয় মাস পর বাইয়াত হওয়ার বিষয়টি আদ্যোপান্ত মেনে নিয়ে থাকেন। প্রকৃতপক্ষে তা দ্বারা জমহুর মুসলমানের মতাদর্শের উপর কোনো আঘাত আসে না। যেমনটা ইমাম নববি রহ. এর বক্তব্য দ্বারা খুব ভালোভাবেই পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে। অপরদিকে আলেমদের এক বিশাল জামাআত এসব রেওয়ায়েতকে আপত্তিকর মনে করে থাকেন। তাদের মত হলো, এ রেওয়ায়েতগুলো সহিহই হোক না কেন, এটা আবশ্যক নয় যে, সকল সহিহ সনদের রেওয়ায়েতই আলোচনার বিষয় হবে।

বিশেষ করে যখন এর বিপরীতে হজরত আবু সাঈদ খুদরির সহিহ রেওয়ায়েত বিদ্যমান রয়েছে। আর ঐ সকল আলেমের তালিকায় উল্লেখযোগ্য হলেন ইমাম বাইহাকি, যিনি ইমাম যুহরি রহ. এর রেওয়ায়েত উল্লেখ করে নিম্নের এ পর্যালোচনা উল্লেখ করেছেন। হজরত আলি রা. এর আবু বকর রা. এর হাতে বাইয়াত করতে হজরত ফাতেমা রা.==

==এর ইনতেকাল পর্যন্ত বিলম্ব করা বিষয়ক ইমাম যুহরি রহ. এর উক্তিটি মুনকাতি। পক্ষান্তরে হজরত আবু সাঈদ খুদরি রা. এর রেওয়ায়েতে সুস্পষ্টভাবে এসেছে, সাকিফার ঘরোয়া বাইয়াতের পর ব্যাপকভাবে বাইয়াত অনুষ্ঠিত হয়। আর এই পরবর্তী বাইয়াতেই আলি রা. অংশগ্রহণ করেন। [আসসুনানুল কুবরা, বাইহাকি : ১২৭৩২]
এ সকল আলেম ইমাম যুহরি রহ. এর রেওয়ায়েতে 'ছয় মাস পর' শব্দটিকে ইমাম যুহরির অনুমান বলে আখ্যা দিয়ে থাকেন। [আল ইতিকাদ : পৃষ্ঠা : ৩৫২, দারুল আফাক মুদ্রিত]
হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানি রহ. আলোচ্য বিষয়ে আলোকপাত করতে গিয়ে লেখেন- ইবনে হিব্বানসহ অন্যান্য ওলামায়ে কেরাম হজরত আবু সাঈদ খুদরি রা. এবং অন্যান্য ব্যক্তিদের রেওয়ায়েতকে অধিক সহিহ আখ্যা দিয়েছেন। যার দ্বারা→ বুঝা যায় যে, হজরত আলি রা. শুরুতেই বাইয়াত হয়ে গিয়েছিলেন। এরপর তিনি ঐ সকল আলেমের মত উল্লেখ করেছেন, যারা উক্ত রেওয়ায়েতের মধ্যকার বিরোধ দূর করার জন্য তাতবিক বা সামঞ্জস্যের পন্থা অবলম্বন করেছেন। সুতরাং তিনি বলেন, অন্যান্য ওলামায়ে কেরাম রেওয়ায়েতগুলোকে এভাবে জমা করেছেন যে, ছয় মাস পরের বাইয়াতটি তার দ্বিতীয় বাইয়াত ছিল, যা প্রথম বাইয়াতকে শক্তিশালী করার উদ্দেশ্যে ছিল। যাতে মিরাসের কারণে যা কিছু ঘটেছিল, তা পরিষ্কার হয়ে যায়। যেমনটা ইতিপূর্বে আলোচিত হয়েছে। তখন ইমাম যুহরি রহ. এর এ উক্তি যে, হজরত আলি রা. তখন বাইয়াত হননি, এর অর্থ হবে হজরত আলি রা. তখন হজরত আবু বকর রা. এর কাছেধারে ছিলেন না অথবা এ ধরনের অন্য কোনো অর্থ গ্রহণ করা হবে। আর যেহেতু আলি রা. এর মতো এক মহান ব্যক্তির হজরত আবু বকর রা. হতে দূরে থাকার দরুন, যারা প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে অবগত নয় তারা সন্দেহে পড়ে যেতে পারে যে, তিনি হয়তো হজরত আবু বকর রা. এর খেলাফতে সন্তুষ্ট নন। আর যারা বলবার তারা এ কথা বলেও ফেলেছেন। তাই হজরত আলি রা. হজরত ফাতেমা রা. এর ইনতেকালের পর ব্যাপকভাবে জনসম্মুখে বাইয়াত হয়ে সকলের সন্দেহ-সংশয় দূর করে দেন। [ফাতহুল বারি : ৭/৪৯৪-৪৯৫, দারুল মা'রিফা মুদ্রিত]
হাফেজ ইবনে কাসির রহ. এ কথাও বলেছেন যে, ছয় মাস পর সর্বসম্মুখে এ বাইয়াত পুরাতন বাইয়াতেরই নবায়ন ছিল। প্রথম বাইয়াত তো পূর্বেই হয়ে গিয়েছিল। [আলবিদায়া ওয়ান নিহায়া : ৮/১৮৮]
ছয় মাস পরের এ বাইয়াতের কথা কতিপয় জয়িফ রেওয়ায়েতেও বিদ্যমান রয়েছে। যেমন: এক রেওয়ায়েতে আছে, হজরত আলিকেই একদা বাইয়াতে বিলম্ব হওয়ার কারণ জিজ্ঞেস করা হলো। তখন তিনি জবাবে বলেছিলেন-

إني آليت بيمين حين قبض رسول الله صلعم أن لا أرتدي برداء إلا إلى الصلوة المكتوبة حتى أجمع القرآن فإني خشيت أن يتفلت القرآن.

আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অফাতের সময় এ কসম করেছিলাম যে, আমি ফরজ নামাজ ছাড়া কোনো সময় ততদিন পর্যন্ত গায়ে চাদর আবৃত্ত করবো না যতদিন পর্যন্ত আমি কুরআন একত্র না করবো। কারণ, আমি কুরআন বিনষ্ট হয়ে যাওয়ার আশংকা করছিলাম। [মুসান্নাফে আবদুর রাজ্জাক : হাদিস নং ৯৭৬৫।
অনুরূপভাবে ইবনে সা'দ স্বীয় তাবাকাতগ্রন্থেও এই শব্দে উল্লেখ করেছেন, آليت أن لا أرتدي برداء إلا إلى الصلوة حتى أجمع-২/২৫৮ অর্থাৎ তিনি ছয় মাস পর্যন্ত বাইয়াত করতে এজন্য বিলম্ব করেছেন যে, তিনি এ লম্বা সময় ঘরে বসেই কুরআন জমা করার কাজে ব্যস্ত ছিলেন। ঘর থেকেই বের হননি।]==

যখন এই খবর দেওয়া হলো যে, হজরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাতে বাইয়াত গ্রহণ চলছে তখন তিনি এত দ্রুত ঘর হতে বের হয়ে আসেন যে, নিজের চাদরটিও সাথে আনতে ভুলে গিয়েছিলেন।[৯২৮]

বাইয়াতের পর আবু বকর রা. এর প্রথম ভাষণ

বাইয়াতের পর হজরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহু একজন রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে সর্বপ্রথম ভাষণ প্রদান করেন। উক্ত ভাষণে তিনি বলেন- 'আল্লাহর কসম, নেতৃত্বের লোভ আমার মধ্যে কখনোই ছিল না। এখনও নেই। আমি আল্লাহ তায়ালার নিকট কখনোই রাজত্ব ও ক্ষমতা চাইনি। কিন্তু আমি বিশৃঙ্খলার ভয়ে দায়িত্বের এ বোঝা মাথায় নিয়েছি। এই দায়িত্বে আমি কোনোধরনের প্রশান্তি অনুভব করছি না। আমার উপর এমন দায়িত্ব অর্পণ করে দেওয়া হয়েছে, আল্লাহর তাওফিক ছাড়া এর হক আদায়ের শক্তি আমার নেই।'[৯২৯]

==কোনো কোনো আলেম এ কথাও বলেছেন যে, স্ত্রী অসুস্থ ছিলেন। তাই স্ত্রীর সেবা-শুশ্রূষায় ব্যস্ত থাকা তার অনেক বড় ওজর ছিল। এরপর ছয় মাস পর যখন স্ত্রী মারা গেলেন তখন অবসর পেয়েছেন। উল্লেখ্য যে, এটা এমন কোনো ওজর নয় যে, ছয় মাস তিনি একারণে ঘরবন্দি হয়ে যাবেন। অথচ হজরত আলি রা. এসব অজুহাত থাকা সত্ত্বেও মসজিদে নববিতে নামাজ আদায় করতে আসতেন। হজরত আবু→ বকর রা. এর পেছনে ইকতিদা করে নামাজও আদায় করেছেন। যেকোনো এক নামাজের পরই তিনি বাইয়াতের কাজটি সেরে নিতে পারতেন। যা মাত্র কয়েক মিনিটের কাজ ছিল। সুতরাং এ ধরনের রেওয়ায়েতের অর্থ এভাবেই করতে হবে যে, হজরত আলি রা. বাইয়াত করা সত্ত্বেও যেহেতু বাইয়াত সংক্রান্ত কিছু আবশ্যক ব্যস্ততায় তিনি ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন; তাই নিজেকে সবার থেকে কিছুটা বিচ্ছিন্ন করে রেখেছিলেন। ফলে কিছু সন্দেহ-সংশয় লোকদের মনে তৈরি হয়ে গিয়েছিল। উক্ত সংশয় দূর করার জন্যই তিনি ছয় মাস পর আবার বাইয়াত নবায়ন করে জনগণকে জানান দিয়েছিলেন।

শিয়াদের ইসনা আশারিয়া সম্প্রদায়ের প্রথম সারির কিতাবাদিতেও উক্ত সংশয়ের সন্ধান পাওয়া যায় যে, হজরত আলি রা. শুরুতে বাইয়াত হয়েছিলেন।

ইমাম মুহাম্মদ বাকের রহ. হতে বর্ণিত আছে হজরত উসামা বিন যায়েদ রা. যখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অফাতের খবর পেয়ে মদিনা চলে এলেন তখন তিনি দেখতে পেলেন কিছু লোক হজরত আবু বকর সিদ্দিকের চারপাশ বেষ্টন করে আছে। তারা সকলেই হজরত আলিকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, هل بايعته আপনি কি বাইয়াত হয়েছেন? তখন তিনি উত্তর দিলেন, قال نعم হ্যাঁ, বাইয়াত হয়েছি। [আলইহতিজাজ, তাবরাসি : ১/১৩১] প্রকাশ থাকে যে, হজরত উসামা রা. এর এই প্রত্যাবর্তন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অফাতের সংবাদ পাওয়ার সাথে সাথেই হয়েছিল। ঐ সময়ে হজরত আলি রা. এর বাইয়াতের স্বীকারোক্তি প্রমাণ করে যে, শিয়া সম্প্রদায়ের প্রবীণ লোকেরাও মনে করে থাকেন যে, হজরত আলির বাইয়াত তাৎক্ষণিকই হয়েছিল। তাই ছ' মাস পরের বাইয়াতের বিষয়টি দুর্বল, নয়তো ব্যাখ্যাযোগ্য কোনো উক্তি হবে।

৯২৮. তারিখুত তাবারি : ৩/২০৭

৯২৯. মুসতাদরাকে হাকিম : হাদিস নং ৪৪২২; সনদ সহিহ।

এরপর বলেন- 'বন্ধুগণ, আমাকে আপনাদের সরদার হিসেবে নিযুক্ত করা হয়েছে। যদিও আমি আপনাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও মর্যাদাবান নই। আমি যদি কল্যাণকর কাজ করি তা হলে আমাকে সকলে সাহায্য করে যাবেন আর যদি কোনো খারাপ কাজ করি তা হলে অবশ্যই আমার সংশোধন করে দেবেন। সততা ও সত্যবাদিতা হলো আমানত। আর মিথ্যা ও কপটতা হলো খেয়ানত।'

তিনি রাজ্যের মৌলিক দায়িত্বের প্রতি ইঙ্গিত করে বলেন- 'জাতির একজন সাধারণ ব্যক্তিও আমার নিকট ততক্ষণ পর্যন্ত অধিক গুরুত্বপূর্ণ যতক্ষণ পর্যন্ত আমি তার অধিকার আদায় না করব। আর জাতির একজন ক্ষমতাধর ব্যক্তিও আমার নিকট ততক্ষণ পর্যন্ত সাধারণ যতক্ষণ পর্যন্ত আমি তার থেকে মজলুমের অধিকার উসুল করে আনতে না পারি।'[৯৩০]

তার এই বক্তব্যের মধ্যে এ কথাও সুপ্ত ছিল যে, শাসনভার মূলত জনসাধারণ ও দুর্বলদের দেখাশোনার জন্যই এসে থাকে। নয়তো আমির-উমারা ও নেতা-সরদারদের হক তো তাদের দাপটের কারণে ঘরে বসেই উসুল হয়ে যায়। রাষ্ট্রীয় সেবা-যত্নের মূল প্রয়োজন হলো সাধারণ জনগণের। তাই ইসলামি শাসন তাদের অধিকারই প্রাধান্য দিয়ে থাকে। তার এই বক্তব্যে এই দিকেও ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, শাসকদের অপরাপর লোকের হক মেরে খাওয়ার বদঅভ্যাস থেকে দূরে থাকা বাঞ্ছনীয়। কারণ, ইসলামি হুকুমত বঞ্চিত ও পীড়িত লোকদের সাহায্য-সহায়তার দায়ভার গ্রহণ করে থাকে। অপরের সম্পদ আত্মসাৎ করা মুসলিম শাসকদের কাজ নয়।

তিনি জিহাদের গুরুত্ব ও গুনাহর অশুভ পরিণতির কথা উল্লেখ করে বলেন- 'স্মরণ রাখবেন, যখন কোনো জাতি বা সম্প্রদায় জিহাদ ছেড়ে দেয়, তখন আল্লাহ তায়ালা ওই সম্প্রদায়ের উপর লাঞ্ছনা ও অপমান চাপিয়ে দেন। আর যখনই কোনো সম্প্রদায়ের মাঝে গুনাহ ও পাপাচার বৃদ্ধি পায় তখন আল্লাহ তায়ালা ওই সম্প্রদায়কে চতুর্দিক হতে আজাব গজব ও বালা-মুসিবত দিয়ে ঢেকে দেন।'

পরিশেষে তিনি ইসলামি শাসনব্যবস্থায় জনগণকে 'মূল ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহর'- এ কথা স্মরণ করিয়ে বলেন- 'আমি যতদিন পর্যন্ত আল্লাহ ও তার রাসুলের আনুগত্য করব, ততদিন পর্যন্ত আপনারা আমার আনুগত্য করে যাবেন। আর যেদিন হতে আল্লাহ ও তার রাসুলের নাফরমানি করা শুরু করব,

---

৯৩০. তাবাকাতে ইবনে সা'দ : ৩/১৮২, তারিখুল খোলাফা, সুয়ুতি : পৃষ্ঠা ৫৯; (মাকতাবায়ে নাযার মুদ্রিত)

সেদিন থেকে আমার আনুগত্যও আবশ্যক নয়।'[৯৩১]

চিরদিনের জন্য চোখের আড়াল হয়ে গেল রিসালাত-প্রদীপ

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাফন পরিধানের কাজ সম্পন্ন হয়ে গেল। সাহাবায়ে কেরাম জানাজার নামাজ আদায়ের নিমিত্তে সমবেত। হজরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহুকে জিজ্ঞেস করা হলো, জানাজা আদায়ের পদ্ধতি কী হবে? বললেন, ছোট ছোট জামাতবদ্ধ হয়ে ঘরের ভেতর প্রবেশ কর এবং পালাক্রমে জানাজা পড়তে থাকো।

তাই হলো। এভাবেই জানাজা আদায় করা হলো। হজরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহার হুজরাতেই লাশ মোবারক রাখা ছিল। ছোট ছোট জামাত হুজরার ভেতর প্রবেশ করছিল ও জানাজার নামাজ আদায় করে বের হয়ে আসছিল। জানাজার ইমামত কেউ করেনি। কারণ, এটা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামেরই ওসিয়ত ছিল। অফাতের পূর্বে তিনি বলেছিলেন-'সর্বাগ্রে আমার ঘরওয়ালারা আমার জানাজা আদায় করবে। আর সকলে একা একা নামাজ পড়বে।'[৯৩২]

এই হুকুম মোতাবেক সর্বপ্রথম আহলে বাইত, এরপর পুরুষগণ, এরপর নারীগণ, এরপর বাচ্চারা ও পরিশেষে গোলাম-বাঁদিরা জানাজা পড়ে।[৯৩৩]

যেহেতু জনসংখ্যা ছিল সহস্রাধিক তাই হুজরা শরিফে এত লোকের সংকুলান না হওয়াটাই স্বাভাবিক ছিল। তাই জানাজা আদায় করতে করতেই পুরো একদিন পার হয়ে গেল।

এরপর প্রশ্ন দাঁড়ালো, নবীজিকে কোথায় দাফন করা হবে? বিভিন্নজন বিভিন্ন মত প্রকাশ করতে থাকল। এমনকি এ বিষয়ে মতানৈক্য সৃষ্টি হয়ে গেল। কেউ কেউ বলল, হুজরা শরিফের ভেতরেই দাফন করা হোক। আবার কেউ বলল, বরং সাধারণ মুসলমানের সাথেই করা হোক। তখন হজরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহু মুখ খুললেন। বললেন, আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এ কথা বলতে শুনেছি যে, 'নবীগণকে সেখানেই দাফন করা হয়, যেখানে তাদের রুহ কবজ করা হয়ে থাকে'।

সুতরাং সেখান থেকে বিছানাপত্র সরিয়ে সেখানেই কবর খনন শুরু হয়।[৯৩৪]

মঙ্গল ও বুধবারের মধ্যবর্তী রাতে উম্মুল মুমিনিন জমিনে কোদালের আঘাতের

৯৩১. তারিখুত তাবারি : ৩/২৪০
৯৩২. দালাইলুন নুবুওয়াহ, বাইহাকি : ৭/২৩২
৯৩৩. দালাইলুন নুবুওয়াহ, বাইহাকি : ৭/২৫০
৯৩৪. দালাইলুন নুবুওয়াহ, বাইহাকি : ৭/২৬০

শব্দ শুনতে পেলেন।[৯৩৫]

একপর্যায়ে কবর খনন সম্পন্ন হলো। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গোলাম শাকরান খুব দ্রুত একটি লাল চাদর এনে কবরে বিছিয়ে দিল। হজরত আলি রাদিয়াল্লাহু আনহু, হজরত আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং তার পুত্র হজরত কুসাম বিন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু কবরে প্রবেশ করে রাসুলের পবিত্র দেহ মোবারক কবরে নামিয়ে দিলেন।[৯৩৬]

সবশেষে হজরত মুগিরা বিন শুবা রাদিয়াল্লাহু আনহু কবরে অবতরণ করেন এবং নবীজির কাফনের কাপড় ঠিকঠাক করে দিলেন। এরপর কবরে মাটি ঢালা হলো।[৯৩৭] হজরত বেলাল রাদিয়াল্লাহু আনহু মিশ্ক নিয়ে করের চারপাশে ছিঁটিয়ে দেন।[৯৩৮]

এভাবেই মদিনার ভূখণ্ডে চিরতরে সকল চোখের আড়াল হয়ে গেলেন প্রিয়নবী হজরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। সেই সাথে গোটা মদিনায় শোনা যেতে থাকল হেঁচকি কান্নার করুণ ধ্বনি। কাঁদল আকাশ-পাতাল। কাঁদল ইথার-পাথার সবই। আসমান ও জমিন ইতোপূর্বে এমন শোকাবহ পরিবেশ দেখতে পায়নি।[৯৩৯]

নবীজির জন্য উৎসর্গপ্রাণ লোকদের পক্ষে এ কল্পনাটিও সয়ে নেওয়ার মতো ছিল না যে, দুনিয়ার এ জিন্দেগিতে কখনোই রাসুলের সাক্ষাৎ ঘটবে না। সাহাবায়ে কেরাম অবশিষ্ট রাত অশ্রুবিসর্জন দিতে দিতে কাটিয়ে দিলেন। সুবহে সাদিকের সময় হজরত বেলাল রাদিয়াল্লাহু আনহু তার প্রাত্যহিক অভ্যাস অনুযায়ী পরিচিত কণ্ঠে আজান দেওয়া শুরু করলেন। আজানের ধ্বনি أشهد أن محمدا رسول الله পর্যন্ত পৌঁছেই তিনি আর সহ্য করতে পারলেন না। জার জার করে কেঁদে দিলেন।[৯৪০]

জানাজা ও দাফন কাজে বিলম্ব কেন?

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অফাত হয়েছিল সোমবার দুপুরে। জানাজার নামাজ আদায় শুরু হয় মঙ্গলবার দুপুর থেকে। আর দাফন কাজ সম্পন্ন হয় মঙ্গল ও বুধ এ দু'য়ের মধ্যবর্তী রাতে। এ বিলম্বের পেছনে সবচেয়ে বড়

৯৩৫. দালাইলুন নুবুওয়াহ, বাইহাকি : ৭/২৫৬
৯৩৬. আলবিদায়া ওয়ান নিহায়া : ৮/১৪৪
৯৩৭. মুসনাদে আহমাদ : হাদিস নং ২০৭৬৬
৯৩৮. দালাইলুন নুবুওয়াহ, বাইহাকি : ৭/২৬৪
৯৩৯. দালাইলুন নুবুওয়াহ, বাইহাকি : ৭/২৬৭
৯৪০. দালাইলুন নুবুওয়াহ, বাইহাকি : ৭/২৬৪

কারণ হলো সাহাবায়ে কেরামসহ আহলে বাইতের বিয়োগব্যথা ও শোকাবহ পরিবেশের কারণে তাদের শরীর অচল হয়ে যাওয়া। এ ছাড়া আরেকটি কারণ ছিল খেলাফতের বিষয়টির সমাধা করা। জানাজা ও দাফন কাজ এর পরপরই সম্পন্ন হয়।

খলিফা নির্বাচনের বিষয়টি জানাজা ও দাফনের পূর্বে হওয়ার মধ্যেও আল্লাহর অনেক বড় নেয়ামত ছিল বলে মনে হয়। জানাজায় বিলম্ব হওয়ার দ্বারা এ আশঙ্কা তো মোটেই ছিল না যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দেহ মোবারকে কোনো ধরনের পরিবর্তন পরিলক্ষিত হবে। কারণ, নবীদের দেহ তাদের অফাতের পরেও অক্ষত অবস্থায় সংরক্ষিত থাকে। হ্যাঁ, যদি খলিফা নির্বাচনের বিষয়টি তাৎক্ষণিকভাবে সমাধান করা না হতো, তা হলে বিশ্বজুড়ে বিশাল ফেতনা ও বিশৃঙ্খলা বিরাজ করত।

কাফন-দাফনের পূর্বেই খেলাফতের সমস্যা-সমাধান কেন আবশ্যক ছিল?

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাফন-দাফনের দায়িত্বটি একটি অসাধারণ গুরুত্ব বহন করছিল। যদি এত গুরুত্বপূর্ণ কাজ এক ব্যক্তির নেতৃত্বে আঞ্জাম দেওয়া না হতো, তা হলে এখানেই বিশাল বিশৃঙ্খলা দেখা দিত। প্রথমে এ বিষয় নিয়ে ঝগড়া হতো যে, জানাজার নামাজ কোথায় পড়ানো হবে? এমনিতেই লোকেরা তখন আবেগপ্রবণ ছিল। তাই সকলে চাইত কোনো খোলা ময়দানে নামাজ পড়ানো হোক। অনেকে আবার লাশ দেখানোর গণআয়োজনের আবদারও করে বসতো। ফলে আবেগাপ্লুত নয়নে আখেরি দিদার করতে গিয়ে অনেকের হিতাহিত জ্ঞান হারানোর আশঙ্কাও ছিল। আবার এ বিষয়েও মতানৈক্য হতো যে, জানাজা কে পড়াবে? কোথায় তার দাফন হবে? ইত্যাদি শত ঝামেলা দেখা দিত। যখন শুরুতেই নেতৃত্বের বিষয়টি সমাধা হয়ে গিয়েছে, তাই এখন প্রতিটি কাজই এক আমিরের নেতৃত্বে সুন্দর ও সুচারুরূপে সম্পন্ন হওয়া সম্ভব হয়েছে।

আর খেলাফতের বিষয়টি এই বিবেচনাতেও অধিক গুরুত্বপূর্ণ ছিল যে, ইসলামের সূচনালগ্ন হতে এই পর্যন্ত মুসলমানদের উপর এমন কোনো মুহূর্ত কাটেনি, যখন তারা আমির ও নেতা শূন্য হয়েছেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামই ছিলেন সকলের ইমাম, আমির, নেতা ও পথপ্রদর্শক। তার অধীনে গোটা মুসলিম উম্মাহ এক ও অভিন্ন ছিল। তাই মুসলমানদের জন্য তখন কোনো আমির বা খলিফা ছাড়া জীবনযাপন করা একটি কঠিন ও কষ্টকর বিষয় ছিল। আর উম্মতের প্রবীণ সাহাবিগণ এই আশঙ্কা করছিলেন যে,

মুসলমানদের নেতৃত্বশূন্য সময় দীর্ঘ হয়ে গেলে না-জানি মুসলিম উম্মাহ কোন্ ধরনের বিভেদ ও বিভক্তির শিকার হয়ে পড়ে!

মুনাফিক ও দুষ্টপ্রকৃতির লোকেরা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশাতেই সবসময় তৎপর ছিল, না-জানি তারা আজ কোন্ কথা ছড়িয়ে দিয়ে মতভেদ সৃষ্টি করে গৃহযুদ্ধের পরিবেশ তৈরি করে ফেলে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জীবিত থাকতেই কয়েকবার এ ধরনের অপচেষ্টা চালিয়ে তারা ব্যর্থ হয়।

এসব কারণে সাহাবায়ে কেরামের দূরদর্শী বিবেক এবং পবিত্র মন ও মনন এ দিকেই সর্বাগ্রে ধাবিত হয়েছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খলিফা ও নায়েব নির্বাচনের বিষয়টিই সর্বপ্রথম সমাধান করা হোক। ঐসব শুষ্ক দৃষ্টিসম্পন্ন লোকের বিবেকবুদ্ধি একেবারেই অন্তঃসারশূন্য, যারা মনে করে সাহাবায়ে কেরামের মাঝে নবীজির মহব্বত অপেক্ষা ক্ষমতার টান বেশি ছিল। আর এজন্যই তারা রাসুলের কাফন-দাফনের বিষয়টি পেছনে রেখে ক্ষমতা বণ্টন নিয়ে পরস্পর বোঝাপড়া করতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। প্রকৃতপক্ষে সাহাবিদের ভেতর লালিত রাসুলের ভালোবাসাই তাদেরকে ইসলাম রক্ষার কাজে অধিক অনুপ্রাণিত করে। তাই দ্রুততম সময়ে কোনো দক্ষ ব্যক্তির হাতে ইসলামের বাগডোর সঁপে দিয়ে তার নেতৃত্বে গোটা মুসলিম উম্মাহর একতা ও সংহতি অক্ষুণ্ন রাখা আবশ্যক হয়ে পড়েছিল।

সাহাবায়ে কেরামের বিরহ-বেদনা

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অফাতের ঘটনা সাহাবায়ে কেরামের মনে কী পরিমাণ বেদনা ও বিরহ-জ্বালা সৃষ্টি করেছে, তা একমাত্র সে-ই উপলব্ধি করতে পারবে, যার ভাগ্যে কিছুটা হলেও আকায়ে নামদার তাজেদারে মদিনা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভালোবাসার জ্বালা জুটেছে। যখন হজরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দাফন কার্য সম্পন্ন করে অবসর হলেন তখন হজরত ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলছিলেন- 'আনাস, তুমি কীভাবে পারলে রাসুলুল্লাহর উপর মাটিচাপা দিয়ে এভাবে দাফন করে চলে আসতে?'[৯৪১]

বাল্যকাল হতে বার্ধক্য পর্যন্ত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সকল দুর্দিনের কাণ্ডারী হজরত উম্মে আইমান রাদিয়াল্লাহু আনহা কাঁদতে কাঁদতে বলছিলেন, 'হায়! আমরা ওহী অবতরণের বরকত হতে চিরতরে মাহরুম হয়ে

---

৯৪১. সুনানে ইবনে মাজাহ : হাদিস নং ১৩২১

গেলাম।'[৯৪২]

হজরত মুআজ বিন জাবাল রাদিয়াল্লাহু আনহুকে এর কয়েকমাস পূর্বেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইয়ামানের গভর্নর নিযুক্ত করে সানআ শহরে পাঠিয়েছিলেন। সেখানে তিনি লোকজনকে দীন-ইসলাম শেখানো এবং তাদের বিচারকার্য আঞ্জাম দেওয়ার কাজে ব্যস্ত সময় পার করছিলেন।

তিনি সে-রাতে বিছানায় শুয়ে ছিলেন। কেউ চিৎকার করে বলছিল, 'হে মুআজ, রাসুলুল্লাহর অফাত হয়ে গেছে আর তুমি আরামে মগ্ন হয়ে আছো?' এই সময় তিনি এমন তড়িঘড়ি করে বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়ান, যেন কেয়ামতের শিঙ্গায় ফুঁক দেওয়া হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে তিনি দৌড়াতে দৌড়াতে শহরের অলিগলিতে চক্কর খেতে লাগলেন আর চিৎকার করতে থাকলেন, 'হে ইয়ামানবাসী, আমাকে এখন যেতে দাও। আহা, কত কষ্টকর ছিল সেদিন, যেদিন আমি আমার প্রিয় হজরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কদম মোবারক ছেড়ে এখানে পাড়ি জমিয়েছি।'

লোকজন জিজ্ঞেস করতে লাগল, মুআজ, তোমার কী হলো? কিন্তু তিনি কারো কোনো কথার জবাব না-দিয়ে সওয়ারি হাঁকিয়ে মদিনার পথে ঘোড়া ছুটালেন। মদিনার প্রায় পঞ্চাশ মাইল দূরত্বে তিনি হজরত আম্মার বিন ইয়াসির রাদিয়াল্লাহু আনহুকে ইয়ামানের দিকে আসতে দেখলেন। তিনি হজরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর নির্দেশে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অফাতের সংবাদ নিয়ে ইয়ামান ছুটে যাচ্ছিলেন। হজরত মুআজ রাদিয়াল্লাহু আনহুকে চিনতে পেরে আম্মার বিন ইয়াসির রাদিয়াল্লাহু আনহু সেখানেই যাত্রা ক্ষান্ত করলেন। হজরত মুআজ রাদিয়াল্লাহু আনহুকে তিনি রাসুলের অফাতের সংবাদ দিলেন। অতঃপর তিনি বললেন, 'হে আম্মার, আমি এখন আর কার নিকট থেকে দিকনির্দেশনা নিবো এবং মনের আকুতি আর কার কাছে জানাব?'

এরপর তিনি সফর করতে করতে মদিনায় পৌঁছেন। উম্মুল মুমিনিন হজরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহার ঘরে এসে করাঘাত করলেন। নিজের পরিচয় দিয়ে শোকপ্রকাশ করলেন। আম্মাজান হজরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বললেন, 'মুআজ, তুমি যদি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনের শেষমুহূর্তগুলো দেখতে, তা হলে দুনিয়ার জীবন যত দীর্ঘই হতো না কেন, কখনোই ভালো লাগতো না।'

এ কথা শোনামাত্র হজরত মুআজ রাদিয়াল্লাহু আনহু কাঁদতে কাঁদতে বেহুঁশ হয়ে

---

৯৪২. মুসনাদে আহমাদ : হাদিস নং ১৩২১৫

গেলেন।[৯৪৩]

***

يا خيرَ من دُفنت بالقاعِ أعظُمُهُ * فطابَ من طيبهنَّ القاعُ والأكمُ
نفسي الفداءُ لقبرٍ أنتَ ساكنُهُ * فيه العفافُ وفيه الجودُ والكرمُ

হে পবিত্র সত্তা, যার অস্থিমজ্জা মাটির নিচে সমাহিত করা হয়েছে, যার সুঘ্রাণে ওই মাটিও বিমোহিত ও সুশোভিত

আমার জান উৎসর্গ ওই কবরের তরে, যেখানে তিনি অবস্থান করছেন, শারাফাত, মাহাত্ম্য, উদারতা ও শ্রেষ্ঠত্ব সব তার মাঝেই সুপ্ত।

***

৯৪৩. সিরাতে ইবনে হিব্বান : ২/৪২৭-৪২৮

শামায়েলে মুসতফা

নবীজির দৈহিক আকৃতির বিবরণ

রহমতে দো-আলম হজরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আখলাক-চরিত্র ও দৈহিক গঠন-গড়নের বিবরণ লেখনীর বন্ধনীতে নিয়ে আসা বড় বড় সিরাত-লেখক এবং বিশ্বকাঁপানো ঐতিহাসিকের পক্ষেও সম্ভব নয়। চতুর্দশ শতাব্দী পর্যন্ত এ বিষয়ে লেখা হয়েছে এবং কেয়ামত পর্যন্তই লেখা হতে থাকবে; তবু হজরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শামায়েল ও খাসায়েল লিখে শেষ করা যাবে না। এখানে আমরা আমাদের শত অপারগতা ও সম্বলহীনতার কথা স্বীকার করে নেহায়েত সংক্ষিপ্তাকারে হাদিস ও সিরাতের কিতাব থেকে কিঞ্চিৎ আলোকপাত করছি।[৯৪৪]

নবীজির দৈহিক আকার-আকৃতি

হজরত হিন্দ বিন আবি হালা রাদিয়াল্লাহু আনহু নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দৈহিক গঠনের বিবরণ দিতে গিয়ে উল্লেখ করেন- নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেহারা মোবারক পূর্ণিমার চাঁদের মতো ঝলমল করত। তার পদযুগল মধ্যমাকৃতির ব্যক্তির পা থেকে কিছুটা লম্বা ছিল। তবে তিনি বেমানান দীর্ঘকায় ছিলেন না। মাথা মোবারক ভারসাম্যপূর্ণ বড় ছিল। মাথার কেশগুচ্ছ হালকা কোঁকড়ানো ছিল। সহজে সিঁথি করতে পারলে করে নিতেন, অন্যথায় রেখে দিতেন (অর্থাৎ, কখনো চিরুনি হাতের কাছে পেলে আঁচড়ে নিতেন)। যখন নবীজির চুল লম্বা হতো তখন তার কেশগুচ্ছ কানের লতি অতিক্রম করে যেত।

দেহের বর্ণ ছিল উজ্জ্বল ফর্সা। প্রশস্ত কপালবিশিষ্ট ছিলেন তিনি। ভ্রু ছিল ঘন ও চিকন। উভয় ভ্রুর মধ্যখানে ছিল নজরকাড়া দূরত্ব। মাঝখানে একটি রগ ছিল, যা গোসসার সময় ফুলে উঠত।

নাক মোবারক ছিল কিছুটা উঁচু ও সরু। যার অগ্রভাগে সবসময় এক ধরনের চমক ও ঔজ্জ্বল্য প্রত্যক্ষ করা যেতো। প্রথম দর্শনে যে কেউ তার নাককে উঁচুই মনে করত (কিন্তু পরে গভীরভাবে লক্ষ করে বুঝতো মূলত তা চমক ও ঔজ্জল্যের কারণেই উঁচু মনে হয়েছে, আসলে উঁচু নয়)।

---

৯৪৪. এ অধ্যায়ের যেসব জায়গায় শামায়েলে তিরমিজির বরাত রয়েছে, সেখানে ইবারতের অনুবাদ ও বন্ধনীর মধ্যকার ব্যাখ্যাগত ইবারতে শাইখুল হাদিস যাকারিয়া রহ. অনূদিত 'খাসায়েলে নববি শরহে শামায়েলে তিরমিজি' হতে চয়ন করা হয়েছে।

দাঁড়ি মোবারক ছিল খুব ঘন। চোখের পুত্তলি ছিল মিশমিশে কালো। কপাল ছিল সমান ও প্রশস্ত। মুখের গঠন ছিল ভারসাম্যপূর্ণ প্রশস্ত (ছোট মুখবিশিষ্ট ছিলেন না তিনি)। তার দাঁতগুলো ছিল চিকন চিকন ও চমকদার। সামনের দাঁতগুলোর মাঝেমধ্যে একটু ফাঁকও ছিল। গর্দান মোবারক এমন সুন্দর ও মসৃণ ছিল, যেমনটি হয়ে থাকে মূর্তির ঘাড়—পরিষ্কার, স্বচ্ছ ও সৌন্দর্যমণ্ডিত। আর গায়ের বর্ণ ছিল রুপালি সুন্দর ও ঝকঝকে।

নবীজির সবকটি অঙ্গই ছিল ভারসাম্যপূর্ণ ও গোশতে ভরা নাদুসনুদুস। পেট ও সিনা মোবারক ছিল সমান। তবে সিনা ছিল প্রশস্ত ও চওড়া। তার উভয় কাঁধের মাঝখানে কিছুটা দূরত্ব ছিল। জোড়ার হাড়গুলো ছিল খুব শক্ত ও প্রশস্ত (যা শক্তিশালী হওয়ার পরিচায়ক)। কাপড় খোলার সময় দেহের ঔজ্জ্বল্য ও চমক প্রকাশ পেতে দেখা যেতো।

নাভি ও সিনার মধ্যখানে পশমের একটি সরুরেখা ছিল, যা দেখলে মনে হতো একটি সুন্দর কালো দাগ। এ দাগ ছাড়া বুক ও পেট পশমশূন্য ছিল। তবে উভয় বাহু, কাঁধ এবং সিনার উপরি অংশে কিছুটা পশম ছিল। হাতের কব্জি ছিল লম্বা। হাতের তালু ছিল প্রশস্ত। উভয় পায়ের নিচ ও হাতের তালু গোশতে ভরপুর ছিল। হাত-পায়ের আঙুলগুলো ছিল পরিমাণমতো লম্বা। পায়ের তলায় কিছুটা গভীরতা ছিল। তবে পা ছিল সমান। সমতল পা হওয়ার কারণে পানি কোথাও থামত না। মুহূর্তেই গড়িয়ে পড়ত।

তিনি যখন পথ চলতেন তখন শক্তি দিয়ে পা উঠাতেন। সামনের দিকে ঝুঁকে ঝুঁকে চলতেন। মাটিতে আস্তে আস্তে পা রাখতেন। চলার সময় মনে হতো কোনো নিচু জমিতে অবতরণ করছেন। কোনো দিকে তাকালে পুরো শরীর ঘুরিয়ে তাকাতেন।

তার নজর সব সময় নিচদিকে থাকত। আসমানের দিকে না তাকিয়ে জমিনের দিকেই দৃষ্টি বেশি রাখতেন। চোখের কিনারা দিয়ে তাকানোর অভ্যাস ছিল না তার (অর্থাৎ লজ্জার কারণে চোখে চোখ রেখে কারো দিকে তাকাতেন না তিনি)। চলার সময় সাহাবিদের সামনে এগিয়ে দিতেন আর নিজে পেছনে থাকতেন। কারো সাথে সাক্ষাৎ হলে নিজেই আগে সালাম দিতেন।[৯৪৫]

হজরত আলি রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন-রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অত্যন্ত উদারচিত্ত, প্রশস্ত হৃদয়, সত্যভাষী, নরমপ্রকৃতি এবং সামাজিকতা ও লেনদেনের ক্ষেত্রে অত্যন্ত ভদ্র ও শালীন ছিলেন। তাকে কেউ প্রথমবার দেখলেই তার প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে যেতো। এরপর তার সংস্পর্শে অবস্থান

৯৪৫. শামায়েলে তিরমিজি : বাবু মা-জা-আ ফী খুলুকি রাসুলিল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

করতে থাকলে ধীরে ধীরে তার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে যেতো। তার স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে সকল লিপিকার ও জীবনীকারই লিখেছেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মতো দ্বিতীয় কাউকে আমরা না এর পূর্বে খুঁজে পেয়েছি আর না তার পরে। সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।[৯৪৬]

হিন্দ বিন আবি হালা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেও ছিলেন অত্যন্ত গাম্ভীর্যপূর্ণ ও শৌর্য-বীর্যমণ্ডিত এবং অন্যের দৃষ্টিতেও ছিলেন তিনি প্রতাপশালী। তার মুখমণ্ডল পূর্ণিমার চাঁদের ন্যায় ঝলমল করতে থাকত।[৯৪৭]

হজরত বারা বিন আযেব রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মধ্যম মাপের উঁচু ছিলেন। আমি একবার তাকে কুবাতে দেখতে পেয়েছিলাম। আমি তার চেয়ে সুন্দর অবয়ববিশিষ্ট কাউকে কখনো দেখিনি।[৯৪৮]

হজরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন- আমি এমন কোনো রেশমও ছুঁয়ে দেখিনি, যা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতের তালু অপেক্ষা অধিক কোমল। আর আমি কোনো মেশক বা আম্বরও এমন শুঁকে দেখেনি, যা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘাম মোবারক অপেক্ষা অধিক ঘ্রাণযুক্ত।[৯৪৯]

উত্তম চরিত্রের বিবরণ

হজরত হিন্দ বিন আবি হালা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন- রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বদা আখেরাতের চিন্তায় নিমগ্ন থাকতেন। পরকালের বিষয়গুলো নিয়ে তিনি সবসময় চিন্তিত থাকতেন। অবিরাম এই চিন্তা-নিমগ্নতায় তার দিনরাত কাটত। বিশ্রাম ও বিরাম বলতে তার জীবনে কিছুই ছিল না। অধিকাংশ সময় নীরব থাকতেন। প্রয়োজন ছাড়া কথাই বলতেন না। কথা শুরু করলে পুরো মুখ খুলে পরিষ্কার ভাষায় বলতেন (অহংকারীদের মতো বেপরোয়াভাব প্রদর্শন করে কথা বলতেন না)। আর এভাবেই কথা শেষ করতেন। তার কথা হতো অত্যন্ত পরিষ্কার ও স্পষ্ট ভাষায়। তাতে না থাকত অপ্রয়োজনীয় কোনো দীর্ঘতা, আর না থাকত অস্পষ্টতা ও সংক্ষিপ্ততা।

---

৯৪৬. শামায়েলে তিরমিজি : বাবু মা-জা-আ ফী খুলুকি রাসুলিল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।
৯৪৭. শামায়েলে তিরমিজি : বাবু মা-জা-আ ফী তাওয়াযুই সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।
৯৪৮. শামায়েলে তিরমিজি : বাবু মা-জা-আ ফী খুলুকি রাসুলিল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।
৯৪৯. সহিহ মুসলিম : কিতাবুল ফাযায়েল, বাবু তীবি রা-ইহাতিন নাবিয়্যি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

তিনি কর্কশ ও রূঢ় ছিলেন না। কারো মানহানি করা তিনি পছন্দ করতেন না। নেয়ামতের খুব কদর করতেন। মনে করতেন এটাই অনেক কিছু। তা যত ছোট বা অল্প পরিমাণেরই হোক না কেন। কখনোই তার নিন্দা করতেন না। খাওয়াদাওয়ার ক্ষেত্রে অধিক প্রশংসাও করতেন না আবার মন্দও বলতেন না। দুনিয়া ও দুনিয়াদারি সম্পর্কিত কোনো বিষয়ে কখনো তিনি রাগান্বিত হতেন না। কিন্তু যখনই আল্লাহ তায়ালার কোনো হুকুম নিয়ে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা হতো তখন তার প্রভাব-প্রতাপের সামনে কেউ স্থির থাকতে পারত না। তিনি তার প্রতিশোধ না নিয়ে ক্ষান্ত হতেন না।

ব্যক্তিগত কোনো বিষয়ে তিনি কখনো না রাগ করতেন, না প্রতিশোধ গ্রহণ করতেন। কাউকে কোনো ইশারা-ইঙ্গিত করলে পূর্ণ হাত দিয়ে ইশারা করতেন। কখনো কোনো বিষয়ে বিস্মিত হলে হাত উলটিয়ে বিস্ময় প্রকাশ করতেন। কথা বলার সময় ডান হাতের তালুর সাথে বাম হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলি মিলিয়ে কথা বলতেন। রাগ ও গোসসার কথা হলে চেহারা মোবারক পুরাটা ফিরিয়ে কথা বলতেন ও বিমুখতা পোষণ করতেন। আর যখন খুশি হতেন তখন দৃষ্টি নিচু করে ফেলতেন। তিনি অধিকাংশ সময় মুচকি হাসি হাসতেন। যদ্দরুন তার সামনের দাঁতগুলো শুভ্র শিলাখণ্ডের মতো ঝকঝকে ও চকচকে অবস্থায় প্রকাশ পেতো।[৯৫০]

উম্মুল মুমিনিন হজরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন- রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অশ্রাব্য কথাবার্তা, নির্লজ্জতা ও অশ্লীলতা হতে বহুদূরে থাকতেন। হাট-বাজারে কখনোই উঁচু আওয়াজে কথা বলতেন না। মন্দের প্রতিশোধ তিনি কখনো মন্দ দিয়ে নিতেন না। বরং ক্ষমা ও মার্জনার মাধ্যমে অপরাধীকে বরণ করে নিতেন।

হজরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা আরো বলেন- নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনোই কারো উপর অন্যায়ভাবে হাত উঠাতেন না। তবে জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহর বিষয় ভিন্ন। দাস-দাসী, খাদেম ও নারীদের উপর তিনি কখনোই হাত ওঠাতেন না।[৯৫১]

তিনি আরো বলেন- আমি কখনোই তাকে কারো সাথে অত্যাচার ও নির্যাতনমূলক আচরণ করতে দেখিনি, যতক্ষণ না আল্লাহ তায়ালার নির্ধারিত সীমারেখা অতিক্রম করা হতো। তবে যদি কোথাও আল্লাহর হুকুম লঙ্ঘিত

৯৫০. শামায়েলে তিরমিজি : বাবু কাইফা কা-না কালামু রাসুলিল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

৯৫১. শামায়েলে তিরমিজি : পৃষ্ঠা : ১৯৭

হতে দেখতেন তখন তিনি ভীষণ রাগান্বিত হতেন এবং অপরাধীকে শাস্তি দিয়ে ছাড়তেন।[৯৫২]

হজরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন- আমি টানা দশ বছর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমত করেছি। তিনি আমার কোনো কাজে কখনোই উফ্ফ শব্দটুকু বলেননি। কোনো কাজ করার পর তিনি এমন কখনোই বলেননি যে, তুমি এটা কেন করেছ? আবার কোনো কাজ না করার পর তিনি এমন কখনোই বলেননি যে, তুমি এটা কেন করোনি?[৯৫৩]

ব্যবস্থাপনাগত সৌন্দর্য

উম্মুল মুমিনিন হজরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন- যদি কোনো বিষয়ে দুটি পন্থা খোলা থাকত, তা হলে সবসময় তিনি সহজ পন্থাটি অবলম্বন করতেন। তবে তা জায়েজ পন্থায় হওয়া আবশ্যক ছিল।[৯৫৪]

হজরত আলি রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন- রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বদা স্বীয় জবান মোবারক হেফাজত করতেন। সেখানেই মুখ খুলতেন যেখানে না খুললেই নয়। মানুষকে মনোতৃপ্তি দিয়ে রাখতেন। বিরক্ত করতেন না। কোনো সম্প্রদায়ের সম্মানিত কেউ এলে তাকে সর্বোচ্চ সম্মান দিতেন। তাকেই তার সম্প্রদায়ের আমির ও নেতা নিযুক্ত করতেন। লোকজনের ব্যাপারে সতর্কতার সাথে এমনভাবে আলোচনা-পর্যালোচনা করতেন, যাতে নিজের হাস্যোজ্জ্বল মুখের হাসি ও উত্তম চরিত্রের সংস্পর্শ হতে কেউ বঞ্চিত না হয়।

লোকজনকে অপরাপর লোকের ভালোমন্দ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে থাকতেন। ভালো কাজের প্রশংসা করতেন ও সাহস যোগাতেন। মন্দ কাজের নিন্দা করতেন ও তার প্রতিকার করতেন।

তিনি আচার-আচরণে মধ্যপন্থা অবলম্বন করতেন। কখনো এর ব্যতিক্রম হতো না। কোনো বিষয়ে গাফলতি প্রদর্শন করতেন না। আশঙ্কা করতেন যে, এতে লোকজনও ধীরে ধীরে গাফেল হতে শুরু করবে।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট সবসময়ের প্রয়োজনীয় বস্তুর বন্দোবস্ত থাকত। হকের ক্ষেত্রে তিনি কখনো কোনো ত্রুটি করতেন না। কখনো সীমাতিরিক্ত কাজও করতেন না। তার নিকট যারা থাকতেন, তারা সকলেই নির্বাচিত ও উত্তম শ্রেণির ছিলেন। তার দৃষ্টিতে সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ওই লোক ছিল, যার কল্যাণকামিতা ও আচার-আচরণ উৎকৃষ্ট হতো। আর তার

৯৫২. শামায়েলে তিরমিজি : পৃষ্ঠা : ১৯৮
৯৫৩. শামায়েলে তিরমিজি : বাবু মা-জা-আ ফী খুলুকি রাসুলিল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।
৯৫৪. শামায়েলে তিরমিজি : পৃষ্ঠা : ১৯৮

দরবারে সে-ই অধিক ইজ্জত-সম্মান লাভ করতো, যার মধ্যে অধিক পরিমাণে সহমর্মিতা, হৃদ্যতা ও সৌহার্দ্যপূর্ণ মন এবং পরোপকারের মানসিকতা বিদ্যমান থাকত।[৯৫৫]

তার মজলিসের সৌন্দর্য

আলি রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মজলিসের সৌন্দর্য ও মাধুর্যের কথা বিশুদ্ধ বাকশৈলী দিয়ে এভাবে উল্লেখ করতেন- নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর জিকির করতে করতে দাঁড়াতেন এবং জিকির করতে করতেই বসতেন। কোনো মজলিসে গমন করলে মজলিসের একেবারে শেষাংশে গিয়ে বসতেন। আর এমনটি করতে অন্যান্য লোকদেরও তিনি আদেশ দিতেন। উপস্থিত লোকদের প্রত্যেককেই তিনি নিজের তাওয়াজ্জুহ-মনোনিবেশের সমান হিস্যা প্রদান করতেন।

উপস্থিত প্রত্যেকেই মনে করত নবীজির দৃষ্টিতে সে-ই প্রিয়; আর কেউ নয়।

কেউ যদি নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কোনো কাজে বসিয়ে রাখতো কিংবা কেউ কোনো প্রয়োজনীয় কথা তাকে বলত, তখন তিনি পূর্ণ মনোযোগ সহকারে ধীর-স্থির ও ধৈর্য নিয়ে তার কথা শুনতেন। তার কথা পূর্ণ করার পরই বিদায় নিতেন। আর কেউ যদি তার নিকট কোনো কিছু চাইত বা সাহায্য প্রার্থনা করত, তা হলে তিনি তার প্রয়োজন মেটানো ছাড়া বাড়িতে ফিরতেন না। নয়তো কমপক্ষে নম্র ভাষায় ভদ্র আচরণের মাধ্যমে সুন্দরভাবে জবাব দিয়ে ফিরতেন।

তার এই মধুর চরিত্র সকলের জন্য সমান ছিল। তিনি সকলের জন্য পিতৃতুল্য ছিলেন। লেনদেনের ক্ষেত্রে সকলের নিকট তিনি সমান ছিলেন। তার মজলিস ছিল জ্ঞান-প্রজ্ঞা, হায়া-শরম, সবর ও আমানতদারির মজলিস। না তাতে কোনো কিছু উঁচু আওয়াজে বলা হতো, আর না কারো কোনো দোষত্রুটির আলোচনা হতো। না তিনি কারো ইজ্জত-সম্মানে আঘাত করে কথা বলতেন, না কারো কোনো দুর্বলতার প্রচার-প্রসার করতেন। মজলিসে লোকজন অত্যন্ত বিনয় ও নম্রতার সাথে বসে থাকত। সকলেই বড়দের প্রতি শ্রদ্ধা এবং ছোটদের প্রতি স্নেহ ও হৃদ্যতা পোষণ করত। অসহায়দের প্রাধান্য দেওয়া হতো এবং মুসাফির ও অনাথদের প্রতি খেয়াল রাখা হতো।[৯৫৬]

---

৯৫৫. শামায়েলে তিরমিজি : বাবু মা-জা-আ ফী তাওয়াযুই রাসুলিল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

৯৫৬. শামায়েলে তিরমিজি : বাবু মা-জা-আ ফী তাওয়াযুই রাসুলিল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম- আলি রা. থেকে বর্ণিত।

প্রফুল্লতা ও হাসিখুশি স্বভাব

হজরত আলি রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন- রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সদা প্রফুল্ল ও হাসিখুশি থাকতেন। নম্র চরিত্রের ও ভদ্র স্বভাবের ছিলেন। অল্পতেই তিনি লোকজনকে ক্ষমা করে দিতেন। কঠোর স্বভাবের অধিকারী ছিলেন না। কড়া কথা বলতে অভ্যস্ত ছিলেন না তিনি। চিৎকার করে কথা বলতেন না। নিম্ন শ্রেণির লোকদের মতো কথা বলতেন না। কারো দোষচর্চা করতেন না। কৃপণও ছিলেন না। যা তার পছন্দ হতো না, তিনি তা এড়িয়ে যেতেন। ধরপাকড় করতেন না। কাউকে কোনো বিষয়ে নিরাশ করতেন না।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সব সময় তিনটি বস্তু থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখতেন।

১. ঝগড়া

২. অহংকার প্রদর্শন

৩. অনর্থক কথাবার্তা

অন্যান্য লোককেও তিনি তিনটি বিষয় থেকে বাঁচিয়ে রাখতেন।

১. তিনি কারো মন্দ আলোচনা করতেন না।

২. কারো দোষচর্চা করতেন না।

৩. কারো গোপন বিষয়ের পেছনে পড়তেন না।

তিনি শুধু এমন কথাই বলতেন, যার মধ্যে সওয়াবের আশা করতেন।

যখন তিনি কথা বলতেন তখন উপস্থিত লোকজন এমনভাবে মাথা ঝুঁকিয়ে নিতেন, মনে হতো তাদের সকলের উপর পাখি বসে আছে (অর্থাৎ সকলেই জড়পদার্থের ন্যায় হয়ে যেতেন)। তিনি চুপ হয়ে গেলে তারা কথা বলতেন। তার সামনে কেউ কখনো দ্বন্দ্ব-কলহে লিপ্ত হতো না।

তার মজলিসে কেউ কথা বললে অন্য সবাই নীরবে তা শুনে যেত। যখন সে তার কথা শেষ করত তখনই অন্য কেউ কথা বলত। তার সামনে কথা বলার ক্ষেত্রে প্রত্যেকের মর্যাদা তেমনই হতো যেমন প্রথম ব্যক্তির ক্ষেত্রে হতো। অর্থাৎ সকলের কথাই তিনি পূর্ণ ধৈর্য ও স্থিরতার সঙ্গে শ্রবণ করতেন। যে কথায় সকলে হাসত, তিনিও হাসতেন। যে কথায় সকলে অবাক হতো, তিনিও অবাক হতেন। মুসাফির ও ভিনদেশি লোকদের বাহ্যত অভদ্রোচিত ও সর্বপ্রকারের কথা তিনি ধৈর্য সহকারে শুনতেন। এমনকি তার সকল সাহাবি এধরনের লোকদের নিজের দিকে টেনে নিতেন, যাতে নবীজি সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর কোনো বোঝা না হয়ে যায়। তিনি তাদেরকে বলতেন, তোমরা যেখানেই কোনো অসহায় লোকের দেখা পাবে, সাধ্যমতো তাকে সাহায্য করবে।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওই লোকেরই প্রশংসা গ্রহণ করতেন, যে সীমার ভেতরে থাকত। কারো কথার মাঝে তিনি কথা বলতেন না। কারো কোনো কথা তিনি কাটতেন না। হ্যাঁ, যদি কেউ সীমালঙ্ঘন করত, তাকে বারণ করতেন। অথবা মজলিস হতে উঠে গিয়ে তার কথার জবাব দিতেন।[৯৫৭]

রুগ্‌ণ ব্যক্তির সেবা-শুশ্রূষা

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অভ্যাস ছিল, কোনো সাহাবি অসুস্থ হয়ে পড়লে তিনি তার শুশ্রূষায় যেতেন। জনৈক ইহুদি খাদেম এবং নিজের মুশরিক চাচার শুশ্রূষায়ও তিনি গিয়েছিলেন। তাদেরকে তিনি ইসলামের দাওয়াতও দিয়েছেন। ওই ইহুদি লোকটি ইসলামগ্রহণে ধন্যও হয়েছেন।[৯৫৮]

জিকির ও ইবাদত

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অভ্যাস ছিল তিনি অধিক পরিমাণে কুরআন তেলাওয়াত করতেন। তিনি অত্যন্ত তারতিলের সাথে কুরআন তেলাওয়াত করতেন। প্রত্যেক আয়াতই তিনি থেমে থেমে পড়তেন। মদ্দের হুরফগুলো টেনে টেনে পড়তেন। যেমন الرحمن الرحيم কে মদ্দের সাথেই পড়তেন। তেলাওয়াতের শুরুতে أعوذ بالله من الشيطان الرجيم পড়তেন।

তিনি কখনো কখনো জোরে মোহন সুরে কুরআন তেলাওয়াত করতেন। অন্যের কণ্ঠেও তেলাওয়াত শুনতে পছন্দ করতেন। একবার হজরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু তার নির্দেশে কুরআন তেলাওয়াত করেন। তিনি তা এত নিবিষ্ট হয়ে শুনে যান যে, তার দু'চোখ অশ্রুসজল হয়ে গাল বেয়ে পড়তে থাকে।[৯৫৯]

আল্লাহর জিকির ও খোদাভীতি

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অধিক পরিমাণে আল্লাহর জিকির করতেন। বরং তাঁর প্রতিটি কথাতেই আল্লাহর জিকির ও ফিকির বিদ্যমান থাকত। তার পক্ষ থেকে উম্মতকে আদেশপ্রদান, বাধাদান, আল্লাহ তায়ালার

---

৯৫৭. শামায়েলে তিরমিজি : পৃষ্ঠা : ১৯৯-২০০ (বাবু মা-জা-আ ফী খুলুকি রাসুলিল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)।

৯৫৮. যাদুল মাআদ (আররিসালা মুদ্রিত)

৯৫৯. যাদুল মাআদ : ১/৪৬৩-৪৬৫; ফসলুন ফি হাদয়িহী সা. ফী কিরাআতিল কুরআন

নাম ও গুণাবলি, তার বিধি-বিধান ও তার ওয়াদা ও ধমক ইত্যাদি সব কিছুই জিকরে ইলাহির অন্তর্ভুক্ত। অনুরূপভাবে আল্লাহ তায়ালার অসংখ্য ও অফুরন্ত নেয়ামতরাজির উপর শুকরিয়া প্রকাশ ও তার তাসবিহ ও তাহমিদ সবই এ জিকিরেরই অন্তর্ভুক্ত।

আল্লাহ তায়ালার নিকট অনুকম্পাভিক্ষা, দোয়া ও প্রার্থনা, আল্লাহকে ভয় করা ইত্যাদিও ওই জিকিরেরই প্রকার। এমনকি তার নীরব থাকাটাও ছিল এক প্রকার আত্মিক জিকির। যেমনিভাবে জিকির দ্বারা তার জিহ্বা তরতাজা থাকত ঠিক তেমনি তার অন্তরজগতও আল্লাহর জিকিরে সতেজ ও সজীব থাকত।

মোটকথা এই যে, তিনি সর্বহালতে ও প্রত্যেক মুহূর্তে আল্লাহর জিকিরে মশগুল থাকতেন। আল্লাহর জিকির-আজকার তার শ্বাস-প্রশ্বাসে জারি থাকত। তিনি চলতে-ফিরতে ও উঠতে-বসতে, আরোহণে উঠতে-নামতে সর্বাবস্থাতেই আল্লাহকে স্মরণ করতেন। তারই ধ্যানে লিপ্ত থাকতেন। যখন ঘুম হতে জাগতেন তখনও তিনি বলতেন-

الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا و إليه النشور

সকল প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর জন্য, যিনি আমাকে মৃত্যু দেওয়ার পর পুনরায় জীবন দিয়েছেন, আর তারই দিকে আমাদের প্রত্যাবর্তন করতে হবে।

ঠিক তেমনিভাবে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সর্ব অবস্থার দোয়াও বর্ণিত রয়েছে। যেমন, জাগ্রত হওয়ার দোয়া, নামাজ শুরু করার দোয়া, ঘর হতে বের হওয়ার দোয়া, মসজিদে প্রবেশের দোয়া, সকাল-সন্ধ্যার দোয়া, কাপড় পরিবর্তনের দোয়া, ঘরে প্রবেশের দোয়া, ইসতিনজাখানায় প্রবেশের এবং সেখান হতে বের হওয়ার দোয়া, অজু করার দোয়া, আজানের দোয়া, চাঁদ দেখার দোয়া, খানা খাওয়ার দোয়া, হাঁচি দেওয়ার দোয়া ইত্যাদি।[৯৬০]

নবীজির ঘরোয়া জীবন

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘরোয়া-জীবন ছিল খুব সাদাসিধা ও সহজ-সরল। তিনি যখন স্বীয় গৃহে প্রবেশ করতেন তখন তাকে একজন সাধারণ লোক মনে হতো। নিজের কাপড়চোপর নিজেই পরিষ্কার করতেন। বকরির দুধ দোহন করতেন। বাড়ির টুকিটাকি কাজ তিনি নিজ হাতেই আঞ্জাম দিতেন।[৯৬১]

৯৬০. যাদুল মাআদ : ১/৪৬৩-৪৬৫ (ফসলুন ফি হাদয়িহী সা. ফিল আযকার)

৯৬১. শামায়েলে তিরমিজি : পৃষ্ঠা : ১৯৪ (বাবু মা-জা-আ ফী তাওয়াযুই রাসুলিল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত)

হজরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিছানা ছিল পুরাতন ও খসখসে। আমি একবার চাইলাম সেটি পালটে আরেকটি বিছিয়ে দিই, যা তার জন্য আরামদায়ক হবে। তাই আমি নরম চাদর বিছিয়ে দিলাম। এরপর যখন তিনি আগমন করলেন, বললেন, আয়েশা, এটা কী?

আমি বললাম, আপনার বিছানাটা শক্ত ও খসখসে মনে হচ্ছিল। তাই নরম চাদর বিছিয়ে দিলাম।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, বিছানাটি উঠিয়ে নাও। কসম খোদার, যদি এটা না ওঠাও আমি তাতে বসবো না। অতএব, আমি বিছানাটি উঠিয়ে নিলাম।[৯৬২]

হজরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহাকে জিজ্ঞেস করা হলো, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘরে কী করতেন? তিনি বললেন, তিনি অন্যান্য মানুষের মতোই ছিলেন। নিজের মাথা নিজেই পরিষ্কার করতেন। বকরির দুধ নিজ হাতেই দোহন করতেন। কাপড় সেলাই করতেন। নিজের কাজকাম নিজেই সারতেন। সাধারণ লোকেরা ঘরে যা যা করে থাকে তিনিও তাই করেন। এমনকি তিনি ঘরওয়ালাদেরও সেবা-যত্ন করে থাকেন। কিন্তু যখনই মুয়াজ্জিন আজান দিতো, তখনই নামাজের জন্য দাঁড়িয়ে যেতেন।[৯৬৩]

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় স্ত্রীদের সাথে সমতা রক্ষা করে চলতেন। সব সময় এ দোয়া করতেন, 'হে আল্লাহ, আমার মধ্যে সমতা রক্ষার বিষয়ে যতটা সাধ্য রয়েছে তা আমি পূরণ করছি, আর আমার সাধ্যের বাইরে (হৃদয়ের ভালোবাসার ক্ষেত্রে) যা আপনার হাতে রয়েছে সেক্ষেত্রে আপনি আমাকে ধরপাকড় করবেন না'।[৯৬৪]

তিনি উম্মতকেও তাদের পরিবার-পরিজন ও আত্মীয়স্বজনের উত্তম আচরণ প্রদর্শনের নির্দেশ প্রদান করতেন ও বলতেন, তোমাদের মাঝে সর্বোত্তম ওই ব্যক্তি, যে তার পরিবারের সাথে উত্তম আচরণ করে থাকে। আমি তোমাদের অপেক্ষা সর্বাধিক নিজ পরিবারের প্রতি সদয় ও উত্তম আচরণকারী।[৯৬৫]

---

৯৬২. সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ ফী সিরাতি খাইরিল ইবাদ : ৭/৩৫৬

৯৬৩. মুসনাদে আহমাদ : হাদিস নং ২৬১৯৪

৯৬৪. সুনানে আবু দাউদ : হাদিস নং ২১৩৪ কিতাবুন নিকাহ, বাবুন ফিল কিসমি বাইনান নিসা।

৯৬৫. সুনানে তিরমিজি : কিতাবুল মানাকিব, বাবুন ফি ফাযলি আযওয়াজিন নাবিয়্যি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

হজরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, আমার বিয়ের শুরু জমানার কথা। আমি তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘরে কাপড়ের পুতুল দিয়ে খেলা করতাম। আমার সই-সখীরাও এসে আমার সাথে খেলাধুলা করত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ঘরে আসতেন তখন তারা লজ্জায় লুকিয়ে যেত। কিন্তু তিনি তাদেরকে আবারো আমার কাছে পাঠিয়ে দিতেন। তারা আবারো আমার সাথে খেলা শুরু করত।[৯৬৬]

হজরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, একদিন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলতে লাগলেন, হে আয়েশা, আমি অবশ্যই জানি কখন তুমি আমার প্রতি সন্তুষ্ট থাক আর কখন অসন্তুষ্ট হও। আয়েশা রা. জিজ্ঞাসা করলেন, তা আপনি কীভাবে জানেন? রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যখন তুমি আমার প্রতি সন্তুষ্ট থাক তখন তুমি এভাবে বলো, 'মুহাম্মদের রবের কসম! আর যখন তুমি অসন্তুষ্ট হও তখন বলো, 'ইবরাহিমের রবের কসম'! আয়েশা রা. বলেন, জি হ্যাঁ, ইয়া রাসুলাল্লাহ, আল্লাহর শপথ (রাগের সময়) আমি কেবল আপনার নামটাই বাদ দিই।[৯৬৭]

হজরত আয়েশা বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন ঘরে বসে ছিলেন। বাইরে থেকে আমরা হই-হুল্লোড়ের আওয়াজ শুনলাম। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘটনার উৎস জানতে দাঁড়ালেন। দেখলেন, হাবশিরা তাদের ছোট ছোট বর্শা দিয়ে খেলছে। নবীজি বলেন, আয়েশা, এই দিকে এসে দেখ। আমি ওদিকে গেলাম। নবীজির কাঁধের উপর আমার থুতনি রাখলাম। তার কাঁধ এবং মাথার মাঝখান দিয়ে হাবশিদের লড়াই-খেলা দেখছিলাম।

নবীজি আমাকে বলেন, আয়েশা, তোমার মন ভরেছে? তোমার কি মন ভরেছে? আমি না না বলতে থাকলাম। দেখতে চাইলাম, নবীজির কাছে আমার অবস্থান এবং ভালোবাসা কেমন![৯৬৮]

সহিহ মুসলিমের বর্ণনায় এসেছে, একপর্যায়ে আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা নিজেই সেখান থেকে সরে এলেন (অর্থাৎ, আম্মাজান আয়েশা রা.-এর মনোবাসনা পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে সঙ্গ দিয়েছেন)।[৯৬৯]

---

৯৬৬. সহিহ বুখারি : কিতাবুল ফাযাইলি, বাবু ফযলি আয়িশাতা রা.।

৯৬৭. সহিহ বুখারি, বাবু গায়রাতিন নিসা, সহিহ মুসলিম : ২৫৪৩

৯৬৮. সুনানে তিরমিজি : ৩৬৯১

৯৬৯. সহিহ মুসলিম : ৮৯২

নবীজির কথাবার্তা

হজরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা সাধারণ লোকদের মতো দ্রুত ছিল না। তিনি ধীরে ধীরে কথা বলতেন। তার কথা এতো সুস্পষ্ট হতো যে, শ্রবণকারী পরিষ্কাররূপে হৃদয়ঙ্গম করতে সক্ষম হতো। অন্য রেওয়ায়েতে এসেছে, কোনো ব্যক্তি চাইলে তার প্রতিটা শব্দ গণনাও করতে পারত।'[৯৭০]

শিশুদের প্রতি ভালোবাসা

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শিশুদেরকে অত্যন্ত মহব্বত করতেন। তাদের তরবিয়ত ও প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে বড় ভালোবাসাপূর্ণ পন্থা অবলম্বন করতেন। এত স্নেহ-মায়া নিয়ে তাদের উপদেশ দিতেন যে, তারা আত্মস্থ করতে সক্ষম হতো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার সীমাহীন ব্যস্ততা সত্ত্বেও শিশুদের ক্ষেত্রে কখনোই অবহেলা করেননি। তিনি শিশুদের জন্মের সময় কানে আজান দেওয়ার ব্যাপারে খুব যত্নবান ছিলেন।

আবু রাফে রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, হজরত ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহার ঘরে যখন হাসান বিন আলি রাদিয়াল্লাহু আনহু জন্মগ্রহণ করেন, তখন আমি দেখেছি, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার কানে আজান দিয়েছিলেন।[৯৭১]

কানে আজান দেওয়ার হেকমত হলো, শুরুতেই শিশুর কানে দীনের আওয়াজ পৌঁছে দেওয়া। তার অজান্তেই যেন ইসলাম ও তাওহিদের বাণী তার হৃদয়ে স্থিতি লাভ করে।

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শিশুদেরকে দৈনন্দিন শিষ্টাচার শিক্ষা দিতেন। কোনো শিশুর সঙ্গে খাবার খেতে বসলে তাকে খাবারের আদব শেখাতেন। তার সৎ ছেলে উমর বিন আবু সালামা রাদিয়াল্লাহু আনহুকে যখন তিনি খানার আদব পরিপন্থি খাবার খেতে দেখলেন, তাকে বললেন, 'বৎস, খাওয়া শুরু করার পূর্বে বিসমিল্লাহ বলবে এবং ডানহাতে খাবে এবং তোমার সামনে থেকে খাবে।'[৯৭২]

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাচ্চা জন্মের পরপরই তার মুখে খেজুর চিবিয়ে দিতেন। হজরত আবু মুসা আশআরি রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা

---

৯৭০. শামায়েলে তিরমিজি (কাইফা কানা কালা মু রাসুলিল্লাহ)

৯৭১. সুনানে আবু দাউদ : হাদিস নং ৫১০৫ (কিতাবুল আদাব, বাবুন ফিস সাবিয়্যি য়ুলাদু), সুনানে তিরমিজি : হাদিস নং ১৫১৪ (আবওয়াবুল আজাহি, বাবুল আজানি ফি উযুনিল মাওলুদি; সহিহ হাদিস)

৯৭২. সহিহ বুখারি : হাদিস নং ৫৩৮৬ (কিতাবুল আতইমাহ, বাবুত তাসমিয়াহ আলাত তআম)

করেন, 'আমার একটি ছেলে জন্ম নিলে তাকে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে নিয়ে যাই। তিনি তার নাম রাখেন ইবরাহিম এবং খেজুর চিবিয়ে তার মুখে দেন, তার জন্য বরকতের দোয়া করেন, এরপর তাকে আমার কাছে ফিরিয়ে দেন।[৯৭৩]

বাচ্চাদের এত যত্ন নিতেন যে, তাদের দ্বারা ইবাদতে বিঘ্ন ঘটলেও তিনি অসন্তুষ্ট হতেন না। একবার নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাজ পড়ছিলেন। তিনি যখন সেজদায় যেতেন, তখন হাসান-হুসাইন তার পিঠে চড়ে বসত। সাহাবায়ে কেরাম তাদেরকে সরিয়ে নিতে চাইলে তিনি ইশারায় বারণ করলেন। নামাজ শেষ করে তাদেরকে কোলে বসিয়ে বললেন, 'যারা আমাকে মহব্বত করবে তাদের উপর এ দুজনকে মহব্বত করাও আবশ্যক।'[৯৭৪]

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শিশুদের সুন্দর নাম রাখার নির্দেশ দিতেন। এটি মা-বাবার গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হিসেবে গণ্য করতেন। এ প্রসঙ্গে বহু হাদিস আছে। এক হাদিসে ইরশাদ করেছেন, 'আল্লাহর নিকট সবচেয়ে প্রিয় নাম হলো আবদুল্লাহ এবং আবদুর রহমান।'[৯৭৫]

হজরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, 'আমি একদিন নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে বের হলাম। পথিমধ্যে আমাদের কারো মধ্যে কোনো কথাবার্তা হলো না। ইতোমধ্যে আমরা কাইনুকা বাজারে এসে পড়লাম। এরপর সেখান থেকে ফিরে যখন ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু আনহার ঘর পর্যন্ত পৌঁছি, তখন তিনি বললেন, 'এখানে কি খোকা (হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু) আছে? এখানে কি খোকা আছে? আমরা বুঝতে পারছিলাম যে, ফাতিমা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) তাদেরকে প্রস্তুত করছেন। কিছুক্ষণ পরই তিনি দৌড়ে এসে নবীজিকে জড়িয়ে ধরলেন, চুমু খেলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'হে আল্লাহ, তুমি তাকে মহব্বত কর এবং যে তাকে মহব্বত করবে, তুমি তাকেও মহব্বত কর।'[৯৭৬]

হজরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু ছোটকালে একবার নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পেছনে সওয়ারিতে বসে ছিলেন। তাকে নসিহত করতে গিয়ে নবীজি বলেন, আমি তোমাকে কয়েকটি কথা শিখিয়ে

---

৯৭৩. সহিহ বুখারি : হাদিস নং ৫৪৬৭ (কিতাবুল আকিকাহ, বাবু তাসমিয়াতিল মাওলুদ)

৯৭৪. মুসনাদে আবু ইয়ালা : হাদিস নং ৫০১৭ (সনদ হাসান)

৯৭৫. সুনানে আবু দাউদ : হাদিস নং ৪৯৪৯ (কিতাবুল আদাব, বাবুন ফি তাগয়িরিল আসমা), সুনানে তিরমিজি : হাদিস নং ২৮৩৩ (আবওয়াবুল আদাব, বাবু মা-জা-আ মা য়ুস্তাহাব্বু মিনাল আসমা)

৯৭৬. সহিহ বুখারি : হাদিস নং ২১২২ (কিতাবুল বুয়ূ, বাবু মা যুকিরা ফিল আসওয়াক)

দিচ্ছি: তুমি আল্লাহ তায়ালাকে স্মরণ রাখবে, তিনিও তোমাকে স্মরণ রাখবেন। যখন তুমি চাইবে, আল্লাহর কাছেই চাইবে। যখন সাহায্য প্রার্থনা করবে, আল্লাহর কাছেই প্রার্থনা করবে।

জেনে রাখবে, পুরো উম্মত যদি তোমাকে কোনো উপকার করার জন্য একত্রিত হয়, তা হলে আল্লাহ তায়ালা তোমার জন্য যতটুকু লিখে রেখেছেন, ততটুকুই তারা উপকার করতে পারবে। জেনে রাখবে, পুরো উম্মত যদি তোমাকে কোনো ক্ষতি করার জন্য একত্রিত হয়, তা হলে আল্লাহ তায়ালা তোমার জন্য যতটুকু লিখে রেখেছেন, ততটুকুই তারা ক্ষতি করতে পারবে। কলম তুলে নেওয়া হয়েছে এবং লিখিত কাগজসমূহও শুকিয়ে গেছে।[৯৭৭]

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শিশুদের সঙ্গে হাস্যরস করতেন। আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের ঘরে আগমন করলেন। আমার একটি ছোট ভাই ছিল। তার নাম উমাইর। তার কাছে 'নুগার' (লাল ঠোঁটবিশিষ্ট একটি চড়ুই) পাখি ছিল। এই পাখি নিয়ে সে খেলত। একদিন নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসে তাকে বিষণ্ন হয়ে বসে থাকতে দেখে বললেন, 'কী হলো উমাইর? বিষণ্ন কেন?

আমরা বললাম, ইয়া রাসুলাল্লাহ, তার খেলার সাথি চড়ুই মরে গেছে।'

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন তাকে রসিকতা করে বললেন, 'আবু উমাইর, কই গেল তোমার নুগাইর?'[৯৭৮]

নবীজির চিত্তাকর্ষক হাস্যরস

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞেস করলেন, 'ইয়া রাসুলাল্লাহ, আপনি আমাদের সঙ্গে রসিকতাও করেন?'

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, 'হ্যাঁ, কিন্তু আমি কখনো মিথ্যা বলি না।'[৯৭৯]

একদিন মজলিসে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'জান্নাতে এক লোক আল্লাহ তায়ালার নিকট চাষাবাদ করার আবদার করবে। তখন আল্লাহ তাকে বলবেন, তোমার কি সকল চাহিদা পূরণ হয়নি? সে বলবে, জি হয়েছে। কিন্তু আমি চাচ্ছি বীজ বুনতেই ফসল উৎপন্ন হয়ে যাওয়া দেখতে। ফলে সে বীজ বপন করবে আর সঙ্গে সঙ্গে তা বড় হয়ে পেকে কাটার উপযুক্ত হয়ে যাবে।'

৯৭৭. সুনানে তিরমিজি : ২৫১৬

৯৭৮. সুনানে আবু দাউদ : হাদিস নং ৪৯৬৯ (কিতাবুল আদব); মুসনাদে আহমদ : হাদিস নং ৪০৭১, সনদ সহিহ

৯৭৯. সুনানে তিরমিজি : হাদিস নং ১৯৯০

এক গ্রাম্য লোক সেই বৈঠকে বসে নবীজির কথা শুনছিল। সে জিজ্ঞেস করল, 'এই সৌভাগ্য তো কেবল কোনো কুরাইশি কিংবা কোনো আনসারি ব্যক্তিরই ভাগ্যে জুটবে। কারণ, চাষাবাদ তাদেরই পেশা, আমাদের নয়।' এ কথা শুনে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হেসে দিলেন।[৯৮০]

একবার এক বৃদ্ধা নবীজির নিকট এসে আরজ করল, 'আল্লাহর রাসুল, দোয়া করুন, আল্লাহ তায়ালা যেন আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করান।'

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'জান্নাতে কোনো বৃদ্ধা প্রবেশ করবে না।'

বৃদ্ধা এ কথা শুনে কাঁদতে কাঁদতে ফিরে যায়। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, 'তাকে বলে দাও যে, সে বৃদ্ধ অবস্থায় জান্নাতে যাবে না; বরং যুবতী হয়ে যাবে।[৯৮১] আল্লাহ তায়ালা কুরআনে বলেছেন, 'আমি তাদেরকে সৃষ্টি করেছি বিশেষ রূপে। তাদেরকে করেছি কুমারী, প্রেমময়ী ও সমবয়স্কা।'[৯৮২]

হজরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, এক ব্যক্তি নবীজির দরবারে এসে একটি সওয়ারি চাইল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, আমি তোমাকে উটনীর বাচ্চা দেব।'

সে বলল, 'ইয়া রাসুলাল্লাহ, আমি উটনীর বাচ্চা দিয়ে কী করব?'

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'সব উট তো উটনীরই বাচ্চা।'[৯৮৩]

একবার হজরত সাওদা রাদিয়াল্লাহু আনহা আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য এলেন। সেখানে হাফসা রাদিয়াল্লাহু আনহাও ছিলেন। সাওদা রাদিয়াল্লাহু আনহা সেজেগুজে এসেছিলেন। তার গায়ে একটি সুন্দর ইয়ামানি নকশি চাদর ছিল। হজরত হাফসা রাদিয়াল্লাহু আনহা আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহাকে বললেন, এখন যদি নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের এখানে আসেন, তা হলে সাওদাকে আমাদের চেয়ে অধিক সুন্দরী দেখা যাবে। তাই আমি আজ সত্যি তার সাজগোজ খারাপ করে দিব। তাদের কানাঘুষা শুনে জিজ্ঞেস করেন, 'তোমরা কী নিয়ে কথা বলছ?' হাফসা রাদিয়াল্লাহু আনহা বললেন, 'কানা (দাজ্জাল) এসে গেছে।'

---

৯৮০. সহিহ বুখারি : হাদিস নং ৭৫১৯ (কিতাবুত তাওহিদ, বাবু কালামির রব মাআ আহলিল জান্নাহ)

৯৮১. শারহুস সুন্নাহ, বাগাব : ১৩/১৮৩ (বাবুল মিযাহ, আলমাকতাবুল ইসলামি, দামেশক সংস্করণ)

৯৮২. সুরা ওয়াকিয়া, আয়াত ৩৫, ৩৬

৯৮৩. সুনানে আবু দাউদ : হাদিস নং ৪৯৯৮ (কিতাবুল আদব, বাবু মা-জা-আ ফিল মিযাহ)

সাওদা রাদিয়াল্লাহু আনহা ভীষণ ঘাবড়ে গেলেন এবং তার মধ্যে কাঁপুনি এসে যায়। তিনি বলতে লাগলেন, 'হায়! আমি কোথায় লুকাবো?'

হাফসা রাদিয়াল্লাহু আনহা বললেন, 'তাঁবুতে চলে যাও।'

তিনি সেখানে চলে যান। তাঁবুটি ছিল গুদামঘর। সেখানে ফলমূল এবং মাকড়সার জাল ছিল। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আগমন করলে তারা দুজন হাসতে থাকেন। হাসির কারণে তারা কথাই বলতে পারছিলেন না। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, হাসছো কেন?

তারা দুজনই গুদামঘরের দিকে ইশারা করল। নবীজি সেখানে গিয়ে সাওদা রাদিয়াল্লাহু আনহাকে কাঁপতে দেখে জিজ্ঞেস করলেন, 'সাওদা, কী হয়েছে তোমার?'

সাওদা রাদিয়াল্লাহু আনহা বললেন, 'কানা (দাজ্জাল) এসে গেছে।'

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'না, এখনো আসেনি। তবে নিশ্চয় আসবে। এখনো আসেনি। তবে নিশ্চয় আসবে।' এটুকু বলে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাওদা রাদিয়াল্লাহু আনহার কাপড়ের ধুলোবালি এবং মাকড়সা ঝাড়তে থাকেন।[৯৮৪]

আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, আমি একবার নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হারিরা (একধরনের মিষ্টান্ন) নিয়ে এলাম। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন আমার আর সাওদা রাদিয়াল্লাহু আনহার মাঝখানে ছিলেন। আমি সাওদাকে বললাম, খাও। সে (কোনো কারণে) খেতে অস্বীকার করে। আমি বললাম, খাও, নইলে কিন্তু তোমার চেহারায় মারবো। সে তখনও খেতে অস্বীকার করে। তখন আমি সত্যি সত্যিই হারিরা হাতে নিয়ে তার চেহারায় ছুড়ে মারলাম।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন হাসছিলেন। এরপর নবীজি সাওদা রাদিয়াল্লাহু আনহাকেও বললেন, তুমিও তার চেহারায় মেরে দাও। ফলে সেও আমার চেহারায় ছুঁড়ে মারে। আর নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা দেখে হাসছিলেন।[৯৮৫]

উম্মুল মুমিনিন আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, আমি একবার এক সফরে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে ছিলাম। আমি নবীজির সঙ্গে দৌড়প্রতিযোগিতা করলাম, তখন তার আগে চলে গেলাম। অতঃপর কিছুদিন

৯৮৪. মুসনাদে আবু ইয়ালা মাওসিলি : ১৩/৮৯ (দারুল মামুন সংস্করণ)

৯৮৫. মাজমাউয যাওয়াইদ : হাদিস নং ৭৬৮৩, হাইসামি বলেন, আবু ইয়ালা হাদিসটি বর্ণনা করেছে, তার রাবিগণ সহিহ'র রাবি।

পর পুনরায় কোনো এক সুযোগে দৌড়প্রতিযোগিতা হলে, এবার তিনি আমার আগে চলে গেলেন। তখন তিনি বললেন, এটা ঐটার বদলা (অর্থাৎ সেদিন তুমি জিতেছিলে আর আজ আমি। তো দুজনই বরাবর)।[৯৮৬]

***

৯৮৬. সুনানে আবু দাউদ : হাদিস নং ২৫৭৮ (কিতাবুল জিহাদ, বাবুন ফিস সাবকি আলাররিজলি)

শ্রদ্ধানিবেদন... নবীজির তরে

হযরত কাব বিন যুবাইর রা. নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর শানে বলেন-

إن الرسول لَسيفٌ يُستضاءُ به * مُهنّدٌ من سُيوف الله مسلولُ

নিঃসন্দেহে রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সেই তরবারি, যার থেকে জ্যোতি লাভ করা যায়। তিনি আল্লাহ তায়ালার একটি কোষমুক্ত তরবারি।

মুতাযুদ্ধের বিখ্যাত শহীদ হজরত আবদুল্লাহ বিন রাওয়াহা রা. বলেন-

روحي الفداءُ لمن أخلاقُه شهدتْ * بأنه خيرُ مولودٍ مِنَ البَشر

আমার জান উৎসর্গ ঐ মহান ব্যক্তির জন্য, যার চরিত্রই সাক্ষ্য দেয় যে, তিনি পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ।

মাওলানা মুহাম্মদ কাসেম নানুতবি রহ. বলেন-

وے یہ رتبہ کہاں مشتِ خاکِ قاسم کا
کہ بن کے جائے ترے کوچہ اطہر میں بن کے غبار

ও অন্তরা, ধুলোসম তুচ্ছতর কাসেমের এমন মর্যাদা কোথায়, যে আপনার পবিত্রতম নগরীর ন্যূনতম ধূলিকণা হবে!

ডক্টর মুহাম্মদ ইকবাল রহ. বলেন-

وہ دانائے سبُل ، ختم الرسل، مولائے کل جس نے * غبارِ راہ کو بخشا فروغِ وادیٔ سینا
نگاہِ عشق و مستی میں وہی اوّل وہی آخر * وہی قرآں وہی فرقاں وہی یاسیں وہی طٰہٰ

(তিনি) সংবিধানপ্রণেতা, শেষনবী, সরদারে দুজাহান
তার পদধূলিতে ধন্য ওয়াদিল কুরা উপত্যকা
প্রেম ও মহব্বতে তিনিই প্রথম, তিনি শেষ
তিনিই কুরআন, তিনিই ফুরকান, তিনি ইয়াসিন-ত্বহা।

سلام بحضور خیر الانام ﷺ

সৃষ্টির শ্রেষ্ঠজনকে সালাম

সাইয়েদ নাফিস শাহ আল হুসাইনি রহ.

الٰہی محبوبِ کل جہاں کو، دل و جگر کا سلام پہنچے
نفس نفس کا دُرُود پہنچے، نظر نظر کا سلام پہنچے

ইলাহি, সৃষ্টিকুলের প্রিয়তমের কাছে পৌঁছে দিন হৃদয়ের সালাম
প্রতিটি আত্মার পক্ষ থেকে দুরুদ, প্রতিটি দৃষ্টির পক্ষ থেকে সালাম।

بساطِ عالم کی وسعتوں سے، جہانِ بالا کی رِفعتوں سے
ملک ملک کا درود اُترے، بشر بشر کا سلام پہنچے

আদিগন্ত বিস্তীর্ণ ভূমণ্ডল থেকে, অপার উচ্চতাময় পৃথিবী থেকে
ফেরেশতাকুলের পক্ষ থেকে, সমগ্র মানবজাহানের পক্ষ থেকে সালাম

حضور کی شام شام مہکے، حضور کی رات رات جاگے
ملائکہ کے حسیں جلو میں سحر سحر کا سلام پہنچے

নবীজিময় প্রতিটি সন্ধ্যা সুবাসিত, বিনিদ্র সব রজনী
ফেরেশতাকুলের বিভাময় জ্যোতিতে,
পৌঁছে যাক প্রতিটি ভোরের সালাম।

زبانِ فطرت ہے اس پہ ناطق، بارگاہِ نبی صادق
شجر شجر کا درود جائے، حجر حجر کا سلام پہنچے

স্বভাবজাত বাকশক্তি তাকে নিয়ে মুখর,
শ্রেষ্ঠ সত্যবাদী নবীজির দরবারে
প্রতিটি বৃক্ষলতার দুরুদ,
প্রতিটি পাথরখণ্ডের পক্ষ থেকে সালাম।

نبیٔ رحمت کا بارِ احساں، تمام خلقت کے دوش پر ہے
تو ایسے محسن کو بستی بستی، نگر نگر کا سلام پہنچے

সৃষ্টিকুলের স্কন্ধে স্কন্ধে মিশে আছে নবীজির দয়া আর ইহসান
প্রতিটি পক্ষীর পক্ষ থেকে তাকে সালাম,
প্রতিটি নগরীর পক্ষ থেকে সালাম।

مرا قلم بھی ہے ان کا صدقہ، مرے ہنر پر ہے ان کی رحمت
حضورِ خواجہ مرے قلم کا، مرے ہنر کا سلام پہنچے

আমার কলমও তারই অনুদান, আমার যোগ্যতাতেও তার অনুকম্পা
নবীজির প্রতি আমার কলম ও সমস্ত যোগ্যতার পক্ষ থেকে সালাম।

یہ التجا ہے کہ روزِ محشر، گناہ گاروں پہ بھی نظر ہو
شفیعِ اُمّت کو ہم غریبوں کی چشمِ تر کا سلام پہنچے

শুধু মিনতি এই যে– রোজ হাশরে পাপীদের ভিড়ে যেন তার নজর পাই
সৃষ্টিকুলের সুপারিশকারীকে আমি অভাজনের পক্ষ থেকে অশ্রুসজল সালাম।

نفیس کی بس دعا یہی ہے، فقیر کی اب صدا یہی ہے
سوادِ طیبہ میں رہنے والوں کو عمر بھر کا سلام پہنچے

নাফিসের প্রার্থনা শুধু এটিই,
অসহায়ের আকুতি কেবল এটিই
তায়বার ছায়ায় যে মহান মনীষীদের বাস,
তাদের প্রতি আজীবনের সালাম।

নবী-জীবনের সালভিত্তিক নকশা

কয়েকটি জ্ঞাতব্য :

১. সিরাতুন-নবী সংক্রান্ত প্রাচীন সূত্রগ্রন্থে বর্ণিত অধিকাংশ তারিখ মক্কি ক্যালেন্ডার অনুযায়ী। কারণ, ওই সময় এটিই সর্বাধিক প্রচলিত ছিল। এর অনেক প্রমাণ রয়েছে। কিন্তু কোনো তারিখ যদি কোনো দলিল বা ইঙ্গিত দ্বারা মাদানি ক্যালেন্ডারের অনুরূপ প্রমাণিত হয়, তা হলে সেই অনুপাতে খ্রিষ্টাব্দ তারিখও আবশ্যিকভাবেই পরিবর্তন হয়ে যাবে।

২. সালভিত্তিক নকশায় যেখানে তারিখের নিচে দাগ টানা হয়েছে, তার উদ্দেশ্য হলো, তারিখটি সিরাতবিদদের মতে প্রসিদ্ধ। অন্যদিকে সাধারণভাবে লিখিত তারিখগুলো ক্যালেন্ডারের হিসাবে, মৌসুমের বিভিন্ন ইঙ্গিত অনুসারে কিংবা অন্যান্য প্রমাণের ভিত্তিতে বের করা হয়েছে।

মক্কিযুগ (নবুওয়াতের পূর্বপর্যন্ত)

ঘটনা	মক্কি ক্যালেন্ডার (সৌর-চন্দ্র)	খ্রিষ্টাব্দ	মাদানি হিজরি ক্যালেন্ডার	নবীজির বয়স মক্কিক্যালেন্ডার
আবরাহার মক্কা আক্রমণ	১৮ রজব- (হিজরতের ৫৩ বছর পূর্বে)	২৩ মার্চ ৫৬৯ খ্রিষ্টাব্দ	১৮ মহররম (১৮ মহররম হিজরতের ৫৪ বছর ১০ মাস পূর্বে)	নবীজির জন্মের ৫০ দিন পূর্বে
শুভজন্ম	সোমবার ৮ রমজান (হিজরতের ৫৩ বছর ৪ মাস পূর্বে)	১৩ মে সোমবার ৫৬৯ খ্রিষ্টাব্দ	৮ রবিউল আওয়াল সোমবার	জন্মদিন
বক্ষবিদারণ	জন্মের ১ম বছর জন্মের ৩য় বছর	৫৭১ খ্রিষ্টাব্দ	(হিজরতের ৫৫ বছর পূর্বে)	২ বছর থেকে কিছু বেশি
দুধমা হালিমার নিকট থেকে প্রত্যাবর্তন	জন্মের ৫ম বছর	৫৭৩ খ্রিষ্টাব্দ		চার বছর থেকে কিছু বেশি
মায়ের ইনতেকাল	জন্মের ৭ম বছর	৫৭৫ খ্রিষ্টাব্দ		৬ বছর থেকে কিছু বেশি
দাদার ইনতেকাল	জন্মের ৯ম বছর শুরু, রমজান	৫৭৭ খ্রিষ্টাব্দ	জুমাদাল আখিরা জন্মের ৯ম বছর	৮ বছর থেকে কয়েকদিন বেশি
চাচা আবু তালেবের সঙ্গে শাম সফর	জন্মের ১৩ম বছর	এপ্রিল ৫৮২ খ্রিষ্টাব্দ		প্রায় সাড়ে ১২ বছর

চতুর্থ ফিজার যুদ্ধে অংশগ্রহণ	শাওয়াল জন্মের ১৬ম বছর	জুন ৫৮৪ খ্রিষ্টাব্দ		১৫ বছর এক মাস
বকরি চড়ানো	জন্মের ১৭ম বছর	৫৮৫ খ্রিষ্টাব্দ ৫৮৬ খ্রিষ্টাব্দ		১৬, ১৭বছর (আনুমানিক)
চাচা যুবাইরের সঙ্গে ইয়ামান সফর	জন্মের ১৯ম বছর	অক্টোবর, নভেম্বর ৫৮৭ খ্রিষ্টাব্দ		১৮ বছর থেকে বেশি (আনুমানিক)
হিলফুল ফুযুল চুক্তিতে অংশগ্রহণ	যিলকদ জন্মের ২১ম বছর	জুলাই ৫৮৯ খ্রিষ্টাব্দ		২০ বছর দুই মাস
ব্যবসার উদ্দেশ্যে দ্বিতীয়বার শাম সফর	রজব, শাবান জন্মের ২৫বছর	মার্চ, এপ্রিল ৫৯৩ খ্রিষ্টাব্দ		২৪বছর ১০মাস (আনুমানিক)
খাদিজার সঙ্গে বিবাহ	শাওয়াল জন্মের ২৬ বছর	জুন ৫৯৪ খ্রিষ্টাব্দ		২৫ বছর দুই মাস (আনুমানিক)
যায়নাব রা. এর জন্ম	নবীজির জন্মের ৩১ বছর শুরু নবুওয়াতের ১০ বছর পূর্বে	৫৯৯ খ্রিষ্টাব্দ		৩০ বছরের কিছু বেশি

রুকাইয়ার জন্ম	নবীজির জন্মের ৩৩ বছর শুরু নবুওয়াতের ৭ বছর পূর্বে	৬০২ খ্রিষ্টাব্দ		৩২ বছরের কিছু বেশি
কিছু গায়েবি আলোকরশ্মি অবলোকন	জন্মের ৩৩বছর শুরু নবুওয়াতের ৭ বছর পূর্বে	৬০২ খ্রিষ্টাব্দ		৩২, ৩৩ বছরের মাঝামাঝি
উম্মে কুলসুমের জন্ম	নবীজির জন্মের ৩৩ বছর শুরু নবুওয়াতের ৮ বছর পূর্বে	৬০৩ খ্রিষ্টাব্দ		৩৪ বছর
কাবা নির্মাণ এবং হাজরে আসওয়াদ পুনঃস্থাপন	১২ শাবান জন্মের ৩৬ বছর শুরু (নবুওয়াতের ৫ বছর পূর্বে)	এপ্রিল ৬০৪ খ্রিষ্টাব্দ	১২ রবিউল আওয়াল	৩৪ বছর ১১মাস
ফাতেমার জন্ম	শাবান জন্মের ৩৬বছর শুরু (নবুওয়াতের ৫ বছর পূর্বে)	এপ্রিল ৬০৪ খ্রিষ্টাব্দ	রবিউল আওয়াল	৩৪ বছর ১১ মাস
নবুওয়াতের আলামত প্রকাশ	জন্মের ৩৯, ৪০ বছর	৬০৮, ৬০৯ খ্রিষ্টাব্দ		৩৮, ৩৯ বছর
গারে হেরাতে একাকী ধ্যানমগ্নতা	জন্মের ৪০, ৪১ বছর	৬০৯, ৬১০ খ্রিষ্টাব্দ		৪০ বছর

***

মক্কি-যুগের পর নবুওয়াতপ্রাপ্তি

এটি নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়াতের ঘোষণার পর থেকে মদিনায় হিজরতের পূর্ব পর্যন্ত ঘটনাবলির সালভিত্তিক নকশা। মৌলিকভাবে ঘটনার তারিখ নির্ধারণের ক্ষেত্রে নবুওয়াতপ্রাপ্তির বছরের রমজান থেকে পরবর্তী রমজান হওয়া উচিত। কারণ, হাফেজ ইবনে কাসির রহ. এর অগ্রগণ্য মতটি সামনে রাখলে নবুওয়াতপ্রাপ্তির মাস রমজানই অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত হয়। কিন্তু অধিকাংশ ঐতিহাসিক এক্ষেত্রে মক্কি ক্যালেন্ডার তথা মহররম থেকে মহররমকে বছর হিসেবে গণনা করেছেন। আমরাও এই মত গ্রহণ করেছি, যেন সাধারণ পাঠক বিভিন্ন ক্যালেন্ডারের মাঝে বৈপরীত্য দেখে ঘাবড়ে না যান। কিন্তু এজন্য আমাদেরকে নবুওয়াতের প্রথম বছরকে এক বছর ষোলো মাস হিসেবে গণনা করতে হয়েছে।

সর্বোপরি এই বিষয়টিও মনে রাখতে হবে যে, নবুওয়াতের প্রতিটি মূলবর্ষ প্রসিদ্ধ বছর থেকে রমজানের চার মাস পূর্বেই পূর্ণ হয়ে যায় এবং কিছু বর্ণনাকারী এই হিসাবেই ঘটনা বর্ণনা করেন। এ কারণে এসব স্থানে নববি ৯ম বর্ষের যিলহজের দু'মাস পর নববি ৯ম বর্ষ সফর মাস, কিংবা নববি ৫ম বর্ষের শাবানের এক মাস পর নববি ৬ষ্ঠ বর্ষ রমজান মাস দেখে পেরেশান হবেন না। কারণ, মূল সময়কাল অনুযায়ী রমজানেই বছর পরিবর্তন হয়, মহররমে নয়। এই শুদ্ধ গণনার কারণে সিরাত-লেখকদের উল্লিখিত ঘটনাবলি কিছু তারিখের সঙ্গে মেলে না।

আমাদের উপর্যুক্ত নির্দেশনা সামনে রাখলে, সিরাতশাস্ত্রের এই জটিল বিষয়ে সৃষ্ট কিছু আপত্তি এবং বাহ্য বৈপরীত্য দূর করা আশাকরি সম্ভব হবে।

ঘটনা	মক্কিপঞ্জিকা	খ্রিষ্টাব্দ	মাদানিপঞ্জিকা	নবীজিররবয়স (মক্কিপঞ্জিকা)
নবুওয়াতের ১ম বছর				
প্রথম ওহী অবতীর্ণ	রমজান সোমবার, ৯ রমজান, নববি-বর্ষের সূচনা হিজরতের ১৩ বছর বছর ৪ মাস পূর্বে ৯ রবিউল আওয়াল (সৌর, চন্দ্র, বসন্ত ক্যালেন্ডার)	২৩ মার্চ ৫৬৯ খ্রিষ্টাব্দ	১৮ মহররম (হিজরতের ৫৪ বছর ১০ মাস পূর্বে)	মক্কি ক্যালেন্ডার মোতাবেক নবীজির ৪০ বছর পূর্ণ
গোপনে তাবলিগ আরম্ভ	রমজানের প্রারম্ভে ১ নববি বর্ষ	মে ৬০৯ খ্রিষ্টাব্দ		৪১ বছর শুরু
নবুওয়াতের ২য় বছর				
	মহররম শুরু	সেপ্টেম্বর ৬১০ খ্রিষ্টাব্দ		
নবুওয়াতের ৩য় বছর				
	মহররম শুরু	সেপ্টেম্বর ৬১১ খ্রিষ্টাব্দ		
প্রকাশ্য তাবলিগের সূচনা	নবুওয়াতের তিন বছর পূর্ণ হওয়ার পর -রমজান মাসে- হিজরতের ১০ বছর ৪ মাস পূর্বে	মে ৬১২ খ্রিষ্টাব্দ	রজব হিজরতের ১০ বছর বছর ৭ মাস পূর্বে	৪৩ বছর পূর্ণ

নবুওয়াতের ৪র্থ বছর				
	মহররম শুরু	সেপ্টেম্বর ৬১২ খ্রিষ্টাব্দ		
উকাজ বাজারে দাওয়াতে তাবলিগ	শাওয়াল	জুন ৬১৩ খ্রিষ্টাব্দ		
হজে আগতদের মধ্যে তাবলিগ শুরু	যিলহজ	আগস্ট ৬১৩ খ্রিষ্টাব্দ		
নবুওয়াতের ৫ম বছর				
	মহররম শুরু	সেপ্টেম্বর ৬১৩ খ্রিষ্টাব্দ		
প্রথম হাবশা হিজরত	রজব নববি ৫ম বর্ষ হিজরতের ৮বছর ৫মাস পূর্বে	মার্চ ৬১৪ খ্রিষ্টাব্দ	জুমাদাল আখিরা হিজরতের ৮বছর ৭মাস পূর্বে	৪৪ বছর ১০মাস
সুরা নাজ্‌ম নাজিল	রমজান নববি ৫ম বর্ষ	মে ৬১৪ খ্রিষ্টাব্দ		
হজরত হামজা এবং উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর ইসলামগ্রহণ	যিলহজ ৫ম নববি বর্ষ হিজরতের ৮বছর ১মাস পূর্বে	আগস্ট ৬১৪ খ্রিষ্টাব্দ	যিলকদ হিজরতের ৮বছর ৪ মাস পূবে	৪৫ বছর ৩মাস

নবুওয়াতের ৬ষ্ঠ বছর				
১ম হাবশা হিজরত থেকে প্রত্যাবর্তন	৬ষ্ঠ নববি বর্ষ শুরু (আনুমানিক)	হেমন্তকাল ৬১৪ খ্রিষ্টাব্দ (আনুমানিক)		
দ্বিতীয়বার হাবশা হিজরত	৬ষ্ঠ নববি বর্ষের শেষাংশ (আনুমানিক)	হেমন্তকাল ৬১৫ খ্রিষ্টাব্দ (আনুমানিক)		৪৬ বছরের নিকটবর্তী
নবুওয়াতের ৭ম বছর				
	মহররম	সেপ্টেম্বর ৬১৫ খ্রিষ্টাব্দ		
কুরাইশ প্রতিনিধিদলের নাজাশির দরবারে গমন	৭ম নববি বর্ষের শুরু			
আউস-খাযরাজের মাঝে 'বুআছ' যুদ্ধ	৭ম নববি বর্ষের মাঝামাঝি	৬১৬ খ্রিষ্টাব্দ এর শুরুর দিকে		৪৬ বছর কয়েক মাস
নবুওয়াতের ৮ম বছর				
শা'বে আবু তালেবে অবরুদ্ধ	মহররম ৮ম নববি বর্ষ	সেপ্টেম্বর ৬১৬ খ্রিষ্টাব্দ	মহররম	৪৭ বছর ৪ মাস
কাফেরদের সাথে হজরত আবু বকর রা. এর রোমানদের বিষয়ে চ্যালেঞ্জ	রমজান ৮ম নববি বর্ষ	মে ৬১৭ খ্রিষ্টাব্দ		

নবুওয়াতের ৯ম বছর				
হজরত আবু বকর রা. এর হাবশা রওনা এবং প্রত্যাবর্তন	মহররম	সেপ্টেম্বর ৬১৮ খ্রিষ্টাব্দ		
নবুওয়াতের ১০ম বছর				
	মহররম	সেপ্টেম্বর ৬১৮ খ্রিষ্টাব্দ		
শা'বে আবু তালেবে অবরোধ সমাপ্তি	১৫ রবিউল আখির ১০ম নববি বর্ষ	৯ ডিসেম্বর ৬১৮ খ্রিষ্টাব্দ	শাবান	৪৯ বছর ১০মাস
হজরত খাদিজার ইনতেকাল	১০ রমজান	৩০ মে ৬১৯ খ্রিষ্টাব্দ	শাওয়াল	৫০ বছর ২দিন
হজরত সাওদার সঙ্গে বিবাহ	রমজানের শেষের দিকে	জুনের মাঝামাঝি ৬১৯ খ্রিষ্টাব্দ	শাওয়ালের শেষের দিকে	৫০ বছর ১৫দিন
আবু তালেবের মৃত্যু	১৫ শাওয়াল	১৩জুলাই ৬১৯ খ্রিষ্টাব্দ	১৫ যিলকদ	৫০ বছর ১মাস ৭দিন
তায়েফ সফর শুরু	২৭ শাওয়াল	১৫জুলাই ৬১৯ খ্রিষ্টাব্দ	২৭ যিলকদ	৫০ বছর দেড় মাস
তায়েফ থেকে প্রত্যাবর্তন	২৩ যিলকদ	১০ আগস্ট ৬১৯ খ্রিষ্টাব্দ	২৩ যিলহজ	৫০বছর আড়াই মাস
চার আনসারির ইসলামগ্রহণ	যিলহজ	আগস্টের শেষদিকে ৬১৯ খ্রিষ্টাব্দ	মহররম	৫০বছর ৩ মাস

নবুওয়াতের ১১তম বছর				
	মহররম	সেপ্টেম্বর ৬১৯ খ্রিষ্টাব্দ		
হজরত আয়েশার সঙ্গে বিবাহ	শাওয়াল	জুন ৬২০ খ্রিষ্টাব্দ	যুলকাদা	৫১ বছর ১ মাস
প্রথম বাইয়াতে আকাবা	যিলহজ	আগস্টের মাঝামাঝি ৬২০ খ্রিষ্টাব্দ	মহররম	৫১ বছর ৩ মাস
নবুওয়াতের ১২তম বছর				
	মহররম	সেপ্টেম্বর ৬২০ খ্রিষ্টাব্দ		
মেরাজের সফর	২৭ রজব	২৬ এপ্রিল ৬২১ খ্রিষ্টাব্দ	২৭ রমজান	৫১ বছর ১০ মাস ৩ দিন
আকাবার দ্বিতীয় বাইয়াত	যিলহজ	সেপ্টেম্বরের শুরুর দিকে ৬২১ খ্রিষ্টাব্দ	সফর	৫২ বছর ৩ মাস
নবুওয়াতের ১৩তম বছর				
	মহররম	সেপ্টেম্বরের শেষদিকে, ৬২২ খ্রিষ্টাব্দ		
সাহাবিদের মদিনা হিজরত	শাবান থেকে যিলকদ পর্যন্ত	এপ্রিল ৬২২ খ্রিষ্টাব্দ থেকে জুলাই ৬২২ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত	শাওয়াল থেকে মহররম পর্যন্ত	৫৩ বছর কিছু বেশি

মাদানি-যুগ

মাদানিযুগের একটি সুস্পষ্ট পরিবর্তন লক্ষ করবেন যে, এ সময়ের সকল ঘটনা অধিক পরিমাণে সংরক্ষিত। মক্কিযুগের পুরো সময়ের এক-দুটি ঘটনাই এমন পাওয়া যায়, যার দিন কিংবা তারিখ সুনির্দিষ্টভাবে জানা যায়। সাধারণত সাল, সর্বোচ্চ সালের সঙ্গে মাসটা উল্লেখ থাকে। অন্যদিকে মাদানিযুগের একই বছরের একাধিক ঘটনা দিন-তারিখসহ সংরক্ষিত আছে।

এই যুগে এসে মক্কি ক্যালেন্ডারের পাশাপাশি মাদানি ক্যালেন্ডারও ব্যবহার হতে থাকে। এজন্য এখানে মক্কি ক্যালেন্ডারের সাথে সাথে মাদানি ক্যালেন্ডারের উপর নির্ভরকারী রেওয়ায়েতও পাওয়া যায়। বিভিন্ন বছরকে হিজরি বছর হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। তবে এখানে একটি পেরেশানির বিষয় হলো, বর্ণনাকারী হিজরি সালের সূচনা ও শেষ কখনো মক্কি ক্যালেন্ডার, কখনোবা মাদানি ক্যালেন্ডার অনুযায়ী উল্লেখ করে থাকেন। কোনোটা সুনির্দিষ্ট না হওয়ার দরুন আজও সিরাতের ঘটনাবলির সময় ও তারিখ নির্ধারণে বিভিন্ন ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হয়।

বক্ষ্যমাণ নকশাতে সেই দ্বন্দ্ব নিরসনের যথাসাধ্য চেষ্টা করা হয়েছে। মক্কি ক্যালেন্ডার, যা 'নাসি' তথা মাস পিছিয়ে দেওয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল, বিদায় হজের সময় তা রহিত হয়ে যায়। তাই এর পূর্বের যুগের ক্ষেত্রে মক্কি ক্যালেন্ডারকে চিহ্নিত করে দেখিয়ে দেওয়া হয়েছে।

ঘটনা	মক্কিপঞ্জিকা	খ্রিষ্টাব্দ	মাদানিপঞ্জিকা	নবীজির বয়স মক্কিপঞ্জিকা মোতাবেক
প্রথম ওহী অবতীর্ণ	যিলকদ	শুক্রবার ১৬ জুলাই ৬২২ খ্রিষ্টাব্দ	হিজরি বছরের সূচনা ১ মহররম	
গারে সাওরে নবীজির আত্মগোপন	২৭ যিলহজ	১০ সেপ্টেম্বর ৬২২ খ্রিষ্টাব্দ	২৭ সফর শুক্রবার ১ম হিজরি	৫৩ বছর ৫ মাস ২০দিন
মক্কিবর্ষ -১ হিজরতের সূচনা ১ মহররম = সোমবার ১৩ সেপ্টেম্বর ৬২২ খ্রিষ্টাব্দ				
গারে সাওর থেকে রওনা	১ মহররম	১৩ সেপ্টেম্বর ৬২২ খ্রিষ্টাব্দ	১ রবিউল আওয়াল সোমবার ১ম হিজরি	৫৩ বছর ৫ মাস ২৩ দিন
কুবায় আগমন এবং মসজিদে কুবার নির্মাণ	৮ মহররম	২০ সেপ্টেম্বর ৬২২ খ্রিষ্টাব্দ সোমবার	৮ রবিউল আওয়াল সোমবার ১ম হিজরি	৩ বছর ৬ মাস পূর্ণ
মসজিদে বনু সালিমে প্রথম জুমা	১২ মহররম	২৪ সেপ্টেম্বর ৬২২ খ্রিষ্টাব্দ	১২ রবিউল আওয়াল শুক্রবার ১ম হিজরি	
মদিনায় প্রথম আগমন	১২ মহররম	১৭ অক্টোবর শুক্রবার ৬২২ খ্রিষ্টাব্দ	১২ রবিউল আওয়াল ১ম হিজরি	

কুবা ছেড়ে স্থায়ীভাবে মদিনায় আগমন	২২ মহররম (কুবা'তে চৌদ্দদিন অবস্থান সমাপ্তি)	২৪ অক্টোবর ৬২২ খ্রিষ্টাব্দ	২২ রবিউল আওয়াল সোমবার ১ম হিজরি	
মসজিদে নববি ভিত্তিপ্রস্তর		অক্টোবরের শুরুতে ৬২২ খ্রিষ্টাব্দ	রবিউল আওয়ালের শেষদিকে ১ম হিজরি	
সারিয়া হামজা বিন আবদুল মুত্তালিব	রজব	মার্চ ৬২৩ খ্রিষ্টাব্দ	রমজান ১ম হিজরি	৫৩ বছর ১০ মাস পূর্ণ
সারিয়া উবাইদা বিন হারিস	শাবান	এপ্রিল ৬২৩ খ্রিষ্টাব্দ	শাওয়াল ১ম হিজরি	৫৪বছর ১মাস
আয়েশাকে নবীজির স্ত্রী হিসেবে উঠিয়ে নেওয়া	শাওয়াল	জুন ৬২৩ খ্রিষ্টাব্দ	যিলহজ	৫৪বছর ১মাস
মাদানিবর্ষ –২ হিজরতের সূচনা ১ মহররম = মঙ্গলবার ৫জুলাই ৬২৩ খ্রিষ্টাব্দ				
মক্কিবর্ষ –২ হিজরতের সূচনা ১ মহররম = ১২ অক্টোবর ৬২৩ খ্রিষ্টাব্দ				
গাজওয়া আবওয়া, যাতুল আশিরা (এক সফরে দুই অভিযান)	সফর	নভেম্বর ৬২৩ খ্রিষ্টাব্দ	জুমাদাল উলা ২য় হিজরি	৫৪ বছর ২ মাস

কুরয বিন জাবেরের অতর্কিত মদিনা আক্রমণ	রবিউল আওয়াল	ডিসেম্বর ৬২৩ খ্রিষ্টাব্দ	জুমাদাল আখিরা ২য় হিজরি	৫৪ বছর ৭ মাস
গাজওয়া বুওয়াত	রবিউল আখের	জানুয়ারি ৬২৪ খ্রিষ্টাব্দ	রজব ২য় হিজরি	৫৪ বছর ৮ মাস
কিবলা পরিবর্তন	জুমাদাল উলা	ফেব্রুয়ারি ৬২৪ খ্রিষ্টাব্দ	শাবান ২য় হিজরি	৫৪ বছর ৯ মাস
সারিয়া আবদুল্লাহ বিন জাহাশ	জুমাদাল আখিরা, রজব	মার্চ ৬২৪ খ্রিষ্টাব্দ	রমজান ২য় হিজরি	৫৪ বছর ১০ মাস
গাজওয়া ইয়ানবু	শাবানের শুরুদিকে	মে মাসের শুরুর দিকে ৬২৪ খ্রিষ্টাব্দ	যিলকদ ২য় হিজরি	৫৪ বছর ১১ মাস
গাজওয়া বনু গিফার ও বনু আসলাম	মধ্য শাবান	মে মাসের মাঝামাঝি ৬২৪ খ্রিষ্টাব্দ		৫৪ বছর ১১ মাস
রমজানের রোজা ফরজ হওয়া	শাবান	মে ৬২৪ খ্রিষ্টাব্দ		৫৪ বছর ১১ মাস

গাজওয়া বদর	১৭ রমজান শুক্রবার	১২ জুন ৬২৪ খ্রিষ্টাব্দ	১৭ যিলহজ ২য় হিজরি	৫৫ বছর ৯ দিন
রুকাইয়ার ইনতেকাল	বদরযুদ্ধে বিজয়ের সংবাদ মদিনায় পৌঁছার পূর্বে (আনুমানিক ১৯ রমজান)	১৫ জুন ৬২৪ খ্রিষ্টাব্দ		৫৫ বছর ৯ দিন
ফাতেমাকে আলির বধূ হিসেবে ঘরে উঠিয়ে নেওয়া	রমজানের শেষ দশকে	জুনের শেষে ৬২৪ খ্রিষ্টাব্দ	যিলহজের শেষাংশে ২য় হিজরি	৫৫ বছর ১৫দিনের কাছাকাছি
সদকা ফিতর ও জাকাতের বিধান অবতীর্ণ	২৭ রমজান	২২জুন ৬২৪ খ্রিষ্টাব্দ	২৮ যিলহজ ২য় হিজরি	৫৫ বছর ১৯ দিন
মাদানিবর্ষ -৩ হিজরতের সূচনা ১ মহররম = এক সপ্তাহ ২৩ জুন ৬২৪ খ্রিষ্টাব্দ				
প্রথম ঈদুল ফিতরের নামাজ	১ শাওয়াল	২৩ জুন ৬২৪ খ্রিষ্টাব্দ	১ মহররম ৩য় হিজরি	৫৫বছর ২২ দিন
গাজওয়ায়ে বনু কাইনুকা'র সূচনা	১৪ শাওয়াল ২হিজরি	৭ জুলাই ৬২৪ খ্রিষ্টাব্দ	১৪ মহররম ৩য় হিজরি	৫৫ বছর ১ মাস ৬ দিন

গাজওয়া বনু কাইনুকার সমাপ্তি	২৯ শাওয়াল ২হিজরি	২২ জুলাই ৬২৪ খ্রিষ্টাব্দ	২৯ মহররম ৩য় হিজরি	৫৫ বছর ১ মাস ২১ দিন
গাজওয়া সাবীক	৫ যিলহজ ২হিজরি	২৬ আগস্ট ৬২৪ খ্রিষ্টাব্দ	৫ রবিউল আওয়াল ৩য় হিজরি	৫৫ বছর ২ মাস ২৬ দিন
প্রথম ঈদুল আযহার নামাজ	১০ যিলহজ ২হিজরি	২৬ আগস্ট শুক্রবার ৬২৪ খ্রিষ্টাব্দ	১০ রবিউল আওয়াল ৩য় হিজরি	৫৫ বছর ৩ মাস ২ দিন
কাব বিন আশরাফের হত্যা	১৪ যিলহজ ২য় হিজরি	৪ সেপ্টেম্বর ৬২৪ খ্রিষ্টাব্দ	১৪রবিউল আওয়াল ৩য় হিজরি	৫৫ বছর ৩ মাস ৬ দিন
মক্কিবর্ষ -৩ হিজরতের সূচনা ১ মহররম = বৃহস্পতিবার ২০ সেপ্টেম্বর ৬২৪ খ্রিষ্টাব্দ				
সারিয়া যায়েদ বিন হারিসা যু-কারওয়া (ইরাকের বড় সড়ক)	রবিউল আওয়াল ৩য় হিজরি	নভেম্বর ৬২৪ খ্রিষ্টাব্দ	জুমাদাল আখেরাহ	৫৫ বছর ৬ মাস
উম্মে কুলসুমের বিবাহ	রবিউল আওয়াল ৩য় হিজরি	নভেম্বর ৬২৪ খ্রিষ্টাব্দ	জুমাদাল আখেরা	৫৫ বছর ৩ মাস
গাজওয়া উহুদ	রজব ৩য় হিজরি	৩০ মার্চ ৬২৫ খ্রিষ্টাব্দ	১৫ শাওয়াল ৩য় হিজরি	৫৫ বছর ১০ মাস ৭ দিন

গাজওয়া উহুদ	রজব ৩য় হিজরি	৩০ মার্চ ৬২৫ খ্রিষ্টাব্দ	১৫ শাওয়াল ৩য় হিজরি	৫৫ বছর ১০ মাস ৭ দিন
গাজওয়া হামরাউল আসাদ		৩১ মার্চ ৬২৫ খ্রিষ্টাব্দ	১৬ শাওয়াল ৩য় হিজরি	৫৫ বছর ১০ মাস ৮ দিন
মাদানিবর্ষ -৪ হিজরতের সূচনা ১ মহররম = বৃহস্পতিবার ১৩ জুন ৬২৫ খ্রিষ্টাব্দ				
সারিয়া রাজি সাহাবিদের বন্দিত্ব বরণ	যুলকাদা ৩য় হিজরি	জুলাই ৬২৫ খ্রিষ্টাব্দ	সফর ৩য় হিজরি	৫৬ বছর ২ মাস
মক্কিবর্ষ -৪ হিজরতের সূচনা ১ মহররম = সোমবার ৯ সেপ্টেম্বর ৬২৫ খ্রিষ্টাব্দ				
রাজি ট্রাজেডি -সাহাবিদের হত্যা-	সফর ৪ হিজরি	অক্টোবর ৬২৫ খ্রিষ্টাব্দ	জুমাদাল উলা ৪ হিজরি	৫৬ বছর ৫ মাস
বি'রে মাউনার মর্মান্তিক হত্যাকাণ্ড	সফর ৪ হিজরি	অক্টোবর ৬২৫ খ্রিষ্টাব্দ	জুমাদাল উলা ৪র্থ হিজরি	৫৬ বছর ৬ মাস
গাজওয়া বনু লাহয়ান (১৪ দিনের সফর)	সফর ৪ হিজরি	অক্টোবর ৬২৫ খ্রিষ্টাব্দ	জুমাদাল উলা ৪র্থ হিজরি	৫৬ বছর ৬ মাস
গাজওয়া বনু নাজির (২৩ দিনের অভিযান)	১২ রবিউল আওয়াল ৪ হিজরি	১৯ নভেম্বর ৬২৫ খ্রিষ্টাব্দ	জুমাদাল আখিরা ৪র্থ হিজরি	৫৬ বছর ৬ মাস

গাজওয়া বনু নাজির, সমাপ্তি (২৩ দিনের অভিযান)	৫ রবিউল আখেরা ৪ হিজরি	১১ ডিসেম্বর ৬২৫ খ্রিষ্টাব্দ	৫ রজব ৪র্থ হিজরি	৫৬ বছর ৭ মাস
গাজওয়া বদরুল মাওয়িদ	শাবান ৪ হিজরি	এপ্রিল ৬২৬ খ্রিষ্টাব্দ	যিলকদ ৪র্থ হিজরি	৫৬ বছর ১১ মাস
সারিয়া আবদুল্লাহ বিন আতিক	৪ রমজান যাত্রা শুরু	৬ মে ৬২৬ খ্রিষ্টাব্দ	যাত্রাশুরু ৪ যিলহজ ৪র্থ হিজরি	৫৬ বছর ১১ মাস ২৫ দিন
ইহুদি আবু রাফেকে হত্যা	হত্যার তারিখ ৯ রমজান ৪হি. (আনুমানিক)	হত্যার তারিখ ১১ মে ৬২৬ খ্রিষ্টাব্দ (আনুমানিক)	হত্যার তারিখ ৯ যিলহজ ৪র্থ হিজরি (আনুমানিক)	
সারিয়া আবদুল্লাহ বিন আতিকের প্রত্যাবর্তন	প্রত্যাবর্তন ১৪ রমজান ৪হি.	১৬ মে ৬২৬ খ্রিষ্টাব্দ	যিলহজ ৪র্থ হিজরি প্রত্যাবর্তন	৫৭ বছর ৬ দিন
মাদানিবর্ষ -৫ হিজরতের সূচনা ১ মহররম = সোমবার ২ জুন ৬২৬ খ্রিষ্টাব্দ				
গাজওয়া দাওমাতুল জানদাল যাত্রা (২৪ দিনের অভিযান)	২৫ যিলকদ ৪ হিজরি	২৪ জুলাই ৬২৬ খ্রিষ্টাব্দ	২৫ রবিউল আওয়াল ৫ম হিজরি	৫৭ বছর ২মাস ১৭ দিন

গাজওয়া দাওমাতুল জানদাল (প্রত্যাবর্তন)	২০ যিলহজ ৪ হিজরি	১৭ আগস্ট ৬২৬ খ্রিষ্টাব্দ	২০ রবিউল আখের ৫ম হিজরি	৫৭ বছর ৩ মাস ১২ দিন
মক্কিবর্ষ -৫ হিজরতের সূচনা ১ মহররম = রবিবার ২৮ সেপ্টেম্বর ৬২৬ খ্রিষ্টাব্দ				
চন্দ্রগ্রহণ		৯ নভেম্বর ৬২৬ খ্রিষ্টাব্দ	জুমাদাল আখিরা	
গাজওয়া মুরাইসি (গাজওয়া বনু মুসতালিক যাত্রা)	২ রবিউল আখের ৫ হিজরি	২৭ ডিসেম্বর ৬২৬ খ্রিষ্টাব্দ	২ শাবান ৫ হিজরি	৫৭ বছর ২মাস ২৪ দিন
২৯দিন পর প্রত্যাবর্তন	১ জুমাদাল উলা ৫ হিজরি	২৫ জানুয়ারি ৬২৬ খ্রিষ্টাব্দ	১ রমজান ৫ হিজরি	৫৭ বছর ৭মাস ২৩ দিন
ইফকের (আয়েশার প্রতি অপবাদের) ঘটনা	জুমাদাল উলা ৫ হিজরি	জানুয়ারি ৬২৭ খ্রিষ্টাব্দ	রমজান ৫ হিজরি	৫৭ বছর ৮মাস
গাজওয়া খন্দক -পরিখা খনন আরম্ভ- (মোট খননকাল ১৫দিন)	২৫ জুমাদাল উলা ৫ হিজরি	১৮ ফেব্রুয়ারি ৬২৭ খ্রিষ্টাব্দ	২৫রমজান ৫ হিজরি	৫৭ বছর ৮মাস ১৭দিন

খননকার্য সম্পন্ন	১০ জুমাদাল আখিরা ৫ হিজরি	৪ মার্চ ৬২৭ খ্রিষ্টাব্দ	১০ শাওয়াল ৫ হিজরি	৫৭ বছর ৯মাস ২০দিন
গাজওয়া খন্দক অবরোধ শুরু (সময়কাল ২১দিন)	১১ জুমাদাল আখিরা ৫ হিজরি	৫ মার্চ ৬২৭ খ্রিষ্টাব্দ	১১শাওয়াল ৫ হিজরি	৫৭বছর ৯ মাস ৩০ দিন
অবরোধ সমাপ্তি	১ রজব ভোর ৫ হিজরি	২৫ মার্চ ৬২৭ খ্রিষ্টাব্দ	১ যুলকাদা ৫ হিজরি	৫৭বছর ৯মাস ২৪দিন
গাজওয়ায়ে বনু কুরাইজা অবরোধ শুরু (সময়কাল ২৫দিন)	১ রজব সন্ধ্যা ৫ হিজরি	২৫মার্চ ৬২৭ খ্রিষ্টাব্দ	১ যিলকদ ৫ হিজরি	৫৭ বছর ৯মাস ২৪দিন
গাজওয়ায়ে বনু কুরাইজা অবরোধ শুরু (সময়কাল ২৫দিন)	১ রজব সন্ধ্যা ৫ হিজরি	২৫মার্চ ৬২৭ খ্রিষ্টাব্দ	১ যিলকদ ৫ হিজরি	৫৭ বছর ৯মাস ২৪দিন
অবরোধ সমাপ্তি	২৬ রজব ৫ হিজরি	১৯এপ্রিল ৬২৭ খ্রিষ্টাব্দ	২৬ যিলকদ ৫ হিজরি	৫৭ বছর ১০ মাস ১৭ দিন
মক্কায় দুর্ভিক্ষ শুরু	শাবান ৫ হিজরি (আনুমানিক)	বসন্তকাল ৬২৭ খ্রিষ্টাব্দ	যিলহজ ৫ হিজরি (আনুমানিক)	
মাদানিবর্ষ -৬ হিজরতের সূচনা ১ মহররম = শুক্রবার ২২ মে ৬২৭ খ্রিষ্টাব্দ				

সারিয়া উক্কাশা বিন মুহসিন -গামরে মারযুক অভিযান-	যিলকদ ৫ হিজরি	জুলাই ৬২৭ খ্রিষ্টাব্দ	রবিউল আওয়াল ৬ হিজরি	
সারিয়া মুহাম্মদ বিন মাসলামা -যুলকাসসা অভিযান-	যিলহজ ৫ হিজরি	আগস্ট ৬২৭ খ্রিষ্টাব্দ	রবিউল আখের ৬ হিজরি	
মক্কিবর্ষ -৬ হিজরতের সূচনা ১ মহররম = বৃহস্পতিবার ১৭ সেপ্টেম্বর ৬২৭ খ্রিষ্টাব্দ				
সারিয়া যায়েদ বিন হারিসা -আবুল আস বিন রাবির গ্রেফতারি এবং ইসলামগ্রহণ			জুমাদাল উলা ৬ হিজরি	
উম্মে কিরফার হত্যা		জানুয়ারি ৬২৮ খ্রিষ্টাব্দ	রমজান ৬ হিজরি	
খাইবার সরদার ইয়াসির বিন রিজামকে হত্যা		ফেব্রুয়ারি ৬২৮ খ্রিষ্টাব্দ	শাওয়াল ৬ হিজরি	

গাজওয়া হুদাইবিয়া (মদিনা থেকে রওনা)	১ রজব	১৩ মার্চ ৬২৮ খ্রিষ্টাব্দ	১ যিলকদ ৬ হিজরি	৫৮ বছর ৯ মাস ২২ দিন
হুদাইবিয়া সন্ধির পর মদিনায় প্রত্যাবর্তন	২৯ শাবান ৬ হিজরি	১০ মে ৬২৮ খ্রিষ্টাব্দ	২৯ যিলহজ ৬ হিজরি	৫৮ বছর ১১ মাস ২১ দিন
মাদানিবর্ষ -৭ **হিজরতের সূচনা ১ মহররম = বুধবার ১১মে ৬২৮ খ্রিষ্টাব্দ**				
গাজওয়া যি কারদ সালামা বিন আকওয়ার বীরত্ব	রমজানের প্রারম্ভে	মে'র মাঝা-মাঝিতে ৬২৮ খ্রিষ্টাব্দ	মহররমের শুরু ৭ম হিজরি	৫৯ বছর
গাজওয়া খাইবার (রওনা)	রমজানের প্রারম্ভে	মে'র মাঝা-মাঝিতে ৬২৮ খ্রিষ্টাব্দ	মহররমের শুরু ৭ম হিজরি	৫৯ বছর থকে কিছু দিন বেশি
গাজওয়া ফাদাক এবং ওয়াদিল কুরা	যিলকদ	জুলাই ৬২৮ খ্রিষ্টাব্দ	রবিউল আওয়াল ৭ম হিজরি	৫৯ বছর ২মাস থেকে কিছু বেশি
বাদশাহদের প্রতি ইসলামের দাওয়াত		মে, জুন, জুলাই ৬২৮ খ্রিষ্টাব্দ	মহররম, সফর, রবিউল আওয়াল, ৭ম হিজরি	৫৯ বছর থেকে কিছু দিন বেশি

খাইবার এবং ফাদাকের অভিযান থেকে প্রত্যাবর্তন	১ যিলহজ	১৭ আগস্ট ৬২৮ খ্রিষ্টাব্দ	১ রবিউল আখের	৫৯ বছর ২ মাস ২২ দিন
মক্কিবর্ষ -৭ হিজরতের সূচনা ১ মহররম = বুধবার ৫ অক্টোবর ৬২৮ খ্রিষ্টাব্দ - ১ জুমাদাল উলা ৭হিজরি				
গাজওয়া যাতুর রিকা (যাত্রা)	১১ মহররম ৭ হিজরি	১৫ অক্টোবর ৬২৮ খ্রিষ্টাব্দ	১১ জুমাদাল উলা ৭ম হিজরি	৫৯ বছর ৪মাস ৩দিন
প্রত্যাবর্তন	২৫ মহররম ৭ হিজরি	২৯ অক্টোবর ৬২৮ খ্রিষ্টাব্দ	২৫ জুমাদাল উলা ৭ম হিজরি	৫৯ বছর ৪মাস ৭দিন
সুমামা বিন আছালের ইসলামগ্রহণ এবং মক্কার খাদ্যরফতানি পথরুদ্ধ	মহররমের শেষদিকে ৭ম হিজরি	নভেম্বরের শুরুর দিকে ৬২৮ খ্রিষ্টাব্দ	জুমাদাল উলার শেষদিকে ৭ম হিজরি	
কিসরা পারভেজের হত্যা		১০ ফেব্রুয়ারি ৬২৯ খ্রিষ্টাব্দ	১০ শাওয়াল ৭ম হিজরি	
উমরাতুল কাযার জন্য রওনা	১ রজব ৭ম হিজরি	মার্চ ৬২৯ খ্রিষ্টাব্দ	১ যিলকদ ৭ম হিজরি	৫৯ বছর ৯মাস ২২ দিন

মাদানিবর্ষ -৮ হিজরতের সূচনা ১ মহররম = ১ মে ৬২৯ খ্রিষ্টাব্দ				
যায়নাব রা. এর ইনতেকাল	রমজান	মে ৬২৯ খ্রিষ্টাব্দ	মহররমের শুরুর দিকে ৮ হিজরি	৬০ বছর পূর্ণ
মুতাযুদ্ধে রওনা	যিলহজ	আগস্ট ৬২৯ খ্রিষ্টাব্দ	জুমাদাল উলা	
মক্কিবর্ষ -৮ হিজরি বর্ষের সূচনা ১ মহররম = সোমবার ২৫ সেপ্টেম্বর ৬২৯ খ্রিষ্টাব্দ - জুমাদাল আখিরা ৮হিজরি - নবীজির বয়স ৬০ বছর ২ মাস				
যাতুস সালাসিল যুদ্ধ	জুমাদাল আখিরা	ফেব্রুয়ারি ৬৩০ খ্রিষ্টাব্দ	যিলকদ	
মাদানিবর্ষ -৯ হিজরতের সূচনা ১ মহররম = শাবান, শুক্রবার ২০ এপ্রিল ৬৩০ খ্রিষ্টাব্দ				
মক্কা বিজয়ের জন্য রওনা	১০ রমজান ৮ হিজরি	২৯ মে ৬৩০ খ্রিষ্টাব্দ	২৯ মে ৬৩০ খ্রিষ্টাব্দ	৬০ বছর ২ দিন
মক্কা বিজয়	১৭ রমজান ৮ম হিজরি	৫ জুন ৬৩০ খ্রিষ্টাব্দ	সফর ৯ হিজরি	৬০ বছর ৯ দিন
গাজওয়া হুনাইন	১৪ শাওয়াল ৮ম হিজরি	১ জুলাই ৬৩০ খ্রিষ্টাব্দ	সফর ৯ হিজরি	৬০ বছর ১ মাস ৪ দিন

গাজওয়া তায়েফ	শাওয়াল, যিলকদ ৮ম হিজরি	জুলাই, আগস্ট ৬৩০ খ্রিষ্টাব্দ	রবিউল আওয়াল, রবিউল আখের ৯ হিজরি	৬০ বছর ২ মাস
ইবরাহিম বিন মুহাম্মদ সা. এর জন্ম	যিলহজ ৮ম হিজরি	আগস্ট ৬৩০ খ্রিষ্টাব্দ		
আত্তাব বিন উসাইদের নেতৃত্বে হজ	যিলহজ ৮ম হিজরি	আগস্ট ৬৩০ খ্রিষ্টাব্দ	জুমাদাল উলা ৯ হিজরি	
মক্কিবর্ষ -৯ হিজরি বর্ষের সূচনা ১ মহররম = শুক্রবার ১৪ সেপ্টেম্বর ৬৩০ খ্রিষ্টাব্দ - জুমাদাল আখিরা				
প্রতিনিধিদের আগমন	বিভিন্ন মাসে			৬১ বছর থেকে বেশি
মাদানিবর্ষ -১০ হিজরি বর্ষের সূচনা ১ মহররম = মঙ্গলবার ৯ এপ্রিল ৬৩১ খ্রিষ্টাব্দ - রজব				
গাজওয়া তাবুক রওনা	বৃহস্পতিবার ৩ রজব ৯ হিজরি	১১ এপ্রিল ৬৩১ খ্রিষ্টাব্দ	মহররম ১০ হিজরি	৬১ বছর ৯ মাস ২৪দিন
গাজওয়া তাবুক থেকে প্রত্যাবর্তন	রমজান ৯ হিজরি	জুন ৬৩১ খ্রিষ্টাব্দ	রবিউল আওয়াল ১০ হিজরি	৬২বছর পূর্ণ
আবু বকর রা. এর নেতৃত্বে হজ	৯ যিলহজ ৯ হিজরি	১২ সেপ্টেম্বর ৬৩১ খ্রিষ্টাব্দ	জুমাদাল আখিরা ১০ হিজরি	৬২বছর ৩মাস ১দিন

মক্কিবর্ষ -১০ হিজরি বর্ষের সূচনা ১ মহররম = বৃহস্পতিবার ১৩ অক্টোবর ৬৩১ খ্রিষ্টাব্দ - রজব ১০হি.				
ইবরাহিম বিন বিন মুহাম্মদ সা. এর ইনতেকাল	মঙ্গলবার ১০ রবিউল আওয়াল	১০ ডিসেম্বর ৬৩১ খ্রিষ্টাব্দ	রমজান	৬২বছর ৬মাস ২দিন
প্রতিনিধিদের আগমন	বিভিন্ন মাসে			
বিদায় হজের জন্য যুল হুলাইফা থেকে রওনা		২৩ ফেব্রুয়ারি ৬৩২ খ্রিষ্টাব্দ	২৬ যিলকদ ১০ হিজরি	৬২বছর ৮মাস ১৮দিন
মক্কায় প্রবেশ		২ মার্চ ৬৩২ খ্রিষ্টাব্দ	৪ যিলহজ ১০ হিজরি	৬২বছর ৮মাস ২৬দিন
বিদায় হজ আরাফার দিন	৯ জুমাদাল আখিরা ১০ হিজরি	৭ মার্চ ৬৩২ খ্রিষ্টাব্দ	৯ যিলহজ ১০ হিজরি	৬২বছর ৯মাস ১দিন
মক্কিবর্ষ -(রহিত) শুক্রবার ১০ হিজরি				
গাদিরে খুম এর বক্তব্য		১৬ মার্চ ৬৩২ খ্রিষ্টাব্দ	১৮ যিলহজ ১০ হিজরি	৬২বছর ১০মাস ২২দিন
মাদানিবর্ষ -১১ হিজরি বর্ষের সূচনা ১ মহররম = ২৮ মার্চ ৬৩২ খ্রিষ্টাব্দ - ১ রজব				
উসামা বিন যায়েদ রা.কে সেনাপতি নিয়োগ	২৯ শাবান	২৫ মে ৬৩২ খ্রিষ্টাব্দ	২৯ সফর ১১ হিজরি	৬২বছর ১১মাস ২২দিন

অফাতপূর্ব অসুস্থতা শুরু		২৫ মে ৬৩২ খ্রিষ্টাব্দ	২৯ সফর সোমবার ১১ হিজরি	৬২ বছর ১১ মাস ২২ দিন
উসামার বাহিনীর যাত্রা	২ রমজান	২৮ মে ৬৩২ খ্রিষ্টাব্দ	বৃহস্পতিবার ২ রবিউল আওয়াল	৬২ বছর ১১ মাস ২৪ দিন
কিরতাসের ঘটনা		৪ জুন ৬৩২ খ্রিষ্টাব্দ	বৃহস্পতিবার ৮ রবিউল আওয়াল	৬৩ বছর পূর্ণ
মসজিদে নববিতে শেষবার আগমন এবং উম্মতের প্রতি শেষ নসিহত		৬ জুন ৬৩২ খ্রিষ্টাব্দ	শুক্রবার ১০ রবিউল আওয়াল	৬৩ বছর ২ দিন
রাসুলুল্লাহ সা. এর অফাত	১২ রমজান	৮ জুন ৬৩২ খ্রিষ্টাব্দ	সোমবার ১২ রবিউল আওয়াল দ্বিপ্রহরের পর ১১ হিজরি	৬৪ বছর ৪দিন **জ্ঞাতব:** চন্দ্রবর্ষ হিসেবে নবীজির বয়স ৬৫ বছর ৪ দিন হয়
দাফন	১৩ রমজান	৯ জুন ৬৩২ খ্রিষ্টাব্দ	১৩ রবিউল আওয়াল মঙ্গল ও বুধবার মধ্যবর্তী রাতে	

৬৩ বছর ২ দিন

হিজরি সালভিত্তিক কিছু গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা

হিজরি-১ (৬২২-৬২৩ খ্রিষ্টাব্দ)

- বাইয়াতে আকাবার বারো ব্যক্তির মধ্যে একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি বারা বিন মা'রুর রা. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হিজরতের এক মাস পূর্বে সফর মাসে ইনতেকাল করেন।
- আনসারদের সরদার সা'দ বিন যুরারা রা. মসজিদে নববির নির্মাণ চলাকালীন ইনতেকাল করেন।
- মদিনায় এসে যার নিকটে প্রথম অবস্থান করেছেন হজরত কুলসুম বিন হিদ্‌ম আনসারি রাদিয়াল্লাহু আনহু, তিনি মৃত্যুবরণ করেন।
- মক্কার এক মুসলমান জামরা বিন জুনদুব রাদিয়াল্লাহু আনহু অসুস্থ অবস্থায় হিজরতের সফরে মারা যান।[৯৮৭]
- মুহাজিররা মদিনায় হিজরতের পর মুহাজিরদের ঘরে প্রথম পুত্রসন্তান ছিলেন আবদুল্লাহ বিন যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং আনসারদের ঘরে নুমান বিন বাশির রাদিয়াল্লাহু আনহু জন্মগ্রহণ করেন।[৯৮৮]

হিজরি- ২ (৬২৩-৬২৪ খ্রিষ্টাব্দ)

- মুহাজিরদের মধ্যে হজরত উসমান বিন মাযউন রাদিয়াল্লাহু আনহু ইনতেকাল করেন।
- ১৫ শাবান বাইতুল্লাহকে কিবলা হিসেবে নির্ধারণ করা হয়।
- আজানের বিধান অবতীর্ণ হয়। রমজানের রোজা ফরজ হয়। আশুরার রোজা, যা পূর্বে ফরজ ছিল, তা রহিত হয়ে নফল হয়ে যায়।[৯৮৯]
- জুমাদাল আখির-এর শেষদিকে সারিয়া উবাইদুল্লাহ বিন জাহশের বাহিনী রওনা হয়।
- হজরত রুকাইয়া রাদিয়াল্লাহু আনহা বিনতে মুহাম্মদ সা. এর ইনতেকাল।
- গাজওয়ায়ে বদরের পর হজরত ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহাকে হজরত আলি রা. এর কনে হিসেবে ঘরে উঠিয়ে নেওয়া

---

৯৮৭ .মুখতাসারু সিরাতির রাসুল, শায়েখ মুহাম্মদ বিন আবদুল ওয়াহহাব : ১ হিজরি

৯৮৮ .আলকামিল ফিত তারিখ : ১ হিজরি

৯৮৯ .মুখতাসারু সিরাতির রাসুল, শায়েখ মুহাম্মদ বিন আবদুল ওয়াহহাব : ২ হিজরি

- ১৫ শাওয়াল গাজওয়ায়ে কাইনুকা সংঘটিত হয়।[৯৯০]

হিজরি-৩ (৬২৪-৬২৫ খ্রিষ্টাব্দ)

- নবীজির সঙ্গে হাফসা বিনতে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহার বিবাহ। এ সময় হাফসা রাদিয়াল্লাহু আনহার বয়স ছিল ১৯ বছর।[৯৯১]
- ১৫ শাওয়ালে গাজওয়ায়ে উহুদ সংঘটিত হয়।
- রমজানে হজরত হাসান বিন আলি রা. এর জন্মগ্রহণ।[৯৯২]

হিজরি-৪ (৬২৫-৬২৬ খ্রিষ্টাব্দ)

- শাবানে হজরত হুসাইন বিন আলি রা. এর জন্মগ্রহণ।[৯৯৩]
- নবীজির সঙ্গে যায়নাব বিনতে খুযাইমার বিবাহ হয়। তার দানশীলতার কারণে তিনি উম্মুল মাসাকিন উপাধিতে প্রসিদ্ধ ছিলেন। বিয়ের মাত্র ছ'মাসের মাথায় তিনি ইনতেকাল করেন। তার বয়স তখন ৩৫ বছর।[৯৯৪]
- হজরত আবু সালামা রাদিয়াল্লাহু আনহু ইনতেকাল করেন। তার বিধবা স্ত্রী উম্মে সালামার ইদ্দতের পর নবীজির সঙ্গে বিয়ে হয়। উম্মে সালামার ছেলে উমর বিন আবু সালামার প্রতিপালনের দায়িত্বও নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গ্রহণ করেন।[৯৯৫]

হিজরি-৫ (৬২৬-৬২৭ খ্রিষ্টাব্দ)

- রবিউল আওয়ালের শেষে এবং রবিউল আখিরের মাঝে গাজওয়ায়ে দাওমাতুল জানদালে মশগুল থাকেন।
- শাবান মাসে গাজওয়ায়ে বনু মুরাইসি (বনু মুসতালিক) থেকে ফেরার পথে তায়াম্মুমের বিধান নাজিল হয়।
- নবীজির সঙ্গে জুওয়াইরিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহাকে বিয়ে করেন।
- রমজানে দুঃখজনক ইফকের (অপবাদ) ঘটনার অবতারণা হয়।

৯৯০ .আলইবার ফি আখবারি মান গাবার : ২ হিজরি

৯৯১ .উসদুল গাবাহ : হাফসা বিনতে উমরের রা. জীবনী দ্রষ্টব্য

৯৯২ .আযযুরিয়্যাতুত তাহিরাহ, দুলাবি, হাদিস নং ১০১

قال أبو بشر الأنصاري الدولابي بإسناده إلى الليث بن سعد قال : ولدت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسنَ بن علي في شهر رمضان سنة ثلاث، وولدت الحسين في ليال خلون من شعبان سنة أربع

৯৯৩ .প্রাগুক্ত

৯৯৪ .আলইসতিয়াব : যায়নাব বিনতে খুযাইমা রা. এর জীবনী দ্রষ্টব্য।

৯৯৫ .আলইসাবাহ : উম্মে সালামা রা. এর জীবনী দ্রষ্টব্য।

- অপবাদের শাস্তি (হাদ্দুল কযফ) সম্পর্কে সুরা নুরের প্রথমদিকের আয়াতগুলো নাজিল হয়।
- শাওয়ালের মাঝামাঝি সময় থেকে যিলকদ পর্যন্ত গাজওয়ায়ে খন্দকে মশগুল থাকেন।
- যিলকদে গাজওয়ায়ে বনু কুরাইজা সংঘটিত হয়।
- যিলকদ মাসে হজরত যায়নাব বিনতে জাহশের সঙ্গে নবীজির বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়।
- পর্দার বিধান নাজিল হয়।[৯৯৬]

হিজরি-৬ (৬২৭-৬২৮ খ্রিষ্টাব্দ)

- উত্তরদিকে যায়েদ বিন হারিসা রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং উপকূলের দিকে আবু উবাইদা বিন জাররা রা. এর নেতৃত্বে বাহিনী প্রেরণ করেন।
- হাবশাতে নাজাশি আসহামা রাদিয়াল্লাহু আনহু নবীজির সঙ্গে উম্মে হাবিবা বিনতে সুফিয়ান রা. এর বিয়ে পড়ান।
- যিলকদ মাসে হুদাইবিয়াসন্ধি হয়।
- বছর পূর্ণ হওয়ার কয়েকদিন পূর্বে গাজওয়ায়ে যিকারদ সংঘটিত হয়।
- হাবশাতে নাজাশি আসহামা রা. এর ইনতেকাল। নবীজির গায়েবানা জানাজা।[৯৯৭]

হিজরি-৭ (৬২৮-৬২৯ খ্রিষ্টাব্দ)

- মহররম থেকে রবিউল আওয়াল পর্যন্ত রাষ্ট্রপ্রধানদের নিকট পত্রপ্রেরণের ধারা অব্যাহত থাকে।[৯৯৮]
- মহররম ও রবিউল আওয়ালে খাইবার ও ফাদাকের এলাকাসমূহ বিজিত হয়।
- নবীজির সঙ্গে খাইবার গোত্রপতির কন্যা সাফিয়া বিনতে হুয়াই রাদিয়াল্লাহু আনহার বিবাহ।
- হাবশার মুহাজিরদের প্রত্যাবর্তন।

---

৯৯৬ .আলকামিল ফিত তারিখ : ৫ হিজরি, আলইবার ফি আখবারি মান গাবার : ৫ হিজরি।

৯৯৭ .গায়েবানা জানাজা পড়া নবীজির (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বৈশিষ্ট্য ছিল। কারণ, জানাজা নামাজের জন্য মৃত ব্যক্তি লাশ জানাজার স্থানে থাকা শর্ত।

قال الإمام السرخسي : لا يصلى على ميت غائب وقال الشافعي : يصلى عليه، فإن النبي عليه الصلاة والسلام صلى على النجاشي وهو غائب ولكنا نقول : طويت الأرض وكان هو أولى الأولياء ولا يوجد مثل ذلك في حق غيره (المبسوط : ٦٧/٢، دار المعرفة)

৯৯৮. আলকামিল ফিত তারিখ : ৬ হিজরি; আলইবার ফি আখবারি মান গাবার : ৬ হিজরি।

- হজরত আবু হুরাইরা রা. এর উপস্থিতি ও ইসলামগ্রহণ এবং হাদিস মুখস্থ করার জন্য জীবন উৎসর্গ করা।
- যিলকদ মাসে নবীজির উমরাতুল কাযা সম্পন্ন।
- যিলকদ মাসে হজরত মাইমুনা বিনতে হারিস রাদিয়াল্লাহু আনহার সঙ্গে নবীজির বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়।[৯৯৯]

হিজরি-৮ (৬২৯-৬৩০ খ্রিষ্টাব্দ)

- হজরত খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ ও আমর বিন আস রাদিয়াল্লাহু আনহুমার ইসলামগ্রহণ।
- জুমাদাল উলা মাসে মুতাযুদ্ধে অংশগ্রহণ, যা আরব সীমান্ত থেকে বাইরে গিয়ে বিদেশি শত্রুদের সাথে প্রথম যুদ্ধ।
- ১৭ রমজান মক্কাবিজয়।
- ১৪ শাওয়াল হুনাইনের যুদ্ধ।
- যিলকদ তায়েফ অবরোধ।
- হজরত যায়নাব রাদিয়াল্লাহু আনহা বিনতে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইনতেকাল।
- হজরত মারিয়া কিবতিয়ার গর্ভে নবীজির সর্বশেষ পুত্র ইবরাহিমের জন্ম।[১০০০]

হিজরি-৯ (৬৩০-৬৩১ খ্রিষ্টাব্দ)

- রজব মাসে তাবুকযুদ্ধের প্রস্তুতি।
- রমজান মাসে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাবুক সফর থেকে ফিরে আসেন, তখন তার কন্যা উম্মে কুলসুম রাদিয়াল্লাহু আনহা ইনতেকাল করেন।
- যিলকদ মাসে মুনাফিক সরদার আবদুল্লাহ বিন উবাইয়ের ইহলীলা সাঙ্গ হয়।
- সত্তরের চেয়েও অধিক প্রতিনিধিদল এসে ইসলাম গ্রহণ করার জন্য মদিনায় আগমন করে।
- হজ ফরজ হয়, হজরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে আমির নির্ধারণ করে মক্কা পাঠানো হয়।[১০০১]

---

৯৯৯. আলকামিল ফিত তারিখ : ৭ হিজরি, আলইবার ফি আখবারি মান গাবার : ৭ হিজরি।
১০০০. আলকামিল ফিত তারিখ : ৮ হিজরি; আলইবার ফি আখবারি মান গাবার : ৮ হিজরি।
১০০১. আলকামিল ফিত তারিখ : ৯ হিজরি, আলইবার ফি আখবারি মান গাবার : ৯ হিজরি

হিজরি-১০ (৬৩১-৬৩২ খ্রিষ্টাব্দ)

- রবিউল আওয়াল মাসে নবীজির পুত্র ইবরাহিমের মৃত্যু হয়।
- নাজরানের পাদরি মুনাযারার জন্য মদিনায় আগমন করে।
- ইয়ামানে আসওয়াদ আনাসি এবং ইয়ামামাতে মুসাইলামা কাজ্জাব নবুওয়াত দাবি করে।
- বিদায় হজ অনুষ্ঠিত হয় এবং ওহী পূর্ণতা লাভ করে।[১০০২]

হিজরি-১১ (৬৩২-৬৩৩ খ্রিষ্টাব্দ)

- নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রোমানদের বিরুদ্ধে জিহাদের জন্য উসামা রা. এর সেনাপতিত্বে একটি বাহিনী প্রস্তুত করেন।
- হজরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু নবীজির ইনতেকালের চারদিন পূর্বে তার স্থানে ইমামতির জন্য নিযুক্ত হন।
- ১২ রবিউল আওয়াল মাসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ৬৩ বছর বয়সে দুনিয়া ত্যাগ করেন।[১০০৩]

***

আলবিদায়া ওয়ান নিহায়া : ৯ হিজরি

১০০২. আলকামিল ফিত তারিখ : ১০ হিজরি, আলইবার ফি আখবারি মান গাবার : ১০ হিজরি; আলবিদায়া ওয়ান নিহায়া : ১০ হিজরি।

১০০৩. আলকামিল ফিত তারিখ : ১১ হিজরি, আলইবার ফি আখবারি মান গাবার : ১১ হিজরি; আলবিদায়া ওয়ান নিহায়া : ১১ হিজরি।

জ্ঞাতব্য

সিরাতুন-নবী এবং ইসলামি ইতিহাসের প্রাচীন তথ্যসূত্রগ্রন্থসমূহে অধিকাংশ ঘটনার হিজরি তারিখ উল্লেখ করা হয়েছে। বর্তমানে অনেক সিরাত ও ইতিহাসের ক্যালেন্ডারের হিসেবের অজুহাতে হিজরি তারিখের পাশাপাশি সৌরতারিখও উল্লেখ করা হয়; কিন্তু এই প্রয়োগটি অনুমানের ভিত্তিতে হয়ে থাকে। একে সুনিশ্চিত মনে করা ঠিক নয়।

আমরা প্রথমে আলি মুহাম্মদ খান রহ. এর কিতাব 'তাকউয়িমে আহদে নববি' থেকে উপকৃত হই; এবং ডক্টর আবদুল কুদ্দুস হাশেমি রহ. লিখিত 'তাকউয়িমে তারিখ'র উপর নির্ভর করি। কিছু কিছু স্থানে টাইমনির্ধারক সফটওয়্যার, বিশেষ করে ড. আবদুল আজিজ মুহাম্মদ গানিমের তৈরি 'বারনামাজুন লিততাকউয়িমিল হিজরি ওয়াল মিলাদি' থেকে সাহায্য নিয়েছি। তাই সিরাতের অন্যান্য কিতাবে যদি কিছু তারিখে ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়, মূলত হিজরি ও সৌরবর্ষের ভিন্নতার কারণেই তা হয়েছে।

সিরাতে মুসতফার পয়গাম

'মুসলমানদেরকে যদি কেবল ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য তৈরি করা হতো, তা হলে মক্কার যেসব বণিক-ব্যবসায়ী শাম ও ইয়ামানে বাণিজ্যসফর করত, তাদের এবং মদিনার বড় বড় ইহুদি সওদাগরদের এই প্রশ্ন তোলার অধিকার ছিল যে, এ কাজের জন্য নতুন একটি উম্মত সৃষ্টির কী প্রয়োজন ছিল?

যদি চাষাবাদ উদ্দেশ্য থাকত, তা হলে মদিনা, খাইবার, তায়েফ, নজদ, শাম, ইয়ামান ও ইরাকের জমিদার ও পেশাদার চাষীরা আপত্তি তুলতে পারত যে, কৃষি ও চাষাবাদে আমাদের চেয়ে পারদর্শিতা ও দক্ষতা আর কার রয়েছে? এর জন্য নতুন আরেকটি জাতির উদ্ভব ঘটাবার কী দরকার ছিল?

যদি পৃথিবীর গতিময়তায় কারিগরি বিদ্যায় দক্ষতা অর্জন করা, সরকার ব্যবস্থাপনা এবং বিনিময় গ্রহণপূর্বক দাফতরিক কার্যক্রম পরিচালনা করা লক্ষ হতো, তা হলে রোম ও পারস্যের ক্ষমতাসীনদের এই প্রশ্ন করার অধিকার ছিল যে, এসব কার্যক্রম পরিচালনা করার জন্য আমরা এবং আমাদের স্বজাতিই অধিক অভিজ্ঞতাসম্পন্ন। এর জন্য নতুন কাউকে সৃষ্টি করার কী প্রয়োজন?

কিন্তু মুসলমানদেরকে সম্পূর্ণ নতুন ও অভিনব এমন এক কাজের জন্য প্রস্তুত করা হচ্ছিল, যা দুনিয়ার কোনো সরকার না পূর্বে সম্পাদন করতে পেরেছে, না পরবর্তীতে কেউ সম্পাদন করতে পারবে। সর্বোপরি এই কাজের জন্য একটি নতুন উম্মতের উত্থানেরই প্রয়োজন ছিল। তাই ইরশাদ হয়েছে : 'তোমরা সর্বোত্তম উম্মত, যাদেরকে মানুষের কল্যাণের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। তোমরা সৎকাজের আদেশ করবে এবং অসৎকাজ থেকে বারণ করবে এবং আল্লাহর উপর ঈমান আনবে।[১০০৪]

এই লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য লোকেরা স্বদেশহারা হয়েছে, নিজেদের উপার্জন বাধাগ্রস্ত হয়েছে, সঞ্চিত সম্পদ লুণ্ঠিত হয়েছে, জমিজমা এবং ব্যবসা-বাণিজ্য সবকিছুতে লোকসান হয়েছে, নিজের ক্ষেতখামার, বাগবাগিচা বিরান হয়েছে, নিজের জীবনের বিলাসিতা ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ত্যাগ করেছেন। দুনিয়ার সকল সফলতা ও স্বাচ্ছন্দ্য থেকে তারা চোখ বন্ধ করে ফেলেছেন। যুদ্ধের ময়দানে

১০০৪ সুরা আলে ইমরান, আয়াত ১১০

অকাতরে নিজের রক্ত বইয়েছেন, সন্তানকে এতিম করেছেন, স্ত্রীকে বিধবা করেছেন।

আজকের মুসলমানদেরকে যে লক্ষ্য ও কাজে নিমগ্ন দেখা যায়, এগুলোর জন্য তো প্রথম যুগের মুসলমানদের এত হুলস্থুল ও আয়োজনের প্রয়োজন ছিল না। তা হাসিল করার পথ একদম নিরাপদ ও অনুকূল ছিল। মুসলমানদের যদি ওই পর্যায়ে আসা উদ্দেশ্য হতো, নবুওয়াতের সময়কালে কাফেররা যে পর্যায়ে ছিল, তা হলে সে সময় সমগ্র দুনিয়ায় শুধু অমুসলিমরাই বসবাস করত। যদি পার্থিব জিন্দেগির এসব কাজে নিমগ্নতা এবং আকণ্ঠ নিমজ্জিত হওয়া উদ্দেশ্য হতো, ইউরোপ, রোমান ও পারসিকরা যেগুলোতে নিমজ্জিত ছিল, এবং তাদের সফলতাই নিজেদের জিন্দেগির চূড়ান্ত কৃতকার্যতা হিসেবে গ্রহণ করত, অথচ তাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে উন্নতির চরম উৎকর্ষে পৌঁছে দিয়েছেন; তা হলে ইসলামের প্রারম্ভ ইতিহাস সবটাই ভণ্ডুল ও নিরর্থক হয়ে পড়বে। পাশাপাশি তাদের এমন আচরণের ফলে পরোক্ষভাবে এ কথার ঘোষণা দেওয়া হবে যে, তারা বদর, হুনাইন, খন্দক, কাদিসিয়া, ইয়ারমুক প্রভৃতি রণাঙ্গনে যে মূল্যবান রক্ত ঝরিয়েছেন, তা অযথা ছিল।

আজ যদি কুরাইশ সরদারদের কথা বলার ক্ষমতা থাকত, তারা মুসলমানদের সম্বোধন করে বলত, তোমরা যেসব বস্তুর দিকে ছুটছ, যেসব জিনিস হাসিল করা তোমাদের জীবনের লক্ষ্য বানিয়ে নিয়েছ, আমরা গুনাহগাররা তোমাদের পয়গাম্বর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মুখে তা পেশ করেছিলাম। তিনি এক ফোঁটা রক্ত ঝরানো ছাড়াই তা অর্জন করতে সক্ষম ছিলেন। তারপরও তার পুরো জিন্দেগিই ছিল সীমাহীন চেষ্টা, পরিশ্রম, অধ্যবসায় ও আত্মত্যাগে ভরপুর। তোমরা যে জীবন বেছে নিয়েছ, তা কি নববি জীবন ও চরিত্রের সঙ্গে কোনোরূপ সামঞ্জস্য রাখে; অথচ তোমরা এ নিয়েই পরিতুষ্ট?

আর সেই কুরাইশ সরদারদের মধ্যে যারা ইসলামের ঘোরতর শত্রু ছিল, তারা যদি এ বলে সমালোচনা করার মওকা পেত, তা হলে আমাদের মুসলমানদের যত বড় প্রাজ্ঞ ও ঝানু উকিলই হোক না কেন, তাদেরকে প্রশান্তিদায়ক কোনো উত্তর দেওয়ার ক্ষমতা ছিল না এবং পুরো উম্মতের লজ্জিত হওয়া ছাড়া কোনো উপায় ছিল না।

মুসলমানদের ব্যাপারে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আশঙ্কা ছিল যে, তারা দুনিয়ার মোহে পড়ে তাদের প্রকৃত লক্ষ্য ভুলে যাবে এবং পার্থিব জীবনে ডুবে যাবে; তাই তিনি ইনতেকালের পূর্বে মুসলমানদের উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন, 'আমি তোমাদের জন্য দারিদ্র্যের আশঙ্কা করি না। বরং আমি

আশঙ্কা করি তোমাদের কাছে দুনিয়ার প্রাচুর্য আসবে বলে, যেমন তোমাদের পূর্বেকার লোকদের কাছে এসেছিল, তখন তোমরা সেটা পাওয়ার জন্য পরস্পরে প্রতিযোগিতা করবে যেমনভাবে তারা করেছিল। আর তা তাদেরকে যেমনিভাবে ধ্বংস করেছিল তোমাদেরকেও তেমনিভাবে ধ্বংস করে ফেলবে।'[১০০৫]

মুসলমানদের আসল পরিচয় হলো, তারা হয়তো ইসলামি দাওয়াত ও আমলের মেহনত-মুজাহাদায় মগ্ন থাকবে কিংবা দাওয়াত ও আমলের মেহনতে নিমগ্ন ব্যক্তিদের সহায়তা ও পৃষ্ঠপোষকতা করবে। তার পাশাপাশি আমলি মেহনতে অংশগ্রহণের সঙ্কল্প করবে এবং আগ্রহ পোষণ করবে। স্বচ্ছন্দ্য জীবনযাপন এবং দৈনন্দিন কাজকর্ম যথাযথভাবে সম্পাদন করার নামই ইসলামি জীবন নয় এবং কোনোভাবেই এটি একজন মুসলমানের জীবনের অভীষ্ট লক্ষ্য হতে পারে না। মুসলমানের প্রকৃত পরিচয়ই হলো নববি সিরাতের সবচেয়ে বড় পয়গাম।[১০০৬]

***

১০০৫. সহিহ বুখারি : হাদিস নং ৪০১৫ (কিতাবুল মাগাজি, বাবু শুহুদিল মালাইকাতি বাদরা)
১০০৬. খুতুবাতে সাইয়েদ আবুল হাসান আলি নদবি রহ. থেকে সংগৃহীত।

ইসলাম কি বলপ্রয়োগের মাধ্যমে প্রসার লাভ করেছে?

প্রাচ্যবিদ ও সেক্যুলার ঐতিহাসিকরা অত্যন্ত জোরালোভাবে এই প্রোপাগান্ডা চালিয়ে আসছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তৎপরবর্তীকালে সাহাবায়ে কেরাম মানুষকে বলপ্রয়োগ করে মুসলমান বানিয়েছেন এবং ইসলাম আধ্যাত্মিকভাবে নয়; তরবারির জোরে প্রসার লাভ করেছে।

এই ঘৃণ্য প্রোপাগান্ডার প্রত্যুত্তরে আমরা এখানে মুফতি মুহাম্মদ শফি রহ. এর প্রসিদ্ধ রচনা 'সিরাতে খাতামুল আমবিয়া' থেকে দুটি কথা তুলে ধরবো। গ্রন্থকার ওহী থেকে মদিনা হিজরত পর্যন্ত অবস্থা বর্ণনা করার পর বলেন, 'এ সময় হাজারো লোক মুসলমান হওয়ার অপরাধে অবর্ণনীয় নির্যাতন হাসিমুখে বরণ করে নিয়েছিল, এটিই প্রমাণ করে, দুনিয়ার কোনো লোভ-লালসা কিংবা কোনো হুকুমতের জোরজবরদস্তি ও তরবারির ভয় তাদেরকে কাবু করতে পারবে না।

হেদায়েতের এমন প্রকাশ্য পদচারণা দেখেও যেসব লোক ইসলামের সত্যতাকে ধামাচাপা দেবার জন্য নির্লজ্জভাবে বলে বেড়ায় যে, ইসলাম তরবারির জোরে প্রসার লাভ করেছে। আচ্ছা, তারা কি বলতে পারবে তরবারি চালনাকারীদের উপর কারা প্রথমে তরবারি চালিয়েছিল, যারা কেবল ইসলামই গ্রহণ করেননি, ইসলামের প্রতিরক্ষায় প্রাণের ঝুঁকি নিতেও তৈরি ছিলেন? ঐসব (বিভ্রান্তি সৃষ্টিকারী) কি বলতে পারবে যে, আবু বকর, উমর, উসমান ও আলির উপর কারা তরবারি চালিয়ে মুসলমান বানিয়েছিল? আবু জর গিফারি ও উমাইস এবং তাদের কবিলার উপর কে তরবারি চালিয়েছিল? জিমাদ আযদিকে কে বাধ্য করেছিল? তুফাইল বিন আমর দাওসি এবং তার কবিলার উপর কে তরবারি প্রয়োগ করেছিল? কবিলা বনু আবদুল আশহালের উপর কোন্ ব্যক্তি বলপ্রয়োগ করেছিল?

মদিনার আনসারদের উপর কে শক্তি প্রদর্শন করেছিল? এই আনসাররা তো কেবল ইসলামই কবুল করেননি; বরং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাদের এলাকায় আমন্ত্রণ জানিয়েছেন, তার নিরাপত্তার দায়িত্ব মাথায় নিয়ে নিয়েছেন, নিজেদের জানমাল সবকিছু তার তরে কুরবানি দিয়েছেন।

বুরাইদা আসলামি রাদিয়াল্লাহু আনহুকে ৭০ ব্যক্তির একটি কাফেলা নিয়ে মদিনার পথে এসে এবং স্বতঃস্ফূর্তভাবে ইসলাম গ্রহণ করার জন্য কে বাধ্য করেছিল? হাবশার বাদশাহ নাজাশির উপর কে তরবারি চালিয়েছিল, যিনি তার সম্রাজ্য ও প্রভাব-প্রতিপত্তি সত্ত্বেও হিজরতের পূর্বেই ইসলাম কবুল করেছিলেন?

আবু হিন্দ, তামিম, নায়িম-সহ বহু মানুষকে কারা জোর করেছিল শামদেশ সফর করে নবীজির খেদমতে উপস্থিত হয়ে তার আনুগত্য স্বীকার করতে? এ ধরনের শত শত ঘটনায় ইতিহাসগ্রন্থগুলো ভরপুর হয়ে আছে।

এসব সত্য ঘটনা দেখেও অস্বীকার করা প্রত্যক্ষ করে যেকোনো মানুষের মধ্যে এই বিশ্বাস তৈরি হবেই যে, ইসলাম তার প্রসারের জন্য তরবারির প্রয়োজন নেই। জিহাদ ফরজ করার পেছনে এই উদ্দেশ্য কখনোই নয় যে, লোকদের মাথায় তরবারি রেখে তাদেরকে ইসলামে দীক্ষিত করা কিংবা যেকোনোভাবে বলপ্রয়োগ করে মুসলমান বানানো। জিহাদের পাশাপাশি জিজিয়া (কর) আদায়ের বিধান এবং ইসলামি রাষ্ট্রে কাফেরদেরকে আহলে জিম্মা তথা মুসলমানদের মতোই তাদের জানমাল হেফাজতের দায়িত্ব নেওয়ার ব্যাপারে ইসলামের হুকুম প্রমাণ করে যে, ইসলাম কখনোই কাফেরদেরকে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করেনি।

একজন ভারসাম্যপূর্ণ মানসিকতার অধিকারী মানুষ যখন শান্তশিষ্টভাবে ফিকির করবে যে, ইসলামে জিহাদ কী উদ্দেশ্যে এবং কী উপকারিতা সামনে রেখে অনুমোদন করা হয়েছে, তখন সে নিশ্চিত হবে যে, যেভাবে কোনো মতাদর্শকে পরিপূর্ণ ভাবা হয় না, যেখানে মানুষকে গলা চেপে, জোরজবরদস্তি করে দলে ভেড়ানো হয়; তদ্রূপ ওই মতাদর্শও পূর্ণতা পায় না, যেখানে কোনো রাজনীতি না থাকে, আর যেখানে তরবারি নেই সেটা রাজনীতি নয়। কোনো চিকিৎসককে তার শাস্ত্রে ততক্ষণ পর্যন্ত দক্ষ গণ্য করা হয় না, যতক্ষণ না সে মলম লাগানোর পাশাপাশি সংক্রমিত অঙ্গের অপারেশনেও পারদর্শী হন।

কবি বলেন-

আরব হোক বা অনারব, তাদের কোনো মূল্য নেই
যতক্ষণ না তাদের কলমের সাথে থাকবে তলোয়ার।

বুঝে রাখুন, ভালো করে বুঝে রাখুন, বিশ্ববাসীর দেহে যখন শিরকের বিষাক্ত জীবাণু পয়দা হয়ে তারা একেবারে শয্যাশায়ী হয়ে পড়ে, তখন দয়াময় আল্লাহ তায়ালা করুণা করে তাদের জন্য একজন সংস্কারক এবং দয়াশীল চিকিৎসক হিসাবে নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পাঠান। তিনি ৬৩ বছর যাবৎ অনবরত দেহের প্রতিটি শিরা-উপশিরার চিকিৎসা করেছেন।

ফলে চিকিৎসাগ্রহণে সক্ষম অঙ্গগুলো পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠেছে। কিন্তু যেসব অঙ্গ একেবারেই নষ্ট হয়ে গিয়েছিল, ভালো হওয়ার কোনো সুযোগই ছিল না; বরং আশঙ্কা ছিল তার কারণে সারাদেহ আক্রান্ত হয়ে পড়ার; প্রজ্ঞার মূলনীতি অনুসারে, দয়া ও অনুগ্রহের দাবিও ছিল অপারেশন করে ওই অঙ্গগুলো কেটে ফেলা। এটিই মূলত জিহাদের নিগূঢ় তত্ত্ব এবং এটিই ইসলামের সকল প্রতিরক্ষা ও আক্রমণাত্মক অভিযানের লক্ষ্য।

এর ফলেই যুদ্ধের চরম মুহূর্তেও শত্রুবাহিনীর কেবল ওই লোকদের হত্যা করার অনুমতি রয়েছে, যাদের রোগ সংক্রমণের আশঙ্কা রয়েছে তথা যারা ইসলামকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে চায়। কিন্তু তাদের স্ত্রী-সন্তান, বৃদ্ধ এবং তাদের ধর্মীয় গুরু, যারা যুদ্ধে শরিক হয়নি, তাদেরকে মুসলমানদের তরবারি থেকে নিরাপদ রাখা হয়েছে। এমনকি যেসব লোক নিরুপায় ও বাধ্য হয়ে যুদ্ধে এসেছে, তারাও মুসলমানদের কাছে নিরাপদ।'

মুফতি শফি রহ. এ প্রসঙ্গে কিছু হাদিস উল্লেখ করার পর বলেন, 'মোদ্দাকথা, প্রতিরক্ষা ও আক্রমণাত্মক অভিযানের লক্ষ্য কেবল সর্বোত্তম আখলাকের প্রচার-প্রসার, ইসলামের সংরক্ষণ ও তাবলিগ, ইসলামের চলার পথে প্রতিবন্ধকগুলো সরিয়ে দেওয়া। উপর্যুক্ত সকল ঘটনায় দৃষ্টি বুলালে ইউরোপিয়ান ঐতিহাসিক এবং মারগুলিস প্রমুখের এই প্রোপাগান্ডা সম্পূর্ণ ভুল প্রমাণিত হয় যে, ইসলামি জিহাদের উদ্দেশ্য হলো লোকদেরকে জোরপূর্বক মুসলমান বানানো এবং লুটপাট করে জীবন ধারণ করা। সাথে সাথে হাদিস ও সাহাবিদের আচার-আচরণ সমন্বিত করলে এ ব্যাপারে কোনো সংশয়ই অবশিষ্ট থাকে না যে, ইসলাম আত্মরক্ষার জন্যই প্রতিরক্ষা জিহাদকে ফরজ করেছে। তদ্রূপ ইসলামের সংরক্ষণ এবং দীনের প্রচার-প্রসারের পথে সকল বাধা-বিঘ্নতা দূর করার জন্য আক্রমণাত্মক জিহাদকে কেয়ামত পর্যন্ত আবশ্যক করে দেওয়া হয়েছে।

প্রতিরক্ষা জিহাদের উদ্দেশ্য যেভাবে লোকজনকে জোরপূর্বক মুসলমান বানানো ছিল না, তদ্রূপ আক্রমণাত্মক জিহাদের লক্ষ্যও কোনোভাবেই তা হতে পারে না। বিশেষ করে জিহাদ চলমান অবস্থাতেও ইসলামের সুপ্রশস্ত গণ্ডির ভেতরে কাফেরদের আশ্রয় দিয়েছে, তাদের জানমাল, ইজ্জত-আবরু হেফাজতের নিশ্চয়তা প্রদান করেছে। উপরন্তু দুনিয়াতে প্রকৃত শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা করা, দুর্বলদেরকে অত্যাচার থেকে পরিত্রাণ দেওয়া ইত্যাদি বিষয় জিহাদের উদ্দেশ্যের মধ্যে গণ্য ছিল।

তাই ইসলামি বর্ণনাগুলোকে বিকৃত করে আক্রমণাত্মক জিহাদকে অস্বীকার করার কোনো সুযোগ নেই, যেমনটি আমাদের কিছু মুক্তমনা ঐতিহাসিক বলে থাকেন।'[১০০৭]

প্রাণের ক্ষয়ক্ষতি কম; কিন্তু উপকারিতা অনেক

নবী-জীবনে সংঘটিত গাজওয়া ও সারিয়াকে যারা রক্তপাত এবং বংশ নির্মূল' বলে আখ্যায়িত করে, এর বাস্তবতা নিয়ে তাদের চিন্তাভাবনা করা আবশ্যক। তারা কি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময়ে সংঘটিত লড়াইসমূহে প্রাণহানির পরিসংখ্যান করে দেখেছে? ওইগুলোর ফল কী ছিল?

গবেষকদের অনুসন্ধান মোতাবেক নবীজির সময়ের সকল যুদ্ধে মোট ২৫৯ মুসলমান শহিদ হন, প্রতিপক্ষের ৭৫৯ কাফের নিহত হয়। তা হলে উভয়পক্ষের মোট নিহতের সংখ্যা দাঁড়ায় ১০১৮ জন।[১০০৮]

এবার আপনি একদিকে জাজিরাতুল আরবের সুবিশাল পরিধি এক নজর দেখুন, অপরদিকে আরবগোত্রগুলোর যুদ্ধংদেহী মনোভাব গভীরভাবে লক্ষ করুন; আপনার বিশ্বাসই হবে না যে, এই মামুলি সংখ্যক মানুষের প্রাণহানির বিনিময়ে এত বড় অঞ্চলে হাজারো মূর্তিপূজারি পরিবারকে তাদের পিতৃপুরুষের ধর্ম ত্যাগ করতে সম্মত করতে পারে?

তার পাশাপাশি সেই ঈমানি ও চারিত্রিক বিপ্লবের চিত্রটিও অবলোকন করুন। কয়েক বছরের ব্যবধানে আরবের বিক্ষিপ্ত কবিলাগুলোকে এক ঝান্ডাতলে সমবেত করা সম্ভব হয়েছে। এক মূর্খতাপূর্ণ সমাজকে দুনিয়ার নেতৃত্বের আসনে সমাসীন করেছে। এই মহান লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য কেবল হাজারখানেক মানুষের ক্ষয় গণনায় আসার মতো? ইতিহাস এবং বর্তমান বিশ্বপরিস্থিতি সম্পর্কে অবগত ব্যক্তিরা খুব ভালো করেই জানেন যে, অধিকাংশ যুদ্ধেই হাজার হাজার, লাখ লাখ মানুষ মারা যায়। তবে দুঃখজনক হলো, নিহতদের মধ্যে যোদ্ধা ও সাধারণ মানুষের মাঝে কোনো পার্থক্য করা হয় না। পৃথিবীতে এসব যুদ্ধের কোনো ইতিবাচক প্রভাব নেই। তদুপরি যুদ্ধে প্রাণহানি হওয়া পৃথিবীর বিভিন্ন বিপ্লবের একটি আবশ্যক বিষয় হিসেবে তাকে উপেক্ষা করা হয়।

ইউরোপ ও আমেরিকায় গণতন্ত্রের নামে যে রক্তারক্তি ও দাঙ্গা-ফাসাদ হয়েছে, তা কারো কাছে গোপন নয়। তারপরও প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে কোনো অতিরঞ্জন ছাড়া কোটি কোটি মানুষ মারা যায়। কিছু রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের

১০০৭. সিরাতে খাতামুল আমবিয়া, পৃষ্ঠা ৬১-৬৭

১০০৮. রাহমাতুল লিল আলামিন : ১/৪৬৪

ক্ষমতা গ্রহণের উন্মত্ত লালসায় রাষ্ট্রের মূলভিত্তি পর্যন্ত উড়িয়ে দিয়েছে। এতসব ক্ষয়ক্ষতির পরও দুনিয়াতে তেমন কোনো উল্লেখযোগ্য বিপ্লব ঘটেনি। বরং বিত্তবান ও ক্ষমতাশীলদের আধিপত্য পাকাপোক্ত হয়েছে আর গরিব-নিঃস্বদের লুটেপুটে খাওয়ার সুযোগ আরো বৃদ্ধি পেয়েছে। ইউরোপ তাদের এমন অতীত ইতিহাস থাকতে কোন্ মুখে তারা নববি সিরাতের দিকে আঙুল তোলার দুঃসাহস করে!

***

https://t.me/islaMic_fdf

ইতিহাসের শিক্ষা

- নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তেষট্টি বছর জীবনযাপন করে দুনিয়া ত্যাগ করেন। কিন্তু তার শিক্ষার আলো আজও বিদ্যমান এবং কেয়ামত পর্যন্ত মানুষ তার নুরে আলোকিত হবে।
- নবীজির মোবারক দৃষ্টি সাধারণকে উচ্চমর্যাদায় আসীন করেছে, তুচ্ছ আরবকে পরিণত করেছে মূল্যবান মাণিক্যে, রাখাল হয়েছে মহান ব্যক্তিত্ব আর ডাকাত পরিণত হয়েছে সন্ন্যাসীতে। পৃথিবীর ইতিহাসে এমন কোনো শিক্ষক কিংবা এমন কোনো পথপ্রদর্শকের সন্ধান মিলবে কি?
- রহমতে দো-আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরবের সরদার হওয়া সত্ত্বেও মৃত্যুকালে কোনো সম্পত্তি রেখে যাননি। ইসলাম ছাড়া কোথাও এমন উদাহরণ পাওয়া যাবে?
- রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মৌখিক ও দৈহিক বহু কষ্ট দেওয়া হয়েছে। পাথর মারা হয়েছে, হত্যার ঘৃণ্য চেষ্টা করা হয়েছে, দেশত্যাগে বাধ্য করা হয়েছে। তদুপরি আল্লাহ তায়ালা যখন তাকে বিজয় ও ক্ষমতা দিয়েছেন, মক্কায় বিজয়ীবেশে তিনি প্রবেশ করেন, তখন তিনি দয়া-অনুগ্রহের অনুপম দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। কট্টর দুশমনদেরও তিনি ক্ষমা করে দেন। বলুন তো, উম্মতে মুহাম্মদির ইতিহাস ছাড়া এমন উপমা খুঁজে পাওয়া যাবে? আমরা কি দুশমন কাফের দূরের কথা, সামান্য ভিন্ন মতাদর্শীদের সঙ্গে এমন নম্র আচরণ প্রদর্শন করার জন্য কি প্রস্তুত? যদি এমনটি না হয়, তা হলে আমরা কোন মুখে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসারী দাবি করি?
- যে সাহাবায়ে কেরাম রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আহ্বানে সর্বপ্রথম সাড়া দিয়েছেন এবং আসসাবিকুনাল আওয়ালুন অভিধা পেয়েছেন, তাদের মধ্যে হজরত আবু বকর সিদ্দিক, উমর ফারুক, উসমান বিন আফফান, আলি বিন আবু তালিবের মতো সম্মানিত ব্যক্তিরা ছিলেন। ইয়ামান থেকে আগত নিঃস্ব পরিবারের সন্তান আম্মার বিন ইয়াসির, হাবশার কৃষ্ণকায় গোলাম বিলাল, গোলাম হিসেবে হাতবদল হতে থাকা সুহাইব রুমির মতো অসহায় লোকেরাও সেই কাফেলায় শামিল ছিলেন। সর্বস্তরের

লোক এই প্রস্রবণের দ্বারা সিক্ত হয়েছে। আমরা কি এমনভাবে সর্বশ্রেণির লোকের নিকট দাওয়াত পৌঁছানোর জজবা লালন করি?

- রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর সঙ্গে বান্দাদের ছিন্ন হওয়া সম্পর্ক পুনরায় স্থাপন করেছেন। আজ আমরা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মত হয়েও কীভাবে সেই সম্পর্ক ছিন্ন করে বসে আছি?
- মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈমান ও সত্যের ঝান্ডা উড্ডীন করেছেন এবং কল্যাণ ও সৌভাগ্যের বীজ বপন করেছেন; অথচ আমরা আজ সকল অনিষ্ট, বিশৃঙ্খলা, অত্যাচার এবং বেহায়াপনায় অভ্যস্ত?
- রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সারাজীবন কুরবানি দিয়ে উম্মতকে বিশ্বজাহান জয় করে নিরাপত্তা ও ন্যায়-ইনসাফের শাসন করেছেন; অথচ আমরা আজ কপট প্রতাপশালী ও স্বৈরাচারী প্রভুদের সামনে মাথানত করে রাখছি?
- নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে যা কিছু দিয়ে গেছেন, আমরা কি নিজেদের বদআমলের ফলে তা খুইয়ে ফেলিনি? যদি এমনই হয়ে থাকে, তা হলে আমরা সেগুলো ফিরে পাওয়ার কোনো চিন্তা কেন করছি না?
- আমাদের ভ্রান্তিপূর্ণ জীবন এবং আমাদের কদর্য আমল কি মানবতার সেই মহান কল্যাণকামীর ইজ্জত-সম্মানে আঘাত করে না? আমরা আমাদের জীবনকে কখন বদলাবো?
- আমাদের দীনদারির অবস্থার এত অবনতি কেন হয়েছে? আমরা নবীজির আনীত শরিয়তের প্রতি এত বেপরোয়া কেন?
- আমরা নামাজ আদায়ে পাবন্দ নই কেন? আমরা জাকাত, সদকা এবং দান-খয়রাত করতে কেন কার্পণ্য করি? আমাদের মধ্য থেকে সেই পরহেজগারি, খোদাভীরুতা, সুন্নাতের অনুসরণ কোথায় হারিয়ে গেল, যা এক সময় মুসলিম উম্মাহর বাচ্চাদের মধ্যেও বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হতো?
- হালাল-হারামের মাঝে আমরা কেন কোনো পার্থক্য করি না? প্রবৃত্তির চাহিদা পূরণ থেকে আমরা কেন বেঁচে থাকি না? আমাদের জীবন নবীজির জানবাজ সাহাবায়ে কেরামের জীবনের সঙ্গে কেন মেলে না?
- সিরাতুন নবীর প্রতিটি পাঠ বলে দেয় যে, সত্য দীন কী ছিল? মুসলমানরা কেমন ছিলেন? ইসলাম কত কুরবানি ও আত্মত্যাগের বিনিময়ে প্রসার লাভ করেছে। সিরাতুন নবীর প্রতিটি অধ্যায় প্রমাণ করে যে, আমাদের ইশকে

নবী ও নবীপ্রেমের দাবি লৌকিকতা বৈ কিছু নয়। আমাদের মুখে নিজেদের নবীর একনিষ্ঠ অনুসারী বলে বেড়ানো এবং একে জান্নাতের টিকিট মনে করা আত্মপ্রবঞ্চনা ছাড়া কিছুই নয়। আমরা প্রায় সকলেই এর শিকার।

- আল্লাহ তায়ালা আমাদের বদআমলের কারণে অসন্তুষ্ট হয়ে তার সেই নেয়ামতগুলো আমাদের থেকে ছিনিয়ে নিয়েছেন। আমরা স্বাধীন থেকে পরাধীন, শাসক থেকে শাসিত এবং সচ্ছলতা থেকে অসচ্ছল জীবনে পদার্পণ করেছি।
- নববি শিক্ষা ছিল- আল্লাহ তায়ালার নিকট কোনো মুসলমানকে অন্যায়ভাবে হত্যা করার চেয়ে অধিক সহজ হলো সমগ্র দুনিয়া ধ্বংস হয়ে যাওয়া। কিন্তু আমাদের সামাজিক জীবনে মানুষের কি কোনো মূল্য রয়েছে? একটি মুসলিম সমাজ কি এমন হতে পারে?
- দয়ার আধার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে বংশ, বর্ণ, ভাষা ও গোত্রভিত্তিক সাম্প্রদায়িকতায় জড়াতে নিষেধ করেছেন। ভালোবাসা ও পারস্পরিক সহমর্মিতার বার্তা ব্যাপক করে গেছেন। কিন্তু আজ আমাদের মানসে সবধরনের সাম্প্রদায়িকতা ছড়িয়ে পড়েছে। এমনটি হলো কেন?

সিরাত ও ইতিহাস যা-ই অধ্যয়ন করি, তা নিজের মুহাসাবা ও সংশোধনের জন্য হওয়া আবশ্যক। আমরা কি নিজেদের হিসেব নেওয়ার জন্য প্রস্তুত?

সত্যের অগ্রদূত রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জিন্দেগি কেয়ামত পর্যন্ত আগত মানুষদের জন্য পথপ্রদর্শক হয়ে থাকবে। তার প্রতি ভালোবাসা পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ও মূল্যবান সম্পদ। আমাদের জন্য কর্তব্য হলো, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইশক ও মহব্বতে ডুবে গিয়ে একজন উত্তম ও সাচ্চা মুসলমান হিসেবে জীবনযাপন করা এবং মুসলিম উম্মাহর বিনির্মাণে নিজেকে উৎসর্গ করা। জনাব খালেদ ইকবাল তায়েবের ভাষায় :

دیوانگیٔ شوق بڑھا کر تو دیکھئے * الفت میں ان کی خود کو مٹا کر تو دیکھئے
کھل جائے باب رحمت حق آپ کے لئے * حب نبی کو دل میں بسا کر تو دیکھئے

আগ্রহ ও উদ্দীপনার পাগলামি প্রদর্শন করে তো দেখো, তার ভালোবাসায় নিজেকে বিলীন করে দেখো না!

আল্লাহ তায়ালার রহমতের দুয়ার কীভাবে খুলে যায় তোমার জন্য। নবীপ্রেম তোমার দিলে গেঁথে দেখো না!

***

সমাপ্ত

ইত্তিহাদ
পাবলিকেশন

কওমি মার্কেট, বাংলাবাজার, ঢাকা
০১৯৭৯-৭৬৪৯২৬
০১৮৪৩-৯৮৪৯৮৪

মাদ্রাসা মার্কেট, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম
০১৭০৫-২২১২১৭
০১৭০৯-২৩০৮৩৫